তুর্কী ও আফগান যুগে ভারত

অসিত কুমার সেন

তুর্কী ও আফগান যুগে ভারত

অসিত কুমার সেন

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮
© অসিত কুমার সেন
ISBN 81-7074-199-8
Turki O Afghan Jugey Bharat

প্রকাশক : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২

টাইপসেট : ভিশন পাবলিকেশন
১১৫ করনানি ম্যানসন, ২৫-এ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রিত : প্রিন্টো ক্রাফট
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ix

প্রথম অধ্যায় : মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের পটভূমি ও তুর্কী বিজয়ের কাহিনী ১-২৫

ইসলামের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ ও পবিত্র খলিফাদের যুগ ১; হজরত মহম্মদের উত্তরসূরী চারজন পবিত্র খলিফা ১; আরবদের সিন্ধুবিজয় ২; সিন্ধুতে আরবদের অনুসৃত নীতি ৩; আরবদের 'সিন্ধু' বিজয়ের ফলাফল ৪; গজনীর তুর্কী সুলতানদের উত্থান ৫; তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কালে হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক অনৈক্য ৬; কামরূপ ৭; হিমালয়ের রাজ্যগুলি ৮; রাজপুত অনৈক্য ৯; সুলতান মহম্মদ ঘুরীর হিন্দুস্তানে বিজয়াভিযান ১৫; বিহার ও বঙ্গদেশে ১৮; তিব্বত অভিযান ১৯; গজনীর মামুদ ও মহম্মদ ঘুরী ২০; তুর্কীদের হিন্দুস্তানে সাফল্য লাভের কারণ ২২

দ্বিতীয় অধ্যায় : দিল্লীর মামলুক সুলতানরা ২৬-৪৬

কুতুবউদ্দীন আইবাক ২৬; শামসউদ্দীন ইলতুৎমিস (১২১১-১২৩৬) ২৮; বৈদেশিক ও সীমান্ত সমস্যা ২৮; রাজ্যবিস্তার ও কৃতিত্ব ৩১; ইলতুৎমিসের দুর্বল বংশধরগণ ৩২; সুলতান রাজিয়া ৩৩; মুইজউদ্দীন বহরম শাহ ৩৫; সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ ৩৫; সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন ৩৭; অভ্যন্তরীণ নীতি ৩৯; মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ ৪১; বলবনের সুলতানী সাম্রাজ্য সুসংহত করার প্রচেষ্টা ও তাঁর নীতির মূল্যায়ন ৪২; বলবনের উত্তরাধিকারীদের আমলে ইলবারি তুর্কী বংশের পতন ৪৪

তৃতীয় অধ্যায় : খলজী সাম্রাজ্যবাদ ৪৭-৭৩

খলজী বিপ্লব ৪৭; সুলতান জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী (১২৯০-১২৯৬ খ্রী:) ৪৯; আলাউদ্দীনের দেবগিরি লুণ্ঠন ৫১; সুলতান আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রী:) ৫৩; আলাউদ্দীনের রাজত্বের শুরুতে বৈদেশিক সংকট-মোঙ্গল আক্রমণ ৫৩; রাজ্যবিস্তার ও অভ্যন্তরীণ সমস্যা ৫৪; উত্তর ভারত বিজয়ের পর সুলতান আলাউদ্দীনের দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে বিজয়াভিযান প্রেরণ ৫৬; দক্ষিণ ভারতে আলাউদ্দীনের কৃতিত্বের মূল্যায়ণ ৫৯; সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর রাজতন্ত্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা ৬০; অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ৬২; আলাউদ্দীনের অর্থনৈতিক সংস্কার ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ৬৪; আলাউদ্দীনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি কি কেবল দিল্লীতেই প্রযোজ্য ছিল? ৬৬; মুল্যায়ন ৬৯; খলজী শাসনের অবসান ৭০; সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজী (১৩১৬-১৩২০ খ্রী:) ৭১; সুলতান নাসিরউদ্দীন খসরু শাহ ৭২

চতুর্থ অধ্যায় : তুঘলক বংশের পত্তন ও দিল্লীর সুলতানী শাসনের অবক্ষয়ের সূত্রপাত ৭৪-১০৭

তুঘলক বংশের পত্তন ৭৪; গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের নীতি ৭৪; মহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রী:) ৭৭; সমকালীন লেখকদের দৃষ্টিতে মহম্মদ বিন তুঘলক ৭৭; বৈদেশিক আক্রমণ ও রাজ্যবিস্তার ৭৯; সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও তার মূল্যায়ন—দোয়াবে রাজস্ব বৃদ্ধি ৮০; রাজধানী পরিবর্তন ৮১; তাম্রমুদ্রা ৮৩; খারাসান অভিযান ৮৫; কারাজল অভিযান ৮৬; সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে বিদ্রোহ ৮৬; বঙ্গদেশে স্বাধীন সুলতানী বংশ স্থাপন ৮৮; দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহ, বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ৮৯; মহম্মদ বিন তুঘলকের মূল্যায়ন ও

www.pathagar.com

সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তাঁর দায়িত্ব ৯০; সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রী:) ৯২; অভ্যন্তরীণ নীতি ৯৩; শাসনব্যবস্থা ৯৪; রাজস্বনীতি ৯৪; সেচব্যবস্থা ও জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপ ৯৭; শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা, জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর ৯৮; ক্রীতদাস ও সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত নীতি ৯৮; উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৯৯; ধর্ম সম্পর্কিত নীতি ১০০; সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের সামরিক অভিযান ও বৈদেশিক নীতি ১০১; জাজনগর অভিযান ১০২; নগরকোট অভিযান ১০২; সিন্ধু বিজয় ১০২; সুলতান ফিরোজ শাহর মূল্যায়ন ও তাঁর সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়িত্ব ১০৩; ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের বংশধরদের অধীনে দিল্লী ১০৬

পঞ্চম অধ্যায় : আমির তৈমুরের আক্রমণ ও সাম্রাজ্যের পতন, সৈয়দ ও লোদী বংশ **১০৮-১১৯**

তৈমুরের ভারত আক্রমণ ১০৮; দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ১১০; সৈয়দ বংশ-খিজির খাঁ (১৪১৪-১৪২১ খ্রী:) ১১২; মুবারক শাহ্ (১৪২১-১৪৩৪ খ্রী:) ১১৩; মহম্মদ শাহ্ (১৪৩৪-১৪৪৫ খ্রী:) ও আলাউদ্দীন আলম শাহ্ (১৪৪৫-১৪৫০ খ্রী:) ১১৪; লোদী বংশ-বহলুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯ খ্রী:) ১১৪; সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রী:) ১১৬; ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-১৫২৬ খ্রী:) ১১৭

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভারতের আঞ্চলিক রাজ্যগুলি **১২০-১৪১**

রাজপুতদের উৎপত্তি ১২০; রাজপুতদের সংহতির অভাব, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও ভূমিব্যবস্থা ১২৩; রাজপুত সামন্ততন্ত্র ১২৪; রাজপুত রাষ্ট্রগুলি ১২৫; মেওয়ার ১২৫; মারওয়াড় ১২৬; অম্বর ১২৭; পশ্চিম ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র—গুজরাট ও মালব ১২৭; আহমদ শাহ্ (১৪১১-১৪৪৩) ১২৮; দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ্ (১৪৪৩-১৪৫১) ১২৯; মামুদ বেগাড়া (১৪৫৮-১৫১১) ১৩০; বাহাদুর শাহ্ (১৫২৬-১৫৩৭) ১৩১; মালব ১৩১; মালবের ঘোরী সুলতানগণ (১৪০১-১৪৩৫ খ্রী:) ১৩২; খলজী বংশ ১৩৩; সুলতান গিয়াসউদ্দীন (১৪৬৯-১৫০০ খ্রী:) ১৩৪; সুলতান দ্বিতীয় মামুদ শাহ্ (১৫১১-১৫৩১ খ্রী:) ১৩৪; কাশ্মীরের হিন্দু রাজবংশ ১৩৫; কাশ্মীরের প্রথম সুলতান শামসউদ্দীন ১৩৫; জৈনউল আবেদিন (১৪২০-১৪৭০ খ্রী:) ১৩৬; কাশ্মীরের পরবর্তী সুলতানগণ ১৩৭; উত্তর-পূর্ব ভারত-জৌনপুর ১৩৭; সুলতান মুবারক শাহ্ (১৩৯৯-১৪০১ খ্রী:) ও সুলতান ইব্রাহিম শাহ্ (১৪০১-১৪৪০ খ্রী:) ১৩৮; সুলতান মামুদ শাহ্ ও সুলতান মহম্মদ শাহ্ ১৩৮; সুলতান হুসেন শাহ্ শার্কী ১৩৮; কামরূপ ও আসাম ১৩৯; উড়িষ্যা ১৪০

সপ্তম অধ্যায় : সুলতানী যুগের বাংলা **১৪২-১৭৫**

বখতিয়ার খলজী কর্তৃক সেন রাজ্য দখল ১৪২; বঙ্গদেশে খলজীদের অনুপ্রবেশ ও দিল্লীর সঙ্গে এই প্রদেশের সম্পর্ক ১৪৩; বঙ্গদেশের সঙ্গে দিল্লী ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সম্পর্ক এবং স্বাধীন সুলতানী শাসনের প্রতিষ্ঠা ১৪৪; বঙ্গদেশে স্বাধীন সুলতানী শাসনের অভ্যুদয় ১৪৬; লখনৌতির শাসকদের বারংবার বিদ্রোহ ১৪৬; বুঘরা খাঁ ও তাঁর উত্তরসূরী ১৪৭; ইলিয়াস শাহী বংশ ১৪৯; সুলতান সিকন্দর শাহ্ ১৫১; গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ্ ১৫২; বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন ১৫৩; আর্থ-সামাজিক অবস্থা ১৫৪; রাজা গণেশ ১৫৫; সুলতান জালালউদ্দীন ও তাঁর বংশধররা ১৫৭; পরবর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ ১৫৮; ইলিয়াস শাহী রাজত্বের গুরুত্ব ১৬০; আবিসিনীয় শাসন ১৬২; হুসেন শাহী বংশ ১৬৩; গৌড়-উৎকল সংঘর্ষ ১৬৫; গৌড়-ত্রিপুরা সংঘর্ষ ১৬৬; নাসিরউদ্দীন আবুল মুজাফর নসরত শাহ্ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রী:) ১৬৭; গিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রী:) ১৬৯; হুসেন শাহী যুগের গুরুত্ব শাসনব্যবস্থা ১৭০; আর্থ-সামাজিক অবস্থা ১৭১; সাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৭৩; হুসেন শাহী আমলে বাংলার স্থাপত্য ও শিল্প ১৭৪

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায় : দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের উত্থান ১৭৬-২০৯

বিজয়নগরের অভ্যুদয় ও সঙ্গম বংশের রাজত্ব ১৭৬; সঙ্গম বংশ (১৩৩৬-১৪৮৫ খ্রী:) ১৭৭; বিজয়নগর-বাহমনি দ্বন্দ্ব ১৭৮; শালুভ বংশ (১৪৮৬-১৫০৩ খ্রী:) ১৮২ ; তুলুব বংশ (১৫০৩-১৫৭০ খ্রী:) ১৮২; অচ্যুত রায় ১৮৪; পরবর্তীকালের বিজয়নগরের ইতিহাস ও আরবিড়ু বংশ ১৮৬; বিজয়নগরের শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এবং এই সম্পর্কে বৈদেশিক বিবরণী ১৮৮; সামাজিক অবস্থা ১৯০; শিক্ষা ও খেলাধূলা ১৯১; আর্থিক অবস্থা-বিদেশীদের বর্ণনায় বিজয়নগরের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি ১৯১; কৃষি ও শিল্প ১৯২; শিল্প বাণিজ্য ও যোগাযোগ ১৯৩; সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প ১৯৪; স্থাপত্য ও শিল্প ১৯৫; মন্দির স্থাপত্যের শিল্পশৈলী ও ভাস্কর্য ১৯৬; দক্ষিণ ভারতে বাহমনি সুলতানদের রাজত্ব ১৯৮; মামুদ গাওয়ান ২০২; বাহমনি রাজ্যের পতন ২০৪; উপসংহার ২০৪; দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি স্বাধীন সুলতানী বংশ ২০৫; সমকালীন দক্ষিণ ভারতের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ২০৮

নবম অধ্যায় : সুলতানী যুগের শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন দিক ২১০-২৩৭

খিলাফৎ ও সুলতান ২১০; সুলতান ২১১; কেন্দ্রীয় সরকার ২১২; সুলতান ও তাঁর মন্ত্রীবর্গ ২১৩; উজীর ২১৩; প্রাদেশিক শাসন ২১৫; স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ২১৭; বিচারব্যবস্থা ও শান্তিরক্ষা ২১৮; ইকতা ২১৯; ইকতার বিবর্তন ২২০; সুলতান আলাউদ্দীনের সময় ইকতার বিবর্তন ২২০; ইকতা সম্পর্কে তুঘলক আমলে নীতি ২২১; সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় ইকতা ব্যবস্থা ২২৩; সৈয়দ ও লোদী সুলতানদের আমলে ইকতা প্রথা ২২৩; রাজস্ব ও অন্যান্য কর ২২৬; অন্যান্য কর ২২৮; কৃষি অর্থনীতি ও কৃষিকর ২২৮; সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের পরবর্তীকাল ২৩১; মধ্যযুগের ধর্ম ও রাষ্ট্র ২৩১; উলেমাদের ভূমিকা ২৩৩

দশম অধ্যায় : আর্থিক পরিকাঠামো ২৩৮-২৬০

কৃষক ও কৃষি ২৩৮; খুট, মুকদ্দম ও গ্রাম্য প্রধানের প্রভাব ২৩৯; রায়, রানা, চৌধূরী ২৪১; রাজস্বনীতি ২৪২; আলাউদ্দীনের রাজস্বনীতি ২৪৩; আলাউদ্দীনের পর রাজস্বনীতির কঠোরতা হ্রাস ২৪৪; মহম্মদ বিন তুঘলকের নীতি ২৪৪; দোয়াবের বিদ্রোহ ২৪৫; কৃষক বিদ্রোহের জন্য সুলতানের দায়িত্ব ২৪৬; দেওয়ান-ই-আমির কোহী ২৪৭; মহম্মদ বিন তুঘলকের পরবর্তীকালে রাজস্বনীতি ২৪৮; তুঘলকদের পরবর্তীযুগ ২৪৯; বাণিজ্য, বণিক ও কারিগর ২৫০; বণিক ২৫২; সামুদ্রিক বাণিজ্য ও বণিক ২৫৩; শিল্প, কারিগর ও শিল্পী এবং নাগরিক অর্থনীতি ২৫৬; বয়ন শিল্প ২৫৭; বয়নশিল্পের শ্রমিক ২৫৮; ধাতুশিল্পের কারিগর ২৫৯; স্থাপত্য শিল্পের বাস্তুকার ও কারিগর ২৫৯; অন্যান্য শিল্প ২৬০; রাজকীয় কারখানা ২৬০

একাদশ অধ্যায় : সমাজ ও সংস্কৃতি ২৬১-২৯৭

মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি ২৬১; শাসকগোষ্ঠী ২৬১; জনসাধারণ ২৬২; নারীর স্থান ২৬৩; পোষাকের ব্যাপারে মুসলিম ও হিন্দুদের পার্থক্য ২৬৪; আহার্য ও পানীয় ২৬৫; উৎসব, আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধূলা ২৬৬; হিন্দু সমাজ ২৬৬; সংস্কৃতি ও শিল্প ২৬৭; স্থাপত্য ২৭১; প্রাদেশিক স্থাপত্য-জৌনপুর ও বঙ্গদেশ ২৭২; গুজরাট ২৭৩; মালব ২৭৩; দক্ষিণ ভারতের শৈলী ২৭৪; মধ্যযুগের হিন্দুস্তানে ইতিহাস রচনা—মুসলিম ইতিবৃত্তকাররা ২৭৫; কাব্য ও সাহিত্যে ইতিহাসের প্রতিফলন ২৭৯; প্রাদেশিক ও স্থানীয় ইতিহাস

www.pathagar.com

২৮০; পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক ২৮১; বৈদেশিক বিবরণী ২৮১; মূল্যায়ন ২৮৩; হিন্দুস্তানে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ এবং আমির খসরু ২৮৪; কুতুবউদ্দীন থেকে ইলতুৎমিস ২৮৪; বলবন ও তৎপরবর্তীকাল ২৮৫; তুঘলক যুগের সাহিত্য ২৮৬; বিভিন্ন রাজ্য ও রাজধানী বহির্ভূত এলাকায় পারসিক সাহিত্যের বিকাশ ২৮৭; সুফী সাহিত্য ২৮৭; আমির খসরু ২৮৮; সুলতানী আমলে সুফী মতবাদের ইতিকথা ও সূত্রপাত ২৯১; ওহাদৎ-উল-উজুদের দর্শন ২৯১; সুফীদের কর্মকান্ড ও সংগঠন ২৯২; চিস্তি সিলসিলা ২৯৩; শেখ ফরিদউদ্দীন গঞ্জ-ই-শক্কর ২৯৩; শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া ২৯৪; হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশে সুফী প্রভাব বিস্তার ২৯৫; সুরাবর্দি সিলসিলা ২৯৫; ফিরদৌসী সিলসিলা ২৯৬; কাদিরিয়া সিলসিলা ২৯৬; নকশবন্দি সিলসিলা ২৯৬; উপসংহার ২৯৭

দ্বাদশ অধ্যায় : ভক্তি আন্দোলন ২৯৮-৩২৯

ভক্তি আন্দোলনের উৎস ২৯৯; উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ভক্তিধর্মের প্রসার ৩০১; রামানন্দ ৩০১; বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ৩০৩; প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্য যুগের বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব ৩০৪; শ্রীচৈতন্য ৩০৫; মহারাষ্ট্র ৩০৮; একনাথ ৩০৮; তুকারাম ৩০৮; রামদাস ৩০৯; হিন্দীবলয়-রামানন্দ ৩০৯; কবীর ৩১০; দাদূদয়াল ৩১১; তুলসীদাস ৩১২; মীরাবাঈ ৩১২; দক্ষিণ ভারত ৩১৩; উত্তর ভারত-নানক ও শিখ ধর্ম ৩১৪; ভক্তিধর্মের প্রচারকদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সমাজ এবং তাঁদের সম্পর্কে রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী ৩১৫; সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর ভক্তিআন্দোলনের প্রভাব ও তাদের প্রতিক্রিয়া ৩১৭; সামাজিক সচলতা ৩১৯; হিন্দী সাহিত্যের বিকাশ ও আঞ্চলিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ৩২১; রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার প্রসার ৩২৩; বাংলাভাষা ৩২৫; মধ্যযুগের অন্যান্য ভাষা ৩২৮; দাক্ষিণাত্যের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য সমূহ এবং উর্দুভাষা ৩২৯

ত্রয়োদশ অধ্যায় : হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ৩৩০-৩৫৬

মধ্যযুগের রাষ্ট্রের ধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী ৩৩০; হিন্দুস্তানে তুর্কী শাসনের প্রতিষ্ঠা ও শাসকগোষ্ঠীর ধর্ম সংক্রান্ত নীতি ৩৩০; সুলতানী শাসনে হিন্দুদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা কতদূর বিঘ্নিত হয়? ৩৩৩; ধর্মান্তকরণ ৩৩৭; শাসকগোষ্ঠী ও প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্ক ৩৩৮; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ৩৪১; লোক-সংস্কৃতি ৩৪৫; যুক্ত সাধনা ও সহমর্মিতা ৩৪৬; সংগীতের মাধ্যমে ভাববিনিময় ৩৪৭; চিত্রকলায় নবরূপায়ন ৩৪৯; স্থাপত্য ৩৫১; উপসংহার ৩৫২

পরিশিষ্ট—ক ৩৫৭-৩৬৫

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ৩৫৭; মোঙ্গল আক্রমণ ও দিল্লীর সুলতানদের সমস্যা ৩৫৭; মোঙ্গল আক্রমণের বৈশিষ্ট্য ৩৫৮; মামলুক সুলতানদের আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ৩৫৮; ইলতুৎমিসের দুর্বল বংশধরদের সময় মোঙ্গল আগ্রাসন ৩৫৯; গিয়াসউদ্দীন বলবনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ৩৬০; খলজী সুলতানদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ৩৬১; পরবর্তীকালে মোঙ্গল আক্রমণ ও তুঘলক আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ৩৬৩; তৈমুরের আক্রমণ ৩৬৩; ফলাফল ৩৬৪

পরিশিষ্ট—খ ৩৬৬-৩৭৩

ইংরাজী গ্রন্থপঞ্জী ৩৬৬; বাংলা গ্রন্থপঞ্জী ৩৭০; দিল্লীর সুলতানদের কাল নির্ঘণ্ট ৩৭২

www.pathagar.com

ভূমিকা

কলকাতা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত এই বইতে সহজ ও সরল ভাষায় তার আলোচনা করা হয়েছে। লেখকের উদ্দেশ্য হল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যযুগের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সমকালীন ও আধুনিক ইতিহাসবিদ্‌দের মতামতের বিষয়ে অবহিত করা। সুদীর্ঘকাল অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থেকে ছাত্রছাত্রীরা মধ্যযুগের ইতিহাস পঠন-পাঠন নিয়ে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেদিকে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। সেই সব সমস্যার যতদূর সম্ভব সমাধানের প্রয়াস করাই হল এই বইয়ের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য কতদূর সফল হয়েছে তা পাঠকের বিচার্য।

ত্রয়োদশ শতকে হিন্দুস্থানে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে মধ্যযুগের ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছিল বলে ধরা যায়। তুর্কী শাসকগোষ্ঠীরা এই দেশে মুলুক বা শক্তি ভিত্তিক রাষ্ট্র স্থাপন করেছিলেন। রাজ্য শাসনের জন্য তাঁরা প্রাক্তন শাসকদের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন। মধ্যযুগের রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রাক্তন শাসক রায়, রাণা, মুকদ্দম ও চৌধুরীর উপরে স্থানীয় শাসন পরিচালনা ও রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে তুর্কী শাসকগোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা লাভে উদ্যোগী হয়েছেন। সর্বনিম্নস্তরে ছিলেন কৃষকরা পাশাপাশি নগরায়ণের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল, আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল ও মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমির ওমরাহদের সঙ্গে বানিয়া, মজদুররা ও কারিগররা শহরে ভীড় করেছিল।

তুর্কী ও আফগান শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্বিরোধে পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে ও ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক দিক থেকে হিন্দুস্তান খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে বাবরের নেতৃত্বে মুঘলরা প্রথম পানিপথের যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে এদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন। কিন্তু বাবরকে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের অধীনে রাজপুত বাহিনীকে খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত করতে হয়েছিল (১৫২৭)। পরবর্তীকালে বাবরের পৌত্র আকবরকে হিমুর নেতৃত্বে পরিচালিত আফগান বাহিনীকে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫২৭) পরাজিত করে হিন্দুস্তানে মুঘল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল। এইসব ঘটনা থেকে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তুর্কী ও আফগান শাসকগোষ্ঠীর আমলে রায়, রাণা, মুকদ্দম ও চৌধুরীদের ক্ষমতা হ্রাস পায়নি এবং এদেরই সহযোগিতায় মধ্যযুগের সুলতানরা রাজ্যশাসন পরিচালনা করতেন।

মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থায় একটি ত্রিস্তরীয় বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে তুর্কী ও আফগান শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সহযোগী রাজস্ব সংগ্রহকারীরা কৃষি উৎপাদনের উদ্বৃত্তের ভাগীদার হয়েছিল। সর্ব নিম্নস্তরে ছিলেন কৃষকরা ও শহরাঞ্চলের মজদুররা। তুর্কী বিজয়ের পরবর্তীকালে নগরায়নের ও বাণিজ্যের প্রসারের দরুন শহরাঞ্চলের বানিয়ারা বিত্তবান হয়েছিলেন। নাগরিক জীবনের বিলাস-বৈভবের সঙ্গে সুলতান ও তার দরবারের অভিজাতরা অভ্যস্ত ছিলেন। শহর ও গ্রামাঞ্চলের নিম্নবর্গের মানুষরা কোনক্রমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন।

www.pathagar.com

সামাজিক জীবনে হিন্দু ও মুসলমানরা সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্মার্ত-ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কঠোর বিধিনিষেধের জালে জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিলেন ও রক্ষণশীল সমাজ গঠন করেছিলেন। ভক্তি আন্দোলনের প্রচারকরা জাতিবৈষম্য ও ভেদাভেদ চিন্তার বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করেছিলেন।

সুলতানরা মৌলবাদী উলেমাদের নির্দেশ মেনে রাজ্য পরিচালনা করতেন না। মধ্যযুগের সুলতানরা 'মুলুক' বা শক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র স্থাপন করেছিলেন ও বৈষয়িক ভিত্তিতে রাজ্যশাসন করতেন। অনেক সময় রাজনৈতিক স্বার্থে সুলতানরা ধর্মকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা করতেন। সুলতান নাসিরউদ্দীন খসরু শাহর (১০২০) বিরুদ্ধে গাজি তুঘলক বা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহর (১৩২০-১৩২৫) জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা তার অন্যতম উদাহরণ। সুলতান নাসিরউদ্দীন খসরু শাহ ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তৎসত্ত্বেও গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহ তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন ও তাঁকে পৌত্তলিক বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু খসরুর অধীনস্থ মুসলমান সৈনিকরা গাজি তুঘলকের এই জেহাদের আবেদনে সাড়া দেননি ও খসরু শাহর হয়ে লড়াই করেছিলেন। ধর্মান্তকরণে সুলতানরা উৎসাহী ছিলেন না। অ-মুসলমানদের কাছ থেকে জিজিয়া বা রাজকর আদায় করে তাদের 'জিম্মি' বলে অভিহিত করা হ'ত। উলেমারা 'জিম্মিদের নিকৃষ্ট নাগরিক হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সুলতানরা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে 'সামাজিক ভারসাম্য' রক্ষা করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। সেইজন্য সমাজের কোন অংশের পক্ষে অপর অংশের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা সহজসাধ্য ছিল না। ধর্মান্তকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উদ্দেশ্য প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে। স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য সমাজের বর্ণ-বৈষম্য ও জাতপাতের বিচার অনেক সময় ধর্মান্তকরণের কারণ হিসাবে দেখা দিত।

হিন্দুস্তানে ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরই চেঙ্গিজের নেতৃত্বে মোংগলরা মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি মরুভূমিতে পরিণত করেছিল। ফলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বহুজাতি হিন্দুস্তানে নিরাপত্তার আশায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ইরান, তুরান, খিবা, আফগানিস্তান যেখান থেকেই তারা আসুক না কেন শেষপর্যন্ত হিন্দুস্তানকেই তারা স্বদেশ বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তৎকালীন যুগের বিখ্যাত কবি আমির খসরু সেইজন্য লিখেছিলেন যে 'বতনে হিন্দু ফিরদৌস অস্ত' হিন্দুস্তান একটি স্বর্গ এবং এখানকার আকাশ-বাতাস, জীবজন্তু, পশুপক্ষী, সাচি ও জল সবকিছুই এমনকি হিন্দুরাও তাঁর চক্ষে বিদেশের তুলনায় শ্রেয়ঃ ও প্রিয় ছিল।

হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সহযোগিতা ও যুক্ত সাধনায় মধ্যযুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভাস্কর্য ও শিল্পের বিভিন্ন দিক সমৃদ্ধ হয়েছিল। বিভিন্ন সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয় ভারতীয় সভ্যতাকে গতিশীল করেছে ও হিন্দুস্তানকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

এই বইতে মধ্যযুগের ভারতের প্রথমপর্বে তুর্কী ও আফগান শাসকগোষ্ঠীদের শাসনকাল। এ যুগের যুদ্ধবিগ্রহ, আমির ওমরাহদের জীবনযাত্রা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, ব্যবসা বাণিজ্য, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও মধ্যযুগের ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে

www.pathagar.com

আলোচিত হয়েছে। তৎকালীন যুগের চিন্তাধারা, আচার-আচরণ, সুফীসন্ত ও ভক্তিধর্মের প্রচারকদের কথা এবং সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের সম্পর্কে এই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মধ্যযুগের প্রথম পর্বে তুর্কী ও আফগান গোষ্ঠীর শাসকদের প্রাধান্য মুঘলদের আগমনের ফলে অবসান হয়। প্রাক্ মুঘল যুগকেএই বইতে তুর্কী আমলে ভারত আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এই বইতে যেসব অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে তার জন্য লেখক আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানীর শ্রী কনক বাগচী বইটির প্রকাশনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে লেখককে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ইতি,
গ্রন্থকার

কলকাতা
২০শে জুলাই, ১৯৯৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের পটভূমি ও তুর্কী বিজয়ের কাহিনী

ইসলামের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ ও পবিত্র খলিফাদের যুগ

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে আরব ও তুর্কীদের নাম বিজড়িত। এইসব হিন্দুস্থানের বিদেশাগত অভিযাত্রীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইসলামের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ (৫৭১-৬৩২ খ্রীঃ) কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গোষ্ঠী বিভক্ত, দুর্বল ও বিছিন্ন আরবদের একই ধর্মপাশে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের শান্তি, সমৃদ্ধি ও একতার পথ প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি আরবদের মধ্যে সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করেছিলেন। হজরত মহম্মদের বাণী ও ইসলামের শিক্ষা আরবদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করেছিল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লিপ্ত আরব জগতকে হজরত মহম্মদ ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের পথ প্রদর্শন করেছিলেন। মুসলমানদের মতে হজরত মহম্মদ (৫৭১-৬৩২ খ্রীঃ) ছিলেন সর্বশেষ ধর্মপ্রবর্তক। তাঁর মারফতে প্রেরিত আল্লার প্রত্যাদেশ পবিত্র কোরানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইসলামের প্রভাবে গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যের স্থলে সামাজিক সংহতি আরবদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। ইসলাম ধর্মের প্রভাবে ঐক্যবদ্ধ আরবরা সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে স্বল্পকালের মধ্যে সভ্যজগতের বহুস্থানে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ পত্তন করেছিলেন।*

হজরত মহম্মদের উত্তরসূরী চারজন পবিত্র খলিফা

হজরত মহম্মদের উত্তরসূরী চারজন খলিফাকে (আরবী শব্দ খলিফার অর্থ উত্তরসূরী) বিশেষভাবে পবিত্র খলিফা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পবিত্র খলিফাদের যুগে আরবদের প্রাধান্য দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছিল। হজরত মহম্মদের পর খলিফা আবু বকর (৬৩২-৩৪ খ্রীঃ) ও খলিফা উমরের যুগে (৬৩৪-৪৪) সিরিয়া, ইরাক ও ইরানের অধিকাংশ অঞ্চলে, মিশর, ত্রিপলি প্রভৃতি স্থানে ইসলামের জয়পতাকা প্রোথিত হয়েছিল। ইসলামের এই বিজয়ের মূলে ছিল আরবদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ফলে যে অনুপ্রেরণা ও ঐক্যর সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভাবে মুসলমানরা নবোদ্যমে সকল বাধা বিঘ্ন জয় করেছিলেন। এছাড়া পবিত্র খলিফারা সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে তাদের সঠিকভাবে পরিচালিত করেন ও বিজয়লাভের পথ প্রশস্ত করেন। এযুগে বাইজেন্টাইন ও সাসানিয় পারসিক সাম্রাজ্যের দুর্বলতা তাদের অবক্ষয় ও পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল, এসম্পর্কেও কোন সন্দেহ নাই। উমরের পরবর্তী পবিত্র খলিফা ছিলেন ওসমান (৬৪৪-৫৩ খ্রীঃ) ও শেষ পবিত্র খলিফা ছিলেন আলি (৬৫৬-৬১ খ্রীঃ)। সর্বশেষ খলিফার সময় মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ ও গৃহযুদ্ধের ফলে দামাস্কাসে উমায়েদ খলিফাদের (৬৬১-৭৫০ খ্রীঃ) বংশানুক্রমিক শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল।

---

* Philips K. Hitti, History of the Arabs, (Tenth Ed), MacMillan দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

উমায়েদ খলিফা আবদুল মালিকের (৬৮৫-৭০৫ খ্রীঃ) শাসনকালে তৎকালীন ইরাক ও খোরাসানের শাসনকর্তা হেজ্জাজের অধীনে দ্বিতীয় দফায় আরবদের রাজ্যবিস্তার শুরু হয়। হেজ্জাজের নির্দেশে তাঁর দুই সেনাপতি কুতায়িবা বিন মুসলিম ও মহম্মদ বিন কাসিম যথাক্রমে ট্রান্সঅক্সিয়ানা ও সিন্ধুতে সাফল্যের সঙ্গে দুইটি অভিযানের নেতৃত্বদান করেছিলেন।

আরবদের সিন্ধুবিজয়

ভারতের পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে আরবদের বহুকাল ধরে বাণিজ্যিক সম্পর্কের অস্তিত্ব ছিল। ইসলামের বিজয়ের পূর্বে আরবরা বহু ভারতীয় বন্দরের সঙ্গে বাণিজ্য সূত্রে যোগযোগ স্থাপন করেছিল। এইসব স্থানে কিছু কিছু আরব বণিকদের বসতি ও উপনিবেশের পত্তন হয়েছিল। ইসলামের আগমনের পর এইসব আরব ঔপনিবেশিকরা ভারতে তাদের বাসস্থলে মসজিদ নির্মান করে ও স্থানীয় অধিবাসীদের অনেককে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে। ইতিপূর্বে এই অঞ্চলের হিন্দুরাজারা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মপালনে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছিলেন। মালাবারের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যারা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয় তারা অনেকেই আরবদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। এইসব বিবাহের সন্তান-সন্ততিরা মোপলা নামে পরিচিত।

আরবদের বাণিজ্যের অন্যতম বাধা ছিল জলদস্যুরা। এই জলদস্যুদের দমন করার জন্য ৬৩৬ সালে বাহরিন ও উম্মানের শাসনকর্তা একটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। খলিফা উমর নৌঅভিযানের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর আমলে আরবদের অধিকৃত মাকরান (বালুচিস্তানের) মধ্য দিয়ে অভিযান প্রেরণ করা শুরু হয়েছিল। অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে মহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুতে যে অভিযানের নেতৃত্ব দান করেছিলেন তাকে চলতি কাহিনীতে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আসলে সেই অভিযানও এই নীতিরই ফলশ্রুতি। ইরাকের শাসনকর্তা হেজ্জাজ বিন ইউসুফ (৬৯৪-৭১৪ খ্রীঃ) উমায়েদ বংশের তরফ থেকে সিন্ধুকে ট্রান্সঅক্সিয়ানার একটি অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত করে আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদী নীতিকেই অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।

এই সময় সিন্ধুর শাসক ছিলেন দাহির। দাহিরের পিতা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধ্বজাধারী চাচ সিন্ধুর বৌদ্ধশাসকদের বিতাড়িত করেন এবং সিংহাসনে একটি ব্রাহ্মণ রাজবংশ স্থাপন করেন। এই ঘটনায় সিন্ধুতে বৌদ্ধশাসকরা বিতাড়িত হন এবং সিংহাসনে একটি ব্রাহ্মণ রাজবংশ স্থাপিত হয়। কিন্তু এর ফলে সিন্ধুতে বৌদ্ধ প্রভাব হ্রাস পায়নি। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে হেজ্জাজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মহম্মদ বিন কাসিমকে সিরাজ (ইরাণ) ও মাকরানের মধ্য দিয়ে এক বিশাল ও শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সমুদ্রপথে দাহিরের বিরুদ্ধে অভিযানে মহম্মদ বিন কাসিমের সৈন্যদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দেবল বন্দরে মূল বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য উৎক্ষেপণ যন্ত্র বা বালিস্তা (Ballistae) প্রেরণ করা হয়েছিল। বালিস্তা সক্রিয় করার জন্য ৫০০ দক্ষ সামরিক ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। দেবলে (করাচির কাছে বাণিজ্যিক বন্দর) দাহিরের সৈন্য সুরক্ষিত দুর্গ থেকে প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং আরবদের শক্তিশালী উৎক্ষেপণ যন্ত্র প্রস্তর ক্ষেপণের মারফত সব বাধাবিঘ্ন চূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ৭১২ সালের প্রথমার্ধে বর্তমান হায়দ্রাবাদের (পাকিস্তান) নিকটবর্তী নিরুন আরবদের পদানত হয় এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র সেহওয়ান বিনা বাধায় তাদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। কেবলমাত্র সিন্ধুর দক্ষিণাঞ্চলে জাটেরা আরব অভিযাত্রীদের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা গড়ে তুলেছিল এবং আরব সৈন্যবাহিনীর ঘোড়া ও লোকলস্কর সিন্ধুনদের শাখাপ্রশাখা অতিক্রম করার সময় সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তাদের সংখ্যা হ্রাস পায়। কিন্তু

www.pathagar.com

এইসব বাধা জয় করে মহম্মদ বিন কাসিমের অধীনে আরব বাহিনী অগ্রসর হয় এবং হেজ্জাজ তাদের সাহায্যের জন্য নতুন সৈন্যবাহিনী, রসদ ও ওষুধপত্র প্রেরণ করেছিলেন। ৭১২ সালের জুন মাসে ব্রাহ্মণবাদের কাছে (হায়দ্রাবাদের উত্তরে) দাহিরের সঙ্গে মহম্মদ বিন কাসিমের সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল। এই সংঘর্ষে রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হন এবং ব্রাহ্মণবাদ আরবদের পদানত হয়। এই যুদ্ধের ফলে সিন্ধুর দক্ষিণাঞ্চল আরবদের দখলে এসেছিল। এইসময় দাহিরের অন্যতম বিধবাপত্নী রানী লাডীকে আরবরা বন্দী করেন। অতঃপর মহম্মদ বিন কাসিম দাহিরের রাজধানী আলোর (বর্তমান রোহরীর নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল) রাজা দাহিরের উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এইভাবে ৭১৩ সালের প্রথমার্ধে উত্তর সিন্ধু আরবদের পদানত হয় এবং মহম্মদ বিন কাসিম মুলতান অঞ্চলেও প্রাধান্য স্থাপন করেন।

সিন্ধুতে আরবদের অনুসৃত নীতি

সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরবদের হাতে বহু লুণ্ঠিত ধনঐশ্বর্য এসেছিল। তার একপঞ্চমাংশ লুণ্ঠিত ধনের প্রাপ্য হিসাবে খলিফার কাছে প্রেরিত হয় এবং বাকি অংশ ইসলামের প্রচলিত বিধি অনুসরণ করে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ব্রাহ্মণাবাদে এই সময় মহম্মদ বিন কাসিম যে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আইন প্রবর্তন করেছিলেন তা চাচনামায় বর্ণিত হয়েছে। চাচনামার লেখকের বক্তব্য অনুসারে শিল্পী, কারিগর, বণিক ও অন্যান্য সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আরব বিজয়ের ফলে ব্যহত হয়নি। কিন্তু যুদ্ধবন্দী সৈনিকদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল। যেসব ব্যক্তি এই সময় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেনি তাদের জিজিয়া কর দিতে বলা হয়। এই করের আওতায় প্রত্যেক সাবালক ব্যাক্তি মাথাপিছু জিজিয়া কর দিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু জিজিয়া আদায়ের জন্য করদাতাদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল। যেসব ব্যাক্তিকে তাঁদের আয়ের ভিত্তিতে ধনী বলে গণ্য করা যেত তাঁদের মাথাপিছু বাৎসরিক ৪৮টি রৌপ্য দিরহাম জিজিয়া হিসেবে দিতে হত। যাঁদের মধ্যবিত্ত হিসাবে ধরা হত তাঁদের বাৎসরিক ২৪ দিরহাম ও যাঁরা আয়ের ভিত্তিতে সর্বনিম্ন শ্রেণীর অন্তর্গত তাঁদের বাৎসরিক ১২ দিরহাম মাথাপিছু জিজিয়া দিতে হত। জিজিয়া আদায়ের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসীদের জিম্মি বা ইসলামিক রাষ্ট্রের রক্ষণাধীন ব্যক্তিতে পরিণত করা। এই কর থেকে বেকার, অক্ষম, পঙ্গু, বৃদ্ধ, অন্ধ ও বিকৃত-মস্তিষ্কদের এবং দরিদ্রদের রেহাই দেওয়া হ'ত।

হেজাজ্জের কাছ থেকে মহম্মদ বিন কাসেম এই সময় যে নির্দেশ পেয়েছিলেন তাতে সিন্ধুর অধিবাসীদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করার ভার তাকে গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল। কারণ ইসলামের আইন জিম্মিদের এই অধিকার দান করেছিল। এই একই কারণে হিন্দুরা ধর্মপালনে স্বাধীনতা ভোগ করত এবং তাদের এমনকি মন্দির সংরক্ষণ ও নতুন মন্দির গঠনের অনুমতি দান করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা পূর্বের ন্যায় বণিকদের কাছ থেকে ও হিন্দু প্রধান বা ঠাকুররা সাধারণ লোকের প্রণামী পেত এবং সরকারী রাজস্বের শতকরা ৩ ভাগ লাভ করার অনুমোদন পেয়েছিল। কেবলমাত্র জাটদেরই অবস্থার উন্নতি হয়নি। জাটদের কোন ভাল পোষাক পরিধান বা ব্যবহার করতে দেওয়া হত না ও তাদের ঘোড়ায় চড়ার অনুমতি ছিল না।

সিন্ধুতে মহম্মদ বিন কাসেমের বিজয়লাভ সেনাপতি হিসেবে তাঁর দক্ষতার অন্যতম নিদর্শন। প্রধানতঃ তাঁর রণকৌশলের জন্য ও আরবদের উন্নতমানের রণনীতির ফলে সিন্ধুতে আরবদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। মহম্মদ বিন কাসিম সমুদ্রপথে ও স্থলপথে সুকৌশলে তাঁর বাহিনীর সহযোগিতার মারফতে দাহিরকে বিপর্যস্ত করেছিলেন। এছাড়া দাহিরের দুর্গ ও নগরগুলির প্রতিরক্ষা ছিল দুর্বল এবং তাঁর অধীনস্থ সেনাপতি ও প্রধানরা রাজ্যরক্ষার জন্য

www.pathagar.com

ঐকান্তিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন না। দাহির নিজেকে সুরক্ষিত করার জন্য ব্রাহ্মণাবাদের চতুর্পার্শ্বে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গঠন করে আরব আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেননি যে, শত্রুর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে আক্রমণ করাই ছিল আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। বিশেষতঃ যখন মহম্মদ বিন কাসেমের সৈন্যবাহিনী সিন্ধুনদের শাখাপ্রশাখা বিধৌত অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকাকালে নানা রোগভোগের ফলে ক্ষীণবল হয়ে পড়েছিল, সেইসময় তাদের আক্রমণ করে ধ্বংস করার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু দাহির সেই সুযোগ হেলায় হারিয়েছিলেন। এছাড়া দাহিরের বাহিনীতে বিশ্বাসঘাতক সেনানীর অভাব ছিল না। ইতিপূর্বে সিন্ধুতে বৌদ্ধ রাজত্বের অবসান করে ব্রাহ্মণ বংশের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। এখন আরব আক্রমণের সুযোগে বৌদ্ধরা তাদের পুরনো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ লাভ করেছিল। সিন্ধুতে আরবদের সাফল্যের মূলে ছিল মহম্মদ বিন কাসেমের রণপ্রতিভা ও দাহিরের রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা।

আরবদের 'সিন্ধু' বিজয়ের ফলাফল

আরবদের সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে মন্তব্য করে স্টানলি লেনপোল (Stanley Lane-Pole) বলেছেন যে, 'ভারতের ইতিহাসে একে একটি উপাখ্যান মাত্র বলা যায় ও ইসলামের এটি নিস্ফলা বিজয় কাহিনী।' ৭১৪ সালে হেজ্জাত ও তৎপরবর্তী বৎসরে খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যু হয়। এই সময় সিন্ধু বিজয়ী মহম্মদ বিন কাসেমের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হয়। তাঁর পতন সম্পর্কে প্রচলিত বহু কাহিনীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, দাহিরের দুই বন্দিনী রাজনন্দিনী দামস্কাসে খলিফা ওয়ালিদের দরবারে মহম্মদ বিন কাসেমের বিরুদ্ধে তাঁদের অসম্মান করার মিথ্যা অভিযোগ পেশ করাতে খলিফা তাঁর মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন। অপর কাহিনী অনুসারে ওয়ালিদের পরবর্তী খলিফার আমলে তাঁকে সিন্ধুর শাসনকর্তার পদ থেকে সরিয়ে দেশে নিয়ে আসা হয় ও শৃংখলিত করে ইরাকে প্রেরণ করা হয় এবং সেইখানে অবশেষে মহম্মদ বিন কাসেমকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল। মহম্মদ বিন কাসেমের পরবর্তী যুগে সিন্ধুতে কোন দক্ষ শাসক প্রেরিত হয়নি। উমায়েদ খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজের (৭১২-২০) শাসনকালে সিন্ধুতে হিন্দু রাজকুমারদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। ফলে দাহিরের পুত্র জয়সিংহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি পুনরায় স্বধর্মে ফিরে যান এবং আরবদের বিরুদ্ধে লড়াইতে প্রাণ বিসর্জন দেন। কিছু হিন্দু প্রধানরা এই সময় মুসলমান হয়েছিলেন। ৭২৪ সালে জুনেয়দ সিন্ধুর শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি আরবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমন করেন ও আরবদের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য অনেকগুলি প্রতিবেশী অঞ্চলে অভিযান করেন। এইসব অভিযানের মধ্যে কাথিয়াওয়াড় ও উজ্জয়িনীতে আরব অভিযান উল্লেখযোগ্য। সিন্ধুর বাইরে আরবদের এইসব অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াতে ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে জুনেয়দকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী সিন্ধুর শাসকরা স্থানীয় বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁরা আরবদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে বিরোধের ফলশ্রুতি যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তা দমনে ব্যপৃত ও বিব্রত থাকতেন। অতএব আরব শাসনবিস্তারে তাঁরা মনোনিবেশ করতে পারেননি। ৭৩১ সালে সিন্ধুনদের তীরে আরবরা সামরিক ছাউনী হিসাবে মাহফুজা শহর স্থাপন করেছিলেন। ছয় বৎসর পরে আরবরা তাঁদের রাজধানী ম্যানসুরার পত্তন করেছিলেন। ৮৫৪ সালে উমর বিন আব্দুল আজিজ হিব্বারী সিন্ধিতে যে বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা চালু করেন। তিনি বাগদাদের আব্বাসিদ খলিফাদের প্রতি নামে মাত্র আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের ফতেমিদ খলিফাদের সঙ্গে আনুগত্য বন্ধনে আবদ্ধ ইসমাইলীরা মুলতান দখল করেছিল এবং আটবছর বাদে হিব্বারী পরিবারের কাছ থেকে সমগ্র

www.pathagar.com

সিন্ধুর শাসনদণ্ড ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

আরবদের সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে উল্লেখ করে কেমব্রিজ হিষ্ট্রি এব ইণ্ডিয়ার (তৃতীয় খণ্ড) লেখক স্যার উলসী হেগ মন্তব্য করেছেন যে,—'It was a mere episode in the history of India and affected only a small fringe of that vast country.' রাজনৈতিক গুরুত্ব না থাকলেও অন্যান্য বহুদিক থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কতকগুলি সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেখা যায়। তন্মধ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব বাণিজ্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে এই বাণিজ্যের প্রসার করার জন্য সিন্ধুর আরবশাসনের অবদান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ। আরবরা স্বল্পকালের মধ্যেই সিন্ধুবাসীর জীবনের সঙ্গে নিজেদের গোষ্ঠীগত জীবনযাত্রাকে মানিয়ে নিয়েছিল। ৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন হিন্দুপ্রধানের অনুরোধে কোরাণ সিন্ধি ভাষায় অনুদিত হয়। যে সব আরব ভ্রমণকারী দশম শতকে সিন্ধুতে এসেছিলেন তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, স্থানীয় নগরাঞ্চলের অধিবাসীরা আরবী ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় কথাবার্তা চালাতে অভ্যস্ত। ফলে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পথ সহজে সম্প্রসারিত হয়েছিল। কুফার চর্ম কারখানায় মাকরান ও সিন্ধুর লোকেরা চর্মের কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনের সুযোগ লাভ করত। ফলে তারা যে দক্ষতা অর্জন করেছিল তার জন্য সিন্ধুর চর্মজাত পণ্য ও জুতা এমনকি খলিফার দরবারেও সমাদৃত হত। ফলে সিন্ধুর তৈরী জুতার মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছিল। সিন্ধুর উট ব্যবসায়ীরা বিদেশে ক্রয়বিক্রয় করে লাভবান হবার সুযোগ পান। আব্বাসিদ খলিফাদের অনুবাদ সম্পর্কিত বিভাগের সঙ্গে সিন্ধুর বুদ্ধিজীবীদের যোগাযোগ ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের জ্যোর্তিবিজ্ঞান, ভেষজবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান ও শাসনাতন্ত্রিক পদ্ধতি সংক্রান্ত পুস্তকগুলি আব্বাসিদ দরবারের অনুবাদ বিষয়ক বিভাগের কাছে পরিচিত। এইসব সিন্ধী বুদ্ধিজীবীদের হাদিস ও ফিকের (Fiqh) সম্পর্কে জ্ঞান ইসলামিক ধর্মীয়জ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এইজন্য ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছেন যে, 'We may endorse Stanley Lane-Pole's view that the conquest of Sind produced no permanent political results, but it must be added that the Arabs derived much benefit from the culture and learning of the Hindus.'

গজনীর তুর্কী সুলতানদের উত্থান

আরবরা সিন্ধুর অনূর্বর ও উষর প্রদেশ জয় করেছিলেন। তাঁরা হিন্দুস্তানের অভ্যন্তরে প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হননি। কিন্তু দশম শতকে তুর্কীরা প্রবল বেগে উত্তর ভারত পদানত করার জন্য আফগানিস্থানের পার্বত্য অঞ্চল থেকে ক্রমান্বয়ে ও ক্রমবর্দ্ধিত সংখ্যায় আক্রমণ শুরু করেছিল।

দশম শতকের প্রথমার্ধে বালখের সামান নামক একজন পারসিক অভিজাত ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে ট্রান্সঅক্সিয়ানা, পারস্য ও বর্তমানে আফগানিস্থান নামে পরিচিত অঞ্চলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সামানিদ সুলতানী বংশ ৮০৯ থেকে ১০০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই সুলতানী বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় আল্পতগীন নামে একজন তুর্কী ক্রীতদাস হাজিবউল হুজাব বা রক্ষীবাহিনীর প্রধানপদ লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সুলতান আব্দুল মালিকের (৯৫৪-৬১ খ্রীঃ) রাজত্বকালে আল্পতগীন খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিছুকাল পরে আব্দুল মালিকের উত্তরসূরীরা তাঁকে পদচ্যুত করায় তিনি সামানিদ সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন। তিনি গজনী দখল করে একটি স্বাধীন সুলতানী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৯৬৩ সালে আল্পতগীনের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে আল্পতগীনের সুযোগ্য প্রাক্তন ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তগীন ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সিংহাসন দখল করেন।

www.pathagar.com

সবুক্তগীন সিংহাসনে আরোহন করে গজনীর রাজ্যটি সুসংগঠিত করেছিলেন। তাঁর প্রভুর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র রাজ্যের সীমানায় তিনি আবদ্ধ থাকতে চাননি ও আফগানদের সুশিক্ষিত ও দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীতে পরিণত করে তাদের সাহায্যে রাজ্যবিস্তারের দিকে নজর দিয়েছিলেন। তিনি গজনীর আশেপাশের অঞ্চল দখল করেন ও হিন্দু শাহী রাজবংশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। শাহী নৃপতিদের রাজ্য সরহিন্দ থেকে লামঘান ও কাশ্মীর থেকে মূলতান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁদের রাজধানী ছিল ওয়াইহিন্দ বা উন্দে। ৯৮৬-৮৭ সালে শাহীরাজা জয়পাল প্রাক্তন পরাভবের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে গজনী আক্রমণ করেছিলেন। সবুক্তগীন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। জয়পাল পরাজিত হয়ে যে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন তার শর্ত অনুসারে শাহী নৃপতি প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি এই শর্ত পালন করেননি। বরং পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জয়পাল তাঁর মিত্র হিন্দুরাজাদের সহযোগিতা নিয়ে পুনরায় সবুক্তগীনের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। কিন্তু লামঘান ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন। ৯৯৭ সালে সবুক্তগীন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু ইসমাইল তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মামুদের নিকটে পরাজিত হয়ে সিংহাসনচ্যূত হয়েছিলেন। অতঃপর মামুদ গজনীর একচ্ছত্র অধিপতি হন। সামানিদ সুলতানদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের ফলে মামুদ সামানিদ সুলতানদের বাণিজ্য ও কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ খোরাসন প্রদেশ দখল করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মামুদের এই বিজয়ে আব্বাসিক খলিফা আল-কাদির (৯৯১-১০৩৯) উল্লসিত হয়েছিলেন কারণ সামানিদ সুলতানরা তাঁর খলিফা পদে উত্তারাধিকার লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অতএব খলিফা আল-কাদির সুলতান মামুদকে ইয়েমিন উদ-দৌলা ও আমিন-উল-মুলক উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু সুলতান মামুদ প্রধানত তাঁর হিন্দুস্থান অভিযানের জন্য বিখ্যাত।

তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কালে হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক অনৈক্য

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে হিন্দু নৃপতিরা আত্মকলহে ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের পাল রাজবংশ, উত্তর ভারতের গুর্জর-প্রতিহার বংশ ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে ত্রয়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় একশতকের অধিক কাল এই সংঘর্ষ চলতে থাকে। বাংলার পালবংশীয় সম্রাট ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রীঃ) ও দেবপালের (৮১০-৮৫০ খ্রীঃ) প্রভাব উত্তর ভারতে বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু নবম শতকে গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় নৃপতি মিহিরভোজ (৮৩৬-৮৮৫ খ্রীঃ) প্রতিহার সাম্রাজ্যের গৌরব পুণরুদ্ধার করেন। সিন্ধু, কাশ্মীর ও পাল রাজত্ব ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল। তাঁর উত্তরসূরী মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯১০ খ্রীঃ) উত্তরবঙ্গের একটি অংশে ও মগধে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দশম শতকে মহেন্দ্রপালের সাম্রাজ্য হিমালয় থেকে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই ত্রয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে দক্ষিণভারতের রাষ্ট্রকূট নৃপতিরাও পরাক্রমশালী ছিলেন। রাষ্ট্রকূট নৃপতি ধ্রুব। (৭৮০-৭৯৩ খ্রীঃ) উত্তর ভারতে সমরাভিযান করে ধর্মপাল ও প্রতিহার নৃপতিকে পরাজিত করেন। পরবর্তীকালে মহেন্দ্রপালের পুত্র মহীপাল রাষ্ট্রকূট তৃতীয় ইন্দ্র কর্তৃক পরাজিত হন এবং কনৌজ রাষ্ট্রকূটদের পদানত হয়। ইহার পর সামন্ত চন্দেল্লা বংশের সাহায্যে প্রতিহারগণ পুনরায় কনৌজ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের পূর্বগৌরব ফিরে আসেনি। চন্দেল্লা, চেদী, পরমার, চালুক্য, তোমর, গাহড়বাল, চৌহান, কলচুরী প্রভৃতি

www.pathagar.com

সামন্ত নৃপতিরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। পূর্বাঞ্চলে পাল রাজারা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সেন রাজাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে চালুক্য, সুদূর দক্ষিণে চোল নৃপতিদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রতিহার নৃপতি রাজ্যপাল যখন কনৌজে রাজত্ব করছিলেন সেই সময় সুলতান মামুদ কনৌজ আক্রমণ করেন। রাজ্যপাল তাঁর নিকট পরাজিত হন এবং কনৌজ লুণ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার ও পালদের মধ্যে শেষোক্ত রাজবংশ বঙ্গদেশ ও বিহারে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং দশম শতকে উত্তর ভারতে প্রতিহারদের দুর্বলতার জন্য প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করেছিলেন। পালরাজা মহীপাল পরাক্রমশালী চোল সম্রাট রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গদেশে অভিযানের সময় আত্মরক্ষার জন্য স্বীয় উচ্চাকাংখাকে সংযত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কম্বোজ জাতির আক্রমণ ও কৈবর্তবিদ্রোহের ফলে পাল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বাদশ শতকে সেন রাজবংশ, বঙ্গদেশে প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন। বিহারে তুর্কী বিজয়ের প্রাক্কাল পর্যন্ত পাল রাজারা রাজত্ব করেছিলেন। সেনবংশীয় সামন্ত সেন বা তাঁর বংশধর হেমন্ত সেন একটি স্বাধীন রাজবংশ স্থাপন করেন। পরবর্তী সেনরাজা বিজয়সেন একাদশ শতকের শেষার্ধে বা দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে পরাক্রমশালী শূর নৃপতিদের সহায়তায় শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁর পুত্র বল্লালসেন চালুক্য রাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কন্যা রমাদেবীকে বিবাহ করেন। কথিত আছে যে তিনিই বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। দানসাগর ও অদ্ভুদসাগর নামক দুইটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন সম্ভবত ১১৭৮-১১৭৯ বা ১১৮৪-৮৫ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবার কোন কোন পন্ডিতের মতে সেন অব্দের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ১১১৯ সালে লক্ষণ সেন সিংহাসন লাভ করেছিলেন। তাঁর লিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে গৌড়, বঙ্গ ও রাধার উপর তাঁর প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল। লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে যুদ্ধে কলিঙ্গ ও কাশ্মীর অধিপতি পরাজিত হন। পাল রাজা মদন পালের ও গাহড়বাল নৃপতি জয়চাঁদের সঙ্গেও তাঁর সংঘর্ষ হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে সেন রাজাদের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং তুর্কী আক্রমণকারী ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বখতিয়ার খলজীর আক্রমণের সময় রাজধানী নদীয়া থেকে পলায়ন করে (১২০২ খ্রীঃ) পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশে) আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। মিনহাজ লিখিত তবকত্-ই-নাসিরীতে বলা হয়েছে যে, মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সহ বখতিয়ার নদীয়া দখলে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই বক্তব্য যে অতিরঞ্জিত তা মিনহাজের বক্তব্য পাঠ করলেই বোঝা যায়। বখতিয়ার ও তাঁর সঙ্গীরা যখন প্রাসাদ আক্রমণে ব্যাপৃত তখন শহরের মধ্যস্থল থেকে প্রচণ্ড চিৎকার ও গোলমাল শোনা যায় বলে মিনহাজ নিজেই স্বীকার করেছেন। এই শব্দ ও হৈচৈ-র মূল কারণ স্বাভাবিকভাবেই মূলবাহিনীর শহর আক্রমণের ফলশ্রুতি, এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই। লক্ষ্মণসেন ও তার বংশধররা ত্রয়োদশ শতকে পূর্ববঙ্গে তুর্কী আক্রমণকারীদের প্রতিহত করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। গীতগোবিন্দের লেখক জয়দেব ও পবনদূতের লেখক ধোয়ী লক্ষ্মণসেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন।

কামরূপ

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত কামরূপ আধুনিক আসাম অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল। কামরূপের রাজধানী ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েনসাং সপ্তম শতকে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে এই স্থান পরিভ্রমণ করেন। ভাস্করবর্মন হর্ষবর্ধনের মিত্র ছিলেন ও বঙ্গদেশের অধিপতি শশাঙ্কের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে অহোমরা আসামে অনুপ্রবেশ করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। বখতিয়ার

www.pathagar.com

খলজী নদীয়া ও গৌড়ে বিজয়ের পর 'তিব্বত' বিজয়মানসে কামরূপের মধ্যে দিয়ে সামরিক অভিযান করেছিলেন। ফলে তাঁর সৈন্যবাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। মুষ্টিমেয় অনুচরসহ গৌড়ে প্রত্যাবর্তনের পর বখতিয়ার স্বীয় একজন অনুচরের হস্তে নিহত হন। পরবর্তীকালে যেসব তুর্কী শাসনকর্তা কামরূপ জয়ের প্রচেষ্টা করেছিলেন, তাঁরাও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

হিমালয়ের রাজ্যগুলি

সপ্তম শতকে হিমালয়াশ্রিত রাজ্য কাশ্মীর গাঙ্গেয় উপত্যকার রাজ্যগুলির পরাক্রমশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতে পরিণত হয়েছিল। এইযুগে কাশ্মীরের স্থানীয় কর্কটবংশের প্রসিদ্ধ নৃপতি দুর্লভবর্দ্ধন ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর উত্তরসূরী চন্দ্রাপীড় ও মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য চীনা সম্রাটের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। কলহন লিখিত রাজতরঙ্গিনীতে মুক্তা পীড়ের তিব্বতী, দর্দ, তুর্কী ও গৌড়ের একজন নৃপতির উপর বিজয়ের কাহিনী এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীর হস্তে কনৌজের যশোবর্মনের পরাজয়ের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়পীড় বিনয়দিত্য তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে গৌড় ও কনৌজের নৃপতিদের পরাজিত করেন।

নবম শতকের মাঝামাঝি কাশ্মীরে উৎপলবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। কনৌজের সম্রাট প্রথম ভোজ ও উদভান্ডপুরের শাহীদের সহিত এই বংশের দ্বিতীয় নৃপতি শংকরবর্মন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর শোষণে অতিষ্ঠ প্রজাদের হস্তে শংকরবর্মনের মৃত্যু হয়। অতঃপর কাশ্মীরে কিছুকাল বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাণী সুগন্ধা এইযুগে তাঁর পছন্দমত ব্যক্তিদের সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যশাসন করতেন। কিন্তু তিনি তন্ত্রিন নামে শক্তিশালী, একটি সামরিক গোষ্ঠীর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই তন্ত্রিন গোষ্ঠী ক্রমে রাষ্ট্রে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। কাশ্মীরের একাঙ্গদের সহায়তায় রাণী সুগন্ধা তন্ত্রিনদের দমনের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে তিনি নিজেই ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। অবশেষে সামন্তগোষ্ঠীদের একাংশের প্রচেষ্টায় তন্ত্রিনরা বিতাড়িত হয়। এই সময়ে ব্রাহ্মণরা সমবেত হয়ে তাঁদের মধ্যে থেকে যশস্কর নামে একজনকে রাজামুকুট দান করেন। যশস্করের বংশ কাশ্মীরে কিছুকাল রাজত্ব করার পর পর্বগুপ্ত কাশ্মীরে এক নতুন রাজবংশের সূত্রপাত করেছিলেন। পর্বগুপ্তের উত্তরসূরী ক্ষেমগুপ্তের রাণী দিদ্দা (৯৮০-১০০৩) কাশ্মীরের প্রকৃত শাসক ছিলেন। দিদ্দা ছিলেন একজন লোহার প্রধানের কন্যা এবং মাতার দিক দিয়ে উদভান্ডপুরের শাহীদের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর মৃত্যুর পর লোহার বংশীয় সংগ্রামরাজ কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। এইযুগে সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে লোহার নৃপতি শাহীরাজবংশের প্রতিরোধে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ কলহে কাশ্মীর উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ১৩৩৯ সালে কাশ্মীরে মুসলমানদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

হিমালয়ের পাদদেশে অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য বহুকাল নিজেদের স্বাতন্ত্র রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এইসব রাজ্যগুলির মধ্যে কুলুত, চম্বা, কুমায়ুন, গাড়োয়াল অঞ্চল, ত্রিগর্ত (জলন্ধর), দুর্গের বা জম্মুর নাম উল্লেখ করা যায়। প্রথমোক্ত রাজ্যটির নাম মহাভারত, বৃহৎ সংহিতা, কাদম্বরী ও মুদ্রারাক্ষসে উল্লিখিত আছে এবং দিল্লীর সুলতানরা এই অঞ্চলের প্রধানদের পরাক্রমশালী নৃপতি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। চম্বা, কুলুতের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এই দুইটিসহ এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি দীর্ঘকাল নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছিল।

হিমালয়ের আশ্রিত রাজ্যগুলির মধ্যে ভারতের উত্তরসীমান্তে রাজ্যের মধ্যে নেপাল

www.pathagar.com

অন্যতম। নেপালের পশ্চিমে কুমায়ুন ও পূর্বে সিকিম অবস্থিত। নেপালের রাজধানী কাটমুণ্ডু সম্ভবতঃ ৭২৪ সালে রাজা গুনকামদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপাল, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্যের যোগসূত্র ছিল। এখানকার শক্তিশালী ভূস্বামী ও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধানরা স্ব স্ব প্রধান ছিলেন। কোন কোন পরাক্রমশালী নৃপতি এদের ঐক্যবদ্ধ করতে ও স্ববশে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাশ্মীরের ন্যায় নেপাল তুর্কী আক্রমণের সম্মুখীন হয়নি এবং শক্তিশালী ভূস্বামীরা এখানে প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন। ১৭৬৮ সালে গুর্খারা নেপাল বিজয় করে এখানে রাজত্ব করেছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে যে রাজ্যটি গজনীর আক্রমণকারীদের সম্মুখীন হয়েছিল সেটি হল কাবুল ও উদ্‌ভান্ডপুরের তুর্কী শাহী রাজবংশ। রাজা লাগতুরমানের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কল্লার তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে নবম শতকের মধ্যভাবে হিন্দুশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা জয়পাল ও আনন্দপাল গজনীর সুলতানদের অর্থাৎ সবুক্তগীন ও মামুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গঠন করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই বংশের শেষ রাজা ভীমপাল ১০২৬ সালে গজনীর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। শাহী বংশের উত্তরসূরীরা কাশ্মীরের লোহার রাজবংশের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং পাঞ্জাব তুর্কীদের পদানত হয়। 'অক্সফোর্ড হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া'তে (৪র্থ সংস্করণ) ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে এই পরিবর্তনশীল যুগের বৈশিষ্ট্য হল রাজপুত গোষ্ঠীদের উত্থান। তারা অষ্টম শতক থেকে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। রাজপুতরা এইসময়ে এতদূর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিলেন যে হর্ষের মৃত্যুর পর থেকে উত্তরভারতে মুসলমান বিজয়ের কাল পর্যন্ত মোটামুটি সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত যুগটাকে যথার্থভাবে রাজপুত যুগ বলা যায়। রাজপুতরা কোন একটি জাতি বা গোষ্ঠী বা গণের সঙ্গে যুক্ত একই বংশ বা রক্ত সম্পর্কিত জাতি ছিলেন না বরং রাজপুত বলতে এক সামাজিক স্তরের মানুষের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশিত হ'ত যারা রণদক্ষ। এই রাজপুতরা অভিজাত বংশীয় বলে দাবী করতেন এবং প্রাচীন শাস্ত্র উল্লিখিত ক্ষত্রিয় বংশউদ্ভূত বলে ব্রাহ্মণরা তাঁদের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

রাজপুত অনৈক্য

রাজপুতগোষ্ঠীদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল গুর্জর-প্রতিহাররা। নবম দশকে মহেন্দ্রপালের লিপিতে গুর্জর-প্রতিহাররা সূর্যবংশীয় বলে দাবি করেন। আরেকটি লিপিতে বলা হয়েছে দ্বাররক্ষীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন বলে এইবংশ প্রতিহার উপাধিতে ভূষিত। রাজশেখর এই মহেন্দ্রপালকে রঘু বংশের 'অলংকার' বলে বর্ণনা করেছেন। ৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি লিপি থেকে অনুমান করা হয় যে, প্রতিহাররা ছিলেন গুর্জরদেরই শাখা এবং এই গুর্জরা বিদেশাগত ছিলেন বলে অনেক ঐতিহাসিক অভিমত প্রকাশ করেছেন। চারণ কাব্যের বর্ণনা অনুসারে প্রতিহাররা আবু পাহাড়ে অনুষ্ঠিত বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে যে পৌরানিক মানব উদ্ভূত হয়েছিল তারই বংশধরদের অন্যতম। প্রতিহার ছাড়া অন্য যে তিনটি গোষ্ঠী এই 'অগ্নিকুলের' দাবি করতেন তাঁরা হলেন পরমার, চালুক্য ও চহমানরা। অগ্নিকুলের এই কাহিনীর চাঁদ বরদাইর পৃথিরাজ রাসোতে অন্যরকম ভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং ঐতিহাসিক সূত্র হিসাবে এর নির্ভরশীলতা সন্দেহজনক। কারণ চহমান ও প্রতিহার লিপিতে এই অগ্নিকুলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। চালুক্য দ্বিতীয় ভীমের রাজত্ব কালের লিপিতে জানা যায় যে, কামধেনু নন্দিনী নিয়ে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বিরোধে জয়লাভ করার জন্য ঋষি বশিষ্ঠ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। যজ্ঞ থেকে সৃষ্ঠ বীরপুরুষই পরমার বা শত্রুহন্তারক নামে অভিহিত হয়েছিলেন কারণ তিনি বশিষ্ঠকে

www.pathagar.com

কামধেনু উদ্ধার করে দিয়েছিলেন। অতএব গুজরাতের চালুক্য নৃপতিরা অগ্নিকুল কাহিনী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। পদ্মগুপ্তের নবসহস্ক্ষচরিতেও বশিষ্ঠের যজ্ঞ থেকে পরমার নামে বীরপুরুষের উদ্ভব ও নন্দিনীর উদ্ধারের কাহিনী পাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত রাজপুতদের উৎপত্তি সম্পর্কে এইসব বিভিন্ন কাহিনীর ঐতিহাসিক সূত্র সন্ধানের প্রচেষ্টা বৃথা।

পশ্চিম ভারতে বহুশতক ধরে যে রাজপুতরা তাদের প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তাদের বৈদেশিক জাতি হুন, গুর্জর প্রভৃতির সংমিশ্রনে সৃষ্ট মিশ্র জাতি বলে অনুমান করা হয়। ডি. আর. ভান্ডারকর মনে করেন যে, গুজরাটের চালুক্যরা সম্ভবত গুর্জরদের বংশধর। কিন্তু চালুক্যদের সঙ্গে সুলিক বা মধ্যএশিয়ার সোগডিয়ান বা গুর্জরদের সম্পর্ক প্রমানিত হয়নি। হুনরা গুপ্তযুগে রাজস্থানের গণরাজ্যগুলি অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে এইস্থানে বসবাস শুরু করেছিল এবং রাজপুতরা তাদের বংশধর বলে অনেক ঐতিহাসিক দাবি করেন।

বশিষ্ঠের যজ্ঞ যেসব রাজপুতগোষ্ঠী প্রচলিত কাহিনী অনুসারে তাঁদের উদ্ভব দাবি করেন তাঁরা হলেন পরমার, প্রতিহার, চৌহান ও সোলাংকী। এইসব রাজপুতগোষ্ঠী গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর তাঁদের রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এদের উৎপত্তি সম্পর্কে ক্রুক অনুমান অনুসারে অগ্নিশুদ্ধির মারফতে বিশুদ্ধিকরণের অনুষ্ঠানের প্রশ্ন বিজড়িত ছিল। এইসব রাজপুতগোষ্ঠীর মধ্যে চহমান বা চৌহানরা উত্তর আজমীরের শাকম্বরীর শাসক ছিলেন। তাঁদেরই একটি শাখা উজ্জয়িনীর শাসক গুর্জর দ্বিতীয় মহেন্দ্রপালের সামন্ত ছিলেন ও অপর একটি শাখা ব্রোচে প্রথম নাগভট্টের সামন্ত হিসাবে রাজত্ব করতেন। শাকম্বরীর চৌহানদের মধ্যে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে উল্লেখযোগ্য নৃপতি ছিলেন চতুর্থ বিগ্রহরাজ ও তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র তৃতীয় পৃথ্বীরাজ। ১১৭৫ সালে তিনি কনৌজের গাহড়বাল রাজা জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তাকে অপহরণ করে বিবাহ করেছিলেন বলে চাঁদ বরদাইর কাব্য পৃথ্বীরাজ রাসোতে বর্ণিত হয়েছে। পৃথ্বীরাজ প্রথম তরাইর যুদ্ধে (১১৯১ খ্রীঃ) মুইজউদ্দীন ঘোরীকে পরাজিত করেন। কিন্তু পরবৎসর দ্বিতীয় তরাইর যুদ্ধে তুর্কীদের হাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

দশম শতকের একটি লিপি অনুসারে পরমার নৃপতি প্রথম বাকপতি রাজ রাষ্ট্রকূটবংশীয় নৃপতি তৃতীয় কৃষ্ণের বংশধর ছিলেন। পরমাররা দাক্ষিণাত্য থেকে এসেছিলেন। এরজন্য তাঁদের বিদেশাগত বলে গণ্য করা যায় না। সোলাংকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা মূলরাজ ছিলেন একজন চাপোকাত রাজকুমারীর সন্তান। হেমচন্দ্র তাঁকে চালুক্য বংশের রাজা বলে অভিহিত করেছেন। এই বংশের নৃপতিরা অনহিলওয়াড়ায় দশম শতকের শেষার্ধ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সোলাংকি প্রথম ভীমদের (১০২২) ধরের রাজা প্রথম ভোজকে পরাজিত করেন। সোমনাথ মন্দির মামুদ কর্তৃক ধ্বংস হ'লে ভীমদের এই মন্দির পুনর্নির্মিত করেছিলেন। এই বংশের প্রসিদ্ধ নৃপতি ছিলেন জয়সিংহ সিদ্ধরাজ। সোলাংকি দ্বিতীয় ভীমদের ১১৯৫ সালে কুতুবউদ্দীন আইবাককে পরাজিত করেন। কিন্তু ১১৯৭ সালে তুর্কীরা তাঁর রাজধানী অনিহিলওয়াড়া দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। জেজাকভুক্তির চন্দেল্লারা যে বিদেশাগত নন এবিষয়ে এই বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী থেকেই বোঝা যায়। খাজুরাহোর একটি প্রস্তর লিপিতে(৯৫৪ খ্রীঃ) চন্দেল্লারা চন্দ্রবংশীয় বলে দাবি করা হয়েছে। ইউরোপীয় লেখকরা ভিনসেন্ট স্মিথ ও রাসেল অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, চন্দেল্লারা অনার্য কোন জাতি মধ্যভারতের গন্ড বা ভরদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। এই বংশের নৃপতি ধঙ্গ (৯৫৪-১০০২) ও তাঁর পুত্র গন্ড যথাক্রমে সবুক্তগীন ও মামুদের বিরুদ্ধে শাহী রাজাদের সাহায্য করেছিলেন। কনৌজের রাজা রাজ্যপাল মামুদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন বলে গন্ডের পুত্র চন্দেল্লারাজ বিদ্যাধরদেব শাস্তিদানের জন্য অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পর চন্দেল্লারা মামুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কালঞ্জরকে রক্ষা করতে সমর্থ হননি। চন্দেল্লা নৃপতি

www.pathagar.com

কীর্তিবর্মন ও মদনবর্মন রাজত্বকালে দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই বংশের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১২০৩ সালে চন্দেল্লা নৃপতি পরমার্দিদেব বা পরমলকে পরাজিত করে কুতুবউদ্দীন আইবক কালঞ্জর দখল করেছিলেন।

গাহড়বালদের তাদের অতীতের কোন গৌরবজনক ভূমিকার কথা এই বংশের লিপিতে উল্লিখিত হয়নি এবং অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সম্ভবতঃ তাঁরা প্রথমযুগের গজনীর শাসকদের করদাতা সামন্ত ছিলেন। যদিও এসম্পর্কে সঠিক কিছু বলা যায় না। ভিনসেন্ট স্মিথ গোরক্ষপুরের একটি প্রচলিত কাহিনী উল্লেখ করেছেন যাতে বলা হয়েছে গহরওয়ার বা গাহড়বালরা নল রাজার বংশধর ও নারওয়ার (গোয়ালিয়রের নিকটস্থ) থেকে কাশীতে এসে রাজ্য বিস্তার করেন। এই কাহিনী তাদের মধ্যভারতের আদিবাসীদের সঙ্গে যুক্ত করে বলে অনেকে অনুমান করেছেন এবং সম্ভবতঃ এইজন্যই টড তাদের দূষিতরক্তের (Contaminated blood) কথা বলেছেন। তুলনামূলক ভাবে অজ্ঞাত এই গাহড়বালরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার পর ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য লড়াই চালান এবং সেইজন্য ক্ষত্রিয় আখ্যালাভ করেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র। তাঁর পৌত্র জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজ স্বয়ম্ভর সভা থেকে অপহরণ করার কাহিনী চাঁদ বরদাইর পৃথ্বীরাজ রাসোতে বর্ণিত হয়েছে। ১১৯৪ সালে কুতুবউদ্দীন আইবক জয়চাঁদকে পরাজিত ও নিহত করে কাশী দখল করেন। তুর্কী বিজয়ের প্রাক্কালে রাজপুতদের অনৈক্যের জন্য তাদের পরাজয় হয়েছিল।

কাশীর গাহরওয়ার শাসকদের কথা পৃথ্বীরাজ রাসোর মহোবাখণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে ও তাঁদের গাহড়বালদের সঙ্গে সনাক্ত করা হয়। উত্তরপ্রদেশের গহড়বারদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রবাদ অনুসারে গাহড়বালরা যযাতির বংশধর বলে দাবি করে। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমর্থনে সংগ্রাম করায় অখ্যাত, অজ্ঞাত স্বনির্ভরশীল গোষ্ঠী থেকে গাহড়বালরা 'ক্ষত্রিয়' হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। মাড়ওয়ারের ও বিকানিরের রাঠোর বংশীয় নৃপতিরা গাহড়বালদের বংশধর বলে স্থানীয় ইতিবৃত্তকাররা সকলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। মাড়ওয়ারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতাকে পরবর্তীকালের একটি লিপিতে 'কনৌজিয়া বা ঠোড' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার বিথুলিপিতে তাঁকে 'রাঠাড' উপাধিতেই ভূষিত করা হয়েছে। রাঠোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সিহার সঙ্গে জয়চাঁদের সম্পর্ক ছিল কিনা বলা যায় না। সম্ভবতঃ জয়চাঁদ তুর্কী আক্রমণের সময় কনৌজের সার্বভৌম নৃপতি ছিলেন। স্থানীয় রাষ্ট্রকূট রাজবংশ (সিহাকে বাদায়ুনের স্থানীয় রাষ্ট্রকূটদের বংশধর বলে অনুমান করা হয়) তাঁকে স্বীকৃতি দান করেছিল। অন্যান্য রাজবংশের মধ্যে হৈহেয়দের একটি শাখা চন্দ্রবংশীয় বলে দাবি করেছেন। ত্রিপুরীর (জব্বলপুরের কাছে) চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং কার্তবীর্যার্জুনের বংশধর বলে তাঁদের লিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। দহালের কালচুরীরা বিষ্ণুর থেকে তাঁদের পূর্বপুরুষের উৎপত্তি হয়েছে বলে দাবি করেন। তুর্কী আক্রমণের যুগে যে সব প্রধান প্রধান রাজপুত রাজবংশের পতন হয়েছিল এছাড়া মধ্যযুগে অন্যান্য কয়েকটি রাজপুত রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে মাড়ওয়ারের রাঠোরদের কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। মেওয়ারের গুহিল গোষ্ঠীরা ও অম্বর-জয়পুরের কাছোয়া রাজপুতদের নাম এই সূত্রে উল্লেখ্য। প্রতিহারদের সামন্ত তোমররা চৌহান বিজয়ের পূর্বে দিল্লীতে রাজত্ব করতেন। এই সব রাজপুতগোষ্ঠী যারা তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন তাঁরা চন্দ্র বা সূর্যবংশীয় বৈদেশাগত বা আদিমগোষ্ঠী সম্ভূত যাই হয়ে থাকুন না কেন হিন্দুস্থানের পরিস্থিতি ও পরিবেশের সঙ্গে এমন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বহির্ভূত কোন প্রভাবের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। এইজন্য ডঃ

www.pathagar.com

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, 'There might be foreign elements in the Hindu population of the 'Rajput period' but there are few recognisable foreign elements in the Hindu society and culture or in the Hindu political system on the eve of the Turkish conquest.' কিন্তু রাজপুতরা তুর্কীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হননি।

গজনীর সুলতান মামুদ রাজত্বের প্রথম থেকে লুণ্ঠন ও ধর্মপ্রচারের নামে প্রায় প্রতিবৎসর অক্টোবরের শুরুতে হিন্দুস্থান অভিমুখে অভিযান করার জন্য সসৈন্যে রওনা হতেন এবং গ্রীষ্মকালে যুদ্ধাভিযান শেষে শতসহস্র বন্দী ও অজস্র লুণ্ঠিত ধনরত্ন-সহ উত্তরভারতের উর্বরাভূমি থেকে গজনীতে প্রত্যাবর্তন করতেন। স্যার হেনরী ইলিয়টের মতে তিনি এইভাবে হিন্দুস্থানে প্রায় ১৭টি অভিযান করেছিলেন। এইসব অভিযানের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জেহাদের নামে মামুদ হিন্দুস্থানের নগর ও জনপদের বহু নিরীহ নরনারীকে হত্যা করেছেন, মন্দির লুণ্ঠন করেছেন এবং কারিগর ও দক্ষ শ্রমিক-সহ বহু ব্যক্তিকে বন্দী করে নিয়ে গেছেন। কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার (৩য় খণ্ড) লেখক স্যার উলসী হেগ মামুদের হিন্দুস্থান আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে, 'How far his Indian raids and massacres were inspired by a desire of propagating his faith for which purpose they were ill adopted, and how far by avarice must remain uncertain, for Mahmud's character was complex. Though zealours for Islam he maintained a large body of Hindu troops, and there is no reason to believe that conversion was a condition of their service.' তাঁর প্রতিটি আক্রমণ ও তার ফলাফল একই ধরনের ছকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে মামুদের গুরুত্বপূর্ণ অভিযানগুলিকে সংক্ষেপে আলোচনা করলে তাদের বিষয়ে জানা যায়।

সুলতান মামুদের অভিযান ১০০০-১০২৬ সাল পর্যন্ত প্রসারিত। তাঁর প্রাথমিক অভিযান ১০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল। এর ফলে তিনি হিন্দুশাহীদের সীমান্তবর্তী কয়েকটি দুর্গ দখল করেছিলেন এবং মুলতানের ইসমাইলীদের কাছ থেকেও কয়েকটি সুরক্ষিত স্থান কেড়ে নিয়েছিলেন। এইভাবে গাঙ্গেয় উপত্যকায় মামুদ তাঁর আক্রমণের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। পরবর্তী বৎসর তিনি শাহী নৃপতি জয়পালের বিরুদ্ধে পেশোয়ারের নিকট যুদ্ধে লিপ্ত হন। মামুদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত হয়ে বন্দী হয়েছিলেন। মুক্তিলাভের পর জয়পাল পরাজয়ের গ্লানি ও অনুশোচনায় অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ও মনোনীত উত্তরাধিকারী ছিলেন পরবর্তী শাহী নৃপতি আনন্দপাল। ইতিমধ্যে মামুদ ভাতিণ্ডা দখল করেছিলেন। মামুদের গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে বিজয় অভিযান প্রেরণের পথে অন্যতম বিঘ্ন ছিল মুলতানের ইসমাইলী শাসক আব্দুল ফতে বিন দায়ুদ। দায়ুদ, শাহী রাজাদের ও গজনীর সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখার প্রচেষ্টা করেন। ১০০৬ সালে মামুদ মুলতানের ইসমাইলীদের উৎখাত করেছিলেন এবং জয়পালের ইসলামে ধর্মান্তরিত পৌত্র সুখপালকে মুলতানের সিংহাসন দান করেছিলেন। সুখপাল কিন্তু বেশীদিন মামুদের আনুগত্য স্বীকার করেননি এবং খোরাসানে মামুদ যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত সেই সময় বিদ্রোহ করেছিলেন। অতএব ১০০৮ সালে মামুদ সুখপালকে দমন করার জন্য অভিযান করেন। এর ফলে সুখপাল যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী হন এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ইতিমধ্যে আনন্দপাল, উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, কনৌজ, দিল্লী ও আজমীরের রাজাদের সহযোগিতায় এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। উত্তরপশ্চিম ভারতের খোকর উপজাতি এই সময় মামুদের বিরুদ্ধে আনন্দপালের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। প্রায় ৪০ দিন উন্দ ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তী প্রান্তরে উভয়পক্ষের সৈন্যবাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর খোকরা মামুদের সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করে যুদ্ধের সূত্রপাত করে। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে মুণ্ডিত মস্তক খোকরদের ঝটিকা আক্রমণে ৩ থেকে ৪ হাজার

www.pathagar.com

১১৯৭-৮ সালে আইবাক একজন রাষ্ট্রকূট রাজপুত রাজাকে পরাজিত করে বাদায়ুন দখল করেছিলেন। ১২০২-৩ কুতুবউদ্দীন বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল নৃপতি পরমার্দিকে আক্রমণ করে পরাস্ত করেছিলেন। ফলে কালঞ্জর দুর্গ সহ মহোবা এবং খাজুরাহো তাঁর করতলগত হয়।

বিহার ও বঙ্গদেশে যথাক্রমে পাল ও সেন বংশের রাজাদের প্রাধান্য ছিল। ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বখতিয়ার খলজী নামে একজন মধ্যএশিয়ার গরমাশিরের ভাগ্যান্বেষী সৈনিক স্বীয় বুদ্ধি ও বাহুবলে এইসব এলাকায় অভিযানের জন্য কুতুবউদ্দীন আইবাকের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হয়ে প্রথমে বাদায়ুন ও পরে অযোধ্যার তৎকালীন শাসনকর্তাদের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেছিলেন। স্বকীয় যোগ্যতায় তিনি চুনারের নিকটবর্তী স্থানে 'ইকতা' লাভ করেন। তাঁর কর্মনাশা নদীর পূর্বদিকে সাফল্যজনক অভিযানে অনুপ্রানিত হয়ে অন্যান্য বহু তুর্কী সৈন্য বখতিয়ারের সঙ্গে যোগদান করেছিল। এদের সাহায্যে তিনি বিহারের বিভিন্ন স্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন এবং ওদন্তপুরী, বিহার ও অন্যান্য বৌদ্ধ বিহার ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিলেন। এই আক্রমণের সময় তিনি পাল ও সেন নৃপতিদের কাছ থেকে বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হন নাই। কেবলমাত্র কয়েকজন মুণ্ডিতশির শ্রমণ তাঁদের বাধাদান করেছিলেন বলে সমকালীন পারসিক ভাষায় লিখিত ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময় বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলি তুর্কীরা ধ্বংস করে বৌদ্ধধর্মের উপর চরম আঘাত হেনেছিল। কিন্তু ১২৭৬ সংবতের বিদ্যাধরের লিপি (অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় ১২১৯ সালের লিপি) থেকে জানা যায় যে, উত্তরভারতে এতদসত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অবলুপ্ত হয়নি। অতঃপর আইবাকের অনুমোদন নিয়ে ইখতিয়ারউদ্দীন আরো পূর্বদিকে তুর্কী বিজয় সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

বিহার বিজয়ের একবছর পর বখতিয়ার খলজী বঙ্গবিজয়ে মনস্থ করেন। বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়ের কাহিনী সম্পর্কে সমকালীন ঐতিহাসিক মিনহাজের লিখিত তবকত-ই-নাসিরীতে বলা হয়েছে যে, মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সহ ইখতিয়ারউদ্দীন লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করে অতি সহজে এই স্থান দখল করেছিলেন। মিনহাজ বলেছেন যে, নিদাঘ মধ্যাহ্নে এই অশ্বারোহীরা দ্রুত নদীয়ার রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলে লোকে তাদের সাধারণ অশ্বব্যবসায়ী বলে ধরে নেয়। কিন্তু রাজপ্রাসাদের কাছে এসে তারা অকস্মাৎ দ্বারীদের আক্রমণ করে এবং তার ফলে একটি গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। এই সময় বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন মধ্যাহ্নভোজনে বসেছিলেন। তিনি এই গণ্ডগোলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পশ্চাতের দ্বার দিয়ে পলায়ন করে বিক্রমপুরের সোনারপুরে চলে যান। এইখানে বহুকাল তিনি ও তাঁর বংশধররা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন।

১৮জন অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়ের কাহিনী যথেষ্ট মুখরোচক হলেও কতটা সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে লেখা এবং কতটা অতিরঞ্জিত, এসম্পর্কে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ মিনহাজের এই কাহিনীর ভিত্তি ছিল ফারগানার একজন সৈনিক যিনি বখতিয়ারের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বঙ্গ-বিজয়ে সঙ্গী হয়েছিলেন বলে দাবি করেন। এই কাহিনী সম্পর্কে তবকত-ই-নাসিরী পাঠে যা জানা যায় তার থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, বখতিয়ার যখন রাজপ্রাসাদে হামলা শুরু করেন সেইসময় শহরের অভ্যন্তর থেকে প্রচণ্ড গণ্ডগোলের শব্দ শোনা গিয়েছিল। স্যার যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন যে, এর অর্থ হল প্রধান তুর্কীবাহিনী একইসঙ্গে শহর নদীয়াতে আক্রমণ শুরু করেছিলেন। আধুনিক কোন কোন লেখক স্যার

www.pathagar.com

একজন খলজী অশ্বারোহীর তৎপরতায় তিনি কোনক্রমে রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন।

পরবর্তী বৎসর এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে মুইজউদ্দীন এক দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী সহ পুনরায় হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তুর্কী আক্রমণকারীরা পুনরায় তরাই-এর রণক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের রাজপুত বাহিনীর সম্মুখীন হয়। এইবার মুইজউদ্দীন এক নতুন রণকৌশল গ্রহণ করে তাঁর সৈন্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। রণসজ্জায় সুসজ্জিত রাজপুতবাহিনী তাদের তাড়া করলে তুর্কীরা দ্রুত পলায়নের ভান করবে বলে নির্দেশ ছিল। বারংবার আক্রমণে বিব্রত সমগ্র রাজপুতবাহিনী যখন শ্রান্ত ও ক্লান্ত তখন ১২০০০ তুর্কী সৈন্য তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এইভাবে মহম্মদ ঘুরী শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করেন। পৃথ্বীরাজ স্বয়ং তুর্কী সৈন্যের হাতে বন্দী হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিল। ১১৯২ সালে তরাইয়ের দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয়ের ফলে দিল্লী ও আজমীর বিজয়ী তুর্কীবাহিনীর পদানত হয়েছিল।

পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও মৃত্যু রাজপুত শক্তির অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছিল। তুর্কীবাহিনী দিল্লী ও আজমীর লুণ্ঠন করে। পৃথ্বীরাজের পুত্রকে নিয়মিত করদানের বিনিময়ে আজমীরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল। মহম্মদ ঘুরীর এই বিজয়লাভের ফলে হিন্দুস্তানে তুর্কী শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে তুর্কীদের কর্তৃত্ব কেবলমাত্র পাঞ্জাব ও সিন্ধুতেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বীয় ক্রীতদাস কুতুবউদ্দীন আইবাকের উপর হিন্দুস্তানের দায়িত্ব অর্পন করে সুলতান মুইজউদ্দীন গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কুতুবউদ্দীন আইবাক মিরাট, কোল (আলিগড়) ও দিল্লীতে তুর্কী শাসন কায়েম করেছিলেন। দিল্লীতেও মহম্মদ ঘুরী একজন তোমর বংশীয় রাজপুতকে করদ রাজা হিসেবে স্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু বারংবার বিদ্রোহ করায় কুতুবউদ্দীন তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে দিল্লীকে পুরোপুরি তুর্কী শাসনের অধীনস্থ করেছিলেন। আজমীর এবং হানসী, মিরাট প্রভৃতি অঞ্চল বিজিত হয়েছিল। প্রথম থেকেই রায় বা স্থানীয় শাসক যাঁরা নিয়মিত করদানে (মালগুজরী) স্বীকৃত হয়েছিলেন তাঁদের অধিকার মেনে নেওয়ার নীতি তুর্কী বিজয়ীরা অনুসরণ করেছিলেন। কনৌজের রাঠোর অধিপতি জয়চাঁদ প্রথম ও দ্বিতীয় তরাইয়ের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানকে সাহায্য দান করেননি। ১১৯৪ সালে মুইজউদ্দীন মহম্মদ ঘুরী কনৌজ ও বেনারসের রাঠোরদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করেছিলেন। চন্দাওয়ারের যুদ্ধে কনৌজের গাহড়বাল বংশীয় অধিপতি জয়চাঁদ পরাজিত ও নিহত হয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলে বারাণসী পর্যন্ত সকল স্থান তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হয়েছিল। এইসময় কোলে (আলিগড়) একটি অভ্যুত্থান কুতুবউদ্দীন আইবাককে দমন করতে হয়েছিল। আজমীরে একজন তুর্কী শাসনকর্তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং পৃথ্বীরাজের পুত্রের হস্তে রন্থাম্ভর দুর্গের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল।

১১৯৫-৯৬ সালে মহম্মদ ঘুরী ভাটি রাজপুতদের পরাজিত করে বিয়ানা দখল করেছিলেন। এইস্থানে মালিক বাহাউদ্দীন তুঘরিলকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তাঁর উৎসাহে হিন্দু ও খোরসানী বণিকরা এই স্থানকে ব্যবসাবাণিজ্যে সমৃদ্ধ করেছিলেন এবং কৃষিক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এই অঞ্চল থেকে চলে যাওয়ার আগে মুইজউদ্দীন গোয়ালিয়রের রাজাকে করদ নৃপতিতে পরিণত করেছিলেন।

ইতিমধ্যে কুতুবউদ্দীন আজমীরের রাজপুত বিদ্রোহীদের সহায়তা করার জন্য গুজরাটের চালুক্য নৃপতি দ্বিতীয় ভীমদেবের রাজধানী অনহিলওয়াড়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। আবুপাহাড়ের নিকট গুজরাটের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয় ও গুজরাট লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু ১২৪০ সালের পূর্বে অনহিলওয়াড়া তুর্কীদের পদানত হয়নি।

www.pathagar.com

রাজধানী অনহিলওয়াড়া বা পত্তন আক্রমণ করার জন্য তিনি সিন্ধুর মরুভূমি অঞ্চল পার হয়ে অভিযান করেন। এই সময় গুজরাটের অধিপতি দ্বিতীয় মূলরাজ তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন এবং আক্রমণকারী তুর্কী বাহিনীকে বহু দুর্ভোগ ও ক্ষতি স্বীকার করে মরু অঞ্চল দিয়ে পলায়ন করতে হয়েছিল।

এই পরাজয় থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে মুইজউদ্দীন মহম্মদ ঘুরী তাঁর পূর্বসূরী হিন্দুস্তান আক্রমণকারী মামুদের সিন্ধু ও মূলতানের মধ্য দিয়ে অভিযানের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছিলেন। এর ফলে পরবর্তীকালে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং পাঞ্জাবে অভিযান করেছিলেন। ১১৭৯ সালে তিনি পেশোয়ার দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতঃপর ১১৮১ সালে মহম্মদ ঘুরী লাহোর আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তিনি সেখানকার শাসনকর্তা মামুদের বংশধর খসরু মালিকের সঙ্গে সন্ধি করে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ১১৮২ সালে মুইজ-উদ্দীন দেবল নিজের দখলে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময় দক্ষিণ-সিন্ধুর সুমার বংশীয়রা মুইজউদ্দীন ঘুরীর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। লাহোরে গজনীর মামুদের শেষ বংশধর খসরু মালিক এইসময় খোখরদের সহযোগিতায় শিয়ালকোট দুর্গ অবরোধ করেন। খসরু মালিক কাশ্মীরের অধিপতি চক্রদেওর শত্রুদের সাহায্য দান করেছিলেন। অতএব চক্রদেও তাঁকে শিয়ালকোট দখলে বাধা দিয়েছিলেন। খসরু মালিক এই দুর্গ দখলে ব্যর্থ হবার পর ১১৮৬ সালে মহম্মদ ঘুরী পুনরায় পাঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং সুকৌশলে খসরু মালিককে বন্দী করেন। ১১৯২ সালে বন্দীদশায় সবুক্তগীনের শেষ বংশধর মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন।

এইভাবে লাহোর, মুলতান ও সিন্ধু তুরী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও হিন্দুস্থানের পরাক্রান্ত রাজপুত রাজাদের সঙ্গে তাঁর তখনও শক্তি পরীক্ষা হয়নি। এই সব রাজপুত রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু সৈন্যর বিরুদ্ধে লড়াইতে নিজেদের জীবনপণ করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সামরিক সংগঠন ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও আত্মকলহে দুর্বল। কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়রা রণক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করত এবং তাঁদের যুদ্ধপদ্ধতী ছিল প্রাচীন। তুর্কীরা দ্রুতগামী অশ্বের উপর নির্ভর করে আক্রমণ করত এবং রাজপুতরা প্রধানতঃ রণহস্তীর উপর নির্ভর করত।

এইযুগে উত্তরভারতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ রাজপুত গোষ্ঠী প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। এই গোষ্ঠীরা হল—(১) গহরওয়ার যারা পরবর্তী কালে কনৌজের রাঠোর রাজপুত নামে খ্যাত হয়েছিলেন (২) দিল্লী ও আজমীরের চৌহানরা। এ ছাড়া গুজরাটের বাঘেলা বংশীয় নৃপতিরা ও বুন্দেলখন্ডের চন্দেল্লদের নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্বভারতে বিহার ও বঙ্গদেশে এইসময় পাল ও সেন রাজারা রাজত্ব করতেন। কিন্তু প্রথমোক্ত দুইটি রাজপুত বংশের বিরোধ তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধ ও সুসংহত ভাবে বাধাদানের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মুইজউদ্দীন ঘুরী সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিরহিন্দ দখল করেছিলেন। স্বীয় রাজ্যের অন্তর্গত এই অঞ্চলের সুরক্ষার জন্য দিল্লী ও আজমীরের চৌহান শাসক পৃথ্বীরাজ চৌহান সসৈন্যে ঘুরীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। দিল্লী থেকে ৮০ মাইল দূরে তরাই-এর রণক্ষেত্রে রাজপুত সৈন্য তুর্কী আক্রমণকারীদের বাধাদানের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে কনৌজের রাঠোর নৃপতি জয়চাঁদ ছাড়া অন্যান্য বহু রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। জয়চাঁদের অমতে তাঁর কন্যা সংযুক্তা পৃথ্বীরাজকে মাল্যদান করেন এবং এই কাহিনী কবি চাঁদ বরদাইর পৃথ্বীরাজ রাসোর কাব্যগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়েছিল। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে রাঠোর নৃপতি পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধে সাহায্যদান করেননি। তরাই-এর প্রথম যুদ্ধে রাজপুত বাহিনীর হাতে তুর্কী আক্রমণকারীরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিল। মুইজউদ্দীন মহম্মদ ঘুরী যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

বংশের সুলতান মুইজ্‌উদ্দীন মহম্মদ বিন সাম অনেক বেশী দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। মামুদ যে সব অভিযান করেছিলেন সেইসব অভিযানগুলিতে ঘূর্ণিবাত্যার ন্যায় সামরিক ধ্বংসলীলা ছাড়া অন্য কোন পরিণাম দেখা যায়নি। সামরিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে বলা যায় মামুদের মত সাফল্য মহম্মদ ঘুরী অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু যেসব স্থান হিন্দুস্তানে তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল সেখানে তিনি স্থায়ী তুর্কী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সুলতান মামুদ সম্পর্কে এইজন্য V.A. Smith মন্তব্য করেছেন যে, "So far as as India was concerned Mahmud was simply a bandit operating on a large scale who was too strong for the Hindu Rajas, and was in consequence able to inflict much irreparable damage." অতএব বলা যায় মামুদ হিন্দুস্থানে লুন্ঠন ও দস্যুবৃত্তিতেই নিজেকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন। তাঁর আক্রমণের ফলে রাজপুত শক্তি প্রচন্ড আঘাত পেয়েছিল এবং তিনি হিন্দুস্তানে তুর্কী সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। পরবর্তী কালে সুলতান মহম্মদ ঘুরী তুর্কী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করার গৌরব অর্জন করেন।

সুলতান মামুদের দুর্বল বংশধররা তাঁর সাম্রাজ্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। উত্তর ক্যাস্পিয়ানের তৃণাঞ্চল ও আরাল সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানের সেলজুক তুর্কীরা মামুদের পুত্র প্রথম মাসুদের (১০৩১-৪১ খ্রীঃ) কাছ থেকে খোরাসান ও খোয়ারজিম দখল করে নিয়েছিল। পরবর্তী কালে বহরাম শাহর রাজত্ব কালে (১১১৪-১১৫২ খ্রীঃ) হিরাট ও কাবুলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ক্ষুদ্র ঘোরের শাসনকর্তারা প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিলেন। এই অঞ্চল সুলতান মামুদ কর্তৃক বিজিত হয়। কিন্তু ঘোরের শাসক তাঁর মৃত্যুর পর সেলজুক তুর্কীদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। ঘুরী বংশীয় আলাউদ্দীন হুসেন গজনীর অধিপতি বহরম শাহকে যুদ্ধে পরাজিত করে গজনী থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। এইসময় আলাউদ্দীন হুসেন গজনী ও আশেপাশে অঞ্চলে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করায় সমকালীন লেখকরা তাঁকে জাহান-সুজ (বা বিশ্বদাহনকারী) নামে উল্লেখ করেন। ১১৫২ সালে বহরাম শাহর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র খারুস শাহ সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। কিন্তু এইসময় মামুদের বংশধরদের প্রাধান্য কেবল লাহোর ও তৎসন্নিকটবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়েছিল। এই বংশের শেষ সুলতান ছিলেন খসরু মালিক (৯১১৬০-১১৮৬)। তাঁর রাজত্বকালে ঘুরী সুলতানদের আক্রমণে লাহোর মামুদের বংশধরদের হস্তচ্যুত হয়।

সুলতান মহম্মদ ঘুরীর হিন্দুস্তানে বিজয়াভিযান

আলাউদ্দীন জাহানসুজের বিজয় ঘুরী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করেছিল। কিন্তু তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসউদ্দীন গজনীকে স্থায়ীভাবে দখল করেন (১১৭৩ খ্রীঃ)। এই সময় গিয়াসউদ্দীন গজনী ও কাবুল সহ অন্যান্য আশেপাশের অঞ্চল তাঁর ভ্রাতা মুইজউদ্দীন বিন সাম উপর অর্পন করেছিলেন। তিনি ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি সুলতান মামুদের পথ অনুসরণ করে বারংবার হিন্দুস্তান আক্রমণ করেছিলেন। মহম্মদ ঘুরীর সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক ছিল তুর্কী ও তাজিক (পারসিক ভাষাভাষী) ক্রীতদাস। মুইজউদ্দীন তাঁর প্রাথমিক অভিযান গোমাল গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে শুরু করেন। পূর্বদিকে ইসমাইলীরা তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধনে তৎপর হয়েছিল এবং মূলতানে তাদের ঘাঁটি ১১৭৫ সালে এইজন্য সর্বপ্রথম তুর্কী সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়। সুতরাং মহম্মদ ঘুরী তাঁর অভিযানের শুরুতেই ইসমাইলীদের অধিকৃত মূলতানের উপর আক্রমণ করে (৯১১৭৫-৭৬) এইস্থান দখল করেন। অতঃপর তিনি উচ্ নামক স্থানটি পদানত করেছিলেন। তাঁর উচ্ অভিযানের সাফল্যের মূলে ছিল স্থানীয় বিশ্বঘাতকদের মদত। ১১৭৮ সালে গুজরাটের

www.pathagar.com

সোমনাথ মন্দির দখল করেন। প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দু সৈন্য মন্দির রক্ষার শেষ প্রচেস্টায় আত্মদান করেছিলেন। মামুদ সোমনাথ ধ্বংস করেন ও মন্দিরের বিগ্রহ চূর্ণ করেন। মামুদের লুণ্ঠিত ধনরত্নের পরিমাণ ছিল প্রায় ২০,০০০,০০০ স্বর্ন দিনার। সুলতান মামুদ গজনী প্রত্যাবর্তনের জন্য পশ্চিম দিক দিয়ে কচ ও সিন্ধু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে মূলতানের ইসমাইলীদের পাশ কাটিয়ে স্বীয় রাজধানী পৌছতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পথে জলকষ্টে ও জাঠদের আক্রমণে মামুদের বহু সৈন্য-ক্ষয় হয়েছিল। মামুদ পরবর্তী বৎসরে জাঠেদের শাস্তি দান করার জন্য হিন্দুস্থানে শেষ অভিযানে এসেছিলেন। এই অভিযানে সাফল্য অর্জন করার জন্য তাঁকে জাঠদের বিরুদ্ধে একটি নৌবাহিনী গঠন করতে হয়েছিল। জাঠরা প্রায় চারহাজার নৌকা নিয়ে তাঁর নৌবাহিনী আক্রমণ করেছিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে মামুদ বহু জাঠ নরনারীকে বন্দী করেছিলেন।

মামুদের বিজয় পতাকা ইরাক পর্যন্ত ও ক্যাস্পিয়ান সমুদ্র থেকে গঙ্গা, আরালসাগর ও ট্রান্সঅক্সিয়ানা থেকে সিন্ধু ও রাজস্থানের মরুঅঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু মামুদের হিন্দুস্তানের উপর বারংবার আক্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই দেশের মন্দির, শহর, গ্রাম ও জনপদ লুণ্ঠন। প্রতিবারই তিনি হিন্দুস্তান আক্রমণ করে অজস্র ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন ও অগণিত মানুষকে অকারণ হত্যা করেন এবং বহু নর-নারীকে বন্দী করে দাসে পরিণত করেছেন। হিন্দুস্তান ও হিন্দুস্তানের বাইরে মামুদ যে সব সামরিক অভিযান করেছেন তাতে তাঁর রণনীতিতে সামরিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় এবং সেই সব রণনীতির কৌশলগত দিক সফল করার জন্য দুঃসাহসিক অভিযান প্রিয়তার নমুনা দেখা যায়। সুলতান মামুদ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং যুদ্ধ ও রণনীতিতে তাঁর কলাকৌশল শত্রুর মনে ভীতির সঞ্চার করত। মামুদ শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি তাঁর লুণ্ঠিত ধনদৌলতে বিশাল বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কিন্তু এইসব প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার এবং মামুদের সামরিক অভিযানের ব্যয়ভার তাঁর সাধারণ প্রজারা বহনে অক্ষম ছিল এবং এইজন্য অনেক সময় কৃষকরা করভারে উৎপীড়িত হয়ে কৃষিকার্য ত্যাগ করত। খোরাসানে ও মামুদের রাজত্বের অন্যান্য স্থানে সেচ ব্যবস্থা অবহেলিত হয়েছিল। মামুদের দরবারে আবু রিহান আল বিরুনীর ন্যায় অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ, দর্শন, সংস্কৃতি প্রভৃতি বহুবিষয়ের পণ্ডিত ব্যাক্তি, শাহনামার লেখক ফিরদৌসীর মত প্রসিদ্ধ কবি এবং অন্যান্য বহু শিল্পী ও লেখক অলংকৃত করেছিলেন। মামুদ গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি গ্রন্থাগার ও যাদুঘর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর লুণ্ঠিত ধনরত্ন ও দৌলত তিনি গজনীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতে ব্যয় করেন।

সমকালীন মুসলমান ঐতিহাসিকরা তাঁকে ধর্মযোদ্ধা বা গাজী হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু হিন্দুদের দৃষ্টিতে তিনি মন্দির ও ধর্মস্থানের ধ্বংসকারী হিসাবে পরিচিত। সুলতান মামুদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁর একান্ত সচিব আল উতবীরর গ্রন্থ কিতাব-ই-ইয়েমিনি পাঠে জানা যায় ধর্মের ধ্বজাধারী মামুদের রাজত্বকালে নিশাপুর শহরে একবার দুর্ভিক্ষে এমন অন্নাভাব উপস্থিত হয়েছিল যে, মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মৃতের হাড়মজ্জা সেদ্ধ করে আহার করতে দ্বিধা করেনি। অথচ এইসময় একজন রুটিওয়ালা ক্রেতার অভাবে তার রুটি উদ্বৃত্ত আছে বলে ক্ষোভ করেছিল। অর্থাৎ স্বীয় প্রজাদের রক্ষার জন্য মজুতদারদের বিরুদ্ধে সুলতান মামুদের সরকার তৎপর ছিল না। সুন্নী মুসলমান হলেও মামুদ তাঁর সৈন্যবাহিনীতে সালার-ই-হিন্দিয়ান বা হিন্দু সৈন্যবাহিনী বজায় রেখেছিলেন।

সুলতান মামুদের আক্রমণের ফলে পাঞ্জাবের একটি বিস্তৃত অঞ্চল গজনীর সাম্রাজ্যর অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বারংবার অভিযানের ফলে কোন স্থায়ী তুর্কী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়নি। হিন্দুস্থানে মামুদের অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল লুণ্ঠন। পরবর্তী যুগে ঘোরী

www.pathagar.com

মামুদের সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময় অকস্মাৎ আনন্দপালের রণহস্তী তাঁকে নিয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করেছিল। আনন্দপালের বাহিনীর মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল ফলে তারা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন করে। মামুদ খোকর আক্রমণের মুহূর্তে বিভ্রান্ত হয়ে পলায়নের কথা চিন্তা করেছিলেন অথচ সৌভাগ্যবশতঃ এই যুদ্ধে তিনি সহজে জয়লাভে সমর্থ হন। আনন্দপাল ও তাঁর সহযোগী রাজারা কাংড়ার নগরকোটের মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। মামুদ কাংড়ার দুর্গটি দখল করেন এবং নগরকোটের মন্দিরের ধনরত্ন তাঁর হস্তগত হয়। এইসব সম্পদের মধ্যে ৪০ গজ লম্বা ও বিশগজ চওড়া একটি তাঁবু ছিল যার জন্য দুইটি স্বর্ণ নির্মিত ও দুইটি রৌপ্য নির্মিত দণ্ড ছিল। মামুদ এই সময় যে পরিমাণ হীরামুক্তা ও জহরত হিন্দুস্থান থেকে লুণ্ঠন করেছিলেন তা গজনীর রাজদরবারে বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতদের বিস্ময় বিমোহিত করেছিল। আনন্দপাল অতঃপর নন্দনাতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। আনন্দপালের পুত্র ত্রিলোচনপাল তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহন করেন। মামুদের আক্রমণে শাহী রাজাদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়েছিল।

বারংবার পাঞ্জাব ও পূর্ব রাজস্থানের বিরুদ্ধে অভিযান করে মামুদ রাজপুত শক্তি চূর্ণ করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই সময় তিনি শাহী রাজাদের অনুসরণ করে কাশ্মীর পর্যন্ত অভিযান করেন কিন্তু এই অঞ্চলের পার্বত্য পথের নানা বাধাবিঘ্নের জন্য বেশীদূর অগ্রসর হননি।

১০২৮ সালে মামুদ তাঁর দ্বাদশ অভিযানে কনৌজের প্রতিহার নৃপতি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। পথে বারান বা বুলন্দ শহরের অধিপতি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন ও ১০,০০০ অনুচর-সহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর মামুদ মথুরা লুণ্ঠন করেছিলেন। মথুরার মন্দিরের স্থাপত্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু সেজন্য তিনি এই মন্দিরগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি। অতঃপর কনৌজ তাঁর পদানত হয়। কনৌজের প্রতিহার নৃপতি রাজ্যপাল গঙ্গা পার হয়ে পলায়ন করেছিলেন। কনৌজ মামুদের সৈন্যবাহিনীর দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। এই লুণ্ঠনের ফলে মামুদ প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেছিলেন। এছাড়া ৫৫,০০০ হাজার দাস ও ৩৫০টি হাতি তাঁর করতলগত হয়েছিল। রাজ্যপাল সুলতান মামুদের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের ভয়ে পলায়ন করার জন্য সমকালীন রাজপুত রাজাদের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। চন্দেল্লবংশীয় কালঞ্জরের রাজকুমার বিদ্যধর এই বিক্ষুব্ধ রাজাদের সহায়তায় রাজ্যপালকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রাজ্যপাল পরাজিত ও নিহত হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান মামুদ চন্দেল্ল রাজাকে শাস্তি দান করার জন্য ১০১৯ সালে গজনী থেকে সসৈন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। মামুদের বিশাল সৈন্যবাহিনী চন্দেল্ল রাজ্যে প্রবেশ করে শত্রুর সৈন্যের মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধের জন্য চন্দেল্ল নৃপতি যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ত্যাগ করে চন্দেল্লদের বিশাল বাহিনী ও তাদের অধিপতি আত্মরক্ষার জন্য রণক্ষেত্র ত্যাগ করেছিল।

১০২৫ সালের অক্টোবর মাসে সুলতান মামুদ ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গুজরাটের বিখ্যাত হিন্দুমন্দির সোমনাথ লুণ্ঠনের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এই অভিযানে বহু স্বেচ্ছা-সৈনিক মামুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। রাজস্থানের জয়সলমীর ও অনহিলওয়াড়ার মরু অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে সৈন্যবাহিনী যাতায়াত ও খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা মামুদকে করতে হয়েছিল। অনহিলওয়াড়ায় চালুক্য নৃপতি ভীমদের মামুদের সোমনাথ অভিযান পথে বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। মন্দিরের রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি মামুদের ভয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু সোমানথ রক্ষার জন্য নিযুক্ত হিন্দু সৈন্যরা আক্রমণকারীদের প্রবলভাবে বাধাদান করেছিলেন। এই মন্দির রক্ষার জন্য দলে দলে স্বেচ্ছাসৈনিক যুদ্ধে যোগদান করেন এবং মরণপণ করে আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। প্রবল বাধা সত্ত্বেও মামুদ

www.pathagar.com

যদুনাথের যুক্তি খণ্ডনের কোন প্রয়াস না করে কেবলমাত্র তাঁদের অনুমানের ভিত্তিতে মিনহাজের শ্রুতিকাহিনীকে বাস্তব ঘটনার তথ্যভিত্তিক রূপায়ণ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।*

তিব্বত অভিযান

বঙ্গদেশে সেনরাজাদের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে বখতিয়ারের উচ্চাকাংখা আকাশচুম্বী হয়েছিল। এইসময় তিনি তিব্বত অভিযানের (অনেকের মতে ভূটান বিজয়ের) জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে দশ হাজার তুর্কী অশ্বারোহী-সহ বঙ্গবিজয়ী তুর্কী সেনাপতি ব্রহ্মপুত্রনদের তীর ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়। একজন মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত কোচ উপজাতির লোক তাঁর পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করতে স্বীকৃত হয়। পথিমধ্যে বিশটি স্তম্ভযুক্ত একটি সেতু পার হয়ে বখতিয়ারের সৈন্যবাহিনী তাদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এইসময় কামরূপের রাজা তাঁকে বর্ষাকালে এই অভিযান স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেছিলেন এবং পরবর্তী বৎসরে তুর্কীরা এই অভিযান করলে কামরূপের অধিপতি তাদের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দান করেন। কিন্তু বখতিয়ার খলজী এই অনুরোধ কর্ণপাত করেননি এবং তুর্কীসৈন্যরা সদর্পে কুচকাওয়াজ করে ১৬ দিন পরে তাদের লক্ষ্যস্থলের নিকটে পৌছে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিল।

মিনহাজ বর্ণিত কাহিনীতে যতদূর জানা যায় তাতে অনুমান করা যায়, এইসময় বখতিয়ার খলজী সংবাদ পান যে, প্রায় ৫০ হাজারের অধিক সৈন্যবাহিনী আক্রমণকারীদের বাধাদানের জন্য সমবেত হয়েছিল। এই সংবাদে সন্ত্রস্ত হয়ে বখতিয়ার পরবর্তীকালে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে এই অভিযানে আসার মনস্থ করেছিলেন এবং পশ্চাদাপসারণের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই পশ্চাদাপসারণ অত্যন্ত বিপদজনক হয়েছিল। কারণ, কামরূপের রাজার আদেশে তাঁর প্রজারা তুর্কী সৈন্যদের খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য করে তুলেছিল। যে পথ ধরে আক্রমণকারী তুর্কীবাহিনী সেতু পার হয়েছিল সেই সেতু কামরূপের প্রজারা ভেঙ্গে দিয়েছিল। অন্য কোন ফেরার পথ তুর্কীবাহিণীর জানা ছিল না। এইজন্য তারা ভাঙ্গা সেতুর ধারে একটা মন্দিরে আশ্রয় লাভের প্রচেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখানেও কামরূপের লোকেরা তাদের চারিদিক থেকে অবরোধ করেছিল। বখতিয়ার ও তাঁর অনুচররা এই অবরোধ চূর্ণ করে নদী পার হয়ে দ্রুত পলায়নের প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় তুর্কী সৈন্যদের সলিলসমাধি হয়। বখতিয়ার খলজী ও তাঁর শ'খানেক অনুচর কোনক্রমে রক্ষা পেয়ে গৌড় বা লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই অভিযানের ব্যর্থতা মহম্মদ বখতিয়ার খলজীর সাফল্যের উপর বিয়োগান্তক যবনিকা টেনেছিল। কারণ, এরপরই তিনি সম্পূর্ণ অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন। বখতিয়ারের একজন অনুচর আলি মরদান খলজী এই সুযোগে ক্ষমতা দখলের জন্য ১২০৬ সালে রোগশয্যায় স্বীয় প্রভুকে হত্যা করে বঙ্গ বিজয়ী তুর্কী সেনাপতির সকল যন্ত্রণার অবসান করেছিলেন।**

এইসময় মুইজউদ্দীন ঘুরীও তাঁর জীবনের সর্বাধিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ১২০৫ সালে ঘুরীর বাহিনী আন্দখুইতে (Andhkui) খোয়ারজিমের শাহর কাছে পরাজিত হন। ফলে

* এই ধরনের একজন লেখক রিজভী (Wonder that was India vol.II,p 22) স্যার যদুনাথ সরকার ও ডঃ ডি সি গাঙ্গুলী প্রভৃতির নাম উল্লেখ না করে তাঁদের অভিমত বাঙালী লেখকদের বক্তব্য কেবলমাত্র এই যুক্তিতে অগ্রাহ্য করার হাস্যকর প্রচেষ্টা করেছেন। এবিষয়ে আলোচনার জন্য History of Bengal, Vol.II pp.7-8 দ্রষ্টব্য।

** ঐ পৃঃ ৯-১১; তবকত-ই-নাসিরী (ইং অনুবাদ Reverty পৃঃ ৭৬৪-৬৬)

www.pathagar.com

তাঁর সাম্রাজ্যে বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে খোকররা তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য মুইজউদ্দীন ঘুরী হিন্দুস্তানে তাঁর শেষ অভিযান করেন এবং কুতুবউদ্দীন আইবকের সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে দামেক নামক স্থানে ১২০৬ সালের ২৫ মার্চ তিনি একজন অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে স্বীয় তাঁবুতে নিহত হন।

গজনীর মামুদ ও মহম্মদ ঘুরী

ভারতে তুর্কী আক্রমণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মামুদ গজনীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর বারংবার আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহর, জনপদ ও তীর্থস্থান লুণ্ঠিত হয়। এইসব অভিযানের ফলশ্রুতিতে পাঞ্জাব গজনীর সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল। গজনীর দরবারের ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ ও পরবর্তীযুগের আরবী ও ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাস মামুদের গুণাবলীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কারণ কেবলমাত্র দক্ষ সেনাপতি এবং ভারত ও মধ্যএশিয়াতে বিজিত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হিসেবেই নয়, পারসিক সাহিত্যের বোদ্ধা ও পৃষ্ঠপোষক রূপে এবং কবি ও দার্শনিকদের সমঝদার হিসেবেই তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু শাহনামার রচয়িতা ফিরদৌসি সুলতানের সাহিত্যিকদের লেখনীকে পুরস্কৃত করার ব্যাপারে কার্পণ্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করে ব্যাঙ্গাত্মক রচনার মারফতে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সুলতান মামুদকে ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা বলা যায় না। কারণ ভারতে তিনি যে সব অভিযান প্রেরণ করেন সেগুলির ফলে বহু নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় গ্রাম ও নগরের মানুষের ধনসম্পদ, জীবন ও সম্মান বিনষ্ট হয়েছে কিন্তু কোন স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি। এইজন্য ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ মন্তব্য করেছেন যে, 'So far as India was concerned Mahmud was simply of bandit opereting on a large scale, who was too strong for the Hindu Rajas, and was in consequence able to inflict much irrerarable damage.'*

মুইজউদ্দীন মহম্মদ বিন সামকে অনেকে মামুদের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বিচার করেন। কারণ, তুর্কী সাম্রাজ্য ভারতে প্রতিষ্ঠার মূলে এই দুইজনের অবদান ছিল সর্বাধিক। মহম্মদ ঘুরী তাঁর পূর্বসূরী মামুদের কাছে হিন্দুস্তান বিজয়ের পথিকৃত হিসেবে ঋণী। কিন্তু মামুদের ন্যায় তিনি রণদক্ষ সেনাপতি ছিলেন না। কারণ, মামুদ হিন্দুস্তান ও হিন্দুস্তানের বাইরে যুদ্ধে কখনও পরাজয় স্বীকার করেননি। মহম্মদ ঘুরী সম্পর্কে একথা বলা যায় না। তিনি বহুক্ষেত্রেই পরাজয়ের গ্লানি বহন করে রণভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু মহম্মদ ঘুরীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভবপর করেছিল। মামুদ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসনের জন্য কোন শাসনপদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেননি। ফলে পরবর্তীকালে তাঁর দুর্বল বংশধররা এই সাম্রাজ্য রক্ষা করতে অক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ঘুরীরা গজনী দখল করার পর তুর্কী জাতিগোষ্ঠীদের পুনরায় সংগঠিত করে নেতৃত্ব দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদের ভাষায় বলা যায়, 'But the chiefs of Ghori were men of a different stamp. They wre better fitted to lead and command the unruly Turks and knew how to employ their valour and zeal for the purposes of self-aggrandizement'**

সুলতান মামুদ বা মহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের মধ্যে একটি বিষয়ে ঐক্য ছিল। এদের

---

* Oxford History of India, 4th Ed, p- 208.

** (A short history of Muslim Rule in India, p. 74)

www.pathagar.com

দুইজনের মধ্যে কেওই ইসলামের প্রচারের জন্য মহান আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দুস্তানে অভিযান প্রেরণ করেননি। রাজ্যজয় ও লুণ্ঠন যে তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মামুদের সৈন্যবাহিনীতে এবং মহম্মদ ঘুরীর অভিযানে হিন্দু সৈন্য ও উচ্চপদস্থ সৈনিক ও সেনানীরা রণক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এই উদাহরণের অভাব নেই। মামুদকে যাঁরা ইসলামের গাজী হিসেবে বর্ণনা করেন তাঁদের মামুদের একান্ত সচিব আল-উতবী লিখিত কিতাব-ই-ইয়েমিনিতে যে দুর্ভিক্ষের কথা উল্লিখিত আছে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া কর্তব্য। এই দুর্ভিক্ষে নিশাপুরে মামুদের অজস্র মুসলমান প্রজার অনাহারে মৃত্যু সত্ত্বেও সুলতান তাদের জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি বা দুর্ভিক্ষের সময় যারা চড়াদাম পাওয়ার জন্য খাদ্য মজুত করেছিল তাদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেননি। হিন্দুস্তান থেকে লুণ্ঠিত অর্থে মামুদ গজনীর শোভাবর্দ্ধন করেন কিন্তু সাধারণ প্রজার দুঃখ নিরসন করেননি। মহম্মদ ঘুরীর রাজ্যজয়ে যতটা লক্ষ্য ছিল প্রজার সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করার জন্য ততটা সময় ছিল না। যেসব হিন্দু রাজা বিজয়ী তুর্কী বাহিনীর বশ্যতা স্বীকার করে করদ রাজা হতেন তাঁদের রাজ্য সাধারণতঃ দখল করার রীতি ছিল না। আজমীরের সিংহাসনে এইজন্য পৃথ্বীরাজ চৌহানের পুত্রকে মহম্মদ ঘুরী পুনঃস্থাপন করেছিলেন। মূলতঃ তুর্কীরা হিন্দুস্তানে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে 'মুলুক' বা রাজ্য স্থাপন করেছিল। ধর্মের জেহাদ, যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আওয়াজ হিসেবে অনেক সময় ব্যবহৃত হলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্তানের সম্পদ লুণ্ঠন। কারণ রিজভীর ভাষায় বলা যায় যে, 'Both were in need of plunder from India to maintain their slave armies and to attract the wandering bands of Islamicized mereanaries known as ghazis to their forces.' অতএব হিন্দুস্তানে ইসলাম ধর্মের প্রসার তাদের উদ্দেশ্য ছিল না; কোন কোন সমকালীন ফার্সী ও আরবী ঐতিহাসিকদের অতিরঞ্জিত কাহিনীতে তুর্কী বাহিনীর বিজয় সম্পর্কে বিবরণীতে লিখিত মামুদ গজনী ও মহম্মদ ঘুরীকে ইসলামের গাজী হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। আসলে তারা উভয়েই রাজ্য জয়, রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার ও লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই হিন্দুস্তানে অভিযান করেছিলেন। এইদিক থেকে উভয়ের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্যতঃ মহম্মদ ঘুরী তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং মামুদের তুলনায় তিনি রণদক্ষতার নিদর্শন রাখতে সক্ষম না হলেও তাঁরই দক্ষতায় হিন্দুস্তানে তুর্কী অধিকার স্থায়িত্ব লাভ করেছিল।

এই সূত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মামুদ যখন ভারত লুণ্ঠনে লিপ্ত হয়েছিলেন তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি গজনীর সুলতানের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি গজনীর সুলতানের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে হিন্দুস্তানের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ও বর্ণবৈষম্য জর্জরিত পরিবেশে বিশেষ কোন পরিবর্তন বা উন্নতি হয়নি। মামুদ গজনীর আক্রমনে পাঞ্জাবে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং হিন্দুস্তানের সৈন্যবাহিনীর রণনীতি, সমাজ ও সভ্যতা এবং রাজন্যবর্গের অনৈক্যের বিষয়ে তুর্কীরা অবহিত হয়েছিলেন। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, মুইজউদ্দীন মহম্মদ ঘুরীকে অনহিলওয়াড়ার দ্বিতীয় মূলরাজ বা পৃথ্বীরাজ চৌহানের ন্যায় শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবার ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। অপরদিকে খোয়ারজিমের শাহ্ আলাউদ্দীনের প্রবল পরাক্রান্ত বাহিনী মধ্যএশিয়া এমনকি নিশাপুর ও হিরাট থেকে ১২০১ সালের মধ্যে ঘুরীদের প্রাধান্য উৎখাত করেছিল। এই পরিস্থিতিতে মুইজউদ্দীন হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য ও গজনীতে ঘুরী সাম্রাজ্য যথাক্রমে তাজউদ্দীন ইলদিজ, কুতুবউদ্দীন আইবাক ও অন্যান্য দক্ষ ক্রীতদাস সৈন্যাধক্ষ ও অনুগত অনুচরদের প্রচেষ্টায় রক্ষা পায়। ঘুরী সাম্রাজ্য হিন্দুস্তানে পরবর্তীকালে স্থায়িত্ব লাভ করেছিল এবং এইজন্য মামুদ গজনীর ধূমকেতুর ন্যায় উত্থান অপেক্ষা মহম্মদ

www.pathagar.com

ঘুরীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অধিক প্রশংসনীয় এবং কৃতিত্বের দাবী রাখে।

তুর্কীদের হিন্দুস্তানে সাফল্য লাভের কারণ

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে আরবরা সিন্ধু ও মূলতান জয় করেছিল। কিন্তু তারা হিন্দুস্তানের অন্যান্য অংশে তাদের প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়নি। পরবর্তীকালে দশম শতকের শেষার্ধে ও একাদশ শতকের প্রথমার্ধে গজনীতে শক্তিশালী ইয়েমিনি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই বংশের অন্যতম প্রভাবশালী সুলতান মামুদ (৯৯৮-১০৩০ খ্রীঃ) মধ্যএশিয়া ও হিন্দুস্তানে তাঁর বিজয় পতাকা প্রথিত করেছিলেন। সুলতান মামুদের বারংবার আক্রমণের ফলে হিন্দুস্তানের নৃপতিদের বাধা দানের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। মামুদ লুণ্ঠন ও ধ্বংশের দ্বারা হিন্দুস্তানের শাহী নৃপতিদের ও মূলতানের মুসলমান শাসকদের বা গুজরাটের চালুক্যদের অথবা খোকর ও জাটদের বাহিনীকে পরাজিত করেন। তাঁর আক্রমণের ফলে হিন্দুস্তানের সৈন্যবাহিনীর ও রণনীতির দুর্বলতা প্রকট হয়েছিল। কিন্তু এই সময় তুর্কীরা কেবলমাত্র পাঞ্জাব ব্যতীত ভারতের অন্য কোন অংশে তাদের প্রাধান্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে যখন পুনরায় তুর্কী আক্রমণ সমগ্র উত্তর ভারতের নিরাপত্তাকে ক্ষুন্ন করেছিল তখন যেসব রাজপুত রাজারা তুর্কীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঘুরীদের অপেক্ষা বৃহত্তর এলাকার শাসক ছিলেন এবং তুর্কী আক্রমণকারীদের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে ১১৯২ সাল থেকে ১২০৬ সালের মধ্যে উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে উত্তরপূর্ব ভারতের গৌড়বঙ্গ পর্যন্ত এলাকা তুর্কী আক্রমণকারীদের পদানত হয়। তুর্কীদের এই বিস্ময়কর সাফল্যের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। ব্যাক্তিগত বীরত্ব বা সাহসের ক্ষেত্রে হিন্দু সৈনিকগণ তুর্কী আক্রমণকারীদের অপেক্ষা হীনবল ছিলেন না। গজনীর মামুদ আনন্দপালের বাহিনীর খোকরদের দুর্বার আক্রমণে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়নের কথা চিন্তা করেছিলেন। শেষমুহূর্তে আনন্দপালের বাহন রণহস্তী অকস্মাৎ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ না করলে মামুদের ভাগ্যে পরাজয় নিশ্চিত ছিল। ১১৭৮ সালে দ্বিতীয় মূলরাজ এবং ১১৯১ সালে চৌহান নৃপতি দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘুরীকে পরাজিত করেন। কিন্তু যুদ্ধ জয়লাভ করার পর শত্রুকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার কথা তাঁরা চিন্তা করেননি।

এছাড়া হিন্দুদের রণনীতির দুর্বলতা তাঁদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। মহাভারতে বর্ণিত পদ্ধতিতে বূহ্য রচনা বা আলেকজান্দারের সময়কার ভারতীয় রণনীতি অনুসরণ একাদশ ও দ্বাদশ শতকে হিন্দুদের আদর্শ ছিল। অশ্ব, গজ ও পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে ও রণহস্তীর উপর নির্ভর করে হিন্দুরা আক্রমণকারীদের বাধাদানের প্রচেষ্টা করেন। অশ্বারোহী আফগান তুর্কী ও পারস্যদেশীয় সৈনিকদের গেরিলা পদ্ধতিতে দ্রুত আক্রমণ ও পশ্চাদাপসারণ ভারতে অশ্রুতপূর্ব ছিল। এছাড়া পরাজিত শত্রুদের প্রতি করুণা প্রদর্শন এবং আত্মরক্ষামূলক রণনীতি হিন্দুদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। ডঃ রোমিলা থাপার মন্তব্য করেছেন, 'এছাড়া যুদ্ধ সম্পর্কে দু'পক্ষের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পার্থক্য ছিল। আফগানরা যুদ্ধকে জীবনমৃত্যুর ব্যাপার মনে করত। কিন্তু ভারতীয় রাজাদের কাছে যুদ্ধ ছিল এক ধরনের খেলা এবং তার কিছু নিয়ম তারা মেনে চলত।'*

এযুগের হিন্দু নৃপতিরা আত্মকলহে ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। যেসময় শাহী নৃপতি জয়পাল ও আনন্দপাল এবং তাঁদের বংশধররা উত্তরপশ্চিম ভারতে মামুদ গজনীর বিরুদ্ধে জীবনমরণ

* ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃঃ ১৭৭, (ওরিয়েন্টলংম্যান)।

www.pathagar.com

সংগ্রামে লিপ্ত সেই সময় উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব ভারতে এবং দক্ষিণ ভারতের শক্তিশালী রাজন্যবর্গ তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি। মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের সময় পৃথ্বীরাজ চৌহান বা গাহড়বাল নৃপতি জয়চাঁদ ও অন্যান্যরা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের কথা চিন্তা করেননি। ভারতীয়দের পারস্পরিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব বিদেশী আক্রমণকারীর সাফল্যের পথ প্রশস্ত করেছিল। 'তাঁদের ধারণা ছিল, মধ্যএশিয়ার শক, কুষাণ ও হুণদের মতো তুর্কীরাও পাঞ্জাবের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার প্রচেষ্টা করছে। তুর্কীরা যে ভারতবর্ষের গভীরে এসে পড়বে শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরবর্তি রাজ্যগুলি তা অনুমান করতে পারেনি।'*

ডঃ আশীর্বাদি লাল শ্রীবাস্তব ভারতীয় নৃপতিদের পরাজয়ের কারণকে সাধারণত তাদের রাজনৈতিক ঐক্যের এবং সঠিক সংগঠন ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবের জন্য হয়েছিল বলে অনুমান করেছেন। হিন্দুস্তানের নৃপতিরা তুর্কী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গঠনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ডঃ শ্রীবাস্তব এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, শত্রুর সাংগঠনিক দুর্বলতার বিষয়ে ভারতীয় রাজন্যরা কখনই সচেতন ছিলেন না।** অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব ও কে এ নিজামী সম্পাদিত Comprehensive History of India-তে (৫ম খণ্ড) বলেছেন যে, বর্ণবৈষম্য হিন্দু সমাজকে এতদূর দুর্বল করেছিল যে তার ফলে সামরিক ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল ও সর্বপ্রকার ঐক্য চিন্তা বিনষ্ট করেছিল। এইজন্য কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক একতাবোধ গড়ে ওঠেনি। নিজামী মন্তব্য করেছেন যে, 'Thus for the bulk of the Indian people there was handly anything which could evoke patriotic responses in them when face to face with the Ghurid invader'।*** ভারতীয় সমাজ রাজনৈতিক কাঠামো ও পরিস্থিতিতে বর্ণবৈষম্য, বিভেদ সৃষ্টি করেছিল এসম্পর্কে সন্দেহ নাই এবং এর ফলে হিন্দুস্থানের পতনের পথ নিঃসন্দেহে প্রশস্ত হয়েছিল। বর্ণবৈষম্যের অন্ধকার দিক সম্পর্কে দেশীয় ও বিদেশী লেখকদের সমাজের বিষয়ে বিস্তারিত সমালোচনা থেকে জানা যায়। শ্রীবাস্তবের বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, তৎকালীন যুগে লেখক আধুনিক দেশপ্রেমের অস্তিত্ব আশা করেছিলেন। নিজামী, শেখ সাদীর কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, লস্করী অর্থাৎ যুদ্ধকে যারা বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল তারা সুলতান, স্বদেশ বা ধর্মের জন্য নয়, কেবলমাত্র বেতনের বিনিময়ে যুদ্ধ করত। কিন্তু তাঁর বক্তব্য থেকেও মনে হতে পারে যে, দেশপ্রেমের অভাব হিন্দুস্থানের রাজাদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। দেশপ্রেম যা আধুনিককালে স্বাভাবিকভাবে মানুষকে অনুপ্রানিত করে, মধ্যযুগের ইতিবৃত্তে তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব তুর্কী আক্রমণের সময় হিন্দুস্তানের মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা আশা করা বৃথা।

একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, 'The utter and precipitate prostration of such a vast and ancient land, endowed with resources far superior and greater to those of her invaders, can be the result mainly of internal decay and not merely of external attacks, which were its effects rather then the cause.' হিন্দুস্তানে একাদশ ও দ্বাদশ শতকে সমাজ ও সভ্যতার মধ্যে দেখা দিয়েছিল এক আত্মকেন্দ্রিক কূপমণ্ডুকতা। এছাড়া সমাজের উচ্চস্তরের মানুষরা বর্ণবৈষম্যের ও জাতি বিচারের ভিত্তিকে নিম্নবর্ণের জনসাধারণকে উৎপীড়িত করার জন্য নানা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের সৃষ্টি করেছিলেন। হিন্দুদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও কূপমণ্ডুকতা দেখে মামুদের দরবারের প্রখ্যাত পণ্ডিত আল বেরুনী বিস্ময় প্রকাশ করেন। আল বেরুনী হিন্দুস্তানের ধর্ম, আচার-ব্যবহার ও শাস্ত্রপাঠের জন্য এদেশে

---

* ঐ গ্রন্থের, পৃঃ ১৭৮ দ্রষ্টব্য।

** ডঃ শ্রীবাস্তবের মতামতের জন্য তাঁর গ্রন্থ The Sultanate of Delhi (Agra.) পৃঃ ৮৪-৭ দ্রষ্টব্য।

*** পৃঃ ১৮৫ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

এসেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, 'হিন্দুরা মনে করেন যে, পৃথিবীতে তাদের দেশের ন্যায় দেশ নাই, তাদের রাজার ন্যায় রাজা নাই, তাদের বিজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞান নাই।* আল বেরুনীর মতে, ইতিপূর্বে হিন্দুরা এত সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন ও কূপমণ্ডুক ছিলেন না। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধ এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তারা পদে পদে শাস্ত্রীয় নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। হিন্দু নৃপতিগণ স্বীয় রাজ্যসীমা রক্ষার বাইরে অন্য কোন কথা চিন্তা করতেন না। তুর্কী আক্রমণের গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করেননি। পৃথ্বীরাজ রাসোর লেখক চাঁদ বরদাই বলেছেন প্রথম তরাইয়ের যুদ্ধে জয়লাভের পর পৃথ্বীরাজ তাঁর অন্দরমহলে বিলাসে এতদূর মগ্ন হয়েছিলেন যে, দ্বিতীয়বার ঘুরীর আক্রমণ সম্পর্কে প্রজাদের উৎকণ্ঠার কথা কবির মারফতে জানতে পেরেছিলেন। এই কাহিনী কতদূর প্রামান্য বা নির্ভরযোগ্য তা বিতর্কসাপেক্ষ। কিন্তু সাহিত্যে সমকালীন পরিস্থিতির প্রতিফলন হয় এসম্পর্কে সন্দেহ নাই এবং হিন্দু নৃপতিরা এই যুগে বিদেশী আক্রমণকারীদের প্রতিরোধের প্রতি সমধিক গুরুত্ব দেননি, সেটা পৃথ্বিরাজ রাসো থেকে অনুমান করা যায়। তাঁরা আত্মকলহে লিপ্ত ছিলেন।

উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ও পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণরা জনসাধারনকে শোষণ করার কৌশল আবিস্কার করতে তৎপর ছিলেন। দেশের নৃপতিদের সহায়তায় তাঁরা মন্দির নির্মাণ করতেন এবং ধনসঞ্চয় করতেন। ভারতের অগনিত গ্রাম ও জনপদের মানুষ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য না রেখে আপন আপন জীবনযাত্রার সমস্যায় ব্যাপৃত ছিলেন।

হিন্দুসমাজের বর্ণাশ্রমধর্ম সমগ্র দেশকে জাতি ও বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত করেছিল। অন্ত্যজ শ্রেণী ছিল অবহেলিত ও পদানত। সবার নিচে ছিল আটটি শ্রেণীর মানুষ। আল বেরুনী বলেছেন, এই আটটি শ্রেণীর মানুষদের যথা কামার, মুচি, তাঁতী প্রভৃতিকে শহরের অভ্যন্তরে বাস করতে দেওয়া হত না। যে শ্রেণীর মানুষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত তারা ছিল ক্ষত্রিয়। রাজপুত ক্ষত্রিয় রাজারা সর্বশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মারফতে বৈদেশিক আক্রমণের মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা করেননি। অস্পৃশ্য শ্রেণীর কাছে হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রম নীতি অপেক্ষা ইসলামের গণতান্ত্রিক আবেদন অনেক ক্ষেত্রে হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। কিন্তু কোন কোন লেখক মনে করেন যে, বর্ণাশ্রমধর্মে বিভক্ত হিন্দুসমাজের পতন হয়েছিল প্রধাণত সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর দুর্বলতার জন্য। অন্য কোন কারণে নয়। রিজভী তাঁর Wonder that was India (Vol.II) গ্রন্থে বলেছেন যে, 'Indian caste taboos can not be blamed for the Rajpur defeat'। রিজভীর মতে, ক্ষত্রিয়রক্তের ঐতিহ্যে দাম্ভিক তরবারী চালনায় দক্ষ ও বীরত্ব গাঁথায় অনুপ্রাণিত রাজপুতদের পরাভবের অন্যতম কারণ তাদের সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং তাদের কেবলমাত্র স্বীয় রাজ্য রক্ষায় তৎপরতা ও অন্তর্বিরোধ।**

রিজভীর বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, কেবলমাত্র ঘুণধরা সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর জন্য রাজপুত শাসকশ্রেণীর বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ, তারা স্বীয় রাজ্যের প্রতিরক্ষা ছাড়া অন্য কিছুই চিন্তা করেনি। ফলে তুর্কীদের পক্ষে তাদের একে একে পরাজিত করে হিন্দুস্তানে প্রাধান্য বিস্তার করার পথ প্রশস্ত হয়েছে। এছাড়া আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধনীতি ও বিজয়লাভের পর শত্রুকে ধ্বংস করে তার শক্তিবিনাশ করার সুযোগে হেলায় হারানোর রাজপুত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছিল। আত্মকলহ সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য। এইযুগের ভারতীয় নৃপতিদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তার

---

* Al Biruni's India Vol I. পৃঃ ২৩ ও Vol. II, পৃঃ ১০১, ১৫৪ দ্রষ্টব্য। (Translated by Edward Sachau)

** S. A. Rizvi. Wonder that was India. Vol.II. পৃঃ ২৩-২৪।

www.pathagar.com

অন্যতম প্রমাণ। এইযুগে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রভাবে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার সঙ্গে রামশরণ শর্মা ক্যারোলিঞ্জয় সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিম ইউরোপের পরিস্থিতির তুলনা করেছেন।* রায়, রানা, রাউত প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সামন্তরা সমগ্র দেশকে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় বিভক্ত করেছিল। স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের রাজ্যব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং ক্ষত্রিয়দের নির্যাতনে ও উচ্চশ্রেণীর শোষণে নিম্নশ্রেণীর জাতি, বর্ণ ও বৃত্তির লোকেরা উৎপীড়িত হয়েছিল। অতএব হিন্দুধর্মের বর্ণবৈষম্যজনিত বিভেদ বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় ভারতীয় রাজন্যদের দুর্বলতা বৃদ্ধি করেনি একথা পুরোপুরি স্বীকার করা যায় না।

এইসব আলাচনা থেকে ভারতে তুর্কী বিজয়ের উপর আলোকসম্পাত করা যায়। কিন্তু এইসূত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হিন্দুস্তানে তুর্কী আক্রমণের সময়কার কাহিনীর অধিকাংশ বিজয়ীদের বিবরণী থেকে গৃহীত। বিজিতদের পরাজয়ের ও ব্যর্থতার বিষয়ে অনেক সময় তাঁদের দরবারের ইতিবৃত্তকাররা নীরব। ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বখতিয়ার খলজীর কামরূপ ও তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতার কাহিনী পাঠে মনে হয় যে, তুর্কী আক্রমণকারীরা যেসব অঞ্চলে জনগণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন বা যেখানেই স্থানীয় নৃপতিরা প্রজাসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে আক্রমণকারীকে বাধাদান করেছেন সেখানেই তুর্কীদের বিজয়রথের যাত্রা পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

* ভারতের সামন্ততন্ত্র, পৃঃ ১৩১

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিল্লীর মামলুক সুলতানরা

মুইজউদ্দীন ঘুরীর ১২০৬ সালে দামেক নামক স্থানে আকস্মিক মৃত্যুর ফলে ঘুরী সাম্রাজ্যে সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়েছিল। কারণ মহম্মদ বিন সাম বা মুইজউদ্দীন ঘুরীর কোন পুত্র ছিল না এবং সাম্রাজ্য বিজয় ও সংগঠনে তিনি ক্রীতদাস ও সামরিক কর্মচারীদের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। মিনহাজ বলেছেন যে, মুইজউদ্দীনের তুর্কী ক্রীতদাসরা ভবিষ্যতে তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে বলে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুইজউদ্দীন ঘুরীর ভ্রাতুস্পুত্র গিয়াসউদ্দীন মামুদের উচ্চাকাংখার অভাব ছিল। তিনি বিলাস-লালসাময় মদির মধুর জীবন যাপনের আকাংখায় ঘুরীদের পৈতৃক রাজ্যে ও ফিরোজকোহয় স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে সন্তোষ লাভ করেছিলেন।

কুতুবউদ্দীন আইবাক

মুইজউদ্দীন ঘুরীর ক্রীতদাসদের মধ্যে তিনজনের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই তিনজনের মধ্যে তাজউদ্দীন ইলদিজ গজনীর শাসনকর্তা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাজউদ্দীনের জামাতা ও মুইজউদ্দীনের অন্য দুইজন সুযোগ্য ক্রীতদাস নাসিরউদ্দীন কুবাচা ও কুতুবউদ্দীন আইবাক ইলদিজের কন্যাদের বিবাহ করেছিলেন। কুবাচা উচের শাসনভার লাভ করেছিলেন। কুতুবউদ্দীন তাঁর প্রভু মুইজউদ্দীনের প্রতি একান্তভাবে অনুগত ছিলেন এবং দ্বিতীয় তরাইয়ের যুদ্ধে জয়লাভের পর ঘুরীর হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্যের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। মুইজউদ্দীনের প্রতিনিধি হিসাবে কুতুবউদ্দীন আইবাক হিন্দুস্থানে মুইজী সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ও সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসাবে যোগ্যতার সঙ্গে স্বীয় কর্তব্য পালন করেছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় হানসী, মিরাট, দিল্লী, রন্থাম্ভর ও কোল (বর্তমান আলিগড়) সহ বেনারস পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় তুর্কীদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। কুতুবউদ্দীন আইবাকের নেতৃত্বে তুর্কীবাহিনী অনহিলওয়াড়ার চালুক্য নৃপতি দ্বিতীয় ভীমদেবকে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছিল। ১২০২ সালে কালঞ্জর এবং তারপর মহোবা কুতুবউদ্দীনের প্রচেষ্টায় তুর্কীদের পদানত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ইখতিয়ার উদ্দীন মহম্মদ-ই-বখতিয়ার খলজীর তুর্কীবাহিনী বিহার ও নদীয়া এবং গৌড় বা লখনৌতিতে তাদের বিজয় পতাকা প্রথিত করেছিল। এইভাবে সমগ্র উত্তর ভারতে দিল্লী থেকে কালাঞ্জর ও গুজরাট এবং লখনৌতি থেকে লাহোরে মুইজউদ্দীনের শাসনকর্তা হিসাবে কুতুবউদ্দীন তুর্কীদের প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এই বিশাল এলাকা সম্পূর্ণভাবে তুর্কী শাসনের কব্জায় এসেছিল একথা বলা যায় না। কারণ অনবরতই বিভিন্ন অঞ্চলে তুর্কীদের প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হত। মুইজউদ্দীন ঘুরীর মৃত্যুর তিনমাস পরে ২৪শে জুন ১২০৬ সালে কুতুবউদ্দীন আইবাক লাহোরে ঘুরীর হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্যের সকল ক্ষমতা গ্রহণ করেন। গিয়াসুদ্দীন মামুদ তাঁকে রাজকীয় ছত্র প্রেরণ করেছিলেন এবং সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু সমসাময়িক লিপিতে কুতুবউদ্দীন আইবক মালিক ও সিপাহী সালার নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই কিন্তু কুতুবদ্দীন নামে খুতবা পাঠ করার ও তাঁর মুদ্রা প্রচলিত করার উল্লেখ সমকালীন

www.pathagar.com

ইতিহাসে পাওয়া যায়। ১২০৮ সালের পূর্বে তিনি মুক্তিপত্র অর্থাৎ দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন নাই।*

শাসক হিসাবে আইবাক সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং সকলের প্রতি সুবিচার করার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল ও রাস্তাঘাটে দস্যু তস্করের আশংকা থেকে পথিক নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করেছিল। বিভিন্ন যুদ্ধে বা জেহাদে বহু যুদ্ধবন্দী দাসে পরিণত হলেও সাধারণতঃ তাঁর রাজ্যে বসবাসকারী হিন্দুদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হ'ত। দানবীর হিসাবে কুতুবউদ্দীনকে সমসাময়িক ইতিবৃত্তকাররা সকলেই প্রশংসা করেছেন এবং তাঁকে লাখ্‌বকস্‌ (অর্থাৎ লাখটাকা দানকারী) বলে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু কুতুবউদ্দীনের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে (১২০৬-১২১০ খ্রীঃ) প্রধানতঃ বৈদেশিক সমস্যার সঙ্গে হিন্দুস্থানে নবগঠিত সুলতানী রাজ্যের স্বার্থ বিজড়িত হয়ে পড়েছিল। এই সময় মুইজউদ্দীনের রাজধানী গজনীতে তাজউদীন ইলদিজ ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। খোয়ারজিমের শাহ সমগ্র মধ্যএশিয়া ও ইরানের উপর প্রাধান্য স্থাপন করে গজনী স্বদখলে আনার কথা চিন্তা করছিলেন এবং ইলদিজ দিল্লী পর্যন্ত স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারের কথা চিন্তা করছিলেন। এই পরিস্থিতিতে কুতুবউদ্দীন আইবাক লাহোরে নিজের সদর কেন্দ্র স্থাপন করেন। কারণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে সতর্ক নজর রাখার প্রয়োজন ছিল। ১২০৮ সালে খোয়ারজিমের শাহ ইলদিজকে গজনী থেকে বিতাড়িত করার ফলে তাজউদ্দীন পাঞ্জাবে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন। ইলদিজকে হিন্দুস্থানে ঘাঁটি করতে দেওয়ার অর্থ খোয়ারজিমের শাহর দিল্লীর প্রতি রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রাধান্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত করা। অতএব আইবাক, ইলদিজকে কেবলমাত্র পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত করেই ক্ষান্ত হননি। গজনীর নাগরিকদের একাংশ এইসময় আইবাককে আমন্ত্রণ জানায় এবং সেই অনুসারে তিনি সসৈন্যে ঘুরীর রাজধানী আক্রমণ করে দখল করেন। কিন্তু গজনীতে আইবাকের প্রাধান্য ৪০ দিনের বেশী স্থায়ী হয়নি। ইতিমধ্যে গজনীর নাগরিকরা ইলদিজকে পুনরায় আহ্বান জানিয়েছিল। তারা বিজয়ী কুতুবউদ্দীনের অতিমাত্রায় মদ্যপানে ও অসংযত আচরনে অসন্তুষ্ট হয়ে পুরাতন শাসককেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। ফলে ইলদিজ গজনীতে আবার তাঁর প্রাধান্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন এবং কুতুবউদ্দীনকে দ্রুত হিন্দুস্থানে স্বীয় রাজ্যসীমায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল।

কুতুবউদ্দীন আইবাক স্বীয় রাজত্বের রাজনৈতিক সীমারেখাকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য এবং হিন্দুস্তানে ইলবারি তুর্কী সুলতানদের সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি রাজপুতদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। রাজপুতদের স্ব স্ব প্রধান হবার প্রচেষ্টা দমন করার জন্য তাঁর প্রয়াস বিশেষ সাফল্য লাভ করেনি। লখনৌতিতে বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর খলজী গোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল এবং বখতিয়ারের হত্যাকারী আলি মর্দানকে কুতুবউদ্দীন স্বীকৃতিদান করেন। কিন্তু খলজী গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রধানরা তাঁর বিরোধিতা করেন। আলি মর্দান স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করেছিলেন। অবশেষে হিসামউদ্দীন আয়াজ খলজী ওরফে গিয়াসউদ্দীন আয়াজ খলজী কুতুবউদ্দীনের উত্তরসূরী শামসুদ্দীন ইলতুৎমিসের আমলে লখনৌতিতে একটি স্বাধীন সুলতানী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লখনৌতির বিরুদ্ধে ইলতুৎমিস দিল্লী থেকে তিনটি অভিযান প্রেরণ করে এই অঞ্চলে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন।

* তাঁর বংশকে দাসবংশ বলা চলে না। কুতুবউদ্দীন আইবাক এবং তাঁর উত্তরসূরী অনেকেই প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। সুলতান হিসাবে তক্তাউসে আরোহনের পূর্বে তাঁদের সকলকেই দাসত্ব থেকে মুক্তিপত্র গ্রহণ করতে হয়েছে। এইজন্য দিল্লীর এই যুগের মামলুক সুলতানরা কেউই দাস হিসাবে রাজ্যভার পরিচালন করেননি।

www.pathagar.com

১২০৬ সালে লাহোরে চৌগন বা পোলো খেলবার সময় ঘোড়া থেকে আকস্মিকভাবে পতনের ফলে কুতুবউদ্দীনের মৃত্যু হয়। আইবাকের সম্পর্কে উল্লেখ করে ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন যে 'he ranks among the great pioneers of Muslim conquest in India'. ইসলামের প্রতি তাঁর অনুরাগের জন্য আইবাক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর আমলে দিল্লী ও আজিমীরে দুইটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এ বি এম হাবিবউল্লা তাঁর The Foundation of Muslim rule in India নামক গ্রন্থে কুতুবউদ্দীনের পরাজিত শত্রুর প্রতি সদয় ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে অন্ততঃ দুইটি ক্ষেত্রে যুদ্ধে পরাভূত হিন্দু রাজারা তাঁর অনুরোধে মুইজউদ্দীনের হাত থেকে রক্ষা পান। হাবিবউল্লার মতে ভারত অভিযানে মুইজউদ্দীন মহম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব ও সাফল্য লাভ প্রধানতঃ কুতুবউদ্দীনের উদ্যোমেরই ফলশ্রুতি। হাবিবউল্লার ভাষায় বলা যায় যে, 'He (Muizuddin) merely supplied the motive power. Aibak was responsible for the detailed planning and initiation of the Delhi state.' (The Foundation of Muslim rule in India, p.76)

কুতুবউদ্দীন আইবকের মৃত্যুর পর লাহোরের প্রভাবশালী উচ্চপদস্থ সুলতানের কর্মচারীরা তাঁর অযোগ্যপুত্র আরাম শাহকে সুলতানপদে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু তিনি মাত্র অটমাসকাল রাজত্ব করার পর বাদায়ুনের শাসনকর্তা শামসউদ্দীন ইলতুৎমিসের কাছে পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন এবং ইলতুৎমিস দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন।

শামসউদ্দীন ইলতুৎমিস (১২১১-১২৩৬)

শামসউদ্দীন ইলতুৎমিস ছিলেন ইলবারী তুর্কী ক্রীতদাস। তাঁর বংশধররা ইলবারী তুর্কী সুলতান নামে পরিচিত। ১২৯০ সাল পর্যন্ত এই ইলবারী তুর্কীরা দিল্লীতে রাজত্ব করেন। তাঁরা মামেলুক সুলতান নামে ইতিহাসে খ্যাত। অল্পবয়সে তাঁর ভ্রাতারা ঈর্ষাপরবশ হয়ে ইলতুৎমিসকে দাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করেন এবং কুতুবউদ্দীন আইবাক তাঁকে ক্রীতদাস হিসাবে ক্রয় করেন। কালক্রমে নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ইলতুৎমিস কুতুবউদ্দীন আইবাকের প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন এবং আইবাক স্বীয় কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বাদায়ুনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং আইবাকের মৃত্যুকালে তিনি বাদায়ুনের শাসনকর্তা হিসাবেই ছিলেন! কুতুবউদ্দীনের পুত্র আরাম শাহর যোগ্যতার প্রতি সন্দিহান হয়ে দিল্লীর আমির ওমরাহরা ইলতুৎমিসকে হিন্দুস্তানের তক্তে আরোহন করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। শামসউদ্দীন ইলতুৎমিস এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং যুদ্ধে আরাম শাহকে পরাজিত ও নিহত করে সিংহাসনে স্বীয় অধিকার কায়েম করেছিলেন।

সিংহাসনে আরোহনের পর ইলতুৎমিসের প্রধান সমস্যা হল নবগঠিত তুর্কী সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করা। ইলদিজ আইবাকের মৃত্যুর পর পুনরায় দিল্লীর উপর গজনীর সার্বভৌম অধিকার দাবি করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। আর সেই উদ্দেশ্যে তিনি ইলতুৎমিসকে রাজছত্র ও রাজদন্ড প্রেরণ করেন। সাময়িকভাবে ইলতুৎমিস তার সঙ্গে বিরোধ না করে অনিচ্ছা সহকারে এই উপহার দুইটি গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লীতে তুর্কী রক্ষীবাহিনী বা জানদাররা আরাম শাহর সমর্থকদের সহযোগিতায় সুলতানদের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থান নেতৃত্বে দান করেছিল। ইলতুৎমিস বহুকষ্টে এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং এছাড়া দিল্লীর আশপাশের অঞ্চলে যেসব পদস্থ তুর্কী রাজকর্মচারীদের শাসনাধীন ছিল ও যাঁরা এতকাল ইলতুৎমিসের সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্যও সুলতানের যথেষ্ট কালক্ষেপ হয়েছিল।

বৈদেশিক ও সীমান্ত সমস্যা

দিল্লীর সুলতানের পক্ষে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত সমস্যা বিপজ্জনক হবার আশংকা ছিল। সিন্ধুর

www.pathagar.com

অধিপতি নাসিরউদ্দীন কুবাচা মুলতান, লাহোর, ভাতিন্ডা এমনকি সরসুতি পর্যন্ত স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। অপরদিকে গজনীর শাসনকর্তা ইলদিজ লাহোর থেকে কুবাচাকে বিতাড়িত করে পাঞ্জাবে স্বীয় প্রাধান্য স্থায়ী করতে সচেষ্ট ছিলেন। ইলদিজের ভারতের সীমান্তে অনুপ্রবেশ খোয়ারজিমের শাহ কর্তৃক এই অঞ্চলের উপর হামলার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেছিল। কারণ, ইলদিজ আফগানিস্তানে বারংবার খোয়ারজিমের শাহ কর্তৃক আক্রান্ত হবার ফলে হিন্দুস্তানে রাজ্য বিস্তারের কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু এর ফলে এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হয়েছিল ও খোয়ারজিমের শাহও হিন্দুস্তানের প্রতি প্রলুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করার পর ইলতুৎমিস কিছুকাল স্বীয় রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ব্যাপৃত ছিলেন। হিন্দুস্তানে যেসব অঞ্চলে তুর্কী শাসন বিস্তৃত হয়েছিল তার মধ্যে অনেক স্থানেই রাজপুত রাজারা নামে মাত্র সুলতানের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছিল। এইসব রাজারা এখন স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। রন্থম্ভর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি এলাকা দিল্লীর অধীনতা পাশ মুক্ত হয়েছিল। পূর্বে বারানসী থেকে পশ্চিমে শিবালিকের পার্বত্য এলাকা পর্যন্ত ইলতুৎমিসের রাজ্যসীমা নিবদ্ধ ছিল। এমনকি গৌড় বা লখনৌতীতে খলজীরাও একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন করার জন্য সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমেই ইলতুৎমিস উত্তরপশ্চিম সীমান্তের সমস্যা সমাধানের প্রতি মনোনিবেশ করেন। অবশেষে তাজউদ্দীন লাহোর থেকে কুবাচাকে বিতাড়িত করলে ইলতুৎমিস এসম্পর্কে কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেননি বরং এই সুযোগে সরসুতি, ভাতিন্ডা প্রভৃতি অঞ্চলে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ইলদিজ যখন খোয়ারজিমের শাহ কর্তৃক পরাজিত হয়ে গজনী থেকে লাহোরে আশ্রয়প্রার্থী হলেন তখন ইলতুৎমিস প্রমাদ গুনেছিলেন। কারণ, এর ফলে ভবিষ্যতে খোয়ারজিমের শাহর সৈন্যবাহিনী কর্তৃক হিন্দুস্তানের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া ইলদিজ তখন দিল্লীর সুলতানের উপর সার্বোভৌমত্বের দাবি পুনরায় উত্থাপন করে সাহায্য দানের জন্য ইলতুৎমিসকে নির্দেশ দান করেছিলেন। এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দানের উদ্দেশ্যে ১২১৫ সালে ইলতুৎমিস তরাইয়ে সসৈন্যে তাজউদ্দীন ইলদিজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। তরাইয়ের যুদ্ধে ইলদিজকে দিল্লীর বাহিনী পরাজিত ও বন্দী করেছিল। ইলদিজকে বন্দী হিসাবে বাদায়ুনে প্রেরণ করা হয় এবং সেইখানে তাঁকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল। এইসময় ইলতুৎমিস সরাসরি লাহোর দখল না করে তাঁর পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং সেই সুযোগে কুবাচা সাময়িকভাবে লাহোর দখল করেন। ১২১৭ সালে দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে সম্পাদিত একটি চুক্তি লংঘিত হয়েছে এই অজুহাতে দিল্লীর সৈন্যবাহিনী লাহোরের দিকে অগ্রসর হলে নাসিরউদ্দীন কুবাচা উচ্ নামক স্থানে পশ্চাদাপসরণ করেছিলেন ও লাহোর ইলতুৎমিসের পদানত হয়েছিল। ১২২১ সালে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত থেকে মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনার ফলে দিল্লীর নবগঠিত সুলতানী রাজ্য ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিল। মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খান মধ্যএশিয়ার বিচ্ছিন্ন ও যাযাবর মোঙ্গল গোষ্ঠীদের ঐক্যবদ্ধ করে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগে এক দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। মোঙ্গলরা ১২১৫ সালে পিকিং দখল করে ও পাঁচ বৎসর পরে সমগ্র ট্রান্সঅক্সিয়ানা পদানত করেছিল। মোঙ্গল বাহিনী পঙ্গপালের মতন মধ্যএশিয়ার ইসলামিক সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ, সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, নগর ও জনপদ মরুভূমিতে পরিণত করেছিল। সমরকন্দ, বোখারা, খিভা প্রভৃতি উদ্যান নগরী মোঙ্গল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল। মধ্যএশিয়ার শক্তিশালী খোয়ারজিমের শাহ মোঙ্গল আক্রমণের সাম্রাজ্য হারান এবং আত্মরক্ষার জন্য ক্যাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে খোয়ারজিমের শাহজাদা জালালউদ্দীন মাংগবারানী মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে ...লেন এবং গজনী অঞ্চলে একটি মোঙ্গলবাহিনী তাঁর হস্তে পরাজিত

www.pathagar.com

হয়েছিল। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চেংগিজ খান স্বয়ং দ্রুতগতিতে তাঁর পশ্চাদধাবন করে ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে হানা দিয়েছিলেন। জালালউদ্দীন এই সময় ভারতের সীমান্তের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। মোঙ্গলদের দ্বারা বিতাড়িত সংখ্যাতীত আশ্রয়প্রার্থী এইসময় ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাবে দলে দলে নিরাপত্তা লাভের আশায় আগমন করেছিলেন। এইসব পলাতকদের মধ্যে জালালউদ্দীন মাংগবারানীর ন্যায় শাহজাদা থেকে সাধারণ নাগরিক, ফকির থেকে বাদশাহ, উলেমা থেকে অক্ষরজ্ঞানহীন অজস্র শরনার্থী ছিলেন।

মোঙ্গলদের আগমন বিশেষত জালালউদ্দীন মাংগবারানীর ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাবে অনুপ্রবেশের ফলে ইলতুৎমিস এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারণ জালালউদ্দীন ইলতুৎমিসের কাছে কাফের মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেন। একজন মুসলমান শাহর সংকটে ইলতুৎমিস বিধর্মীদের বিরুদ্ধে এই সাহায্যের প্রার্থনা সরাসরি অস্বীকার করতে সাহস পাননি। অপরদিকে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার অর্থ ছিল অনিবার্যভাবে সাম্রাজ্যের ধ্বংস ডেকে আনা। অতএব এইসময় ইলতুৎমিস সৌজন্য বজায় রেখে কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও জালালউদ্দীনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ইলতুৎমিস খিবার শাহজাদাকে বলে পাঠান যে, দিল্লীর আবহাওয়া তাঁর বসবাসের উপযুক্ত হবে না। কিন্তু মাংগবারানী উত্তরপশ্চিম ভারত বিশেষতঃ পাঞ্জাব ত্যাগ করে চলে যাননি। মোঙ্গলরা যখন তাঁর সন্ধানে পাঞ্জাবে ইলতুৎমিসের রাজ্যের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেছিল তখনও তিনি তাদের বাধা দান করেন নাই। কিন্তু লাহরের দিকে অগ্রসর হতে জালালউদ্দীনের বাহিনী ইলতুৎমিসের রাজত্বে অনুপ্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এবার তিনি সল্টরেঞ্জ এলাকার একজন খোকর প্রধানের কন্যাকে বিবাহ করে তার চিরশত্রুদের সঙ্গে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

জালালউদ্দীন মাংগবারানীর পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রায় ৩ বৎসরকাল অবস্থানের ফলে ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ইলতুৎমিসের প্রাধান্য ক্ষুন্ন হয়েছিল। কিন্তু ইলতুৎমিস তাঁকে বিতাড়িত করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এইসময় জালালউদ্দীন বাধ্য হয়ে কুবাচার রাজ্য আক্রমণ করেন ও মূলতানকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকা খোয়ারজিমের শাহর অধিকৃত অঞ্চলে পরিণত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে মোঙ্গলরা জালালউদ্দীন মাংগবারানীকে অনুসরণ করে মূলতান পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। খোয়ারজিমের শাহর সমর্থক একদল খলজী বাহিনীও এই এলাকায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল। কুবাচা, জালালউদ্দীনের আকস্মিক অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসনে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু খোয়ারজিমের বাহিনীর পশ্চাদধাবনকারী চেংগিজ ও তাঁর মোঙ্গলবাহিনী ১২২৪ সালে হিন্দুস্তান ত্যাগ করেছিল, কারণ এদেশের উত্তপ্ত আবহাওয়া তাদের সহ্য হয়নি। মাংগবারানীও এরপর পারস্যের কিরমানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এইসকল ঘটনা একদিকে যেমন নাসিরউদ্দীন কুবাচার শক্তি হ্রাস করেছিল অপরদিকে এইসব ঘটনার ফলশ্রুতিতে ইলতুৎমিস বৈদেশিক আক্রমণ ও কালান্তর মোঙ্গল নেতা চেংগিজের দুর্ধর্ষ বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পান। এই সুযোগে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর রাজ্য দখলের সুযোগও লাভ করেছিলেন। কুবাচা যখন নিম্ন সিন্ধু অঞ্চলে নানাধরনের আগ্রাসনের মুখোমুখি সেই সুযোগে ইলতুৎমিস প্রথমে লাহোর দখল করেছিলেন। কিন্তু ১২২৭ সালে চেংগিজ খানের মৃত্যুর পূর্বে তিনি কুবাচার বিরুদ্ধে অগ্রসর হননি। কারণ মোঙ্গলদের সংগে সংঘর্ষে ব্যাপৃত কুবাচার অস্তিত্ব দিল্লীর সুলতানের রক্ষাকবচের কাজ করছিল।

১২২৮ সালে ইলতুৎমিস লাহোরের শাসনকর্তাকে মূলতান আক্রমণের নির্দে[illegible] স্বয়ং উচ দখল করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। কুবাচা নিম্ন সিন্ধুনদের দ্বীপ[illegible] গ্রহণ করেন। তিনমাস অবরোধের পর উচ্ আত্মসমর্পণ করে। নাসির[illegible] বাহিনীর আক্রমণের ফলে এইস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[illegible]

www.pathagar.com

পলায়নকালে কুবাচা সপরিবারে সিন্ধুনদের জলে সলিল সমাধি লাভ করেন। ফলে মুলতান ও সিন্ধুর দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্তিতে সকল বাধা অপসারিত হয়েছিল। সিন্ধুনদের দক্ষিণ তটে দিল্লীর প্রাধান্য স্থাপিত হলেও এই নদের উত্তর তীরভূমিতে মোঙ্গলরা সক্রিয় ছিল। এইজন্য ইলতুৎমিস তাঁর সৈন্যবাহিনীকে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর উপত্যকায় প্রাধান্য বিস্তারের জন্য নির্দেশ দান করেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও মোঙ্গলদের সঙ্গে সংঘর্ষ পরিহার করতে বলা হয়েছিল। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পূর্বে তিনি উত্তরে শিয়ালকোটে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং সল্টরেঞ্জের নন্দনা পর্যন্ত সাময়িকভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন। শামসউদ্দীন ইলতুৎমিসের সর্বাধিক কৃতিত্ব হল তিনি উত্তরপশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ ও খোয়ারজিমের শাহজাদার হিন্দুস্তানে আশ্রয়প্রার্থী হওয়ার ফলে যে বিপদজনক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল, তা স্বীয় কূটনৈতিক দক্ষতা ও কৌশলের দ্বারা সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে সঠিক নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

রাজ্যবিস্তার ও কৃতিত্ব

লখনৌতি বা গৌড়ের খলজী মালিকরা দিল্লীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে রাজি ছিলেন না। আলি মর্দান খলজী এইখানে দুই বৎসর স্বেচ্ছাচারী শাসন চালানোর পর স্বীয় অনুচরদের হাতে নিহত হন। অবশেষে খলজী মালিকরা হিসামউদ্দীন আয়াজকে লখনৌতির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি গিয়াসউদ্দীন আয়াজ খলজী উপাধি নিয়ে সার্বভৌম সুলতান হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বিহারের ভাগলপুর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেন, ত্রিহুত, কামরূপ ও অন্যান্য স্থানের হিন্দু রাজাদের করদানে বাধ্য করেন এবং উড়িষ্যার রাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমদেব (১২১১-১২৩৬) ও পূর্ববাংলার সেন রাজাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর সময় লখনৌতি থেকে লাখনোর ও দেবকোট পর্যন্ত নির্মিত পথ সংযোগের রাস্তা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। ১২২৫ সালে সুলতান ইলতুৎমিস স্বয়ং গিয়াসউদ্দীনের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। এইসময় গিয়াসউদ্দীন দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু ইলতুৎমিসের প্রত্যাবর্তনের এক বৎসরের মধ্যে গিয়াসউদ্দীন চুক্তিভঙ্গ করে বিহার দখলে সচেষ্ট হলে ইলতুৎমিসের জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দীন মামুদ শাহ তাঁকে আক্রমণ করে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন। কিন্তু এর ফলে লখনৌতিতে শান্তি স্থাপিত হয়নি। কারণ দুই বৎসর পরে নাসিরউদ্দীন মামুদ শাহ লখনৌতিতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেই সুযোগে বল্কা খলজী নামে একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা করেন। ফলে ইলতুৎমিসকে ১২২৯ সালে তৃতীয়বার খলজীদের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে বাংলায় অভিযান করতে হয়েছিল। এইবারের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে তিনি আলাউদ্দীন জানিকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

সুলতানী সাম্রাজ্যের আক্রমণের ও বিপদের সুযোগে বিভিন্ন রাজপুতরাজ্যগুলি স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠেছিল। এইসব রাজার মধ্যে কালঞ্জরের চন্দেল্লা রাজপুতরা প্রতিবেশী অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করেন, গোয়ালিয়রের পরিহার বংশীয় রাজা মলয়বর্মাদেব নারওয়ার, গোয়ালিয়র ও ঝাঁসিতে প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন এবং ১২২০-৩৩ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে তাঁর নামাংকিত মুদ্রা পাওয়া যায়। এছাড়া রন্থম্ভরের চৌহানদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে জত্রী সিংহ নামে যোধপুর বা মংগলানার একজন প্রধানের ১২১৫ সালের লিপি পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য এই লিপিতে দিল্লীর সুলতানের নামের উল্লেখ আছে। ফলে অনুমান করা যায় যে ইলতুৎমিস এই অঞ্চলে সার্বভৌম হিসাবে তখনও স্বীকৃতি লাভ করতেন। ঝালোরার চৌহানরা নাডোল, ঝালোর, মান্ডোর ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। উত্তরপূর্ব রাজপুতানার জাদোন ভাট্টি রাজপুতরা এবং আজমীর, বিয়ানা, থাংগির প্রভৃতি স্থানের রাজপুত রাজারা স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠেছিলেন।

www.pathagar.com

সুলতান ইলতুৎমিস রাজপুত রাজাদের স্ববশে রাখার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ১২২৬ সালে রন্থম্ভর ও তার স্বল্পকালের মধ্যে শিবালিক পাহাড়ের মাণ্ডোয়ার দুর্গ সুলতানের করতলগত হয়েছিল। ঝালোরের বিরুদ্ধেও ইলতুৎমিসের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু নাগড়া ও বুন্দির বিরুদ্ধে তুর্কীদের সামরিক তৎপরতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। আজমীর, সম্বর এবং নাগোরে তুর্কী প্রাধান্য প্রসারিত করার জন্য ইলতুৎমিসের সময় সাফল্য জনক সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়। ১২৩১ সালে গোয়ালিয়রের শাসক মলয়বর্মাদেবের বিরুদ্ধে ইলতুৎমিস অভিযান প্রেরণ করেন এবং ১২৩২ সালে ১১ মাস অবরোধের পর মলয়বর্মাদেব এই দুর্গ থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে গোয়ালিয়র তুর্কীদের পদানত হয়। মালিক তায়েসী নামে মুইজউদ্দীনের একজন ক্রীতদাসের উপর এই দুর্গের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। তাঁর কালঞ্জর থেকে চন্দেরী পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস সফল হয়নি। ১২৩৪-৩৫ সালে সুলতান মালব আক্রমণ করেন এবং উজ্জয়িনী ও ভিলসা দুর্গ দখল করেন। উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য প্রতিষ্ঠিত মহাকালের মন্দির ও মূর্তি ইলতুৎমিস ধ্বংস করেন। এছাড়া কাটেহারিয়া রাজপুতরা অহিচ্ছত্রে এবং বাতু (বা পৃথু) নামে হিন্দু প্রধান অযোধ্যা ও দোয়াবে তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। ১২৩৬ সালে উত্তর-পশ্চিমে অভিযান কালে ইলতুৎমিস অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এই বৎসরের এপ্রিল মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

একথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, ইলতুৎমিসই হিন্দুস্থানে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রিজভী মন্তব্য করেছেন যে, 'He was the greatest ruler of the thirteenth century India and a wise statesman'* মহম্মদ ঘুরীর কাছ থেকে কুতুবউদ্দীন হিন্দুস্তানের যে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন ইলতুৎমিস তা সুসংগঠিত করেন। তুর্কী সামরিক কর্মচারী ও ইরানী, তুরানী ও অন্যান্য বিদেশাগত অভিযাত্রী যারা দিল্লী সুলতানের অধীনে তাজিক নামে পরিচিত ছিলেন তাদের মধ্যে ভারসাম্য ও সংহতি স্থাপন করে ইলতুৎমিস শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে সুসংবদ্ধ করেন। কেবলমাত্র আমির ও ওমরাহদের সংঘবদ্ধ করে এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেই নয় হিন্দুস্তানকে মোঙ্গল আক্রমণের বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা করে সুলতান প্রজা সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। ইলতুৎমিস স্থাপত্য ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে দিল্লীতে বিখ্যাত কুতুবমিনার নির্মিত হয়। এই মিনার বাগদাদের খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার খাকির উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হয়েছিল। ইলতুৎমিস সুফী ও উলেমা উভয়ের প্রতি সদাশয় ছিলেন। ১২২৯ সালে বাগদাদের আব্বাসিদ খলিফা ইলতুৎমিসকে খিলাৎ প্রেরণ করেন এবং তাঁকে সুলতান-ই-আজম উপাধিতে ভূষিত করেন। ইলতুৎমিসের কৃতিত্বের সম্পর্কে উল্লেখ করে তাঁর দিল্লীর প্রথম সুলতান বলে ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে হাবিবউল্লাহর মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষা উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, 'Working on the outlines drawn by Aibak he filled in the details of a military state and richly deserved his position as its first king.**

ইলতুৎমিসের দুর্বল বংশধরগণ

ইলতুৎমিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীন মামুদ তাঁর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। অন্যান্য শাহজাদারা সিংহাসনে বসার অনুপযুক্ত বলে ইলতুৎমিসের ধারণা হয়েছিল এবং সেইজন্য

* S. A. A. Rizvi, The Wonder that was India, Vol.-II., পৃঃ ২৭।
** The Struggle for Empire (Bharatiya Vidya Bhavan), পৃঃ ১৩৬।

www.pathagar.com

তিনি স্বীয় কন্যার রাজিয়াকে তাঁর উত্তরাধিকারী করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে তাকে যুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১২৩১ সালে গোয়ালিয়রের বিরূদ্ধে অভিযানের জন্য দিল্লী থেকে রওনা হবার সময় ইলতুৎমিস স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে রাজধানীর দায়িত্ব রাজিয়ার উপর অর্পণ করেন। কিন্তু শেষ জীবনে সম্ভবত তিনি এই সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করেছিলেন। জীবনের সর্বশেষ সামরিক অভিযানের সময় তিনি শাহজাদাদের মধ্যে নাসিরউদ্দীন মামুদের মৃত্যুর পর যিনি সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন সেই রুকনউদ্দীন ফিরোজকে লাহোর থেকে আহ্বান করেছিলেন। এতদ্বারা কেবলমাত্র এই উপসংহারে আসা যায় যে সুলতান সম্ভবত তার প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু ইলতুৎমিসের কোন ঘোষণায় তিনি রাজিয়ার স্থলে ফিরোজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন এইরূপ জানা যায় না।

সুলতানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরোজের মাতা শাহ তুর্কন স্বীয় পুত্রকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন। সিংহাসনে আরোহন করে রুকনউদ্দীন ফিরোজ মদ্যপানে ও বিলাস ব্যাসনে মত্ত হয়ে পড়েন। রাজ্য শাসনের ও পরিচালনার দায়িত্ব সুলতানের মাতা বেগম শাহ তুর্কনের হস্তগত হয়। আর এই সুযোগ তিনি ইলতুৎমিসের অন্যান্য বেগম ও তাঁদের সন্তানদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে স্বীয় প্রতিহিংসা বৃত্তিকে চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। ফলে অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও মালিকরা বিদ্রোহী হয়েছিলেন। শাহ তুর্কনের ষড়যন্ত্রে ইলতুৎমিসের অন্যতম নাবালক পুত্র কুতুবউদ্দীনের জীবননাশ হয় ও রাজিয়ার জীবনসংশয় উপস্থিত হয়েছিল। এইসব সংবাদে রাজধানীতে ও সর্বত্র অসন্তোষ ধূমায়িত হয়। উজীর জুনেদী পর্যন্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদানের জন্য রাজধানী ত্যাগ করেন। ইলতুৎমিসের অন্য একটি পুত্র অযোধ্যার শাসক গিয়াসউদ্দীন দিল্লীর জন্য প্রেরিত লখনৌতির রাজস্ব পথে লূণ্ঠন করেন। লাহোর, হানসী, মুলতান, বাদায়ুনের বিদ্রোহী শাসকরা সশস্ত্র হয়ে মনসুরপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। রুকুনউদ্দীন ফিরোজ এই প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য সসৈন্যে দিল্লী থেকে রওনা হন। কিন্তু পথে তাঁর নিজের সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহী হয়ে সুলতানের দেহরক্ষীদের হত্যা করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেছিল।

ইতিমধ্যে ফিরোজের অনুপস্থিতির সুযোগে শাহ তুর্কনের বিরুদ্ধে সাধারণের ক্ষোভকে রাজিয়া তাঁর স্বপক্ষে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে রাজিয়া নিপীড়িত মানুষের প্রতীক লালপোষাক পরে শুক্রবারের প্রার্থনার সময় শাহ তুর্কনের বিরুদ্ধে সমবেত জনগণের সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। এই আবেদন দিল্লীর নাগরিকদের মনে সাড়া জাগিয়েছিল। তাদের সহায়তা লাভ করে রাজিয়া শাহ তুর্কনকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। রাজিয়া সৈন্যবাহিনীরও সমর্থন লাভ করেছিলেন। ফলে রুকনউদ্দীন ফিরোজ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করার পর সহজেই রাজিয়ার হাতে বন্দী হয়েছিলেন। পরে তাঁর প্রাণদন্ড হয়।

সুলতান রাজিয়া

১২৩৬ সালে দিল্লীর আমির ও সৈন্যবাহিনী এবং নাগরিকরা রাজিয়াকে সুলতান হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন। এইভাবে ইলতুৎমিসের ইচ্ছা অবশেষে পূরণ হয়েছিল। সুলতান ইলতুৎমিস যখন রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনিত করেছিলেন তখন তাঁর সভাসদ, আমির ওমরাহ ও পার্ষদগণ এই ব্যাপারে সুলতানের নীতিতে ক্ষুব্ধ হন। কারণ কোন মহিলার সিংহাসন আরোহন ও রাজমুকুটধারণ সিংহাসনের পক্ষে হানিকর বলে তাঁরা মনে করতেন।* এইজন্য এইসব আমির

* মধ্যযুগের ইতিহাসে রাজঅন্তপুরিকাদের শাসনদন্ড পরিচালনা করার ইতিপূর্বেকার উদাহরণ স্বরূপ শাহ তুর্কন কতৃক দিল্লী সুলতানী শাসন পরিচালন ও খোয়ারজ্মিমের শাহ জালালউদ্দীন মাংগবারণীর মাতার কথা উল্লেখ করা যায়।

www.pathagar.com

ওমরাহ ইলতুৎমিসকে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে অনুরোধ করেছিলেন। সমকালীন ঐতিহাসিক মিনহাজের লেখনী থেকে এই অনুরোধের উত্তরে ইলতুৎমিসের বক্তব্য জানা যায়। ইলতুৎমিস বলেছিলেন যে, 'আমার পুত্ররা যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতায় মত্ত বলে তাদের কারো দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী নেই। আমার মৃত্যুর পর দেখা যাবে আমার কন্যার অপেক্ষা তারা কেউই উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে যোগ্য নয়।' এই কথার পরে আমিররা নিরুত্তর হয়েছিলেন বটে কিন্তু রাজিয়া যখন সিংহাসন লাভ করলেন তখন তাঁরা অনেকে বিরোধিতা করেন। কারণ যেভাবে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অনুমোদন ব্যতিরেকে সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন তাতে উজীর জুনেদী ও এইসকল প্রাদেশিক শাসকরা তাঁদের অধিকার লংঘিত হয়েছে বলে মনে করেন ও দিল্লী অবরোধ করেন। এইসময় রাজিয়ার অধীনে বিদ্রোহ দমন করার জন্য যথেষ্ঠ সৈন্যবাহিনী ছিল না এবং অবরোধের সময় একমাত্র অযোধ্যার শাসক তাঁকে সাহায্য প্রেরণ করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। ফলে বিদ্রোহীরা এই অনুগত আমিরকে বন্দী করে ও পরে কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়। অতএব রাজিয়া এই সময় প্রায় নিঃসহায় হয়ে পড়েন। তিনি কৌশলে বিদ্রোহী আমিরদের মধ্যে দুই-একজনকে স্বদলভুক্ত করেছিলেন। ফলে অন্যান্য আমিরদের মনোবল বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে বিরোধের বীজ উপ্ত হয়। এই পরিস্থিতির সুযোগে রাজিয়া সহজেই বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়েছিলেন। অতঃপর সুলতানের প্রতি সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের প্রাদেশিক সরকারগুলি অনুগত্য প্রদর্শনে দ্বিধা করেনি। মিনহাজ বলেছেন দেবল থেকে লখনৌতির সমস্ত মালিক ও আমিররা রাজিয়ার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

সমকালীন ইতিহাসে সুলতান রাজিয়াকে 'মহৎ শাসক' বলে বর্ণনা করেছে। তিনি নারীর পোশাক ও বোরখা বর্জন করে দরবারে পুরুষের পোষাকে শাসন পরিচালনা শুরু করেন। ত্রয়োদশ শতকে পুরুষানুক্রমিক স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সাফল্য সম্পূর্ণ সুলতানের ব্যক্তিগত সাহস ও যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল ছিল। রাজিয়া সম্পর্কে তৎকালীন যুগের ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেছেন যে, রাজ্যশাসন পরিচালনার জন্য তিনি তুর্কী আমির গোষ্ঠী ও ইলতুৎমিসের প্রিয়পাত্র তথাকথিত 'চল্লিশজন' উচ্চপদস্থ ক্রীতদাসদের সন্তোষ বিধানের পথ পরিত্যাগ করেছিলেন। রাজিয়া এই উদ্দেশ্যে তাজিকদের উচ্চরাজপদে নিয়োগ করেন ও তুর্কী আমিরদের মধ্যে রাজিয়ার এই কার্যকলাপে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষত রাজিয়া কর্তৃক জামালউদ্দিন ইয়াকুত নামে একজন হাবসীকে আমির-ই আখুর বা অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান হিসাবে নিয়োগ তুর্কীদের নিজস্ব অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে তারা মনে করেছিল। ইয়াকুতের নিয়োগের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'চল্লিশ জন' তুর্কী গোষ্ঠীর ক্ষমতা হ্রাস করা এবং সুলতানের প্রতি অনুগত ও নির্ভরশীল রাজকর্মচারী ও সেনাপতিদের দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করা। অতএব ইয়াকুত রাজিয়ার প্রিয়পাত্র ছিলেন এইজন্য তাঁর উন্নতি হয় এই বক্তব্য এবং ফিরিস্তার লিখিত ইতিহাসে সুলতানের ব্যক্তিগত দুর্বলতার জন্য একজন হাবসীর পদোন্নতি হয়েছিল বলে যে কাহিনী প্রচারিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইসেমী তাঁর ফতোয়া-উস্-সালাতিনে উল্লেখ করেছেন যে, জালালউদ্দীন ইয়াকুতের পদমর্যাদা বৃদ্ধি রাজিয়ার পূর্বসূরী ইলতুৎমিস ও রুকনউদ্দীনের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল।

রাজিয়ার শাসনকালে 'চল্লিশ জনের' গোষ্ঠীর (The Forty) প্রতি ইচ্ছাকৃত অবহেলা ইলতুৎমিসের প্রিয়পাত্র তুর্কী ক্রীতদাস গোষ্ঠীর কাছে অসহনীয় হয়েছিল। এইজন্য সুলতান রাজিয়ার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে এই অসন্তুষ্ট গোষ্ঠীর আমিররা নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কিন্তু রাজধানী দিল্লীতে কোন অভ্যুত্থান বা গোপন ষড়যন্ত্রের মারফতে রাজিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করা সম্ভব ছিল না। কারণ দিল্লীর নাগরিকরা বিপুল সংখ্যায় তাঁকে সমর্থন করতেন। এইজন্য কবির খান দিল্লীর বাইরে লাহোরে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। কিন্তু রাজিয়া সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করেন।

www.pathagar.com

অতঃপর ষড়যন্ত্রকারীরা ভাতিন্ডার শাসনকর্তা আলতুনিয়ার সাহায্যে রাজিয়াকে বন্দী করেছিল। রাজিয়া আলতুনিয়ার বিদ্রোহ দমনের জন্য ভাতিন্ডায় পদার্পন করলে ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর হাবসী অশ্বারোহী বাহিনী প্রধানকে হত্যা করে এবং রাজিয়ার কাছে অন্য কোন সাহায্য পৌছবার আগে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। রাজিয়ার পতনের পর দিল্লীতে ইলতুৎমিসের তৃতীয় পুত্র বহরম শাহকে ষড়যন্ত্রকারীরা সুলতান মুইজউদ্দীন বহরম শাহ নামে অভিষিক্ত করেছিলেন (১২৪০)।

মুইজউদ্দীন বহরম শাহ নামেমাত্র মুকুটধারী সুলতান হয়েছিলেন। কারণ ষড়যন্ত্রকারীদের নেতারা রাজ্য পরিচালনার জন্য সকল ক্ষমতা দখল করেন। বহরমশাহ স্বহস্তে ক্ষমতা দখলের জন্য আমির আয়েতিগিন (Actigin) যিনি নায়েব-ই মামলিকাত (রাজ্যের নায়েব) উপাধি গ্রহণ করে সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন তাঁকে ভাড়া করা আততায়ীর সাহায্যে হত্যা করেন। কিন্তু উজীর মুহাজ্জবউদ্দীন (Muhazzbuddin) বহরম শাহর আশা নিস্ফল করে দিয়েছিলেন এবং অন্যান্য আমিরদের সমর্থনে সুলতানকে পুনরায় পুতুল রাজায় পরিণত করেছিলেন।

ইতিমধ্যে আলতুনিয়া ক্ষমতা দখলের লড়াইতে তাঁর কোন লাভ না হওয়াতে রাজিয়াকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন ও তাঁকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই প্রস্তাবের সুযোগ গ্রহণ করে রাজিয়া, আলতুনিয়াকে বিবাহ করে রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আলতুনিয়া ও রাজিয়ার সৈন্যবাহিনী দিল্লীর সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হয়। ১৩ই ডিসেম্বর, ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের সময় কাইথালের কাছে দস্যুদের হাতে রাজিয়া ও আলতুনিয়া নিহত হন। স্বল্পকালের মধ্যে মুইজউদ্দীন বহরম শাহরও পতন হয়েছিল। ১২৪১ সালে লাহোরে মোঙ্গল আক্রমণের সময় উজীর মুহাজ্জবউদ্দীনের নেতৃত্বে লাহোরের সাহায্যার্থে প্রেবিত সৈন্যবাহিনী মোঙ্গলদের প্রতিরোধ না করে উজীরের ষড়যন্ত্রে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেছিল। ফলে সুলতান তাঁর রাজধানীতে অবরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে সিংহাসনে আরোহনের পর বহরম শাহ তাঁর নায়েব-ই মামলিকাত ইখতিয়ারউদ্দীন আইতকিনকে গোপন ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছিলেন। মুহাজ্জবউদ্দীন এই ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে যেসব আমির প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে সুলতানের মনে ভ্রান্তির ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছিলেন। বহরম শাহ উজীরকে আমিরদের বিদ্রোহ উপস্থিত হলে তাদের প্রাণদন্ড দেবার কর্তৃত্ব দিয়ে মোঙ্গল বিরোধী সৈন্যবাহিনীর প্রধান রূপে লাহোরের উদ্দেশ্যে অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। উজীর সুলতানের হুকুমনামা জনসমক্ষে প্রচার করে সহজেই আমিরদের বহরম শাহর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দিল্লীতে সুলতান এই বিদ্রোহী আমিরদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে অবশেষে তাদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। ১২৪২ সালের মে মাসে তাঁর প্রাণদন্ড হয়। অতপর সুলতান রুকনউদ্দীন ফিরোজের ১৬ বছরের পুত্র **আলাউদ্দীন মাসুদ শাহকে** সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। মাসুদও ১২৪৬ সালে বন্দেগান-ই-চহেলগাঁও বা চল্লিশজন ক্রীতদাস আমিরের গোষ্ঠীর এবং ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দীন মামুদের মাতার ষড়যন্ত্রে সিংহাসনচ্যুত হন। তাঁর স্থলে নাসিরউদ্দীন মামুদ সুলতান হিসাবে ১২৪৬ সালে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন।

সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ সিংহাসন লাভের পর চল্লিশ জনের গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে গিয়াসউদ্দীন বলবন রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়েছিলেন এবং তাঁর স্বজনদের উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন। বলবন নিজের কন্যার সঙ্গে সুলতানের বিবাহ দিয়েছিলেন। ১২৪৯-৫০ সালে বলবনকে নায়েব-ই মামলিকাত পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। কেবলমাত্র এক বৎসর (১২৫৩-৫৪ খ্রীঃ) বাদ দিয়ে সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদের রাজত্বকালে গিয়াসউদ্দীন বলবনই শাসনদন্ড পরিচালনা করছিলেন। প্রায় একবৎসর ইমাদউদ্দীন রিহান নামে একজন ভারতীয় মুসলমান বলবন বিরোধী তুর্কী ও

www.pathagar.com

তাজিক আমিরদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে বলবনকে ক্ষমতাচ্যুত করে উজীরের পদ দখল করেছিলেন। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে বলবন পুনরায় দরবারে স্বীয় প্রভাব পুনরুদ্ধার করেন। অভ্যন্তরীন গোষ্ঠী বিরোধ, হিন্দুরাজাদের শক্তিবৃদ্ধি ও স্বাধীনতা ঘোষণা সুলতানী শাসনের ভিত্তিকে দুর্বল করেছিল। গিয়াসউদ্দীন বলবন ইলবারী তুর্কী বংশীয় একজন ক্রীতদাস ছিলেন এবং সুলতান ইলতুৎমিস তাঁকে খাজা জামালউদ্দীনের কাছ থেকে ক্রয় করেন। তিনি সুলতান ইলতুৎমিসের খাস বরদার বা ব্যক্তিগত পরিচারক নিযুক্ত হন ও কালক্রমে ইলতুৎমিসের প্রিয়পাত্র চল্লিশজন ক্রীতদাসের অন্যতমরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। রিজিয়ার রাজত্বকালে গিয়াসউদ্দীন বলবনকে আমির-ই-শিকার নিযুক্ত করে রেওয়ারী ও পরে হানসী অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১২৪৫ সালে মাংগু খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা উচ্ আক্রমণ করলে গিয়াসউদ্দীন বলবনের তৎপরতায় ও সামরিক দক্ষতায় তারা বিতাড়িত হয়েছিল। সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ সিংহাসনে আরোহন করবার পর কার্যত বলবন তাঁর রাজত্বের শাসনদন্ড পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাময়িকভাবে একবৎসরের জন্য রিহান কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হলেও বলবনই ছিলেন রাজ্যের সর্বেসর্বা। ১২৬৫ সালে নাসিরউদ্দীন মামুদের মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দীন বলবন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন।

সুলতান নাসিরউদ্দীন সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন। সমকালীন ইতিহাস পাঠ করে মনে হয় যে, রাজ্যশাসনের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্নরূপে বলবনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। মূলতঃ পরবর্তীকালের দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহাসিক ফিরিস্তার বিবরণী থেকে নাসিরউদ্দীন মামুদের বিষয়ে নানা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এইজন্য রিজভী মন্তব্য করেছেন যে, 'Sultan Nasiruddin is wrongly described as a very God-fearing' and amicable person.*

বলবন এইযুগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কেন্দ্রের কর্তৃত্ব স্থাপনের ও বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রচেষ্টা করেছিলেন। এইসব প্রয়াস বহুক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করেনি। লখনৌতিতে বারংবার অভিযান করে তিনি বঙ্গদেশে সুলতানী শাসনের ভিত্তি মজবুত করতে সক্ষম হননি। অযোধ্যা ও বাহারিচের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের শাসন এবং নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল; হাসান কারলুগ নামক খোয়ারজিম রাজবংশের একজন শাসক মুলতান ও উচ্ কয়েক বৎসরের জন্য স্বীয় দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু বলবনের প্রচেষ্টায় কারলুগ বিতাড়িত হন এবং কিসলু খানকে এই দুইটি অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি মোঙ্গল নেতা হুলাগু খান (১২৫৬-৬৫ খ্রীঃ) ও ইরানের ইল-খান বংশের প্রতিষ্ঠাতার কাছে সিন্ধু অঞ্চল সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমনকি ইলতুৎমিসের এক পুত্র জালালউদ্দীন মামুদ শাহ পর্যন্ত মোঙ্গলিয়া ও চীনের মোঙ্গল শাসক মাংগু খানের বশ্যতা স্বীকার করে সল্টরেঞ্জ অঞ্চলের উপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা করেছিলেন। ভাতিন্ডার শাসনকর্তা থাকাকালীন সময় শেরখানও মোঙ্গলদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এই পরিস্থিতি উজীর গিয়াসউদ্দীন বলবনের প্রচেষ্টায় হুলাগু খানের সঙ্গে সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে একটি আপোষরফা করেছিলেন। ১২৬০ সালে এই উদ্দেশ্যে হুলাগু খানের দূত দিল্লীতে উপস্থিত হলে তাঁকে জাঁকজমকের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ ও হুলাগু খানের মধ্যে যে সমঝোতা হয় তার ফলে বিতস্তা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত নিজেদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখতে মোঙ্গলরা সম্মত হয়। ইতিপূর্বে কিসলু খান ও কুতলুগ খান ১২৫৭ সালে বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং দিল্লী শহরে তাদের সমর্থকরাও এইসময় একটি অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। কিন্তু বলবনের তৎপরতায় এই অভ্যুত্থানের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ১২৫৯

---

* S. A. A. Rizvi, The Wonder that was India, Vol. II, পৃঃ ৩০ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সালে মেওয়াটের হিন্দু বিদ্রোহীরা তাদের নেতা মালিকার নেতৃত্বে হরিয়ানা, শিবালিক ও বিয়ানার জনপদ ও গ্রামাঞ্চল লুণ্ঠন করেছিলেন। উলুঘ খান বা বলবন সসৈন্য এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। এই অভিযান সমগ্র এলাকা মেওয়াটিদের হাত থেকে মুক্ত করে বলবন শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে সমকালীন ইতিহাসে পুনরায় মেওয়াটিদের উৎপাতের কথা শোনা যায়। এমনকি দিল্লীর উপকণ্ঠে পর্যন্ত তারা নানাভাবে অনুপ্রবেশ করে লুণ্ঠন চালাত বলে জানা যায়। বলবন এইযুগে সীমান্ত সুরক্ষিত করেছিলেন এবং মোঙ্গল আগ্রাসনের ভীতি থেকে দিল্লীর সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন, করদ রায়, রাণা এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের তিনি দমন করেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। তার তৎপরতার ফলে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য রক্ষা পেয়েছিল।

সমকালীন লেখক মিনহাজ লিখিত তবকত-ই-নাসিরী গ্রন্থে নাসিরউদ্দীন মামুদের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিবরণী অকস্যাৎ ১২৬০ সালের প্রথম দিকের ঘটনাবলী বিবৃত করে স্তব্ধ হয়ে গেছে। পরবর্তী একজন ঐতিহাসিক ইসেমী ১৩৫০-৫১ সালে তাঁর লিখিত গ্রন্থ ফুত-উস্-সালাতিনে এই যুগের বিবরণী সম্পূর্ণ করেছিলেন। ইসেমী মন্তব্য করেছেন যে, বলবন তাঁর জামাতা সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেন। ইবন বতুতা এই বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। এই উক্তি কতদূর সত্য তা নিয়ে বর্তমান কালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সমকালীন মুদ্রা থেকে জানা যায় ১২৬৫ সালে গিয়াসউদ্দীন বলবন সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। নাসিরউদ্দীন সিংহাসনে আরোহনের পর থেকে মাত্র একবৎসর ছাড়া গিয়াসউদ্দীন বলবনই তাঁর নামে রাজকার্য চালাতেন। তাঁর মৃত্যুর পর বলবন নামে ও কাজে সুলতানী শাসন পরিচালনার দায়বহন করেছিলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন

জিয়াউদ্দীন বারানী মন্তব্য করেছেন যে, ইলতুৎমিসের বংশধরদের প্রায় ত্রিশবৎসরের শাসনকালে শাসকের সম্পর্কে ভীতি শাসিতের মধ্যে ছিল না। সুলতান বলবন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এবং প্রজাসাধারণের কাছ থেকে বশ্যতা ও আনুগত্য আদায় করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিদ্রোহী রায়, রাণা, মুকদ্দম ও চৌধুরীদের স্ববশে আনার জন্য এবং মোঙ্গল আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষার জন্য কেন্দ্রীকরণের মারফতে সুলতানের ক্ষমতা শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। এইজন্য তিনি সিংহাসনের গৌরব বৃদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে বলবন কিংবদন্তীতে খ্যাত তুর্কী বীর আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলে নিজেকে ঘোষণা করেন। তুর্কীরা যে জাতিগত দিক থেকে শ্রেষ্ঠ এই তথ্যের প্রচার ইতিপূর্বে তারিখ-ই ফকরউদ্দীন মুবারক শাহীতে করা হয়েছিল। বলবন এই বক্তব্যের সমর্থক ছিলেন। তাছাড়া রাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক বলে তিনি মনে করতেন। বারানীর মতে বলবন বিশ্বাস করতেন যে, রাজতন্ত্র কোন জ্ঞাতি সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেয় না। কাজে ও ব্যবহারে বলবন সর্বদা প্রজাদের মনে সুলতান সম্পর্কে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সুলতান পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়া মাত্র এই ছিল বলবনের বক্তব্য এবং সেইজন্য যেসব অভিজাত ও সামরিক প্রধান একান্তভাবে অনুগত তারা ছাড়া অন্য কেউ বলবনের রাজত্বকালে আমল পায় নি। বলবন তাঁর পুত্র বুঘরা খানকে বলেছিলেন যে, 'সুলতানের হৃদয় ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র এবং এর ফলশ্রুতিতে মানুষের সমাজে তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই'। সুলতানের এই ঐশ্বরিকক্ষমতা বিশ্বাসের জন্য তিনি নিজেকে সর্বসাধারণের উর্দ্ধে বলে মনে করতেন।

কিন্তু এই ধরণের স্বৈরতন্ত্র ইসলামিক গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার দ্বারা সমর্থিত নয়। তাছাড়া

www.pathagar.com

এরূপ একক ক্ষমতার অধিকারীকে সর্বদা শত্রুদের হাত থেকে বা গুপ্তঘাতকদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হয়। বলবনকে এইজন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত তুর্কী অশ্বারোহী দেহরক্ষী নিযুক্ত করতে হয়েছিল। এইসব দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ তুর্কী দেহরক্ষীদের ঝকঝকে অস্ত্রসজ্জা সর্বদা লোকের মনে সুলতানের সম্পর্কে ভীতি ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি করত। বলবন জাঁকজমকের পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য রাজসভায় তিনি পারসিক আদব কায়দার প্রবর্তন করেন। আভূম সেলাম বা সিজদা ও ভূমিচুম্বন বা জমিনবুস এবং এইধরনের অন্যান্য দরবারী প্রথা প্রবর্তন করে বলবন সুলতানের পদমর্যাদার সম্মান বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়েছিলেন। বলবন এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে উত্তরাধিকারী সূত্রে তিনি সিংহাসন লাভ করেননি। অতএব স্বপ্রচেষ্টায় একটি নতুন সুলতানী বংশের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হয়ে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বলবন নিজেকে কিংবদন্তীতে প্রসিদ্ধ তুরস্কের বীর অফ্রাসিয়ারের বংশধর বলে দাবি করেছিলেন।

সুলতানের সুবিচার সম্পর্কে উচ্চধারণা সৃষ্টির জন্য গিয়াসউদ্দীন বলবন কঠোর হাতে আইনভঙ্গকারী ও অপরাধীকে শাস্তিদান করতেন। সমকালীন ইতিহাসে দাবি করা হয়েছে যে, সুবিচারের জন্য এই যুগে পদমর্যাদার খাতির করা হত না। বাদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক বকবকের (Malik Baq Baq) হুকুমে একজন ক্রীতদাসকে বেত্রাঘাতের শাস্তিদান করা হয়। বেত্রাঘাতের ফলে তার মৃত্যু হয় এবং তার আত্মীয়রা ন্যায়বিচারের জন্য সুলতানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। বিচারে বলবন মালিক বকবককে অনুরূপ শাস্তিদান করেন। অযোধ্যার শাসক মালিক হাইবত খান মদ্যপ অবস্থায় একজন ব্যক্তিকে হত্যা করার ফলে তাঁকেও সুলতান বেত্রাঘাতের শাস্তিদান করেছিলেন। এইভাবে তিনি স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকে নিষ্কন্টক করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উত্তরপশ্চিম সীমান্তের শাসক মালিক শের খানকে গোপনে বিষপ্রয়োগ করে তাঁর জীবননাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মালিক আমিন খান লখনৌতির বিদ্রোহী শাসক তুঘরিলের হাতে পরাজিত হলে তাঁকে অযোগ্যতার জন্য প্রাণদন্ড দেওয়া হয়। এই ধরনের ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, কেবলমাত্র সুবিচারই নয়, 'চল্লিশজনের গোষ্ঠীর' অন্তর্ভুক্ত প্রভাবশালী আমিরদের যেকোন প্রকারে বলবন দমন করতে তৎপর হয়েছিলেন। সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল অভিজাতদের মধ্যে আনুগত্য অথবা ভীতির সৃষ্টি করে তাঁদের সুলতানের আজ্ঞানুবর্তী করা।

এছাড়া বলবন তুর্কী জাত্যাভিমানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি তুর্কীদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করতেন। তাঁর রাজত্বকালে তুর্কী ছাড়া অন্যজাতের লোকেরা উচ্চপদ লাভে বঞ্চিত ছিলেন। বলবন নিম্নবংশজাত লোকদের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করতেন না। দিল্লীর একজন বিত্তবান বণিক বহু অর্থব্যয় করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই প্রাচষ্টা ব্যর্থ হয়। বলবনের দরবারে হাস্য-পরিহাস অচল ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদের মৃত্যুর পর সুলতানের অন্তরঙ্গ সেবকরা পর্যন্ত তাঁকে শোকপ্রকাশ করতে দেখেনি। এইজন্য ঐতিহাসিক হাবিবউল্লাহ মন্তব্য করেছেন যে, 'Ruthlessly he thus sacrificed himself to the king in him'। মোঙ্গলদের আক্রমণের ফলে মধ্যএশিয়া ও অন্যান্য স্থানের ইসলামিক সাম্রাজ্যের প্রাধান্য ধ্বংস হয়েছিল। একমাত্র, হিন্দুস্তান এইসব অঞ্চলের আশ্রয়প্রার্থী মুসলমান সুলতান ও উজীর-সাহিত্যিক, লেখক ও সাধারণ মানুষের আশ্রয়স্থান হয়েছিল। বলবন এইসব আশ্রিতদের প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীর পৃথক বাসস্থলে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ইসলামের রক্ষক ও উদ্ধারকর্তা হিসেবে হিন্দুস্তানের বাইরের দেশগুলিতে এইজন্য তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ নীতি

বলবন তাঁর স্বৈরতন্ত্রকে স্থায়ী করার জন্য গুপ্তচরদের সমগ্র রাজ্যের খবরাখবর দেবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। প্রতিটি বিভাগের কার্যকলাপের উপর তারা নজর রাখত। এছাড়া সংবাদলেখকদের বা বারিদদের নিয়োগের সময় বলবন তাদের আনুগত্য ও চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে তবেই তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিতেন। হাবিবউল্লাহ মন্তব্য করেছেন যে, 'Balboan's despotism was of extreme kind in was of extreme kind in which the right of the military aristocracy even to a share, not to speak of domination in the government, could find no place.'* বলবনের এই স্বৈরতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম কারণ হ'ল সুলতান নাসিরউদ্দীনের নায়েব হিসাবে শাসন পরিচালনা করার সময় ও তাঁর রাজত্বকালে বন্দেগান-ই-চহেলগাঁওর বা ইলতুৎমিসের চল্লিশজন প্রিয়পাত্র ক্রীতদাসের অধিকাংশের জীবনাবসান হয়েছিল। শের খানের মৃত্যুর পর তাঁর স্বৈরতন্ত্র সম্পূর্ণ নিরংকুশ হয়েছিল। স্বৈরতন্ত্রের সাফল্যের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করারও প্রয়োজন ছিল। তাঁর রাজত্ব কালের কৃতিত্বকে সংক্ষেপে ইলবারী তুর্কী সাম্রাজ্যে সংহতি আনয়নের প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করা চলে।

সুলতান কেন্দ্রের শাসন রাজ্যের সর্বত্র বলবৎ করার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। এইসময় সুলতান বলবন রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা সুলতানী শাসনাধীন অঞ্চলে নিরাপত্তা বিধানে অধিক আগ্রহী ছিলেন। সেইজন্য তিনি সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন ও তাদের বেতন বৃদ্ধি করেন। যোগ্য ও রাজভক্ত সৈন্যাধক্ষ ও সৈনিক, নিয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রে তাদের বেতনের বদলে ইকতা বা ভূমিরাজস্ব দান করা হয়েছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার অসুবিধা সম্পর্কে তিনি শীঘ্র অবহিত হয়েছিলেন। কারণ এইসময় তিনি অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে, সুলতান ইলতুৎমিসের আমলে প্রায় দুইহাজার অশ্বারোহী ইকতা বা বেতনের পরিবর্তে ভূমিরাজস্ব লাভ করেছিল। এদের মধ্যে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল বা অনেকেই বৃদ্ধ ও অশক্ত ছিল। এইসব অশ্বরোহীরা সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিসের আমলে ইকতা লাভ করেছিল বলে শামসী অশ্বারোহী নামে পরিচিত ছিল। সৈন্যবাহিনী থেকে কাজে অবসর গ্রহণ করেও তারা ইকতার অধিকার বেআইনীভাবে দখল করে উপভোগ করেছিল বা তাদের বংশধররা ইকতা উপভোগ করছিল। তাদের এই কাজে সৈন্যবিভাগের (দেওয়ান-ই-আরজ) গোপন সহযোগিতা ছিল। বলবন এইসব ইকতা ক্ষতিপূরণ দিয়ে শামসী অশ্বরোহীদের কাছ থেকে পূর্ণগ্রহণের আদেশ জারি করেছিলেন। শামসী অশ্বরোহীরা এইসময় দিল্লীতে এসে সুলতানের একান্ত প্রিয়পাত্র ফকরউদ্দীন কোতোয়ালকে তাদের হয়ে সুলতানের কাছে আর্জি পেশ করার জন্য আবেদন করেছিলেন। ফকরউদ্দীনের অনুরোধে বলবন তাঁর হুকুমের কিছু রদবদল করেছিলেন। ফলে বৃদ্ধ ও অশক্তদের অবসরকালীন ভাতা এবং বিধবা ও নাবালকদের বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল ও সক্ষমদের সৈন্যবাহিনীতে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। সমকালীন ইতিবৃত্ত থেকে মনে হয় যে, অতঃপর সৈন্যদের নগদেই বেতন দেওয়া হত। কিন্তু 'ইকতা' লাভ করবার পর পুরুষানুক্রমে যারা এই সুবিধা ভোগ করছিল তারা সরকারী অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয়নি।

বারানীর বর্ণনা থেকে দোয়াব, অযোধ্যা ও দিল্লীর উপকণ্ঠে পর্যন্ত অরাজকতা, বিশৃংখলা এবং দস্যু-তস্করের উপদ্রব ও কৃষকদের বিদ্রোহের সম্পর্কে জানা যায়। দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠে মেওয়াটি দস্যুদের অত্যাচার এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, রাজধানীর প্রবেশপথ সন্ধ্যার পর বন্ধ রাখতে হত। কারণ মেওয়াটিরা শহরের প্রান্তের অধিবাসীদের ধনসম্পদ নির্ভয়ে লুটপাট করত ও শহরের শান্তি ভঙ্গ করত। কাটেহারিয়া রাজপুতরা বাদায়ুন ও আমরোহা অঞ্চলের উপর হামলা

* The Foundation of Muslim rule in India, p.138.

www.pathagar.com

শুরু করেছিল। সম্ভবতঃ গঙ্গার তীরের অপর পারে যেসব অঞ্চলে তখনও রাজপুত প্রাধান্য বজায় ছিল সেখানে দক্ষিণ থেকে আগত রাজপুত শাসকগোষ্ঠীর লোকেরা হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিদ্রোহ সংগঠিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিল। অতএব এইসব ঘটনা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল।

বলবন প্রথমে রাজধানীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে অগ্রণী হয়েছিলেন এবং প্রায় এক বৎসরকাল এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে জঙ্গল পরিস্কার করে দস্যু দমনে লিপ্ত ছিলেন। দিল্লীর দক্ষিণপূর্ব প্রবেশপথের দিকে গোপালগিরিতে এই উদ্দেশ্যে দুর্গ নির্মাণ করে আফগান সৈন্য মোতায়েন করা হয়। এইভাবে মেওয়াটি দস্যুদের অত্যাচারের ভীতি থেকে দিল্লীর নাগরিকদের মুক্ত করা হয়েছিল। এরপর সুলতান দোয়াব ও অযোধ্যার প্রতি নজর দিয়েছিলেন। এই অঞ্চলে ভবিষ্যতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সমগ্র এলাকাকে কয়েকটি সামরিক কেন্দ্রে বিভক্ত করা হয় ও জঙ্গল পরিস্কার করে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়। এইসব অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধানের জন্য রাস্তাঘাট ও সৈন্যদের ঘাঁটি নির্মাণের ফলে পথিকদের যাতায়াত নিরাপদ হয়। এই স্থানে দুর্গও নির্মাণ করা হয়। কাম্পিল, পাতিয়ালি (ফারুক্কাবাদ জিলা) ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে গাহড়বাল রাজপুতদের ঘাঁটি ধ্বংস করার জন্য বলবন স্বয়ং অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এইসব স্থানে আফগান সৈন্যদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল ও সুরক্ষিত দুর্গ গঠন করা হয়েছিল। বাদায়ুনে কাটেহারিয়াদের অভ্যুত্থান স্থায়ীভাবে দমন করার জন্য বলবন দ্রুত সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। এইসময় বিদ্রোহ যেসব এলাকায় প্রসারিত হয়েছিল সেখানকার সাবালক পুরুষদের হত্যা করা হয়েছিল ও নারীদের বন্দিনী করা হয়েছিল। পরিকল্পিত ভাবে এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে গিয়াসউদ্দীন বলবন এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা করেছিলেন।

লখনৌতির বিদ্রোহ দমনের জন্য বলবনকে অনুরূপ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। লক্ষ্ণৌতি বা গৌড়কে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী বিদ্রোহের দেশ (বুলঘাকপুর) বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ এখান থেকে দিল্লীর দূরত্ব অনেক বেশী ছিল। যেজন্য 'দিল্লী হনুজ দূর অস্ত', এই চিন্তায় এখানকার লোকেরাও শাসনকর্তাকে বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচনা দিত। সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদের সময় লখনৌতির শাসনকর্তা আরসেলান খান বিনাবাধায় স্বাতন্ত্র ভোগ করেছিলেন। তিনি বিহার পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁর পুত্র তাতার খান উত্তরাধিকারী সূত্রে লখনৌতির শাসনকর্তা হয়েছিলেন। বলবনের প্রতি তিনি আনুগত্য প্রদর্শন করার প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি হাতি ভেট পাঠিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বা তাঁকে শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারিত করে বলবন লখনৌতিতে নিজের বিশ্বস্ত কর্মচারী তুঘরিল খাঁকে এই পদে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু লখনৌতির পরিস্থিতিতে তুঘরিল প্রভাবিত হন। তুঘরিলের সুশাসন ও অপরিমিত দান ধ্যানের জন্য সর্বশ্রেণীর লোকের কাছে তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন। এই সুযোগে তিনি ১২৭৯ সালে সুলতান মুঘিসউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। সুলতান বলবন অযোধ্যার শাসনকর্তা আমিন খানকে লখনৌতির বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু এই অভিযান এবং তৎপরবর্তী আরো দুইটি অভিযানে দিল্লী থেকে প্রেরিত সৈন্যবাহিনী তুঘরিলের হস্তে পরাজয় বরণ করেছিল। তখন সুলতান স্বয়ং বিশাল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে লখনৌতির দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তুঘরিল তাঁর আগমনের বার্তা পেয়ে জাজনগরের দক্ষিণপূর্বদিকে পলায়ন করেছিলেন। সুলতান তার সন্ধানে পূর্ব বাংলা বা (বর্তমান বাংলাদেশে) দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। এইসময় সোনারগাঁওর অধিপতি রায় দনুজের সঙ্গে বলবনের মৈত্রী হয় এবং পূর্বোক্ত রাজা জলপথে তুঘরিলের পলায়নের পথ রোধ করতে সম্মত হয়েছিলেন। এই সময় বলবনের সৈন্যবাহিনীর একদল অকস্মাৎ তুঘরিলের শিবির দেখতে পেয়ে আক্রমণ করেছিল। এই ঘটনায় বিভ্রান্ত তুঘরিল এক অশ্বারোহনে পলায়নের প্রচেষ্টা

www.pathagar.com

করলে মালিক শের আন্দাজ ও মালিক মুকাদ্দর তাঁকে আক্রমণ করে নিহত করেন। এইভাবে লখনৌতির বিদ্রোহ দমন করে সুলতান বলবন তুঘরিলের অনুচরদের এবং দিল্লী থেকে আগত যেসব সৈন্য পূর্বতন অভিযানের সময় তুঘরিলের সঙ্গে যোগদান করেছিল তাদের কঠোর শাস্তিবিধান করেন। সুলতানের মধ্যমপুত্র বুঘরা খাঁ এইসময় লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ

সুলতান ইলতুৎমিসের দুর্বল বংশধরদের রাজত্বকালে উত্তরপশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে সিন্ধু অঞ্চলে এমনকি লাহোর পর্যন্ত মোঙ্গল প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। ১২৪১ সালে লাহোর ও তার আশপাশের অঞ্চল মোঙ্গলদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় ও ১২৪৭ সালের মধ্যে এইসব স্থান মোঙ্গলদের পদানত হয়েছিল। মুলতান ও উচ্-এর উপর দিল্লীর সুলতানরা এইসময় প্রাধান্য হারান। ১২৫৫ সালে মালিক কিসলু খান সিন্ধুপ্রদেশ মোঙ্গলদের হস্তান্তরিত করেন ও ইরানের মোঙ্গল প্রধান হুলাগুখানের আনুগত্য স্বীকার করেন। এছাড়া ইলতুৎমিসের একটি পুত্র জালালউদ্দীন মামুদ মোঙ্গলদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। ১২৫৭ সালে কিসলু খান ও কুতলুঘ খান মোঙ্গলদের আনুগত্য গ্রহণের পরবর্তীকালে দিল্লীর কয়েকজন উলেমার সহায়তায় রাজধানী দখলের প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা বলবনের তৎপরতায় ব্যর্থ হয়। মোঙ্গলদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির জন্য বলবন ১২৫৯ সালে হুলাগুখানের কাছে মৈত্রীর জন্য দূত প্রেরণ করেছিলেন। এর ফলে দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে মোঙ্গলদের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছিল বলে আশা করা যায়। সম্ভবত এই কারণেই সিন্ধুর উত্তরাংশে বলবনের রাজত্বের প্রথমার্ধে সুলতানী শাসনের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। এইসব স্থান সামরিক বিজয়ের ফলশ্রুতিতে বলবনের শাসনাধীন হয়েছিল কিনা এসম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু মোঙ্গলরা পশ্চিম পাঞ্জাবে তাদের প্রাধান্য বজায় রেখেছিল এবং বলবনের সিংহাসন আরোহনের কয়েকবছর পর লাহোরে দিল্লীর সুলতানদের অধিকার বিস্তৃত হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। তিনি লাহোর থেকে মোঙ্গলদের বিতাড়িত করে ভবিষ্যতের আক্রমণ রোধের জন্য উত্তর পশ্চিম সীমান্তে দুর্গ নির্মাণ করেন এবং রাস্তাঘাট সংস্কার করেন। সৈন্যবাহিনী বিশেষ করে অশ্বারোহী বাহিনীকে তিনি ঢেলে সাজান এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিগুলিতে সৈন্য সংস্থাপন করেন। বলবনের সিংহাসনে আরোহনের পর কিছুকাল পর্যন্ত সুলতানের সম্পর্কিত ভ্রাতা শের খান মুলতান ও দিপালপুরের সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন এবং তাঁর প্রভাবে মোঙ্গলরা সীমান্ত অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু শের খানের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি বলবনের চক্ষুশূল হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ সুলতানের নির্দেশেই শের খানকে গোপনে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা হয়।

শের খানের মৃত্যুর পর বলবন উত্তর পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য মুলতান ও দিপালপুর অঞ্চলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা মহম্মদকে শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেন। পূর্বাঞ্চলের ভাতিন্ডা জেলা এবং সুনাম ও সামানা তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁর অধীনস্থ করা হয়। সমগ্র এলাকার প্রধান সেনাপতি রূপে শাহাজাদা মহম্মদের উপর উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উভয় শাহজাদার অধীনে ১৮ হাজার সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য সর্বদা মোঙ্গল হাংগামা রোধের উদ্দেশ্যে তৎপর ছিল। রাজধানী দিল্লীতেও সমসংখ্যক একদল ঘোড়সওয়ার সংরক্ষিত বাহিনী হিসেবে প্রস্তুত ছিল। এইভাবে মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে যখনই উত্তরপশ্চিম সীমান্ত থেকে কোন হানাদার বাহিনী সুলতানী সাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে আক্রমণ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হত তখনই

www.pathagar.com

মুলতান ও দিপালপুরের থেকে শাহজাদা মহম্মদ, ভাতিন্ডা থেকে শাহজাদা বুঘরা খাঁ ও দিল্লী থেকে প্রেরিত বাহিনীর ত্রিভুজ আক্রমণ তাদের বিধ্বস্ত করত। বলবনের রণনীতি উত্তর পশ্চিম সীমান্তকে সুরক্ষিত করেছিল। যদিও লাহোর এইসময় সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শহর বলে গণ্য হত, তৎসত্ত্বেও বলা যায়, মোঙ্গলরা এইযুগে বিতস্তার অপর পারে পদার্পণ করতে সক্ষম হয়নি। কারণ বলবনের প্রবর্তিত ত্রিভুজ আক্রমণের সামরিক পরিকল্পনার সাফল্যের ফলে মোঙ্গলরা বারংবার পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এমনকি তারা বিতস্তার তীরবর্তী অঞ্চল অবধি অগ্রসর হবার হিম্মৎও হারিয়েছিল। বুঘরা খাঁ-কে লখনৌতিতে শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠানোর পর সুনাম-সামানা এলাকার সৈন্যবাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাগে বিভক্ত করে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের অন্যান্য অঞ্চলের মতো শাহজাদা মহম্মদের অধীনস্থ করা হয়েছিল। উত্তর পশ্চিমের সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সময় এতদূর সাফল্য অর্জন করেছিল যে, মোঙ্গলরা অবশেষে সিন্ধুর অপর পারে বিতাড়িত হয়েছিল। মহম্মদ প্রতিবৎসর মোঙ্গল হামলাকারীদের বন্দী করে দিল্লীতে প্রেরণ করতেন।

সীমান্তের এই সাফল্য, লখনৌতির বিদ্রোহ দমনে সাফল্য ও সুলতানী সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃংখলা স্থাপিত হবার ফলে বলবনের রাজত্বের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সূচিত হয়েছিল। কিন্তু ১২৮৬ সালের প্রথম দিকে অকস্মাৎ একটি মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযানে নেতৃত্ব করার সময় শাহজাদা মহম্মদ নিহত হন। সমকালীন ইতিহাসে এইজন্য তিনি খান-ই-শহীদ বা শহীদ রাজকুমার নামে পরিচিত। মহম্মদের মৃত্যুতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়নি এবং মোঙ্গলরা সীমান্তে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু এই দুর্ঘটনা সুলতান বলবনের জীবনে এক মর্মান্তিক আঘাত হেনেছিল। কারণ মহম্মদ ছিলেন বলবনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী এবং সুলতান তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পর্কে অনেক আশা পোষণ করতেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁকে কেউই হাস্য পরিহাস করতে দেখেনি। অত্যল্পকালের মধ্যে সুলতান বলবনের জীবনাবসান হয়।

বলবনের সুলতানী সাম্রাজ্য সুসংহত করার প্রচেষ্টা ও তাঁর নীতির মূল্যায়ন

গিয়াসউদ্দীন বলবন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহনের পর রাজ্যবিস্তারের নীতি পরিত্যাগ করেছিলেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, গোয়ালিয়র, মালব, রাজস্থান প্রভৃতি এলাকায় হিন্দু রাজ্যগুলিকে জয় করা এবং নিয়ন্ত্রণে আনা প্রায় দুঃসাধ্য। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা দৃঢ় করার জন্য এবং মেওয়াটিদের রাজধানীর উপর হামলা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কাটেহার বা রোহিলখন্ড অঞ্চল এবং আমরোহা (উত্তর পশ্চিম প্রদেশ) থেকে বিদ্রোহীদের আক্রমণ ও উৎপাত রোধ করার জন্য এইসময় কঠোর সামরিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। ইলতুৎমিসের আমলে আভ্যন্তরীণ শক্তি স্থাপনের পর রাজ্যবিস্তারের নীতি অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু বলবন এই নীতি অনুসরণ করেননি। কারণ স্বীয় অভিজ্ঞতার থেকে রাষ্ট্রের সাংগঠনিক ভিত্তির দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। দিল্লীতে বংশানুক্রমিক স্বৈরতান্ত্রিক সুলতানী শাসন কায়েম করার পথে প্রচুর বাধা ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধের ফলে বিকেন্দ্রীকরণ শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেন্দ্র ছিল দুর্বল। এই পরিস্থিতিতে নতুনভাবে রাজ্য বিজয় ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল।

হিন্দুদের সশস্ত্র সংগ্রাম ও সীমান্তে মোঙ্গলদের হামলার জন্য সুলতানদের সর্বদাই সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষায় ব্যাপৃত থাকতে হত। মোঙ্গলরা বিতস্তা পর্যন্ত দিল্লীর সাম্রাজ্যের সীমানায় আগ্রাসন চালিয়েছিল। লাহোর পর্যন্ত মোঙ্গলরা বারংবার আক্রমণ করে সুলতানী সাম্রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত করেছিল। এছাড়া মুলতান, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলের উপর মোঙ্গলরা হামলা চালিয়েছিল। এই যুগে

www.pathagar.com

আরেকটি সমস্যা হল মোঙ্গলদের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে হামলার ফলে মধ্য এশিয়ার তুর্কীদের হিন্দুস্তানে আগমন ব্যাহত হয়েছিল। এরজন্য তুর্কীদের মধ্যে থেকে সৈন্যবাহিনী ও শাসকগোষ্ঠীতে সুযোগ্য নয়া সংযোজন ব্যাহত হয়েছিল। হিন্দুস্তানের জনগোষ্ঠীর থেকে বা তুর্কী ছাড়া অন্য কোন বিদেশাগত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে বলবন রাজকার্যে বা উচ্চপদে বিনিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ রাষ্ট্রে তুর্কী জাতির প্রাধান্য তিনি কোনপ্রকারে ক্ষুন্ন হতে দিতে রাজি ছিলেন না।

হাবিবউল্লাহ্ বলেছেন যে, 'To expand his limited man-power and military resources in making additional conquests of dubious value was therefore a course of action whose folly he realised quite early in his reign and explained to those who urged him on to win new territories.' অতএব কোন নতুন রাজ্য জয়ের তিনি বিরোধী ছিলেন। বলবন এক সময় মন্তব্য করেছিলেন যে, 'আমার পক্ষে অন্য দেশ জয় করা ও দখল করা স্বীয় রাজ্যের ক্ষতিসাধন করার নামান্তর মাত্র'। সুলতান তার বক্তব্যকে আরো প্রাঞ্জল করার জন্য বলেছিলেন যে, 'মুসলমানদের সুরক্ষা দান করা (মোঙ্গলদের হাত থেকে) যদি আমার প্রাথমিক দায় না হত তাহলে আমি একদিনও নিজের রাজধানীতে থাকতাম না এবং দূর দূরান্তরের রাণাদের ধনসম্পদ, অশ্ব ও হস্তী লুণ্ঠনের জন্য ও ইসলামের শত্রুদের ধ্বংসের জন্য আমার সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতাম।* বলবন শান্তিপ্রিয় সুলতান ছিলেন না। কিন্তু প্রতিরক্ষার কারণে ও রাজ্যের শক্তি ও সামর্থ সুসংহত করার উদ্দেশ্যে তার সর্বশক্তি নিয়োজিত হয়েছিল। অভ্যন্তরীণভাবে সংহতি সাধনই তাঁর নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। রাজ্যবিস্তার করার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন না। বলবনের এই নীতির মূল কথা ছিল তুর্কী প্রাধান্য সর্ব প্রযত্নে বজায় রাখা।

মামলুক সুলতানী শাসনের প্রাথমিক স্তরে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশে সাম্রাজ্য বিস্তারের মূলে ছিল তুর্কীদের এইসব স্থানে প্রাধান্য স্থাপন। এইযুগে তুর্কী জাত্যাভিমান সাম্রাজ্য বিস্তারের সহায়ক হয়েছিল। জাতিগত ঐক্য সম্পর্কে সচেতনতা বিচ্ছিন্ন তুর্কী গোষ্ঠীগুলিকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও মোঙ্গল আক্রমণকারীদের প্রতিরোধের যুগে শক্তিশালী করেছিল। এইজন্য রাষ্ট্রের চরিত্র ছিল অনেকটা তুর্কী জাতিগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির মতো এবং তুর্কীগোষ্ঠীর বাইরে অন্য যে জাতিই রাজ্যশাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণে সচেষ্ট ছিল তাদের শাসকগোষ্ঠীর বিরোধের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। 'The House of Iltutmish Jealously championed this racialism.'** এই নীতি বেশীকাল বজায় রাখা সম্ভবপর ছিল না। মোঙ্গল আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের জাত্যাভিমান অর্থহীন ও বিপদজনক হয়ে পড়েছিল। করেণ, তুর্কীদের মধ্য এশিয়া থেকে হিন্দুস্তানে আগমনের পথ মোঙ্গল আক্রমণের ফলে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং বহুকাল এদেশে বসবাসের দরুন ও স্থানীয়ভাবে বিবাহের ফলে এবং মেলামেশার জন্য হিন্দুস্তানের ঐতিহ্যের সঙ্গে তুর্কীদের সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। বরং মধ্য এশিয়ার সঙ্গেই তাদের যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া বিদেশ থেকে তুর্কী ব্যতীত অন্যান্য বহু জাতিগোষ্ঠী এদেশে এসেছিল। শেষোক্তরা সংখ্যায় ও যোগ্যতার মানে কোন অংশে তুর্কীদের থেকে হীন ছিল না। এইজন্য যে নীতি ইলতুৎমিসের পক্ষে সহজ ছিল তা বলবনের পক্ষে অনুসরণ করা ছিল সমস্যা সংকুল। এই নীতি অনুসরণ করে বলবন রাষ্ট্রের কার্যকরী ক্ষমতাকে সীমিত করেছিলেন। তাঁর সময় যেসব শক্তি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণে যোগ্যতা অর্জন করেছিল তাদের দমন করে তুর্কীদের প্রাধান্য যেনতেন উপায়ে বজায় রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। ফলে বলবন স্বীয় সাম্রাজ্যের প্রসারকে সীমিত করেছিলেন। এ নীতি মামলুক সুলতানী শাসনের ভবিষ্যতকে

---

* The Foundation of Muslim Rule in India, পৃঃ ১৪৩।

** The Struggle for Empire, পৃঃ ১৫২।

www.pathagar.com

অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দিয়েছিল।

সুলতান বলবনের নীতি কালের অমোঘ নিয়মে স্বাভাবিকভাবে যে পরিবর্তন এসেছিল তাকে অস্বীকার করা জন্য সচেষ্ট ছিল। গিয়াসউদ্দীন বলবন তাঁর অভূতপূর্ব কর্মশক্তি ও মনোবলের জন্য এই জাত্যাভিমান ভিত্তিক রাষ্ট্রকে বজায় রেখে তাঁর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বুনিয়াদ রচনা করেছিলেন। স্বজাত্যাভিমান ও অন্য জাতি অপেক্ষা তুর্কীদের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ সম্পর্কে বলবনের দৃষ্টিভঙ্গীকে তুর্কীদের মনোবৃত্তির প্রতীক বলা যেতে পারে। অতএব বলবনের কাছে সুলতানী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল দমনমূলক নীতির মারফতে বিরোধী শক্তিগুলিকে খর্ব করে রাষ্ট্রে তুর্কী প্রাধান্য বজায় রাখা। এইভবে কালের গতির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বলবন এক অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনকে রুখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রাচীন অভিজাততন্ত্রের অর্থাৎ তুর্কীদের স্থলে খলজী ও অন্যান্যরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল এবং সুলতানী সাম্রাজ্যকে সীমাবদ্ধ রাখার নীতি স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হয়েছিল।

বলবনের জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়পুত্র শাহজাদা মহম্মদ কেবল সুযোগ্য যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি আমির খসরু ও আমির হাসানের ন্যায় লেখক ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খান-ই-শহীদের মৃত্যুর পর বলবন দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে লখনৌতি থেকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে সুলতান বলবন তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে রাজকার্য সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছিলেন। বুঘরা খাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের পূর্বে বলবন তাঁকে রাজসিংহাসনে অধিকারীর অবশ্য কর্তব্যের বিষয় সম্ভবতঃ সচেতন করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু বুঘরা খাঁর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করে সুলতানী সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা ছিল না। এইজন্য তিনি বলবনের অজ্ঞাতসারে দিল্লী ত্যাগ করেন এবং লখনৌতির দিকে রওনা হন। এই পরিস্থিতিতে সুলতান বলবন মৃত্যুশয্যায় (১২৮৭ খ্রীঃ) খান-ই-শহীদের পুত্র কাইখসরুকে সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী মনোনীতি করেছিলেন।

বলবনের উত্তরাধিকারীদের আমলে ইলবারি তুর্কী বংশের পতন

বলবন তুর্কী প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তুর্কী আমিররা ও তাঁর উত্তরসূরীরা এই প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তুর্কী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনকে বাধা দেওয়ার শক্তি তাঁদের ছিল না। জোরজবরদস্তি করে এতকাল যেসব শক্তিকে দমন করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রবল চাপে তুর্কীদের প্রাধান্য বিনষ্ট হয় এবং সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়।

বলবনের মৃত্যুর পর তাঁর শেষ ইচ্ছার প্রতি কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন না করে বলবনের প্রিয়পাত্র ফকরুদ্দীন কোতোয়াল কাইখসরুর বদলে বুঘরা খাঁর পুত্র কাইকোবাদকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কাইখসরুকে শাসনকর্তা রূপে দিল্লী থেকে সুদূর মুলতানে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তাঁর সমর্থক উজীর ও অন্যান্যদের কারারুদ্ধ করে কোতোয়াল ফকরুদ্দীনের গোষ্ঠী নিষ্কন্টক হয়েছিলেন। কোতোয়ালের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নিজামউদ্দীন সুলতান কাইকোবাদের শাসনদন্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান পরামর্শদাতা ও নিয়ামক হয়ে বসেছিলেন। ফকরুদ্দীন তাঁর সঙ্গে খান-ই-শহীদ মহম্মদের ব্যক্তিগত বিরোধের জের টেনে এইভাবে বলবনের শেষ ইচ্ছাপূরণে বাধা দিয়েছিলেন। এছাড়া নিজামউদ্দীনের ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখা ছিল সুলতানের ক্ষমতা সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করা এবং সম্ভব হ'লে অবশেষে কাইকোবাদকে সিংহাসনচ্যুত করাই তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বলে অনেকে অনুমান করেছিলেন।

কাইকোবাদ তাঁর আঠার বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহনের আগে পর্যন্ত পিতামহ বলবনের কঠোর শাসনের ফলে বিলাস ব্যাসনে দিন যাপনের সুযোগ লাভ করেননি। এখন

www.pathagar.com

রাজমুকুট ধারণ করে তিনি বিলাস লালসাময় মদির-মধুর জীবনের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। দিল্লী থেকে কিছুদূরে কিলোখোরির প্রাসাদ নগরীতে যমুনার তীরে সুলতান কাইকোবাদ যখন বিলাস লালসায় মত্ত সেই সময় নিজামউদ্দীন একে একে তাঁর ক্ষমতা দখলের পথে যারা বাধাস্বরূপ হতে পারে তাদের সরিয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট হলেন। কাইখসরুকে মুলতান থেকে সুলতানের নামে ডেকে পাঠিয়ে পথে হত্যা করা হ'ল। এই সময় নিজামউদ্দীনের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের উচ্চরাজপদে নিযুক্ত করা হয় এবং উজীর খাজা খাতিরের ন্যায় রাজভক্তদের পদচ্যুত করা হয়। অতএব নিজামউদ্দীন নামে শহরের দদবক (ম্যাজিস্ট্রেট) হলেও সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। নিজামউদ্দীন যখন কাইকোবাদের অদূরদর্শিতা ও অনভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করে ক্ষমতা দখলের জন্য সচেষ্ট তখন লখনৌতি থেকে বুঘরা খাঁ স্বীয় পুত্রের কল্যাণ কামনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে কাইকোবাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদন করেন। সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যায় পিতা-পুত্রের মিলন হয়। আমির খসরুর লেখা কিরান-উস-সাদায়িনে এইঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করা আছে। দুই পক্ষই সাক্ষাৎকারের পূর্বে সসৈন্যে সরযূর উভয় তীরে উপস্থিতি হয়। প্রথমে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও পরে স্বাভাবিক স্নেহ ও ভালবাসার মধ্যে পিতাপুত্রের মিলনের বর্ণনা খসরুর গ্রন্থে পাওয়া যায়। বঘুরা খাঁ তিনদিন পুত্রের সঙ্গে বাস করার পর লখনৌতি রওনা হন এবং কাইকোবাদ দিল্লীর দিকে যাত্রা করেন।

কাইকোবাদকে বুঘরা খাঁ বিলাসী জীবন ত্যাগ করে রাজকার্যের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে বিদায়কালে নিজামউদ্দীনের মত লোককে সরিয়ে ফেলতে বলেছিলেন। কাইকোবাদ প্রথমে পিতৃবাক্য শিরধার্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেও স্বল্পকালের মধ্যে আবার নারী ও সুরায় আসক্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু একদিন সুরার প্রভাবেই তিনি পিতার দ্বিতীয় উপদেশ স্মরণ করে নিজামউদ্দীনকে মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই হুকুম তামিলে তিনি দ্বিধা প্রকাশ করলে নিজামউদ্দীনকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়।

নিজামউদ্দীনের আকস্মিক মৃত্যুর পরে সুলতান কাইকোবাদ ও তাঁর আমিররা শাসনকার্যে শৃংখলা বজায় রাখতে পারেননি। আমির-ই-হাজিব মালিক কাচ্ছন ও বরবক মালিক সুরখা রাজদরবারে প্রধান হয়েছিলেন। তুর্কী প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য তাঁর তুর্কী গোষ্ঠী বহির্ভূত অন্যান্য প্রভাবশালী আমির ও মালিকদের ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১২৮৯ সালে অসংযমের ফলে কাইকোবাদ পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়েছিলেন। অতএব কাইকোবাদের নাবালক পুত্র কাইমুরসকে সুলতান শামসউদ্দীন উপাধি দিয়ে তুর্কী গোষ্ঠী সিংহাসনে বসান। মালিক কাচ্ছন, মালিক সুরখা ও কোতোয়াল নাবালক সুলতানের প্রতিনিধি পরিষদ (Regency Council) হিসাবে রাজকার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁরা তুর্কী গোষ্ঠীর বিরোধীদের মধ্যে মালিক ফিরোজ খলজীকে অন্যতম বলে গণ্য করতেন এবং তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ধনেপ্রাণে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কাইকোবাদ নিজামউদ্দীনের মৃত্যুর পর প্রাক্তন সর-ই-জান্দার ফিরোজ খলজীকে সামানার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। সৈন্যবাহিনীর প্রধান (আরিজ-ই-মামালিক) ও খলজী গোষ্ঠীর প্রধান হিসাবেও তাঁর শক্তিবৃদ্ধি পেয়েছিল। খলজীরা মোঙ্গলদের অভ্যুত্থানের পূর্বে তুর্কীস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে বাস করত। বহুকাল তুর্কীস্তান ছেড়ে আসার দরুণ ও পূর্ব আফগানিস্থানে বসবাসকারী আফগানদের সান্নিধ্যে এবং আফগানিস্থানের পুস্তু ভাষাভাষী গোষ্ঠীদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হবার জন্য তারা আফগানদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু গজনীর মামুদ ও পরে মহম্মদ ঘোরীর সৈন্যবাহিনীতে সামিল হয়ে তাঁরা হিন্দুস্তানে এসেছিল।

তুর্কী গোষ্ঠী ফিরোজ খলজীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এই খবর পেয়ে খলজী মালিক দিল্লীর নিকটবর্তী বাহারপুরে তাঁর সদর দপ্তর স্থানান্তরিত করেন। এইখানে সুলতানের নামে পরোয়ানা নিয়ে মালিক কাচ্ছন ফিরোজ খলজীকে আহ্বান করতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মূলতঃ মালিক কাচ্ছনের উদ্দেশ্য ছিল খলজী নেতার প্রাণনাশ করা। কিন্তু তুর্কী মালিকদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ফিরোজ খলজী আগেই জানতে পেরেছিলেন। অতএব তিনি এইসময় সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনে ব্যাপৃত এই অজুহাতে দেরী করতে থাকেন এবং মালিক কাচ্ছনের অসাবধানতার সুযোগে তাঁকে হত্যা করেন।

অতঃপর খলজীরা বালক সুলতানকে ও কোতোয়াল ফক্‌রুদ্দীনের দুই পুত্রকে অপহরণ করে তাদের সদর দপ্তরে নিয়ে এসেছিল। এই অপহরণের সময় তুর্কী গোষ্ঠীর সমর্থকরা বাধাদান করতে এসে অনেকেই নিহত হয়েছিলেন। দিল্লীতে আপামর জনসাধারণ বালক সুলতানের অপহরণে ক্ষুব্ধ হয়ে সমবেতভাবে খলজীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাদের সদর দপ্তর থেকে সুলতান শামসউদ্দীনকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে বাদায়ুন দরওয়াজায় সমবেত হয়েছিল। কিন্তু কোতোয়াল ফক্‌রুউদ্দীন স্বীয় পুত্রদের খলজীদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য দিল্লীর নাগরিকরা এই কাজ থেকে বিরত করেছিলেন।

পরবর্তীকালে সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী তিনমাস রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। তারপরে ফিরোজ খলজী নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু খলজীদের প্রতি দিল্লীর জনসাধারণের বিরূপ মনোভাবের জন্য জালালউদ্দীন খলজী কিছুকাল কিলোখোরিতে থেকে রাজ্যশাসন পরিচালনা করেছিলেন। ইতিপূর্বে কিলোখোরির প্রাসাদে পক্ষাঘাতগ্রস্ত কাইকোবাদকে হত্যা করার জন্য ফিরোজ খলজীর প্রেরিত একজন আততায়ী পক্ষাঘাতগ্রস্ত কাইকোবাদকে মাদুরে জড়িয়ে যমুনার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এইভাবে দিল্লীতে ইলবারী তুর্কী বংশের শাসনের অবসান হয় এবং খলজী বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। *

---

* বারাণী, তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৭২, ইসেমীর ফুত-উস-সালা-তিন, পৃঃ-২০০; এবং History of the Khaljis-K.S.Lal, পৃঃ ৭-৮ ও ১১-১৬ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

খলজী সাম্রাজ্যবাদ

খলজী বিপ্লব

সুলতান জালালউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১২৯০ সালের জুন মাসে ইলবারী তুর্কী বংশের স্থলে খলজী শাসনের পত্তন করে খলজী বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিলেন। ইলতুৎমিসের উত্তরসূরীদের রাজত্বকালে বন্দেগান-ই-চহেলগাঁও বা ইলতুৎমিসের প্রিয়পাত্র শক্তিশালী ক্রীতদাস গোষ্ঠী দুর্বল সিংহাসনের অধিকারীদের ইচ্ছামত পরিচালনা করতেন। এইসব অভিজাত গোষ্ঠীদের মধ্যে ছিলেন তুর্কী অভিজাতরা ও ইলতুৎমিসের প্রিয়পাত্র তুর্কী ক্রীতদাসরা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খলজীরা এদের সহযোগী ছিলেন। বলবনের সিংহাসন লাভের পর থেকে তাজিক বা বিদেশাগত পারসিক ভাষাভাষী অভিজাতরা ও মোঙ্গল আক্রমণের ফলে হিন্দুস্তানে আগত শরণার্থীরা এবং অন্যান্য অভিজাতরা ও ভারতীয় মুসলমানরা রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। একমাত্র বিশুদ্ধ তুর্কী রক্ত যাঁদের ধমনীতে প্রবাহিত তারা ছাড়া অন্য কোন গোষ্ঠীর ব্যক্তিকে বলবন উচ্চরাজকার্যে নিযুক্ত করতেন না। অতএব গিয়াসুদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে ও তৎপরবর্তী কালে (১২৮৯-৯০ খ্রীঃ) তুর্কীদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য অন্যান্য সকল গোষ্ঠীকে ক্ষমতালাভে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এর ফলে তুর্কী শাসন উত্তরভারতের একাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ বলবন সীমিত এলাকায় তুর্কী প্রাধান্য বজায় রাখাকে শ্রেয় বলে মনে করতেন। ১২৯০ সালে খলজীরা দিল্লীতে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তাদের ভুইফোঁড় বলা যায় না। কারণ তাঁরা প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীর অংশ বিশেষের প্রতিনিধি ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।*

ডঃ কে. এস. লাল তাঁর History of the Khalji's-এ মন্তব্য করেছেন যে, খলজীদের ক্ষমতা দখলের ফলে কেবলমাত্র একটি নতুন সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠা হয়নি, এর ফলে অবিরত রাজ্যজয় ও সাম্রাজ্য বিস্তার, শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নব নব অভিজ্ঞতার সূত্রপাত হয়েছে। এযুগে সাহিত্যের জগতেও নয়া উদ্ভাবনী প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে।

ইতিপূর্বে ইলবারী তুর্কী ছাড়া অন্য কেউ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করার সৌভাগ্য লাভ করেনি। খলজীদের ক্ষমতালাভের ফলে যারা কেবলমাত্র ঘোর ও গজনীর প্রতি অনুরক্ত তাদের স্থলে যাদের সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য দিল্লীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তাদের ক্ষমতালাভের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। তুর্কীরা সর্বদা জাত্যাভিমানের গর্বে ভারতীয় বা হিন্দুস্তানীদের এবং তাজিক ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী যারা বিশুদ্ধ তুর্কী-রক্তের উত্তরাধিকার দাবি করতে পারত না, সকলকেই রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করে আসছিল। জালালউদ্দীন ফিরোজের সিংহাসনে আরোহনের ফলে তুর্কীদের একচেটিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যুগের অবসান হল। খলজীদের ক্ষমতা লাভের পর মুষ্টিমেয় তুর্কী গোষ্ঠীর রাজানুগ্রহ লাভে পুষ্ট হয়ে এতকাল যে প্রাধান্য উপভোগ করে আসছিল তার অবসান হল। জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী পূর্বতন

* এ সম্পর্কে ইরফান হাবিবের প্রবন্ধ 'Formation of the Sultanate Ruling caste of the 13th Century' দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সুলতানী বংশের প্রতিনিধি ও বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক চাজ্জুকে কারা-মানিকপুরের ইকতার শাসনভার দিয়েছিলেন। ফকরুদ্দীন কোটয়াল তাঁর পূর্বতন পদে বহাল রইলেন। খাজা খাতির বলবনের আমলে এবং কাইকোবাদের সময় উজীর ছিলেন এবং তাঁকে সেই পদ থেকে সরানো হয়নি। কিন্তু সুলতান জালালউদ্দীন খলজীর আমলে ইলবারী তুর্কীদের প্রাধান্যের অবসান হওয়াতে তাজিক, হিন্দুস্তানী, খলজীদের ও অন্যান্যদের রাজকার্যে উচ্চপদে নিয়োগের পথে বাধা অপসারিত হয়েছিল।

এই খলজীরা মূলতঃ ছিলেন তুর্কী জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আফগানিস্থানে খলজ নামক স্থানে হেলমুণ্ড নদীর পার্শ্বস্থ উভয় তীরে বহুকাল বসবাস করার ফলে তাদের রীতি ও আচার অনেকটা আফগানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ছিল। মামুদ গজনীর ও মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের সময় যেসব তুর্কী গোষ্ঠী তাদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন খলজীরা তাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ইলবারী তুর্কীদের রাজত্বকালে খলজীরা রাজকার্যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ করেনি। কারণ বলবনের ন্যায় জাত্যাভিমানী শাসকরা খলজীদের বিশুদ্ধ তুর্কী গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে গণ্য করতেন না। ডঃ কে. এস. লাল মন্তব্য করেছেন যে, খলজীদের রাজ্যলাভে প্রজাসাধারণের বিশেষ কোন পরিবর্তন হিসেবে দেখেননি কারণ— 'A change of dynasty was not a new thing to the Indian people'। কিন্তু জিয়াউদ্দীন বারানী লিখিত সমকালীন ইতিহাস তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী থেকে জানা যায় যে, কাইকোবাদের নাবালক পুত্র সুলতান শামসউদ্দীনরা কাইমুরসকে খলজীদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য দিল্লীর নাগরিকরা বাদুয়ুন দরওয়াজায় সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা খলজীদের সদর দপ্তর বাহারপুর (দিল্লী থেকে ৫/৬ মাইল দূরে অবস্থিত) থেকে নাবালক সুলতানকে উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কোতোয়াল ফকরুদ্দীন বহুকষ্টে তাঁদের এই কাজ থেকে বিরত করেন। ফকরুদ্দীনের দুইটি পুত্রকেও খলজীরা অপহরণ করেছিল। অতএব তিনি খলজী-বিরোধী অভ্যুত্থান থেকে জনগণকে নিবৃত্ত করেছিলেন।

দিল্লীর জনগণ কিন্তু বহুদিন খলজীদের প্রতি বিতস্পৃহ ভাব বজায় রেখেছিলেন। এই কারণে জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী সিংহাসন লাভের পর কিছুকাল কিলোখোরিকেই তাঁর সদর দপ্তরে পরিণত করেছিলেন। কাইকোবাদের প্রমোদ প্রাসাদ ক্রমেই খলজী শাসনের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করেছিল এবং বহু আমির-ওমরাহ ও ধনী ব্যক্তি খলজী শাসনের শুরুতেই এখানে এসে বসবাস করতে থাকেন। ফলে এখানে একটি নতুন শহর গড়ে উঠেছিল। জালালউদ্দীন খলজী তাঁর উদারতা ও দানধ্যানের দ্বারা জনগণের মধ্যে খলজী শাসনের ভিত সুদৃঢ় করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। কালক্রমেই সুলতান জালালউদ্দীনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় ও তিনি বিনা দ্বিধায় রাজধানী দিল্লীতে পদার্পণ করেছিলেন। অতএব খলজীদের ক্ষমতালাভ ও ইলবারী তুর্কী বংশের অবসানের সময় জনগণ অতিসহজে পূর্বতন বংশের প্রতি আনুগত্য বিস্মৃত হয়ে খলজী শাসনকে স্বীকৃতিদান করেছিলেন, এই দাবি মেনে নেওয়া যায় না।

খলজীরা নির্বাচন বা ষড়যন্ত্রের মারফতে নয়, শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায় খলজী শাসকরা রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ থেকে দিল্লীর সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন। ধর্মীয় প্রভাব বা উলেমাদের নির্দেশকে খলজী শাসকগণ রাজ্য পরিচালনায় গুরুত্বদান করেননি। ভারতে তুর্কী বিজয়ের পরবর্তী যুগে খলজী শাসন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বিশেষতঃ সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালে হিন্দুস্তানের অধিকাংশ এলাকাকে দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখা যায়। আলাউদ্দীন সর্বপ্রথম দেশের সুদূর দক্ষিণে স্বীয় বিজয়কেতন

www.pathagar.com

উড়িয়েছিলেন। উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল খলজীরা জয় করেছিলেন এবং মোঙ্গল আক্রমণকারীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত করার জন্য এইসময় যেসব আর্থিক, সামাজিক ও সামরিক সংস্কার প্রবর্তিত হয় তাতে সাম্রাজ্যের পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছিল। বিশেষতঃ সুলতান আলাউদ্দীন তাঁর সংস্কারগুলিতে যেরূপ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা অশ্রুতপূর্ব। তাঁর অর্থনৈতিক ও রাজস্ব বিষয়ক সংস্কার, মূল্যনিয়ন্ত্রণ বিধি ও সামরিক সংস্কারগুলি মোঙ্গল আক্রমণের ফলে যে জরুরী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রবর্তিত হয়েছিল। আলাউদ্দীন প্রবর্তিত সংস্কারগুলির স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি ও কঠোরতা এবং স্থায়িত্বের অভাবের জন্য অনেকে সমালোচনা করেন। কিন্তু মোঙ্গলদের বিতাড়িত করে হিন্দুস্তানকে বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর নীতি যে সাফল্য অর্জন করেছিল এসম্পর্কে সন্দেহ নাই। খলজী বিপ্লবের ফলে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করেছিল ও প্রসারিত হয়েছিল। সাহিত্যে ও শিল্পের ক্ষেত্রে এক নয়া সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। যার উজ্জ্বলতম নিদর্শন পাওয়া যায় শেখ নিজামউদ্দীন আওলিয়ার ন্যায় সুফী সাধকদের সাধনায় ও আমির হাসান এবং সর্বোপরি আমির খসরুর লেখনীতে।

সুলতান জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী (১২৯০-১২৯৬ খ্রীঃ)

সুলতান জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী ১২৯০ সালে সত্তর বছর বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। তৎকালীন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান জালালউদ্দীনের নরমপন্থী নীতি একেবারেই অচল ছিল বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। জালালউদ্দীন খলজীর এই নরমপন্থী নীতি কতকটা বয়োঃবৃদ্ধির কারণে ও অনেক সময় শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য এবং অকারণে রক্তপাতের বিরোধী হওয়ার দরুন গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু খলজীদের মধ্যে যাঁরা উগ্রপন্থী ছিলেন তাঁরা সুলতানের এই নরমপন্থী নীতি ও অতিরিক্ত উদার মনোভাব অপছন্দ করতেন।

সম্ভবতঃ জালালউদ্দীন খলজী স্বীয় শাসনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অকারণে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের বিরোধী ছিলেন। সিংহাসনে আরোহনের পর কিছুকাল তিনি দিল্লীর প্রজাসাধারণের খলজীদের প্রতি বিতৃষ্ণার জন্য এই শহরে প্রবেশ করেননি এবং কিলখোরিকে তাঁর সদর দপ্তরে পরিণত করেছিলেন। দানধ্যান ও উদারতার মারফতে সুলতান জালালউদ্দীন লোকের মন জয় করতে সচেষ্ট হন। অতঃপর যখন তিনি রাজধানীতে পদার্পণ করেছিলেন তখন জালালউদ্দীন সর্বপ্রথম বলবনের প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হয়ে স্বীয় পাদুকা খুলে প্রসাদের অভ্যন্তরে পদার্পণ করেছিলেন। বলবনের সিংহাসনের সামনে আমির হিসাবে ইতিপূর্বে জালালউদ্দীন যেভাবে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনকে সম্মান প্রদর্শন করতেন সেকথা তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। জালালউদ্দীন এমন কথাও বলেছিলেন যে, সুলতান বলবনের ভীতি তাঁর মন থেকে যায়নি। এইসব বক্তব্য জালালউদ্দীনের খলজীর অনুচরদের বিশেষতঃ তরুণদের তাঁর প্রতি বিরূপ করেছিল। এই সময় জালালউদ্দীনের হিতাকাংখী আহমদ চাপের ন্যায় উচ্চপদাধিকারীরা সুলতানকে সিংহাসনে আরোহন করে রাজদণ্ড ধারণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। জালালউদ্দীন এই ধরনের বিনয়ের মূলে ছিল তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত সুলতানী বংশের স্থায়িত্ব সম্পর্কে উদ্বেগ। বলবনের বংশের ক্ষণভঙ্গুরতা তাঁর মনে এই ভাবনার সৃষ্টি করেছিল একথা জালালউদ্দীন স্বীকার করেছিলেন।

বলবনের সম্পর্কে প্রজাসাধারণের মনে আনুগত্য যে নিঃশেষিত হয়নি তা প্রমাণিত হ'ল অতি অল্পকালের মধ্যেই। বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক চাজ্জু খলজী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে বারানীর ভাষায়, দলে দলে পাইক হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে পিঁপড়ের সারির মত

www.pathagar.com

তাঁর সঙ্গে যোগদান করার জন্য এসেছিল। মালিক চাজ্জুর বিদ্রোহ অতি সহজেই দমন করা সম্ভব হয়েছিল এবং তাঁকে সুলতানের কাছে বন্দী করে পাঠান হয়েছিল। সুলতান জালালউদ্দীন, চাজ্জু ও তাঁর অনুচরদের, শাস্তিদান করেননি বরং সাদরে বিদ্রোহীদের মুক্তিদান করেছিলেন। এই ধরনের উদারতা তরুণ খলজীদের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিল এবং আমির ওমরাহদের মধ্যে ভবিষ্যতে বিদ্রোহের বীজ উপ্ত করেছিল। বিদ্রোহীদের প্রতি এই অনুকম্পার কারণ সম্পর্কে সুলতানকে জিজ্ঞাসা করলে জালালউদ্দীন মন্তব্য করেছিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সে তিনি মুসলমানের রক্তপাতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। এই বিদ্রোহ দমনের পর জালালউদ্দীন স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীনকে কারা-মানিকপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। কেবলমাত্র চাজ্জুর ক্ষেত্রেই নয় সুলতান জালালউদ্দীন অন্যান্য বিদ্রোহীদেরও কঠোর শাস্তিদানের পক্ষপাতী ছিলেন না। সেইজন্য দিল্লীর আশপাশের প্রায় একহাজার ঠগীকে গ্রেপ্তার করে সুলতানের আদেশে তাদের সুদূর বঙ্গদেশে নির্বাসিত করা হয়েছিল। এইরূপ উদারতায় বিক্ষুব্ধ তরুণ খলজীরা সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করার কথা চিন্তা করেন। আবার ইলবারীদের পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত থাকার সন্দেহে সুলতান জালালউদ্দীন সিদি মৌলা নামে একজন দরবেশকে গ্রেপ্তার করেছিলেন।

সিদি মৌলা প্রসিদ্ধ সূফী দরবেশে শেখ ফরিদউদ্দীন গঞ্জ-ই শক্করের শিষ্য ছিলেন। দিল্লীতে আশ্রম বা খানকাহ স্থাপনের পূর্বে সিদি মৌলাকে শেখ ফরিদ রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লীতে তাঁর খানকা হতে বহুলোকের যাতায়াত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সুলতান জালালউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র খান-ই-খানা তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্ভবতঃ খান-ই-খানের আর্থিক সাহায্যে সিদি মৌলার ও তাঁর অনুগামীদের ব্যয় নির্বাহ হত। বলবনের যুগের কোতোয়ালির উচ্চপদস্থ কিছু কর্মচারী, আমির ও মালিক সিদি মৌলাকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে অনেকে সন্দেহ করেন। এইসব সন্দেহের মূলে ছিল সিদি মৌলার সম্পর্কে নানা রটনা এবং শুক্রবারের মসজিদের নামাজে তাঁর অনুপস্থিতি। সিদি মৌলার সঙ্গে প্রাক্তন সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদের এক কন্যার বিবাহ দিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বসানোর প্রচেষ্টা চলেছে এই অভিযোগে সিদি মৌলা ও তাঁর প্রধান সমর্থকদের সুলতান জালালউদ্দীন গ্রেপ্তার করেছিলেন। কিন্তু অভিযুক্তরা কেহই এই ধরনের ষড়যন্ত্রের মারফতে সুলতান জালালউদ্দীনকে হত্যা করার ও সিদি মৌলার সিংহাসনে আরোহনের উচ্চাকাংখার কথা স্বীকার করেননি। তৎসত্ত্বেও সিদি মৌলার অনুচরদের প্রত্যেককে অল্পবিস্তর শাস্তিদান করা হয়েছিল। সিদি মৌলার প্রতি অন্যান্যদের অপেক্ষা অনেক বেশী নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়। কারণ জালালউদ্দীন তাঁর কাছ থেকে কোনপ্রকার স্বীকৃতি আদায়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন ফলে সুলতানের উপস্থিতিতেই প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন দরবেশ সিদি মৌলাকে ক্ষুর দিয়ে আঘাত করেছিলেন এবং সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র আরকালি খানের ইসারায় একজন মাহুত তার হাতির পায়ের নিচে আহত এই সূফী দরবেশকে পিষে মেরে ফেলেছিল। জিয়াউদ্দীন বারনী বলেছেন যে, এই ঘটনার পর বহু অশুভ প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল এবং ধূলার ঝড়, দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির ফলে বহুলোকের জীবনহানি হয়েছিল। সিদি মৌলার ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুলতান জালালউদ্দীনের নরমপন্থী নীতির উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সিংহাসনকে ভবিষ্যতের খলজী উত্তরসূরীদের জন্য সুরক্ষিত করা। মালিক চাজ্জুর বিদ্রোহদমন কঠোর হস্তে করে তিনি বহুকষ্টে অর্জিত জনপ্রিয়তা হারাতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁর অনুসৃত নীতি দেখে মনে হয় তিনি খলজীদের শক্তি সংহত করতে চেয়েছিলেন। সিদি মৌলাকে কেন্দ্র করে বলবনের সমর্থকদের যোগসাজস আছে সন্দেহে তাঁর খানকাহ ভেঙে দিয়ে জালালউদ্দীন প্রাক্তন ইলবারী শাসকদের অনুচরদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টায় সুলতান জালালউদ্দীন সরাসরি কোন

www.pathagar.com

পদক্ষেপ বলবনের সমর্থকদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করে জনপ্রিয়তা হারাবার ভয় নাই বলে অনুমান করেছিলেন। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সিদি মৌলার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন ছিল কিন্তু সিদি মৌলার থেকে এই স্বীকৃতি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে সুলতান ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এছাড়া আরকালি খান সিদি মৌলার শত্রু ছিলেন কারণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই দরবেশের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অতএব সিদি মৌলার মৃত্যু কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এই ঘটনা তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের জটিলতার ফলশ্রুতি মাত্র।

সুলতান জালালউদ্দীনের বৈদেশিক নীতি এই একই কারণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। রন্থাম্ভর অবরোধ করে এই প্রসিদ্ধ দুর্গটি পদানত করার উদ্দেশ্যে সুলতান অভিযান করেছিলেন। কিন্তু এই দুর্গ জয় করতে হলে বহু মুসলমানের জীবননাশ হবে, এই আশঙ্কায় রন্থাম্ভর অবরোধ পরিত্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু রন্থাম্ভর অভিযানের সময় ঝায়িন দুর্গ দিল্লী বাহিনীর পদানত হয়েছিল। ১২৯২ সালে হুলাগু খানের পৌত্রের নেতৃত্বে একদল মোঙ্গল আক্রমণ করে সুনাম পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। জালালউদ্দীন এই মোঙ্গলবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু সুলতান ভবিষ্যতে মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনাকে বন্ধ করার জন্য তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। চেঙ্গিজের একজন বংশধর উলুঘ খাঁ ও তাঁর অনুচররা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে নবমুসলমান নামে পরিচিত হয়েছিলেন। হিন্দুস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে নব মুসলমানরা দিল্লীর উপকণ্ঠে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে এই নবমুসলমানদের বিদ্রোহ বারংবার কঠোর হস্তে দমন করা হয়। সুলতান জালালউদ্দীনের রাজত্বকালে মাণ্ডোর দিল্লীর পদানত হয়েছিল।

আলাউদ্দীনের দেবগিরি লুণ্ঠন

সুলতান জালালউদ্দীনের রাজত্বকালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা কারা ও মানিকপুরের শাসনকর্তা সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীন কর্তৃক যাদবদের রাজধানী দেবগিরি আক্রমণ ও লুণ্ঠন। ১২৯৩ সালে সুলতানের অনুমোদন নিয়ে আলাউদ্দীন ভিলসা আক্রমণ করে লুণ্ঠন করেছিলেন। এরপর আলাউদ্দীন সুলতানের অনুমোদন নিয়ে চান্দেরী অভিযান করার জন্য একদল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। এইসময় কারা ও মানিকপুরে জালালউদ্দীন বিরোধী অভিজাতরা আলাউদ্দীনের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। আলাউদ্দীন মালিকা-ই-জাহান বা জালালউদ্দীনের বেগমের দুর্ব্যাবহারে ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং স্বীয় উচ্চাকাংখাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য তিনি পিতৃব্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। আলাউদ্দীনের উদ্দেশ্য ছিল চান্দেরী আক্রমণের অজুহাতে দেবগিরি লুণ্ঠন করা। ১২৯৬ সালে এই উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণে অভিযান করেন এবং অকস্মাৎ ইলিচপুরের পথে আলাউদ্দীন দেবগিরি আক্রমণ করেন। এই সময় দেবগিরি অধিপতি রামচন্দ্রদেবের মূল সৈন্যবাহিনী রাজকুমার সিংঘনের নেতৃত্বে বরঙ্গলে প্রেরিত হয়েছিল। অতএব রামচন্দ্রদেব প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে আলাউদ্দীনের সঙ্গে সন্ধি করেন। আলাউদ্দীন যখন ফেরার উদ্যোগ করছেন সেই সময় সিংঘন তাঁর বরঙ্গল অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন এবং রামচন্দ্রদেবের অভিমতের বিরুদ্ধে সিংঘন দিল্লীর সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে আলাউদ্দীনের বাহিনীর পরাজয় যখন সুনিশ্চিত তখন আক্রমণকারীদের যে অংশ দেবগিরি অবরোধে নিযুক্ত ছিল তারা নিজেদের মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। এই ঘটনায় মারাঠা বাহিনী দিল্লী থেকে নতুন সৈন্যদল দেবগিরিব বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছে বলে অনুমান করেছিল। ফলে দেবগিরির সৈন্যবাহিনী সহজেই পরাজয় বরণ করে এবং রামচন্দ্রদেব পুনরায় প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিয়ে সন্ধি করেছিলেন।

www.pathagar.com

আলাউদ্দীনের দেবগিরি অভিযান মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারা ও মানিকপুরের শাসনকর্তা হিসাবে তিনি একক প্রচেষ্টায় দিল্লীর খলজী সাম্রাজ্যের প্রাধান্য দক্ষিণে সর্বপ্রথম বিস্তার করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কারা ও মানিকপুরে তাঁর প্রতিনিধি আলা উলমুলুক (ঐতিহাসিক বারানীর পিতৃব্য) সুলতান জালালউদ্দীনের সকল অনুসন্ধানের উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, আলাউদ্দীন রাজ্যের বিদ্রোহী প্রজাদের দমনে ব্যাপৃত আছেন। ১২৯৬ সালে সুলতান গোয়ালিয়রে সসৈন্যে উপস্থিত হবার পর আলাউদ্দীনের দেবগিরি অভিযান সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। 'আলাউদ্দীনের দেবগিরি অভিযান ও লুণ্ঠন এবং তৎপরবর্তীকালে লুণ্ঠিত ধনরত্ন থেকে সুলতানের খাজাঞ্চিখানায় প্রাপ্য অংশ প্রেরণে ব্যর্থতা মুসলিম আইনের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় অপরাধ। এই সময় আলাউদ্দীন নানা বাহানায় সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। এমনকি তিনি লখনৌতিতে আশ্রয়গ্রহণ করে বা আত্মহত্যা করে সুলতানের ক্রোধের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। অবশেষে সুলতান তাঁর বিশ্বস্ত আমির ওমরাহদের নিয়ে সসৈন্যে কারা অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। এই সংবাদে আলাউদ্দীন বিচলিত হয়ে তাঁর সৈন্য ও ধনরত্নসহ গঙ্গার অপরপারে মানিকপুরে তাঁবু ফেলে সুলতানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন এবং স্বীয় ভ্রাতা আলমাস বেগকে সুলতান জালালউদ্দীনকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আলমাস বেগ সুলতানকে বলেন যে, সসৈন্যে এমনকি দেহরক্ষী নিয়েও যদি জালালউদ্দীন স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্রর সঙ্গে মানিকপুরে সাক্ষাৎ করতে যান তাতে আলাউদ্দীন ভয় পেয়ে যাবেন। এইসময় জালালউদ্দীনের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। সম্ভবত স্নেহে অন্ধ হয়ে এবং দেবগিরি লুণ্ঠিত ধনদৌলতের আকর্ষণে তিনি আলমাস বেগের এইসব কথায় আস্থা স্থাপন করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিরস্ত্র অনুচরসহ নৌকাযোগে গঙ্গার অপরপারে ভ্রাতুস্পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। আলাউদ্দীন সসৈন্যে এইখানে সুলতানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং সুলতান গঙ্গার তীরে আলাউদ্দীনকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করার সঙ্গে সঙ্গে একজন ঘাতক তাঁকে পূর্ব নির্দেশ মত ছুরিকাঘাত করেছিল। আর্তচীৎকার করে জালালউদ্দীন তীরের দিকে দৌড় দিলে পশ্চাৎ থেকে একজন তাঁর শিরচ্ছেদ করে ছিল। পরে বর্ষাফলকে জালালউদ্দীনের কর্তিত মুণ্ড স্থাপন করে আলাউদ্দীন সদর্পে দিল্লীর দিকে রওনা হয়েছিলেন। ১২৯৬ সালে এইরূপ দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে জালালউদ্দীনের রাজত্বকালের অবসান হয়েছিল। দিল্লীতে মালিকা-ই-জাহান স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র কাদের খানকে সুলতান রুকনউদ্দীন ইব্রাহিম উপাধিতে ভূষিত করে অভিষিক্ত করেছিলেন। দিল্লীর সিংহাসন খালি রাখা বাঞ্ছনীয় নয় বলে মালিকা-ই-জাহান মুলতানের শাসনকর্তা সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র আরকালি খানের দাবিকে উপেক্ষা করেন। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে আরকালি খান দিল্লীতে দ্রুত উপস্থিত হয়ে আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হননি। ফলে আলাউদ্দীনেরই সুবিধা হয়েছিল। তিনি তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান অনুচরদের নিয়ে দেবগিরি লুণ্ঠিত অর্থ উদার হস্তে বিতরণ করতে করতে দিল্লীর দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। অনেক জালালী অভিজাত তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন। রুকনউদ্দীন যখন সসৈন্যে আলাউদ্দীনের সঙ্গে সংগ্রামে অগ্রসর হলেন তখন তাঁর সৈন্যবাহিনীর বামপার্শ্বস্থিত সৈন্যরা শত্রুপক্ষের সাথে হাত মিলিয়েছিল। ফলে রুকনউদ্দীন, মালিকা-ই-জাহান, আহমদ চাপ ও অন্যান্য বিশ্বস্ত জালালউদ্দীনের অনুচররা মুলতানে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এখানে গিয়েও তাঁরা নিস্তার পাননি। আলাউদ্দীনের সৈন্যবাহিনী মুলতান অবরোধ করে দখল করেছিল এবং মালিকা-ই-জাহান, আরকালি খান, রুকনউদ্দীন এবং আহমদ চাপ সহ জালালউদ্দীনের বিশ্বস্ত সকল আমিরদের বন্দী করে দিল্লী প্রেরণ করেছিল। মালিকা-ই-জাহান সারাজীবন বন্দীদশায় কাটিয়েছিলেন এবং তাঁর দুইপুত্রের প্রাণদণ্ড হয়েছিল। জালালউদ্দীনের

www.pathagar.com

বিশ্বস্ত অনুচরদের কঠোর শাস্তিদান করা হয়েছিল আবার যারা প্রাক্তন সুলতানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তারাও আলাউদ্দীনের শাস্তির হাত থেকে নিস্তার লাভ করেন নি।

সুলতান আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ)

সুলতান আলাউদ্দীন খলজী তাঁর সহযোগীদের মধ্যে উপাধি বিতরণ করেন এবং তাদের নানাভাবে পুরস্কৃত করেন। এইজন্য আলমাস বেগকে উলুঘ খান উপাধি দেওয়া হয়েছিল; হিজাবরউদ্দীনকে জাফর খান উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল, মালিক সঞ্জুর আলপ খান উপাধি ও মালিক নসরৎ, নসরৎ খান এই উপাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু নসরৎ খান উজীর হিসাবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে তাঁকে কারাতে বদলী করা হয় এবং শেষোক্ত স্থান থেকে আলা-উল-মূলককে দিল্লীতে এনে রাজধানীর কোতোয়াল হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

আলাউদ্দীনের রাজত্বের শুরুতে বৈদেশিক সংকট-মোঙ্গল আক্রমণ

রাজত্বের শুরুতে আলাউদ্দীনকে কতকগুলি আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সংকটের সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল। এইসব সংকটের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাঁর রাজ্যের সীমানায় বারংবার মোঙ্গল আক্রমণ। ট্রান্সঅক্সিয়ানার মোঙ্গল শাসকরা এই সময় বহুবার হিন্দুস্থানের সীমানায় হামলা করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ধনরত্ন লুণ্ঠন এবং সম্ভব হলে রাজধানী দিল্লীকে পদানত করা। আলাউদ্দীনের রাজত্বের প্রথম দিকে কাদারের নেতৃত্বে মোঙ্গল পাঞ্জাবে হামলা করেছিল। এই মোঙ্গল আক্রমণকারীরা লাহোরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। আলাউদ্দিনের সেনাপতি উলুঘ খান ও জাফর খান তাদের জলন্ধরের কাছে যুদ্ধে পরাজিত করে হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। এই যুদ্ধে বহু মোঙ্গল হামলাকারী নিহত হয় (১২৯৭)। এই পরাজয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে মোঙ্গলরা হিন্দুস্তানে হামলা বন্ধ করেনি। ১২৯৮ সালে পুনরায় সালদীর নেতৃত্বে মোঙ্গলরা আলাউদ্দীনের রাজ্যসীমা লংঘন করে লুণ্ঠন ও নরহত্যার তাণ্ডব শুরু করেছিল। সিন্ধু সীমান্তে এই সময় মোঙ্গল আক্রমণ শুরু হয় এবং জাফর খাঁ সিয়াওয়ানে বা সিবিস্থানে তাদের পরাজিত করে সালদী ও তার ভ্রাতাকে বহু অনুচর সহ রাজধানীতে বন্দী হিসাবে নিয়ে আসেন। জাফর খাঁর এই বিজয় উলুঘ খাঁর গুজরাট বিজয়ের গৌরবকে ম্লান করে দিয়েছিল এবং সুলতান আলাউদ্দীনও তাঁর একজন সেনাপতির এই বীরত্ব ও শৌর্য দেখে সম্ভবতঃ ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন।

১২৯৯ সালে প্রায় ২০০,০০০ মোঙ্গল কুতলুঘ খোজার নেতৃত্বে দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়েছিল। এই সময় রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকজন নিরাপদ আশ্রয় লাভের জন্য দিল্লী আশ্রয় নিতে এসেছিল। ফলে শহরে মানুষের ভীড় বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবরুদ্ধ দিল্লী নগরীতে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। সুলতান স্বয়ং রাজধানীর উত্তরে কিলিতে মোঙ্গলদের প্রতিরোধ করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু মোঙ্গল আক্রমণকারীরা এইবার জাফর খানের প্রবল আক্রমণে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। মোঙ্গলদের সঙ্গে সংঘর্ষে জাফর খাঁ বীরের মত মৃত্যুবরণ করেছিলেন। জাফর খাঁর মৃত্যু ও মোঙ্গলদের পরাজয় উভয় ঘটনাতেই আলাউদ্দীন উল্লসিত হয়েছিলেন। কারণ স্বীয় অনুচরের সাহসিকতা ও সুনামকে তিনি সুচক্ষে দেখেননি। ১৩০৩ সালে তার্গির নেতৃত্বে আরেকটি মোঙ্গলবাহিনী দিল্লী অবরোধ করেছিল। এই বাহিনীতে প্রায় ১,২০,০০০ মোঙ্গল সৈন্য ছিল। এই সময় সুলতানের সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ তেলিঙ্গানা বিজয়ের জন্য প্রেরিত হয়েছিল এবং সুলতান স্বয়ং চিতোর অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সেই কারণে তাঁর শত্রু সৈন্যের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না।

www.pathagar.com

এই সময় সিরি দুর্গের সুরক্ষিত এলাকায় সুলতান আলাউদ্দীন ও তাঁর সৈন্যবাহিনী অবরুদ্ধ ছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ মোঙ্গলরা দুর্গ দখল ও প্রতিরোধ চূর্ণ করার রণপদ্ধতী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না। অতএব লুণ্ঠনের পর মোঙ্গলরা স্বেচ্ছায় এই অবরোধ তুলে নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করলে আলাউদ্দীন এই যাত্রা রক্ষা পান। ১৩০৫ সালে পুনরায় আলিবেগ, তারতাক ও তার্গির অধীনে একদল মোঙ্গল বাহিনী শিবালিক পর্বতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দিয়ে আমরোহা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। মালিক, নায়েব ও তাঁর সৈন্যবাহিনী এই মোঙ্গল হামলাকারীদের সম্পূর্ণ পরাজিত করেছিলেন। পরবর্তী মোঙ্গল আক্রমণগুলিও গাজি মালিকের তৎপরতায় হিন্দুস্তানের সীমানা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ মোঙ্গল আক্রমণ হয় ১৩০৬ সালে যখন কুবক ও ইকবালমান্দার মোঙ্গল বাহিনী হিন্দুস্থানের সীমা লংঘন করেছিল। সুলতান আলাউদ্দীনের প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর কাছে তারা পরাজিত হয়েছিল এবং মোঙ্গল সৈন্য ও সামরিক বাহিনীর বহু পদস্থ ব্যক্তি বন্দীদশা প্রাপ্ত হয়েছিল। এইসব বন্দীদের দিল্লীতে সুলতানের আদেশে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। পরবর্তী মোঙ্গল আক্রমণকারিদের সীমানা লংঘন প্রচেষ্টা সুলতানী বাহিনী ব্যর্থ করে দিয়েছিল। ভবিষ্যতে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সুলতান এই সময় তাঁর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত সুসংগঠিত করেছিলেন। এই বিষয়ে তিনি বলবনের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। সামানা ও দিপালপুরের সীমান্তে মোঙ্গলদের আগমনের পথে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করা হয়েছিল। পুরাতন দুর্গগুলি সংস্কার করা হয় এবং অভিজ্ঞ সেনাপতিদের এইসব দুর্গের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল। সুলতান তাঁর সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী করার জন্য দাগ প্রথার ও প্রতিটি সৈন্যের পরিচিতির জন্য বর্ণনামূলকভাবে নাম লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। রাজকীয় কারখানায় সর্বপ্রকারের অস্ত্র নির্মাণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।* এই যুগে গাজিমালিক উত্তর পশ্চিম সীমান্তের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

রাজ্যবিস্তার ও অভ্যন্তরীণ সমস্যা

আলাউদ্দীন বৈদেশিক আক্রমণ দমনে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি শুরুতেই তৎপর হয়েছিলেন। ১২৯৮ সালের শেষার্ধে উলুঘ খান ও নসরৎ খানকে গুজরাট জয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। গুজরাটের বাঘেল বংশীয় রাজপুত নৃপতি কর্ণদেব আমেদাবাদের নিকট আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীকে বাধাদান করার প্রচেষ্টায় বিফল হয়ে পলায়ন করেন এবং তাঁর মহিষী রানী কমলাদেবী বন্দিনী হয়ে আলাউদ্দীনের বেগম হয়েছিলেন। বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর হস্তে এই সময় একজন হিন্দু ক্রীতদাস বন্দী হয়ে দিল্লীতে প্রেরিত হন। পরবর্তীকালে তিনি কাফুর হাজারদিনারী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং আলাউদ্দীনের সর্বাধিক প্রিয় সেনাপতি হয়েছিলেন। সৌরাষ্ট্র ও ক্যাম্বে এইসময় লুণ্ঠিত হয় এবং সোমনাথের পুনর্গঠিত মন্দির থেকে বিগ্রহ আক্রমণকারীদের দ্বারা অপহৃত হয়ে দিল্লীতে প্রেরিত হয়েছিল। প্রত্যাবর্তনের পথে নসরৎ খান ও উলুঘ খানের বাহিনীতে 'নয়া মুসলমান' বা ইসলামে দীক্ষিত মোঙ্গল সৈন্যদের বিদ্রোহের ফলে নসরৎ খানের ভ্রাতা ও আলাউদ্দীনের একটি ভ্রাতুষ্পুত্র নিহত হয়েছিলেন। এই বিদ্রোহ অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল। মোঙ্গল বিদ্রোহের নেতারা হিন্দু রাজাদের বিশেষত রন্থম্ভরের প্রধান হামিরদেবের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। নসরৎ

* বারানি ও বাদায়ুনীর লেখায় ইকবালমন্দা যুক্ত ছিলেন না এবং তাকে পরবর্তী একটি অভিযানের সঙ্গে সংযুক্ত বলে দাবি করা হয়েছে। বিশাল সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য আলাউদ্দীন যে সব অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সে বিষয়ে আলোচনা জন্য নিম্নে দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

খানের ভ্রাতার মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের সন্তানসন্ততি মাতৃক্রোড়ে নিহত হয় ও তাদের পত্নীদের দিল্লীর ধাঙড়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রথম জীবনের অসাধারণ সাফল্য সুলতান আলাউদ্দীনের উচ্চাকাংখা বৃদ্ধি করেছিল। তিনি অন্যান্য রাজমুকুটধারীদের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করছিলেন এবং সর্বকালের স্মরণীয় ব্যক্তিত্বদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ইসলামের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের আবুবকর, উমর, ওসমান ও আলির ন্যায় চারজন প্রসিদ্ধ সহযোগী ছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন তাঁর চারজন বিশ্বস্ত অনুচর উলুঘ খান, নসরৎ খান, জাফর খান ও আলাপ খানকে তাঁদের সমতুল্য বলে মনে করেছিলেন এবং হজরত মহম্মদের ন্যায় এক নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আবার আলেকজান্ডারের মতন সারা বিশ্বে নিজেকে দিগ্বিজয়ী হিসাবে পরিচিত করার উচ্চাকাংখাও আলাউদ্দীন প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মিত্র ও দিল্লীর কোতোয়াল আলাউলমুলুকের সদুপদেশ তাঁকে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত করেছিল। আলাউলমুলুক সুলতানকে বলেছিলেন ধর্ম কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত দ্রষ্টাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং বুদ্ধি বা জ্ঞানের সাহায্যে ধর্ম প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। কোতোয়াল বলেছিলেন যে, হিন্দুস্তানে যেসব রাজ্য তখনও দিল্লীর পদানত নয় আলাউদ্দীনের সেই সব রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করা উচিত এবং মোঙ্গলদের হাত থেকে রাজ্যসীমা রক্ষায় তৎপর হওয়া কর্তব্য। সুলতান আলাউলমুলুকের উপদেশের সারসত্তা উপলব্ধি করে তাঁর ধর্মস্থাপন বা দিগ্বিজয়ের কল্পনা ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু আলাউদ্দীনের মুদ্রায় তাঁর বিশ্বজয়ের উচ্চাকাংখার রেশ পাওয়া যায়। কারণ আলাউদ্দীন তাঁর কোন কোন মুদ্রায় সেকেন্দার সানি বা দ্বিতীয় সেকেন্দার উপাধি নিয়েছিলেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোতোয়াল আলাউলমুলুকের সদুপদেশ গ্রহণ করে আলাউদ্দীন যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার প্রমাণ অল্পকালের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। কারণ এই সময় সীমান্তে মোঙ্গলদের হানা রোধ করতে তৎপরতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল ও সৈন্যবাহিনী সুসংগঠিত করতে হয়েছিল। এই সময়ে আলাউদ্দীন হিন্দুস্তানের রাজ্যগুলি পদানত করে সুলতানী শাসন প্রসারে এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য মনোনিবেশ করেছিলেন।

কিন্তু রণথম্ভর দুর্গ সুলতান জালালউদ্দীনের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়েছিল। ১২৯৯ সালে সুলতান আলাউদ্দীন নসরৎ খান ও উলুঘ খানকে এই দুর্গ পদানত করার জন্য সসৈন্যে প্রেরণ করেছিলেন। দুর্গ অবরোধের সময় নসরৎ খান আকস্মিকভাবে আঘাত পেয়ে নিহত হয়েছিলেন। রণথম্ভরের দুর্গাধিপতি হামিরদেবের প্রবল আক্রমণে খলজী বাহিনী উলুঘ খানের নেতৃত্বে পশ্চাদাপসারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। অতপরঃ সুলতান আলাউদ্দীন স্বয়ং রণথম্ভর দখল করার জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আলাউদ্দীনের রণথম্ভর অভিযানের সময় তিলপৎ নামক স্থানে যখন শিবির স্থাপন করেছিলেন তখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র স্বীয় পিতৃব্যের উদাহরণ অনুসরণ করে সুলতানের প্রাণনাশের জন্য চেষ্টা করেন। সুলতানের বিদ্রোহী ভ্রাতুষ্পুত্র আকাট খানের ষড়যন্ত্র প্রধানতঃ আলাউদ্দীনের পাইক দেহরক্ষীদের বিশ্বস্ততায় ও সাহসিকতায় ব্যর্থ হয়। এছাড়া ১৩০১ সালে দিল্লীতে হাজি মোল্লার বিদ্রোহের ফলে শহরের কোতোয়াল তামার্দি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এইসময় সুলতান ইলতুৎমিসের সঙ্গে সম্পর্কিত একজন সৈয়দকে বিদ্রোহীরা সুলতান বলে ঘোষণা করেছিল। এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হয়। সুলতানের ভগ্নীর পুত্রদ্বয় বাদায়ুনের শাসক উমর খান ও অযোধ্যার শাসনকর্তা মাংগুখানও বিদ্রোহী হয়েছিলেন। আলাউদ্দীন এই সব বিদ্রোহের নেতাদের অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দান করেছিলেন।

ইতিমধ্যে রণথম্ভর দুর্গ সুলতানের সৈন্যবাহিনীর দখলে এসেছিল। রাণা হামিরদেব ও তাঁর

www.pathagar.com

রাজপুত অনুগামীরা রণক্ষেত্রে বীরের মত মৃত্যুবরণ করেন এবং রাজপুত রমনীরা অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে জহর ব্রত উদযাপন করেছিলেন। আলাউদ্দীনের আদেশে রণমল নামে হামিরদেবের যে মন্ত্রী ও তার অনুচররা বিশ্বাসঘাতকতা করে আলাউদ্দীনের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন, তাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। অপরদিকে মহম্মদশাহ নামে নয়ামুসলমান বা মোঙ্গল সেনাপতি হামিরদের প্রতি আনুগত্যের জন্য জীবন দান করেন। পুরস্কার হিসাবে আলাউদ্দীন তাঁর মরদেহ সসম্মানে কবর দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তী বৎসর ফকরউদ্দীন জুনা ও নসরৎ খানের ভ্রাতুস্পুত্র চাজ্জুর নেতৃত্বে বরঙ্গলে একটি অভিযান প্রেরিত হয়। বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে প্রেরিত এই অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে সমকালীন ইতিহাসে তথ্যের অভাব দেখে মনে হয় সম্ভবতঃ এই অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের ইতিবৃত্ত পাঠে এই অনুমানের কারণ সম্পর্কে জানা যায়।

১৩০৩ সালের ২৯শে জানুয়ারী সুলতান আলাউদ্দীন খলজী চিতোরের বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং চিতোর দুর্গ অবরোধ করেন। রানা রতন সিংহের নেতৃত্বে চিতোরের বীর রাজপুত সৈনিকরা তাঁর বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। অবশেষে চিতোর রক্ষা করে যখন আর সম্ভব হল না তখন রাণা রতন সিংহের নেতৃত্বে রাজপুতরা শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণত্যাগ করেন। আমির খসরু ও ইসেমীর মতে রানা রতন সিংহ এই যুদ্ধে নিহত হননি এবং আলাউদ্দীন তাঁর জীবন নাশ করেননি। কিন্তু পরবর্তী কালে রানা রতন সিংহের সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। ১৩০৩ সালের ২৬ শে আগষ্ট ৩০ হাজার রাজপুত সৈন্যের রণক্ষেত্রে জীবনদানের পর চিতোর অধিকৃত হয়। খিজির খাঁকে চিতোরের সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু খলজীরা বেশীদিন চিতোর দখলে রাখতে পারেননি। রাজপুতদের অনবরত বাধাদানের ফলে ১৩১১-১২ সালে মালদেবের হাতে খলজীরা চিতোরের শাসনভার অর্পণ করেছিল। ১৩২৫ সালে শিশোদিয়া বংশীয় রানা হামির চিতোর ও সমগ্র মেবারের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

রাজপুত চারণ কবিরা আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের জন্য রানা রতন সিংহের অপূর্ব সুন্দরী মহিষী পদ্মিনীর প্রতি সুলতানের আকর্ষণকে দায়ী করেছেন। আবুল ফজল, হাজি উদ্-দাবির, ও ফিরিস্তার লেখনীতে এই কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ এই কাহিনী মালিক মহম্মদ জয়সীর রচিত গাঁথা পদ্মাবত (১৫৪০ খ্রীঃ) থেকে পল্লবিত হয়ে বিভিন্ন লেখকের বক্তব্যকে প্রভাবিত করেছে বলে অনুমান করেন। আলাউদ্দীনের রাজ্যবিস্তারের আকাংখাই প্রধানতঃ মেবার আক্রমণে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আবার একথাও অনস্বীকার্য যে গুজরাটের রাণী কমলাদেবীর ঘটনা থেকে সুলতান আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেকের মনে স্বাভাবিক ভাবে এই ধরনের সন্দেহের ছায়া পড়েছে। বর্তমানে ঐতিহাসিকদের কাছে যেসব তথ্য আছে তা থেকে কিন্তু পদ্মিনী কাহিনীকে প্রামানিত সত্য হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না।

চিতোর বিজয়ের পর ১৩০৫ সালে মুলতানের শাসনকর্তা আইন-উল মুলকের নেতৃত্বে ১০,০০০ সৈন্যবাহিনী মালবের রাজা মহলদেবের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিল। মালবের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে আইন-উল মুলক এই স্থান দখল করেছিলেন এবং মহলদেবকে ও কোকা প্রধানকে যুদ্ধে নিহত করেছিলেন। অতঃপর আলাউদ্দীন মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, চান্দেরী প্রভৃতি দখল করে প্রায় সমগ্র উত্তরভারতে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন।

উত্তর ভারত বিজয়ের পর সুলতান আলাউদ্দীনের দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে বিজয়াভিযান প্রেরণ

আলাউদ্দীন খলজী দক্ষিণ ভারতে সার্বভৌম প্রাধান্য স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আলাউদ্দীনের দক্ষিণ ভারত বিজয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দক্ষিণের রাজ্যগুলির লুণ্ঠিত স্বর্ণ ও মনিরত্নের সাহায্যে তিনি উত্তর ভারতে প্রভুত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে দেবগিরি লুণ্ঠিত অর্থ আলাউদ্দীনকে দিল্লীর সিংহাসন লাভে সাহায্য করেছিল। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি সম্পূর্ণ পদানত করে দিল্লীর শাসনাধীন করা অপেক্ষা এইসব রাজ্য থেকে ধনরত্ন লুণ্ঠন করা সুলতান আলাউদ্দীনের অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল। আমির খসরু তাঁর খাজায়িন-উল-ফুতুহ গ্রন্থে আলাউদ্দীনের দক্ষিণের অভিযানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। সুলতান দক্ষিণ ভারত অভিযানের সময় মালিক কাফুরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বিজিত রাজ্যগুলি থেকে তিনি যেন জিজিয়া সংগ্রহ করেন। এইখানে জিজিয়ার অর্থ দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে অর্থ ও ধনদৌলত লুণ্ঠন এবং বিজিত রাজ্যগুলিকে দিল্লীর সুলতানকে বাৎসরিক কর ও উপঢৌকন দান করতে বাধ্য করা। দক্ষিণ ভারতের ভৌগলিক অবস্থান, এখানকার হিন্দুরাজাদের বিরোধিতা ও দিল্লী থেকে এইসব দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির দূরত্ব প্রভৃতি এই রাজ্যগুলিকে স্থায়ী ভাবে সাম্রাজ্যের অধীন করার পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করেছিল।

দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্য ছিল না। দেবগিরির যাদববংশীয় রাজা রামচন্দ্রদেবের রাজ্যে আলাউদ্দীনের প্রথম অভিযানের সময় থেকে উত্তর ভারতের খলজী সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণশীল নীতি সম্পর্কে দক্ষিণের রাজ্যগুলির সচেতন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এইসময়েও তারা পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত ছিলেন। আলাউদ্দীন যখন সর্বপ্রথম দেবগিরির দ্বারদেশে হানা দেন সেই সময় রামচন্দ্রদেবের প্রধান সৈন্যবাহিনী বরঙ্গলের (তেলেঙ্গানা) কাকতীয় রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিল। এছাড়া দক্ষিণ ভারতে অন্য আরো দুইটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হোয়সলের বংশীয় রাজা তৃতীয় বল্লাল। তিনি দ্বারসমুদ্রে (মহিশূর) রাজত্ব করতেন। এছাড়া মাদুরা পাণ্ড্যদের রাজধানী ছিল। ১৩০৭ সালে সুলতান আলাউদ্দীন খলজী স্বীয় সেনাপতি মালিক নায়েব কাফুর ও তাঁর সহকারী হিসাবে খাজা হাজিকে রাজা রামচন্দ্রদেবের বিরুদ্ধে একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। কারণ রামচন্দ্রদেব বহুকাল তাঁর প্রতিশ্রুত কর দিল্লীতে নিয়মিত পাঠান বন্ধ করেছিলেন। এইবারের অভিযানে গুজরাটের শাসনকর্তা আলপ খান এবং মালবের শাসনকর্তা আইন উলমুলুক মালিক কাফুরের বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। দেবগিরি সহজেই দিল্লীর সৈন্যবাহিনীর পদানত হয়েছিল এবং রাজা রামচন্দ্রদেব সপরিবারে শত্রুসৈন্যের হাতে বন্দী হয়ে দিল্লীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন রাজা রামচন্দ্রদেবের সঙ্গে প্রীতি ও মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন এবং অধীনতা স্বীকার ও করদানের বিনিময়ে তাঁকে দেবগিরিতে পুনঃস্থাপিত করেছিলেন। এইসময় নবসারী নামে স্থানটি দিবগিরির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং রাজা রামচন্দ্রদেব রায়রায়ান উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। রামচন্দ্রদেবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের ফলে দাক্ষিণাত্যে ও সুদূর দক্ষিণে সুলতান আলাউদ্দীনের যে সকল অভিযান প্রেরিত হয় সেগুলি যাদব নৃপতির সহযোগিতা লাভ করেছিল। দেবগিরিতে মূল শিবির স্থাপন করে দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অংশে খলজী বাহিনী সামরিক অভিযান করেছিল। এইসব অভিযানের সময় গুজরাটের বাঘেলা বংশীয় রাজা কর্ণদেবের কন্যা দেবলাদেবী আলপ খানের সৈন্যদের হাতে বন্দিনী হয়ে দিল্লীতে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং খিজির খানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। আমির খসরুর লিখিত কাব্য কাহিনী 'আশিকা'র উৎস দেবলাদেবী ও খিজির খানের বিবাহ বলে অনুমান করা হয়। এই কাহিনীর একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই।

দেবগিরি অভিযানের সাফল্যে সুলতান আলাউদ্দীনকে দক্ষিণ ভারতে অন্যান্য রাজ্যজয়ের জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। ১৩০৯ সালে সুলতানের আদেশে মালিক-নায়েব কাফুর বরঙ্গলের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই অভিযানে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেব কাফুরের অভিযাত্রী বাহিনীর সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেছিলেন। এমনকি একদল মারাঠা পদাতিক ও অশ্বারোহীকে আক্রমণকারী বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য তাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। বরঙ্গলের দুর্গটি প্রস্তর নির্মিত ছিল এবং এর চারিপাশে মাটির সুদৃঢ় দেওয়াল ও দুইটি পরিখা—একটি বহির্ভাগে আরেকটি ভিতরের দিকে-- খনন করা ছিল। বরঙ্গলের কাকতীয় নৃপতি প্রতাপরুদ্রদেবের অধীনে ৯০,০০০ তীরন্দাজ ও ২০,০০০ অশ্বারোহী যুদ্ধার্থে সর্বদা প্রস্তুত ছিল। আক্রমণকারীদের বাধাদানের জন্য প্রতাপরুদ্রদেব শত্রুর ডাক চৌকী বিনষ্ট করে, যোগাযোগের পথ ধ্বংস করে ও পোড়া মাটি নীতি অনুসরণ করে বহুকাল বাধাদান করেছিলেন। ১৩১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দুর্গের পতন অবশ্যম্ভাবী জেনে তিনি সন্ধির প্রস্তাব করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রতাপরুদ্রদেবের একটি স্বর্ণমূর্তিতে গলায় শিকল দিয়ে আত্মসমর্পনের প্রতীক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রতাপরুদ্রদেব ১০০টি হাতি, ৭০০০ ঘোড়া ও তাঁর সঞ্চিত ধনরত্ন কাফুরের সঙ্গে দিল্লীকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন এবং বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হয়েছিলেন। ১৩১০ সালের মার্চ মাসে প্রায় একহাজার উটের পিঠে এইসব ধনরত্ন চাপিয়ে মালিক কাফুর দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। জুন মাসের এগারো তারিখে মালিক কাফুর দিল্লীতে পদার্পন করার পর তাঁকে সুলতান এই অভিযানে সাফল্য অর্জনের জন্য বিশেষভাবে অভ্যর্থনা জানান।

বরঙ্গলে কাফুর সুদূর দক্ষিণের রাজ্যগুলির ধনসম্পদের বিবরণ পেয়েছিলেন এবং সুদূর দক্ষিণের হোয়েসল রাজ্য ও মাবার আক্রমণ করে এইসব রাজ্যের প্রাধান্য স্থাপন ও লুন্ঠনের জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। ১৩১০ সালের ১৯শে নভেম্বর তিনি এই উদ্দেশ্যে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ সুদূর দক্ষিণে অভিযান করেন এবং ১৩১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ তারিখে দেবগিরিতে পদার্পণ করেন। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেব কাফুরের সৈন্যবাহিনীর পথপ্রদর্শক হিসাবে পরশুরামদেব নামে সীমান্তের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে নিয়োগ করেছিলেন। খলজীবাহিনী সর্বপ্রথম হোয়েসল রাজধানী দ্বারসমুদ্রের সীমান্তে ১৩১১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী হানা দিয়েছিল। এইসময় হোয়েসল নৃপতি তৃতীয় বল্লাল তাঁর সৈন্যবাহিনী-সহ পাণ্ড্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। কাফুরের আক্রমণের সংবাদে তিনি দ্রুত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তৃতীয় বল্লাল এই বিবাদের সময় তাঁর শত্রু পাণ্ড্যদের কাছেই সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং বীরপাণ্ড্য তাঁকে সহায়তা করার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন; কিন্তু হোয়েসল নৃপতি বল্লাল, রাজা রামচন্দ্রদেব ও কাকতীয় অধিপতি প্রতাপরুদ্রের ন্যায় খলজী সাম্রাজ্যবাদের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। বাৎসরিক কর দানের বিনিময়ে ও সঞ্চিত ধনরত্ন দিয়ে তৃতীয় বল্লাল দিল্লীর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন এবং সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন।

তৃতীয় বল্লাল মালিক কাফুরকে পাণ্ড্যরাজ্য বিজয়ে সাহায্য করার জন্য তাঁর পথপ্রদর্শক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলেন। এইসময় পাণ্ড্যরাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে সুন্দর-পাণ্ড্য ও তাঁর ভ্রাতা বীরপাণ্ড্য গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। অতএব মালিক কাফুর আশা করেছিলেন যে ভ্রাতৃ বিরোধে বিভক্ত এই রাজ্য সহজেই তাঁর পদানত হবে। কিন্তু তাঁর এই আশা পূরণের পথে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল। কুইলন থেকে নেলোর পর্যন্ত সমুদ্র উপকূলে ৩০০ লিগ প্রসারিত এই রাজ্যের সীমা। পার্বত্য অঞ্চল ও গিরিবর্ত্ম পার হয়ে মালিক কাফুর যখন বীরপাণ্ড্যের সদর দপ্তর বিরধৌলে পদার্পন করেছিলেন তার আগেই বীরপাণ্ড্য শত্রু সৈন্যের আগমনবার্তা পেয়ে বিবাহস্থান ত্যাগ করেন। অন্যান্য দক্ষিণ ভারতের রাজাদের মত পাণ্ড্যভ্রাতৃদ্বয় সরাসরি উত্তর ভারতের সৈন্যদের সম্মুখ সমরে মোকাবিলা করার পদ্ধতি গ্রহণ করেনি বা কোন

www.pathagar.com

সুরক্ষিত স্থানে বা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেনি। যার ফলে কোন একটি বিশেষ যুদ্ধে জয় লাভ করে বা কোন একটি দুর্গ দখল করে মালিক কাফুরের পক্ষে পাণ্ড্য রাজ্য জয় করা সম্ভব হয়নি। বরং সমগ্র পাণ্ড্য রাজ্য জুড়ে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই ছড়িয়ে পড়েছিল। সময়, সুযোগ ও সুবিধা বুঝে পাণ্ড্যরা শত্রু সৈন্যদের উপর হামলা করে তাদের বিব্রত করতে কসুর করেনি। তার উপরে এইসময়ে অবিরাম বর্ষণের ফলে সারা অঞ্চল প্রায় জলে জলাকার হয়েছিল। ফলে উত্তর ভারতের সৈন্যরা বিশেষ অসুবিধায় পড়েছিল।

মালিক কাফুর বীরপাণ্ড্যর পশ্চাদধাবন করে কুনডুরের (ক্যানানুর) দ্বারদেশে হানা দিয়ে এই স্থান দখল করেছিলেন। বীরপাণ্ড্য এই স্থান ত্যাগ করে যাওয়াতে কাফুর তাঁকে ধরার আশা ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি ব্রহ্মসতপুরী (চিদাম্বরম) দখল করেছিলেন। ১৩১১ সালের এপ্রিল বিরধৌল প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কাফুর ২৫০টি হাতি ও বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করেছিলেন। বিরধৌল, শ্রীরঙ্গম ও ক্যানানুরের আশেপাশে অন্যান্য বহু অঞ্চল থেকে কাফুর মন্দির লুঠতরাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। এইসময় তিনি অকস্যাৎ সুন্দরপাণ্ড্যের রাজধানী মাদুরা আক্রমণ করেছিলেন। এই আক্রমণের সংবাদ পূর্বাহ্নে লাভ করে সুন্দরপাণ্ড্য মাদুরা ত্যাগ করে যান। কাফুর স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করতে না পেরে সোমনাথের মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন। এই সময় সুন্দরপাণ্ড্যের খুল্লতাত বিক্রমপাণ্ড্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কাফুরের বাহিনীকে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করেছিলেন। এতদসত্বেও কাফুর তাঁর লুণ্ঠিত ধনদৌলতের এক বিরাট অংশ শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইসব লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে যেসব মনিরত্ন ছিল তার ওজন হয়েছিল সমকালীন লেখকদের মতে ৫০০ মণ। আর তা ছাড়া ছিল ৫১২টি হাতি ও ৫০০০ অশ্ব।

দক্ষিণ ভারতে আলাউদ্দীনের কৃতিত্বের মূল্যায়ণ

দিল্লীর সুলতানী শাসন সম্পর্কে সমকালীন যেসব ফার্সীতে লিখিত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় সেগুলি পাঠ করলে মনে হয় সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর দক্ষিণ ভারতের এইসব অভিযান প্রায় একটানা জয়যাত্রায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু উত্তর ভারত থেকে প্রেরিত এই সব অভিযান বহুক্ষেত্রেই কঠিন বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছিল এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। আমির খসরু বা অন্যান্য দিল্লী সুলতানের ইতিবৃত্তকাররা দক্ষিণ ভারতের খলজী সাম্রাজ্যবাদের অভিযানকে একটানা জয়যাত্রার কাহিনী বলে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে হিন্দুদের বিবরণীতে দক্ষিণের রাজাদের সাফল্যের কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে। এইরূপ পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থেকে সত্য উদ্‌ঘাটন করা খুবই কঠিন।

ফিরিস্তার ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, মালিক নায়েব কাফুর মাদুরা থেকে রামেশ্বর পর্যন্ত অভিযান করেন ও শেষোক্ত স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা বলা যায় না। কারণ প্রথমতঃ, ফিরিস্তার বক্তব্যের মধ্যে স্ব-বিরোধ দেখা যায়; দ্বিতীয়তঃ, বারানী ইসেমী এমনকি আমির খসরুর খাজায়িন-উল-ফুতুহতে এসম্পর্কে উল্লেখ নাই। খসরুর পরবর্তী কালের লেখা আশিকাতে বলা হয়েছে যে, মালিক কাফুর শ্রীলংকার উপকূল পর্যন্ত আক্রমণ করেছিলেন। হাজি-উদ্-দবিরও মালিক কাফুরের শ্রীলঙ্কা আক্রমণের ও সেখানে একটি মন্দির ধ্বংসের কথা ইংগিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এইসব বক্তব্য কোন সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে লেখা হয়েছিল কিনা বলা যায় না।

১৩১২ সালে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিংঘন দিল্লীর সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে মালিক কাফুরকে পুনরায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছিল। কাফুর সহজেই সিংঘনকে পরাজিত ও নিহত করেন। কিন্তু যাদবদের রাজ্যের একটি অঞ্চল কাম্পিলি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। ইতিমধ্যে ১৩১৬ সালে সুলতান আলাউদ্দীন

www.pathagar.com

খলজীর মৃত্যু হয় এবং কাফুরকে কাম্পিলির বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা ত্যাগ করে দিল্লী যাত্রা করতে হয়েছিল।

সুলতান আলাউদ্দীনের দক্ষিণ ভারত অভিযানের ফলে দেবগিরি, বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র, মাদুরা ও সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত খলজী সাম্রাজ্যবাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ ও বিবাদ খলজী অভিযানগুলির সাফল্যের পথ প্রশস্ত করেছিল। রাজা রামচন্দ্রদেব কাফুরের তেলিঙ্গানা অভিযানে সাহায্য করেছিলেন এবং তৃতীয় বীর বল্লালপাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণের সময় কাফুরের সৈন্যবাহিনীর পথ প্রদর্শক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যখন উত্তরভারত থেকে সুলতান আলাউদ্দীন দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে পদানত করার জন্য বারংবার অভিযান প্রেরণ করছিলেন তখন দক্ষিণের রাজারা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গঠনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন না।

ডঃ কে. এস. লালের মতে দক্ষিণের সৈন্যবাহিনীর খলজী আক্রমণকারীদের হাতে পরাজয়ের জন্য কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যের নৃপতিদের অনৈক্য দায়ী ছিল না। ডঃ কে. লাল মন্তব্য বলেছেন যে, 'The defeat of the southern princes was not wholly due to their disunity.' আলাউদ্দীনের সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ ভারতের সৈন্যদের তুলনায় অনেক বেশী দক্ষ, সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত ছিল। খলজী অশ্বারোহী বাহিনীর তৎপরতা ছিল অতুলনীয়। দিল্লী ও দেবগিরির দূরত্ব অতিদ্রুত অতিক্রম করে উত্তরদক্ষিণের সংযোগ রক্ষা করত। সৈন্যবাহিনীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আলাউদ্দীনের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। দূরদেশে যে সব সৈন্য কর্তব্য পালনে নিযুক্ত ছিল তাদের সন্তোষ বিধানের জন্য সুলতান বারংবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দিল্লীর সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে পারদর্শী ছিল এবং রণকৌশলে ও দক্ষতায় দক্ষিণের সৈন্যদের তুলনায় উন্নত মানের ছিল। শারীরিক শক্তিতে দক্ষিণের সৈন্যদের অপেক্ষা উত্তরের সৈন্যরা শ্রেষ্ঠ ছিল। শেষোক্তদের স্বভাবতঃ রণক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারে কোন অসুবিধা ছিল না। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের সৈন্যদের নিম্নমানের কথা উল্লেখ করে ইতালিয় ভ্রমণকারী মার্কো পেলো মন্তব্য করেছিলেন যে,—The people of the country go to the battle all naked with only a lance and shield and are the most wretched soldiers.' তিনি আরো মন্তব্য করেছেন যে, এই সৈনিকরা কেবলমাত্র ভাত ও সবজী ভোজী ছিল এবং নিয়মিত স্নান করা তাদের অভ্যাস ছিল। ধর্মের ব্যাপারে তারা ছিল অত্যন্ত গোঁড়া এবং ছুৎমার্গে বিশ্বাসী। লড়াই করার থেকে ধর্মীয় আচার পালনের প্রতি তারা বেশী আগ্রহী ছিল। এতএব মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেসব উত্তর ভারতের সৈনিক রণনীতি সম্পর্কে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তাদের কাছে দাক্ষিণাত্যে সাফল্য অর্জন করা দুঃসাধ্য ছিল না।

আলাউদ্দীন দক্ষিণে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি দক্ষিণের নৃপতিদের কাছ থেকে নিয়মিত বাৎসরিক কর লাভের বিনিময়ে এইসব রাজ্যের সার্বভৌম সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর অভিযানগুলির উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে দিল্লীর প্রতি বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা ও তাদের ধনদৌলত লুণ্ঠন করা। নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এই কার্যে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন মালিক নায়েব কাফুর।

সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর রাজতন্ত্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা

ঈশ্বরীপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন যে, 'Alauddin was opposed to the interference of the ulamas in matters of state and in this respect he departed from the traditions

www.pathagar.com

of the previous rulers of Delhi.' সুলতানের প্রবর্তিত আইন বা কানুন-ই-শাহীকে রাজ্যশাসনের ব্যাপারে আলাউদ্দীন শরিয়তের অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দান করেছিলেন। সুলতানের রাজতন্ত্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে মনোভাব কাজি মুঘিসউদ্দীনের সঙ্গে আলোচনার সময় সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছিল। কাজি মুঘিসউদ্দীনের সঙ্গে আলাউদ্দীন রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগে সুলতান কতদূর ইচ্ছামত স্বীয় শক্তি আইনসম্মত ভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম এবিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত হয়েছিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিন মজলিস-ই-খিলওয়াতে যে সব স্বল্পসংখ্যক কাজি ও আলম ও অন্যান্য প্রধান পরামর্শদাতা আমির-ওমরাহদের সঙ্গে আসন গ্রহণ করতেন এবং যাঁরা স্বাধীন মতামত প্রকাশেরও সাহস রাখতেন কাজি মুঘিসউদ্দীন ছিলেন তাদের অন্যতম। সুলতান আলাউদ্দীনের সঙ্গে কাজি মুঘিসউদ্দীনের আলোচনা প্রধানতঃ চারিটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে হয়। প্রথমতঃ, হিন্দুদের প্রতি দমনমূলক নীতি অবলম্বন করা সম্পর্কে কাজি মুঘিসউদ্দীন সুলতানকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ শরিয়তের বিধানে অনুমোদিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত আসামীদের প্রতি অতিরিক্ত কঠোর ও অমানবিক ব্যবহার ও তাদের কঠিন এবং নিষ্ঠুর শাস্তিপ্রদানকে কাজি মুঘিসউদ্দীন ইসলামের বিধি লংঘনের সামিল ও শরিয়তের অনুমোদন বর্হিভূত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। তৃতীয়তঃ, কাজিকে যখন দেবগিরি লুন্ঠিত ধনদৌলতের আইন সঙ্গতভাবে বন্টনের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন সুলতানের বিরাগভাজন হবার সম্ভবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, এই লুন্ঠিত ধনসম্পদ সম্পূর্ণ আত্মস্মাৎ করে আলাউদ্দীন শরিয়তের বিধি লংঘন করেছিলেন। কারণ, সৈন্যবাহিনীকে ও বয়েতউলমলকে বা রাজকীয় খাজাঞ্চিখানাকে এই লুন্ঠিত দৌলতের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করে সুলতান আলাউদ্দীন ইসলামের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন। সবশেষে সুলতান আলাউদ্দীনের কাজির কাছে জিজ্ঞাস্য ছিল যে, তিনি বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা বয়েতউলমল থেকে নিজস্ব ও রাজপরিবারের ব্যয়ের জন্য কি পরিমাণ অর্থগ্রহণ করতে পারেন। কাজি মুঘিসউদ্দীন তদুত্তরে বলেন যে, শরিয়তের বিধি অনুসারে সুলতান বা তার পরিবারবর্গ ব্যয়ের জন্য খাজাঞ্চিখানা থেকে আইন সঙ্গতভাবে কেবলমাত্র একজন সৈনিক বা উচ্চপদস্থ সেনানী যে পরিমাণ অর্থ বেতন হিসেবে পান তদাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অর্থ দাবি পেশ করার অধিকারী।

মুঘিসউদ্দীনের কাছ থেকে শরিয়তের বিধি সম্পর্কে নির্দেশ ও কাজির স্পষ্টভাষণ শোনার পর সুলতান রাজ্যশাসনের বিষয়ে তিনি যে অভিমত পোষণ করতেন তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন। এই বক্তব্যে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে রাজ্যশাসনে সুলতানের অনীহা সুস্পষ্ট। আলাউদ্দীন বলেছিলেন যে, 'হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর মূলে যেসকল বিদ্রোহ তাকে রোখবার জন্য আমার ধারনায় যেসব আদেশ রাষ্ট্রের মঙ্গল ও জনগণের উপকার সাধন করবে তা আমি জারি করে থাকি। লোকে আমার নির্দেশের প্রতি অবহেলা ও অশ্রদ্ধা দেখালে আমি বাধ্য হয়ে তাদের বশে আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করি। যে নির্দেশ রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক ও জরুরি পরিস্থিতি বিচার করে সঠিক বলে মনে হয়, আমি তা জারি করি। এগুলি শরিয়তের অনুমোদিত কিনা আমি জানি না। আমি একথাও জানি না, শেষবিচারের দিনে ঈশ্বর আমার বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেবেন'। সুলতান আলাউদ্দীন কাজি ও উলেমাদের ধর্ম উপদেশ ধৈর্য সহকারে শুনলেও এইসব উপদেশ তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বিরোধী হলে তা তিনি গ্রহণ করতেন না। বারানীর ন্যায় মৌলবাদী লেখকরা এইজন্য ধর্মের প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধার অভাবের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমির খসরু আলাউদ্দীনের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি একজন ইসলামের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাজি মুঘিসউদ্দীনকে সুলতান

www.pathagar.com

বলেছিলেন যে, 'Although I have not studied the science or the book, I am a Mussalman of Mussalman stock.' রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তিনি নিজে যা সঠিক বলে মনে করতেন সেই অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণের মারফত তিনি কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং কোন ধর্মীয় প্রভাবে স্বীয় সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হতেন না।

উলেমা ও কাজিরা যথেষ্ট সম্মানিত হলেও রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অক্ষম ছিলেন। আলাউদ্দীনের কঠোর শাসনে বিত্তবান হিন্দুরা যথেষ্ট দুর্ভোগের শিকার হয়েছিলেন কিন্তু আমির, ওমরাহ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও তাঁর হাত থেকে রেহাই পাননি। সেইজন্য বলা যায় যে, 'The policy of Sultan Ala-uddin Khilji positively constituted to a qualitative change in the evolution of Mulsim kingship in India'.

অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ

কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সুলতান আলাউদ্দীন তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকেই উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ, এইসময় পরপর তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র আকাট খান ভাগিনেয় ওমর খান ও মাংগু খান, নয়া মুসলমানদের এবং হাজি মোল্লার বিদ্রোহ হয়।* সুলতান এইসব বিদ্রোহের জন্য প্রধানতঃ চারটি কারণকে দায়ী করেছিলেন। এই চারিটি কারণ হল, (১) সুলতানের রাজকার্যে অবহেলা, (২) অতিরিক্ত মদ্যপান, (৩) আমির-ওমরাহদের মেলামেশা যার ফলে তারা সহজেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারত, (৪) অতিরিক্ত ধনবৃদ্ধি যার ফলশ্রুতিতে অনিষ্ট ও বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল এবং আত্মম্ভরিতা ও আনুগত্যের অভাব দেখা দিয়েছিল।

এইসব কারণ দূর করার জন্য সুলতান আলাউদ্দীন কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সুলতান প্রথম যেদিকে নজর দিয়েছিলেন তা হল, প্রজাদের মধ্যে অনেকের ব্যক্তিগত ধন ও সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে অনুসন্ধান। যারা রাষ্ট্রের বৃত্তিভোগী ও দান ও দাতব্যর উপর নির্ভরশীল তাদের আয় ও সম্পত্তি তিনি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। ইনাম ও অবসরকালীন বৃত্তি এবং ওয়াকফ (ধর্মীয় উদ্দেশ্য দান করা সম্পত্তি) রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করেছিল। বারানীর মন্তব্য অনুসারে বলা যায়, 'লোককে যে কোন অজুহাতে উৎপীড়ণ করে বা জরিমানা করে তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হত। যার ফলে অনেকেই বিত্তহীন হয়ে পড়েছিল। এমনকি অবশেষে কেবলমাত্র অভিজাত ও আমির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা, মুলতানীরা ও ব্যাঙ্কাররা ব্যতীত কারো হাতেই সামান্যতম নগদ অর্থ ছিল না'। দ্বিতীয়তঃ, আলাউদ্দীন তাঁর গুপ্তচর ব্যবস্থা এমনভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছিলেন যে, রাজ্যের অভিজাতদের সকল কার্যকলাপ এবং রাজ্যের সর্বত্র যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাঁর নখদর্পণে ছিল। অভিজাতরা এই গুপ্তচরদের আশংকায় সর্বদা সন্ত্রস্ত ছিল এবং অনেক সময় ইংগিতে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করত।

তৃতীয়তঃ, সুলতান দিল্লীতে মদ্য বিক্রয় ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করার আদেশ জারি করেছিলেন। যারা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করত তাদের কঠোর শাস্তিদান করা হত। সুলতান মদ্যবর্জনের উদাহরণ তুলে ধরার জন্য স্বয়ং মদ পান বন্ধ করেন এবং মদের পাত্র চূর্ণ করেন।

চতুর্থতঃ, সুলতান আলাউদ্দীন আমির-ওমরাহদের সামাজিক অনুষ্ঠান ও মেলামেশা এবং

* এই বিদ্রোহগুলি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ডঃ কে. এস. লাল ও অন্যান্য কয়েকজন লেখক হাজিমোল্লার বিদ্রোহকে ইলবারি তুর্কীদের ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ হাজিমোল্লা সুলতান ইলতুৎমিসের সঙ্গে মাতার দিক দিয়ে সম্পর্কিত এক ব্যক্তিকে দিল্লীতে তিনদিনের জন্য সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কিন্তু মূলতঃ এই বিদ্রোহ ছিল বিক্ষুব্ধ দিল্লীর সাধারণ মানুষের (মুচি, জেল থেকে মুক্ত কয়েদি ইত্যাদির) কোটয়ালের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান। History of the Khaljis.পৃঃ ১১৮' দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সুলতানের বিশেষ অনুমোদন ছাড়া বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষেধ করেন।

এই সূত্রে আলাউদ্দীন কতকগুলি শাসনসংস্কার ও রাজস্ব বিষয়ক সংস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন যার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। আলাউদ্দীন রাজস্ব সংগ্রহকারী খুট, মুকদ্দম ও চৌধুরীদের অর্থ, বিত্ত ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা হ্রাসের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে রাজস্ব সংগ্রহকারীরা সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে জমিদার নামে পরিচিত হয়েছিল। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী যথাক্রমে গ্রাম ও তৃতীয় শ্রেণীর রাজস্ব সংগ্রহকারীরা পরগণার প্রধান ছিল। গ্রামাঞ্চলে এরা বংশানুক্রমিকভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করত। সমকালীন লেখকদের মতে, এইসব রাজস্ব সংগ্রহকারীরা বিত্তবান ও সুবিধাভোগী ছিল। আলাউদ্দীনের নির্দেশ খুট, মুকদ্দম ও চৌধুরীদের যেসব বিশেষ সুবিধা উপভোগ করছিল তা তুলে দেওয়া হল এবং তাদের কৃষকদের সঙ্গে সমান হারে রাজস্ব দিতে বলা হল। সুলতানের বিশেষ লক্ষ্য ছিল যাতে খুটরা বা রাজস্ব সংগ্রহকারীরা তাদের বোঝা বালাহারে বা কৃষকদের উপর চাপিয়ে দিতে না পারেন এবং উভয়ের ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কোন পার্থক্য না থাকে। আলাউদ্দীন জমির মাপজোক করে ও তাদের উৎপাদনের মান অনুসারে রাজস্ব নির্ধারণ করার পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। উৎপাদনের শতকরা পঞ্চাশভাগ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হত। এছাড়া দুগ্ধবতী গাভী ও পশুচারণের জন্য এবং গৃহের উপর কর বসান হয়েছিল। আলাউদ্দীন খলজী তাঁর রাজস্ব সংক্রান্ত আইনকানুন অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে চালু করতে চেয়েছিলেন। তিনি কৃষকদের কাছ থেকে শতকরা ৫০ ভাগ রাজস্ব আদায় করেই ক্ষান্ত হননি, শস্য উৎপাদনকারীদের নির্দিষ্ট মূল্যে রাষ্ট্রের নিযুক্ত বণিকদের উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করতে বাধ্য করেছিলেন। এই শস্য ক্রয় করে বণিকরা সামান্য লাভে রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট মূল্যে শহরে সরবরাহ করতেন। কোন ব্যবসায়ীকেই শস্য গুদামজাত করতে দেওয়া হত না। কৃষকদের উদ্বৃত্ত শস্য সরাসরি শহরের বাজারে বিক্রয় করতে অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে গ্রামাঞ্চলের উৎপাদক ও কৃষিজীবিকে শোষণ করে শহরের প্রয়োজন মেটান হত। বারানী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টির সময়ও দিল্লীতে মূল্যমান বৃদ্ধি পায়নি। কারণ, এইসব সময় রাজকীয় গুদাম থেকে শস্য সরবরাহ করা হত।

কিন্তু কৃষকদের উপর এই রাজস্বের বোঝা চাপান এবং তদুপরি বাধ্যতামূলক ভাবে নির্দিষ্ট মূল্যে উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয়ে বাধ্য করা সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে আলাউদ্দীনের সময়, পরবর্তী যুগে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের ন্যায়, কোন ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ বা অসন্তোষ প্রকাশ পায়নি। সুলতান আলাউদ্দীনের নীতির ফলে রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা ও অতিরিক্ত শোষণের দরুণ কৃষকদের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছিল, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজস্ব আদায়কারী খুট, মুকদ্দম ও চৌধুরী প্রভৃতির হাত থেকে কৃষকরা পরিত্রাণ পেয়েছিল। রাজস্ব আদায়কারীকে কাশ্মীরী ঐতিহাসিক কলহন কৃষকের শূলবেদনা বলে বর্ণনা করেছেন। আলাউদ্দীনের সময় মুকদ্দম, চৌধুরী প্রভৃতি মধ্যসত্ত্বভোগীরা যাতে কৃষকের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করতে না পারে বা তাদের করের বোঝা কৃষকের উপর চাপাতে না পারে সরকার থেকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হত। এই সময়কার নায়েব উজীর শরফ কোয়ি (Saraf Qu'i) গ্রামের হিসাবরক্ষকের বা পাটোয়ারীর খাতা থেকে সরকারের পাওনা রাজস্বের প্রতিটি 'জিতল'* রাজস্ব সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে ও রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের কাছ থেকে আদায় করতেন। রাজস্বের জন্য পাওনা প্রতিটি অর্থের জন্য জোরজুলুম করা হত। এর ফলে

* ৪৮ জিতলে এক তংকা হ'ত।—"The value of a tanka was little more than that of a rupee"—Advanced history, পৃঃ38.

www.pathagar.com

মধ্যসত্ত্বভোগী ও রাজস্ব কর্মচারীদের নির্যাতন ভোগ করতে হত। এইসব নির্যাতনের জন্য রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে লোকে এমনকি কন্যার বিবাহ দিতেও অনিচ্ছুক ছিল। বারানী মন্তব্য করেছেন যে, 'men looked upon revenue officers as something worse than fever. Clerkship was a great crime and no man would give his daughter to a clerk.'

আলাউদ্দীনের এই নীতির ফলশ্রুতিতে রাজস্ব আদায়কারীরা অর্থাৎ খুট, মুকদ্দম ও চৌধুরীরা দুর্দশায় পড়েছিল। সুলতান নিয়ম করেছিলেন যে, রাজস্ব আদায়ের সময় সকলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে এবং কোনক্রমেই খুটদের তাদের করের বোঝা বালাহার অর্থাৎ সাধারণ কৃষকদের উপর চাপাতে দেওয়া হবে না। এইজন্য মোরল্যান্ড মন্তব্য করেছেন যে, আলাউদ্দীনের রাজস্ব সংক্রান্ত বিধানের কঠোরতা প্রধানতঃ বিত্তবান হিন্দুদের প্রতি প্রযোজ্য ছিল।* গ্রামাঞ্চলের এইসব মধ্যসত্ত্বভোগীরা যারা ইতিপূর্বে মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করত ও যারা অশ্বারোহনে যাতায়াত করত তারা দুর্দশায় পড়েছিল। বারানী বলেছেন যে, এর ফলে হিন্দুরা তাদের স্ত্রীদের অপরের গৃহে কাজ করতে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। আধুনিক যুগের কোন কোন লেখকের মতে, সুলতানের হিন্দুদের প্রতি এই মনোভাব আলাউদ্দীনের মুসলমানদের সম্পর্কে গৃহীত নীতির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল।** কিন্তু সুলতান তাঁর স্বধর্মাবলম্বীদের প্রতি যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার কঠোরতা কোন অংশে কম ছিল না। আলাউদ্দীন ইনাম ও 'ওয়ারকফে'র জমি খালিসাতে পরিণত করেছিলেন। ফিরিস্তা অভিযোগ করেছেন যে, সুলতান হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পত্তি একইভাবে দখল করেন। আলাউদ্দীনের লক্ষ্য ছিল, রাজকর্মচারী, অভিজাত ও মধ্যসত্ত্বভোগী সকলের ক্ষমতা খর্ব করা ও রাজস্ব আদায়কারীরা যাতে কৃষকদের শোষণ করে বা রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিয়ে বিত্তশালী হয়ে উঠতে না পারে সে বিষয়ে নজর রাখা। ফলে তাঁর রাজস্ব নীতি সাফল্য লাভ করেছিল। পরবর্তী সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজী এইসব কঠোর বিধি শিথিল করেছিলেন ও রাজস্বের বোঝা হ্রাস করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে মোঙ্গল আক্রমণের শঙ্কা ছিল না ও প্রতিরক্ষার ব্যয় হ্রাস পেয়েছিল। ফলে মধ্যসত্ত্বভোগীরা পুনরায় বিত্তবান হয়ে উঠেছিল। মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য কৃষক বিদ্রোহের কারণ সুলতান আলাউদ্দীনের ন্যায় মহম্মদ বিন তুঘলক মধ্যস্বত্ত্বভোগীর শোষণের হাত থেকে রায়তকে রক্ষা করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

আলাউদ্দীনের অর্থনৈতিক সংস্কার ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে কতকগুলি সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক সংস্কার গৃহীত হয়েছিল। এইসব সংস্কারগুলির উদ্দেশ্য ছিল লোকহিতৈষণা বলে খয়েরউল মজলিসে উল্লিখিত হয়েছে। ডঃ কে. এস. লালের মতে সুলতান আলাউদ্দীনের অর্থনৈতিক সংস্কার ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি তৎকালীন রাজনৈতিক প্রয়োজনেরই ফলশ্রুতি মাত্র। এইসব সংস্কার প্রবর্তনের মূলে লোকহিতৈষণার মহৎ উদ্দেশ্য ও অনুপ্রেরণা ছিল না। কিন্তু কার্যতঃ মূল্যনিয়ন্ত্রণ বিধি কঠোরভাবে চালু হবার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নির্দিষ্ট ছিল ও সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছিল এসম্পর্কে সন্দেহ নাই।

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে বর্বর মোঙ্গল আক্রমণে সমগ্র ইসলামিক সভ্যতা ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল। সমরকন্দ, বোখারা, খিবার ন্যায় উদ্যান নগরীকে মোঙ্গলরা

* W.H. Morreland, Agrarian System of Moslem India, পৃঃ ৩২

** Delhi Sultanate, (Bheratiya Vidya Bhavan) পৃঃ ২৪

www.pathagar.com

মরুভূমিতে পরিণত করেছিল। ১২৫৮ সালে বাগদাদ শহরে মোঙ্গলদের আক্রমণের ফলে প্রায় ৮০ হাজার লোকের প্রাণনাশ হয়। তৎকালীন খলিফা আল মুসতাসিম বিল্লাহকে মোঙ্গলরা নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ইতিপূর্বে সুলতান ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে মোঙ্গলরা চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে ভারতের দ্বারদেশে হানা দিয়েছিল এবং তৎপরবর্তী যুগে ইলতুৎমিসের বংশধরদের আমলে তারা লাহোর ও মুলতান পর্যন্ত নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। সুলতান বলবন মোঙ্গল আক্রমণ কঠোরভাবে প্রতিরোধের জন্য উত্তরপশ্চিমের সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুরক্ষিত করেন। আলাউদ্দীনের রাজত্ব কালে মোঙ্গলরা পুনরায় ভারতে হানা দিতে শুরু করে এবং এইসময় তারা দুইবার রাজধানী দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল।*

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য একটি বিশাল ও দক্ষ সৈন্যবাহিনী রাখার প্রয়োজন হয়েছিল। ওয়াসফের মতে, আলাউদ্দীন এই উদ্দেশ্যে ৪৭৫,০০০ অশ্বারোহীবাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। তাছাড়া মোঙ্গলদের প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন ছিল অস্ত্রশস্ত্রের দ্রুত উৎপাদন ও সামরিক প্রস্তুতি, দুর্গ সংস্কার ও সামরিক বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি। কেবলমাত্র মোঙ্গল আক্রমণই নয়, হিন্দুস্তানে খলজী সাম্রাজ্য প্রসারের পথে বিঘ্নস্বরূপ যেসব স্বাধীন রাজ্য ছিল, যেগুলি জয়ের জন্যও শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের পূর্বে দিল্লীর কোন সুলতানের আমলেই রাজধানী দিল্লী মোঙ্গলদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়নি। অতএব প্রতিরক্ষার দাবিতে সুলতানের বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার বহন করা সহজসাধ্য ছিল না। অতএব বাৎসরিক মাত্র ২৩৪ তংকা বা মাসিক মাত্র ১৯১/২ তংকা একজন অশ্বারোহীর বেতন নির্ধারিত হয়েছিল। যেসব অশ্বারোহী দো আসপি বা দুইটি অশ্ব রাখত তাদের ৭৮ তংকা বেশী দেওয়া হত।

এই সামান্য বেতনে যাতে সৈনিকদের ও তাদের পরিবারবর্গের ব্যয় নির্বাহ হয় সেই উদ্দেশ্যে আলাউদ্দীন অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ চালু করেন। এই মূল্য নিয়ন্ত্রণের পশ্চাদপটে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনের সঙ্গে প্রজাহিতৈষণার প্রশ্নও জড়িত ছিল। সুলতান আলাউদ্দীনের আর্থিক সংস্কারের লক্ষ্য ছিল স্বল্পব্যয় বিশাল ও দক্ষ সৈন্যবাহিনী রাখা যাতে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা যায় আর দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং প্রজাসাধারণ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হয়।

সুলতান আলাউদ্দীনের সময় যেসব আর্থিক সংস্কার প্রবর্তন করা হয়েছিল তার জন্য তাঁকে কোন কোন ঐতিহাসিক 'a daring political economist' বলে অভিহিত করেছেন। এইসব সংস্কারের আওতায় খাদ্যশস্য ও রেশম সহ সর্বপ্রকারের বস্ত্র, অশ্ব ও গবাদি পশু, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী ইত্যাদি আনা হয়েছিল। বারানীর মতে মাথার টুপি থেকে জুতোর ফিতে পর্যন্ত সকল প্রকার পণ্য রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট মূল্য তালিকা অনুসারে স্বল্পলাভে ব্যবসায়ীরা বাজারে বিক্রয় করতে বাধ্য হতেন। বাজারে সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যেসব ব্যবসায়ী শস্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করত তাদের পরিবারবর্গকে রাজধানীতে জামিন হিসাবে বসবাস করতে বাধ্য করা হত।

সুলতান আলাউদ্দীন প্রতিটি পণ্যের উৎপাদনের খরচের দিকে লক্ষ্য রেখে মূল্য নির্ধারণ করতেন এবং বিভিন্ন ধরনের পণ্যের জন্য পৃথক পৃথক বাজার নির্দিষ্ট করেছিলেন। ফলে দিল্লীতে যেসব বাজার সংগঠিত হয়েছিল তা হল শস্যের বাজার, কাপড়, চিনি, ফলমূল ও ঘি এবং তেলের বাজার, ঘোড়া, গবাদি পশু ও দাস-দাসীর বাজার এবং অন্যান্য সব পণ্যের বাজার। শস্য মজুত করার বা স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে অতিরিক্ত লাভজনক মূল্যে বিক্রয় করা

* সুলতান আলাউদ্দীনের সময় হিন্দুস্তানে মোঙ্গল আক্রমণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রভৃতি নিষিদ্ধ হয়েছিল। বাদায়ুন দরওয়াজার কাছে কাপড়ের বাজার বা সরা-ই-আদল স্থাপিত হয়েছিল। প্রতিটি বণিকের নাম দেওয়ান-ই-রিয়াসতে নিবদ্ধিকরণ করতে হত এবং সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার জন্য তাদের নিশ্চয়তা দিতে হত। মুলতানী বণিকরা দুষ্প্রাপ্য বস্ত্র সরা-ই-আদলে সরবরাহ করার জন্য খাজাঞ্চিখানা থেকে অগ্রিম অর্থ ও সহায়তা লাভ করত। কিন্তু মূল্যবান বস্ত্র ক্রয় করার জন্য সরকারি অনুমোদন গ্রহণ করতে হত।

বাজারে পণ্য বিক্রয়ের সময় ওজনে কম বা দামে বেশী যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সাহানা বা তত্ত্বাবধায়ক (superintendent) নিযুক্ত ছিলেন। মালিক কাবুল সাহানা কর্তব্য পালনের জন্য বাজারে বেত হাতে ঘুরে বেড়াতেন এবং অসৎ ব্যবসায়ী ওজনে বা দামের ক্ষেত্রে প্রতারণা করলে বেত্রাঘাত করতেন। সুলতান স্বয়ং তাঁর বালক ভৃত্যদের দিয়ে বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করে মূল্য ও ওজনে ব্যবসায়ীরা খরিদ্দারকে প্রতারণা করছে কিনা এ সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন। কঠোর শাস্তি হিসেবে অসৎ ব্যবসায়ীর গা থেকে, যে পরিমাণ পণ্য ওজনে সে ক্রেতাকে ঠকিয়েছে সেই ওজনের মাংস কেটে নেওয়ার বিধি ছিল।

আলাউদ্দীন প্রবর্তিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধিতে স্বল্প আয়ের যে কোন ব্যক্তি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হত। বারানীর বক্তব্য অনুসারে খাদ্যশস্যর তালিকায় বিভিন্ন পণ্যের কয়েটি নিয়ন্ত্রিত মূল্য নিম্নলিখিত ভাবে নির্দিষ্ট হয়েছিল। যথা—গম প্রতি মন ৭$^{১}/_{২}$ জিতল, চাল প্রতি মন ৫ জিতল, যব প্রতি মন ৫ জিতল, বার্লি প্রতি মন ৪ জিতল, ছোলা প্রতি মন ৫ জিতল ইত্যাদি। এইভাবে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রর মূল্য তাদের উৎকর্ষ অনুসারে নির্দিষ্ট ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এক তংকায় বিশ গজ অথবা ৪০ গজ লংক্রুথ বিক্রয় হত। দামের পার্থক্য উৎকর্ষতার উপর নির্ভরশীল ছিল। রেশমের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য কাপড়ের মূল্য নির্ধারণের সময় এই একই নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের মূল্য তাদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করত। একটি গৃহকর্মে নিযুক্ত করা যায় এইরূপ ক্রীতদাসীর মূল্য ছিল ৫ থেকে ১২ তংকা, আবার একজন সাধারণভাবে ভাল চেহারার ক্রীতদাসী ২০ থেকে ৩০ এমনকি ৪০ তংকা পর্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হ'ত। সুরূপা ও সুদর্শনা ক্রীতদাসীর মূল্য ছিল ২০০ তংকা বা ততোধিক। ক্রীতদাসদেরও এইরূপ তিনটি শ্রেণীবিভাগ ছিল।

উৎকৃষ্ট অশ্বের মূল্য ছিল ১০০ থেকে ১২০ তংকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর অশ্বের মূল্য ছিল ৮০ থেকে ৯০ তংকা আর তৃতীয় শ্রেণীর অশ্ব ৭৫ থেকে ৭০ তংকায় বিক্রয় করা হত। টাট্টু ঘোড়ার মূল্য ছিল ১০ থেকে ২৫ তংকা।

এইভাবে প্রায় প্রতিটি পণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য বিক্রয় না করলে কঠোর শাস্তিদান করা হত। দক্ষিণী ঐতিহাসিক ইসেমী বলেছেন যে, আলাউদ্দীনের প্রবর্তিত নিয়মাবলী ভঙ্গ করলে অপরাধীকে যে কারাগারে প্রেরণ করা হত তা থেকে খুব কম লোকই জীবন্ত অবস্থায় মুক্তি লাভ করত। কারণ, এই কারাগার ছিল আসলে মাটিতে খোঁড়া কতকগুলি গহ্বর মাত্র। কিন্তু এইসব কঠোর বিধি সত্ত্বেও চোরাচালান এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করে অধিক মূল্যে তা পুনরায় বিক্রয় করার রীতি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি।

আলাউদ্দীনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি কি কেবল দিল্লীতেই প্রযোজ্য ছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কেঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। রিজভীর মতে, 'The prices fixed for the Delhi market were also applied in the provincial capitals and towns. It was in the amy's interest that the Delhi regulations should be enforced at other places.'* কিন্তু ডঃ কে. এস. লাল এর বিরোধী মত প্রকাশ করেছেন। পণ্যমূল্য

---

* Wonder that was India, vol. II, পৃঃ -৩৯।

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ বিধি কেবলমাত্র দিল্লীতেই চালু ছিল এই বক্তব্যের সমর্থনে যেসব যুক্তি উত্থাপন করা হয় তা সংক্ষেপে নিম্নে অলোচিত হ'ল।

প্রথমতঃ, সুলতান আলাউদ্দীনের প্রবর্তিত অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রনের সঙ্গে জড়িত সকল পদস্থ রাজকর্মচারীরা দেওয়ান-ই-রিয়াসত, সাহানা-ই মণ্ডি প্রভৃতির কার্যকলাপ বারাণীর তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীতে যখনই আলোচিত হয়েছে তখনই এইসব কার্যের তালিকা ও সীমা দিল্লীর বা তার উপকণ্ঠে নিবদ্ধ বলে মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও বণিকদের দেওয়ান-ই-রিয়াসতে নাম নিবদ্ধিকরণের সময় রাজধানীতে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। স্বভাবতই এর কারণ হচ্ছে দিল্লীর বাইরে মূল্য নিয়ন্ত্রণ চালু ছিল না। তৃতীয়তঃ, দিল্লীর কাপড়ের বাজার সরাই-ই-আদলে বস্ত্র আনার জন্য সুলতান বণিকদের রাজকোষ থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ আগাম দিয়েছিলেন। অন্যথায় অধিক মূল্যে বাইরে থেকে কাপড় কিনে ব্যবসায়ীদের দিল্লীতে নির্দিষ্ট মূল্যে কেনাবেচা করার জন্য লোকসান দিতে হত। সেইজন্য দিল্লী থেকে স্বল্পমূল্যে বস্ত্র ক্রয় করে যাতে রাজধানীর বাইরে নিয়ে বিক্রি করা না যায় দেওয়ান-ই-রিয়াসত সেইদিকে নজর রেখেছিলেন। চতুর্থতঃ, বারানী অভিযোগ করেছেন যে, স্বল্প ও নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে পুনরায় সেই পণ্য লাভজনক দামে বিক্রয় করার রীতি সাধারণের মধ্যে চালু ছিল। দিল্লীতে সকলেই নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করার সুবিধা লাভ করত। অতএব রাজধানীর বাইরে এই ধরনের বেআইনী কেনাবেচা ও চোরাকারবার চালানোর প্রয়াস ছিল। ফতোয়া-ই-জাহান্দারীতে বলা হয়েছে যে, 'মণ্ডির গোমস্তাদের ও সাহানাদের এবং শহরগুলির কোতোয়ালদের উপর সুলতানের এই মর্মে হুকুমজারি করা উচিত যে, কোন পরিস্থিতিতেই রাজধানীতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করে তা উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া যাবে না।' কঠোর শাস্তিদান সত্ত্বেও এই নিয়ম লঙ্ঘনের উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু এইসকল বিধির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেবলমাত্র রাজধানীতেই মূল্য নিয়ন্ত্রণ চালু ছিল।

পঞ্চমতঃ, বারানী মন্তব্য করেছেন, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও পণ্যমূল্য হ্রাসের ফলে রাজধানী দিল্লীকে নানা জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি তাঁদের স্থায়ী আবসস্থলে পরিণত করেছিলেন। ষষ্ঠতঃ, যে সব বৎসরে অনাবৃষ্টির জন্য বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে খাদ্যাভাব দেখা দিত দিল্লীতে সেই সময়ও খাদ্য সরবরাহ নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। কারণ রাজস্ব বিভাগ থেকে বণিকদের খাদ্যশস্য সংগ্রহে সহায়তা করা হ'ত এবং সরকারী গুদাম থেকে প্রত্যেক ক্রেতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল ও দিল্লীতে পণ্যমূল্য স্বল্প ছিল। বারানী মন্তব্য করেছেন যে, 'Unvarying price of grain in the market was, looked upon as one of the wonders of the time.' সর্বশেষে বলা যায় যে, সুলতান আলাউদ্দীন খলজী যেভাবে পণ্যমূল্য সম্পর্কে ও ওজনে ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের ফাঁকি দেন কিনা দেখার জন্য তাঁর বালক ভৃত্যদের বাজারে পাঠিয়ে অবহিত হতে সচেষ্ট ছিলেন তা একমাত্র দিল্লীতেই করা সম্ভব ছিল। ঐতিহাসিক ডঃ কে. এস. লাল এইসব যুক্তির ভিত্তিতে মনে করেন যে, আলাউদ্দীনের আমলে একমাত্র রাজধানীতেই পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হয়েছিল।

অধ্যাপক লালের* এই অভিমতের সঙ্গে ডঃ সাকসেনার মতভেদ সুস্পষ্ট। ডঃ সাকসেনার মতে, বারানী তাঁর বিবরণীতে দিল্লীর গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করেছেন ও প্রাদেশিক শহর বা

* History of the Khaljis পৃঃ ২২০ - ২২৩

www.pathagar.com

কসবাগুলির এবং গ্রামাঞ্চলের ভূমিকাকে অবহেলা করেছেন।* ঐতিহাসিক বেনারসী প্রসাদ সাকসেনা মন্তব্য করেছেন যে, সৈন্যবাহিনীর লোকজন সমগ্র সাম্রাজ্য থেকে সংগৃহীত হত এবং তাদের পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাস করত। অতএব কেবলমাত্র দিল্লীতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত হলে স্বল্পবেতনভোগী অশ্বারোহীবাহিনীর বা সৈন্যবাহিনীর লোকেদের কোন সুরাহা হবার সম্ভাবনা ছিল না। সেইজন্য আলাউদ্দীনের কেবলমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন বাজার সৃষ্টি করার বাসনা ছিল না। সরা-ই-আদলের পণ্য বাইরে যাওয়া বাঞ্ছনীয় না হলেও এসম্পর্কে সুলতানের বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, যেসব বণিকরা প্রদেশ থেকে দিল্লীতে পণ্য আমদানী করতেন তাঁরা আবার উত্তর ভারতের পণ্য দূরদূরান্তরে রপ্তানীও করতেন এবং তাঁরা নগদে যে সাহায্য লাভ করতেন তা কেবল আমির-ওমরাহদের জন্য রেশম ও অন্যান্য মূল্যবান পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় হত।

অধ্যাপক সাকসেনা মনে করেন যে, সুলতান আলাউদ্দীন প্রবর্তিত অর্থনৈতিক নিয়মাবলী তার রাজ্যের সর্বত্র প্রযোজ্য ছিল বলে ফিরিস্তা যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা যুক্তিসঙ্গত। বারানীর লেখনী পাঠে মনে হয়, সুলতান তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্য নয় কেবলমাত্র দিল্লীকে অনাহার থেকে রক্ষা করতে তৎপর হয়েছিলেন। সেইজন্য বারানী তাঁর তৃতীয় নিয়মাবলীতে (Third Regulation) লিখেছেন যে, সুলতানের হুকুম অনুসারে দোয়াবের খালিসা অঞ্চলের সমস্ত উৎপাদন থেকে রাজস্ব নগদে বা ফসলে আদায় করে দিল্লীতে প্রেরণ করতে বলা হয়েছিল। এই নির্দেশ পালিত হবার অর্থ দিল্লীতে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য মজুত রাখার ব্যবস্থা করা ও অন্যান্য কসবা বা শহরকে উপবাসী রাখা। ষষ্ঠ নিয়মাবলীতে বারানী যেভাবে সুলতানের নির্দেশ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তা থেকে মনে হয় যে, খালিসা গ্রামগুলিতে বসবাসকারী কৃষকরা তাদের উৎপাদনের অর্ধেক রাজস্ব হিসেবে দিত ও তাদের উদ্বৃত্ত শস্য নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য হত এবং নিজেদের খোরাকী হিসেবে কোন ফসল গোলায় রাখতে পারত না। এই ধরনের অযৌক্তিক বক্তব্যর সঙ্গে ফিরিস্তা ঐক্যমত না হয়ে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে আবার এই দুইটি নিয়মাবলীকে মুসাবিদা করেছিলেন।

ফিরিস্তার মুসাবিদা পুনর্লিখনে আলাউদ্দীনের দ্বিতীয় নিয়মাবলী অনুযায়ী রাজস্ব বিভাগের প্রাপ্য খালিসার অন্তর্গত অঞ্চলে ফসলে আদায় করে শহর বা কসবাতে মজুত রাখতে বলা হয়েছিল। শস্যের সরবরাহের অভাব হ'লে সরকারের নির্দিষ্ট মূল্যে ও সরকারের নির্দিষ্ট দোকান থেকে তা বিক্রয় হত।

পঞ্চম নিয়মাবলীতে বলা হয়, রায়তরা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত শস্য মাঠেই নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করবে। ফলে তারা অধিক মূল্যে ফসল বিক্রয় করার সুযোগ পাবে না। এইভাবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব ফসলে সংগৃহীত হয়ে শহরে মজুত থাকত। সাধারণত রায়তদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল ক্ষেতেই বিক্রি করতে বলা হয়েছে। আবার ইচ্ছা করলে তারা নিকটবর্তী গঞ্জে বা শহরে গিয়ে সরকারের নির্দিষ্ট মূল্যে তাদের উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করতে পারত। দুর্ভিক্ষের সময় প্রতিটি কৃষক পরিবারের কি পরিমাণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজন তার হিসাব সহজেই পাওয়া যেতে। আমির খসরু বলেছেন, খালিসার রাজস্ব দুর্ভিক্ষের সময় মকুব করার রীতি ছিল।

অতএব এই আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, সুলতান আলাউদ্দীনের সময় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেবলমাত্র দিল্লীতেই প্রযোজ্য হয়েছিল একথা সর্বজনগ্রাহ্য মত নয়। এমনকি

* Comprehensive history of India, Vol. V, পৃঃ ৩৮৭

www.pathagar.com

এই যুগে কতকগুলি পণ্যের ক্ষেত্রে দিল্লীতে অন্যান্য স্থানের তুলনায় মূল্য বেশী ছিল বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু দিল্লী রাজধানী হওয়াতে সকলপ্রকার নিয়মকানুন এখানে যত কড়া ছিল অন্যত্র সরকারী নজরদারীর কড়াকড়ি সম্ভবতঃ ততটা ছিল না। যেখানেই শৈথিল্য সেখানেই নিয়মভঙ্গের উদাহরণ বেশী এবং দুর্নীতির প্রসারে সম্ভাবনা সমধিক।

মূল্যয়ন

সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সংস্কারগুলি স্থায়ী হয়নি। এইজন্য একজন লেখক মন্তব্য করেছেন যে, 'The foundation of the military monarchy that he tried to build up was, however, laid upon sand.' সুলতান আলাউদ্দীনের কঠোর ব্যবস্থা সকলের ভীতির কারণ হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে খুট, মুকদ্দম ও চৌধুরী থেকে সাধারণ রায়ত পর্যন্ত সকলেই করভারে পীড়িত ছিল। শহরের ধনী ও নির্ধন এবং আমির-ওমরাহরা সর্বদা সুলতানের গুপ্তচরদের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত ছিল। সুলতানের আদেশ পালনের জন্য তাঁর প্রজারা বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিল। আলাউদ্দীন প্রজাদের প্রীতি ও আনুগত্যের উপর তাঁর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। তাঁর সাম্রাজ্যের ভিত্তি এইজন্য দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। সুলতানের কঠোর ব্যবস্থা সকলের ভীতির কারণ হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এইগুলির অবসান হয়।

আলাউদ্দীনের পুত্র মুবারক খলজী প্রায় ১৭ হাজার বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এইসব বন্দীরা যেসব কারাগারে প্রেরিত হতেন সেখান থেকে জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভ করা কঠিন ছিল এবং অনেক বন্দীরই এখানে জীবনাবসান হয়। আলাউদ্দীনের কঠোর শাসনের বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে এসে প্রজারা কিরূপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন এসম্পর্কে মন্তব্য করে বারানী বলেছেন যে, 'ইহা বল, উহা বলিও না; ইহা প'ড়, উহা পড়িও না; ইহা খাও, উহা খাইও না; এইভাবে থাক, এইভাবে থাকিও না' ইত্যাদি নিয়ম-অনিয়মের ভীতি ও কঠোরতার চাপ থেকে আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর মানুষ মুক্তিলাভ করেছিল।'

আলাউদ্দিনের নীতির সমালোচনা করার সময় কতকগুলি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যে পরিস্থিতিতে সুলতান আলাউদ্দীন তাঁর শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন তাতে এইসকল ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে কার্যকরী হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে ও দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। সাম্রাজ্য বিস্তার করে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে তিনি খলজী শাসন প্রসার করেছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে সুলতান আলাউদ্দীন সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। এইসব কারণে কঠোর আর্থিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুরাহা হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের বিত্তবানরা বিলাসিতা ও সচ্ছলতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দীনের কঠোর নিয়মাবলী কেবলমাত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে লক্ষ্য করে রচিত হয়েছিল এবং মুসলমানরা কোন অসুবিধা ভোগ করেনি, এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রথমতঃ, সুলতান ইনাম ও ওয়াকফে দেওয়া জমি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। দ্বিতীয়তঃ, কাজি মুঘিসউদ্দীনের সঙ্গে আলাউদ্দীনের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উলেমাদের প্রভাব বিস্তার করতে দিতে সুলতানের অনীহা ছিল। তৃতীয়তঃ, কৃষকদের কাছ থেকে উচ্চহারে রাজস্ব আদায় করলেও তিনি রায়তকে খুট, মুকদ্দম, চৌধুরী প্রভৃতি মধ্যসত্ত্বভোগীদের শোষণ থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। চতুর্থতঃ, শহরের আমির-ওমরাহ ও বিত্তবানরা তাঁর রাজত্বে সর্বদা গুপ্তচরদের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। অতএব ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের প্রতি তিনি সমভাবে কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলেন।

www.pathagar.com

ইবন বতুতার মতে দিল্লীর সিংহাসনে যে সমস্ত সুলতান আরোহন করেছিলেন আলাউদ্দীনকে তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা যায়। তাঁর চরিত্রের অন্যতম কলঙ্ক হচ্ছে তাঁর নিষ্ঠুরতা। অন্যথায় সুলতান আলাউদ্দীন সামরিক ক্ষেত্রে ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারক হিসেবে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর সময় দিল্লীর সাম্রাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সম্প্রসারিত হয়েছিল। আলাউদ্দীনের অর্থনৈতিক সংস্কার মধ্যযুগের ইতিহাসে তাঁর দক্ষতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছে। এইসব সংস্কার স্থায়ী হয়নি বলে যাঁরা অভিযোগ করেন তাঁদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, জরুরী রাজনৈতিক ও আর্থিক সঙ্কটে এই সব বিধি চালু করার প্রয়োজন হয়েছিল এবং পরিস্থিতির সুরাহা হবার পর স্বভাবতই এদের কার্যকারিতার অবসান হয়েছিল। কিন্তু আলাউদ্দীনের এইসব বিধি প্রবর্তন রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করেছিল এবং সুলতান বৈদেশিক শত্রুকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইযুগে মোঙ্গল আক্রমণ থেকে হিন্দুস্তানকে রক্ষা করার জন্য দিল্লীর সিংহাসনে তাঁর মত দক্ষ সামরিক নেতা ও প্রশাসকের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে রাজধানী দিল্লীতে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল এবং দিল্লীকে কায়রো ও কনস্টানটিনোপলের সঙ্গে তুলনা করা হত। এইসব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও লেখক এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে আমির খসরু ও আমির হাসান ছিলেন অন্যতম। আলাউদ্দীন ১৩১১ সালে কুতুব মসজিদের সম্প্রসারণ করেন ও কুতুবমিনার অপেক্ষা উচ্চ একটি মিনার নির্মাণ শুরু করেন। শেষোক্ত পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে শেখ নিজমউদ্দীন আউলিয়ার দরগার সন্নিকটে জমায়েত খানা মসজিদ ও কুতুবমিনারের এলাকায় আলাই দরওয়াজা নির্মিত হয়। তাঁর হুকুমে যে সব দুর্গ নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে আলাই দুর্গ বা কুসক-ই-সিরি অন্যতম। এই জন্য বলা যায় যে, 'Ala-ud-din was the first Muslim imperialist and the first great Muslim administrator of India.'*

খলজী শাসনের অবসান

২রা জানুয়ারী, ১৩১৬ সালে সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর মৃত্যু হয়। সুলতানের প্রিয়পাত্র কাফুর তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে অনেকে অনুমান করেছিলেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর দুইদিন পর রাজধানীতে সমবেত অভিজাতদের কাফুর একটি উইল প্রদর্শন করে সুলতান আলাউদ্দীনের শেষ ইচ্ছা সম্পর্কে জানান। সম্ভবত কাফুরের প্রভাবেই এই উইল লিখিত হয়েছিল। এই উইল অনুসারে শিহাবউদ্দীন উমর নামে সুলতান আলাউদ্দীনের একটি নাবালক পুত্রকে সিংহাসনের অধিকারী বলে ঘোষণা করে মালিক কাফুর তাঁর অভিভাবক হিসেবে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এইসময় কাফুর সুলতান আলাউদ্দীনের বেগম ও রামচন্দ্রদেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। আলাউদ্দীনের পুত্রদের মধ্যে খিজির খাঁ ও শাদি খাঁকে অন্ধ করে দেওয়া হয় এবং অন্যান্যদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এইভাবে ৩৫ দিন রাজ্য পরিচালনার পর কাফুর যখন আলাউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র মুবারক খানকে অন্ধ করার জন্য চারজন পাইককে প্রেরণ করেন তখন মুবারক খান তাদের আনুগত্যের প্রতি আবেদন জানান এবং নিষ্কৃতির বিনিময়ে গলার রত্নখচিত হার উপহার দেন। এই চারজন পাইক মুবারক খানকে অন্ধ না করে প্রত্যাবর্তন করে

* Delhi Sultanate (Bharatiya Vidya Bhavan) পৃঃ ৪০।

www.pathagar.com

এবং নায়েব মালিক কাফুরের কামরায় প্রবেশ করে তাকেই হত্যা করেছিল।* মুবারক খাঁ মুক্তিলাভের পর প্রায় দুই মাসকাল শিহাবউদ্দীন উমরের প্রতিনিধি রূপে রাজ্যশাসন পরিচালনা করেছিলেন। পরে তিনি কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজী উপাধি নিয়ে ১৯শে এপ্রিল ১৩১৬ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। নাবালক সুলতান শিহাবউদ্দীন উমরকে এইসময় অন্ধ করে দেওয়া হয়।

সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজী (১৩১৬-১৩২০ খ্রীঃ)

রাজত্বের প্রথমার্ধে সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজী যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কারণ তিনি সুলতান আলাউদ্দীনের আমলে প্রবর্তিত কঠোর নিয়মাবলী বাতিল করে দিয়েছিলেন। বহু বন্দীকে এইসময় মুক্তিদান করা হয় এবং ইনাম ও ওয়াকফ জমি এবং অন্যান্য ভূসম্পত্তি যা পূর্বতন সুলতান বাজেয়াপ্ত করেছিলেন তা এইসময় ফেরত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সুলতান তার চারবৎসর চারমাস রাজত্বকালে বিলাস-লালসাময় মদির-মধুর জীবনযাপন করে কালাতিপাত করেন এবং রাজকার্যের ভার গুজরাট থেকে আগত হাসান নামে একজন ধর্মান্তরিত ক্রীতদাসের উপর অর্পন করেছিলেন। হাসান পরে খসরু খান উপাধিতে ভূষিত হন। খসরু খানকে 'বারানী বারওয়ার' এবং আমির খসরু 'বারাদো' নামে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তব খসরু খান 'বারওয়ার' নামে গুজরাটের মেষপালকদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন লেখকের অভিমত থেকে বোঝা যায় যে, এই বারওয়ার গোষ্ঠীকে সঠিকভাবে সনাক্ত করা সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। সুলতান আলাউদ্দীনের সময় মালিক কাফুর যেমন রাজশক্তি কুক্ষিগত করে স্বয়ং সকল ক্ষমতা দখল করেছিলেন খসরু খানও একই প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন।

সৌভাগ্যবশতঃ সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজীর রাজত্বকালে কোন মোঙ্গল আক্রমণ হয়নি এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। এই সময় দুইটি বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। উত্তর ভারতে, গুজরাটে বিদ্রোহ দেখা দিলে আইন-উল-মুলুক মুলতানী এই বিদ্রোহ দমন করেন। সুলতানের শ্বশুর এবং মালিক দিনার (পরবর্তীকালে জাফর খাঁ) এইস্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে দেবগিরির শাসনকর্তা হরিপালদেব বিদ্রোহী হলে সুলতান স্বয়ং তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। হরিপালদেব পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয়গ্রহণ করলে খসরু তাঁর পশ্চাদধাবন করে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেছিলেন। হরিপালদেবকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এইসময় খসরু খানকে তেলিঙ্গানার বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করে সুলতান দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এইসব সাফল্য কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজীর দম্ভকে আকাশচুম্বী করেছিল। দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বিদ্রোহের আশংকায় বহু নির্দোষ রাজকর্মচারীর প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়েছিলেন। এইসময় মুবারক শাহর আদেশে খিজির খাঁ সহ আলাউদ্দীনের অন্যান্য তিন পুত্রের জীবননাশ করা হয়েছিল। সুলতানের দরবারে সুরা ও নারীর প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এইসময় সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজী নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করে আল-ওয়াসিক বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

সুলতানের ব্যভিচার ও বিলাসিতা এবং রাজকার্যে অবহেলার সুযোগে খসরু খান তাঁকে

---

* এই পাইক সৈন্যরা খলজী যুগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আলাউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র আকট খান যখন তাঁকে হত্যা করার প্রচেষ্টা করেন তখন পাইকরা সুলতানের প্রাণ রক্ষা করে তাদের মধ্যে মানকা পাইক প্রসিদ্ধ। মুবারক খলজীর প্রাণরক্ষাকারী পাইকদের নাম ছিল বসির, মুবসির, শালাই ও মুনির। পরবর্তীকালে প্রথমস্ত দু'জনের প্রাণদণ্ড হয়।

www.pathagar.com

হত্যা করে সিংহাসন দখলে সচেষ্ট হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের মা'বার (Ma'abar) অভিযানের সময় খসরু খানের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে মালিক তলবাঘ, মালিক তমর ও অন্যান্য রাজভক্ত আমির-ওমরাহরা খসরুর উদ্দেশ্যের বিষয় সুলতান মুবারক খলজীকে বিস্তারিত সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন। ফলে খসরু খানকে রাজধানীতে আহ্বান করা হয়। কিন্তু দিল্লীতে পদার্পণ কর্‌বার পর তাঁকে দরবারে পূর্ণ মর্যাদায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। আর খসরুর বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ করেছিল সেইসব আমিরদের কঠোর শাস্তিদান করা হয়েছিল। সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজী খসরুর প্রতি এই অন্ধবিশ্বাসের ফলে অতি শীঘ্র তিনি স্বীয় প্রিয়পাত্রের হাতে প্রাণ হারালেন। ১৩২০ সালের ১৫ই এপ্রিল খসরু খান ও তাঁর সঙ্গীরা সুলতানের শয়নকক্ষে অনুপ্রবেশ করে মুবারক খলজীকে হত্যা করেছিল। মুবারক খলজী নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করে দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাগদাদের খলিফার প্রভাব থেকে সুলতানী শাসনকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ধর্মীয় উপবাস ও প্রার্থনায় যোগ দিতেন না এবং শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার ন্যায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় ফকিরের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করতেও দ্বিধা করেন নাই।

সুলতান নাসিরউদ্দীন খসরু শাহ

খসরু খান সুলতান নাসিরউদ্দীন খসরু শাহ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। রিজভী বলেছেন যে, 'বারানী ও তাঁকে অনুসরণ করে অন্যান্য ঐতিহাসিকরা যাদের মধ্যে আধুনিক যুগের লেখকরাও আছেন অভিযোগ করেছেন যে, খসরু খান প্রাসাদে পৌত্তলিকতার প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং ইসলামের ও কোরানের অবমাননা করেছিলেন কিন্তু এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।* আমির খসরু ও ইবন বতুতা বলেছেন যে, আমির ওমরাহ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা তাঁকে সমর্থন করে খসরু শাহের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন।

একমাত্র দিপালপুরের শাসনকর্তা গাজি মালিক ও তাঁর পুত্র ফকরুদ্দীন জৌনা, যিনি খসরু খানের সিংহাসন লাভের সময় দিল্লীতে ছিলেন ও অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন, নব প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। খসরু খানের ক্ষমতা দখলের কিছুদিন বাদে ফকরুদ্দীন জৌনা তাঁর পিতার সঙ্গে যোগদানের জন্য দিল্লী থেকে পলায়ন করেছিলেন। তিনি উচের শাসনকর্তা বহরম আইবার পুত্রকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গাজি মালিকের শিবিরে যোগদান করেন। এরপর গাজি মালিক নাসিরুদ্দীন শাহের বিরুদ্ধে উচ্, মুলতান, শিবিস্তান (সেওয়ান), সামানা, ঝালোরের শাসনকর্তা ও আইন-উল-মুলুক মুলতানীর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। এদের মধ্যে বহরম আইবার সমর্থন তিনি সহজেই লাভ করেন কারণ, ইতিপূর্বেই আইবার পুত্রকে জৌনাখাঁ তাঁর সঙ্গী হতে বাধ্য করেছিলেন। গাজি মালিক পশ্চিম সীমান্তে অন্য যেসব শাসনকর্তার কাছে সাহায্যের আবেদন করেন তাঁদের মধ্যে প্রায় কেউই তাঁকে স্বেচ্ছায় সমর্থন করেননি। তিনি শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার কাছে নৈতিক সমর্থন লাভে সক্ষম হননি।

গাজি মালিক যে অভিযান করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল নাসিরুদ্দীন খসরু শাহ কর্তৃক হিন্দুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করা। কিন্তু নাসিরুদ্দীন খসরু শাহ যদি হিন্দু শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তৎপর হতেন বা ইসলাম ও কোরানের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন

* Wonder that was India, Vol II, পৃঃ ৪৩।

www.pathagar.com

করতেন তাহলে গাজি তুঘলকের সৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁর মুসলমান সৈন্যরা কখনই অস্ত্রধারণ করতেন না। অতএব একথা সহজেই উপলব্ধি করা যায়, যে, গাজি তুঘলক ইসলাম বিপন্ন এই জিগির তুলে স্বয়ং দিল্লীতে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন।* কারণ, তুর্কী বিজয়ের পরবর্তীকালে নাসিরুদ্দীন খসরু শাহই একমাত্র সুলতান যাঁর ধমনীতে বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী রক্ত প্রবাহিত ছিল। গাজি তুঘলকের জেহাদ এইজন্য ছিল একটি অজুহাত মাত্র। তিনি খসরু খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং ধর্মের ধ্বজা তুলে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখে ১৩২০ সালে দিল্লীর উপকণ্ঠে সুলতান নাসিরউদ্দীন খসরু শাহের বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে গাজি মালিকের সৈন্যবাহিনী প্রথমে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু বিজয়ী সৈন্যদল যখন লুটপাটে ব্যস্ত সেই সুযোগে গাজি মালিক তাঁর বাহিনী পুনরায় সংগঠিত করে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করে ধ্বংস করেছিলেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন খসরু শাহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে শাদি খানের উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এই স্থানে পরের দিন তাঁকে ধরা হয় এবং নাসিরুদ্দীন খসরু শাহের প্রাণদণ্ড হয়। অতঃপর গাজি মালিক আলাউদ্দীনের বংশধরদের অনুসন্ধান করেছিলেন। কিন্তু খলজী বংশ নিশ্চিহ্ন হওয়াতে সমবেত অভিজাতদের অনুরোধে গাজি মালিক সিংহাসনে আরোহণ করেন ও তুঘলক শাসনের সূত্রপাত করেন (১৩২০)।

* ডঃ ত্রিপাঠি মন্তব্য করেছেন যে—'The slogan of revenge for religion, so common yet so effective in the history of the Muslims was now started'. Some Aspects of Muslim Administration (2nd Ed.) পৃঃ ৫৬।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

তুঘলক বংশের পত্তন ও দিল্লীর সুলতানী শাসনের অবক্ষয়ের সূত্রপাত

তুঘলক বংশের পত্তন

সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলককে মরক্কোর ভ্রমণকারী ইবন বতুতা করৌনা তুর্কী বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু শেষোক্তরা তুর্কী বা মোঙ্গল গোষ্ঠীর লোক এসম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। ফিরিস্তা বলেছেন যে, গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের পিতা মালিক তুঘলক ছিলেন বলবনের আমলের একজন তুর্কী ক্রীতদাস এবং তাঁর সঙ্গে একজন জাট রমনীর বিবাহের ফলে গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের জন্ম হয়।* অতএব গিয়াসউদ্দীন তুঘলক খুব সামান্য অবস্থা থেকে পদোন্নতি করেন এবং সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সময় গিয়াসউদ্দীন তুঘলক বা গাজি মালিক উত্তরপশ্চিম সীমান্তের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। এইযুগে তিনি মোঙ্গল আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যের সীমান্তকে সুরক্ষিত করেছিলেন।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের শেষবয়সে দিল্লীর সিংহাসন লাভ (১৩২০) জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজীর রাজমুকুট ধারণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উভয়েই পুরাতন রাজবংশের অবক্ষয় ও পতনের ফলে ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন। আরেকটি বিষয়ে গিয়াসউদ্দীনের সঙ্গে জালালউদ্দীনের সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উভয়েই সিংহাসনে আরোহনের পূর্বে অন্তত মৌখিকভাবে রাজমুকুট ধারণ করতে তাঁদের অনীহার কথা বলেছিলেন। বারানী বলেছেন যে, খসরু খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের পর গাজি মালিক বলেন যে আলাউদ্দীনের বংশের যেকোন ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাতে তিনি রাজি ছিলেন কারণ, রাজ্যলাভের জন্য তিনি অস্ত্রধারণ করেননি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ গ্রহণ ও হিন্দুদের ক্ষমতা লাভ থেকে বঞ্চিত করা। আমির খসরু তাঁর তুঘলকনামাতে গিয়াসউদ্দীনের সিংহাসনে আরোহন করার অনীহার কথা লিপিবদ্ধ করার সূত্রে এমন কথাও লিখেছেন যে, গাজি তুঘলক নিজেকে একজন 'ভবঘুরে' বা আওয়ারা বলে অভিহিত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। যাইহোক, অবশেষে অভিজাতদের অনুরোধে গাজি তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। **

গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের নীতি

সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক সিংহাসন লাভের পর পূর্বতন আমলের দুর্নীতি ও শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতার অবসান করার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে নাসিরুদ্দীন খসরু শাহ বিভিন্ন

---

* এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আগা মাহেদী হুসেনের Rise and Fall of Muhammad bin Tughluq, পৃঃ ৫১ দ্রষ্টব্য।

** Tughluqnamah, পৃঃ ১৪২, অনুসারে গাজি মালিকের বক্তব্য ছিল, সিংহাসনে বসলে লোকে এই বলে তাঁর বদনাম করবে যে, ধর্ম নয়, রাজসিংহাসন লাভের জন্য তিনি লড়াই করেছেন।

www.pathagar.com

সুফী ও ফকিরদের তাঁর জন্য প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে বহু অর্থদান করেছিলেন। গ্রহীতারা অনেকেই গাজি মালিককে এই অর্থ প্রত্যার্পণ করেন, কিন্তু শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া রাজকোষের অর্থ জনগণেরই সম্পদ বলে মনে করতেন এবং দরিদ্র ও দীন দুঃখীদের মধ্যে তা বিতরণ করেন। ফলে গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের সঙ্গে শেখ নিজামউদ্দীনের প্রথম থেকেই মনমালিন্য হয়েছিল।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক কয়েকজনকে পরিতুষ্ট করে বা দানধ্যানের মাধ্যমে লোককে চমকে দেবার চেষ্টা করেননি। কিন্তু সকলকে উদার হস্তে অর্থ ও উপহার দিয়ে সুলতান যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিলেন। এইসময় আলাউদ্দীনের সময় রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি পুনরায় মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আবার বেআইনীভাবে প্রাপ্ত জমির স্বত্ব সরকার কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হয়েছিল। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যোগ্য প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। পতিত জমি উদ্ধার করা হয়েছিল, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও ইকতার মালিকদের দায়ী করা হয়েছিল। কৃষির প্রসার করা হয়েছিল। উৎপাদনের এক দশমাংশ বা এক একদশমাংশ রাজস্ব হিসেবে দাবি করা হ'ত। খাল খনন করে জমিসেচের ব্যবস্থা হয়েছিল। রাজস্ব আদায়কারীর জমিকে কর থেকে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। নির্যাতন করে রাজস্ব আদায় বন্ধ করা হয়েছিল। অভিজাতরাও বহু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। আবার যে কোন উপায়ে অতিরিক্ত ধনসঞ্চয় করে লোকেযাতে বিদ্রোহ না করে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের আমলে নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মারফতে সরকারের সকল বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সুলতান দরিদ্রদের সাহায্যদানের জন্য নিয়মিত অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সুলতান সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে আমির খসরুর ন্যায় কবি ও সাহিত্যিক দরবারের শোভাবর্দ্ধন করেছিলেন। সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য রানার এবং ঘোড়সওয়ার রাজ্যের সর্বত্র যোগাযোগ বজায় রাখত।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের খলজী নীতি অনুসরণ করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে বরঙ্গলের কাকতীয় রাজা দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্রদেব দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যে পরিবর্তন ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে করদান বন্ধ করেছিলেন। এই সুযোগে তিনি দক্ষিণ ভারতের রাজাদের দিল্লীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না করে কেবলমাত্র স্বীয় রাজ্যবিস্তারে মনসংযোগ করেছিলেন। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক পুত্র জৌনা খানকে বা উলুঘ খানকে রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে (১৩২১-২২ খ্রীঃ) তেলিঙ্গানার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই অভিযানে বহু সৈন্যের প্রাণনাশ হয়, কারণ হিন্দুরা প্রবল বিক্রমে অবরোধকারীদের বাধাদান করেছিল। ফলে দিল্লীর সৈন্যবাহিনী ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিল। বারানীর মতে, জৌনা খানের সঙ্গী উবেদ নামে এক কবি সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সুলতানের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচার করেছিলেন এবং বহু অভিজাত সৈন্যবাহিনী ত্যাগ করে চলে যান। এইজন্য জৌনা খান তেলিঙ্গানার অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইবন বতুতার মতে, উলুঘ খান স্বয়ং এই সময় সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার দরুন এই অভিযান ব্যর্থ হয়। তেলিঙ্গানার অবরোধের সময় হিন্দুদের আক্রমণে দিল্লীর সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী ডাকচৌকীগুলি ধ্বংস হওয়াতে এই ধরনের গুজব প্রচারিত হয়। ফলে জৌনা খান অবরোধ তুলে দিয়ে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৩২৩ সালে বরঙ্গলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযানে পুনরায় জৌনা খানকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। প্রথম অভিযানের সময় যাদের ভিত্তিহীন গুজব প্রচারের ফলে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন তাদের শাস্তিদান করা হয়। তেলিঙ্গানার দ্বিতীয় অভিযানের ফলে প্রতাপরুদ্রদেব আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং

www.pathagar.com

তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল। এইসময় বরঙ্গল দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বারানী বলেছেন যে, এই স্থানের নাম পরিবর্তিত করে সুলতানপুর রাখা হয়েছিল। কিন্তু গুন্টুরে প্রাপ্ত একটি লিপিতে ১৩২৬ সালে প্রতাপরুদ্রদেবকে শাসক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে অনুমান করা যায় যে, সম্ভবতঃ তিনি দিল্লীর বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন অথবা তিনি দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করে করদরাজা হিসেবে রাজত্ব করেছিলেন।

স্থানীয় ইতিবৃত্ত অনুসারে ১৩২৩ সালে দিল্লী থেকে একটি অভিযানে মাদুরা (সমকালীন পারসিক ঐতিহাসিকদের মা'বার) সুলতানী সাম্রাজ্যের পদানত হয়েছিল। ১৩২৭ সালে মহম্মদ বিন তুঘলক যখন দেবগিরি (বা দৌলতাবাদে) রাজধানী পরিবর্তন করেছিলেন সেইসময় দক্ষিণ ভারতের যেসমস্ত রাজ্য সুলতানের শাসনাধীন ছিল বলে বারানী উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে মাদুরা অন্যতম। অথচ ১৩২৭ সালের পূর্বে সুলতান এইস্থানের বিরুদ্ধে কোন অভিযান প্রেরণ করেছিলেন বলে সমকালীন ইতিহাসে উল্লিখিত হয়নি। সুতরাং প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভের পর জৌনা খান মাদুরা জয়ের জন্য অভিযান করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় সমকালীন কোন ইতিবৃত্ত থেকে এইরূপ একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা জানা যায় না।

বারানী বলেছেন যে, বরঙ্গল জয়ের পর জৌনা খান পূর্ব উপকূল দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি জাজনগরের দিকে অভিযান করেছিলেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে ৪০টি হস্তি লুণ্ঠন করেছিলেন। কিন্তু রাজা চতুর্থ নরসিংহের পুরীর লিপিতে দাবি করা হয়েছে যে উড়িষ্যার রাজা দ্বিতীয় ভানুদেব যুদ্ধে সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলককে পরাজিত করেছিলেন। সম্ভবতঃ ভানুদেবের সঙ্গে গিয়াসউদ্দীনের এই সংঘর্ষে জৌন খানের উৎকল অভিযানের বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে এবং এই অভিযানে দিল্লীর সুলতান যে বিশেষ সাফল্য লাভ হয়নি তা সহজেই অনুমেয়। জৌনা খানের প্রত্যাবর্তনের পর একদল মোঙ্গল সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে সামান্য আক্রমণ করেছিল। সুলতানের সৈন্যবাহিনী সহজেই তাদের বিতাড়িত করে। এইসময় গুজরাটে একটি পারওয়ারদের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছিল। বঙ্গদেশে বুঘরা খাঁর বংশধররা খলজী সুলতানদের আমলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। ১৩০১ সালে শামসউদ্দীন ফিরোজ শাহ বাংলায় একটি স্বাধীন সুলতানী বংশ স্থাপন করেছিলেন। ১৩২২ সালে শামসউদ্দীন ফিরোজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর, নাসিরউদ্দীন ইব্রাহিম ও শিহাবউদ্দীন ব্যতীত অন্য সকল ভ্রাতাকে হত্যা করে লখনৌতি এবং সোনারগাঁওতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। নাসিরউদ্দীন ইব্রাহিম তাঁর ভ্রাতা গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের বিরুদ্ধে দিল্লীর দরবারে সাহায্যপ্রার্থী হলে ১৩২৪ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক সসৈন্যে বঙ্গদেশে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করে সুলতান দিল্লীতে নিয়ে যান। লখনৌতিতে নাসিরউদ্দীন ইব্রাহিমকে প্রতিষ্ঠিত করে সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক তাঁকে উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করার অনুমতি দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গও এই সময় দিল্লীর সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এই দুই অঞ্চলের রাজধানী ছিল যথাক্রমে সোনারগাঁও ও সাতগাঁও। বহরাম খান শেষোক্ত দুই অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সময় দিল্লীর সৈন্যবাহিনী ত্রিহুত পদানত করেছিল।

কিন্তু সুলতান গিয়সাউদ্দীন বেশীদিন তাঁর রাজত্ব উপভোগ করতে পারেননি। বঙ্গ বিজয়ের পর যখন তিনি রাজধানী দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সেই সময় তাঁর অভ্যর্থনার জন্য দুর্গশহর তুঘলকাবাদ থেকে ৫/৬ মাইল দূরে আফগানপুরে একটি কাষ্ঠ মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। এই মঞ্চের আকস্মিক পতনের ফলে সুলতানের মৃত্যু হয় (১৩২৫ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ)। বারানীর মতে বজ্রপাতের দরুন এই দুর্ঘটনা হয়েছিল। ইয়াহিয়া বিন আহমেদ এই

www.pathagar.com

ঘটনাকে দৈবনির্দিষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন। ফিরিস্তা, বারানীর বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু ইসেমী, নিজামউদ্দীন আহমেদ ও বাদায়ুনী তাঁদের লেখনীতে ইবন বতুতাকে সমর্থন করে জৌনা খানকে পিতৃহন্তা বলে অভিযুক্ত করেছেন। ডঃ মাহেদী হুসেনের মতে, গিয়াসউদ্দীন তুঘলক, তাঁর আমির-ওমরাহ ও সাধারণ প্রজাদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন ও এই ধরনের হত্যাকাণ্ডে একজন সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর কোন বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। এইসব বিভিন্ন কারণে ডঃ হুসেন জৌনা খানের বিরুদ্ধে পিতৃহন্তার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মনে করেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কর্তৃক এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের উদাহরণের অভাব নাই। বিশেষতঃ পরবর্তীকালে সিংহাসন লাভের পর উলুঘ খান (বা সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক) যেসব নিষ্ঠুর কার্যকলাপের দ্বারা স্বীয় রাজ্যশাসনকে কলঙ্কিত করেছিলেন তাতে ডঃ হুসেনের বক্তব্য নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না।*

মহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রীঃ)

১৩২৫ সালের জুলাই মাসে পিতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের মৃত্যুর পর মহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সমকালীন ঐতিহাসিকদের বক্তব্য পাঠে মনে হয় যে, তাঁর চরিত্রে অনেক স্ববিরোধ ছিল। ঔদ্ধত্য ও বিনয়, আকাশচুম্বী আত্মম্ভরিতা ও উদার দানশীলতা, নিষ্ঠুরতা ও দয়া, গুণগ্রাহীতা ও ক্রুরতা প্রভৃতি নানাপ্রকার দোষ ও গুণের অদ্ভুত সমন্বয় তাঁর চরিত্রে দেখা দিয়েছিল। এইজন্য তাঁকে অনেক সময় 'Mixture of opposite' বা স্ববিরোধিতার সংমিশ্রণ বলে উল্লেখ করেছেন।

সমকালীন লেখকদের দৃষ্টিতে মহম্মদ বিন তুঘলক

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সমকালীন লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীর রচয়িতা জিয়াউদ্দীন বারানী। বারানীর আদর্শ নৃপতি ও পৃষ্ঠপোষক ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের খুল্লতাত ভ্রাতা। দক্ষিণ ভারতের ঐতিহাসিক ইসেমী প্রায় বারানীর সমসাময়িক লেখক। তাঁর লিখিত ইতিহাসের নাম ফুতুহ্-উস-সালাতিন। মরোক্কর পর্যটক ইবন বতুতা ১৩৩৩ সালে হিন্দুস্তান পরিভ্রমণে আসেন। তিনি বহুকাল দিল্লীর প্রধান কাজি হিসেবে কাজ করেন এবং ১৩৪২ সালে চীনে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। ইবন বতুতার ভ্রমণকাহিনীতে সমকালীন হিন্দুস্তান ও সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। এই তিনজন ব্যতিরেকে আমির খসরুর তুঘলকনামা, আইন-উল-মুলুক মুলতানীর মাহেরু, শামস-ই-সিরাজ আফিফের লিখিত ফিরোজ শাহর ইতিহাস ও পরবর্তীকালের লেখক ইয়াহিয়া বিন আহমেদ সরহিন্দির রচিত তারিখ-ই-মুবারক শাহীতে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়।

মহম্মদ বিন তুঘলকের সম্পর্কে প্রথমোক্ত তিনজন সমকালীন লেখকের অভিমত পাঠকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে বলে রিজভী লিখেছেন যে, 'Historians were unable to assess his personality and left their readers confused.'** এই তিনজনের মধ্যে ইসেমীকে রাজধানী পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ ভারতে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে যেতে হয়েছিল। ইসেমীর মতে, সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আলাউদ্দীন খলজী, আর

---

* Rise and fall of Sultan Muhammad Bin Tughluq, পৃঃ ৭৪।

** Wonder that was India Vol II পৃঃ ৪৫।

www.pathagar.com

নিকৃষ্টতম ছিলেন মহম্মদ বিন তুঘলক। বারানী, মহম্মদ বিন তুঘলকের গ্রীক দর্শনের প্রতি অনুরাগ, উলেমা, সৈয়দ, সুফী প্রভৃতির প্রতি অবহেলা বৈদেশিকদের এবং হিন্দুস্তানীদের* উচ্চপদে নিয়োগের ও নানাধরনের সম্মান এবং পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য সমালোচনা করেছেন। এইসব সম্মান ইতিপূর্বে কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীরই প্রাপ্য ছিল। তা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমির-ওমরাহ্রা সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে সহযোগিতা করেননি এবং তাঁর কার্যকলাপের কঠোর সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। জিয়াউদ্দীন বারানীর তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীতে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলককে নাস্তিক ও হৃদয়হীন এবং নিষ্ঠুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ইবন বতুতা সুলতানের স্ববিরোধী চরিত্রের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এমন কোনদিন ছিল না যেদিন সম্রাটের দানে কোন দরিদ্র ব্যক্তি বিত্তবানে পরিণত হননি। আবার সুলতানের নিষ্ঠুরতায় প্রায় প্রতিদিন কারো না কারো জীবননাশ হয়েছিল।

কিন্তু এইসব বিরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও বারানী এবং বিভিন্ন সমকালীন ও পরবর্তী লেখকরা স্বীকার করেছেন যে, দিল্লীর সিংহাসনে যাঁরা আরোহণ করেছিলেন মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁদের মধ্যে জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বারানীর মতে, কোন উলেমা বা লেখক, কবি, চিকিৎসক বা বিদ্বান ব্যক্তি সুলতানের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হতে সাহসী হতেন না। তর্কশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্ক ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে এবং ধর্মশাস্ত্রে ও সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। সামরিক বিদ্যায়ও তিনি দক্ষ ছিলেন। সমকালীন ঐতিহাসিকরাও তাঁর প্রতিভা ও গুণগ্রাহীতার কথা উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু সুলতানের মানসিক উৎকর্ষতা, পাণ্ডিত্য এবং অজস্র গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও তিনি যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তাদের ব্যর্থতা দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়েছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রজারা এইসব পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়াতে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল এবং প্রজাবিদ্রোহ দমন করার জন্য সুলতান কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল দিল্লী থেকে দেবগিরি রাজধানী পরিবর্তন, প্রতীক মুদ্রার প্রবর্তন, দোয়াবে রাজস্ব বৃদ্ধি, খোরাসান অভিযান ও কারাজল অভিযান। এইসব পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। আধুনিক গবেষকরা অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এইসব পরিকল্পনা ব্যর্থতার জন্য সুলতানের অবাস্তব নীতি ও কর্মপদ্ধতীই দায়ী। প্রধানতঃ, এইসব ব্যর্থতার জন্যই ইসেমী মহম্মদ বিন তুঘলকের কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর নিষ্ঠুরতাকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন। বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক খামখেয়ালী ছিলেন না এবং এইসব পরিকল্পনার ব্যর্থতা তাঁর বাস্তবজ্ঞান বর্জিত নীতিরই ফলশ্রুতি মাত্র।

মহম্মদ বিন তুঘলক সিংহাসনে আরোহনের পর যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তার প্রায় প্রত্যেকটাই ব্যর্থ হয়েছিল। এই ব্যাপারে তাঁকে অষ্ট্রিয়ার জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী নৃপতি দ্বিতীয় জোসেফের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র সাফল্য বা ব্যর্থতার দ্বারা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। মহম্মদ বিন তুঘলকের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিটি নীতি ও কর্মসূচীর বিচার পৃথক পৃথক ভাবে করা কর্তব্য। এইসব নীতি তাঁর খামখেয়ালী

* ঐ পৃঃ ৪৬— "Disappointed with the continuous rebellions by trusted officers such as Sayyids, Shaykhs, Afghans and Turkic governors he promoted to high positions intelligent administrators, whose ancestors had been vintrners, barbers, cooks, gardeners, musicians and weavers."

www.pathagar.com

মনোভাব প্রসূত বলে ব্যর্থ হয়েছিল অথবা যুগের পরিস্থিতিতে ও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর করা সম্ভবপর হয়নি তা বিচার করা প্রয়োজন। অনেকে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলককে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। * কারণ, তিনি রাজ্যশাসনের ব্যাপারে স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করতেন এবং রাজত্বের প্রথমদিকেই প্রদেশগুলির রাজস্ব ও ব্যয় সংক্রান্ত একটি রেজিস্টার প্রস্তুত করিয়েছিলেন।

কিন্তু রাজত্বের প্রথম থেকেই তিনি তাঁর প্রজাদের সহানুভূতি হারাতে শুরু করেন। আমির-ওমরাহরা সুলতান কর্তৃক আজিজ হেমার, শেখ বাবুনায়েক জাতীয় নিচুতলার মানুষের পদোন্নতি করাতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। উলেমারা রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। জনসাধারণ তাঁর পরিকল্পনাগুলির অবাস্তবতা ও ব্যর্থতায় বিক্ষুব্ধ ছিল। সুলতানের দৃষ্টিভঙ্গী আর সমকালীন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রজাদের দৃষ্টিকোনের কোন মিল ছিল না। তাছাড়া মহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনা ও নীতিগুলি মানবিক সহানুভূতির দ্বারা কখনই প্রভাবান্বিত হয়নি। যাঁরা সুলতানের সঙ্গে একমত ছিলেন না বা যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী সুলতানের সঙ্গে মিলতো না তাদের প্রতি তিনি কোন সহানুভূতি প্রদর্শন করেননি।

বৈদেশিক আক্রমণ ও রাজ্যবিস্তার

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সিংহাসন লাভের পর দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ফলশ্রুতি তাঁর পরবর্তীকালের কার্যকলাপকে প্রভাবিত করেছিল। সুলতানের রাজত্বের প্রথমদিকে (১৩২৭) সীমান্তে চাঘতাই নেতা মোঙ্গল প্রধান তরমাশিরিনের বাহিনী আক্রমণ করেছিল। ফিরিস্তার বক্তব্য অনুসারে সুলতানের কাছে বহু অর্থ উৎকচ লাভ করে তরমাশিরিন হিন্দুস্তান ত্যাগ করতে রাজি হয়েছিলেন।** কিন্তু ফিরিস্তার পূর্ববর্তী লেখকরা মনে করেন যে, আক্রমণকারী মোঙ্গল বাহিনীকে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার কালানোর পর্যন্ত পশ্চাদধাবন করেছিলেন এবং ভবিষ্যতে তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য কালানোর ও পেশোয়ারকে সুরক্ষিত করেছিলেন। তারিখ-ই-মুবারক শাহীর লেখকের মতে, তারমাশিরিন পশ্চাদাপসরণের পূর্বে বাদায়ুনের উপকণ্ঠ পর্যন্ত লুণ্ঠন করেছিলেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ১৩২৬-২৭ সালে, গুলবার্গের নিকটবর্তী সগরের শাসনকর্তা ও মহম্মদ বিন তুঘলকের সম্পর্কিত ভ্রাতা বাহাউদ্দীন গুরশাস্প বিদ্রোহী হন এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কাম্পিলির হিন্দুরাজার নিকট আশ্রয়প্রার্থী হন। বেলারী, রাইচুর ও ধারওয়ার জিলা নিয়ে গঠিত এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি দেবগিরির যাদবদের অধীন ছিল। যাদব রাজ্য খলজীদের পদানত হবার পর কাম্পিলি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং তার সীমানা সম্প্রসারিত হয়েছিল। কাম্পিলির রাজা বিদ্রোহী গুরশাস্পকে আশ্রয়দান করার জন্য তুঘলক সৈন্যবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হন। এইসময় গুরশাস্পকে হোয়েসল রাজা তৃতীয় বল্লালের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। দিল্লীর বাহিনী কাম্পিলি পদানত করার পর হোয়েসল রাজ্য আক্রমণ করেছিল। এইসময়ে হোয়েসল অধিপতি তৃতীয় বীর বল্লাল দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করে আশ্রয়প্রার্থী গুরুশাস্পকে দিল্লীর বাহিনীর কাছে সমর্পণ করেন এবং সুলতানের আদেশে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়।

সুলতান আলাউদ্দীন খলজী দক্ষিণ ভারতের দেবগিরি, তেলিঙ্গানা, হোয়েসল ও পাণ্ড্য

---

* Cambridge History of India, Vol. III, পৃঃ ১৩৯)।

** ঐতিহাসিক হেগ এই বক্তব্য মহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি নাই বলে মন্তব্য করেছেন। CHI Vol III পৃঃ ১৪৩ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

রাজ্যের কাছ থেকে বাৎসরিক কর আদায় করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। একমাত্র দেবগিরির রাজ্যটি পরবর্তীকালে বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু মহম্মদ বিন তুঘলক সিংহাসনে আরোহনের পূর্বে ও পরে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি দিল্লীর সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এইভাবে বরঙ্গল ও কাম্পিলি এবং হোয়েসল রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল দিল্লীর সাম্রাজ্যের অংশবিশেষে পরিণত হয়।

দক্ষিণ ভারতে দিল্লীর সাম্রাজ্যের এই বিস্তার যখন চরমসীমাতে পৌঁছেছিল তখনই তার পতনের বীজ উপ্ত হয়েছিল। কারণ একমাত্র দেবগিরি ছাড়া অন্য কোথাও দিল্লীর শাসন দক্ষিণ ভারতে শিকড় গাড়তে পারেনি এবং ১৩২৯ সালে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক উত্তর ভারতের দিকে প্রস্থান করলে দক্ষিণ ভারতে শৈব-ধর্মের পুনরুত্থান ইসলাম বিরোধী অভ্যুত্থানের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রলয় নায়ক ও তাঁর সম্পর্কিত ভ্রাতা কাপায়া নায়ক (বা কানাইহা নায়ক) এবং প্রলয় ভীমা। রাজা তৃতীয় বীর বল্লালও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সঙ্গমের পাঁচপুত্রের নেতৃত্বে এই অভ্যুত্থান মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই পঞ্চভ্রাতার মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন হরিহর ও বুক্কা। প্রাক্তন আনাগুনডীর রাজ্যকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তাঁরা সংগঠিত করেছিলেন। অপরদিকে সুলতানের অধীনস্থ আমির ওমরাহরা যাঁরা আমিরন-ই-সদা নামে পরিচিত তাঁরাও বিদ্রোহী হয়েছিলেন। ফলে দক্ষিণে দিল্লীর সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের প্রথমার্ধে মালাবার থেকে তেলিঙ্গানা পর্যন্ত সকল স্থানে দিল্লীর উপকণ্ঠের যে কোন গ্রামের ন্যায় দিল্লীর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।*

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও তার মূল্যায়ন—দোয়াবে রাজস্ব বৃদ্ধি

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ববৃদ্ধি (১৩২৬-২৭ খ্রীঃ) অন্যতম। এই বৃদ্ধির পরিমাণ কতটা ছিল সে সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় না।** বারানী উল্লেখ করেছেন যে, দোয়াবে রাজস্ব ১০ এবং ২০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এইসময় রাজকর্মচারীরা এমনভাবে সেস বা আওয়াব বৃদ্ধি করে জোরজবরদস্তি তা সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন যে রায়তরা নিঃস্ব হয়ে যায়। হাজি-উদ্-দবির তাঁর লিখিত গ্রন্থ জাফর-উল-ওয়ালিতে মন্তব্য করেছেন যে, ইতিপূর্বে রাজস্বের তুলনায় দাবি এতবেশী বৃদ্ধি করা হয়েছিল যে কৃষকে আগেকার দিনের প্রতিটি এক তংকার জায়গায় ৩ বা ৪ তংকা দিতে বলা হয়েছিল। এতএব কৃষকের উপর রাজস্বের এই অতিরিক্ত বোঝা বহন করা কষ্টসাধ্য ও দুর্বিষহ হয়েছিল। ঐতিহাসিক হেগের মতে, রাজস্ব বৃদ্ধি দশ এবং বিশভাগ অধিক হয়েছিল বলে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে।*** পরবর্তীকালের একজন ঐতিহাসিকের মতে, এই বর্দ্ধিত রাজস্বের সঙ্গে পশুচারণ ও বাসস্থানের উপর কর আদয় করা হত। বারানীর বক্তব্য সমকালীন ইতিহাস হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। ফিরিস্তা বলেছেন যে, দোয়াবে রাজস্ব তিন থেকে চার ভাগ বেশী বেড়েছিল এবং সম্ভবতঃ তিনি রাজস্ব বৃদ্ধির বাস্তব চিহ্নই উপস্থিত করেছিলেন। এই সূত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সুলতান আলাউদ্দীন খলজী দোয়াবে রায়তের উপর

---

* The Delhi Sultanate (Bharatiya Vidya Bhavan) Vol. VI, পৃ:৬৩; A History of South India-Nilkanta Sastri, পৃ: ২৩৬-৩৭ দ্রষ্টব্য।

** Cambridge History of India, Vol.III অনুসারে 'The extent of the enhancement is uncertain' পৃঃ ১৪৫ দ্রষ্টব্য।

*** ঐ।

www.pathagar.com

শতকরা ৫০ ভাগ রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিলেন এবং তার নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে যে শস্য উদ্বৃত্ত থাকত তাও নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু খলজী সুলতানের রাজত্বকালে রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কেউই রায়তের কাছ থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে পারত না। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে রায়তের উপর রাজস্বের বোঝা বেড়েছিল অথচ তাকে রাজস্ব আদায়কারীর অত্যাচার ও শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া এইসময় অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের দরুণ মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে রায়তের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এই পরিস্থিতি অতিরিক্ত রাজস্ব বৃদ্ধিতে রায়তরা অনেকে চাষাবাদ ত্যাগ করে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

এইসময় রায়তরা রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হয়ে বিদ্রোহী হয় এবং দিল্লীর শস্যভাণ্ডার দোয়াবে এক ধরনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। দোয়াবের কৃষক বিদ্রোহ দমন করার জন্য আমিরন-ই-সদা নামে উচ্চপদস্থ আমিররা বলপ্রয়োগ করে রাজস্ব আদায় করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ সুফল হয়নি। বারানী বলেছেন যে, সুলতানের হুকুমে স্থানীয় ফৌজদার রাজস্ব আদায়ের জন্য বহু খুট ও মুকদ্দমের প্রাণ হরণ করেছিলেন। সুলতান রাজস্ব আদায়ের জন্য রায়তের বিরুদ্ধে ফৌজ নিয়োগেও দ্বিধা করেননি।* এইভাবে গ্রামাঞ্চলে রায়ত ও মধ্যসত্ত্বভোগী এবং স্থানীয় হিন্দু প্রধানদের সকলে সুলতানের ভ্রান্তনীতির ফলে রাষ্ট্রের বিরোধী হয়ে উঠেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের দুর্নীতি। পরবর্তীকালে সুলতান যখন কৃষির উন্নতি, রায়তদের ঋণদান, কূপখনন ও সেচব্যবস্থার বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হন তখন রাজকর্মচারীদের দুর্নীতির ফলে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। সুলতান দেওয়ান-ই-আমির কোহী নামে একটি কৃষিবিভাগের মারফতে প্রায় ৭০ লক্ষ তংকা কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয় করেন। কিন্তু রাজকর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য সুলতানদের কৃষি উন্নতির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক যখন দোয়াবে রাজস্ব বৃদ্ধি করেন প্রায় একই সময় তিনি অন্য দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাকেও কার্যকরী করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই দুইটির প্রথমটি হ'ল দিল্লী থেকে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী পরিবর্তন ও দ্বিতীয়টি হ'ল প্রতীক তাম্রমুদ্রার প্রচলন।

রাজধানী পরিবর্তন

১৩২৬-২৭ সনে সুলতান দিল্লী থেকে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। দেবগিরি রাজধানী হওয়ার পর তার নাম পরিবর্তন করে দৌলতাবাদ রাখা হয়। সমকালীন লেখক জিয়াউদ্দীন বারানী ও ইসেমীর ইতিহাসে রাজধানী পরিবর্তনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাজধানী পরিবর্তনের পরে মরক্কোর পর্যটক ইবন বতুতা হিন্দুস্তানে আসেন এবং তিনি রাজধানী স্থানান্তর সম্পর্কে তাঁর বিবরণীতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালের লেখকরাও ইয়াহিয়া, বাদায়ুনি প্রভৃতি দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন।

জিয়াউদ্দীন বারানী বলেছেন যে, দৌলতাবাদ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল।

---

* ডঃ মাহেদী হুসেন মন্তব্য করেছেন, সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের খোরাসান বিজয়ের জন্য সংগৃহীত সৈন্যবাহিনীতে যেসব হিন্দু সৈন্য বিশেষতঃ রাজপুত ছিল তারা ঐ সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেবার পর দোয়াবে বিদ্রোহীদের মদত দিয়েছিল। দোয়াবের কৃষক বিদ্রোহ প্রধানত সুলতানের ভ্রান্ত রাজস্বনীতির জন্য হয়েছিল এবং বাইরের মদত এই বিদ্রোহে ছিল না।

www.pathagar.com

অতএব শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য সুলতান রাজধানী স্থানান্তর করেন। এইসময় সুলতানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ দিল্লী, গুজরাট, লখনৌতি, সাতগাঁও, সোনারগাঁ ও, তিলংগ, ম'বার (মাদুরা), দোরসমুদ্র, কাম্পিলির দূরত্ব দৌলতাবাদ থেকে প্রায় একইরকম ছিল। কারো সঙ্গে আলোচনা না করে সুলতানী শাসনের প্রথম যুগ থেকে যে দিল্লী হিন্দুস্তানের সদর কেন্দ্রস্থল ছিল মহম্মদ বিন তুঘলক সেখান থেকে রাজধানী দেবগিরি বা দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত করেছিলেন। এইভাবে বাগদাদ ও কায়রোর প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য শহরের ঈর্ষার পাত্র দিল্লীর অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করা হয়েছিল।

মরক্কোর পর্যটক ইবন বতুতা তার রেহেলা বা ভ্রমণকাহিনীতে রাজধানী স্থানান্তরের কারণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের দিল্লীর নাগরিকদের প্রতি বিতৃষ্ণা রাজধানী পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। ইবন বতুতা বলেছেন যে দিল্লীর নাগরিকরা সুলতানের কার্যকলাপের জন্য তাঁর প্রতি বিরূপ ছিল এবং তারা রাতের অন্ধকারে দেওয়ান-ই-আমে সুলতানের কঠোর সমালোচনা করে চিঠি ফেলে যেত। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ১৩২৭ সালে রাজধানী পরিবর্তনের সময় ইবন বতুতা হিন্দুস্তানে পদার্পণ করেননি এবং যেহেতু মরক্কোর পর্যটক গুজবের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন সেইজন্য এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।*

ইবন বতুতা বলেছেন যে, সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের হুকুমে দিল্লীর সমস্ত জনগণকে দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে বাধ্যতামূলকভাবে যেতে হয়েছিল। একজন অন্ধ ব্যক্তিকে দৌলতাবাদে যাবার অক্ষমতার জন্য 'মানজানিক' (Minjaniq) নামে তৎকালীন যুগে ব্যবহৃত পাথর ছোঁড়া যন্ত্রের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়। আর একজন খঞ্জকে দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ এই দীর্ঘপথ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে তার জীবননাশ হয়। এই ভাবে দিল্লী সম্পূর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল। ইসেমীর কল্পনা আরো সুদূরপ্রসারী। তিনি মন্তব্য করেছেন যে মহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লীকে সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য করেছিলেন। বারানী একজায়গায় মন্তব্য করেছেন যে, দিল্লীতে একটা বিড়াল বা কুকুর পর্যন্ত ছিল না।

কিন্তু দিল্লী সম্পূর্ন পরিত্যক্ত হয়নি। কারণ যেবছর সুলতান রাজধানী স্থানান্তরের হুকুম দিয়েছিলেন সেইবছরই তিনি একটি নতুন শহর বা জাহানপানার নির্মান করে দিল্লীর সম্প্রসারণ করেছিলেন। রাজধানী স্থানান্তরের পর মহম্মদ বিন তুঘলক সিন্ধু ও মুলতানের শাসনকর্তা বহরম আইবা কিস্‌লু খানের বিদ্রোহের সংবাদ পান। এইসময় তিনি দৌলতাবাদ থেকে দিল্লীতে এসে সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। দিল্লী জনমানবশূন্য হলে বা দিল্লীর জনসংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পেয়ে থাকলে সুলতান এই স্থান থেকে সৈন্যসংগ্রহের কথা চিন্তাও করতেন না। ইবনবতুতা ১৩৩৪ সালে দিল্লী শহরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে রাজধানী পরিবর্তনের পর দিল্লী জনশূন্য হয়েছিল বলে মনে হয় না।

রাজধানী স্থানান্তরের সময় দিল্লী থেকে কেবলমাত্র প্রধান প্রধান আমির ওমরাহরা সৈন্যবাহিনীর লোক লস্কর ও তাদের আত্মীয় পরিজনরা দৌলতাবাদে সর্বপ্রথম যাত্রা করেছিল। কারণ যখনই দরবার যেখানে যেত এইসব শ্রেণীর লোকেরা ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা দরবারের সহযাত্রী হত। রাজধানী পরিবর্তনের সময় প্রথমে রাজমাতা ও রাজপরিবারের সকলে ও দরবারের আমির ওমরাহরা এইজন্য দৌলতাবাদে গিয়েছিলেন। এই সঙ্গে ছিল দাসদাসী, খাজাঞ্চিখানা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এবং সর্বশেষে অন্যান্য লোকেরা নতুন রাজধানীতে বসবাস

* কিন্তু ইসেমী ছিলেন একজন সমকালীন ঐতিহাসিক এবং তাঁরও বক্তব্য ছিল যে, স্থানান্তরের কারণ দিল্লীর সুলতানের রাজধানী দিল্লীর নাগরিকদের প্রতি বিতৃষ্ণা।

www.pathagar.com

করার জন্য গিয়েছিলেন। যার ফলে শহরের সমস্ত ব্যক্তি দিল্লী ত্যাগ করে দৌলতাবাদে যান এইরূপ মনে করার কারণ নাই। তারিখ-ই-মুবারক শাহীতে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, সাধারণ লোক যারা সমাজের নিম্নকোটির মানুষ তারা দিল্লী ত্যাগ করেনি।* অতএব দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী পরিবর্তনের ফলে শহর জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল অথবা দিল্লীতে একটি কুকুর বা বিড়ালও ছিল না এইসব বক্তব্য অতিরঞ্জিত এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই।

এই রাজধানী পরিবর্তনের সময় পথে যাতে লোকের কোন অসুবিধা না হয় সেইজন্য দিল্লী ও দৌলতাবাদের সংযোগকারী সড়কের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপিত হয়েছিল এবং সরাইখানা স্থাপিত হয়েছিল। পথিকের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এবং পথশ্রম দূর করার জন্য এই ৭০০ মাইল দীর্ঘ পথের দুইধারে সুলতান সর্বপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বারাণী বলেছেন, নতুন রাজধানীতে, যারা স্থানান্তরিত হয়েছিলেন এইস্থানে সারিবদ্ধভাবে তাদের কবরখানার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এই নতুন রাজধানী সম্পর্কে উল্লেখ করে ইসেমী বলেছেন যে, দৌলতাবাদের যা কিছু উন্নতি হয়েছিল তার মূলে ছিল দিল্লী থেকে আগত নাগরিকরা। পথকষ্টের পর যারা দৌলতাবাদে পৌঁছয় তাদের বাসস্থল ও সুখসুবিধার জন্য সুলতান সুবন্দোবস্ত করেছিলেন।

রাজধানী পরিবর্তনের ফলে বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং রাজকোষকে বিপুল ব্যয়বহন করতে হয়েছিল। রাজধানী স্থানান্তরের জন্য দিল্লী তার পুরাতন সমৃদ্ধি হারিয়েছিল। বারাণী মন্তব্য করেছেন যে, 'The people, who for many eyars and generations had been the natives and inhabitants of the land were broken hearted.' দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত দিল্লীর অধিবাসীরা সর্বদাই তাদের নিজেদের বাসভূমিতে প্রত্যাগমনের জন্য উৎসুক থাকত। অবশেষে সুলতান দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত বাতিল করেন এবং দিল্লী পুনরায় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ও রাজধানীতে পরিণত হয়। কিন্তু সুলতানের রাজধানী নিয়ে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে রাজকোষের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল এবং দিল্লীও তার পূর্ব গৌরব হারিয়েছিল। এইজন্য Stanley Lane Poole মন্তব্য করেছেন যে, 'Daulatabad was a monument of misdirected energy'। রাজধানী স্থানান্তর সম্পর্কে ডঃ হুসেন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে দিল্লীকে রাজধানী হিসাবে সবসময়েই গণ্য করা হত এবং তার বক্তব্য ছিল দৌলতাবাদ ছিল মহম্মদ বিন তুঘলকের দ্বিতীয় রাজধানী।**

তাম্রমুদ্রা

সুলতানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ছিল তামার প্রতীক মুদ্রার বা নোটের প্রবর্তন। সুলতানের এই প্রতীকতাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের (১৩২৯-৩০ খ্রীঃ) পশ্চাতে যেসব কারণ ছিল তার উল্লেখ করে সমকালীন ঐতিহাসিক বারানী মন্তব্য করেছেন যে, মহম্মদ বিন তুঘলকের অমিতব্যয়িতার ফলে রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য হয়ে পড়েছিল। এছাড়া সুলতানের বিভিন্ন পরিকল্পনায় বহু অর্থব্যয় হয়েছিল এবং রাজ্যজয়ের নেশায় মহম্মদ বিন তুঘলক সামরিক খাতে বেহিসাবী অর্থব্যয় করেছিলেন। এই পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে তিনি আর্থিক সঙ্কটের থেকে

* ডঃ মাহেদী হুসেনের বলেছেন—"The Hindus remained in Delhi throughout in full strength" (Rise and fall of Muhammah bin Tughluq পৃঃ ১১৮)। এই বক্তব্য সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। কারণ যে সব হিন্দুরা রাজকার্যে নিযুক্ত ছিল তারা দরবারের সহযাত্রী হয়েছিল। মোঙ্গল আক্রমণ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাজধানী স্থাপনের জন্য দৌলতাবাদকে সুলতানের পছন্দ হয়েছিল বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মহম্মদ বিন তুঘলকের খোরাসান জয়ের পরিকল্পনা প্রমাণ করে যে, মোঙ্গলদের সম্পর্কে সুলতানের অহেতুক ভীতি ছিল না।

** রিজভী এই বক্তব্য সমর্থন করে বলেছেন যে— "In fact two capitals flourished simultaneously." Wonder that was India (Vol-II) পৃঃ ৪৬।

পরিত্রাণ পাবেন বলে সুলতান অনুমান করেছিলেন। আধুনিক গবেষকগণ অনেকে মনে করেন যে, প্রতীক তাম্রমুদ্রা প্রচলনের কারণ সমকালীন সময় বাজারে রৌপ্যের সরবরাহের ঘাটতি। অতএব সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক রাজকোষ পূর্ণ করার জন্য প্রতীক তাম্রমুদ্রার প্রবর্তন করেননি, তিনি রৌপ্য সরবরাহের ঘাটতির জন্য যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল তার সুরাহার উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে চীনে ও পারস্যে এই ধরনের প্রতীক মুদ্রার প্রবর্তন হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে চীনের মোঙ্গল শাসক কুবলাই খান একধরনের কাগজের নোট চালু করেছিলেন এবং পারস্যের অধিপতি গাই খাটু ১২৯৪ সালে তাঁর রাজ্যে নোটের প্রবর্তন করেন। সুতরাং সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক যখন প্রতীক তাম্রমুদ্রা চালু করেছিলেন তখন তাকে কেবলমাত্র খামখেয়ালীপনার নিদর্শন বলে বাতিল করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। সুলতান হুকুম দিয়েছিলেন যে, এই প্রতীক তাম্রমুদ্রা উচ্চতর মূল্যের রৌপ্যমুদ্রার (১৪০ গ্রামের রৌপ্য তংকার) জায়গায় লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। এই ধরনের প্রতীক মুদ্রা কেবলমাত্র দিল্লীতে নয় দোয়াব, দেবগিরি, ধর, লখনৌতি প্রভৃতি সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে চালু করা হয়েছিল।

এডওয়ার্ড টমাস, সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলককে 'Prince of Moneyers' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর বিভিন্ন মুদ্রা সংস্কারের ফলে যে সব নতুন মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল তাতে মুদ্রাব্যবস্থায় মূল্য পরিবর্তনের সঠিক প্রতিফলন পাওয়া যায়। ইবনবতুতা বলেছেন যে, তিনি ২০০ গ্রামের স্বর্ণদিনার ও ১৪০ গ্রামের রৌপ্য আদলাই প্রবর্তন করে যথাক্রমে পূর্বতন স্বর্ণ ও ১৭৪ গ্রামের রৌপ্য তংকার স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। এডওয়ার্ড টমাস মহম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক প্রতীক তাম্রমুদ্রার প্রচলনকে অযৌক্তিক বা অন্যায্য বলে মনে করেন না। ডঃ হুসেন এই প্রতীক মুদ্রার প্রবর্তনকে -'On the whole good and statesman like'.-বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু অন্যান্য লেখকরা তার সঙ্গে একমত নন। কারণ প্রতীক তাম্রমুদ্রার প্রবর্তন রাজকোষের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। বিশেষত যে পদ্ধতিতে এই পরিকল্পনা চালু করা হয়েছিল তার অন্যতম ফলশ্রুতিতে রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থায় বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়েছিল।

এই প্রতীক তাম্রমুদ্রার পাশাপাশি রৌপ্য তংকাও চালু ছিল। লোকে রাজস্ব দেওয়ার সময় প্রথমোক্ত শ্রেণীর মুদ্রায় রাজকোষের অর্থ পরিশোধ করত এবং বৈদেশিক বণিকরা তাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতীক তাম্রমুদ্রার ব্যবহার করত। কিন্তু তাদের পণ্য বিক্রয়ের সময় বৈদেশিক বণিকরা প্রতীক তাম্রমুদ্রা গ্রহণ করতে রাজি হত না। তাছাড়া চীনে কাগজের নোট প্রচলন করার সময় তা জাল করা যাতে সম্ভব না হয় তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক প্রতীক মুদ্রা জাল যাতে না হয় তার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। বারানী মন্তব্য করেছেন যে, প্রতিটি হিন্দুর গৃহ টাকশালে পরিণত হয়েছিল এবং প্রত্যেক স্বর্ণকার তার কর্মশালায় জাল প্রতীক তাম্রমুদ্রা বানানো শুরু করে দিয়েছিল। বারানীর এই মন্তব্য থেকে এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না হিন্দু বা মুসলমান যারাই পেরেছিল তারাই প্রতীক তাম্রমুদ্রা জাল করে বাজারে ছেড়েছিল। ফলে মূল্যবান রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা বাজার থেকে সহজে উধাও হয়ে যায়। স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কারণে লোকে মূল্যবান ধাতুর মুদ্রা ধরে রাখত ও প্রতীক তাম্রমুদ্রায় ব্যয় নির্বাহ করত। আর্থিক বাজারে তখন জাল ও আসল তাম্রমুদ্রায় এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সহজ ছিল না। এইভাবে জাল মুদ্রায় বাজার ছেয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে সুলতানের হুকুমে সকলপ্রকার প্রতীক তাম্রমুদ্রার পরিবর্তে খাজাঞ্চিখানা থেকে জনগণকে স্বর্ণ (এবং সম্ভবত রৌপ্য) মুদ্রা গ্রহণ করার অনুমতি দান করা হয়। এই প্রতীক তাম্রামুদ্রা প্রায় ৩/৪ বৎসর চালু ছিল। অতএব এই প্রতীক মুদ্রার প্রবর্তন এবং পরে এই ধরনের মুদ্রার পরিবর্তে মূল্যবান ধাতুর মুদ্রায় খাজাঞ্চিখানা থেকে তা

www.pathagar.com

বিনিময় করার অনুমোদন দিয়ে সুলতান রাজকোষের প্রচুর আর্থিক ক্ষতিসাধন করেছিলেন। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনার ব্যর্থতার জন্য প্রজাসাধারণ বিশেষ কোন আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হননি। বাতিল প্রতীক তাম্রমুদ্রাগুলি বিভিন্ন সরকারি খাজাঞ্চিখানার সামনে প্রায় এক শতক পরেও পাহাড় পরিমাণ হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।* মুদ্রা জাল রোধ করার জন্য সরকারী কোন পদ্ধতি না থাকাতে এবং পাশাপাশি মূল্যবান ধাতুর মুদ্রা ও স্বল্পমূল্যের তাম্র ও পিতলের প্রতীক মুদ্রা চালু থাকায় আর্থিক ক্ষেত্রে বাজারের উপর যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয় সেই সম্পর্কে গ্রেসামের নিয়মের (Gresham's Law) বিষয় তৎকালীন যুগে কেহই অবহিত ছিল না। কিন্তু শেষোক্ত নিয়মের দরুণ মূল্যবান ধাতুর মুদ্রা এইরূপ ক্ষেত্রে বাজার থেকে মজুতদাররা তুলে নেয় এবং কেবলমাত্র স্বল্পমূল্যের মুদ্রাই চালু থাকে। অতএব সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের ব্যর্থতার কারণ ছিল তাঁর অবাস্তবভাবে প্রতীক মুদ্রা চালু করার পদ্ধতি এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই।

খোরাসান অভিযান

রাজত্বের প্রথমার্ধে ট্রান্সঅক্সেনিয়ার অধিপতি তরমাশিরিন সিন্ধু আক্রমণ করলে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক এই মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। ফিরিস্তার মতে সুলতান প্রচুর ধনদৌলত উপঢৌকন দিয়ে তার রাজ্য রক্ষা করেন। কিন্তু এই ধরনের নীতি তার প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ এবং এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।** এইসময় সুলতান কালানুর ও পেশোয়ারের সীমানা পর্যন্ত তাঁর ঘাঁটি নির্মাণ করে রাজ্যের সীমা সুরক্ষিত করেছিলেন। তরমাশিরিনের আক্রমণের পরবর্তীকালে মহম্মদ খোরাসান ও ইরাক আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। সুলতান উত্তরপশ্চিম সীমান্তে আক্রমণকারী মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষতঃ খোরাসানের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সুলতানকে এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল। এইভাবে সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর ন্যায় সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক উচ্চাকাংখার বশবর্তী হয়ে বিশ্ববিজয়ের কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাউদ্দীনকে আলা-উল-মুলুকের মত পরামর্শদাতা সচেতন করাতে তিনি নয়া ধর্মপ্রচার ও বিশ্বজয়ের মতন অলীক স্বপ্ন ত্যাগ করেছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলক বৎসরাধিক কাল ৩,৭০,০০০ সৈন্য রাজকোষের অর্থে বজায় রাখার পর এই পরিকল্পনার অবাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেন। যখন তাঁর স্বীয় রাজ্যে রাজধানী পরিবর্তন ও প্রতীক তাম্রমুদ্রার ব্যর্থতার কারণে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির উপর চাপের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সময় দূরদেশে রাজ্যজয়ের ব্যয়নির্বাহের দায়িত্ব গ্রহণের কথা চিন্তা করা রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই।

তৎসহ ভৌগলিক ও যানবাহনের অসুবিধা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার পথে দুরতিক্রম্য বাধার কারণ হিসাবে দেখা দিতে পারত। হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের পার্বত্য গিরিপথে এই বিশাল বাহিনীর যাতায়াত কোনক্রমেই সহজসাধ্য ছিল না। এই অভিযান প্রেরণ করার সঙ্গে যুক্ত ছিল এই বিশাল বাহিনীর প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য পণ্য সরবরাহ।

* C.H.I (Vol III) -তেবলা হয়েছে যে,— "Muhammad had no clear notion of the uses and limitations of a fictitious currency, but believed that he could by his decrees, virtually convert brass and copper into silver and gold." । এই ধরনের রায় মহম্মদ বিন তুঘলকের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনার সৃষ্টি করেছে।

** C.H.I (Vol III) পৃঃ ১৪৩। এই সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

সর্বোপরি সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে এই পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন তরমাশিরিন খান ও মিশরের সুলতান। শেষোক্ত দুইজনই স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আগ্রহী ছিলেন। অতএব এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছিল। এই পরিকল্পনার জন্য সুলতানকে সমালোচনা করে বারানী মন্তব্য করেছিলেন, 'আকাংখিত দেশগুলি জয় করা হয়নি.... এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস তাঁর ধনদৌলত ব্যয় হয়ে গিয়েছিল।'

কারাজল অভিযান

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক খোরাসান বিজয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু তিনি স্বীয় সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য যে সব অঞ্চল এতকাল ভারতের সীমানায় অবস্থিত তাদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করার পরিকল্পনা ত্যাগ করেননি। এইজন্য ১৩৩৭ সালে তিনি নগরকোট দখল করেন এবং হিমালয় অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করেন। ফিরিস্তার মতে তিনি চীনে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক চীন বা তিব্বতে অভিযান প্রেরণ করার কোন ইচ্ছা পোষণ করতেন বলে সমকালীন লেখকরা উল্লেখ করেননি। বারানী ও ইবন বতুতার লেখনীতে বলা হয়েছে যে, সুলতান হিন্দুস্তান ও চীনের মধ্যবর্তী কারাচল বা কারাজল পর্বতে অভিযান প্রেরণ করেন। পরবর্তীকালের কিছু লেখক এই অঞ্চলকে হিমাচল বলে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ এই এলাকা ছিল হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কুমায়ুন অঞ্চল। বারানী বলেছেন সুলতানের খোরাসান অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই অঞ্চলের সামরিক তৎপরতার সূত্রপাত হয়। কিন্তু কুমায়ুন, খোরাসান ও ট্রান্সঅক্সিয়ানার দিকে অবস্থিত ছিল না এবং এই বক্তব্য সঠিক নয়। মূলত মহম্মদ বিন তুঘলকের নগরকোট ও কুমায়ুন অঞ্চলের উপর প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান। ১৩৩৭-৩৮ সালে নগরকোট বা কাংড়া দখলের পর মালিক নেকপাইর (Malik Nikpai) অধীনে ১০০,০০০ অশ্বারোহী ও অজস্র পদাতিক বাহিনী কারাজল অভিযানে প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু বর্ষাগমে যাতায়াতের ও যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও প্রত্যাবর্তনের পথে পার্বত্য জাতির আক্রমণে সৈন্যবাহিনী অধিকাংশ প্রাণ দেয়। বারানী বলেছেন যে, এই অভিযাত্রীবাহিনীর মাত্র দশজন প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিল। ইবন বতুতার মতে মাত্র তিনজন সৈন্যর প্রাণরক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু এই অভিযানের ফলে নগরকোটের রাজা বশ্যতা স্বীকার করে নিয়মিত কর দানে সম্মত হয়েছিলেন এবং পার্বত্য জাতিগোষ্ঠীও সুলতানকে কর দিতে স্বীকৃত হয়।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে বিদ্রোহ

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের বিভিন্ন পরিকল্পনার ব্যর্থতা তাঁর রাজত্বকালে বিদ্রোহের সূত্রপাত করেছিল। সুলতান তাঁর প্রজাদের দুর্দশার কারণ হয়েছিলেন। এইযুগে বরাংবার দুর্ভিক্ষের প্রকোপে দোয়াব ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল বিপন্ন হয়েছিল। ফলে প্রজাদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছিল যার বহিঃপ্রকাশ দোয়াবে এবং বিভিন্ন স্থানে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মারফতে দেখা দেয়। সুলতানের রাজত্বকালের প্রথমার্ধে মাত্র কয়েকটি বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং সেগুলি সহজেই দমন করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষার্ধে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অজস্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। সুলতান রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য তৎপর হয়ে সামরিক অভিযানে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। প্রজাবিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সুলতান অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ফলে প্রজাদের ক্ষোভ বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রজারা সুলতানের প্রতি অসন্তুষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে বিদ্রোহী হয়েছিল এবং সুলতানও তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ দমনে সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে অনবরত অভিযানে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন। এইভাবে সাম্রাজ্যের পতনের বীজ উপ্ত হয়েছিল ও সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু সুলতান প্রজাদের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য কোন প্রচেষ্টা করেননি একথা সত্য নয়। দোয়াবের দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব এবং দিল্লীর জনগণের দুর্দশা মোচনের জন্য সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লী থেকে ১৬৫ মাইল দূরে সরগদ্বারীতে সাময়িকভাবে তাঁর সদর দপ্তর স্থানান্তরিত করেছিলেন। এই সময় প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরবরাহ করে অযোধ্যার শাসনকর্তা আইন-উল-মুলুক-মুলতানী এই দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সুলতানকে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া কৃষির উন্নতির জন্য সুলতান দেওয়ান-ই-আমির কোহী নামে একটি বিভাগের সৃষ্টি করেছিলেন। কৃষির উন্নতিকল্পে সুলতান বহু অর্থব্যয় করেছিলেন। কিন্তু রাজকর্মচারীদের দুর্নীতির জন্য ও তাঁর অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে এই প্রচেষ্টায় কৃষির বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি।

বারানীর মতে সরগদ্বারীতে থাকাকালীন সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের ধারনা হয়েছিল যে খলিফার বিনা অনুমোদনে কোন সুলতানই প্রজানুগত্য লাভে সক্ষম হন না। মোঙ্গল আক্রমণে বিধ্বস্ত বাগদাদের আব্বাসিদ সুলতান বংশের একজন খলিফা এই সময় মিশরের শাসকের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। সুলতান মহম্মদ, মিশরের 'খলিফার' নিকট আবেদন করলে ১৩৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দূত হাজি সৈয়দ সরাসরী দিল্লীতে পদার্পণ করেছিলেন। মহম্মদ সাড়ম্বরে তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁর কাছ থেকে খলিফার স্বীকৃতি লাভ করেন ও খিলাৎ গ্রহণ করেন। অতঃপর সুলতান যে আব্বাসিদ খলিফার কর্তৃত্বাধীন রাজ্যশাসন করেছেন একথা খুতবায় ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এর ফলে মহম্মদ প্রজাবিদ্রোহ দমনে বিশেষ কোন নৈতিক সমর্থন লাভ করেননি। কঠোর দমন নীতি বা প্রজাদের হিতার্থে কৃষির উন্নতির প্রচেষ্টা অথবা খলিফার স্বীকৃতি কোন কিছুতেই প্রজাবিদ্রোহের আগুন প্রশমিত হয়নি।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলককে বারংবার তাঁর আমির ওমরাহদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তুর্কী 'বন্দেগান-ই-চহেলগাঁওদের' প্রাধান্যের স্থলে খলজী ও বৈদেশিক গোষ্ঠীর আমির ওমরাহরা দরবারে আসন গ্রহণ করেছিলেন ও রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাছাড়া ধর্মান্তরিত ভারতীয়রা মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় উচ্চরাজপদে নিযুক্তির অধিকার লাভ করেছিলেন। হিন্দুরা বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হতেন। ফলে পুরাতন অভিজাত ও আমির ওমরাহরা এইসব নিয়োগের বিরোধিতা করেন। বারানী সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক ভারতীয়দের উচ্চপদে নিযুক্ত করার নীতির কঠোর সমালোচনা করেন।

১৩৩৫ সালে মাদুরার শাসনকর্তা জালালউদ্দীন আহসান শাহ বিদ্রোহী হয়েছিলেন। এই সময় উত্তর ভারতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ চলছিল। তৎসত্ত্বেও সুলতান মাদুরার বিদ্রোহী দমনে সসৈন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর সৈন্যবাহিনীর অনেকে বরঙ্গলে মারাত্মক রোগের প্রকোপে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং সুলতান স্বয়ং রোগাক্রান্ত হন। ফলে আহসান শাহর বিদ্রোহ দমনের আশা ত্যাগ করে সুলতানকে উত্তর ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। এইসময় দুর্ভিক্ষের প্রকোপে মহম্মদ বিন তুঘলক সরগদ্বারীতে সাময়িকভাবে সদরদপ্তর স্থানান্তরিত করেছিলেন। ১৩৩৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১৩৩৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ৫টি বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং ১৩৩৬ সালে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। এইসব বিদ্রোহ দমনে সুলতান অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর, কাম্পিলি ও বরঙ্গলের অভ্যুত্থানের ফলে দিল্লী সুলতানী সাম্রাজ্যের

www.pathagar.com

দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য ক্ষুন্ন হয়েছিল। পরবর্তী কালে আমিরন-ই-সদার (যেসব আমিরের একশত গ্রামের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল) বিদ্রোহের ফলে দৌলতাবাদে স্বাধীন বাহমনি রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। *

বঙ্গদেশে স্বাধীন সুলতানী বংশ স্থাপন

উত্তরপূর্ব ভারতে বঙ্গদেশে সুলতান বলবনের মৃত্যুর পর বুখরা খাঁ ও তাঁর বংশধররা স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। ১৩০১ সালে শামসউদ্দীন ফিরোজ বুখরা খাঁর বংশধরের কাছ থেকে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেছিলেন। শামসউদ্দীনের পুত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহর বিরুদ্ধে ১৩২৪ সালে গাজি তুঘলক স্বয়ং বঙ্গদেশে অভিযান করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। এইসময় সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক বঙ্গদেশকে সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও লক্ষ্ণৌতি এই তিনভাগে বিভক্ত করে তিনজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্ব কালে সোনারগাঁওর শাসনকর্তা ছিলেন বহরম খান, লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন কাদের খান এবং সাতগাঁওর শাসনকর্তা ছিলেন ইজ্জউদ্দীন ইয়াহিয়া। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহকে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকমুক্তিদান করেন। প্রায় তিন বৎসর কাল সোনারগাঁও থেকে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহর নাম দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে যুক্তভাবে মুদ্রায় প্রচলন করা হয়েছিল। এই তিন বৎসর কাল, ১৩২৭-২৮ সাল পর্যন্ত, সেনাপতি বহরম খানের সঙ্গে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু দিল্লীর নিযুক্ত শাসনকর্তা বহরম খানের তত্ত্বাবধান থেকে মুক্তিলাভের জন্য অবশেষে তিনি বিদ্রোহী হন। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহকে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন।

১৩৩৭-৩৮ সালে সোনারগাঁওর শাসনকর্তা বহরম খানের মৃত্যু হলে তাঁর পিলাহদার (অস্ত্রবাহক) ফকরউদ্দীন এই সুযোগে স্বাধীনভাবে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব শুরু করেন। লখনৌতির শাসক কাদের খান সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের নির্দেশে ফকরউদ্দীনকে সোনারগাঁও থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। কিন্তু কাদের খান তাঁর সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে লুণ্ঠিত ধনরত্নের অংশ দিতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। ফলে তিনি স্বীয় সৈন্যদের হাতে নিহত হন। ফকরউদ্দীন এরপরে ১৩৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত স্বাধীন ভাবে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর পুত্র ইখতিয়ারউদ্দীন গাজি শাহর তৃতীয় বৎসর রাজত্বকালে ১৩৫২ খ্রীঃ সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও দখল করে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

উত্তরবঙ্গে কাদের খানের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আলি শাহ লখনৌতিতে সুলতান আলাউদ্দীন আলিশাহ উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। এই আলাউদ্দীন আলিশাহর একজন সম্পর্কিত ভ্রাতা শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪৫ সালে আলিশাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসন দখল করেছিলেন। ইতিমধ্যে লখনৌতির স্থলে পাণ্ডুয়ায় বঙ্গদেশের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল। ইবনবতুতা বলেছেন যে, ফকরউদ্দীন সদকাওয়ান (সাতগাঁ) বা চট্টগ্রাম থেকে লখনৌতির বিরুদ্ধে নৌ অভিযান করেছিলেন। আবার অনেকের মতে ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম (১৩৩৯-৪০ খ্রীঃ) সাতগাঁতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মুদ্রার প্রচলন করেন। **

এইভাবে বঙ্গদেশ দিল্লীর হস্তচ্যুত হয় এবং সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক সাম্রাজ্যের অন্যত্র যুদ্ধে ও বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত থাকার দরুণ উত্তরপূর্ব ভারতের এই অশান্ত অংশে শান্তি ও

*বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের অভ্যুত্থান সম্পর্কে নিম্নে দ্রষ্টব্য।

**Delhi Sultanate, Bharatiya Vidya Bhavan, পৃঃ ১১৭

www.pathagar.com

শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হননি।

দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহ, বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

দক্ষিণ ভারতে তেলিংগানা, অন্ধ্র ও কৃষ্ণা-গোদাবরীর দক্ষিণাঞ্চলে সুলতানী শাসনের অবসানের জন্য হিন্দুরা সমবেতভাবে মহম্মদ বিন তুঘলকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে সামিল হয়েছিল। সমকালীন স্থানীয় বিবরণী অনুসারে এই অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদান করেন প্রলয় নায়ক। সম্ভবতঃ তিনি দক্ষিণ অন্ধ্রের মুসুনুরু (পকনাড়ুর অর্ন্তগত) নামক স্থান থেকে এসেছিলেন। কোনডাভিড়ুর রেড্ডী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রলয় ভিমার ও অন্যান্য দক্ষিণ ভারতের নৃপতি ও জনগণের সমর্থনে তিনি পূর্ব গোদাবরী অঞ্চলের ভদ্রাচলম তালুকের একাপল্লীতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং অন্ধ্রর সমুদ্রোপকূলবর্তী জেলাগুলি থেকে সুলতানী সৈন্যদের বিতাড়িত করেছিলেন।

১৩৩০ থেকে ১৩৩৫ সালের প্রলয় নায়কের মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র কপয়া নায়েক বা মুসলিম ইতিবৃত্তকারদের উল্লিখিত কৃষ্ণ নায়েক স্বীয় পিতৃব্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। সুলতান তেলিংগানার সুশাসনের জন্য পূর্বদিকে বরঙ্গলকে রাজধানী করে মালিক মকবুলকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মালিক মকবুল ছিলেন কাকতীয় রাজাদের একজন হিন্দু সেনাপতি। তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কাপয়া নায়ক বা কৃষ্ণ নায়ক হোয়েসল নৃপতি তৃতীয় বীরবল্লালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তেলিংগানা আক্রমণ করেন। এই সময় সাধারণভাবে দক্ষিণ ভারতে তেলিংগানায় বা তিলংগে সুলতানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ফলে মালিক মকবুলের পক্ষে অন্ধ্রে সুলতানের প্রাধান্য বজায় রাখা সম্ভবপর হয়নি। কৃষ্ণনায়েক ও তৃতীয় বীরবল্লালের সমবেত প্রচেষ্টায় মাদুরায় সৈয়দ আহমান শাহ প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজ্য থেকে মুসলমান শাসনের অবসান হয়েছিল এবং সমগ্র টোণ্ডাইমণ্ডলমে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। এইভাবে আরাবিড়ু বংশের প্রতিষ্ঠাতা চালুক্য সোমদেব কৃষ্ণা অঞ্চলে কাম্পিলির শাসনকর্তা মালিক মহম্মদকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী নুনিজ কাম্পিলিতে মহম্মদ বিন তুঘলকের বিরুদ্ধে সার্বিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ণনা দিয়েছেন। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক কাম্পিলিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনের জন্য হরিহর ও বুক্ককে যথাক্রমে কাম্পিলিতে শাসনকর্তা ও সহকারী নায়েব শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। অনেকের মতে তাঁরা কাকতীয় রাজার অধীনে উচ্চপদাধিকারী ছিলেন। তাঁরা উভয়ই পরে কাম্পিলির অধিপতির নিয়োগ গ্রহণ করেন এবং এইসময় সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের বাহিনীর কাছে বন্দী হন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, যাদব প্রধান সঙ্গমের পাঁচপুত্রের মধ্যে হরিহর ও বুক্ক ছিলেন অন্যতম। তাঁরা রাজা তৃতীয় বীর বল্লালের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন।* বিদ্যারন্যের অনুপ্রেরণায় হরিহর ও বুক্ক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন এবং ১৩৩৬ সালে বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্য স্থাপন করেন।

দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্য স্থাপনের পর সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে আমিরন-ই-সদার নেতৃত্বে দৌলতাবাদে বাহমনি রাজ্য স্থাপিত হয়। ১৩৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক দৌলতাবাদের শাসনকর্তা কুতলুঘ খানকে অপসারিত করে সমগ্র দাক্ষিণাত্য থেকে রাজস্ব আদায় করার সুবিধার্থে চারিটি ভাগে বিভক্ত (শিক) করেন। প্রত্যেক বিভাগের উপর একজন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মালবকে এই চারিটি বিভাগের একটিতে পরিণত করা হয়েছিল এবং এইখানে আজিজ হেমার নামে একজন

---

* উভয় ভ্রাতাকে সুলতান সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কাম্পিলি প্রেরণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

নিম্নকোটির ব্যাক্তিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল। আজিজ হেমার সম্পর্কে সমকালীন লেখকরা কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল যে কোন আমিরন-ই-সদা বিদ্রোহী হলে তাকে যেন শাস্তি দান করতে তিনি দ্বিধা না করেন। এই নির্দেশ পালনে অতিরিক্ত তৎপরতা দেখিয়ে আজিজ হেমার ধরের প্রায় আশিজন আমিরন-ই-সর্দার প্রাণদন্ড দিয়েছিলেন। ফলে তাঁদের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং ১৩৪৫ সালে ব্রোচের আমিরন-ই-সদারা বিদ্রোহ ঘোষনা করেছিলেন। সুলতান এই বিদ্রোহীদের পরাজিত করলে তারা দৌলতাবাদের দিকে পলায়ন করেছিলেন। দৌলতাবাদের আমিররাও এইসময় বিদ্রোহ করে ইসমাইল মুখ আফগানকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষনা করেছিল। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক সসৈন্যে এই বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য অগ্রসর হয়ে তাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। ফলে ইসমাইল মুখ আফগান তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে দৌলতাবাদ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে গুজরাটে তাঘীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দিলে মহম্মদ বিন তুঘলক গুজরাটের বিদ্রোহ দমনের জন্য দৌলতাবাদের অবরোধের ভার অন্যদের উপর দিয়ে তাঘীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই সুযোগে হাসান নামে আমিরণ-ই-সদাদের একজন সেনাপতি দিল্লীর সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করে দৌলতাবাদকে অবরোধ মুক্ত করেছিলেন। ইসমাইল মুখ আফগান বৃদ্ধ ও আয়েসী হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি স্বেচ্ছায় হাসানকে সিংহাসন দান করে অবসর গ্রহণ করেন। আবুল মুজাফর আলাউদ্দীন বাহমন শাহ উপাধি গ্রহণ করে ১৩৪৭ সালে এই হাসান, দৌলতাবাদে স্বাধীন বাহমনি সুলতানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ইতিমধ্যে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক গুজরাটে তাঘীকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। এইসময় তাঘী সিন্ধুর সুমার শাসকদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতান সিন্ধু নদ অতিক্রম করে সসৈন্যে তাঘী ও তার আশ্রয়দাতা থাট্টার সুমার শাসকদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৩৫১ সালের মার্চ মাসে তাঁর জীবনাবসান হয়।

মহম্মদ বিন তুঘলকের মূল্যায়ন ও সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তাঁর দায়িত্ব

ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক বাদায়ুনী মন্তব্য করেছেন যে, মৃত্যুর শীতল স্পর্শে সুলতান তাঁর প্রজাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন এবং তাঁর প্রজারাও সুলতানের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (৩য় খণ্ডের) সম্পাদক স্যার উলসী হেগ লিখেছেন যে, মহম্মদ বিন তুঘলক একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর চরিত্রের স্ববিরোধ, যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁদের কাছে বিভ্রান্তিকর বলে মনে হত।

শাসক হিসেবে মহম্মদ বিন তুঘলক নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি যেসব বিভিন্ন সংস্কারের প্রবর্তন করেন তার প্রায় প্রত্যেকটি ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে সুলতান বহু সদ্‌গুণের আধার হলেও তাঁর নিষ্ঠুরতা ও খামখেয়ালীর জন্য তিনি প্রজাদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। বারানী বলেছেন যে, 'সুলতান অকারণে নিরাপরাধ মুসলমানদের রক্তপাত করেছেন'। কিন্তু কেবল মুসলমানদের নয়, মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য তিনি সকলকেই কঠোর শাস্তিবিধান করতেন।

সমকালীন লেখকদের মধ্যে আরব ভ্রমণকারী ইবনবতুতা, ইসেমী এবং তারিখ-ই-ফিরোজশাহীর লেখক জিয়াউদ্দীন বারানী সুলতানের কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইবনবতুতা সুলতানের নিষ্ঠুর শাস্তিদানের কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। এইসব উদাহরণগুলির মধ্যে কিছু কিছু অতিরঞ্জনের নমুনাও পাওয়া যায়। যথা রাজধানী পরিবর্তনের সময় একজন অন্ধ ও খঞ্জকে জোরজবরদস্তি নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় তাদের মৃত্যু বা সমস্ত দিল্লীর জনগণকে

www.pathagar.com

দেবগিরি যেতে বাধ্য করার কাহিনী প্রভৃতি। বারানী সুলতান ফিরোজ তুঘলকের আমলে ইতিহাস রচনা করেন এবং ফিরোজ তুঘলক তাঁর পূর্বসূরীর প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এই কারণে বারানী তাঁর লেখনীতে মহম্মদ বিন তুঘলক সম্পর্কে কিছুটা সংযত ভাবে মন্তব্য করেছেন। এতদসত্ত্বেও বারানীর লেখায় স্ববিরোধ যেকোন পাঠকের কাছে কোন কোন ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। বারানী এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন যে, রাজধানী পরিবর্তনের পর একটি কুকুর বা বেড়ালও দিল্লীতে ছিল না, আবার আরেকজন বলেছেন যে, কেবলমাত্র উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাই দৌলতাবাদে প্রেরিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহাসিক ইসেমী ছিলেন আরেকজন সমকালীন লেখক। তাঁর মতে, সুলতান আলাউদ্দীন খলজী সুলতানী আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন এবং মহম্মদ বিন তুঘলক ছিল নিকৃষ্টতম শাসক। ইসেমী সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলককে হেয় করার জন্য তার গ্রন্থ ফুতু-উস-সালাতিনে চরম অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন, রাজধানী পরিবর্তনের সময় দিল্লী শহরের অসূর্যম্পশ্যা নারী থেকে সকল ব্যক্তিকে দৌলতাবাদে যেতে বাধ্য করা হয়।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক রাজ্য ও রাজনীতিতে উলেমাদের হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। এবিষয়ে তাঁর মনোভাব ইবনবতুতার লিখিত রেহেলা বা ভ্রমণকাহিনীর নানা বক্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট।* ইবনবতুতা উল্লেখিত ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম হল উলেমা আফিফ-উদ্দীন সুলতানের খরাপীড়িত এলাকার মানুষের জন্য যেসব কূপ খনন ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সেই বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করাতে সুলতান তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন সুলতান তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আপনি কেন রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন'? সুলতান রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব সহ্য করতে রাজি ছিলেন না। মহম্মদ বিন তুঘলকের উদারতা ও উলেমাদের প্রতি অবহেলা রক্ষণশীল সমাজের প্রধানদের তাঁর প্রতি বিরূপ হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল।

সুলতানের প্রতি তৎকালীন শাসকশ্রেণীর বিরূপ হওয়ার আরেকটি কারণ হ'ল তিনি, বারানীর মতে, নিম্নশ্রেণীদের অর্থাৎ হিন্দুস্তানীদের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে আমিরন-ই-সদা বা বিদেশাগত অভিজাতরা এই কারণে বিদ্রোহী হয়েছিলেন সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রে নানা সদগুণের সমাবেশ হয়েছিল কিন্তু তাঁর ধৈর্যের অভাব, অপরের চিন্তা ও ভাবনাকে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নিয়ে দেখা এবং ধীর ও স্থিরভাবে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করার ও পদক্ষেপ গ্রহণ করার মত দূরদৃষ্টি ছিল না। তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনাগুলি কতদূর বাস্তবে রূপায়ন করা সম্ভব এসম্পর্কে তিনি চিন্তা করেন নি এবং কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তা সম্পূর্ণ করার জন্য সুলতান ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে শেখেননি। তিনি স্বল্পকালের মধ্যেই মানসিক ধৈর্য হারাতেন এবং ক্রোধে আত্মহারা হয়ে নির্দোষীকে পর্যন্ত কঠোর শাস্তিদান করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের অধিকাংশ পরিকল্পনা এইভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।** মহম্মদ বিন তুঘলক সম্পর্কে ডঃ এ এল শ্রীবাস্তব মন্তব্য করেছেন যে— 'He lacked balance, practical judgement and common sense'*** সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক সঠিকভাবে মানবচরিত্র বিচারে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং কল্পনাপ্রবণ ছিলেন। সুলতান তাঁর পরিকল্পনাগুলি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না

---

*The Rehla of Ibn Battuta (Eng. trans)- Agha Mahedi, Hussin, পৃঃ ৮৮-৮৯।

** অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে অষ্ট্রিয়ার জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী নৃপতি দ্বিতীয় জোসেফ সম্পর্কেও বলা হয় যে, তিনি যে কাজেই হাত দিয়েছিলেন তাতেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলক ও জোসেফ কেহই বাস্তববাদী ছিলেন না

*** The Sultanate of Delhi, পৃ: ২০০।

www.pathagar.com

করে চালু করতে সচেষ্ট হন। দূরদৃষ্টির অভাবে তিনি বারংবার সাফল্য লাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

সমকালীন লেখকরা ও শাসকগোষ্ঠী তাঁর উদারতা, পরধর্মসহিষ্ণুতা ও উলেমা এবং রক্ষণশীলদের প্রতি অবহেলার জন্য সুলতানের নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিলেন। আর শেষোক্তদের মধ্যে যাঁরা ইতিবৃত্তকার ও ডঃ কে এম আশরফের ভাষায়, যাঁদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী (আহলে-এ-কলম) বলা হয় তাঁরা মহম্মদ বিন তুঘলককে তাঁদের লেখনীর মারফতে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। এইসব অভিযোগ ভিত্তিহীন নাহলেও অতিরঞ্জিত। সুলতানের দুর্ভাগ্য তাঁর রাজত্বকালে দুর্ভিক্ষ ও আর্থিক সমস্যা সাম্রাজ্যের সংকট ডেকে এনেছিল। সুলতানের পরিকল্পনাগুলির ব্যর্থতা এই সংকটকে গভীর করেছিল। প্রজাবিদ্রোহ এবং আমিরদের নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ উপ্ত করেছিল। ডঃ মাহেদী হোসেনের মতে দক্ষিণভারতে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে সাম্রাজ্যের সীমা সর্বাধিক বিস্তৃত হয়। কিন্তু সুলতানের অদূরদর্শিতার জন্য অধীন রাজ্যগুলি ও জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের প্রসার অত্যল্পকালের মধ্যে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের অবসানের কারণ হয়েছিল। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন কানহাইয়া নায়েক বা কৃষ্ণ নায়েক দক্ষিণের হোয়েসল রাজা তৃতীয় বীর বল্লালের উত্তরসূরীরা, রেড্ডীনেতা প্রলয়ভীমা প্রভৃতি। অবশেষে বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গমের পঞ্চম পুত্র, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হরিহর ও বুক্ক, ১৩৩৬ সালে বিজয়নগর রাজ্যের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ১৩৪৭ সালে দক্ষিণ-ভারতের আমিরন-ই-সদা বা বৈদেশিক আমিরগণ আলাউদ্দীন বাহমন শাহর নেতৃত্বে স্বাধীন বাহমনী রাজ্য স্থাপন করেন। ১৩৫১ সালে 'তাঘী' নামে এক বিদ্রোহীর অভ্যুত্থান দমন করার জন্য তার পশ্চাদ্ধাবন করার সময় সিন্ধুতে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের ধ্যানধারণার হদিস সমসাময়িক মানুষের নাগালের বাইরে ছিল। তাঁর বাস্তবজ্ঞানের অভাব ও পরিস্থিতির সঠিকমূল্যায়নের ব্যর্থতা সুলতানের পরিকল্পনাগুলির রূপায়নের পথে অলংঘনীয় বাধার সৃষ্টি করেছিল। ধৈর্যের অভাব ও নিষ্ঠুরতা ও অসহিষ্ণুতার জন্য তিনি সময় বিশেষে অকারণে সামান্য অপরাধেও কঠোর শাস্তিদানে কুণ্ঠিত হতেন না। কিন্তু তুর্কী-আফগান শাসনের যুগে বহু সুলতান যাদের সম্পর্কে সমকালীন লেখকরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ যথা, সুলতান আলাউদ্দীন খলজী ও অন্যান্যরা, নিষ্ঠুরতার জন্য সর্বজনবিদিত ছিলেন। তাসত্ত্বেও ইসেমী-প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা তাঁদের প্রশংসা করতে পিছপা হননি। মহম্মদ বিন তুঘলকের ন্যায় জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি সুলতানী আমলে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেননি। কিন্তু সমকালীন রাজনীতি ও সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা, শাসকশ্রেণীর অন্তর্গত শক্তিশালী উলেমা ও আমিরদের অবহেলা, নিম্নকোটির লোকেদের প্রতি পৃষ্ঠাপোষকতা এবং অবাস্তব পরিকল্পনা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাঁর জীবনে দুর্যোগ ডেকে এনেছিল। ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর উত্তরসূরী ফিরোজ তুঘলক গোঁড়া সুন্নী মুসলমান ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি, বংশানুক্রমিক ইক্তার বহুল প্রচলন, দুর্নীতি ও স্বজন-পোষণের প্রসার এবং শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা ও সামরিক ব্যর্থতা সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ সুপ্রশস্ত করেছিল। পরবর্তীকালের দুর্বল তুঘলক বংশীয় সুলতানদের গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণকারী তৈমুরের আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে তুঘলক সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল। মহম্মদ বিন তুঘলকের ব্যর্থতা সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সূত্রপাত করেছিল।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রীঃ)

১৩৫১ সালের ২ মার্চ মহম্মদ বিন তুঘলক সিন্ধুতে যখন তাঘীর বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত ছিলেন

www.pathagar.com

সেই সময় আভ্যন্তরিক গোলযোগের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রয়াত সুলতানের পিতৃব্য রজবের পুত্র ফিরোজ শাহ্ তুঘলককে সমবেত আমিরওমরাহ ও উলেমা এবং সুফীরা মহম্মদ বিন তুঘলকের উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের মাতা ছিলেন দিপালপুরের রায় রণমল ভাট্টীর কন্যা। সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের চাপে রায় রণমল এই বিবাহে সম্মতিদান করতে বাধ্য হন। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের কোন পুত্র ছিল না বলে সমকালীন লেখকরা বলেছেন। কিন্তু দিল্লীতে মহম্মদের নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধি খাজাজাহান একটি বালককে প্রয়াত সুলতানের সন্তান বলে দাবি করেন। এছাড়া খুদাবন্দজাদা বেগমের বা প্রয়াত সুলতানের ভগ্নীর নাবালক পুত্র দাওয়ার মালিকের সিংহাসনে উত্তরাধিকার সম্পর্কে তাঁর মাতা দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু সিন্ধুতে তৎকালীন যে বিপদজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার মোকাবিলা করার জন্য সুযোগ্য নেতৃত্ব দান কোন নাবালকের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অতএব সুলতানের দরবারের প্রভাবশালী আমির ওমরাহ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা ফিরোজের সিংহাসনে আরোহন সমর্থন করেছিলেন।

সৈনিক হিসাবে সুনামের অধিকারী না হলেও সিংহাসনে আমির ওমরাহরা এবং উলেমারা-ফিরোজকে নির্বাচিত করেছিলেন! এর ফলে সুলতান নির্বাচনের ক্ষেত্রে এক নতুন নীতির ইংগিত পাওয়া যায়। ফিরোজ শাহর সিংহাসন লাভ আরো দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা করেছিল। প্রথমতঃ, তুর্কী-আফগান শাসনকালে কেবলমাত্র বংশপরম্পরায় রাজমুকুট ধারনের অধিকার থেকে নির্বাচনের মারফতে যোগ্য প্রার্থীর সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভের দাবি এই ঘটনা সমর্থন করে। দ্বিতীয়তঃ, সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভের জন্য রক্তসম্পর্কের নৈকট্য থেকে প্রার্থীর যোগ্যতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব লাভ করে। রাজ্যশাসনে আমির ওমরাহ এবং উলেমাদের প্রভাব যে কতদূর প্রভাবশালী এই ঘটনা তারও সাক্ষ্য বহন করে। ফিরোজের সিংহাসনে অভিষেকের পর (২৩শে মার্চ, ১৩৫১) শিবিরে শৃংখলা স্থাপন করেন। প্রয়াত সুলতান যে সব ভাড়াটিয়া মোঙ্গল বাহিনী সিন্ধুতে এনেছিলেন মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে সুলতান ফিরোজ শাহ দমন করেছিলেন। শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি স্বীয় অনুগতদের আত্মবিশ্বাস পুনঃস্থাপনে সাফল্য অর্জন করেন। অতঃপর সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক দিল্লীর দিকে প্রত্যাবর্তন শুরু করেছিলেন। মূলতানে তিনি পুনরায় আমিরদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের কোন পুত্র ছিল না এবং উলেমারা রায় দেন যে, কোন নাবালকের উত্তরাধিকার আইনত গ্রাহ্য নয়। এই সমস্যার সমাধান সহজেই হয়। যখন খাজাজাহানও সুলতান ফিরোজ শাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সুলতান ক্ষমা করা সত্ত্বেও খাজাজাহানের শত্রুরা এই সুযোগে সামানায় স্বীয় জায়গীরে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁকে হত্যা করেছিলেন।

অভ্যন্তরীণ নীতি

সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক সিংহাসন লাভের পর যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হল সাম্রজ্যকে অবক্ষয় ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। এই কারণে তিনি সৈন্যবাহিনী আমির ওমরাহ ও উলেমাদের তোষণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লী সাম্রাজ্যের যে সব সুদূরবর্তী অঞ্চলে তাঁর পূর্বসূরীর রাজত্বকালে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল সেখানে ফিরোজ কেন্দ্রের শাসন পুনঃস্থাপনে আগ্রহ প্রদর্শন করেন নি। এইজন্য দাক্ষিণাত্যে ও সুদূর দক্ষিণে সুলতান কোন অভিযান প্রেরণ করেননি। সুলতান ফিরোজের গোঁড়ামী ও অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাস উলেমা ও মুসলিম রক্ষণশীল সমাজের প্রীতি উৎপাদন করেছিল। সুলতান আদর্শ মুসলমান অধিপতি হিসাবে নিজেকে জাহির করেছিলেন। অতএব জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে

www.pathagar.com

তিনি সাম্রাজ্যের সকল প্রজার প্রতিপালক হলেও ফিরোজ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকে মুসলমান প্রজাদের শাসক বলে মনে করতেন। এই দ্বৈতভূমিকায় সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের কৃতিত্বের সম্পর্কে মন্তব্য করে ঐতিহাসিক আশীর্বাদী লাল শ্রীবাস্তব বলেছেন যে, 'He succeded in giving certain measure of material prosperity to the people and in raising the importance of orthodox Islam.'

শাসনব্যবস্থা

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক মালিক-ই-মকবুলকে খানজাহান উপাধিতে ভূষিত করে উজীর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। খানজাহান ছিলেন তেলিংগানার একজন ব্রাহ্মণ এবং তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রাজ্যশাসনে তাঁর দক্ষতার জন্য সুলতান ফিরোজ স্বল্পকালের মধ্যে সহজেই শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁর পূর্বসূরীর আমলে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে নিরাপত্তাবোধের অভাব দেখা দিয়েছিল তা দূর করেছিলেন। দিল্লীর জনগণের মধ্যে বিশেষতঃ সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে সুলতানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাজস্ব ও কারা বিভাগে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক কতকগুলি সংস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন। প্রধানতঃ তাঁর রাজত্বে প্রজাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের প্রতি সুলতানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফলে কল্যাণমূলক কাজের মারফতে জনসাধারণের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। এই সব কাজে মুসলমান প্রজারাই কেবল উপকৃত হননি, গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও শহরাঞ্চলের দরিদ্ররাও যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন। এই কারণেই সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক শাসক হিসাবে সাফল্য অর্জন করেন।

রাজস্ব নীতি

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করে সর্বসাধারণের উপকার সাধন করেছিলেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি সর্বপ্রকার উৎপীড়নের অবলুপ্তি করেছিলেন। ইতিপূর্বে কৃষকদের দূর্ভিক্ষ ও অজন্মার সময় যেসব ঋণ সরকার থেকে দেওয়া হয়েছিল তা পরিশোধ যোগ্য নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সমগ্র রাজ্যের রাজস্বের পরিমান সম্পর্কে একটি অনুমান ভিত্তিক হিসাব করে জানা যায় যে, খালিসা বা সুলতানের খাস জমি এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সরাসরি শাসিত এলাকার আয় ছিল ছয়কোটি আশি লক্ষ তংকা। এই হিসাব জমির জরিপের বা উৎপাদনের ভিত্তিতে করা হয় নি। স্বভাবতঃ এই অনুমান যথাযথ নয়। তাসত্ত্বেও রাজস্ব থেকে রাষ্ট্রের আয় সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

১৩৭৫ সালে ইসলামের আইন বিরোধী কতকগুলি কর সুলতান অবলুপ্ত করেছিলেন। কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ার লেখক বলেছেন যে, 'Firuz abolished some twentyfive vexatious cesses mostly in the nature of octroi duties which had weighed heavily upon merchents and tradesmen'।* ফতোয়া-ই-ফিরোজ শাহীতে এইরূপ ২৬ টি করের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব করের প্রতি সুলতানের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষিত হয় যখন বণিকরা আবগারী কর্মচারীদের অত্যাচারে দিল্লীতে আসা বন্ধ করেন। কারণ প্রত্যেক বণিকের পণ্যবাহী পশুকে আবগারী কর্মচারীরা পুরাতন দিল্লী থেকে ফিরোজ শাহের সময় নির্মিয়মান শহর ফিরোজাবাদের ৬ ক্রোশ দূরে একগাড়ী ইট বহন করতে বাধ্য করত। এই ধরণের বেগার বিশেষ অসন্তোষের কারণ হয়েছিল। বণিকদের মধ্যে দূরদূরান্তর থেকে রাজধানীতে পণ্য

* CH । Vol III পৃঃ ২৭৫।

www.pathagar.com

সরবরাহতে ক্রমেই অনীহা দেখা দিয়েছিল। এছাড়া শুল্ক বিভাগের উৎকোচ গ্রহণের প্রবনতা বণিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। একজন তুলা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ উৎকোচ আদায় করতে না পেরে তার তিন মণ তুলা তিনমাস সরকারী গুদামে আটক করে রাখা হয়েছিল। সরকারী গুদামে অকস্মাৎ অগ্নি সংযোগের ফলে এই তুলা আগুনে পুড়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে ব্যবসায়ীরা দিল্লীতে পণ্য নিয়ে আসা বন্ধ করে। অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে সরবরাহ হ্রাসের ফলে মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং রাজধানীতে এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতি সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় ও তিনি সকল বিষয়ে জানতে পারেন। সুলতান এইসময় শরিয়ত বিরোধী সকল কর অবলুপ্ত করেছিলেন।*

ভবিষ্যতে কর আদায়ের জন্য সুলতান ফিরোজ কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই সমস্ত করই ইসলামের আইনে অনুমোদিত ছিল। এই ধরনের কর কাঠামোর মারফতে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক একদিকে মৌলবাদীদের সমর্থন লাভ করেছিলেন অপরদিকে প্রজাসাধারণের করভার লঘু করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই করগুলি হল খরাজ (kharaj), উশর (Ushr), খামস (Khams), জিজিয়া (Jizya), ও জাকৎ (zakat)। খরাজ বা ভূমিকর অমুসলমানদের কাছ থেকে রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হত। এই করের হার উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশ থেকে অর্ধেকের মধ্যে রাজস্ব হিসাবে নির্ধারিত হত। মুসলমানদের ক্ষেত্রে ভূমিকরকে উশর বলে উল্লেখ করা হত এবং উৎপাদনের মাত্র এক-দশমাংশ রাজস্ব হিসাবে গৃহীত হত। উত্তরাধিকারীবিহীন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হত। খামস বা যুদ্ধে লুণ্ঠিত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্র গ্রহণ করত। সুলতান আলাউদ্দীন খলজী ও মহম্মদ বিন তুঘলক যুদ্ধেপ্রাপ্ত ধনদৌলতের পাঁচভাগের চারভাগই হস্তগত করতেন এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বাকি একভাগ বিতরণ করতেন। ফিরোজ ইসলামিক বিধি অনুসরণ করে সৈন্যবাহিনীকেই লুণ্ঠিত ধনরত্নের $৪/_৫$ গ্রহণ করতে বলেছিলেন। খনি থেকে আয়ের এক পঞ্চমাংশ খামস হিসাবে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হত।

ধর্মীয় কর বা জিজিয়া অবিশ্বাসীদের দেয় করকে বলা হত। ফলে তারা জাকৎ বা মুসলমানদের দেয় সম্পত্তির উপর শতকরা দুইভাগ কর থেকে অব্যাহতি লাভ করত। এছাড়া সৈন্যবাহিনীতে যোগদান থেকে ও যুদ্ধে যোগদান করা সম্পর্কে তাদের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। ধনসম্পদ ও জীবনরক্ষার বিষয় নিশ্চয়তা লাভ করার জন্য এবং নিজেদের মধ্যে স্বধর্মের নিয়মানুসারে বিবাদ মীমাংসার কাছ থেকে যে অধিকার অবিশ্বাসীদের ছিল তার মূল্য হিসাবেও জিজিয়া কর আদায় করা হত। অবিশ্বাসীদের মুসলিম রাষ্ট্রে জিমি বা সুরক্ষিত নামে উল্লেখ করা হত। সন্ধির দ্বারা বা ইমামের আদেশে জিজিয়ার হার নির্ধারিত হত। ফিরোজ শাহ তুঘলকের পূর্বে ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করা হত না। ফিরোজ ব্রাহ্মণদের জিজিয়ার আওতায় এনেছিলেন।** জিজিয়ার হার বিত্তবান, স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্র সাধারণের উপর

* শামসী সিরাজ আফিফ লিখিত তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে পৃঃ ৩৭৫-৭৬ দ্রষ্টব্য। ডঃ জে, এস, ব্যানার্জী তাঁর থিসিস হিষ্ট্রি অব সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (পৃঃ ১২২) মন্তব্য করেছেন যে 'As such the abolition of the cesses was intended to afford economic relief to the people. It might incidentally have also confirmed the requirements of religion." এসম্পর্কে কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়াতে (৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৫) বলা হয়েছে যে এই সব বাধা নিষেধের অবলুপ্তি মূল্যহ্রাসের কারণ হয়েছিল।

** ব্রাহ্মণরা-এর প্রতিবাদে অনশনে ও পরে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া প্রাণ বিসর্জনের হুমকী দেওয়া সত্ত্বেও ফিরোজ তার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। এসম্পর্কে শামসী সিরাজ আফিফের তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী পৃঃ ৩৮২-৮৩ দ্রষ্টব্য। তবে অধ্যাপক হোডিবালা তাঁর স্টাডিজ-ইন-ইন্ডো মুসলিম হিষ্ট্রিতে (পৃঃ ৩৩৬-৩৭) মন্তব্য করেছেন যে, ব্রাহ্মণদের উপর জিজিয়ার হার দরিদ্রদের কাছ থেকে গৃহীত জিজিয়ার হার অপেক্ষাও কম করা হয়েছিল। বেকার, বৃদ্ধ, নারী, শিশু ও অশক্তরা এই কর দিত না।

www.pathagar.com

তাদের আয় অনুসারে তিনপ্রকার করা হয়েছিল এবং হ্রাস বা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এ ছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃকনির্মিত খাল ও সেচ ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে যে সব কৃষকের জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করেছিল তাদের কাছ থেকে উৎপাদনের এক দশমাংশ সেচ কর আদায় করা হত।

সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক রাজস্ব আদায় করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি উন্নত ধরণের শস্য উৎপাদন, চাষাবাদের উন্নতি, সেচব্যবস্থার মারফতে চাষের সুবিধাদান ও বহু উদ্যানের পত্তন করেছিলেন। দিল্লীর আশেপাশে সুলতান ফিরোজ শাহ্র আমলে প্রায় ১,২০০ ফলের বাগানের সৃষ্টি করা হয়েছিল। এইসব বাগান থেকে কেবল রাজকোষের আয় বৃদ্ধি হয়নি দিল্লী শহরের খাদ্য সমস্যারও খানিকটা সুরাহা করেছিল। সুলতান ফিরোজের আমলে শস্য, বস্ত্র ও অন্যান্য দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য হ্রাস পেয়েছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের রাজস্ব নীতির সমালোচকরা তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থার প্রধানতঃ তিনটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ, সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক জায়গীরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ফলে রাজ্যসরকারের বড় বড় কর্মচারীগণ জায়গীর উপভোগ করতেন এবং উত্তরাধিকারী সূত্রে পুত্র ও পৌত্রদের এই সব জায়গীর দান করার অধিকার লাভ করেন। এমনকি উত্তরাধিকারী না থাকলে জায়গীরে পূর্বতন মালিকের ক্রীতদাসদের অধিকার পর্যন্ত সুলতান ফিরোজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল। এইভাবে সাম্রাজ্যে সামন্ততান্ত্রিক শক্তির প্রসার হয়েছিল। সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীরা অনেকে বেতনের বদলে জায়গীর লাভ করতেন। অনিয়মিত সৈন্যরা ভূমিরাজস্ব থেকে বেতন লাভ করতেন। সম্ভাব্য আয়ের ভিত্তিতে দালালদের কাছে তাঁরা অর্ধেক বা $^1/_3$ অংশ মূল্যে রাজস্ব আদায়ের অধিকার বিক্রয় করতেন। এছাড়া ছিল রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার। রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদারকেদায়িত্ব দান করলে প্রজাসাধারণের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভবনা ছিল। অতএব ইজারাদারী প্রথাকে সুলতান ফিরোজের রাজস্ব ব্যবস্থার দ্বিতীয় এবং অন্যতম ত্রুটি বলে গণ্য করা যায়। কারণ ভূমিরাজস্ব আদায়ের ভার ইজারাদারকে দেওয়ার সময় যিনি কোন একটি এলাকা থেকে সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের প্রতিশ্রুতি দান করতেন তাঁকেই সেই অঞ্চলের ইজারা দান করা হত। ফলে প্রজারা ইজারাদারের শোষণের শিকার হতেন। প্রতিশ্রুত রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ইজারাদার বিদ্রোহী হয়েছেন এরূপ উদাহরণেরও অভাব নাই। ১৩৭৬-৭৭ সালে শামসউদ্দীন দামঘানী গুজরাটের ইজারাদার হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তোলেন। এই বিদ্রোহ সুলতান সহজেই দমন করেছিলেন।

তৃতীয়ত, সুলতান ফিরোজশাহ্ তুঘলকের রাজস্বনীতির ফলে ইজারাদার ও জায়গীরের মালিকরা ছাড়াও ভূমিরাজস্বের আদায়ের কাজে নিযুক্ত দালাল ও ফাটকাবাজরাও প্রাধান্য লাভ করেছিল। সমকালীন ইতিবৃত্তে সুলতান ফিরোজের আমলে প্রজাসাধারণ ও কৃষকরা সুখী ও আত্মসন্তুষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই বক্তব্য কতদূর বাস্তবে সত্য ছিল তা বলা যায় না। জিয়াউদ্দীন বারানী বলেছেন যে, এই যুগে খুট ও মুকদ্দমদের গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা দুধেল গাই ও ঘোড়া ছিল এবং হাজার হাজার গ্রাম ও জনপদ লোকবসতিপূর্ণ হয়েছিল ও গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।* সমকালীন আরেকজন লেখক শামসী সিরাজ আফিফও সুলতানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু আফিফ অসাবধানতাবশতঃ তাঁর লিখিত তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী নামক গ্রন্থের একস্থানে উল্লেখ করেছেন যে, কখনও কখনও সুলতান ফিরোজ শাহ্র রাজত্বকালে খরা বা অন্যান্য কোন কারণে প্রকৃতির রোষ কৃষি-উৎপাদনে বিঘ্ন

* তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫৫৪, ৫৬৮

www.pathagar.com

উপস্থিত হলে শস্যের মূল্য মণ প্রতি এক তংকাতেও বিক্রি হত। অবশ্য এরূপ মূল্যবৃদ্ধি কখনই বেশীদিন স্থায়ী হতে দেওয়া হয়নি।*

সেচব্যবস্থা ও জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপ

কৃষির সম্প্রসারণের ও কৃষকের স্বার্থরক্ষার জন্য সুলতান ফিরোজ শাহ আগ্রহী ছিলেন। এইজন্য চাষের জমিতে জলসেচের উদ্দেশ্যে সুলতান কতকগুলি সেচখালের খনন করেন। এইসব খালের মধ্যে অন্যতম ৫টির কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথম খালটি ছিল ১৫০ মাইল দীর্ঘ যমুনা থেকে হিসার পর্যন্ত বিস্তৃত খাল। দ্বিতীয় খালটি ছিল ৯৬ মাইল দীর্ঘ শতদ্রু থেকে ঘর্ঘরা নদীর খাল। তৃতীয় মান্ডভী ও সিরমুর পাহাড় থেকে হানসী পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। চতুর্থ খাল ঘর্ঘর থেকে প্রবাহিত হয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত ফিরোজাবাদ নগরকে যুক্ত করেছিল এবং পঞ্চম খালটি যমুনা থেকে পূর্বোক্ত শহর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছিল। এই সব সেচখাল খননের ফলে দোয়াব অঞ্চলের প্রায় ১৬০ মাইল চাষের জমি দুইট বৃহৎ খালের জলে সিঞ্চিত হয়েছিল। এই অঞ্চলে উৎকৃষ্ট ধরনের গম, আখ ও অন্যান্য শস্যের উৎপন্ন হয়। এই ধরনের সেচের ফলে শস্য উৎপাদনও বৃদ্ধি পায় এবং জনবসতি প্রসারিত হয়। সুলতান সেচের ফলশ্রুতিতে যেসব অঞ্চল উপকৃত হয়েছিল তাদের উপর বর্দ্ধিত উৎপাদনের উপর শতকরা দশভাগ সেচকর (হক-ই-শিরাহ) আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বেকারদের চাকরী দেবার প্রচেষ্টা করেন। তিনি চারটি মসজিদ, ত্রিশটি প্রাসাদ, অজস্র সরাইখানা, পাঁচটি জলাশয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় বা দার-উস-সাফা, একশটি সমাধিস্তম্ভ, দশটি স্নানাগার, দশটি স্মৃতিসৌধ ও একটি সেতু নির্মাণ করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ দুইটি অশোক স্তম্ভ, একটি খিজিরাবাদ থেকে ও অপরটি মিরাট থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তিনি যেসব উদ্যানের পত্তন করেছিলেন তার মধ্যে দিল্লী ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলেই ১,২০০ উদ্যান ছিল। এইসব উদ্যানের উৎপন্ন ফল থেকে প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার তংকা রাজকোষের লাভ হত।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বিচারব্যবস্থার সংস্কার করেন। প্রধান কাজী রাজধানীতে এবং তাঁর অধীনস্থ অন্যান্য কাজি গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে বিচার ব্যবস্থার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। মুফতিরা ইসলামিক আইনের ব্যাখ্যা দিতেন এবং কাজি বিচারের পর রায় দিতেন। সুলতান ফিরোজ অভিযুক্তদের উপর শারীরিক উৎপীড়নের প্রথা বন্ধ করেন এবং অপরাধীদের শাস্তির কঠোরতা হ্রাস করেন।

সুলতান যেমন বেকারদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন তেমনি দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য তিনি দেওয়ান-ই-খরিয়তের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের সাহায্য দান করতেন এবং বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন শিশুদের আর্থিক সহায়তা করতেন। কিন্তু সুলতানের এই সব দানখয়রাত প্রধানতঃ মুসলমানদের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল। এই যুগে দিল্লীতে ৩৬টি রাজকীয় কারখানা ছিল। প্রতিটি কারখানার একজন পরিদর্শক ছিলেন। এইসব পরিদর্শকদের প্রধানের ক্ষমতা একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার বা মুকতির সঙ্গে তুলনীয়। ফিরোজের অজস্র ক্রীতদাসদের মধ্যে অনেকেই কারখানায় নিযুক্ত হতেন। এইসব কারখানার কর্মচারীরা দক্ষ ও কুশল কারিগর ছিলেন। সুলতানের দরবারের ও সরকারের প্রয়োজনীয় পণ্য এইসব কারখানায় উৎপাদন করা হত।

* শামসী সিরাজ অফিফ, পৃঃ ২৯৩।

www.pathagar.com

শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা, জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর

সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের রাজত্বকালে বহু মাদ্রাসা ও মক্তব স্থাপিত হয় এবং উচ্চশিক্ষার প্রসার হয়। সুলতান বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তিদের সমাদর করতেন। সুলতান ফিরোজ ৩০টি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তার সঙ্গে ৩টি উচ্চ শিক্ষায়তনের সূত্রপাত করেন এবং এইসব মাদ্রাসায় শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত আলম ও উলেমারা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। লেখক ও ঐতিহাসিকরা সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের সময় বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন। জিয়াউদ্দীন বারানী ও শামস-ই সিরাজ আফিফের ন্যায় ঐতিহাসিক এই যুগে তাদের গ্রন্থ রচনা করেন।.সুলতানের আমলে যেসব ধর্মীয় বিধির প্রচলন করা হয়েছিল তার খোঁজখবর ফতোয়া-ই-ফিরোজশাহীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফতোয়া-ই-ফিরোজশাহীর বিধিগুলির প্রবর্তক হিসাবে সুলতানের নাম উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও সিরাত-ই-ফিরোজশাহী নামে আরেকটি সমকালীন ফার্সী গ্রন্থের লেখকের নাম অজানা রয়েছে। ফিরোজের পৃষ্ঠপোষকতা কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। ফিরোজ শাহ আইন সংক্রান্ত, ধর্ম বিষয়ক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে চর্চার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন।

ক্রীতদাস ও সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত নীতি

সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক অগণিত ক্রীতদাস সংগ্রহ করেন। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের উপযুক্ত ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুলতান এইভাবে প্রায় একলক্ষ আশিহাজার ক্রীতদাস সংগ্রহ করেন। ক্রীতদাসদের বিভিন্ন কারিগরী বিদ্যা ও অন্যান্য বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাদানের একটি আলাদা বিভাগ ছিল। রাজকীয় কারখানায় সুলতানের দরবারে ও প্রাসাদে এবং প্রদেশগুলিতে বিভিন্ন কাজে তাদের নিযুক্ত করা হ'ত। ক্রীতদাসের সংখ্যাবৃদ্ধি সুলতানের শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার কারণ হয়েছিল। সুলতান ফিরোজ এই ক্রীতদাসদের সংখ্যা ও গুরুত্ব এতদূর বৃদ্ধি করেছিলেন যে, তাঁর রাজত্বের শেষার্ধে তারা শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ শুরু করেছিল এবং তুঘলক বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

সুলতানের সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীর মধ্যে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি নগদ বেতনে নিযুক্ত ছিলেন। কারণ তাঁরা প্রায় সকলেই নগদের পরিবর্তে ইকতা (assignment) রাজস্বের হস্তান্তরের মারফত বেতন লাভ করতেন। সৈন্যবাহিনীর ক্ষেত্রে এইরূপে ইকতা হস্তান্তর একধরণের দুর্নীতি ও ফাটকাবাজির পথ প্রশস্ত করেছিল। এইসব ইকতার (assignment) হস্তান্তরিত রাজস্ব এক তৃতীয়াংশ মূল্যে রাজধানীতে ক্রয় করে বিভিন্ন প্রদেশ ও সরকারে সৈন্যদের কাছে অর্ধেক মূল্যে বিক্রয় করা হত। সুলতানের সৈন্যবাহিনীতে এর ফলে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন সৈন্যের মৃত্যুর পর বা অক্ষমতা ও বার্ধক্যের জন্য তাকে অবসর গ্রহণ করতে হলে তার পুত্র, পৌত্র ও অন্য কোন বংশধরকে এমনকি তার ক্রীতদাসকেও সেই সৈন্যের স্থান গ্রহণ করতে অনুমতি দেওয়া হ'ত। এইভাবে উত্তরাধিকারী সূত্রে সৈন্যবাহিনীতে অযোগ্য ও অকর্মণ্য ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ক্রমেই আলাউদ্দীনের দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী ফিরোজের নীতির জন্য দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত মাত্র আশি থেকে নব্বুই হাজার অশ্বারোহী বাহিনী রাজধানীতে কর্তব্যরত ছিল। দিল্লী সুলতানী বাহিনীর অবশিষ্টাংশ প্রাদেশিক মুক্তি ও শাসনকর্তাদের দেয় সৈন্যবাহিনীর অংশ ছিল। ফলে তাদের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের হাতে ছিল না। কারণ, এইসব বাহিনীর সৈন্যদের নিয়োগ, শৃঙ্খলা ও পদোন্নতি সবটাই প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে ছিল। এইভাবে

www.pathagar.com

আমির ওমরাহদের শক্তিবৃদ্ধি পায়, সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ও কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল।*

উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

সুলতান উন্নয়নমূলক কার্যে উৎসাহী ছিলেন। ফিরোজ বহু নতুন প্রাসাদ ও নগর নির্মাণ করেন। সমকালীন ইতিহাসে দাবি করা হয় যে, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে প্রায় ৩০০ নগরের সূচনা করা হয়েছিল। যেসব গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়েছিল তাদের ফিরোজ পুনর্বাসিন করেছিলেন। সমকালীন ঐতিহাসিকরা তাঁদের বিবরণে ফিরোজকে ৩০০ নগরীর পত্তনের কৃতিত্ব দেওয়ার সময় এইসব পুর্নবাসিত গ্রামগুলিকে গণনা করেছিলেন। ফিরোজ শাহ প্রতিষ্ঠিত নগরগুলির মধ্যে ফিরোজাবাদ (দিল্লীর কোটলা ফিরোজ শাহ), হিসার, ফিরোজাবাদ জৌনপুর, ফিরোজপুর (বাদায়ুনের নিকটবর্তী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায় ১২,০০০ নতুন উদ্যানের পত্তন করেন। খিজিরাবাদ ও মিরাট এই দুইটি স্থান থেকে দুইট অশোক স্তম্ভ ফিরোজ দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। সুলতান মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করেন। এই সময় রৌপ্য ও তাম্র এই দুই ধাতুর সংমিশ্রণে স্বল্পমূল্যের মুদ্রা চালু করা হয়। এই স্বল্পমূল্যের মুদ্রা বা জীতলকে আধা ও বিকা বলা হত। এইগুলি চালু করার ফলে সাধারণের লেনদেনের সুবিধা হয়েছিল। কিন্তু টাঁকশালের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের দুর্নীতির ফলে এই সংস্কারের ফলশ্রুতি লাভজনক হয়নি।

প্রজাহিতৈষী ফিরোজ তুঘলক কৃষক ও জনসাধারণের জীবনযাত্রায় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিধানের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ফিরোজ শাহর রাজত্বকালে ভূমিরাজস্ব নির্ধারণে ও আদায়ে সংস্কারসাধন করা হয়েছিল। যার ফলে প্রজাসাধারণের করভার লাঘব হয়েছিল। কূপখনন ও খালের জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে কৃষির উন্নতি করা হয় এবং খাদ্যশস্যের ঘাটতি হ্রাস পায়। সুলতান ফিরোজের রাজত্বের শুরুতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য আলাউদ্দীনের রাজত্বের তুলনায় অধিক ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে ক্রমেই পণ্যমূল্য স্থিতিলাভ করে। আশরফের মতে, 'আলাউদ্দীন, মহম্মদ তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলকের শাসনাধীনকালে নিম্নে বর্ণিত অধিকাংশ জিনিসের (সম্ভবত যা বলা হল না তারও) দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ফিরোজ তুঘলকের আমলে মূল্যস্তর আবার আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের ন্যায় হয়েছিল। কতকগুলি বিশেষ কারণে চিনির বেলাতেই নিয়মের ব্যতিক্রম চোখে পড়ে।'** ফিরোজ তুঘলকের রাজ্যে প্রজাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের কথা উল্লেখ করে সমকালীন একজন প্রশস্তিকার বলেছেন যে, "তাদের গৃহ, শস্য, সম্পদ, অশ্ব ও আসবাবপত্র পরিপূর্ণ ছিল, প্রত্যেকের যথেষ্ট সোনা ও রূপা ছিল, কোন নারীরই অলংকারের অভাব ছিল না এবং কোন গৃহেরই পালংকের ও উপবেশনের আসবাবের ঘাটতি ছিল না।" দোয়াবের রাজস্বই ছিল ৮০ লক্ষ এবং সমগ্র রাজ্যের রাজস্ব প্রায় ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ তংকা হয়েছিল। রাজ্যে খরা ও অনাবৃষ্টির সময় খাদ্যাভাব কখনও কখনও দেখা দিলেও ফিরোজশাহর রাজত্বে প্রজাসাধারণের আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই।

---

* এইজন্য রিজভী মন্তব্য করেছেন যে, 'During his predecessor's regin the prestige of Alauddin's once invincible army had vanished; under Firuz, manned by hereditary soldiers, it was reputed to be rotten to the core.' Wonder that was India, Vol. II, পৃঃ ৫১।

** এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত কে, এম, আশরফের গবেষণাপত্র Life and conditions of the people of Hindustan' থেকে গৃহীত।

www.pathagar.com

ধর্ম সম্পর্কিত নীতি

সুলতান ফিরোজশাহ্ তুঘলক তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতিতে প্রজাকল্যাণমূলক কার্যকলাপের জন্য প্রসিদ্ধ। আবার তাঁর ধর্মান্ধতা এইযুগের সমস্ত নীতিকে প্রভাবিত করেছে এসম্পর্কে সন্দেহ নাই। রিজভী মন্তব্য করেছেন যে, কেবলমাত্র গোঁড়া সুন্নীরা তাঁর রাজত্বকালে রাষ্ট্রবিরোধী কোন কার্যকলাপে লিপ্ত হবার জন্য শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেতেন। এমনকি শিয়ারা বা যাঁরা গোঁড়া সুন্নী মুসলমান ছিলেন না তাদেরও সামান্যতম অপরাধে ফিরোজ ক্ষমা করতেন না। হিন্দুদের ক্ষেত্রে ফিরোজ একজন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান সুলতান হিসাবে সংকীর্ণ ও ধর্মান্ধনীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জিজিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের অব্যহৃতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন। দিল্লীর ব্রাহ্মণরা জিজিয়া করের আওতায় তাদের আনার বিরুদ্ধে প্রথমে অনশন শুরু করে ও পরে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে উদ্যেত হয়। ফিরোজ এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে ব্রাহ্মণদের জিজিয়া থেকে অব্যহৃতি দান করেন নি। কিন্তু তাঁদের উপর জিজিয়ার হার কমিয়ে দিয়েছিলেন। ফিরোজ তুঘলক সর্বদা উলেমা ও গোঁড়াপন্থী সুন্নীদের সমর্থন লাভের জন্য তৎপর ছিলেন। এইভাবে সুলতান রাজ্যে স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য তিনি জাজনগর অভিযানের সময় ও অন্যান্য সুযোগে হিন্দুমন্দির ধ্বংস করতে দ্বিধা করেননি এবং হিন্দুদের ধর্মান্তকরণে উৎসাহ দিয়েছিলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে একজন ব্রাহ্মণের কাছে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য অনেক হিন্দু এমনকি মুসলমানরাও যাতায়াত করতেন। সুলতানের আদেশে এই ব্রাহ্মণকে গায়ে অগ্নিসংযোগ করে হত্যা করা হয়। খলিফার ফরমান ফিরোজ শাহ্ দুইবার গ্রহণ করেন এবং মুদ্রায় নিজেকে খলিফার নায়েব বলে বর্ণনা করেন। এই ধর্মীয় নীতির মূলে ছিল সুলতান ফিরোজের গোঁড়াপন্থী সুন্নী সমাজের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা। ধর্মীয় নীতির জন্য সুলতানের প্রজাহিতৈষী কার্যকলাপ ব্যাহত হয়নি। ফিরোজের কৃষি ও রাজস্ব সংস্কার কৃষক ও সাধারণ প্রজার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি করেছিল। শুল্ক কর ও অন্যান্য বহুকর অবলুপ্ত করে তিনি পণ্যমূল্য হ্রাস করেছিলেন। যার ফলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হয়েছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক একদিকে গোঁড়া ধর্মীয় নীতি অনুসরণ করেন অপরদিকে, ধর্মের গোঁড়ামির জন্য, প্রজামঙ্গলে বিরত হন নাই। যেজন্য

পণ্য	আলাউদ্দীন	মহম্মদ বিন তুঘলক	ফিরোজ শাহ তুঘলক
	(প্রতি মনের মূল্য জীতল হিসেবে)		
গম	৭ ১/২	১২	৮
যব	৪	৮	৪
ধান	৫	১৪	—
ডাল	৫	—	৪
মসুর	৩	৪	৪
চিনি (শ্বেত)	১০০	৮০	—
চিনি (নরম)	৬০	৬৪	১২০, ১৪০
ভেড়ার মাংস	১০	৬৪	—
ঘি (পরিমার্জিত মাখন)	১৬	—	১০০

www.pathagar.com

প্রজাসাধারণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল।*

ধর্মীয় কারণে হিন্দুদের তাড়না করার অন্যতম উদাহরণ হিসাবে কাটেহারের শাসক (রোহিলখণ্ড) খারকুর বিরুদ্ধে ১৩৮০ সালে সুলতানের অভিযান উল্লেখযোগ্য। খারকুর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনজন সৈয়দের জীবননাশ হয়েছিল। এই ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ফিরোজ ৫ বৎসর ধরে ক্রমান্বয়ে এই স্থানে অভিযান করে অজস্র হিন্দুর প্রাণনাশ করেছিলেন। কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার (৩য় খণ্ড) লেখকের ভাষায় বলা যায় 'the death of the three Sayyids was avenged by that of countless thousands of Hindus'. সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের হিন্দু-বিদ্বেষের দরুণ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়েছিল। একদিকে যেমন কৃষক ও কৃষির উন্নতিসাধন করে ও জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের দ্বারা তিনি প্রজাসাধারণের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন অপরদিকে মুষ্টিমেয় উলেমা ও গোঁড়াপন্থীদের প্রভাবে তিনি ধর্মীয় কারণে যেসব নির্যাতন করেছিলেন তাতে রাজ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সামরিক অভিযান ও বৈদেশিক নীতি

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজ্যজয় নীতি ও সামরিক অভিযানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এইসব অভিযানের অসাফল্যের জন্য সুলতান নিজেই দায়ী ছিলেন। বৈদেশিক নীতি ও সামরিক অভিযানের বিষয়ে ফিরোজের দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বল মনোভাব তাঁর ব্যর্থতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষার্ধে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। ফিরোজ এইসব রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন সামরিক অভিযান প্রেরণ করেননি এবং দিল্লীর সাম্রাজ্য থেকে দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যগুলির স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে মেনে নিয়েছিলেন। বাহমনি রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁকে অভিযান প্রেরণ করতে বলা হলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, তিনি মুসলমানদের রক্তপাতের বিরোধী। কিন্তু অন্যান্য সামরিক অভিযান প্রেরণ করার সময় এরূপ কোন চিন্তা বা বিবেকের দংশনে তিনি বিচলিত হননি।

সামরিক দিক থেকে বিচার করলে ফিরোজ শাহ বিশেষ কোন সাফল্য অর্জনে সক্ষম হননি। ফিরোজ শাহ তুঘলকের দুইবার পাণ্ডুয়া অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। ১৩৩৮ সালের পর থেকে বাংলাদেশ দিল্লীর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে। ১৩৫২ সালের মধ্যে হাজি ইলিয়াস বা শামস-উদ্দীন ইলিয়াস শাহ প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন। ইলিয়াস শাহ ত্রিহুতে স্বীয় অধিকার বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। ত্রিহুত দিল্লীর সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাংশের অংশ ছিল। অতএব ইলিয়াস শাহর এই ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ১৩৫৩ সালে ৭০,০০০ অশ্বারোহী ও বিশাল একটি পদাতিক বাহিনী সহ সুলতান দিল্লী থেকে ইলিয়াস শাহর রাজধানী পাণ্ডুয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। ইলিয়াস শাহ পাণ্ডুয়া থেকে দশ বা বারো মাইলের দূরত্বে নদী ও জঙ্গল পরিবেষ্টিত একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলে দিল্লীর বাহিনী তাঁকে সেখানে অবরুদ্ধ করেছিলেন। এইসময় দুর্গাভ্যন্তর থেকে বাংলার বাহিনীকে সরাসরি রণক্ষেত্রে আনার জন্য ফিরোজ ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন ও দিল্লীবাহিনী অবরোধ তুলে নিয়ে প্রত্যাবর্তনের ভান করেছিল। ফলে ইলিয়াস শাহ দুর্গ থেকে বেরিয়ে অপসৃয়মান দিল্লীর সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই সুযোগে ফিরোজ শাহ সহজেই তাঁকে

---

* বারানী যেখানেই 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি উচ্চবর্গের হিন্দুদের কথাই উল্লেখ করেছেন। হিন্দুস্থানে দুইটি নয়, তিনটি বিভাগ তৎকালীন যুগে দেখা যায়। এই তিনটি ভাগ হ'ল শাসক বিজেতা, যাঁরা ইতিপূর্বে শাসক ছিলেন ও কৃষক এবং প্রজাসাধারণ। তুর্কী শাসকরা 'হিন্দু'দের ও গ্রামীণ খুট, মুকদ্দম ও চৌধুরীদের শক্তি খর্ব করতে চেয়েছিলেন। কৃষি ও কৃষকের রক্ষা করা তাদের নীতির লক্ষ্য ছিল। W.H. Moreland-এর Agrarian System of Moslem India, পৃঃ ৩২, দ্রষ্টব্য। শহর ও কসবায় মজুর ও দীনদরিদ্ররা একটি আলাদা শ্রেণী ছিল।

www.pathagar.com

পরাস্ত করেন। কিন্তু এরপরেও ফিরোজ শাহ তুঘলকের পাণ্ডুয়া বিজয় করা সম্ভব হয়নি। কারণ হাজি ইলিয়াস পুনরায় একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আসন্ন বর্ষার আগমনে কর্দমাক্ত পথঘাট দিল্লীবাহিনীর পক্ষে বিপদ্জনক হতে পারে এই আশঙ্কায় ফিরোজ ১৩৫৫ সালে একডালার অবরোধ তুলে নিয়েছিলেন ও পাণ্ডুয়া ত্যাগ করেছিলেন।*

ইলিয়াস শাহর মৃত্যুর পর তা র পুত্র সিকন্দর শাহ বঙ্গদেশের সুলতান হয়েছিলেন। ১৩৫৯ সালে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক পাণ্ডুয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার অভিযান করেছিলেন। সিকন্দর শাহও তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক একডালা পুনরায় অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে গৌড়ের স্বাধীনতা স্বীকার করে তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকের দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গের প্রাক্তন সুলতান ফকরউদ্দীন মুবারকশাহর জামাতা জাফরখানকে বঙ্গদেশের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা ও এই প্রদেশকে পুনরায় দিল্লীর সার্বভৌমত্বের আওতায় নিয়ে আসা। কিন্তু তাঁর এই উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

জাজনগর অভিযান

বঙ্গদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে সুলতান জাজনগর বা বর্তমান উড়িষ্যার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকের উদ্দেশ্য ছিল পুরীর জগন্নাথ মন্দির লুণ্ঠন করা। পুরীর মন্দির অপবিত্র করে সুলতান মন্দিরের বিগ্রহ সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করেছিলেন। পুরীর রাজা সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে ১৮টি হস্তী ও বাৎসরিক উপঢৌকন দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। অতঃপর সুলতান জাজনগর থেকে ছোটনাগপুরের পার্বত্য এলাকার মধ্য দিয়ে ১৩৬১ সালে রাজধানী ফিরে আসেন। অজানা পথে নানা বাধা-বিঘ্নের জন্য দিল্লীতে ফিরে আসতে সৈন্যবাহিনীর অকারণ বিলম্ব হওয়ার দরুণ কিছুকাল রাজধানীতে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল।

নগরকোট অভিযান

কাংড়ার নগরকোট সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে দিল্লীর প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছিল। ফিরোজ ১৩৬৩ সালে নগরকোটের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। নগরকোটের অধিপতি রাজা রূপচাঁদ সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। এই স্থানের পবিত্র জ্বালামুখী মন্দিরের প্রায় ১,৩০০ সংস্কৃত পুঁথি আয়াজউদ্দীন খালিদ খানি নামে দরবারের একজন কবি দালাল-ইল-ই-ফিরোজ শাহী উপাধি দিয়ে ফার্সীতে অনুবাদ করেছিলেন।

সিন্ধু বিজয়

১৩৬২ সালে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ৯০,০০০ অশ্বারোহী, ৪৮০টি রণহস্তি ও বিশাল পদাতিক বাহিনী নিয়ে সিন্ধুবিজয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। সিন্ধুর শাসক জাম মালী (Jam Mali) ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বানভিনা (Banbhina) দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে ১৯৫১ সালে মহম্মদ বিন তুঘলকের সিন্ধু অভিযান সুলতান

* শামস-ই সিরাজ আফিফের তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, পৃঃ ১১১, ১৪৯ ও অধ্যাপক হোডিবালার স্টাডিজ ইন ইন্দো-মুসলিম হিস্ট্রি, পৃঃ ৩১৩ দ্রষ্টব্য। সুলতান ফিরোজের বঙ্গদেশ অভিযানের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করে শামসিই সিরাজ আফিফ দুইটি কারণের কথা বলেছেন—(১) বঙ্গদেশ-এর ভৌগলিক পরিস্থিতি দিল্লীর বাহিনীকে বিপন্ন করেছিল; (২) বাংলার পাইক সৈন্যদের বীরত্ব। ফলে তারা প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিল।

www.pathagar.com

মহম্মদের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য সফল হয়নি। অতএব ফিরোজ শাহ্ তুঘলক এই স্থান জয় করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং থাট্টা (Tattah) নগরী অবরুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে সুলতানের বাহিনীর তিনচতুর্থাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। এছাড়া মোঙ্গলদের সহযোগিতায় সিন্ধুর শাসক দিল্লীর সৈন্যবাহিনীর উপর হামলা চালান ও তাদের নৌবাহিনী কব্জা করে নেন। ফলে ফিরোজ গুজরাটে প্রত্যাবর্তন করে সামরিক শক্তি সুসংহত ও বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে ভ্রান্তিবশতঃ তিনি কচ্ছের রান এলাকায় উপস্থিত হয়েছিলেন। ফলে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর দিল্লীর বিধ্বস্ত বাহিনী গুজরাতে উপস্থিত হয়েছিল। ১৩৬৩ সালে গুজরাটের রাজস্বে সৈন্যদল পুনর্গঠন করা হয়। এইসময় দিল্লী থেকে সুলতানের প্রতিভূ উজীর খান-ই-জাহান মকবুল অর্থ ও সৈন্যবল প্রেরণ করেছিলেন। ফিরোজের দ্বিতীয় অভিযানের ফলে সিন্ধুর জাম বানভিনা বশ্যতা স্বীকার করেন। বাৎসরিক করদানের বিনিময়ে সিন্ধুর শাসক দিল্লীর সুলতানের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সিন্ধুতে দ্বিতীয়বার অভিযান করে যে সাফল্য ফিরোজ লাভ করেন তা থেকে সুলতানের সামরিক ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রমাণিত হয়নি বরং রণনীতি ও কৌশল সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতাই প্রতিপন্ন হয়েছে।*

সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের জীবনের শেষার্ধে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ফতে খান ১৩৭৪ সালের জুলাই মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। উজীর খান জাহান মকবুল কিছুদিন আগেই দেহরক্ষা করেছিলেন। ফলে বৃদ্ধ ও অশক্ত সুলতান অসহায় ও দুর্বল হয়ে পড়েন। এই সময় উজীর খান-জাহান মকবুলের পুত্র খান-ই-জাহান উজীর নিযুক্ত হন। খান-ই-জাহানের সঙ্গে সুলতানের মনোনীত ভবিষ্যতের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাঁর তৃতীয় পুত্র মহম্মদ খানের বিরোধের ফলে উজীর গৃহযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু মহম্মদ খানের অতিরিক্ত ক্ষমতার লোভ ও বিলাস লালসাময় মদিরমধুর জীবনযাত্রা পদ্ধতি রাজভক্ত ফিরোজ শাহর অভিজাতদের বিক্ষোভের ও প্রতিরোধের কারণ হয়েছিল। উভয় দলের সংঘর্ষ চলাকালীন ফিরোজের অনুগত ক্রীতদাসরা বৃদ্ধ সম্রাটকে রণক্ষেত্রে বহন করে এনেছিল। যার ফলশ্রুতিতে মহম্মদ খানের পরাজয় হয় এবং তিনি পলায়ন করে জীবনরক্ষা করেন। এরপর সুলতান তাঁর পৌত্র ও ফতে খানের পুত্র গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। ১৩৮৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের মৃত্যু হয়।

সুলতান ফিরোজ শাহর মূল্যায়ন ও তাঁর সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়িত্ব

সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের রাজত্বকালে সুলতানী সাম্রাজ্যে প্রায় ৩৮ বৎসর কাল শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় ছিল। সুলতান প্রজা কল্যাণের জন্য আগ্রহী ছিলেন ও জনকল্যাণমূলক কার্যে

* CHI-Vol. III পৃঃ ১৮০; শামসী সিরাজ আফিফ বলেছেন যে, সুলতানের নির্দেশে দলছুট সৈনিকদের জনমতের সম্মুখীন করা হত (তদ্‌বির-ই-মানাওয়াই) এবং তাদের কোন শারীরিক শাস্তি বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত না। আফিফ পৃঃ ২২৫-২৯ দ্রষ্টব্য। ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের দ্বিতীয়বার সিন্ধু অভিযানের সময় যেসব সৈনিক প্রথম অভিযানের সময় নানা দুঃখ-দুর্দশায় ভুগেছিল তারা অনেকে সৈন্যবাহিনী থেকে পলায়ন করে। ফিরোজের নির্দেশে দিল্লীতে রাজপ্রতিনিধি খান-ই-মকবুল, এদের মধ্যে যারা ধরা পড়ত, তাদের বাজারে জনসমক্ষে দলছুট সৈনিক হিসেবে সর্বসমক্ষে দর্শনীয় করে রাখতেন। এই মানসিক অত্যাচার ছাড়া তাদের অন্য কোন শাস্তি দেওয়া হত না।

www.pathagar.com

উৎসাহ দান করেছিলেন। এইজন্য এলফিনিস্টনের ন্যায় কোন কোন ঐতিহাসিক ফিরোজ শাহ তুঘলককে তাঁর যুগের আকবর বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু স্মিথ ও ঈশ্বরীপ্রসাদ এই অভিমত গ্রহণ করতে রাজি নন। ভিনসেন স্মিথ তাঁর Oxford History of India-তে মন্তব্য করেছেন যে, 'It was not possible for him in his age to rise, as Akbar did, to the conception that the ruler of Hindustan should cherish all his subjects alike, whether Muslim or Hindu, and allow every man absolute freedom, not only of consience, but of public worship.'' ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন এবং তাঁর মতে, 'Firuz had not even a hundredth part of the genius of that great hearted and broadminded monarch who preached from the high platform of public interest the gospel of peace, goodwill and toleration towards all sects and creels'. কেম্‌ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়াতে (৩য় খণ্ড) সুলতান ফিরোজ শাহর অনেক সংস্কারকে পিতামহীসুলভ আইন (grandmotherly legislation) বলে প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু সুলতান ফিরোজ শাহর বদান্যতাকে ভারসাম্যহীন (His benevolence was indiscriminate) বলে ঐতিহাসিক হেগ উল্লেখ করেছেন। কারণ, এর ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজকর্মচারী থেকে দুঃস্থ কৃষক সকলেই উপকৃত হত। সুলতান ফিরোজ শাহর শত দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর সময় প্রজাদের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য কৃষির ও সেচব্যবস্থার সংস্কারের ফলে, কারা সংস্কার ও অপরাধীদের কঠোর নির্যাতনের অবলুপ্তিতে চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন ও করভার হ্রাস প্রভৃতির মারফতে শাসনব্যবস্থায় মানবিক দৃষ্টির ছোঁয়া পাওয়া যায়। ফলে সর্বসাধারণের মধ্যে সুলতানের জনপ্রিয়তা প্রসারিত হয়েছিল। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে পূর্বসূরীদের অসহনীয় প্রথাগুলির কঠোরতা হ্রাস করার জন্য ও শাসনযন্ত্রে কিছুটা মানবিক অনুভূতির রেশ এনেছিলেন বলে ফিরোজ কৃতিত্ব পেতে পারেন।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের কঠোর শাসনের পর ফিরোজের রাজত্বকালে লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। সময় বিশেষে চরম ধর্মদ্বেষের জন্য অথবা গোঁড়া উলেমাদের সমর্থন লাভের আশায় ফিরোজ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দান করলেও সাধারণভাবে সুলতানের নরমপন্থী নীতিতে প্রজারা উপকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু এই নরমপন্থী নীতির জন্য দুর্নীতিগ্রস্ত রাজকর্মচারী ও অন্যান্য শ্রেণীর সুবিধাবাদীরা বহু অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রের কর্তব্য কেবল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তি বজায় রাখার কাজ করে শেষ হয়ে যায় না এবং প্রজার সুখের উপর রাজার সুখ নির্ভরশীল দৃষ্টিভঙ্গীকে ফিরোজ শাহর নানা সংস্কার ও মানবিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে বাস্তব রূপায়ণের প্রয়াস করেছিলেন। মধ্যযুগে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজেরও ধর্মীয় রূপ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। ফিরোজ সর্বদা গোঁড়াপন্থীদের সমর্থন নিয়ে এগোতেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রজামঙ্গল। এই যুগের আর্থিক ও কৃষি সংস্কার এবং মুদ্রামূল্য হ্রাস ও শুল্কের অবলুপ্তি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকেই উপকৃত করেছিল, এসম্পর্কে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালে কেন্দ্রের দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় ও বিকেন্দ্রীকরণ শক্তির প্রভাব প্রসারিত হয়। হিন্দুস্তানের ইতিহাসে যখনই কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়েছে তখন প্রদেশগুলি স্ব স্ব প্রধান হবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় দাক্ষিণাত্যে বাহমনি ও সুদূর দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্য, সিন্ধু ও বঙ্গদেশ এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। সিন্ধুতে তাঘীর বিদ্রোহ দমনকালে মহম্মদ

www.pathagar.com

বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর ফিরোজ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্যের হাল ধরেন। কিন্তু সামরিক অভিযানগুলিতে তিনি রণদক্ষতা দেখাতে পারেননি। বঙ্গদেশে ইলিয়াস শাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারী সেকেন্দার শাহ্র বিরুদ্ধে ফিরোজ তুঘলকের দুইটি অভিযানই ব্যর্থ হয়েছিল। সিন্ধুতে সুলতান ফিরোজের প্রথম অভিযানের বিফলতা ও পশ্চাদপসারণের সময় কচ্ছের রানে সৈন্যবাহিনীর দিকভ্রান্ত হওয়ার ঘটনায় তাঁর সামরিক অভিজ্ঞতার অভাব প্রমাণিত হয়েছিল। সুলতান ফিরোজের বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক নগদ বেতনের পরিবর্তে ভূমিরাজস্ব হস্তান্তর বা জায়গীরের মারফতে বেতন লাভ করতেন। এই ব্যবস্থায় একধরনের ফাটকাবাজ লাভবান ও দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার লেখক (৩য় খণ্ড) মন্তব্য করেছেন যে, 'Firuz Shah's connivance at corruption and his culpable leniency destroyed the effects of his own reforms'. সংস্কারের মাধ্যমে দয়াপরবশ হয়ে যেসব সুবিধা ফিরোজ শাহ্ তুঘলক তাঁর সৈন্যবাহিনী ও লোকলস্করদের দিয়েছিলেন তার কুফল অচিরেই আলাউদ্দীনের রণদুর্ধর্ষ বাহিনীকে দুর্বল করে ফেলে। সৈনিকরা বৃদ্ধ বা অশক্ত হলেও তারা মনোনীত প্রার্থী বা উত্তরাধিকারীকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করতে পারত। এছাড়া এসময় কেন্দ্রের অধীন সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা প্রাদেশিক শাসকদের অধীন বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ক্রমেই সমগ্র সাম্রাজ্যে সামন্ততান্ত্রিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফিরোজ স্বয়ং অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে শাসনযন্ত্রকে দুর্বল করে তুলেছিলেন। একবার একজন সৈনিককে সুলতান অর্থ সাহায্য দান করেন। সামরিক বিভাগকে এই অর্থ উৎকোচ দিয়ে সৈনিকটি তার নিম্নমানের অশ্বের অনুমোদন লাভ করেছিল। সমকালীন লেখনীতে এই ঘটনা সুলতানের দয়ার্দ্র চিত্তের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু সুলতান এইভাবে যে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এসম্পর্কে সন্দেহ নাই। ট্যাঁকশালের অধ্যক্ষ মুদ্রার বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করার জন্য যে ধরনের দুর্নীতি গ্রহণ করেন তা সুলতানের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি বরং দুর্নীতির প্রশ্রয়ই দেননি দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করেছিলেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ্র সময় থেকে ক্রীতদাসের সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রাসাদে ও রাজ্যের সর্বত্র ক্রীতদাসদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। সুলতানী শাসনের প্রথম যুগ থেকেই মধ্যযুগের রাজনীতিতে ক্রীতদাসদের প্রাধান্য দেখা দেয়। ইতিপূর্বে ক্রীতদাসরা সংখ্যায় বেশী ছিল না কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাদের প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কুতুবউদ্দীন, ইলতুৎমিস, বলবন প্রভৃতি প্রথম যুগের দিল্লীর সুলতানরা ক্রীতদাস থেকে স্ব স্ব যোগ্যতা ও কৃতিত্বের গুণে সিংহাসনে অরোহন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষত সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের আমলে ক্রীতদাসের সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়ে একলক্ষ আশিহাজারে পরিণত হয়। তাদের হস্তক্ষেপের ফলে সৎ এবং সক্রিয় রাজকর্মচারীরা বিব্রত হয়ে পড়েন, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও ফিরোজের রাজত্বের শেষার্ধে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সুলতান ফিরোজের ক্রীতদাস প্রীতি, ধর্মীয় গোঁড়ামী, দৃঢ়হস্তে শাসনদণ্ড পরিচালনা করার যোগ্যতার অভাব, দুর্নীতিতে প্রশ্রয় দান, সামন্ততান্ত্রিক শক্তির প্রসারে উৎসাহ দান ও নরমপন্থী নীতি কেন্দ্রীয় শক্তিকে দুর্বল করেছিল এবং সৈন্যবাহিনীর শক্তিহ্রাস করেছিল। ফলে ফিরোজের মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যে তাঁর অযোগ্য বংশধরদের রাজত্বকালে গৃহযুদ্ধের দরুণ তুঘলক বংশের অধিকার 'দিল্লী থেকে পালামের' মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। এই সুযোগে আমির তৈমুর ১৩৯৮ সালে হিন্দুস্তান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেছিলেন এবং দিল্লীর তুঘলক শাসনের শেষচিহ্ন মুছে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ফিরোজ শাহ তুঘলকের বংশধরদের অধীনে দিল্লী

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে তাঁর দুর্বল বংশধরদের মধ্যে বিরোধ ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ফিরোজের জীবদ্দশায় তাঁর তৃতীয় পুত্র মহম্মদ রাজ্যের ক্ষমতা দখলের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং উজীর খান জাহানের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিলেন। সাময়িকভাবে উজীরের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করলেও তিনি দিল্লী থেকে অন্যান্য আমিরদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিলেন। ফিরোজ অতঃপর তাঁর প্রয়াত জ্যেষ্ঠপুত্র ফতে খানের বংশধর গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। সুলতান ফিরোজ শাহর পৌত্র গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহ বা দ্বিতীয় তুঘলক শাহ তাঁর অযোগ্যতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৩৮৯ সালে আমির ওমরাহদের ষড়যন্ত্রে সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন। এইসময় ফিরোজ শাহর আরেকটি পৌত্র আবুবকর সিংহাসন লাভ করেন। এই সুযোগে ফিরোজের পুত্র মহম্মদ শাহও নিজেকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু ১৩৮৯ সালের এপ্রিল থেকে ১৩৯০ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এইবছরের শেষের দিকে মহম্মদ শাহ দিল্লী দখল করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আবুবকর এইসময় মেওয়াটে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরে শত্রুসৈন্যের হাতে বন্দীদশায় প্রাণত্যাগ করেন। মহম্মদ শাহ ১৩৯৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। ১৩৯৪ সালের ২০শে জানুয়ারী সুলতান মহম্মদ শাহর মৃত্যু হয় এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ও দ্বিতীয় পুত্র হুমায়ুন খান মাত্র ৪০ দিন বাদে পরলোকগমন করেন।

এই ঘটনার পর দিল্লীর আমির ওমরাহরা মহম্মদ শাহর কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ শাহকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে রাজ্য পরিচালনার সকল ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করেছিলেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকের আরেকটি পৌত্র নসরৎ খানকে ফিরোজাবাদে সুলতান হিসাবে ঘোষণা করে দরবারের আরেকটি আমিরগোষ্ঠী সাদাৎ খানের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন। ফলে দিল্লী ও ফিরোজাবাদের মধ্যে দৈনন্দিন দুই সুলতানের সৈন্যবাহিনীর গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। ঐতিহাসিক নিজামউদ্দীন আমেদ মন্তব্য করেছিলেন যে, 'যে রাজ্যে দুই জন রাজা, তার সর্বনাশ হয়'। এই বক্তব্য যে কতদূর সত্য তৈমুরের আক্রমণ ও তুঘলকদের পতন থেকে সহজেই উপলব্ধি করা গিয়েছিল।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের দুর্বল বংশধরদের মধ্যে কারও সামরিক বা শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা না থাকায় দরবারের সুবিধাবাদী আমির ওমরাহরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের স্বার্থে বিভক্ত হয়েছিলেন ও ক্ষমতার লোভে সাম্রাজ্যের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁরা আত্মস্বার্থ ও উচ্চাকাংখা চরিতার্থ করার জন্য এতদূর মত্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, সাম্রাজ্যের সর্বত্র গৃহবিবাদ ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছিল। ফিরোজ তুঘলক প্রবর্তিত পুরুষানুক্রমিক জায়গীর প্রথা সামন্ততান্ত্রিক ও বিকেন্দ্রীকরণ শক্তির ভিত্তি মজবুত করেছিল। সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদের প্রধান উপদেষ্টা মাল্লু ইকবালের ও নসরৎ শাহর অন্যতম সমর্থক সাদাৎ খানের মত সুবিধাবাদী আমির ওমরাহরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। পরবর্তী তুঘলক বংশীয় সুলতানরা এইসব আমির ওমরাহদের হাতে খেলার পুতুল ছিলেন মাত্র। প্রদেশগুলি স্ব স্ব প্রধান হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে শুরু করে এবং দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। মালিক সরবার নামে একজন খোজা, যিনি সুলতান-উস-শরক (বা পূর্বাঞ্চলের শাসক) উপাধি

www.pathagar.com

পেয়েছিলেন, জৌনপুরের স্বাধীন সুলতানী রাজ্যের পত্তন করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা জাফর খান দিল্লীর আনুগত্য বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন। মালব ও খান্দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। উত্তরপশ্চিম ভারতের খোকররা বিদ্রোহী হয়েছিল। রাজপুতানার রাজ্যগুলি দিল্লীর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেছিল। গোয়ালিয়রে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। দোয়াবের রাজস্ব আদায় শক্তিপ্রয়োগ করা ছাড়া কখনই সম্ভবপর ছিল না। বিয়ানা ও কালপীতে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অতএব পরবর্তী তুঘলক বংশের সুলতানদের রাজ্যসীমা সম্পর্কে সমসাময়িক কালের একজন লেখক মন্তব্য করেছিলেন যে, 'পৃথিবীর অধীশ্বরের রাজ্যসীমা দিল্লী থেকে পালাম পর্যন্ত বিস্তৃত।' এই মুমূর্ষু সাম্রাজ্যের উপর আমির তৈমুরের বাহিনী ১৩৯৮ সালে যখন আক্রমণ করেছিল তখন স্বভাবতই এই সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতন ভেঙ্গে পড়েছিল।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

আমির তৈমুরের আক্রমণ ও সাম্রাজ্যের পতন, সৈয়দ ও লোদী বংশ

তৈমুরের ভারত আক্রমণ

আমির তৈমুর ছিলেন একজন বারলাস তুর্কী। তিনি ১৩৩৬ সালে ট্রান্সঅক্সিয়ানার কেশ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আমির তুরঘায়ে বারলাস তুর্কীদের গুরগান বা চাঘতাই শাখার প্রধান ছিলেন। তৈমুর ইতিহাসে টৈমার লেন, তৈমুর-ই-লঙ প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। কারণ জীবনের প্রথম ভাগে একটি যুদ্ধে তাঁর পায়ে আঘাত লেগেছিল ফলে তিনি খুঁড়িয়ে চলতেন। ১৩৬৯ সালে তিনি সমরকন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর তিনি রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। তৈমুর ট্রান্সঅক্সিয়ানার ও তুর্কীস্থানের অংশবিশেষ ছাড়া আফগানিস্থান, পারস্য, সিরিয়া, কুর্দিস্থান, দক্ষিণ রাশিয়া ও এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ এলাকায় স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৈমুর তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা ও সেই জেহাদের মারফতে গাজী বা ধর্মযোদ্ধা হওয়া। তৈমুর ও চেঙ্গিজ উভয় ছিলেন নিষ্ঠুর পররাজ্যগ্রাসী ও লুটেরা। উভয় মূলতঃ লুণ্ঠনের জন্য বিভিন্ন অভিযানে নানা দেশে হামলা করেছিলেন। তৈমুরের অভিযানের অজুহাত ছিল ধর্মযুদ্ধ ও ইসলামের গাজি হবার আকাংখা।

১৩৯৬-৯৭ সালে তৈমুর তাঁর পৌত্র পীর মহম্মদের নেতৃত্বে একদল অগ্রগামী সৈন্য ভারতে প্রেরণ করেছিলেন। তারা মুলতান অবরোধ করে পদানত করেছিল। ১৩৯৮ সালের এপ্রিল মাসে তৈমুর লঙ সসৈন্যে হিন্দুস্তান বিজয়ে অগ্রসর হন। সেপ্টেম্বর মাসে সিন্ধু, বিতস্তা ও ইরাবতী পার হয়ে বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ মুলতানের প্রায় ৭০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত তালম্বায় উপস্থিত হয়ে তৈমুর এই স্থান স্বদখলে আনেন। এছাড়া পাকপত্তন, দিপালপুর, ভাটনির, সিরসা, কাইথাল ও অন্যান্য বহু শহর ও গ্রাম দখল এবং লুণ্ঠন করে তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের নিষ্ঠুরভাবে তরবারীর মুখে হত্যা করেন।

১৩৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষার্ধে আমির তৈমুর দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সময় সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ ও তাঁর উজীর মাল্লু ইকবাল তৈমুরের সৈন্যবাহিনীকে বাধা দানের উদ্দেশ্যে দশহাজার অশ্বারোহী, চল্লিশ হাজার পদাতিক ও একশত বিশটি রণহস্তীর এক বিশালবাহিনী নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু তৈমুরের রণদুর্দম অশ্বারোহী বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণে দিল্লীর সৈন্যদল খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। মাল্লু ইকবাল নিজে বুলন্দ শহরে পলায়ন করতে সক্ষম হলেও তাঁর দুই পুত্র তৈমুরের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। এই সংঘর্ষের প্রাক্কালে আমির তৈমুরের হুকুমে বন্দী প্রায় এক লক্ষ হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল। সুলতান মামুদ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গুজরাটে পলায়ন করেন। বিজয়ী তৈমুর ১৮ ডিসেম্বর, ১৩৯৮ সালে দিল্লীতে প্রবেশ করেছিলেন।

www.pathagar.com

দিল্লীতে তৈমুরের দরবারে সৈয়দ ও উলেমা এবং শহরের প্রধান প্রধান নাগরিকরা তাঁর প্রতি বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকারের বিনিময়ে শহরের অধিবাসীদের হয়ে রাজকীয় অনুকম্পা ও সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু দিল্লীর নাগরিকরা এই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে অত্যল্পকালের মধ্যে আস্থা হারিয়েছিলেন। কারণ বিজয়ী সৈন্যদের উচ্ছৃংখলতা, পলায়নপর পরাজিত সৈন্যদের সন্ধানের নামে নাগরিকদের শান্তিভঙ্গ, মুক্তিপণ আদায়ের নামে উৎপীড়ন প্রভৃতি ঘটনায় দিল্লীতে নাগরিকদের তৈমুরের বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে প্ররোচিত করেছিল। এই ঘটনার উল্লেখ তৈমুরের আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। তৈমুর বলেছেন যে, হিন্দু ও অবিশ্বাসীরা তাঁর সৈন্যদের বাধাদান করার জন্য তরবারী ধারণ করেছিল। ফলে 'জাহানপানাহ, সিরি ও পুরাতন দিল্লীর সর্বত্র সংঘর্ষের আগুন পৌঁছে গিয়েছিল ও যা কিছু তার সংস্পর্শে এসেছিল সবই ধ্বংস হয়েছিল। হিন্দুরা তাদের গৃহে অগ্নি সংযোগ করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের অগ্নিতে সমর্পণের পরে লড়াই করে প্রাণ দেয়। শহরের হিন্দু ও অবিশ্বাসীরা লড়াইতে যথেষ্ট তৎপরতা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিল।' আরেক স্থানে তৈমুর বলেছেন যে, হিন্দুরা মসজিদ-ই-জামাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্য আমির শাহ মালিক ও আলি সুলতান তোয়াচিকে একদল সৈন্য দিয়ে তাদের স্থানচ্যুত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। এইসব মসজিদে গিয়ে তারা আশ্রয়গ্রহণকারীদের আক্রমণ করে হত্যা করে। এই বিবৃতি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, দিল্লীর নাগরিকরা সাহসভরে তৈমুরকে বাধাদানের জন্য অসম লড়াইতে নেমে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দান করেন। তৈমুর বিরোধী নাগরিকদের মধ্যে যে কেবল হিন্দু ছিলেন তা নয় মুসলমানরাও যে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন তৈমুরের আত্মজীবনী থেকে তা জানা যায়। তৈমুর তাদের কাউকেই ক্ষমা করেননি এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী এইসব নাগরিকদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল। তৈমুরের সৈন্যরা প্রত্যেকে অজস্র ধনরত্ন, মণিমাণিক্য, সোনাদানা ও আশরফি এবং বন্দী সংগ্রহ করেছিল। এদের কেউই ২০ জনের কম নর-নারী ও শিশু বন্দী হিসেবে লাভ করেনি বলে তৈমুর তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। এইসব বন্দীদের মধ্যে যারা দক্ষ কারিগর ছিলেন তাঁদের সমরকন্দে তৈমুরের পরিকল্পিত প্রসিদ্ধ জামা-মসজিদ নির্মাণে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

বিজয়ী তৈমুরের হিন্দুস্তানে স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠনের কোন সদিচ্ছা ছিল না। পনেরোদিন বাদে তিনি দিল্লী ত্যাগ করে ফিরোজাবাদের পথে মিরাটে উপস্থিত হন ও ১৩৯০ সালের ৯ই জানুয়ারী এই শহর দখল করেন। এরপর তৈমুর উত্তরভারতে হরিদ্বারের নিকটে দুইটি হিন্দুবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। অতঃপর শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে কাংড়া আক্রমণ করে তিনি এইস্থান দখল করেন এবং জম্মু লুণ্ঠন করেন। এই সকল অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় মানুষকে তৈমুরের সৈন্যরা অত্যাচার, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের দ্বারা উৎপীড়িত করেছিল। তৈমুর তাঁর আত্মকথা 'মালফুজৎ-ই-তৈমুরী'-তে তাঁর সৈন্য ও সেনাবলের কীর্তি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। ১৩৯০ সালের ৬ই মার্চ একটি দরবারের অনুষ্ঠান করে তিনি ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে সৈয়দ খিজির খাঁকে মুলতান, লাহোর ও দিপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। কোন কোন লেখক অনুমান করেন যে, খিজির খাঁ দিল্লীতে তৈমুরের প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তৈমুরের হিন্দুস্তান ত্যাগের পরবর্তী ঘটনার পরিণতি দেখেই সম্ভবত এই অনুমান করা হয়েছিল। ১৮ই মার্চ আমির তৈমুর সিন্ধু পার হয়েছিলেন ও তার দুইদিন বাদে বান্নুতে পদার্পণ করেছিলেন। তৈমুরের আক্রমণ সম্পর্কে উল্লেখ করে একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, 'একবার আক্রমণ করে তৈমুরের ন্যায় অন্য কোন আক্রমণকারী হিন্দুস্তানে এতদূর দুঃখ ও দৈন্যের সৃষ্টি করেন নি।''

www.pathagar.com

তৈমুরের আক্রমণের পরবর্তীকালে হিন্দুস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে উল্লেখ করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, তৈমুরের ভারত ত্যাগের পর সমগ্র উত্তরভারতে বিশৃংখলা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানী দিল্লীতে খাদ্যাভাব ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল সমকালীন লেখক বাদায়ুনী বলেছেন যে, 'তৈমুরের আক্রমণের পরেও যেসব অধিবাসী রাজধানীতে টিকে ছিলেন তাঁরা মহামারীর কালগ্রাসে পড়েছিলেন, আর এইসময় দুইমাস কাল অবধি এমনকি কোন পাখী পর্যন্ত দিল্লীর আকাশে পাখা মেলেনি।' ইসলামের ধ্বজাধারী ও জেহাদ ঘোষণাকারী তৈমুরের অর্থগৃধ্রুতা এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

তুঘলক সাম্রাজ্য এই বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়েছিল। ইতিপূর্বেই বঙ্গদেশে, দাক্ষিণাত্যে ও বিজয়নগরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। তৈমুরের ভারত ত্যাগের পর গুজরাট, জৌনপুর ও মালবে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। লাহোর, দিপালপুর, মুলতান ও সিন্ধুর অংশ বিশেষে খিজির খান নিজেকে তৈমুরের প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেছিলেন। সামানা, বিয়ানা, কালপী, মহোবা ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

এই বিশৃংখলার সুযোগে কিছু আমির-ওমরাহ দিল্লীর সিংহাসনের উপর স্ব স্ব প্রভাব বিস্তারের জন্য নসরৎ শাহকে দোয়াব থেকে এনে দিল্লী দখল করতে সাহায্য করেছিলেন (১৩৯৯ খ্রীঃ)। কিন্তু নসরৎশাহর এই প্রচেষ্টা মাল্লু ইকবালের বিরোধিতায় ব্যর্থ হয়ে যায়। নসরৎশাহ অতঃপর মেওয়াটে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এই স্থানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৪০১ সালে মাল্লু সুলতান মামুদকে ধর থেকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কারণ নির্বাসিত মামুদ শাহর মর্যাদা তাঁর সহায়ক হবে বলে তিনি অনুমান করেছিলেন। মামুদও ইতিপূর্বে গুজরাটে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে কোন খাতির না পাওয়ায় বিভিন্ন স্থান ঘুরে অবশেষে আশ্রয় নেবার জন্য ধরে এসেছিলেন এবং এখন দিল্লীতে পুনর্বাসনের আশায় উপস্থিত হলেন। দিল্লীতে তিনি আবার মাল্লু ইকবালের হাতের পুতুলে পরিণত হলেন। ১৪০৫ সালের ১২ই নভেম্বর মাল্লু ইকবাল ও খিজির খানের মধ্যে সংঘর্ষে মাল্লু ইকবাল পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। ফলে সুলতান মামুদ তাঁর মর্যাদার ও সম্মানের পুনর্বাসনে ও তুঘলক সাম্রাজ্য পুনপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৪১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি কাইথালে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তুঘলক বংশের শাসনের অবসান হয়েছিল।

এরপর অভিজাতরা দৌলতখান নামে একজন আমিরকে দিল্লীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি কোনদিন রাজমুকুট ধারন করেননি। ১৪১৪ সালের মার্চ মাসে খিজির খাঁ দিল্লী অবরোধ করেন এবং কয়েক মাস অবরোধের পর দৌলত খানকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। অতঃপর ১৪১৮ সালের ১৮ই মে খিজির খাঁ দিল্লীর শাসনভার গ্রহণ করে সৈয়দ বংশের পত্তন করেন।

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্রের মতে, দিল্লীর সুলতানী শাসনের অবক্ষয়ের জন্য কোন একজন সুলতানকে দায়ী করা যায় না। কারণ মধ্যযুগের ইতিহাসে দেখা যায় যে, কতকগুলি প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রত্যেক সুলতানের সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে বারংবার অন্তরায় হয়ে ছিল উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সুলতান ও আমির-ওমরাহদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, স্থানীয় শাসক ও রাজস্ব

www.pathagar.com

আদায়কারীদের স্ব স্ব এলাকায় প্রাধান্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা, বিকেন্দ্রীকরণ শক্তিগুলির প্রভাব বৃদ্ধি ও ভৌগলিক দূরত্ব এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সুযোগ এইগুলির অন্যতম। প্রত্যেক সুলতানই এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য নিজস্ব পদ্ধতি ও নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু দিল্লী সুলতানী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও কেন্দ্রীয় শক্তির অবক্ষয় ফিরোজ তুঘলকের বংশধরদের আমলে সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তৈমুরের আক্রমণের ফলে এই দ্রুত বিলীয়মান সুলতানী শাসনের অবসান হয়। অবশ্য তুঘলক শাসনের অবসানের পরও তথাকথিত সৈয়দ ও লোদীরা প্রায় একশতাব্দীকাল দিল্লীতে রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের রাজ্যসীমা দিল্লী ও উত্তর ভারতের একাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র হিন্দুস্তান এইসময় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত হয়। পরবর্তীকালে ষোড়শ শতকে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্বে হিন্দুস্তানে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন স্থাপিত হয়নি।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ও সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক সুলতানী সাম্রাজ্যের বিস্তারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। শেষোক্ত সুলতানের আমলে তুঘলক সাম্রাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশগুলির উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে শৈথিল্য দেখা দেয়। ফলে বঙ্গদেশে ইলিয়াস শাহী বংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেছিল। দক্ষিণ ভারতে বাহমনি ও বিজয়নগর রাজ্য স্থাপিত হয়। এছাড়া সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এইসব বিদ্রোহের অন্যতম কারণ হ'ল তাঁর পরিকল্পনাগুলির অবাস্তবতা ও ব্যর্থতা। সুলতান সামান্য কারণে কঠোর শাস্তিদান করতে কুণ্ঠিত হতেন না, আবার উদার হস্তে দান করে ফকিরকে আমির করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁর সঙ্গে উলেমা ও গোঁড়াপন্থীদের বিরোধ এবং সুলতানের খামখেয়ালীপনা প্রজা-বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের দীর্ঘ শাসনকালে উলেমা ও আমিরদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্য গোঁড়া ধর্মীয় নীতির অনুসরণ করা হয়। এইসব নীতির মধ্যে হিন্দুদের থেকে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায়, পুরীর মন্দিরের উপর হামলা, সুন্নী ধর্মাবলম্বীদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমির-ওমরাহদের ও সৈন্যবাহিনীর সন্তোষ বিধানের জন্য পুরুষানুক্রমিক ভাবে ইকতা উপভোগের অনুমোদন এবং দুর্নীতির প্রশ্রয় দান সামন্ততান্ত্রিক ও বিকেন্দ্রীকরণ শক্তিগুলির জয় সূচিত করেছিল। ক্রীতদাসদের সংখ্যা বৃদ্ধি সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলার কারণ হয়েছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যখনই কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছে তখনই প্রদেশগুলি স্ব স্ব প্রধান হয়েছে। সুলতান ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধের সুযোগে বিভিন্ন আমির ওমরাহরা স্ব স্ব ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করেছিল এবং হিন্দু নৃপতিরা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে তৎপর হয়েছিলেন। ফিরোজের জীবদ্দশাতেই তাঁর তৃতীয় পুত্র মহম্মদ ও উজীর খান জাহানের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করলেও ফিরোজশাহী ক্রীতদাসদের প্রচেষ্টায় বৃদ্ধ সুলতানের কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। ফিরুজের মৃত্যুর পর মহম্মদ শাহ প্রয়াত সুলতানের মনোনীত প্রার্থী ও পৌত্র আবুবকরকে পরাজিত করে সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু মহম্মদ শাহ ও তাঁর পুত্র হুমায়ুনের রাজত্ব বেশীকাল স্থায়ী হয়নি। হুমায়ুনের ভ্রাতা নাসিরউদ্দীন মামুদ শাহকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করে মাল্লু ইকবাল রাজ্যশাসন শুরু করেছিলেন। এইসময় ফিরোজ শাহর আরেকটি পৌত্র নসরৎ শাহকে সুযোগসন্ধানী আমির সাদাৎ খান দোয়াবে সুলতান বলে ঘোষণা করেছিলেন। দিল্লী থেকে পালাম পর্যন্ত সুলতানের শাসন বিস্তৃত বলে একজন সমকালীন ঐতিহাসিক এইসময় যে মন্তব্য করেছিলেন তা কার্যত সত্য ছিল। কারণ, দুই

www.pathagar.com

সুলতান যখন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত তখন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

সুলতানী শাসনের অন্যতম দুর্বলতা ছিল ক্রীতদাসদের রাজ্যশাসনে গুরুত্ব দান। সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবক, শামসউদ্দীন ইলতুৎমিস, গিয়াসউদ্দীন বলবন প্রভৃতি বহু সুযোগ্য সুলতানই প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু এই প্রথার জন্য শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা সম্ভব হয়নি বা সুযোগ্য রাজকর্মচারী সৃষ্টি হয়নি। সুলতানদের ক্রীতদাস নির্ভরতা অনেক ক্ষেত্রে আলস্য ও কর্মবিমুখতার কারণ হয়েছিল। ফিরোজ তুঘলকের আমলে সুলতানী শাসনের ক্রীতদাসদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এবং ক্রীতদাসদের সংখ্যাবৃদ্ধি রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল।

ফিরোজের উত্তরাধিকারীদের অযোগ্যতা, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্ব স্ব অঞ্চলের স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন এবং পরবর্তীকালের আমির-ওমরাহদের আত্মকেন্দ্রিকতার সুযোগে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা হিন্দুস্তান আক্রমণ করেছিল। ঘুনধরা দিল্লীর সুলতানী শাসনের পতনের অন্যতম কারণ এইসব বৈদেশিক আক্রমণ। এইসব আক্রমণকারীদের মধ্যে আমির তৈমুরের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৩৯৮ সালে ভারতে অবিশ্বাসীদের প্রভাব ধ্বংস করে ইসলামকে সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তানে আগমন করেন। প্রধানত দুর্বল দিল্লী-সুলতানদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সুযোগে লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে তৈমুর ভারতে পদার্পন করেছিলেন কিন্তু তিনি মৌখিকভাবে জেহাদ ঘোষণা করেন। তাঁর আক্রমণে শহরে ও গ্রামে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই দুর্দশাগ্রস্থ হয়েছিলেন কারণ, ধর্মের ধ্বজা ওড়ালেও হত্যা ও লুণ্ঠনের সময় তৈমুর কোন জাতপাতের বিচার করেননি বা ধর্মাধর্ম মানেননি। দিল্লী অধিকার ও ভারত লুণ্ঠনের এইসব নিষ্ঠুর কাহিনী তৈমুরের তথাকথিত আত্মজীবনী, 'মাল ফুজুৎ-ই-তৈমুরী'তে লিপিবদ্ধ আছে। তৈমুর রক্তস্রোতের মধ্যে দিয়ে এদেশ ত্যাগ করেন।

তৈমুরের আক্রমণের ফলে তুঘলক বংশের যে ছায়ামাত্র প্রভাব দিল্লি ও তার উপকণ্ঠে ছিল তার অবসান হয়। সর্বত্র বিশৃংখলা দেখা দেয় ও মাল্লু ইকবালের মত সুবিধাবাদী আমির-ওমরাহরা এই মাৎস্যন্যায়ের সুযোগে স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হয়। অবশেষে ১৪১৪ সালে খিজির খাঁ তৈমুরের প্রতিনিধি হিসাবে মাল্লু ইকবাল ও দৌলত খাঁ লোদীকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করেন। খিজির খাঁ প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম সৈয়দ বংশ। এই বংশের দ্বিতীয় এবং শেষ সুযোগ্য সুলতান মুবারক শাহ আততায়ীর হস্তে নিহত হলে (১৪৩৪) তাঁর উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগে ১৪৫১ সালে বহলুল লোদী দিল্লীতে লোদী বংশের স্থাপন করেছিলেন। বহলুলের পুত্র সেকেন্দর লোদীর রাজত্বকালে এই আফগান বংশের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৫১৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর সেকেন্দর লোদীর পুত্র ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। রাজ্যশাসনে অনভিজ্ঞতা ও সামরিক ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাবের জন্য ইব্রাহিম লোদী তৈমুরের বংশধর বাবরের হাতে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন (১৫২৬ খ্রীঃ)। এই দ্বিতীয় বৈদেশিক আক্রমণ ক্ষণস্থায়ী হয়নি কারণ বাবর এদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। ফলে দিল্লীর সুলতানী শাসনের অবসান হয়।

সৈয়দ বংশ—খিজির খাঁ (১৪১৪-১৪২১ খ্রীঃ)

ভারতের সীমান্ত ত্যাগের পূর্বে আমির তৈমুর মুলতান ও দিপালপুরের উপর মালিক সুলেমানের পুত্র খিজির খাঁকে শাসনকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। খিজির খাঁকে তথাকথিত সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। সৈয়দ অর্থে ইসলামের প্রবর্তক। হজরত

www.pathagar.com

মহম্মদের বংশধর হিসেবে খিজির খাঁ ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা দাবি করতেন। প্রখ্যাত ফকির বোখারার সৈয়দ জালালউদ্দীন এই বংশকে সৈয়দ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই দাবি সঠিক কিনা বলা যায় না। সৈয়দ বংশের পূর্বপুরুষরা আরব দেশ থেকে এসেছিলেন। খিজির খাঁ কোন রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেননি। তিনি তৈমুরের চতুর্থ পুত্র শাহরুকের শাসনকর্তা হিসেবে ক্ষমতায় আসীন ছিলেন এবং শাহরুককে নিয়মিত উপঢৌকন পাঠাতেন। খিজির খাঁ 'রায়াত-ই-আলা' উপাধি গ্রহণ করেন এবং তাঁর পূর্বসূরী দিল্লীর তুঘলক সুলতানদের মুদ্রাই চালু রাখেন। তাঁর ক্ষমতা দখলের ফলে পাঞ্জাব, মূলতান ও সিন্ধু পুনরায় দিল্লী সুলতানী শাসনের অর্ন্তভুক্ত হওয়াতে এই রাজ্যের সীমা বর্ধিত হয়েছিল।

খিজির খাঁ এটওয়া, কাটেহার, কনৌজ, পাটিয়ালি, কাম্পিল প্রভৃতি অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্য লাভ করেনি। প্রায় প্রতিবছর তিনি সসৈন্যে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অভিযান করে লুণ্ঠন ও রাজস্ব আদায় করতেন কারণ এছাড়া রাজস্ব সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব ছিল। রাজ্যে বিশৃংখলা দমনে তাঁর এই সব প্রচেষ্টায় প্রধান সহায়ক ছিলেন উজীর তাজ-উল-মুলুক। এই যুগে অন্য কয়েকটি নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্য গুজরাট ও জৌনপুর দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবে এক ব্যক্তি নিজেকে 'সরঙ্গ খান' নামে ঘোষণা করে ক্ষমতা দখলের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। আর উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবে খোখরদের প্রধান জসরত খোখরের বিদ্রোহের ফলে পরিস্থিতি বিপদ্জনক হয়ে পড়েছিল। মেওয়াটের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাহাদুর নাহির। দোয়াবের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজস্ব দানে অস্বীকৃত বহু ছোট বড় বিদ্রোহী মাথাচাড়া দিয়েছিল। খিজির খাঁ ও উজীর তাজ-উল-মুকুল এইসব বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ১৪২১ সালের জানুয়ারী মাসে উজীর তাজ-উল-মুলুকের মৃত্যু হয় এবং এই বৎসরই ২০শে মে খিজির খাঁ পরলোক গমন করেন। ফিরিস্তার মতে, খিজির খাঁ ন্যায়পরায়ণ ও উদার সুলতান ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বিস্তারে তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেননি।

মুবারক শাহ (১৪২১-১৪৩৪ খ্রীঃ)

খিজির খাঁর পুত্র মুবারক শাহর রাজত্বকালে জসরত খোখর সৈয়দ বংশকে উৎখাত করে দিল্লী দখল করার উচ্চাকাংখা পোষণ করতেন। তিনি তুঘান রায়িস তুর্কবাচ্চার সাহায্যে জলন্ধর আক্রমণ করেন। কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল-আবেদিনের কাছেও তিনি সহায়তা লাভ করেছিলেন। সরহিন্দে ইসলাম খান লোদী জসরতের গতিরোধ করেছিলেন। অতঃপর সুলতান স্বয়ং তার বিরুদ্ধে অভিযান করে খোখরদের চন্দ্রভাগা নদীর অপর পারে পার্বত্য অঞ্চলে বিতাড়িত করেছিলেন। কিন্তু জসরত খোখরকে দমন করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি বারংবার লাহোর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। দিল্লী থেকে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হলে তাঁর অত্যাচার ও লুণ্ঠনের সাময়িক বিরতি দেখা যেত। ভাতিন্ডায় ও দোয়াবের বিদ্রোহ সুলতান মুবারক শাহ সাফল্যের সঙ্গে দমন করেছিলেন। সুলতান মুবারক শাহেরে রাজত্বকালে সর্বপ্রথম দরবারের গুরুত্বপূর্ণ আমির ওমরাহর মধ্যে কয়েকজন হিন্দু অভিজাতের নাম উল্লিখিত হয়েছে। সুলতানের উজীর সরওয়ার উল মুলুকের নেতৃত্বে কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাতের ষড়যন্ত্রে সুলতান মুবারক শাহ আততায়ীর হস্তে নিহত হন (১৪৩৪ খ্রীঃ)। সৈয়দদের রাজত্বকালের ঘটনাবলী বিস্তৃতভাবে ইয়াহিয়া বিন আহমেদ সরহিন্দির তারিখ-ই মুবারক শাহীতে বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

মহম্মদ শাহ (১৪৩৪-১৪৪৫ খ্রীঃ) ও আলাউদ্দীন আলম শাহ (১৪৪৫-১৪৫০ খ্রীঃ)

মুবারক শাহর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ খান সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি সুলতান মহম্মদ শাহ নামে পরিচিত। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম ছয় মাসকাল রাজ্যের সকল ক্ষমতা সরওয়ার-উল-মুলুকের হস্তগত ছিল এবং তিনি সর্বশক্তি দিয়ে পুরনো অভিজাতদের ধ্বংস করার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। অবশেষে কামলা-উল-মুলুকের নেতৃত্বে অভিজাতরা সারওয়ার-উল-মুলুকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। বিপদগ্রস্থ ও ক্ষমতাচ্যুত হবার সম্ভাবনায় ক্ষিপ্ত হয়ে সারওয়ার-উল-মুলুক বা খান জাহান সুলতানকে হত্যা করতে চেষ্টা করেন। ফলে সুলতান মহম্মদ শাহর দেহরক্ষীবাহিনীর হস্তে তিনি নিহত হন। কামাল-উল-মুলক ও অন্যান্য অভিজাতরা সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। নিরংকুশভাবে ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও সুলতান মহম্মদ শাহ রাজকার্যে অবহেলা শুরু করেন এবং সেই সুযোগে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। জৌনপুরের ইব্রাহিম শারকী রাজ্যের সীমানায় কয়েকটি পরগণা দখল করেছিলেন। অপরদিকে মালবের মামুদ খলজী দিল্লীর উপকণ্ঠে সসৈন্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে গুজরাটের আহমেদ শাহর বাহিনী রাজধানী আক্রমণে উদ্যত এই সংবাদে উদ্বিগ্ন মামুদ খলজী মাণ্ডুতে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এইসময় লাহোর ও সরহিন্দের শাসনকর্তা বহলুল লোদী সুলতানের সাহায্যের জন্য সসৈন্যে দিল্লীতে পদার্পণ করে প্রত্যাবর্তনকারী মালবের সৈন্যদের পশ্চাদ্বাবন করেছিলেন। ফলে খলজী বাহিনীর রসদ ও সরবরাহের সরঞ্জামের একাংশ তাঁর হস্তগত হয়েছিল এবং সুলতান মহম্মদ শাহ বহলুল লোদীকে খান-ই-খানান উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। দিল্লীর সুলতানের দুর্বলতার সুযোগে বহলুল লোদী ১৪৪৩ সালে রাজধানী দখলের প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। লোদীদের সঙ্গে জসরত খোখর এইসময় হাত মিলিয়ে সৈয়দ বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৪৪৫ সালে সুলতান মহম্মদ শাহর মৃত্যু হয়।

সুলতান মহম্মদ শাহর পুত্র আলাউদ্দীন আলম শাহ তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন (১৪৪৫ খ্রীঃ)। সুলতান আলাউদ্দীন আলম শাহ তাঁর পূর্বসূরীর থেকেও দুর্বল ও অব্যবস্থচিত্ত ছিলেন। তিনি উজীর হামিদ খানের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হলে উজীর বহলুল লোদীকে দিল্লীতে আমন্ত্রিত করেছিলেন। হামিদ খানের ক্ষমতা দখলের প্রত্যাশা ব্যর্থ করে বহলুল লোদী রাজ্যের সকল ক্ষমতা স্বয়ং দখল করেন। সুলতান এইসময় বাদায়ুনে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন এবং বহলুল লোদীর হাতে রাজ্য সমর্পণ করেছিলেন। বহলুল লোদী মুদ্রা থেকে সুলতান আলাউদ্দীনের নাম অপসারিত করেছিলেন এবং তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা বন্ধ করেছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন আলম শাহ জীবনের অবশিষ্ট কাল বাদায়ুনে একজন সাধারণ অভিজাত হিসেবে জীবনযাপন করেন এবং ১৪৫০ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইভাবে সৈয়দ শাসনের অবসান হয় এবং বহলুল লোদী দিল্লীতে লোদী বংশের পত্তন করেন।

লোদী বংশ — বহলুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯ খ্রীঃ)

লোদীরা ছিলেন আফগান। দিল্লীর প্রথম পাঠান সুলতান বহলুল লোদীর পিতামহ মালিক ইব্রাহিম সুলতান ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালে আফগানিস্থান থেকে এসে মুলতানের শাসনকর্তা মালিক মরদান দৌলতের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। আফগান ঘিলজালা গোষ্ঠীর শাহুখেল শাখার মালিক ইব্রাহিমের পুত্রদের মধ্যে দুইজন সুলতান শাহ ও মালিক কালা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। শেষোক্ত জন জসরত খোখরকে পরাজিত করেছিলেন ও একটি স্বতন্ত্র

www.pathagar.com

গোষ্ঠীর প্রধানরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুলতান শাহ ১৪১৯ সালে সরহিন্দের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন ও ইসলাম খান উপাধিলাভ করেছিলেন। মালিক কালার পুত্র ও স্বীয় জামাতা বহলুল লোদীকে মৃত্যুকালে ইসলাম খান উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। বহলুল কেবলমাত্র সরহিন্দ নয়, লাহোরও স্ববশে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। লোদীরা ইতিপূর্বে ইসলাম খানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং বহলুল লোদী সৈয়দ বংশের অবক্ষয়ের সুযোগে দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন আলম শাহর রাজত্বকালে জৌনপুরের মামুদ শাহ শার্কী দিল্লীর উপকণ্ঠে সসৈন্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। বহলুল লোদী জৌনপুরের সুলতানের দিল্লী দখলের উচ্চাকাংখা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। এই জন্য সুলতান আলাউদ্দীন আলম শাহ তাঁকে খান-ই-খানান উপাধিতে ভূষিত করেন। সৈয়দ বংশের শেষ সুলতান রাজ্যের দায়বহনে অপারগ ছিলেন। আলস্য ও বিলাসে জীবনযাপনের জন্য তাঁর অতিরিক্ত আগ্রহ সুবিদিত ছিল। উজীর হামিদ খানের সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হলে হামিদ খান বহলুল লোদীকে দিল্লীতে রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর ভার গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সুলতান রাজধানী ত্যাগ করে বাদায়ুনে স্বীয় আবাসস্থল নির্ধারিত করেন এবং এইখানেই শেষজীবন যাপনে মনস্থ করেন। ইতিমধ্যে বহলুল লোদী দিল্লীতে তাঁর অনুচরদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে কৌশলে হামিদ খানকে বন্দী করেছিলেন। অতঃপর তিনি আলাউদ্দীন আলম শাহকে পুনরায় দিল্লীতে আহ্বান করেছিলেন। সৈয়দ বংশের শেষ সুলতান এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বহলুল লোদীর মনস্কামনা পূর্ণ করেন। অতঃপর ১৯শে এপ্রিল, ১৪৫১ সালে বহলুল লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন এবং এইসময় তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়।

বহলুল লোদী ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজনীতিক। তিনি জানতেন যে, তাঁর শক্তি সম্পূর্ণ পাঠান অনুচরদের উপর নির্ভরশীল। অতএব সুলতান তাঁর পাঠান আমিরদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অটুট রাখার জন্য সর্বদা তাঁদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করতেন যাতে পাঠানদের আত্মসম্মানে আঘাত না লাগে এবং সুলতানকে তাঁদেরই একজন বলে আমিররা সর্বদা মনে করতেন। উদারহস্তে দান করে ও পুরস্কার দিয়ে এবং একাসনে বসে সুলতান পাঠানদের মধ্যে বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছিলেন। অপরদিকে তিনি বিদ্রোহী প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্ববশে আনার জন্য সামরিক অভিযান করেছিলেন। এইসব সামরিক অভিযানের ফলে প্রথমে মেওয়াটের (গুরগাঁও, আলওয়ার, ভরতপুর প্রভৃতি অঞ্চল) আহমদ খান, মেওয়াটি ও আগ্রা জেলা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল। অতঃপর, অন্যান্য অঞ্চলের শাসনকর্তারা একের পর এক দিল্লীর সুলতানের প্রতি আনুগত্য দেখাতে বাধ্য হয়। এইসব শাসনকর্তাদের মধ্যে ছিলেন সম্বলের দরিয়া খান, কোলের (আধুনিক আলিগড়) ইশা খান, সুকেতের মুবারক খান, ময়িনপুরী ও ভোনগাঁও-এর রাজা প্রতাপ সিংহ, রেওয়ারীর হুসেন খানের পুত্র কুতুব খান প্রভৃতি। দোয়াবের চন্দাওয়ার, এটাওয়া ও অন্যান্য জেলা থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রাথমিক বাধাবিঘ্ন দূর করে বহলুল লোদী এইসব অঞ্চলে দিল্লীর প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জৌনপুরের সঙ্গে দিল্লীর এই সময় সুদীর্ঘ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। জৌনপুরের সুলতান মামুদ শার্কী শেষ সৈয়দ সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং সেই সূত্রে তিনি দিল্লীর সিংহাসন দাবি করেন। ১৪৫১-৫২ সালে বহলুল লোদীর রাজধানীতে অনুপস্থিতির সময় শার্কী সুলতানের সেনাপতি ফতে খান প্রায় একলক্ষ সত্তরহাজার অশ্বারোহী ও চারশো রণহস্তী সহ দিল্লীতে হানা দিয়েছিলেন। অতি দ্রুত রাজধানী প্রত্যাবর্তন করার পথে দিল্লী থেকে ১৭ মাইল দূরে নরেলা নামক স্থানে বহলুল শত্রুসৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। শার্কীবাহিনীর এক

www.pathagar.com

আফগান সেনানায়ক দরিয়া খান লোদীর দিল্লীর বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করার ফলে যুদ্ধে বহলুল জয়লাভ করেন এবং ফতে খান পরাজিত ও নিহত হন। মামুদ শার্কী কিছুকাল পরে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু অবশেষে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ১৪৫৭ সালে মামুদ শার্কীর মৃত্যুর ফলে এই শান্তির শর্তাবলী পালিত হয়নি।

অতঃপর জৌনপুরের সিংহাসনে হুসেন শাহ আরোহণ করেছিলেন। দিল্লীর সঙ্গে চারবৎসরের শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। কিন্তু বহলুলের রাজধানীতে অনুপস্থিতির সুযোগে হুসেন শাহ্ শার্কী দিল্লী আক্রমণ করে চান্দওয়ারের যুদ্ধে আফগানবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। বহলুল লোদী দিল্লী প্রত্যাবর্তন করে হুসেন শাহর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু উভয় পক্ষই এইসব সন্ধির শর্তবলী রক্ষা করতে আগ্রহী না থাকায় দিল্লী ও জৌনপুরের সংঘর্ষ চলতে থাকে। এইসব সংঘর্ষের ফলে অবশেষে হুসেন শাহ্ শার্কী তাঁর রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বরবক শাহকে বহলুল লোদী জৌনপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরবর্তী অভিযানে বহলুল লোদী গোয়ালিয়রের রাজাকে দিল্লীর প্রাধান্য স্বীকার করতে বাধ্য করেন। এই অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে ১৪৮৯ সালের জুন মাসে সুলতান বহলুল লোদী মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছিলেন।

সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীঃ)

বহলুল লোদীর মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র নিজাম খান সুলতান সিকন্দর লোদী উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। সুলতান বহলুল লোদী দিল্লী সুলতানী শাসনের সম্মান পুনরুদ্ধারে অনেকটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন। জৌনপুর দখলের পর তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বরবক শাহকে জৌনপুরের সিংহাসনে স্থাপন করেন। বহলুলের মৃত্যুর পর বরবক শাহকে দিল্লীর মসনদ দান করার জন্য কিছু আমির সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাজ্যে বিশৃংখলা দমনের জন্য সিকন্দর লোদী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সিংহাসনে আরোহনের একবছরের মধ্যে তিনি ভ্রাতা আলম খান, ভ্রাতুস্পুত্র আজম হুমায়ুন ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বিদের স্ববশে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। আফগান জাগীরদারদের নিকট থেকে নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের জন্য সুলতান সিকন্দর লোদী তাদের হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর ন্যায় তিনি গুপ্তচর মারফতে রাজ্যের সকল সংবাদ সংগ্রহ করতেন। সিকন্দর লোদী তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বরবক শাহকে অধীন মিত্র রাজ্যের অধিপতি হিসেবে জৌনপুরের রাজ্যশাসন করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু প্রাক্তন জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ-শার্কীর প্ররোচনায় বরবক শাহ্ তাঁর ভ্রাতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে যুদ্ধে লিপ্ত হন। দিল্লীর সৈন্যবাহিনীর কাছে বরবক শাহ পরাজিত হয়েছিলেন। সুলতান সিকন্দর শাহ্ তাঁর জেষ্ঠ্য ভ্রাতাকে পুনরায় জৌনপুরের সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু জৌনপুরের শাসনব্যবস্থার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রন রাখার জন্য বিশ্বস্ত কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। এতদ্সত্ত্বেও জমিদারদের ও বাছগোটি উপজাতির নেতা জুগার অধীনে বিদ্রোহ দেখা দিলে সিকন্দর লোদীকে এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। কিন্তু বরবক শাহ সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পরে আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং সুলতান সিকন্দর শাহ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে জৌনপুরের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

ইতিমধ্যে জৌনপুরের প্রাক্তন সুলতান হুসেন শার্কী এই সুযোগে তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধারের কথা চিন্তা করে বিদ্রোহী নেতা জুগাকে সমর্থন জানান। সুলতান সিকন্দর শাহ হুসেন শার্কীর বিরুদ্ধে অভিযান করে শার্কী সুলতানকে বঙ্গদেশের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। সুলতান সিকন্দর শাহর সঙ্গে বঙ্গদেশের সুলতান

www.pathagar.com

আলাউদ্দীন হুসেন শাহর একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় এবং উভয় সুলতান পরস্পরের শত্রুকে কোন সাহায্য না করার প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন। জৌনপুরের প্রাক্তন সুলতান হুসেন শার্কী কোলগাঁওতে বাকি জীবন বঙ্গদেশের সুলতানের বৃত্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে শান্তিতে বসবাস করেছিলেন। সুলতান সিকন্দর শাহ বিহারের উপর প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন এবং দরিয়া খানকে এই স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। ত্রিহুতের রাজা এইসময় সুলতানের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে কর দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

লোদী বংশের তিনজন সুলতানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সিকন্দর লোদীকে শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে গণ্য করা হয়। তিনি কঠোর হস্তে আফগান আমির ওমরাহদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা, দরিদ্র ও দুঃস্থ প্রজাদের সাহায্যদান কবা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। শস্যের উপর শুল্ক অবলুপ্ত করে এবং বানিজ্যিক লেনদেনকে অন্যায় কর ও বাধা থেকে মুক্ত করে সুলতান দেশের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করেছিলেন ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য হ্রাস করেছিলেন। কিন্তু ফিরোজ তুঘলকের মত সিকন্দর লোদীও হিন্দুদের নির্যাতন ও ধর্মান্তকরণে উৎসাহদান করেছিলেন। তিনি নগরকোটের জ্বালামুখী মন্দিরের দেবমূর্তি ভঙ্গ করেছিলেন এবং মথুরা, নারওয়ার, চন্দেরী ও অন্যান্য বহু স্থানের মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। সিকন্দর লোদীর সময় বোধন নামে এক ব্রাহ্মণ হিন্দুধর্মকে সত্যধর্ম বলে দাবী করায় প্রাণদণ্ড দণ্ডিত হয়েছিল। ডঃ কিশোরী শরণ লাল তাঁর Twilight of the Sultanate গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, সিকন্দর লোদীর এইসব ধর্মান্ধনীতি ও অত্যাচার প্রধানতঃ পূর্ব ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের যেসব অঞ্চল সুলতানী শাসনের বিরোধিতা করেছিল, সেইসব স্থানেই হয়েছিল। ডঃ লালের মতে, ষোড়শ শতকের ভারতে যেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় যুক্তভাবে তৈমুরের বিরোধিতা করেছিল সেইযুগে সিকন্দরের ধর্মান্ধতা সমকালীন পারসিক ইতিবৃত্তকারের চক্ষেও দৃষ্টিকটু বলে প্রতীয়মান হয়েছে।* এইসব ধর্মান্ধ কার্যকলাপকে তখনকার পটভূমিকায়, যখন কবীর ও নানক ও অন্যান্য সন্তদের চিন্তাধারা হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সাধনার পথ প্রশস্ত করছিল সেইসময় দৃষ্টিকটু হিসেবে বহু সমকালীন লেখকদের চক্ষে প্রতিপন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

সুলতান সিকন্দর লোদী ঢোলপুরের রাজা বিনায়ক দেওকে পরাজিত করে ১৫০২ সালে এইস্থান দখল করেন। কিন্তু গোয়ালিয়রের রাজা মান সিংহ (১৪০৬-১৫১৭) তাঁর সামরিক অভিযানগুলি ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন পরে। মানসিংহের উত্তরাধিকারী দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। কিন্তু সুলতান এই প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকার দরুণ উত্তর-পশ্চিমের সীমান্তের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হয়। কারণ এই সময় বাবর কাবুল থেকে হিন্দুস্থানে হামলা শুরু করেছিলেন এবং সিকন্দর লোদী জৌনপুরের এবিষয়ে কোন দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহন করেননি। সিকন্দর লোদী আগ্রাকে তাঁর রাজধানী করেছিলেন। নারওয়ার, চান্দেরী, মান্দারিন, উতগির প্রভৃতি স্থান দিল্লীর পদানত হয়। কিন্তু রেওয়ার রাজা বৈদচন্দ্র দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেননি। সিকন্দর লোদীর মালব দখল করার স্বপ্নও সফল হয়নি। ১৫১৭ সালের নভেম্বর মাসে সুলতান সিকন্দর লোদীর মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-১৫২৬ খ্রীঃ)

১৫১৭ সালে সিকন্দর লোদীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। রাজত্বের প্রথমদিকে ইব্রাহিম লোদী তাঁর ভ্রাতা জালাল খাঁর সঙ্গে একযোগে

---

* Nizamuddin Ahmed and following him most other chrondelers declave that "his [Sikandar's] bigotry is Islam was so qreat that in this regard he went beyond the bounds of even excess. [Twilight of the Sultanate, পৃঃ ১৯৩]."

www.pathagar.com

রাজ্য বিভাগে সম্মত হয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি জালাল খাঁকে জৌনপুরে স্বাধীনভাবে রাজ্য স্থাপনে অনুমোদন দান করেছিলেন। কিন্তু জালাল খাঁ জৌনপুরের শাসনভার গ্রহণের পূর্বে ইব্রাহিম লোদী এই রাজ্যবিভাগ বাতিল করতে মনস্থির করেন। কারণ এর ফলে শক্তিশালী আমির ওমরাহদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভবনা ছিল। জালাল খাঁর সঙ্গে এই রাজ্যবিভাগের প্রশ্নে বিরোধে ইব্রাহিম সহজেই তাঁর ভ্রাতার মুষ্টিমেয় অনুচরদের পরাজিত করেছিলেন। জালাল খাঁ প্রথমে গোয়ালিয়র ও মালব এবং পরে গড়কাটাংগায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। শেষোক্ত স্থানের রাজা জালাল খাঁকে বন্দী করে ইব্রাহিমের নিকট প্রেরণ করেন। সুলতানের আদেশে বন্দী জালাল খাঁ ইব্রাহিম লোদীর অন্যান্য ভ্রাতাদের সঙ্গে হানসি প্রেরিত হয়েছিলেন কিন্তু পথে সুলতানের আদেশে তিনি নিহত হয়েছিলেন।

জালাল খাঁকে গোয়ালিয়রের রাজা সাময়িকভাবে আশ্রয়দান করেছিলেন এই কারণে সুলতান ইব্রাহিম লোদী গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন। এইসময় রাজা মানসিংহের পুত্র রাজা বিক্রমাদিত্য দীর্ঘকাল সংগ্রামে বিধ্বস্ত গোয়ালিয়রকে ভবিষ্যতের সংঘর্ষের ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দিল্লীর সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। এই ঘটনা ইব্রাহিম লোদীর কৃতিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু এরপরে লোদী সুলতান মেওয়ারের শক্তিশালী রাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছিলেন।

জালাল খানের দমনের পর সুলতান ইব্রাহিম লোদী তাঁর আফগান আমির ওমরাহদের স্ববশে রাখার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এইরূপে তুর্কী সুলতানদের দরবারে প্রচলিত প্রথাগুলি চালু করে এইরূপে আফগানদের সুলতান সম্পর্কে গোষ্ঠীচিন্তা প্রসূত ভ্রাতৃত্বমূলক সমভাবের মনোবৃত্তিতে ইব্রাহিম লোদী আঘাত করতে দ্বিধা বোধ করেননি। তিনি আজম হুমায়ুন সারওয়ানী, উজীর মিঁয়াভুয়া প্রভৃতির প্রতি সুলতানরে নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রভাবশালী আফগান গোষ্ঠী লোহানী, ফরমুলী ও অন্যান্যদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। ফলে কারাতে আজম হুমায়ুন সারওয়ানীর পুত্র ইসলাম খান কয়েকজন আমিরের সহযোগিতা গ্রহণ করে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তোলেন। সুলতানের বাহিনীর সঙ্গে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বিদ্রোহের নেতা ইসলাম খান নিহত হন এবং বহুকষ্টে এই বিদ্রোহ দমন করা। ইতিমধ্যে রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে বিহারে লোহানী আফগানরা স্বাধীনতা ঘোষনা করে এবং দরিয়া খান লোহানীর পুত্র বাহার খান লোহানী সুলতান মহম্মদ উপাধি গ্রহণ করেন। বিহার থেকে সম্বল পর্যন্ত তাঁর প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল। গাজীপুরের শাসনকর্তা নাসির খান লোহানী, আজম খান হুমায়ুনের পুত্র ফতে খান ও শের খান সুর (পরবর্তীকালে সুলতান শেরশাহ) প্রভৃতি তাঁকে সমর্থন জানান।

এইসময় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী সুলতান ইব্রাহিম লোদীর বিরোধিতা শুরু করেন এবং কাবুলের অধিপতি বাবরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। দৌলত খান লোদী বাবরকে হিন্দুস্তান আক্রমণের জন্য আহ্বান জানান এবং ইব্রাহিম লোদীকে সিংহাসনচ্যুত করে দিল্লীর সিংহাসন দখলের জন্য অনুরোধ করেন। দৌলত খান মনে করেছিলেন যে, বাবর তাঁর পূর্বপুরুষ তৈমুরের মতই হিন্দুস্তান লুণ্ঠন করে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং তারপরে দৌলত খান পাঞ্জাবে নিরঙ্কুভাবে স্বীয় শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন। এইসময় ইব্রাহিম লোদীর একজন পিতৃব্য আলম খানও দিল্লীর সিংহাসন দখলের কথা চিন্তা করে বাবরকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করেছিলেন। পাঞ্জাবে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ১৫২৪ সালে বাবর লাহের দখল করেন এবং স্বীয় রাজকর্মচারীদের অধিকৃত স্থান শাসনের জন্য নিযুক্ত করেন। এর ফলে দৌলত খান বাবরের পরিবর্তে আলম খানের সহযোগিতায় ইব্রাহিম লোদীর বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। ১৫২৫ সালে দৌলত খান ও আলম খানের মিলিত

www.pathagar.com

আফগানবাহিনী দিল্লী অভিযান করলে ইব্রাহিম লোদী এই বিদ্রোহী নেতাদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৫২৬ সালে ২০শে এপ্রিল বাবর সসৈন্যে ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পানিপথ প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদীর এক লক্ষ আফগান বাহিনীর সঙ্গে বাবরের মুষ্টিমেয় সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। কিন্তু বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে তাঁর উন্নত যুদ্ধকৌশল ও আগ্নেয়াস্ত্রের সুদক্ষ ব্যবহারের ফলে সহজেই জয়লাভ করেছিলেন। ইব্রাহিম লোদী ও তাঁর অধিকাংশ অনুচর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। দৌলত খান লোদী, আলম খান, গুজরাটের বাহাদুর শাহ এমনকি মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহ পর্যন্ত অনেকেই আশা করেছিলেন যে, বাবর তাঁর পূর্বসূরী তৈমুরের ন্যায় লুণ্ঠনের জন্যই হিন্দুস্তান আক্রমণে তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই প্রত্যাশা ব্যর্থ করে বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করার পর হিন্দুস্তানে স্থায়ীভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে তৎপর হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ভারতের আঞ্চলিক রাজ্যগুলি

দিল্লীর সুলতানী শাসনের ক্রমবর্দ্ধমান দুর্বলতার জন্য এবং ১৩৯৮ সালে তৈমুরের আক্রমণের পরবর্তী কালে তুঘলক সুলতানের দিল্লী পরিত্যাগ করে পলায়ন করার ফলে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসকগণ ও রাজ্যগুলি স্ব স্ব প্রধান হয়ে পড়েছিল। দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন রাজ্যগুলি ছাড়া পূর্বাঞ্চলে বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও কামরূপ, পশ্চিম দিকে মুলতান ও সিন্ধু সহজেই দিল্লীর সুলতানী শাসনমুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। অত্যল্পকালের মধ্যে গুজরাট, মালব ও জৌনপুরে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। রাজস্থানের আজমীরের মুসলমান শাসনকর্তা বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং অন্যান্য অংশে দিল্লীর শাসনের চিহ্নমাত্র রইল না। কাশ্মীরের স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের স্থলে চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে শাহ মির্জা কর্তৃক একটি মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া রাজস্থানের বিভিন্ন রাজ্য এই সময় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল।

বিভিন্ন অঞ্চলের এই সব রাজ্যগুলির মধ্যে কালক্রমে একটি বিশেষ ছকে শক্তিসাম্য দেখা দিয়েছিল। পশ্চিমাঞ্চলে গুজরাট, মালব এবং মেবার পরস্পরের ক্ষমতা সীমিতকরণ করে একটি শক্তিসাম্যের সৃষ্টি করেছিল। বঙ্গদেশে সুলতানদের শক্তি উড়িষ্যার গজপতি শাসক ও জৌনপুরের সুলতানদের দ্বারা সীমিত হয়েছিল। অপরদিকে গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের প্রাধান্যের জন্য পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে লোদী সুলতানদের অভ্যুত্থানের ফলে জৌনপুরের সঙ্গে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে লোদী সুলতানরা জৌনপুর দখল করেছিলেন। পরিস্থিতির এই পরিবর্তনের দরুণ পূর্বরাজস্থান ও মালবে লোদীরা তাঁদের প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়েছিল এবং অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্য মালবের রাজ্য ক্রমেই হীনবল হয়ে পড়েছিল। ফলে গুজরাট, মেবার ও লোদীদের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে উত্তরভারতের সার্বভৌমত্ব বিজয়ী রাজ্যের কুক্ষিগত হবে বলে সকলের ধারণা হয়েছিল। অর্থাৎ মালবকে কেন্দ্র করে যে সংঘর্ষে গুজরাটের শাসক, দিল্লীর লোদী সুলতান ও মেবারের রানা লিপ্ত হয়েছিলেন, উত্তরভারতের সার্বভৌমত্ব নির্ধারণ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। এই সংঘর্ষে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বি লোদী সুলতানের শক্তি যাতে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ হয় সম্ভবত সেই কারণে রানা সংগ্রাম সিংহ তৈমুরের বংশধর বাবরকে হিন্দুস্থান আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। রানা সংগ্রাম সিংহ আশা করেছিলেন যে, বাবর তাঁর পূর্বপুরুষ তৈমুরের ন্যায় দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং রাজপুতরা সহজেই উত্তরভারতে তাদের প্রাধান্য স্থাপন করতে সক্ষম হবে।

রাজপুতদের উৎপত্তি *

রাজপুত রাষ্ট্রদের অভ্যুত্থান : রাজপুতরা যে কোথা থেকে ভারতে এসেছিল তা কেহ সঠিকভাবে বলতে পারেন না। রাজপুত শব্দটি একটি সামাজিক বর্গের প্রতি প্রযোজ্য যাদের মধ্যে জাতিগত অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কিত কোন যোগসূত্র নেই। রাজপুতরা রণদুর্দম গোষ্ঠী বা উপজাতি ছিলেন।

* রাজপুতদের তুর্কী বিজয়ের সময় অনৈক্য সম্পর্কে প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

রাজপুত নেতৃবৃন্দ অভিজাত হিসাবে নিজেদের জাহির করতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণরা এই রাজপুতদের ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত করেছিলেন। বিভিন্ন দলের রাজপুত উপজাতিদের মধ্যে বহু বিদেশী ছিলেন যাঁরা পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। আবার রাজপুতদের মধ্যে কোনো কোনো গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরা ছিলেন হিন্দু ধর্মের আওতায়। রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ গোষ্ঠীগুলির অনেকে ছিলেন বিদেশী। টড এইসব গোষ্ঠীকে শক (Scythians) বলে মন্তব্য করেছেন। হুন, গুর্জর, মৈত্রক ও অন্যান্য বিদেশী আগমনকারী কালক্রমে রাজপুত গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। এইসব বিদেশাগতদের মধ্যে যারা নিম্নবর্গের মানুষ তারা সামাজিক স্তরে উচ্চবর্ণের মর্যাদা লাভ করেনি। এরা গুর্জর, আহির, জাট প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়েছিল।

রাজপুতরা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এইসব গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীদের মধ্যে অন্যতম হল বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বংশধর মেওয়ারের গুহিল গোষ্ঠীরা, পরিহাররা (প্রতিহারগণ), চৌহানরা (চাহমানরা), পাওয়ার (পরমারগণ) এবং সোলাংকিরা বা চালুক্যগণ।

দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটরা, রাজস্থানের রাঠোররা, বুন্দেলখন্ডের চন্দেল্ল ও বুন্দেলরা ছিলেন, স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে যেসব গোষ্ঠী আভিজাত্য ও প্রাধান্য লাভ করে যারা রাজপুত হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম। চন্দেল্লরা সম্ভবত গোণ্ডদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। শাসক উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ও শাসকক্ষত্রিয়দের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক আদান-প্রদান অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ছিল। কোন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলে কালক্রমে সেই বংশের রাজারা ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হতেন। এই ধরনের মধ্যবর্তী পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে যখন একটি ব্রাহ্মণ পরিবার ক্ষত্রিয়বর্ণের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে শুরু করেছে সেই সময় তারা বহুক্ষেত্রে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত। যেসব রাজ পরিবারের ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিশোদিয়া রানারা ও বাংলার সেনবংশ। রাজপুতানার চারণ কাব্যের ঐতিহ্য অনুসারে প্রতিহার, পরমার, চালুক্য ও চহমান এই চারিটি রাজপুত গোষ্ঠী আবু পাহাড়ে অনুষ্ঠিত এক বিরাট যজ্ঞের আগুন থেকে যে পৌরাণিক মানুষের উদ্ভব হয় তারই বংশধর। কিন্তু এই অগ্নিকুল কাহিনীর বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কর্নেল টড কর্তৃক পৃথ্বীরাজ রাসোতে বর্ণিত কাহিনী গৃহীত হয়েছে। এই কাহিনী অনুসারে ঋষিগণের প্রার্থনা শুনে মহাদেব যে বর দান করেছিলেন তার ফলে যজ্ঞের অগ্নি থেকে চারজন বীরপুরুষ দৈত্য দমনের জন্য নির্গত হয়েছিলেন। আবার কানিংহাম গৃহীত বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি ও অন্যান্য দেবদেবীর কৃপায় পূর্বোক্ত চারিটি রাজপুত গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি হয়েছিল। এ ধরনের বহু প্রচলিত কাহিনীর কোনটিই প্রতিহার ও চহমান লিপিগুলিতে সমর্থিত হয়নি। কেবলমাত্র চালুক্য নৃপতি দ্বিতীয় ভীমের পরমাদের বশিষ্ঠর যজ্ঞ থেকে উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। হেমচন্দ্রের টিকাকার, অভয়টিলক গনি বলেছেন যে, অগ্নিকুলের কাহিনী হ'ল দক্ষিণ রাজপুতনার একটি শুদ্ধির অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'Whereby the impurity of the foreigners was removed and they became fitted to enter the Hindu caste system.''* এইভাবে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা ও অন্যান্য রাজবংশের লোকেরা জাতিকুল নির্বিশেষে উচ্চবর্ণে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

কেবলমাত্র যেসব রাজপুত গোষ্ঠীর আবু পাহাড়ের সঙ্গে ভৌগোলিক দিক থেকে সংযোগ ছিল তাদের কথা অগ্নিকুলভুক্ত বলে উল্লিখিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রতীহাররা দক্ষিণ রাজস্থানে ও চৌহানরা পূর্ব রাজস্থানে রাজত্ব করত। তারা প্রতিহার রাজাদের সামন্ত ছিল ও পরে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। প্রতীহারদের সঙ্গে বৈদেশিক জাতি গোষ্ঠী গুর্জরদের (প্রথমে

---

* এই উদ্ধৃতি এ. সি. ব্যানার্জীর, লেকচারস অন রাজপুত হিস্ট্রি, পৃ ১১ থেকে গৃহীত।

www.pathagar.com

খজর নামে পরিচিত) সম্পর্ক ঐতিহাসিক লিপির তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত। চহ্‌মানরা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়র ন্যায় উচ্চবর্ণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা এ সম্পর্কে সঠিকভাবে বলা যায় না, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা নিজেদের সূর্যবংশীয় বলে দাবি পেশ করেন। অন্যান্য রাজপুত গোষ্ঠী যারা নিজেদের সূর্য বা চন্দ্র বংশোদ্ভূত বলে দাবি করত তারা পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এদের মধ্যে খাজুরাহো অঞ্চলের চন্দেল্লারা দশম শতাব্দীতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।* পরমারগণ যে বৈদেশিক জাতিসম্ভূত নন তা তৎকালীন লিপি থেকে প্রমাণিত হয়েছে। পরমার নৃপতি প্রথম বাকপতিরাজ রাষ্ট্রকূট নৃপতি তৃতীয় কৃষ্ণের বংশজাত বলে হর্সোল লিপিতে (৯৪৮ খ্রীঃ) উল্লিখিত হয়েছে।

গাহড়বালদের লিপিতে তাঁদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করা হয়েছে। রাষ্ট্রকূট ও গাহড়বালদের নাম একটি লিপিতে পাশাপাশি আলাদা গোষ্ঠী হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। ভিনসেন্ট স্মিথ গোরক্ষপুরের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, রাজা নলের বংশধর 'গহরওয়ারগণ' কাশীতে আসিয়া বসবাস শুরু করে এবং এই 'গহরওয়ার' বা 'গহিরওয়ারদের' সাধারণতঃ গাহড়বালদের সঙ্গে সনাক্ত করা হয়। মধ্যভারত থেকে তাদের আগমনের জন্য এই গাহড়বালদের সম্ভবতঃ স্থানীয় আদিবাসীদের বংশসম্ভূত বলে অনেকের ধারণা হয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর তারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি পেশ করেছিল। কলচুরি বা হৈহেয়দের একটি শাখা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে এবং ত্রিপুরীতে (জব্বলপুরের নিকট) স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। সোলাংকিরা কাথিয়াওয়াড় ও ব্রোচ অঞ্চলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

যারা তুর্কী আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিল সেইসব প্রধান রাজপুত গোষ্ঠীগুলি ছাড়াও মধ্যযুগের রাজস্থানে তিনটি প্রধান শাসক রাজপুতবংশের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি হল মেওয়ারের গুহিল গোষ্ঠী, মারওয়াড়ের রাঠোরগণ ও অম্বর-জয়পুরের কচ্ছওয়া গোষ্ঠী। গুহিলরা বাপ্পা রাওয়ালের বংশধর। সমকালীন লিপির ভিত্তিতে ডঃ ভাণ্ডারকর তাঁদের বৈদেশিক অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং নাগর ব্রাহ্মণ হিসাবে তারা পরিচিত ছিলেন। আবার প্রাচীন ঐতিহ্যে তাঁদের সূর্যবংশজাত বলে দাবি করা হয়। চৌহান রাজ্যের দক্ষিণে মেওয়াড়ে তাঁরা রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। মারওয়াড়ের ইতিবৃত্ত রাঠোরদের কনৌজের গাহড়বাল শাসকদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং রাঠোর বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিহাকে 'কনৌজিয়া' রাঠোর বলে পরবর্তী একটি লিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই লিপি সম্ভবতঃ চারণ কাব্যের ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন। অম্বর-জয়পুরের কাছওয়া রাজপুতদের প্রচলিত কাহিনীতে তাদের কোশলের সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং তাঁরা রামের পুত্র কুশের বংশধর বলে দাবি করেন।

এইসব আলোচনা থেকে স্বভাবতঃ উপলব্ধি করা যায় যে বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন লিপি থেকে, বা সংস্কৃত ও হিন্দি সাহিত্যে প্রচলিত কাহিনী ও চারণ কাব্যের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে কোন সঠিক উপসংহারে পৌঁছন সম্ভব হয়নি। এইজন্য ডঃ অনিল চন্দ্র ব্যানার্জি** মন্তব্য করেছেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের এইসব 'অসম্পূর্ণ' সিদ্ধান্ত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

রাজপুতদের সংহতির অভাব, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও ভূমিব্যবস্থা

রাজপুতদের মধ্যে জাতিগত কোন সংহতি ছিল না। রাজপুতরা রক্তের সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধ ছিল না। তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ ছিল এবং তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন রক্তের যোগসূত্র ছিল

* রোমিলা থাপার, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ: ১৭১।

** 'We must satisfy ourselves, in the present circumstances, with unsatisfactory conclusions' Lectures on Rajput History, p. 29.

www.pathagar.com

না। রাজস্থানে যেসব জাতিগোষ্ঠী বসবাস করত তাদের প্রায় প্রত্যেকের ঐতিহ্য পৃথক ছিল। কোন একজন পূর্বপুরুষের রক্ত তাদের ধমনীতে প্রবাহিত হত না। যেহেতু এইসব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একই ধরনের সামাজিক রীতিনীতি গড়ে উঠেছিল এবং যেহেতু রাজপুত জাতিরা রণদুর্দম ও যুদ্ধপ্রিয় ছিল সেইজন্য তাঁদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ বলে মনে করার কোন কারণ নেই।

প্রতিটি রাজপুত রাষ্ট্র একটি গোষ্ঠীর দ্বারা রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রয়োজনে এবং ঐতিহাসিক কারণে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। একজন আধুনিক লেখক মন্তব্য করেছেন যে, 'প্রতিটি রাষ্ট্রে শাসক শ্রেণী একটি বিশেষ গোষ্ঠীর হস্তগত ছিল'। গোষ্ঠীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সনাক্তকরণ মধ্যযুগের রাজপুত রাজনৈতিক কাঠামোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মারাঠা সাম্রাজ্যের চরম সংকটের দিনেও তারা নামে একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে ছিল। বিভক্ত শিখ মিসিলগুলি নিজেদের ঐক্য বজায় রাখার জন্য সরবত খালসার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু রাজপুতদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তাদের ঐক্যের প্রধান অন্তরায় ছিল। রাঠোর ও কচ্ছওয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা উল্লেখ করে স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন যে এমনকি ইংরাজ আমলেও এটাই ছিল রাজপুত সমাজের প্রধান বিষয়বস্তু।

রাজপুতরা সংকীর্ন দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের উর্দ্ধে উঠতে পারেনি বলে সমগ্র হিন্দুস্তানের স্বার্থ ও ঐক্যচিন্তা তাঁদের কখনও বিচলিত করেনি। ভারতীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রাজপুতরা মধ্যযুগে যে নেতৃত্ব দানের সুযোগ লাভ করে, সেই সুবর্ণ সুযোগকে এইভাবে অবহেলা করে গোষ্ঠীবদ্ধ ও সংকীর্ণমনা রাজপুত রাজন্যবর্গ অতীতের ধ্যানধারণা ও পদ্ধতির মধ্যে ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভবনাকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল। গোষ্ঠীব্যবস্থা রাজপুতদের ভারতীয় ইতিহাসের বৃহত্তর পটভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের পথে অলংঘনীয় বাধার সৃষ্টি করেছিল এবং ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের সংকটজনক মুহূর্তে নেতৃত্বদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিল। প্রতিটি রাজপুত রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দুর্বল ছিল। কারণ রাজপুত রাষ্ট্রে অভিজাত রানক, নায়ক, রাউত ইত্যাদি বংশগত অধিকারে জমি লাভ করতেন। এইসব শক্তিশালী সামন্ত বংশানুক্রমিকভাবে জমি ও জায়গীর উপভোগ করার জন্য প্রচলিত প্রথা ও বিধি অনুসারে তাদের অধিকার সংরক্ষিত ছিল।*

রাজপুত সামাজিক ও আর্থিক সংগঠন গোষ্ঠী ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। গোষ্ঠী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পারিবারিক গৌরব সামাজিক জীবনের মুখ্য পরিচালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করত। সামাজিক শ্রেণীবিভাগে যেকোন ব্যক্তির নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুইটি দিকে লক্ষ্য রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। প্রথমতঃ তার বংশপরিচয় সম্পর্কে মূল্যায়ন ও দ্বিতীয়তঃ তার অধীনস্থ জমির পরিমাপ। এই দুইটি বিষয়েই সাধারণতঃ আঙ্গাঙ্গীকভাবে জড়িত বলে ধরা হত। কারণ উচ্চবংশজাত হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তি বিশাল ভূসম্পদের মালিক হতে পারত। রাজপুতের কাছে জমি ছিল একান্ত প্রয়োজনীয় এবং রাজস্থানের ভূস্বামীরা, রানা, রানক, দুর্গাধিপতি, সেনাপতি সকলেই ভূমির আয়ের উপর নির্ভর করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি তাঁদের অনীহা ছিল এবং অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ তাতে লিপ্ত ছিল। রাজস্থানের অনুর্বর ভূমিতে উৎপাদন কমবলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজপুত রাজা ও সামন্তরা বিশাল ভূমির মালিকানা লাভে তৎপর ছিলেন। এইজন্য ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ ও সংঘর্ষের উদাহরণ রাজপুতানার ইতিহাসে অনবরত দেখা যায়।

রাজপুতদের গোষ্ঠী প্রথার জন্য কোন স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন করা সম্ভব ছিল না। এছাড়া রাজপুত রাজাদের খাজাঞ্চিখানার আয় এত স্বল্প ছিল যে তাতে কোন স্থায়ী সৈন্য রাখার ব্যয় বহন করার কথা ভাবা যেত না। রাজস্থানের সামরিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যে কোন স্থায়ী

---

* Col. Todd's Annals Antiquities of Rajasthan (Crooke ed.) Vol-1 পৃঃ ৫৭৫-৭৬-এ বলা হয়েছে যে, কৃষককেও তাদের ভূমিস্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা যেত না।
রামশরণ শর্মা, ভারতের সামন্ততন্ত্র পৃঃ ১৪১-১৭৫ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সৈন্যদলের কথা এজন্য শোনা যায় না। রাজপুত রাজাদের খাস জমি বা খালসা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল ছিল অভিজাতদের জায়গীর। এই জন্য সৈন্যদের বেতনের পরিবর্তে ভূমিরাজস্ব দান করাও সম্ভবপর ছিল না। যুদ্ধে সামন্তসৈন্য ও অনুচরদের উপর নির্ভর করা ছাড়া রাজপুত নৃপতিদের উপায় ছিল না। তারা পদাতিক সৈন্য ও গোলাবারুদের ব্যবহারে দক্ষ ছিল না। খানুয়ার যুদ্ধে রানা সংগ্রাম সিংহের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হল বাবরের রণকৌশল ও কামানের ব্যবহার এবং গোষ্ঠী বিভক্ত রাজপুত বাহিনীর ঐক্যের অভাব।

পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকে রাজপুত নৃপতিরা গোষ্ঠীপ্রথার মধ্যে পরিবর্তন আনাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা আঞ্চলিক গোষ্ঠীর প্রাধান্য ক্ষুন্ন করার জন্য বাইরের কোন অঞ্চলের অভিজাতদের আমদানী করে রাঠোর, চৌহান, পরমার, সোলাংকি ভাট্টি প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রন করতে প্রয়াস করেছিলেন। এইসব বহিরাগত অভিজাতদের যে জায়গীর দেওয়া হত তাকে কালা পাট্টা বলে অভিহিত করার রীতি ছিল। এছাড়া অন্যান্য পদ্ধতিতেও রাজপুত নৃপতিরা কেন্দ্রীয় শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু রাজপুত নৃপতিদের সঙ্গে তাঁদের অধীনস্থ সামন্তদের সম্পর্ক এতই আলগা ও শিথিল ছিল যে এইসব প্রচেষ্টার ফলে রাজনৈতিক কাঠামো বা সামরিক সংগঠনকে সুদৃঢ় করা সম্ভবপর হয়নি।*

রাজপুত সামন্ততন্ত্র

আঞ্চলিক ও গোষ্ঠী শাসিত রাজ্যগুলির উদ্ভব দেখা যায় দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতনের পর। এইসময় উত্তরভারতে রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। কর্নেল টড রাজপুত অধীন সামন্তদের তাঁর প্রভুর প্রতি কর্তব্য ও আনুগত্যর সঙ্গে মধ্যযুগীয় ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশ্য পালনীয় বাধ্যবাধকতা, দেয় কর ও অন্যান্য কর্তব্যের একটি তুলনা করার প্রচেষ্টা করেছেন। সামন্তদের উত্তরাধিকারী না থাকিলে সার্বভৌম কর্তৃক তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করণ, উত্তরাধিকারী সূত্রে জমিদারী লাভের জন্য রাজাকে সেলামী দান (relief), রাজার জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের বীরব্রতী পদে অধিষ্ঠিত হবার সময় (Knighting) অথবা রাজার বিপদে যথা যুদ্ধের সময় বা মুক্তিপণের জন্য এবং নাবালক সামন্তের সম্পত্তির স্বাভাবিক অভিভাবকত্ব লাভের প্রশ্নে রাজস্থানের মধ্যযুগের প্রথার সঙ্গে কর্নেল টড ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রথার সৌসাদৃশ্য দেখিয়েছেন। টড বলেছেন যে, "We have no parallel in Rajwara......to the agricultural serfs and villeins of Europe"**। অনেকের মতে রাজপুতদের যে প্রথাগুলির সঙ্গে টড মধ্যযুগের সামন্তপ্রথার সৌসাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন তা মূলতঃ ছিল বাহ্যিক। কারণ মধযুগের ইউরোপের ও রাজস্থানের সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন সম্পূর্ণ ভিন্নধারায় হয়েছিল। রাজপুতদের যেসকল প্রথার সঙ্গে কর্নেল টড মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের তুলনা করেছেন ডঃ অনিল চন্দ্র ব্যানার্জির মতে তা গোষ্ঠী প্রথা থেকে উদ্ভুত।*** রাজা ছিলেন গোষ্ঠীর প্রধান।

কিন্তু রাজপুতানায় ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তীকালে সামন্ততন্ত্রের প্রসার সম্পর্কে রামশরণ শর্মা মন্তব্য করেছেন যে, ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপের পরিস্থিতির সঙ্গে এ দেশের 'পার্থক্য শুধু এইটুকু ছিল যে,

* পূর্বোক্ত Lectures on Rajput History পৃঃ ১১৪-১২৮ দ্রষ্টব্য।

** এ্যানালস এ্যাণ্ড এ্যানটিকুইটিস এব্ রাজস্থান (ক্রুক সংস্করণ) ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৬-২১০।

*** লেকচারাস অন রাজপুত হিস্ট্রি, পৃঃ ১৩২-১৩৪ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ভারতে অসংখ্য স্বতন্ত্র শাসকবংশ বর্তমান ছিল। তার প্রমাণ নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন ও অধিস্বামীর নামোল্লেখ ছাড়াই ভূমি অনুদানের উল্লেখ থেকে পাওয়া যায়।* এই একই লেখক বলেছেন যে "ভূমিদাস বলতে যদি জোর করে চাষীকে জমিতে আটকে রাখা বোঝায় তাহলে এটি বর্তমান ছিল মধ্যপ্রদেশে, পূর্বভারতে, চাম্বা ও রাজস্থানের ব্যাপক অংশে।" বহু সনদে কৃষক, কারিগর এমনকি ব্যবসাদারদেরও হস্তান্তরের উদাহরণ পাওয়া যায়। ভূমিদাস প্রথা হল কৃষককে ভূখণ্ডের সঙ্গে বেঁধে রাখা ও সেই ভূখণ্ডের হস্তান্তরের সময় কৃষককে তৎসহ হস্তান্তরিত করা। এই সঙ্গে বেগার, ভাগচাষ ও ইজারাদারীও চালু ছিল। অতএব উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের খণ্ড খণ্ড ও রাজনৈতিক দিক থেকে স্বতন্ত্র রাজ্যগুলির মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। এবং কেন্দ্রীয় শাসনের অভাবে তাদের যে রাজনৈতিক আর্থিক কাঠামো গড়ে উঠল তাকে ব্যাপক অর্থে বলা যায় সামন্ততন্ত্র।** ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের মতে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্র অন্যান্য দেশের সামন্ততন্ত্র থেকে ভিন্ন ধরনের। কিন্তু সেটা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয় এবং তার জন্য ভারতীয় পরিস্থিতিকে সামন্ততন্ত্র আখ্যা দেওয়াতে ভুল হবে না।*** রাজপুতদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা এবং সামন্ত ও অধিস্বামীর সম্পর্কের ভারসাম্য রাজার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল ছিল। সামন্তরা আবার অনেক সময় উপসামন্ত সৃষ্টি করতেন। রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ। এইজন্য সামন্তদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সামন্ত-উপসামন্ত ও অন্যান্য মধ্যসত্ত্বভোগীদের চাহিদা মেটাতে কৃষকের উপর নানা ধরনের কর বসানো হত। চৌহান ইতিহাস সম্পর্কিত শিলালিপিতে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নানা ধরনের করের বিবরণ পাওয়া যায়।**** এছাড়া পুরোহিত শ্রেণী ও ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের মিত্র ছিল। শস্য উৎপাদনে সামন্তরা হাত লাগাত না। তারা খাজনা আদায় করেই ক্ষান্ত ছিল। চাষাবাদ করা ব্রাহ্মণদের পক্ষেও নিষিদ্ধ ছিল। অতএব ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সাধারণ চরিত্রের মত এই যুগের ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেক মিল ছিল। কারণ ভারতের মাটিতেও দেখা যায়, 'যোদ্ধারা যুদ্ধ করত, পুরোহিতরা প্রার্থনা করত এবং কৃষকরা মাঠে এবং শ্রমজীবী ও বণিকরা শহরে কাজ করত।'

রাজপুত রাষ্ট্রগুলি

সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর (১২৯৬-১৩১৬) যুগে রাজপুতদের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখা যায়। কারণ, এইসময় গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতনের পর যেসব রাজপুত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল এবং যারা এতকাল দিল্লী সুলতানদের আগ্রাসন থেকে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল তারা একে একে তুর্কী সাম্রাজ্যের পদানত হয়েছিল। কিন্তু তাদের স্থলে রাজস্থানের মেওয়ার, মারওয়াড় এবং অম্বরের রাজপুত নৃপতিরা রাজস্থানের স্বতন্ত্রতার ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে পরিচিতহয়েছিলেন।

মেওয়ার

তুর্কী ও আফগান সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের দি[illegible] রাজপুতরা তাদের গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই পুনর্জাগরণের পুরাধা[illegible] ছিলেন মেওয়ারের গুহিল রাজপুতরা। খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতকে গুহিল রাজপুত গোষ্ঠী মেও[illegible]রে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ১৩০৩ সালে সুলতান আলাউদ্দীন খলজী চিতোর দখল করা সত্ত্বেও মেওয়ারের একাংশে গুহিলদের প্রাধান্য বজায়

---

* রামশরণ শর্মা প্রাগুক্ত গ্রন্থ পৃ : ১৩১।

** রোমিলা থাপারের ভারতবর্ষের ইতিহাস : ওরিয়েন্ট লংম্যান, পৃঃ ১৮০।

*** ঐ।

**** ঐ।

www.pathagar.com

ছিল। অবশেষে মেওয়ারের রানা বংশের উত্তরাধিকারী হামির চিতোরকে তুর্কী অধিকার থেকে মুক্ত করেছিলেন। ১৩৬৪ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু রানা হামির মেওয়ারে রাজত্ব করেন। হামিরের পুত্র ক্ষেত্র সিংহ পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৩৮২ সালে তিনি একটি পারিবারিক কলহে নিহত হন। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন লখা এবং লখার পুত্র মোকালা। শেষোক্ত রানা ১৪৩১ সালে তাঁর দুই জন পিতৃব্য কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী রানা কুম্ভ ছিলেন মেওয়ারের ইতিবৃত্তে একজন সুপ্রসিদ্ধ শাসক। বীরযোদ্ধা ও দক্ষ সেনাপতি হিসাবে তৎকালীন যুগের নৃপতিদের মধ্যে রানা কুম্ভ সুনাম অর্জন করেছিলেন। সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং রাজ্যের সীমান্তের সুরক্ষার জন্য দুর্গম দুর্গ শ্রেণী নির্মান করে রানা কুম্ভ স্বীয় রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করেছিলেন। এইসব দুর্গের মধ্যে কুম্ভলগড় দুর্গ ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। রানা কুম্ভ মালব ও গুজরাটের সুলতানদের বিরুদ্ধে অনবরত অভিযান করে রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেছিলেন। মালবের সুলতানের বিরুদ্ধে বিজয়কে স্মরণীয় করার জন্যও রানা কুম্ভ একটি বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। কেবলমাত্র রণদক্ষতার জন্য নয় বিদ্যোৎসাহীতার জন্যও রানা কুম্ভ সুনাম অর্জন করেছিলেন। মেওয়ারের ইতিহাসে রানা কুম্ভের পরবর্তীকালে রানা সংগ্রাম সিংহ বা রানা সঙ্গ (১৫০৯-১৫২৮) ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। কর্নেল টড তাঁকে রাজস্থানের গৌরবস্তম্ভের 'কলস' বা সর্বোচ্চ শিখর বলে বর্ননা করেছেন। রানা সঙ্গের দেহে আশিটি তরবারি বা বর্শার আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং রণক্ষেত্রে তিনি একটি পা, একটি হাত ও একটি চোখ হারিয়েছিলেন। রানা সঙ্গ ছিলেন রণদুর্দম সৈনিক ও প্রতিভাবান সেনাধক্ষ্য। তিনি মালব, গুজরাট ও দিল্লীর সুলতানকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। মালবের সুলতান যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রানার হস্তে বন্দী হলে রানা সঙ্গ তাঁকে বিনাশর্তে মুক্তি দিয়ে নিজের উদারতার প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খানুয়ার রণক্ষেত্রে তাঁর রাজপুত অশ্বারোহী বাহিনী বাবরের গোলন্দাজদের আক্রমণে ও সংগঠিত রণনীতির ফলে পরাজয়বরণ করেছিলেন। বাবরের পৌত্র আকবর রানা সঙ্গের বংশধর ও উপযুক্ত উত্তরসূরী রানা প্রতাপ সিংহকে হলদিঘাটার যুদ্ধে পরাজিত করলেও বশ্যতা স্বীকার করাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। রানা প্রতাপের উত্তরাধিকারী রানা অমরসিংহ সম্রাট জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মারওয়াড়

যখন মেওয়ারের শিশোদিয়াদের ক্ষমতার সম্প্রসারণ হয়েছিল সেই সময় মারওয়াড়ের ও বিকানীরের রাঠোরদের শক্তি ও প্রাধান্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। রাঠোররা কনৌজের গাহড়বালদের বংশধর বলে রাজপুতানার প্রচলিত ঐতিহ্যে দাবি করা হয়। কিন্তু এই দাবিকে ডঃ হোর্নেলে (Dr. Hoernle) প্রামানিক তথ্য ভিত্তিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ প্রথমতঃ, রাঠোররা এই নামেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে আসছে এবং কখনই 'গাহড়বাল' এই উপাধি ব্যবহার করে না। আর গাহড়বালরা এই নাম ছাড়া অন্য কোন পরিচয় দেয়নি। দ্বিতীয়তঃ, এই দুইটি গোষ্ঠীর গোত্র সম্পূর্ণ পৃথক। তৃতীয়তঃ, রাঠোররা ও গাহড়বালরা পরস্পরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। এই জন্য অনেকে মনে করেন যে রাঠোররা আসলে বাদায়ুনের রাষ্ট্রকূটদেরই বংশধর। এই সম্পর্কে মারওয়াড়ের রাঠোর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা সিহার ১২৭৩ সালের লিপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লিপিতে অনুমান করা হয় যে রাঠোররা দশম শতকের রাষ্ট্রকূটদেরই বংশধর।

রাঠোরদের প্রধান চুণ্ডার ক্ষমতালাভের পর মারওয়াড়ের ইতিবৃত্তে আধুনিক যুগের শুরু হয়। চুণ্ডা চতুর্দশ শতকের শেষপাদে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। তাঁর পৌত্র যোধা একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গ এবং তার আশেপাশে যে নগর গড়ে উঠেছিল তা যোধপুর নামে বিখ্যাত। যোধা ১৪৩৮ থেকে ১৪৮৮সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৫০ বৎসর কাল রাজত্ব করেছিলেন। রাজত্বের

www.pathagar.com

প্রথমার্ধে শিশোদিয়াদের আগ্রাসনের ফলে যোধাকে থাল বা মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং রাঠোরদের রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি শিশোদিয়াদের পদানত হয়েছিল। কিন্তু এই সময় পশ্চিম ভারতের রাজনীতিতে এমন কতকগুলি পরিবর্তনের সূচনা হয় যা রাঠোরদের পক্ষে শুভ হয়েছিল। মেওয়ার ও মালবের মধ্যে ১৪৪৩ থেকে ১৪৪৮ পর্যন্ত কূটনৈতিক সম্পর্কের তিক্ততার দরুণ সংঘর্ষ চলতে থাকে প্রায় আট বৎসরের সাময়িক বিরতির পর মালবের সুলতান গুজরাটের সহযোগিতা ও সহায়তা লাভ করে মেওয়ারের রানা কুম্ভের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। ফলে ১৪৫৮ সাল পর্যন্ত এই সংঘর্ষ স্থায়ী হয়েছিল। সেই সুযোগে যোধা শিশোদিয়াদের দ্বারা অধিকৃত তাঁর রাজ্যের অংশগুলি পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

যোধার সতেরোটি পুত্রসন্তান ছিল। তারা রাঠোর রাষ্ট্রের প্রতিবেশী অঞ্চলগুলি দখল করে স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। এর ফলে যোধার একটি পুত্র সাতল ফলোধির নিকটবর্তী স্থান দখল করে সাতলমের রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। আরেকটি পুত্র বিকানীর নগরটির পত্তন করেন। যোধার পুত্রদের মধ্যে দুদা মের্তা দখল করেন এবং তাঁর বংশধর এখানকার শাসকরা মের্তিয়া রাঠোর নামে পরিচিত। মধ্যযুগের রাঠোর নৃপতিদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন মালদেব (১৫৩২-১৫৬২)। শেরশাহর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয় এবং এই সংঘর্ষের ফলে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল তা সামাল দিতে শেরশাহকে মালদেবের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে হয়েছিল।

অম্বর

অম্বর রাষ্ট্র বর্তমানে জয়পুর নামে পরিচিত। এই রাজ্যের শাসক কাচ্ছওয়া রাজপুতরা সূর্যবংশীয় ও অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের বংশধর বলে দাবি করতেন। কর্ণেল টডের মতে খ্রীষ্টিয় দশম শতকে এই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই রাজ্যটি প্রথমের দিকে মেওয়ারের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। চতুর্দশ শতক থেকে অম্বরের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। মুঘলযুগে অম্বর রাজস্থানের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অম্বরের অধিপতি ভরমল ১৫৬১ সালে আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন এবং তিনি ও তাঁর বংশধররা মুঘল সাম্রাজ্যের প্রসারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন।

পশ্চিম ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র— গুজরাট ও মালব

গুজরাটী ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে গঠিত এলাকা, কচ্ছ ও প্রাচীনকালে হিন্দুদের বর্ণিত সৌরাষ্ট্র মুসলমানরা যাকে সোরাট বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বর্তমানের কাথিয়াওয়াড় নিয়ে গুজরাট গড়ে উঠেছিল। গুজরাটের সীমা কখনও নর্মদা পর্যন্ত আবার কখনও দমন পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে। তুর্কী-আফগান যুগে উত্তর-দক্ষিণে রাজপুতানার সিরোহি ও বিনমল এবং পূর্ব-পশ্চিমে মালবের সীমানা থেকে সমুদ্র ও কচ্ছের রান পর্যন্ত গুজরাটের চৌহদ্দি ছিল। কাথিয়াওয়াড়কে গুজরাটের অন্তর্গত বলে ধরা হত।

প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য গুজরাট ছিল সকলের কাছে আকর্ষণীয়। এখানকার মাটি অত্যন্ত উর্বরা, শিল্পোৎপাদনে ও কারিগরী দক্ষতায় গুজরাট অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক অগ্রসর বলে নিজেকে প্রমানিত করেছিল। সুপ্রাচীন কাল থেকে সামুদ্রিক ও বহির্বাণিজ্যের জন্য গুজরাট সুপ্রসিদ্ধ ছিল। স্বভাবতই এইরূপ ধনধান্যে ও সম্পদেপূর্ণ প্রদেশের উপর বহির্শত্রুর আক্রমণ বারবার হয়েছে। এইজন্য ১০২৪ সালে সুলতান মামুদ গুজরাটের সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করে লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেছিলেন। দ্বাদশ শতকে গুজরাটের উপর বারংবার তুর্কী আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও এইস্থানে হিন্দু রাজবংশগুলি তাঁদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন। ১২৯৭ সালে সুলতান

www.pathagar.com

আলাউদ্দীন খলজী গুজরাট জয় করেন ও গুজরাটকে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

গুজরাটের শাসনকর্তা জাফর খান ১৩৯১ সালে সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ কর্তৃক এই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। জাফর খানের পিতা ছিলেন একজন ধর্মান্তরিত রাজপুত। তিনি মুজাফর খান উপাধি লাভ করেছিলেন এবং মুসলমান অভিজাতদের ও হিন্দু বিদ্রোহীদের দমন করেছিলেন। তৈমুরের আক্রমণের পরবর্তীকালে বিশৃংখলা উপস্থিত হওয়ার সুযোগে এবং পরবর্তী তুঘলক সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে জাফর খান প্রায় স্বাধীন ভাবেই গুজরাটের শাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তৈমুরের হাতে পরাজিত হয়ে তুঘলক সুলতান মামুদ গুজরাটে আশ্রয় গ্রহণ করলে জাফর খান তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করেননি এবং সুলতান মামুদ মালবে প্রস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৪০৩ সালে জাফর খানের পুত্র তাতার খান পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে সিংহাসন দখল করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতৃব্য সামস খান দানদানী, তাতার খানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে জাফর খানকে মুক্ত করেছিলেন। ফলে জাফর খান পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪০৭ সালে সুলতান মুজাফর শাহ উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। মুজাফর শাহ মালবের সুলতান হুসাঙ শাহকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর রাজধানী ধর অধিকার করেছিলেন। ১৪১১ সালে তার মৃত্যু হলে তাতার খানের পুত্র আহমদশাহ উপাধি গ্রহণ করে গুজরাটের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

আহমদ শাহ (১৪১১-১৪৪৩)

আহমদ শাহকে গুজরাট রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। তাঁর দীর্ঘ বত্রিশ বৎসরের রাজত্বকালে তিনি অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন, শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছিলেন এবং স্বীয় রাজ্য সম্প্রসারিত ও শৃংখলা স্থাপন করেছিলেন। ১৪১৩ সালে সুলতান আহমদ শাহ আমেদনগরের পত্তন করে তাঁর রাজধানী এইখানে স্থানান্তরিত করেছিলেন। সুলতান তাঁর নতুন রাজধানীতে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, বাজার ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। গুজরাটের জৈন স্থাপত্যের অমূল্য ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করে তিনি স্থাপত্য রীতিতে যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেন, তার ফলশ্রুতিতে হর্ম প্রাসাদ, মসজিদে ও অন্যান্য স্থাপত্য নির্দশনে এক বিশিষ্ট ধারার প্রচলন হয়েছিল যা দিল্লীর স্থাপত্য রীতির থেকে স্বতন্ত্র। আহমেদাবাদের জামা মসজিদ ও তিন দরওয়াজা এই স্থাপত্য রীতির অন্যতম উদাহরণ।

আহমদ শাহ তাঁর রাজত্বের বত্রিশ বৎসরে যেমন শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তেমনই প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য সর্বদা প্রস্তুতি রেখেছিলেন। প্রধানতঃ গুজরাট ও রাজপুতানার হিন্দুরাজারা এবং মালব ও দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল। আহমদ শাহ সৌরাষ্ট্রের রাজপুত রাজ্যগুলি ও গুজরাট রাজস্থানের সীমায় অবস্থিত রাজপুত রাজ্যগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি গিরনারের দুর্গ দখল করেছিলেন এবং করদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে এইখানের রাজাকে দুর্গটি প্রত্যার্পন করেছিলেন। যেসব হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে আহমেদশাহ অভিযান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ইদরের রাজা পুঞ্জা ও তাঁর বংশধরগণ দীর্ঘকাল সুলতানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। অবশেষে ইদরের নৃপতি নিয়মিত করদানে স্বীকৃত হন। চম্পানের, দুংগারপুর, কোটা ও বুন্দির রাজপুত রাজারাও তাঁকে করদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়। কিন্তু দুংগারপুরের শাসক মহা রাওয়াল গোপিনাথের ১৪৬৮ সালের লিপিতে গুজরাটের সুলতান তাঁর হস্তে পরাজয় বরণ করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ১৪৬০ সালের কুম্ভলগড় লিপি অনুসারে নগৌরের ফিরোজ

www.pathagar.com

খান ও গুজরাটের সুলতান আহমদ খানকে রানা মোখলেন্দ্রর কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকরা ১৪৩৩ সালে ফিরোজ খান ও আহমদ শাহ কর্তৃক মোকলা পরাজিত হন বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং মোকলার লিপিতে যে বিজয় কাহিনীর কথা বলা হয়েছে তা ১৪২৮ সালের। অতএব সম্ভবতঃ মুসলমান ঐতিহাসিকরা সন ও তারিখের ক্ষেত্রে ভুল করেছেন অথবা সুলতান আহমদ শাহ মেওয়ারের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন এবং তার প্রথমটি ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয়টিতে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

সুলতান আহমদ শাহ সিদপুরের প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থক্ষেত্র আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। তিনি গুজরাটের হিন্দুদের উপর সর্বপ্রথম জিজিয়া কর স্থাপন করেন। মধ্যযুগের ঐতিহাসিকরা ও আধুনিক লেখকগণ এইজন্য তাঁকে হিন্দুবিদ্বেষী ও গোঁড়া মতবাদের সমর্থক বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু সুলতান আহমদ শাহ যেমন হিন্দু মন্দির ধ্বংসে দ্বিধা করেননি তেমনি হিন্দুদের সরকারী কার্যে নিযুক্ত করতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। তিনি দুইজন বানিয়া মাণিকচাঁদ ও মোতিচাঁদকে মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। বিচারক হিসাবে তিনি কঠোরভাবে ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং নিজের জামাতাকেও তার অপরাধের জন্য চরম শাস্তি দান করতে দ্বিধা করেন নি।

কেবলমাত্র হিন্দু রাজারাই নয় মুসলমান প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শাসকদের সঙ্গে সুলতান আহমদ শাহর অনবরত বিরোধ চলত। বহুদিন ধরেই গুজরাট, রাজস্থান ও মালবের শাসকদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। সুলতান আহমেদ শাহ সিংহাসন আরোহনের পরই তাঁর পিতৃব্য ফিরোজ খান সহ অন্যান্য কয়েকজন বিদ্রোহী হয়েছিলেন। সুলতান সহজেই এই বিদ্রোহী দমন করেছিলেন। কিন্তু মালবের সুলতান হুসেঙ শাহ এই বিদ্রোহের সুযোগে গুজরাট আক্রমণ করেন। মালবের সুলতানের এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছিল এবং তিনি স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে হুসেঙ শাহ আরো দুইবার গুজরাট আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়েছিলেন ।

১৪৭১ সালে সুলতান আহমদ শাহ খান্দেশের অধিপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন এবং ১৪২৯ সালে ঝালওয়ারের রাজা কানাহ বা কৃষ্ণকে ও বাহমনি সুলতান আহমদ শাহকে যুদ্ধে পরাভূত করে শেষোক্তর কাছ থেকে থানা ও মহিম দখল করেন। সুলতান আহমদ শাহ দক্ষ ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন এবং গুজরাটের সুলতানদের মধ্যে যারা সাফল্য অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আহমদ শাহ ছিলেন অন্যতম। ১৬ই আগষ্ট, ১৪৪৩ সালে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন।

দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ (১৪৪৩-১৪৫১) আহমদ শাহর উত্তরসূরী হিসাবে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ইদরের রাজা হরি রায় ও দুংগারপুরের রাজা গনেশকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ১৪৪৯ সালে তিনি চাম্পানেরের রাজা কনকদাসকে আক্রমণ করলে মালবের সুলতান চাম্পানের রাজাকে সহায়তা করেন। ফলে সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৪৫১ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিষপ্রয়োগের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন সুলতান কুতুবউদ্দীন আহমেদ বা দ্বিতীয় আহমেদ শাহ (১৪৫১-৫৮)। মুসলমান ঐতিহাসিকরা অনেকে বলেন যে তিনি চিতোরের মহারানা কুম্ভকে বারংবার পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু রানা কুম্ভের চিতোর কীর্তিস্তম্ভ লিপি অনুসারে মহারানা গুজরাট ও মালবের সুলতানকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ১৪৫৮ সালে সুলতান কুতুবউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পিতৃব্য দায়ুদ খানকে অভিজাতরা সিংহাসনে বসান। কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যে সুলতান দায়ুদ খান তাঁর অযোগ্যতার জন্য সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মামুদ বেগাড়া (১৪৫৮-১৫১১)

অপদার্থ দায়ুদখানকে সিংহাসনচ্যুত করে অভিজাতরা দ্বিতীয় মহম্মদ শাহর পুত্র ফতেখানকে গুজরাটের সুলতান বলে ঘোষণা করেন। তিনি ইতিহাসে মামুদ বেগাড়া নামে সুপরিচিত। মহম্মদ বেগাড়া গুজরাটের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সুলতান ছিলেন। তিনি আহমদশাহর রাজ্য সম্প্রসারণ ও সংগঠনের নীতি অনুসরণ করে অর্ধশতাব্দীর বেশী গুজরাট শাসন করেছিলেন। জুনাগড় বা গিরনার দুর্গ এবং চাম্পানেরের দুর্গ দুইটি জয় করার জন্য তাঁকে বেগাড়া বলা হত।* গিরনারের শাসক গুজরাটের সুলতানকে নিয়মিত কর দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর রাজ্যটি মামুদ বেগাড়া দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের মূলে যে সব যুক্তি কাজ করছিল তা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে বলা যায়। প্রথমতঃ সুলতান মামুদ বেগাড়া সৌরাষ্ট্রের সম্পদ কুক্ষিগত করতে আগ্রহী ছিলেন। সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের ব্যবসা ও বাণিজ্য স্থল ও জল দস্যুদের দ্বারা ব্যহত হওয়াতে তাদের দমন করার জন্য এই পদক্ষেপ অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। এছাড়া গিরনারে সুরক্ষিত দুর্গটি কেবলমাত্র সৌরাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নয়, সিন্ধু অভিযানের জন্যও জরুরী ছিল। মামুদ বেগাড়া জুনাগড় ও গিরনারের দুর্গ রাজা মানডালিকার কাছ থেকে জয় করেন এবং তাঁকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি ভেরাবল বন্দরের উপর প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং গিরনার পর্বতের পাদদেশে মুস্তাফাবাদ নামে একটি নতুন নগরীর পত্তন করে সেখানে বহু মুসলমান সুফি, ফকির ও আমিরদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি কচ্ছের সুমার, সোডা ও কাহোরা গোষ্ঠীদের শাস্তি দান করেন কারণ তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বহু হিন্দু প্রথা অনুসরন করত। রাজত্বের শেষের দিকে মামুদ বেগাড়া দ্বারকার জলদস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন কারণ তারা হজযাত্রীদের উপর লুটপাট চালাত। এই অভিযানের সময় বহু হিন্দু মন্দিরও ধ্বংস করা হয়েছিল। সুলতান চাম্পানেরের উপর বারংবার আক্রমণ করেন এবং রাজা জয়সিংহের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও এইস্থান দখল করেন। এই সময় রাজা জয়সিংহ ধর্মান্তকরনের থেকে বীরের মৃত্যু বরণ করা শ্রেয় বিবেচনা করে জীবন দান করেছিলেন (১৪৮৪)। ১৪৯৮ সালে খান্দেশ আক্রমণ করে সুলতান মামুদ খান্দেশের সুলতানকে পরাজিত করেছিলেন। ফলে খান্দেশের সুলতান তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজদের আগমনে গুজরাটের সার্বভৌমত্বের বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো ডা গামার কালিকটের বন্দরে আগমনের পর থেকে পর্তুগীজদের সঙ্গে গুজরাটের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ১৫০৮ সালে জুনাগড়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও মিশরের মামলুক সুলতানের নৌবাহিনী সম্মিলিত ভাবে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে চাউলের নৌযুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। কিন্তু পরবৎসর পর্তুগীজ নৌবাহিনী মিশরীয় বাহিনীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেছিল। ১৫১০ সালে পর্তুগীজরা বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানের কাছ থেকে গোয়া দখল করেছিল। সুলতান মামুদ বেগাড়া পর্তুগীজদের সাফল্য দেখে তাঁদের দিওতে ফ্যাক্টরী বানানোর অনুমতি দান করেছিলেন এবং পর্তুগীজ বন্দীদের মুক্তিদান করেছিলেন। ১৫১১ সালের নভেম্বর মাসে সুলতান মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

সুলতান **দ্বিতীয় মুজাফ্ফর (১৫১১-২৬)** মামুদের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে গুজরাটের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। তিনি দিওতে পর্তুগীজদের দুর্গ নির্মাণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন। সুলতান মামুদের বাধাদানের ফলে তাঁর রাজত্বকালে পর্তুগীজরা দুইবার আক্রমণ করেও এইস্থানে প্রভুত্ব স্থাপনে সক্ষম হয়নি। তিনি মেদিনী রায়ের অনুগামী রাজপুতদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং মালবের সুলতান দ্বিতীয় মামুদকে তাঁর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

---

* অনেকের মতে ফতে খানের দীর্ঘ গোঁফের সঙ্গে মোষের শিঙের তুলনা করে তাঁকে বেগারহ উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

www.pathagar.com

করেছিলেন। ইদরের ভীম সিংহকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। যার ফলে মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহ ইদর, বাদনগর ও বিশাল নগরে সৈন্যপ্রেরণ করেছিলেন। সুলতান মুজাফর এই সময় মেবার আক্রমণের উদ্দেশ্যে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এই অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এবং গুজরাটের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়ে মেবার থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। ১৫২৬ সালের এপ্রিল মাসে সুলতান দ্বিতীয় মুজাফরের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর দুইজন অযোগ্য সুলতান সিকন্দর ও দ্বিতীয় মামুদ পর পর মাত্র কয়েকমাস রাজত্বের পর সিংহাসনচ্যুত হন। অবশেষে দ্বিতীয় মুজাফরের আরেকটি পুত্র বাহাদুর শাহ ১৫২৬ সালের জুলাই মাসে গুজরাটের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন।

বাহাদুর শাহ (১৫২৬-১৫৩৭)

সুলতান বাহাদুর শাহ ছিলেন গুজরাটের সর্বশেষ সুযোগ্য শাসক। ১৫৩১ সালের প্রথমার্ধে গুজরাটের নৌবাহিনী ও তুর্কী নৌবাহিনীর যৌথ আক্রমণে পর্তুগীজ নৌবাহিনী পরাজিত হয়ে গোয়া বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরপর তিনি মালব দখল করেন এবং রাইসিনা, সরঙ্গপুর ও ভিলসার অধিপতি সিলাহাদী তার তাঁবুতে সন্ধির মানসে এলে তাঁকে বন্দী করেন। এইসময় কালপী থেকে হুমায়ুন কর্তৃক বিতাড়িত একজন লোদী গোষ্ঠীর প্রধানকে সুলতান বাহাদুর শাহ রাইসিনার রাজ্যটি দিয়েছিলেন। তুর্কী গোলোন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি রুমি খানকে স্বীয় সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করে সুলতান বাহাদুর শাহ তাঁর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন এবং সহজেই চিতোর দুর্গ অধিকার করেছিলেন। কিন্তু চিতোরের শাসনকর্তার পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে রুমি খান হুমায়ুনের সঙ্গে যোগদান করেন। ফলে বাহাদুর শাহকে মুঘল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে প্রথমে মাণ্ডু ও পরে মাণ্ডু থেকে চাম্পানের এবং সেখান থেকে ক্যাম্বে ও সর্বশেষে দিওতে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই সময় পর্তুগীজদের কাছ থেকে সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় তিনি তাদের দিওকে সুরক্ষিত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে হুমায়ুন চাম্পানের ও আমেদাবাদ দখল করে দিও আক্রমণের তোড়জোড় শুরু করেন। কিন্তু শেরখানকে দমন করার জন্য মুঘল সম্রাটকে সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করে পূর্বাঞ্চলের দিকে অভিযান করতে হয়েছিল।

হুমায়ুনের প্রত্যাবর্তনের পর বাহাদুর শাহ তাঁর সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করে স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। অতঃপর তিনি পর্তুগীজদের গুজরাট থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ পর্তুগীজরা সুলতানকে মুঘলদের বিরুদ্ধে সাহায্যদান করেনি। এই সময় গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তা নুনো দ্য কুনহার (Nuno de Cunha) সঙ্গে আলোচনার জন্য সুলতান বাহাদুর শাহ পর্তুগীজ নৌসেনাপতির জাহাজে পদার্পণ করেছিলেন এবং পর্তুগীজদের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণ হারিয়েছিলেন।*

বাহাদুর শাহর মৃত্যুর পরবর্তীকালে গুজরাটের সিংহাসনে তাঁর যেসকল দুর্বল বংশধরা আরোহণ করেছিলেন তাঁদের অযোগ্যতার জন্য রাজ্যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল। এই অরাজকতার সুযোগে ১৫৭২ সালে মুঘল সম্রাট আকবর সহজেই এই রাজ্য জয় করে গুজরাটকে মুঘল সাম্রাজ্যের সুবায় পরিণত করেছিলেন।

মালব

নর্মদা ও তাপ্তী নদীর মধ্যবর্তী স্থলে মালবের রাজ্যটি অবস্থানের জন্য গুজরাট ও উত্তরভারতের যোগাযোগের পথে এবং উত্তর-দক্ষিণের সড়কের সংযোগসূত্র হিসাবে এই স্থানের গুরুত্ব ছিল

* এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভিনসেন্ট স্মিথের অক্সফোর্ড হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া (৪র্থ সংস্করণ) পৃঃ ২৭৭-৭৮ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সমধিক। মালব যতদিন শক্তিশালী ছিল ততদিন গুজরাট, মেওয়ার, বাহমনি সুলতানদের ও দিল্লীর লোদী সুলতানদের উচ্চাকাংখার পথে এই রাজ্যটি বাধার সৃষ্টি করেছিল। কারণ ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়ে মালবের গুরুত্ব এতই বেশী ছিল যে, যদি কোন শক্তি এই রাজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে সক্ষম হয় তার পক্ষে উত্তরাঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টায় সহজেই সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর ছিল। পঞ্চদশ শতকে মালব গৌরবের চরম শিখরে আরোহন করেছিল। মালবের রাজধানী এই সময় ধর থেকে মাণ্ডুতে স্থানান্তরিত করা হয়। এইখানে মালবের সুলতানরা বহু সুদৃশ্য হর্মরাজি নির্মাণ করেছিলেন। গুজরাটের স্থাপত্য শৈলীর সঙ্গে এইস্থানের প্রাসাদ নগরীর গৃহনির্মাণ কৌশলের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। বৃহদায়তনের ও বিস্তৃত বেদীর উপর স্থাপিত এই স্তম্ভগুলি এদের সুবিশাল আকৃতি ও সৌন্দর্যের জন্য আকর্ষণীয়। এইসব প্রাসাদোপম গৃহ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন ঝকঝকে ও রঙীন টালির অজস্র ব্যবহার মাণ্ডুর স্থাপত্য আজও দর্শককে মোহিত করে। মাণ্ডুর স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের মধ্যে জামী মসজিদ, হিন্দোলা মহল, জাহাজ মহল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মালবের অভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রথম থেকে তার দুর্বলতার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সিংহাসনের বিভিন্ন দাবিদারদের মধ্যে কলহ ও সেই সুযোগে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আমির ওমরাহদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য দ্বন্দ্ব মালবের রাজনীতিতে বহির্শক্তির হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টি করেছিল। কারণ, প্রতিবেশী রাজ্যগুলি বিশেষত মেওয়ার ও গুজরাট এই গোষ্ঠী বিরোধের সুবিধা গ্রহণ করে মালবের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

মালবের ঘোরী সুলতানগণ (১৪০১-১৪৩৫ খ্রীঃ)

১৩১০ সালে সুলতান আলাউদ্দীন খলজী মালব জয় করেছিলেন এবং তৈমুরের আক্রমণের পরবর্তীকালে দিল্লীর তুঘলক শাসনের অবক্ষয়ের যুগে মালব স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ১৩৯৮ সালে তৈমুরের আক্রমণোত্তর যুগে মালবের শাসনকর্তা দিলওয়ার খান ঘোরী কার্যতঃ স্বাধীন ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেকে সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেননি। ১৪০১ সালে দিলওয়ার খান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর দিলওয়ার খানের পুত্র আলপ খান ১৪০৫ সালে সুলতান হুসেঙ শাহ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। হুসেঙ শাহ ধর্মের ব্যাপারে উদার ছিলেন। তিনি বহু রাজপুতকে মালবের সুলতানের অধীনে জায়গীর প্রদান করেছিলেন। এই যুগে নির্মিত ললিতপুর মন্দিরের লিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান হুসেঙ শাহর আমলে নতুন মন্দির নির্মাণে কোন বাধা ছিল না। হুসেঙ শাহ তাঁর রাজ্যের বণিক, মহাজন ও জৈনদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুলতানের অন্যতম উপদেষ্টা ও খাজাঞ্চিখানার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন নরদেব সোনি নামক একজন জৈন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি রাজধানী ধর থেকে মাণ্ডুতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। রিজভী মন্তব্য করেছেন যে, ''Hushang ensured a policy of religious toleration.''*

সুলতান হুসেঙ শাহর উচ্চাকাংখা ও রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টার জন্য তাঁর রাজত্বকালে মালবের সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির অনবরত সংঘর্ষ চলছিল। কিন্তু রাজত্বের প্রথমার্ধে মালবের সুলতান হুসেঙ শাহ স্বীয় পিতাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহন করেছেন এই অভিযোগে গুজরাটের সুলতান মুজাফর শাহ মালব আক্রমণ করেছিলেন। যুদ্ধে হুসেঙ শাহ গুজরাটের সৈন্যবাহিনীর হাতে পরাজিত ও বন্দী হন এবং তাঁকে গুজরাটে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে হুসেঙ শাহ মুক্তিলাভ করেছিলেন। এই সময় সুলতান হুসেঙ মালবের সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত

---

* Wonder that was India, Vol-II, পৃঃ ৬৬ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

হয়েছিলেন। ১৪১১ সালে গুজরাটের সুলতান আহমেদ শাহর মৃত্যু হলে হুসেঙ শাহ বারংবার গুজরাট আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি গুজরাটের বিরুদ্ধে কোন সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ১৪২২ সালে সুলতান হুসেঙ শাহ অকস্মাৎ উড়িষ্যা আক্রমণ করে সেখান থেকে ৭৫টি রণহস্তি লুণ্ঠন করে এনেছিলেন। এরপর তিনি খেরালার হিন্দু রাজ্যটি আক্রমণ করে এইখানকার রাজাকে বন্দী করেছিলেন। সুলতান হুসেঙ শাহ স্বীয় উচ্চাভিলাষ পূরণের জন্য দিল্লী, জৌনপুর, গুজরাট এমনকি দক্ষিণের বাহমনি সুলতানের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। এইসব আগ্রাসী যুদ্ধের ফলে মালবের বিশেষ লাভ হয়নি এবং সুলতান হুসেঙ শাহর সম্মান ও যশ বৃদ্ধি পায়নি। অবশেষে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে রণক্লান্ত সুলতান হুসেঙ শাহ ৬ জুলাই ১৪৩৫ সালে মৃত্যুর শীতল স্পর্শে শান্তি লাভ করেছিলেন। হুসেঙ শাহর উত্তরাধিকারী তাঁর পুত্র গজনী খান সুলতান মহম্মদ শাহ উপাধি গ্রহণ করে মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। ১৪৩৬ সালের মে মাসে অযোগ্য মহম্মদ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর মন্ত্রী মামুদ খান নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন।

খলজী বংশ

মামুদ খান সিংহাসনে আরোহণ করে সুলতান মামুদ শাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। মামুদ শাহর (১৪৩৬-৬৯) সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে মালবে ঘোরী বংশের শাসনের অবসান হয় এবং খলজী বংশের শাসনের সূত্রপাত হয়। সুলতান মামুদ শাহর বিরুদ্ধে একদল আমির বিদ্রোহী হয়েছিলেন। এই বিদ্রোহী আমিররা মামুদ শাহর সিংহাসন দাবি স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। এছাড়া গুজরাটের সুলতান আহমদ শাহ প্রয়াত সুলতান মহম্মদ শাহর পুত্রদের সিংহাসন দাবির সমর্থনে মালব আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু সুলতান মামুদ শাহ তাঁর শত্রুদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ করে সিংহাসনে স্বীয় অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সুলতান মামুদ খলজীকে মালবের সুলতানদের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্য করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, তিনি মেওয়ারের রানা কুম্ভর সঙ্গে সংঘর্ষের যুগে ও অন্যান্য যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকালীন সময় বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। এইসব কার্যকলাপ কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু মন্দির ধ্বংস করা সুলতানের নীতির অঙ্গ ছিল না। এই ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের ফলশ্রুতি বলে গণ্য করা যায়।

সুলতান মামুদ খলজী একজন রণদক্ষ সৈনিক ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। গুজরাটের সুলতান প্রথম আহমদ শাহ, দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় সুলতান মহম্মদ শাহ, বাহমনী সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহ ও মেওয়ারের রানা কুম্ভের সঙ্গে সুলতান মামুদ খলজী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। মেওয়ারের সঙ্গে মালবের সুলতানের সংগ্রাম এইযুগে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং উভয়পক্ষই স্ব স্ব সাফল্য ঘোষণার জন্য বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। সুলতান মামুদ খলজী চারবার মেওয়ার আক্রমণ করেছিলেন। এইসব আক্রমণের ফলে তিনি একমাত্র আজমীর ছাড়া অন্য কোন স্থান দখল করতে সক্ষম হন নাই। এই সকল সংঘর্ষের সময় মালবের সুলতান বহুক্ষেত্রে রাজপুত রানার হস্তে পরাজিত হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুলতান মামুদ খলজী বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের মারফতে মালবের রাজ্যসীমা দক্ষিণে সাতপুরা পর্বতমালা ও পশ্চিমে গুজরাটের সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন। পূর্বদিকে বুন্দেলখণ্ড এবং উত্তরে মেওয়ার ও বুন্দী পর্যন্ত সুলতান মামুদের রাজ্যবিস্তৃত হয়েছিল। মিশরের খলিফার কাছ থেকে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন এবং সে দেশের সুলতান আবু সৈয়দ তাঁর কাছে দূত প্রেরণ করেছিলন। ১৪৬৯ সালের পয়লা জুন সুলতান মামুদ খলজী মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলেন।

সুলতান মামুদ খলজী মালবের সর্বাধিক শক্তিশালী সুলতান ছিলেন এবং বহু অভিযানে

www.pathagar.com

ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মালবের রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃত হয়েছিল। অনবরত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তিনি একটি শক্তিশালী সরকারের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর উত্তরসূরীদের রাজত্বকালে নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে সকলপ্রকার পরিবর্তনের মুখেও এই শাসনব্যবস্থা বানচাল হয়নি। তিনি স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে বহু মন্দির ও ধর্মস্থান ধ্বংস হয়েছিল।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন (১৪৬৯-১৫০০ খ্রীঃ)

সুলতান মামুদ খলজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান গিয়াসউদ্দীন পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন আরোহণ করে ঘোষণা করেছিলেন যে, সকল প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করা ও জীবনের আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করাই হবে তাঁর নীতি। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন এবং সর্বক্ষণ প্রার্থনায় সময় অতিবাহিত করতেন। সুলতান মদ্যপান করতেন না এবং ইসলামে নিষিদ্ধ সর্বপ্রকার আহার গ্রহণে বিরত ছিলেন। শান্তিপ্রিয় হলেও তাঁর পুত্রদের মধ্যে কলহের জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দীনের ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীন সুলতান গিয়াসউদ্দীনকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেন। নাসিরউদ্দীন অতঃপর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান নাসিরউদ্দীন অত্যাচারী ও বিলাসী ছিলেন। তাঁর হারেমে অজস্র বেগম ছিল। তিনি মদ্যপান করে মত্ত অবস্থায় ১৫১০ সালে জলে ডুবে মারা যান।

সুলতান দ্বিতীয় মামুদশাহ (১৫১১-১৫৩১ খ্রীঃ)

সুলতান নাসিরউদ্দীনের দ্বিতীয় পুত্র দ্বিতীয় মামুদ শাহ উপাধি নিয়ে মালবের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। সুলতান দ্বিতীয় মামুদ শাহ চান্দেরীর শক্তিশালী রাজপুত প্রধান মেদিনী রায়কে তাঁর উজীর হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। মেদিনী রায়ের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত মুসলিম আমিররা গুজরাটের সুলতান দ্বিতীয় মুজাফর শাহকে মালব আক্রমণ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। এইসময় গুজরাটের সৈন্যবাহিনী মাণ্ডু দখল করেছিল। মাণ্ডুতে একদল অশ্বারোহী সৈন্য রেখে দ্বিতীয় মুজাফর শাহ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে মেদনী রায় মেওয়ারের রানা সঙ্গের সাহায্য প্রার্থী হয়েছিলেন। মেওয়ারের রানার সাহায্যে মেদিনী রায় সুলতান দ্বিতীয় মামুদ শাহকে পরাজিত করেন। এই সংঘর্ষে মালবের সুলতান রাজপুত বাহিনীর হস্তে পরাজিত ও বন্দী হয়েছিলেন এবং বন্দী দশায় তাঁকে চিতোরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। রানা সঙ্গ তাঁকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে মালবের সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু তৎসত্বেও মালব ও মেওয়ারের মধ্যে শত্রুতার অবসান হয়নি। সুলতান দ্বিতীয় মামুদ শাহ রানা সঙ্গের উত্তরাধিকারী রানা রতন সিংহের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। এই অভিযানে মালবের সৈন্য বাহিনী মেওয়ারের রাজপুত সৈন্যদের হাতে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হয়েছিল। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহর ভ্রাতা চাঁদ খানকে আশ্রয় দান করার জন্য সুলতান দ্বিতীয় মামুদ শাহর সঙ্গে গুজরাটের বিরোধ হয়। গুজরাটের সুলতানের বাহিনী মালব আক্রমণ করে সুলতান দ্বিতীয় মামুদ শাহকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেছিল। বন্দীদশায় সুলতান মামুদ ও তাঁর পুত্র চাম্পানেরে প্রেরিত হয়েছিলেন। পথে বন্দীরা পলায়নের প্রচেষ্টা করলে গুজরাটের সৈন্যদের হাতে সুলতান দ্বিতীয় মামুদ শাহ এবং তাঁর পুত্র নিহত হন। এইভাবে ১৫৩১ সালের মার্চ মাসে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ মালব দখল করেছিলেন।

মুঘল সম্রাট হুমায়ুন মালব থেকে গুজরাটের প্রাধান্যের অবসান করে মালবকে সাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত করেন। শেরশাহর আমলে মালব সুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সুজাৎ খান এই স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সুজাৎখানের পর তাঁর পুত্র বাজ বাহাদুর মালবের

www.pathagar.com

শাসনকর্তার পদলাভ করেছিলেন। শেরশাহর উত্তরসূরী ইসলাম শাহর মৃত্যুর পর যে বিশৃংখলা দেখা দেয় সেই সুযোগে বাহাদুর শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৬২ সালে মুঘল সম্রাট আকবর মালব দখল করে এই স্থানকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

কাশ্মীরের-হিন্দু রাজবংশ

কাশ্মীরের রাজ্যটি মহম্মদ বিন কাশিম ও অন্যান্য আরব আক্রমণকারীদের আগ্রাসন ও মামুদ গজনীর হামলা থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দুরাজাদের অধীনে কার্যলাভের আশায় বহু মুসলমান বহিরাগতের আগমন হয়। এইসব মুসলমান বহিরাগতদের মধ্যে শাহ মীরের নাম উল্লেখযোগ্য। শাহ মীরের আগমনের সাতবছর পরে ১৩২০ সালে মোঙ্গল আক্রমণকারী দালুচার বিধ্বংসী আগ্রাসনে কাশ্মীরের হিন্দুরাজ্যের ভিত্তি দূর্বল হয়ে গিয়েছিল। কাশ্মীরের গ্রাম ও নগরের উপর মোঙ্গলদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও ধ্বংস লীলায় হিন্দু রাজারা কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে কাশ্মীরের সাধারণ লোকের হিন্দু রাজবংশের প্রতি আনুগত্য শিথিল হয়ে গিয়েছিল। মোঙ্গলরা যখন পূর্বদিক থেকে কাশ্মীরে হামলা শুরু করে সেই সময় উত্তর দিক থেকে রিঞ্চন নামে একজন তিব্বতী বৌদ্ধরাজপুত্র ও অভিযাত্রী কাশ্মীরের উপর প্রাধান্য স্থাপনে তৎপর হয়েছিলেন। রিঞ্চন কাশ্মীরের হিন্দুরাজা সুহদেবের প্রধান সেনাপতির সহযোগী ছিলেন এবং মোঙ্গলদের কাশ্মীর ত্যাগের পর রাজা সুহদেবের কাছ থেকে ১৩২০ সালে কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করেন। রিঞ্চন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সদরউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। ১৩২৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই সময় হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু শাহ মীর ও তাঁর অনুচররা দ্বিতীয় মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। শেষোক্ত বক্তব্য অনেকে অনৈতিহাসিক বলে বাতিল করে দিয়েছেন। শাহ মীর হিন্দুরানী কোটা দেবীর কাছ থেকে ১৩৩৯ বা ১৩৪৬ সালে কাশ্মীর দখল করেন এবং শামসউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি কোটা দেবীকে বিবাহ করেছিলেন।*

কাশ্মীরের প্রথম সুলতান শামসউদ্দীন

সুলতান শামসউদ্দীন নিজের নামে খুতবা নাঠ করেছিলেন। তিনি যে সুলতান বংশ স্থাপন করেন তা মীর সুলতান বংশ নামে খ্যাত। শামসউদ্দীন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদয়ের অভিজাতদের ইকতা দান করতেন। তিনি ভুমি রাজস্বর মোট উৎপাদনের শতকরা ১৭ ভাগ নির্দিষ্ট করেছিলেন ও বিভিন্ন ধরনের কর ও শুল্ক বাতিল করে দিয়েছিলেন। সুলতান শামসউদ্দীন ১৩৪৯ সালে মৃত্যু মুখে পতিত হন। শাহ মীরের বংশধররা ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেছিলেন।**

শাহ মীরের পুত্রদের মধ্যে একজন সুলতান আলাউদ্দীন (১৩৪৩-৫৪) কাশ্মীরের রাজধানী ইন্দ্রকোট থেকেআলাউদ্দীন পুর (শ্রীনগরে) স্থানান্তরিত করেছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীনের উত্তরসূরী সুলতান শিহাবউদ্দীন অভিযান প্রিয় ছিলেন। তিনি পোখলী আক্রমণ করে পদানত করেছিলেন ও গিলগিটে অভিযান করেছিলেন এবং কাশগড়ী মোঙ্গলদের পরাজিত করেছিলেন।

---

* Wonder that was India, vol-II, পৃঃ ৬২ দ্রষ্টব্য। রিজভীর ভাষায় 'Rinchana's conversion may be dismissed as stock in trade legends attributed to ionnumerable conversions'.

** Advanced History of India (MacMillan) মতে -"The Chronology of the Mahammadan Sultans of Kashmir is rather bewillderмg and the dates of the reigns have to be regarded as being approximate." পৃঃ ৩৬৩ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

তাঁর সৈন্যবাহিনী লাদাকে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং কিশটওয়ার অঞ্চল থেকে জম্মু পর্যন্ত এলাকা পদানত করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সুলতান কুতুবউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করে পুঞ্চ অঞ্চল দখল করেন। কুতুবউদ্দীনের পুত্র সুলতান সিকন্দর তৈমুরের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ ও সম্প্রীতি স্থাপনের মারফতে আক্রমণকারীর হাত থেকে স্বীয় রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করেছিলেন। তিনি বহিরাগত ইরান, ট্রান্সঅক্সিয়ানা ও মেসোপটেমিয়া থেকে আলম ও শেখদের স্বীয় রাজ্যে আমন্ত্রণ করেন এবং তাঁর উদারহস্তে দান ধ্যানের ফলে তারা দলে দলে কাশ্মীর উপত্যকায় উপস্থিত হয়েছিল। তিনি মন্দির ও মূর্ত্তি ভঙ্গ করে ও ধর্মান্তকরণে উৎসাহ দান করে স্বীয় রাজ্যে ইসলাম ধর্মের প্রসারে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রী সুহাভট্ট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সমগ্র রাজ্যে এই ধর্ম প্রচার করার জন্য জোরজবরদস্তি ও অত্যাচার শুরু করেছিলেন। ফলে যে সব ব্রাহ্মণ স্বধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকৃত হন তাঁদের দুর্দশা বৃদ্ধি পায় ও তাঁদের অনেকে স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মভয়াবহ জ্ঞানে এমনকি জীবনদান পর্যন্ত করেছিলেন।

জৈনউল আবেদিন (১৪২০-১৪৭০ খ্রীঃ)

সুলতান জৈনউল আবেদিন ছিলেন কাশ্মীরের অষ্টম সুলতান। সুলতান সিকন্দরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলি শাহ ১৪১৬ সালে সিংহাসন লাভ করেছিলেন। তাঁর ভ্রাতা শাহী খান ১৪২০ সালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে জৈনউল আবেদিন উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তিনি সিকন্দরের উগ্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে উদার ও পরধর্মসহিষ্ণু নীতির অনুসরন করেছিলেন।

জৈনউল আবেদিন রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা পুনঃস্থাপন করেছিলেন। তাঁর আমলে চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছিল। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে শান্তি বজায় রাখার জন্য দায়ী করে সুলতান দেশে আইন ভঙ্গের হার হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রজাদের উপর আর্থিক চাপ কমানোর জন্য সুলতান পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, করভার লাঘব এবং যে নিকৃষ্ট মুদ্রা চালু করবার ফলে তাঁর পূর্বসূরীদের আমলে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল তা বাতিল করেছিলেন। যেসব ব্রাহ্মণ ধর্মদ্বেষের জন্য ইতিপূর্বে কাশ্মীর ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, জৈনউল আবেদিনের উদার ও সর্বধর্মের প্রতি সহিষ্ণু নীতির ফলে তাঁরা প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি জিজিয়া আদায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন, নিরামিষাশী ছিলেন, গোহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন ও জিজিয়া অবলুপ্ত করেছিলেন। সুলতান সাহিত্য, চিত্রকলা ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সংস্কৃত, আরবী ও অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মহাভারতের ও কলহণের রাজতরঙ্গিণী পারসিক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

কাশ্মীরের জনগণের আর্থিক মান উন্নয়নকল্পে সুলতান জৈনউল আবেদিনের প্রচেষ্টায় রাজ্যে সেচব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল ও যোগাযোগের উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সেতু নির্মিত হয়েছিল। কারিগরি বিদ্যায় কাশ্মীরীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুলতান পাথরকাটা ও পালিশ করা, বোতল তৈয়ারী করা, স্বর্ণকারের কাজ ইত্যাদিতেউৎসাহ দান করেছিলেন। বই বাঁধাই ও কাগজ উৎপাদন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য সুলতান দুই ব্যক্তিকে সমরকন্দ প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সম্ভবত তিব্বত থেকে শাল তৈরীর পদ্ধতি কাশ্মীরে আমদানী করতে সহায়তা করেন। বন্দুক তৈয়ারী ও বাজি উৎপাদনের কারখানা এইসময় কাশ্মীরে শুরু হয়েছিল। স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। ওলুর হ্রদের বুকে দ্বীপের ন্যায় প্রাসাদ ও মসজিদ এই সময়কার স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম। জৈনউল আবেদিন মহৎ সুলতান (বুধ-শাহ) নামে পরিচিত। তিনি লাদাকে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন, বালটিস্থান অঞ্চল পদানত করেন ও জম্মু, রাজৌরি এবং কাশ্মীরের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সুনাম সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল। ভারত ও

www.pathagar.com

এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক ও অধিবাসীরা তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। ১৪৭০ সালের নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে সুলতান জৈনউল আবেদিন লোকান্তরিত। তাঁরপুত্র হায়দার শাহ্ কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কাশ্মীরের পরবর্তী সুলতানগণ

কাশ্মীরের পরবর্তী কালের ইতিহাসে জৈনউল আবেদিনের উত্তরসূরীদের রাজত্বকাল গুরুত্বপূর্ণ নয়। মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের একজন নিকট আত্মীয় মির্জা হাইদার প্রায় ১১ বৎসর কাল (১৫৪১-৫১) কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করেছিলেন। তিনি নামে মুঘল সম্রাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেও কার্যতঃ স্বাধীনভাবে কাশ্মীর শাসন করতেন। ১৫৫১ সালে তাঁর শাসনের অবসান করে কাশ্মীরের অভিজাতরা পূর্ববর্তী রাজবংশকে ক্ষমতায় আসীন করেছিলেন। তাঁরা যখন অভ্যন্তরীন কলহে লিপ্ত সেই সুযোগে চাকরা কাশ্মীরে একটি নতুন রাজবংশ স্থাপন করেছিল। কিন্তু তাতে এই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়নি। অবশেষে ১৫৮৬ সালে মুঘল সম্রাট আকবর কাশ্মীরের রাজ্যটি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

উত্তর-পূর্ব ভারত—জৌনপুর

বারাণসীর ৩৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে জৌনপুর শহর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের নামে স্থাপন করেছিলেন। ১৩৯৪ সাল পর্যন্ত জৌনপুর প্রাদেশিক সরকারের সদর দপ্তর ছিল। জৌনপুরের সুলতানী বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মালিক সারওয়ার। তিনি প্রথম জীবনে সুলতান ফিরোজের পুত্র সুলতান মহম্মদের ক্রীতদাস ছিলেন ও পরে দ্রুত পদোন্নতি করেন। ১৩৮৯ সালে তিনি খাজা জাহান উপাধি লাভ করেন এবং উজীর হিসাবে নিযুক্ত হন। তুঘলক বংশের সর্বশেষ সিংহাসনের অধিকারী সুলতান মামুদ তাঁকে মালিক উস্-শরক (বা পূর্বাঞ্চলের প্রধান) উপাধিতে ভূষিত করে জৌনপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। ১৩৯৪ সালে মালিক সারওয়ার যখন জৌনপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন পূর্বাঞ্চলে নানা বিদ্রোহের জন্য সুলতানী শাসন বিপন্ন হয়েছিল। নবনিযুক্ত শাসনকর্তা কেবলমাত্র অযোধ্যা, কনৌজ, সন্ডিলা, বাহারিচ, ডালামৌ ও বিহারে বিদ্রোহ দমন করেননি। তিনি অযোধ্যা ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় পশ্চিমে আলিগড় থেকে পূর্বে বিহার পর্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং বঙ্গদেশের শাসনকর্তাকে বাৎসরিক কর দিতে বাধ্য করেছিলেন। মালিক সারওয়ার জৌনপুরে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি নামে মাত্র দিল্লীর সুলতানের অধীন ছিলেন। তৈমুরের আক্রমণের সময় মালিক উস্-শরক দিল্লীর সুলতানকে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য কোন প্রকার সাহায্য প্রেরণ করেননি। ১৩৯৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

জৌনপুরের সিংহাসনে মালিক উস্-শরকের উত্তরসূরীরা শার্কী সুলতান নামে প্রায় এক শতক রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে জৌনপুরে একটি বিশেষ স্থাপত্য শৈলী গড়ে উঠেছিল। এখানকার প্রাসাদ, মসজিদ ও হর্মরাজির নির্মাণ কৌশলের সঙ্গে দিল্লী রীতির পার্থক্য সহজেই লক্ষ্যণীয়। জৌনপুরের স্থাপত্যে বিশাল দরওয়াজা ও সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ রীতির বৈশিষ্ট্য দর্শককে বিমুগ্ধ করে। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য জৌনপুরকে পূর্বদিকেব সিরাজ নামে অভিহিত করা হয়েছিল। কবি, সাহিত্যিক, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিরা জৌনপুরের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। পদ্মাবতের প্রখ্যাত হিন্দি লেখক মালিক মহম্মদ জয়িসী জৌনপুরের অধিবাসী ছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁরা দিল্লীর অধীশ্বর হবার উচ্চাকাংখা পোষণ করতেন। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে দিল্লীতে লোদী সুলতানরা ক্ষমতায় আসীন হওয়াতে এই স্বপ্ন সার্থক হয় নাই। ১৪৮৪ সালে বহলুল লোদী জৌনপুর দখল করাতে শার্কী সুলতান হুসেন শাহ স্বীয় রাজ্য থেকে

www.pathagar.com

নির্বাসিত হয়ে বহুকাল চুনারে বসবাস শুরু করেছিলেন এবং স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে বঙ্গদেশের সুলতানের আশ্রয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সুলতান মুবারক শাহ (১৩৯৯-১৪০১ খ্রীঃ) ও সুলতান ইব্রাহিম শাহ (১৪০১-১৪৪০ খ্রীঃ)

মালিক সারওয়ারের উত্তরাধিকারী ও তাঁর পোষ্যপুত্র সুলতান মুবারক শাহ স্বীয় নামে মুদ্রার প্রবর্তন করেন ও খুতবা পাঠ করান। দিল্লীর সুলতান মামুদ তুঘলকের উজীর ইকবাল খান এইজন্য তার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু উভয় পক্ষই অবশেষে বিনাযুদ্ধে শান্তিস্থাপনে সম্মত হন। ১৪০১ সালে সুলতান মুবারক শাহর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম শাহ শার্কী (১৪০১-১৪৪০খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে জৌনপুর ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল। তাঁর রাজত্বকালে জৌনপুরের দরবার জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই সময় ফতোয়-ই-ইব্রাহিম শাহী, হাশিয়াহ-ই-হিন্দি, বাহর-উল-মারওয়াজ, এরশাদ ইত্যাদি আইন সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ রচিত হয়। সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য জৌনপুরের নাম সুপ্রসিদ্ধ এবং এই পৃষ্ঠপোষকতার অন্যতম ফলশ্রুতি হচ্ছে তৎকালীন যুগের সংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক সংগীত শিরোমণি এই সময় লেখা হয়েছিল। জৌনপুর স্থাপত্যের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠকীর্তিও এইসময়কার অবদান। এই সব স্থাপত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল অটলা মসজিদ।

সুলতান মামুদ তুঘলক, ইব্রাহিমের রাজত্বকালে, মাল্লু ইকবালের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবার জন্য জৌনপুরের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় মামুদ তুঘলক কনৌজ দখল করেছিলেন। পরবর্তীকালে খিজির খান দিল্লী দখল করার পর সুলতান ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। সুলতান মামুদ তুঘলকের ১৪০৭ সালে কনৌজ থেকে বিতাড়িত করার পর ঐস্থানে পুনরায় জৌনপুরের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ইব্রাহিমের দিল্লী দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সুলতান ইব্রাহিমের বৈদেশিক নীতি ছিল আগ্রাসী। তিনি রাজা গণেশের আমলে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বঙ্গ বিজয়ের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। সুলতান কালপী দখলের প্রচেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এই দুইটি স্থান মালবের সুলতান হুসেন ঘুরী কর্তৃক অধিকৃত হয়। তিনি দিল্লীর সৈয়দ সুলতান মহম্মদ শাহকে (১৪৩৫-১৪৪৬ খ্রীঃ) যুদ্ধে পরাজিত করে স্বীয় পুত্রের সঙ্গে দিল্লীর সুলতানের কন্যার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

সুলতান মামুদ শাহ ও সুলতান মহম্মদ শাহ

সুলতান ইব্রাহিম ১৪৩৬ সালে মতান্তর ১৪৪০ সালে মৃত্যু মুখে পতিত হলে মামুদ শাহ জৌনপুরের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। তিনি চুনার দখল করেছিলেন কিন্তু কালপী ও দিল্লী আক্রমণ করে এই দুইটি স্থান অধিকার করতে বৃথা প্রচেষ্টায় অর্থ ও সৈন্যবলের অপচয় করেছিলেন। মামুদ শাহ ১৪৫৭ সালে মৃত্যু মুখে পতিত হলে তাঁর পুত্র সুলতান মহম্মদ শাহ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। সুলতান মহম্মদ শাহ তাঁর সিংহাসন নিষ্কন্টক করার জন্য স্বীয় ভ্রাতা হাসানের প্রাণদন্ড দিয়েছিলেন এবং অন্যান্য ভ্রাতাদেরও হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে আমির ওমরাহ এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তাঁর ভ্রাতা হুসেন এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ভ্রাতা হুসেন ও আমির ওমরাহদের সঙ্গে বিরোধের ফলে তিনি অবশেষে নিহত হয়েছিলেন।

সুলতান হুসেন শাহ শার্কী বহলুল লোদীর সঙ্গে চার বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি করে সৈন্যবাহিনী সুসংগঠিত করেছিলেন। তিনি উড়িষ্যা ও গোয়ালিয়রকে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। তাঁর রাজত্বকালে জৌনপুর ও দিল্লীর মধ্যে পুনরায় বিরোধ শুরু হয় এবং বহলুল লোদী

www.pathagar.com

সুলতান হুসেন শাহ্ শার্কীকে বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। সুলতান বহ্‌লুল লোদী সমগ্র জৌনপুর পদানত করেন এবং স্বীয় পুত্র বরবক শাহকে জৌনপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হুসেন শাহ্ বিহার থেকে নানা ধরনের প্ররোচনা দিয়ে জৌনপুরের জমিদারদের বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাতে থাকেন ও জৌনপুরের শান্তি বিঘ্নিত করেন। বহ্‌লুল লোদীর উত্তরসূরী সুলতান সিকন্দর লোদী এইজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জৌনপুরের রাজ্যটি স্থায়ী ভাবে দিল্লীর সুলতানের অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত করেছিলেন। ১৪৯৮ সালে হুসেন শাহ্ বেনারসের নিকট একটি যুদ্ধে সিকন্দর লোদীর হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে বঙ্গদেশের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং বিহারের দুর্গ লোদী সুলতান কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। সিকন্দর লোদী মাত্র ছয়মাস জৌনপুরে ছিলেন। তিনি মসজিদগুলি ব্যতীত জৌনপুরের স্থাপত্যের প্রায় সকল নমুনা ও সৌধগুলি ভেঙ্গে ফেলেন। ১৫০৫ সালে সুলতান হুসেন শাহর মৃত্যু হয়।

জৌনপুরের সুলতানদের অধীনে তাঁদের হিন্দু ও মুসলমান প্রজা নির্বিশেষে সকলেই সুখ ও সমৃদ্ধিতে বাস করত। লোদী সুলতানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শার্কীরা তাঁদের হিন্দু প্রজাদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। রিজভীর মতে, "This short lived kingdom surpassed others in helping the cause of cultural synthesis and social rapprochement."*

কামরূপ ও আসাম

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা কতকগুলি স্বাধীন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সুবর্ণগিরি ও দিসাঙের পূর্বে বোড়ো ও শান জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট চুটিয়া জাতিগোষ্ঠীর রাজারা প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন। আরো দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্বের একটি অঞ্চল বোড়ো জাতি-গোষ্ঠীদের অধীন ছিল। পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে কাছারি রাজ্য নওগাঁ জিলার অর্ধাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। পশ্চিম প্রান্তে কামরূপ রাজ্যটির পশ্চিম সীমানায় ছিল করতোয়া নদী ও পূর্ব সীমানা অনবরত যুদ্ধবিগ্রহের দরুণ পরিবর্তনশীল হয়ে পড়েছিল। এই রাজ্যটি কামতা রাজ্য নামে সুপরিচিত হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকে শান জাতিগোষ্ঠীর একটি অংশ অহোমরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে এবং কামতা রাজ্যের পূর্বদিকে প্রাসারের পথে বাধার সৃষ্টি করে। আহোমদের পশ্চিমের প্রতিবেশী গৌড়ের সুলতানদের সঙ্গে তাদের বারংবার সংঘর্ষ হয়েছিল। যার ফলে ভাগ্যদেবী কখনও অহোম রাজাদের কখনও গৌড়ের সুলতানদের প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েছিলেন। গোয়ালপাড়া ও কামরূপ এই দুইটি জিলায় কতকগুলি ছোট ছোট স্বাধীন ও শক্তিশালী স্থানীয় প্রধান ছিলেন যাদের ভুঁইয়া বলে অভিহিত করা হত।

পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে কামতায় খেনস জাতিগোষ্ঠী কামতাপুরে (আধুনিক কুচবিহারের কয়েক মাইল দক্ষিণে) রাজধানী স্থাপন করেছিল। খেন রাজবংশ প্রায় পঁচাত্তর বৎসর রাজত্ব করে। এই বংশের সর্বশেষ নৃপতি নীলাম্বরকে গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে পরাজিত করে কামতা রাজ্যের বরানদী পর্যন্ত স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

১৫১৫ সালে কোচজাতিগোষ্ঠীর প্রধান বিশ্বসিংহ কোচবিহারে (আধুনিক কুচবিহার) রাজধানী স্থাপন করে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই কোচরা মোঙ্গল জাতিসম্ভূত। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন বিশ্ব সিংহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী নরণারায়ন। তাঁর রাজত্বকালে কামতা ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল ও এইরাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান হয়েছিল। কিন্তু ১৫৮১ সালে তিনি রাজ্যের অংশবিশেষ সানকোশী নদীর পূর্বতীরের অঞ্চল স্বীয়

---

* The Wonder that was India, vol. II পৃঃ ৬৫।

www.pathagar.com

ভ্রাতুষ্পুত্র রঘু দেবকে হস্তান্তরিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার ফলে কোচবিহার রাজ্যটি দ্বিধাবিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই রাজ্যের একাংশকে কোচবিহার ও অপরঅংশকে কোচহাজো নামে অভিহিত করা হত এবং এদের পারস্পরিক বিরোধের ফলে অহোম ও তুর্কী আক্রমণকারীদের আগ্রাসনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ১৬৩৯ সালে অবিভক্ত কোচবিহার রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল মুসলমানদের অধীনস্থ হয় এবং পূর্বাঞ্চলে অহোমদের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

শান জাতিগোষ্ঠীর শাখা অহোমরা খ্রীষ্টীয় ১২১৫ সাল নাগাদ আসামে অনুপ্রবেশ করে ধীরে ধীরে একটি রাজ্যের পত্তন করেছিল। এই রাজ্যটি ছয়শতাব্দী কাল স্থায়ী হয়। তারা কামরূপ ও গৌড়ের সুলতানদের পূর্বদিকে প্রসারের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু কামরূপের উপর প্রাধান্য বিস্তারের পর গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহর সৈন্যবাহিনী রাজা সুহেনফার সময় অহোম আক্রমণ করেছিল। এই অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এর পরে অহোম রাজ্যের উপর যে সব ছোটখাট অভিযান বঙ্গদেশ থেকে প্রেরিত হয়েছিল সেগুলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। অতএব ষোড়শ শতকের ত্রিশ দশক পর্যন্ত বঙ্গদেশ থেকে অহোম রাজ্য জয় করার সকল প্রচেষ্টাই বিফল হয়েছিল।

উড়িষ্যা

গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজ্যটি সুসংহত করেছিলেন রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ (১০৭৬-১১৪৮ খ্রীঃ)। তাঁর প্রায় সত্তর বছরের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ কেবলমাত্র রাজ্যবিস্তার করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি ধর্ম-সাহিত্য ও স্থাপত্যকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁর সময় সংস্কৃত ও তামিল সাহিত্যের উন্নতি হয়। পুরীর প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মন্দির অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। রাজা অন্ততবর্মন চোড়গঙ্গের যোগ্য উত্তরসূরীদ্বয় রাজা প্রথম নরসিংহ (১২৩৮-৬৪ খ্রীঃ) ও রাজা দ্বিতীয় নরসিংহ (১২৭৯-১৩০৬ খ্রীঃ) তুর্কী আক্রমণকারীদের হাত থেকে সাফল্যের সঙ্গে উড়িষ্যার রাজ্যসীমাকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন।

রাজা দ্বিতীয় নরসিংহের পুত্র রাজা দ্বিতীয় ভানুদেব গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের পুত্র উলুঘ খানের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। ১৩২৫ সালে দ্বিতীয় ভানুদেবের পুত্র তৃতীয় নরসিংহ ও তারপরে তৃতীয় ভানুদেব সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। শেষোক্ত নৃপতির রাজত্বকালে গৌড়ের সুলতান ইলিয়াস শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করে বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করেছিলেন। এই আক্রমণের পর পরই দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক উড়িষ্যা আক্রমণ করে লুণ্ঠন করেছিলন। তিনি জগন্নাথের মন্দির ধ্বংস করেন। কোন্ডাভিড়ুর রেড্ডি নৃপতি অনাবাটা (১৩৫৫-৬৪ খ্রীঃ) ও তাঁর উত্তরাধিকারী উড়িষ্যার দুর্বলতার সুযোগে এই রাজ্যটি আক্রমণ করে উড়িষ্যার একাংশ স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় ভানুদেবের উত্তরসূরী রাজা চতুর্থ নরসিংহ বিজিত রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করেন। ১৪১৪ সালে রাজা চতুর্থ ভানুদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। সুলতান হুসেঙ শাহ রাজা চতুর্থ ভানুদেবকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে মালবে নিয়ে যান। বন্দীদশা থেকে উদ্ধার লাভ করে তিনি পুনরায় সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ১৪৩৪-৩৫ সালে রাজা চতুর্থ ভানুদেব একটি প্রাসাদ বিপ্লবের ফলে রাজ্য হারান।

রাজা কপিলেন্দ্র (১৪৩৪-৭০ খ্রীঃ) ১৪৩৪ সালে গাঙ্গ বংশের স্থলে উড়িষ্যায় গজপতি বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজা কপিলেন্দ্র দীর্ঘকাল যোগ্যতা ও দক্ষতা সহকারে শাসন পরিচালনা করেছিলেন। তিনি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাহমনি ও বিজয়নগরের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন ও উড়িষ্যার সীমা উত্তরে গঙ্গা থেকে দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন।

www.pathagar.com

পরবর্তী শাসক পুরুষোত্তমের (১৪৭০-৯৭ খ্রীঃ) শাসনকালে রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয় এবং গোদাবরীর দক্ষিণে সকল স্থানের উপর উড়িষ্যার রাজারা অধিকার হারান। পুরুষোত্তমের উত্তরাধিকারী প্রতাপরুদ্রর (১৪৯৭-১৫৪০) রাজত্বকালে শেষোক্ত অঞ্চল একটি সন্ধির মারফতে বিজয়নগরের রাজাকে স্থায়ীভাবে হস্তান্তরিত করা হয়। তিনি শ্রীচৈতন্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ১৫২২ সালে গোলকুণ্ডার সুলতান উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন। প্রতাপরুদ্র গোলকুণ্ডার সুলতানের সঙ্গে অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৫৪১-৪২ সালে গজপতি বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে গোবিন্দ নামে ভোই বা লেখক জাতির এক ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। এই ভোই বংশের রাজারা ১৫৫৯ সাল পর্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করেছিলেন। ১৫৫৯ সালে মুকুন্দ হরিচন্দন উড়িষ্যার সিংহাসন দখল করে মুসলমান আক্রমণ থেকে স্বীয় রাজ্য রক্ষায় তৎপর হয়েছিলেন। ১৫৬৮ সালে মুকুন্দ হরিচন্দন মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইসময় মুঘলরা ও বঙ্গদেশের কররাণী সুলতানরা উড়িষ্যা দখলের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। ১৫৬৮ সালে বঙ্গদেশের সুলতান সুলেমান কররাণী উড়িষ্যা জয় করে স্বীয় রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। কররাণী সুলতানদের ধর্মান্তরিত সেনাপতি কালাপাহাড় এই সময় পুরীর জগন্নাথ মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসের প্রয়াস করেছিলেন। এই সময় উড়িষ্যা মুঘল আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্র হয়েছিল।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

সুলতানী যুগের বাংলা

বখতিয়ার খলজী কর্তৃক সেন রাজ্য দখল

ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বখতিয়ার খলজী ছিলেন মধ্যএশিয়ার একজন যোদ্ধা ও অভিযাত্রী। তিনি কুতুবউদ্দীন আইবাকের দরবারে অন্যান্য বহু সামরিক অভিযাত্রীর মতোই সৈন্যদলে যোগদান করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু এইখানে আশাভঙ্গের দরুণ তিনি প্রথমে মালিক সিপাহীসালার হিজারউদ্দীনের অধীনে নগদ বেতনে বাদায়ুনে ও পরে অযোধ্যার মালিক হিসামউদ্দীনের কাছে জায়গীর হিসাবে ২টি পরগনা, বর্তমান মির্জাপুরের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলে, লাভ করেছিলেন।

এই সামান্য জায়গীর ও আশেপাশে অঞ্চলের উপর লুটপাট করে বখতিয়ার অবশেষে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কর্মনাশার তীরবর্তী ও তার পূর্বদিকে অবস্থিত মগধ অঞ্চলে লুণ্ঠন শুরু করেন। এই ভাবে বখতিয়ার খলজী বিহারের দিকে যখন প্রায় বৎসরাধিক কাল তাঁর অনুচরদের নিয়ে অবাধে লুটপাটে ব্যাপৃত তখন কিন্তু সেনরাজারা এই সকল ঘটনার প্রতিরোধের জন্য কোন বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। ফলে তুর্কী অভিযাত্রীদের শক্তি, অর্থবল উদ্যম ও দুঃসাহস ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। মহম্মদ বখতিয়ার খলজী তৎপরতার সঙ্গে ওদন্তপুরী বিহারের উপর হামলা করে দখল করেছিলেন। এই বৌদ্ধ মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি সুরক্ষিত নগরী বলে অনুমান করেছিলেন। এখানকার অধিকাংশ মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ শ্রমণদের খলজীরা সৈন্য জ্ঞানে আক্রমণ করেন। পরে এই স্থানের নামানুসারে সমগ্র অঞ্চলের নাম হয় বিহার।

ওদন্তপুরী বিহার দখলের পর বখতিয়ার খলজী বাদায়ুনে দিল্লীর শাসক কুতুবউদ্দীন আইবাকের সঙ্গে সাক্ষাত করে স্বীয় সামর্থ ও শক্তিতে পূর্ব দিকে তুর্কী শাসন প্রসারে অনুমোদন গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর সম্ভবতঃ ১২০২ সালে মহম্মদ বখতিয়ার নদীয়া দখলে অগ্রসর হয়েছিলেন।

এইসময়ে বঙ্গদেশের শাসক ছিলেন সেনবংশের রাজা লক্ষ্মণ সেন। তুর্কী আক্রমণের সম্ভাবনায় নদীয়ার বহু নাগরিক স্থান ত্যাগ করেছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও বয়োবৃদ্ধ রাজা তাঁর রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র যাননি। কিন্তু তুর্কী আক্রমণ রুখবার জন্য সেনরাজারা যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেননি তার অন্যতম প্রমাণ হ'ল ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বখতিয়ার খলজী তাঁর মূল সৈন্যবাহিনী নিয়ে শহরে হানা দেবার আগে মাত্র ১৮জন অশ্বারোহীসহ নদীয়ার দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমানায় রাজমহলের কাছে তেলিয়াগড়হির সংকীর্ন পথে সাধারণতঃ উত্তর-পশ্চিম থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। এই পথের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় করার সময় সেনরাজারা দক্ষিণে ঝাড়খণ্ডের পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে তুর্কীদের আক্রমণের সম্ভবনা সম্পর্কে চিন্তা করেননি। ফলে শেষোক্ত পথেই সম্ভবতঃ তুর্কী অশ্বারোহীরা নদীয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

সমকালীন ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীনের লিখিত তবাকৎ-ই-নাসিরীতে বর্ণিত কাহিনী অনুসারে গ্রীষ্মের এক প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে বখতিয়ার ১৮জন সঙ্গীসহ তুর্কী অশ্বব্যবসায়ীর

www.pathagar.com

ছদ্মবেশে নদীয়ার জনশূন্য পথ দিয়ে যখন রাজপ্রাসাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিলেন তখন সকলেই তাঁদের নিরীহ বণিক বলে মনে করেছিল। রাজপ্রাসাদের প্রহরীদের উপর তারা অকস্মাৎ উন্মুক্ত তরবারী হাতে আক্রমণ করে। মিনহাজ বলেছেন যখন এই অশ্বারোহীরা রাজপ্রাসাদ দখলের জন্য হানা দিয়েছিল সেই সময় শহরের মধ্যস্থল থেকে প্রচণ্ড গোলমালের আওয়াজ উঠেছিল। স্যার যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন যে, এর অর্থ হল নদীয়ার উপর আক্রমণে কেবল একদল ১৯ জনের তুর্কী অশ্বারোহীই নয় অন্য তুর্কী সৈন্যরা যারা মূল আক্রমণকারী বাহিনীর সঙ্গে ছিল তারাও একই সময় অংশ গ্রহণ করছিল। রাজা লক্ষ্মণ সেন এই আক্রমণের ফলে বঙ্গে বা পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বখতিয়ার খলজীর রাজপ্রাসাদে হানা দেবার সময় লক্ষ্মণ সেন মধ্যাহ্নভোজে ব্যাপৃত ছিলেন। সদরে আর্তনাদ ও গোলমালের আওয়াজে বৃদ্ধ রাজা ব্যস্ত ও সন্ত্রস্থ হয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে পলায়ন করেন। মিনহাজের বিবৃত এই কাহিনীর সপক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য সূত্রের ভিত্তি নাই এবং সেইজন্য তাঁর বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। রাজা লক্ষ্মণ সেনের বীরত্বের কথা মিনহাজ উল্লেখ করেছেন। তিনি তুর্কী আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে সীমান্তে ও রাজধানী নদীয়াতে কোন সুরক্ষার ব্যবস্থা করেননি একথা বিশ্বাসের অযোগ্য। লক্ষ্মণ সেন যে তুর্কী আক্রমণের জন্য আতংকগ্রস্থ ছিলেন না তার অন্যতম প্রমাণ তিনি তাঁর অন্যান্য প্রজাদের পথ অনুসরণ করে নদীয়া ত্যাগ করেন নি এবং তুর্কী আক্রমণের দিন পর্যন্ত এইস্থানে ছিলেন। যে পরিস্থিতিতে তিনি নদীয়া ত্যাগ করেন তাতে রাজা লক্ষ্মণ সেনকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি ও তাঁর বংশধরগণ বহুকাল পূর্ববঙ্গে ও সম্ভবতঃ দক্ষিণবঙ্গেও রাজত্ব করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেন তাঁর রাজত্বের ২৭ বৎসরে অর্থাৎ নদীয়া জয়ের তিন বৎসর অতীত হলে ভাওয়াল পরগনায় (ঢাকা) ভূমিদান করেছিলেন। *

বখতিয়ার নদীয়া লুণ্ঠন করেছিলেন কিন্তু এইখানে তাঁর সরকার স্থায়ীভাবে স্থাপন করেননি। তিনি গৌড় বা লখনৌতি (লক্ষ্মণাবতী) অর্থাৎ সেনরাজাদের উত্তরবঙ্গের রাজধানী ও গঙ্গার তীরে অবস্থিত অঞ্চল দখল করেছিলেন এবং এইখান থেকে তিব্বত আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। এইভাবে বখতিয়ার খলজী প্রায় সমগ্র বারেন্দ্রর উপর তুর্কী প্রাধান্য স্থাপন করেন। পরের দুই বৎসর (১২০৩-১২০৫) তিনি অভ্যন্তরীণ শাসন সুসংগঠিত করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বখতিয়ার খলজী তাঁর অধীনস্থ সামরিক শাসকদের সহায়তায় একধরনের সামরিক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবিজয় তাঁর মনে যে উচ্চাকাংখার সৃষ্টি করেছিল তার তাড়নায় তিনি এক বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী সহ তিব্বত অভিযানের পরিকল্পনা করেন। ১২০৬ সালে তাঁর সৈন্যদল তিব্বতের সমতল ভূমিতে পদার্পন করে সংবাদ পেলেন যে তার বিরুদ্ধে প্রায় ৫০,০০০ তুর্কী অশ্বারোহী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। অতএব তিনি পরবর্তী বৎসর আরো সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ অভিযানে আসবেন বলে স্থির করেন ও প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। কিন্তু যে পথ দিয়ে তুর্কী অশ্বারোহীরা এসেছিল কামরূপের রাজা ও প্রজার বিরোধিতা ও বাধা দানের ফলে সে পথ দিয়ে আর তাদের ফেরা হল না। মাত্র শ'খানেক অনুচরসহ যখন শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অসুস্থ বখতিয়ার তাঁর রাজধানীতে ফিরলেন তখন আলিমর্দান নামে একজন অনুচর তাঁর জীবননাশ করেছিলেন (১২০৬)।

বঙ্গদেশে খলজীদের অনুপ্রবেশ ও দিল্লীর সঙ্গে এই প্রদেশের সম্পর্ক

খলজী বিজয়ের পূর্বে বঙ্গদেশে মোটামুটি ৫টি আঞ্চলিক বিভাগ ছিল। এই ৫টি অঞ্চল হল—(১) রাধা অর্থাৎ হুগলীর পশ্চিমে ও গঙ্গার দক্ষিণের এলাকা, (২) বাগদী বা গঙ্গা

---

* তবাকাৎ-ই-নাসিরী পৃঃ ১৫০-৫১; হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল ঢাকা (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃ-৭-৮ দ্রষ্টব্য। আধুনিক কালের কোন কোন লেখক স্যার যদুনাথের বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু তাঁরা এরজন্য কোন ঐতিহাসিক প্রমান পেশ করেন নাই। এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে রিজভী কোন যুক্তি পেশ করেননি 'Wonder that was India vol-II' পৃঃ ২১-২২।

www.pathagar.com

ও ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ; (৩) বঙ্গ অর্থাৎ এই ব-দ্বীপের পূর্বাঞ্চল ; (৪) বরেন্দ্র ভূমি ছিল পদ্মার উত্তরে অবস্থিত করোতোয়া ও মহানন্দ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল; এবং (৫) মিথিলায় বরেন্দ্র ভূমির দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, রাঢ়ার উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলি ও বাগদীর উত্তর-পশ্চিম দিকের জেলা সমূহ নিয়ে পঞ্চম অঞ্চলটি গঠিত হয়েছিল। বঙ্গের খলজী বিজয়ের পরবর্তী কালে দীর্ঘদিন তুর্কীদের অনুপ্রবেশ প্রধানতঃ এই এলাকায় নিবদ্ধ ছিল। রাজধানী লখনৌতি নাম থেকে এর নামকরণ হয়েছিল। পরবর্তীকালে লখনৌতির সীমার মধ্যে বঙ্গ ও রাঢ়ার পশ্চিমাঞ্চলের (যার মধ্যে ঝাড়খণ্ড বা ছোটনাগপুর অঞ্চল অর্ন্তভুক্ত) সংযুক্তিকরণ করা সম্ভব হয়েছিল।

বখতিয়ার খলজী অধিকৃত লখনৌতির সীমা উত্তরে আধুনিক পূর্নিয়া থেকে দেবকোট দিয়ে পূর্বে রংপুর (বাংলাদেশ) ও দক্ষিণ-পূর্বে তিস্তা এবং করোতোয়া দিয়ে একটি সরাসরি রেখা টেনে নির্দিষ্ট করা যেত। লখনৌতির দক্ষিণে ছিল গঙ্গা, এবং পশ্চিমে কোশীনদীর নিম্নভাগ থেকে গঙ্গার পারে রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহম্মদ বখতিয়ারের রাজ্যে সরকার লখনৌতি ছাড়া অন্যান্য যে ছয়টি সরকার ছিল তারা হ'ল টাণ্ডা, পূর্ণিয়া, পিঞ্জরা, তাজপুর, ঘোড়াঘাট ও বরবাকাবাদ। এই সরকারগুলির নাম তোডরমলের রাজস্ব তালিকায় সুবে বাংলার অন্তর্গত।

বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশ থেকে মির্জাপুর জেলার গঙ্গার দক্ষিণতীর ধরে রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত দক্ষিণ বিহারের বিস্তৃত অঞ্চলে মহম্মদ বখতিয়ারের প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। এছাড়া সম্ভবতঃ গঙ্গার উত্তরে নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে গণ্ডকের মোহনা থেকে কোশী পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

বঙ্গদেশের সঙ্গে দিল্লী ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সম্পর্ক এবং স্বাধীন সুলতানী শাসনের প্রতিষ্ঠা

বঙ্গদেশের সঙ্গে দিল্লী ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের সম্পর্ক পর্যালোচনার সূত্রে এই অঞ্চলের ভূগোল কিভাবে বঙ্গদেশে তুর্কী অনুপ্রবেশ ও প্রসারে সহায়তা করেছিল তা জানা প্রয়োজন। গঙ্গার উভয় তীরে অবস্থিত এলাকা মিথিলা বা ত্রিহুত বা দক্ষিণ বিহারে প্রাকৃতিক বিভাজ্য রেখার উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে বঙ্গদেশের শাসকরা উত্তরভারতের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এইজন্য সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভাগলপুর, মুঙ্গের এবং বিহার শরীফ (দক্ষিণ-বিহার) সহ রাজমহল থেকে পাটনার বিস্তৃত অঞ্চল এবং উত্তর বিহারে গঙ্গা ও কোশীর সঙ্গমস্থলকে পূর্বদিকে রেখে পশ্চিমে ছাপড়া ও বালিয়া জেলা পর্যন্ত এলাকা যার চৌহদ্দীর মধ্যে গঙ্গা ও ঘর্ঘরার মিলন হয়েছে। রাজমহল পাহাড়ের নিকটবর্তী তেলিয়াগড়হির পথকে সুরক্ষিত করার জন্য এইখানে গঙ্গা বিধৌত অঞ্চল ও কোশীর পারাপারের এলাকায় মধ্যযুগের বঙ্গদেশের প্রতিরক্ষা গড়ার ঐতিহ্য ছিল। কারণ, পশ্চিম থেকে আগ্রাসনের জন্য সৈন্যবাহিনী গণ্ডক এবং কোশী সুবিধামত স্থানে পার হয়ে বঙ্গদেশে অনুপ্রবেশ করতে পারত। লখনৌতি এবং দিল্লীর সংযোগকারী প্রধান সড়ক দিয়ে দক্ষিণ বিহারের উপরিভাগ থেকে সংকীর্ণ তেলিয়াগড়হির পথ ও গঙ্গার শীর্ণ জলস্রোতের কাছে বঙ্গদেশের সীমা সুরক্ষিত করার সুবিধা ছিল। বখতিয়ার ও শের শাহর মতো আক্রমণকারীরা সম্ভবতঃ এইসত্য উপলব্ধি করে দিক পরিবর্তন করে ঝাড়খণ্ডের পথে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেছিলেন। বিহারে গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত ভূমিখণ্ড বঙ্গদেশের সামরিক প্রতিরক্ষার প্রাথমিক ধাপ বলে গণ্য হ'ত। এই অঞ্চল গঙ্গার জলবিধৌত উপত্যকার উপরিভাগস্থিত ত্রিহুতের উপর সামরিক দিক থেকে আগ্রাসনের সুবিধাজনক স্থান।

www.pathagar.com

বঙ্গদেশের শাসকরা এই কারণে বিহারের উত্তরাঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। গিয়াসউদ্দীন আয়াজ খলজী পূর্ব বিহারে ভাগলপুর সহ বিস্তৃত এলাকাকে স্বীয় শাসনাধীনে রেখেছিলেন এবং এইখান থেকেই সম্ভবতঃ তিনি বিহারে ইলতুৎমিসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন বা ত্রিহুতে কর আদায়ের জন্য হামলা করেছিলেন। মুঙ্গের ও বিহার শরীফে প্রাপ্ত লিপি থেকে জানা যায় যে রুকনউদ্দীন কাইকায়ুস (১২৯১-১৩০১ খ্রীঃ) ও শামসউদ্দীন ফিরোজ (১৩০১-১৩২২ খ্রীঃ) বিহারের কোন কোন অংশে তাঁদের প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। ইলিয়াস শাহী সুলতানরা এবং বঙ্গদেশের হাবসী শাসকদের কেহ কেহ ভাগলপুরকে বঙ্গদেশের সুলতানী শাসনাধীন করেন এবং হুসেনশাহী বংশের সুলতানরাও এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন।

ত্রিহুতের পথে উত্তরবঙ্গে আগ্রাসন দক্ষিণ দিকের পথ অপেক্ষা সুবিধাজনক ছিল বলে বলবন, গিয়াসউদ্দীন তুঘলক, ফিরোজ তুঘলক ও বাবর সকলেই এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। অতএব মধ্যযুগের বাংলার দূরদর্শী শাসকরা এই দিক থেকে বিপদ সম্পর্কে সচেতন ভাবে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতেন এবং মধ্যযুগের ত্রিহুতের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা যায় দিল্লী ও জৌনপুরের শাসকরা এই স্থানে বঙ্গদেশের প্রভাব যাতে বৃদ্ধি না পায় তার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক এই স্থানকে দিল্লীর অধীন একটি প্রদেশ বা ইকলিমে পরিণত করেন এবং শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ ত্রিহুত জয় করে তাঁর রাজ্যের অধীন করেন। এইসময় উত্তরে নেপালের তরাই থেকে দক্ষিণে বেগুসরাই পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে ইলিয়াস শাহর প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। গঙ্গা ও গণ্ডকের গতিপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে হাজি ইলিয়াসের সময় হাজিপুর নগরের পত্তন করেন ও একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ত্রিহুতে ইলিয়াস শাহর সামরিক নিয়ন্ত্রণ থাকার দরুণ তাঁর নেপাল অভিযানের পথ প্রশস্ত হয়েছিল এবং অযোধ্যা ও বাহারিচ এবং বেনারস পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল। এই কারণে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের বঙ্গদেশে অভিযানের কালে ত্রিহুতে পুনরায় দিল্লীর প্রাধান্য স্থাপিত করেছিলেন। পরবর্তীকালের ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান বারবক শাহ ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিহুত দখল করে দক্ষিণাঞ্চলে সরাসরি ইলিয়াসশাহী শাসন স্থাপনের উদ্দেশ্যে হাজিপুরকে এই এলাকার সদরে পরিণত করেন। বুড়ী গণ্ডকের উত্তরের এলাকায় রাজা ধীর সিংহের শাসনাধীন করা হয় এবং নায়েব কেদার রায় তাঁর কাছ থেকে কর আদয়ের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে রাজার পুত্র বা মতান্তরে ভ্রাতা ভৈরব সিংহ নায়েবের উপর হামলা করার জন্য সুলতান বারবক শাহ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ত্রিহুতের এই অঞ্চলে পুনরায় সরাসরি সুলতানের শাসনাধীন হয়েছিল। হুসেন শাহী সুলতানদের আমলে ত্রিহুতের নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে নসরৎ শাহ ঘর্ঘরার অপরপারে আজমগড় ও খরিদ পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করেছিলেন। ঘর্ঘরা ও গণ্ডক নদীর মুখে তাঁর নিয়ন্ত্রণের জন্য নসরৎ শাহ বাবরকে বাধাদানের জন্য তৎপর হয়েছিলেন।

বঙ্গবিজয়ের প্রথমস্তরে তুর্কীদের রাজনৈতিক প্রাধান্য বঙ্গদেশের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় সীমিত ছিল এবং এই অঞ্চলেই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলি—দেবকোট, মাহিসন্তোষ ও লখনৌতি প্রভৃতি এই সীমারেখার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। তুর্কী শাসনের সূত্রপাতের এক শতকের মধ্যেই ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চলের উপর খলজীরা প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন এবং তুর্কী প্রাধান্য দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়েছিল। খলজীদের ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে ও চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে সাতগাঁও, পাণ্ডুয়া ও ত্রিবেনীতে স্থায়ী বসতি স্থাপনের প্রয়াসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উড়িষ্যার রাজাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসার রোধ করা ও তৎসহ গঙ্গার নদীবক্ষে বঙ্গদেশের নৌবাণিজ্যের স্বার্থ রক্ষা করা এবং সাতগাঁও বন্দরকে

www.pathagar.com

এই বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য সুরক্ষা দান করা। একই ধরণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সোনারগাঁও, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের উপর প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়োজন হয়েছিল। অহোম, ত্রিপুরা ও আরাকানের রাজাদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির মোকাবিলা করার জন্য বঙ্গদেশের তুর্কী শাসকরা আগ্রহী ছিলেন এবং বঙ্গোপসাগরের নৌবাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন ও মেঘনা-পদ্মার জলবাহিত বাণিজ্যে প্রধান্য বিস্তার তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল।

বঙ্গদেশে স্বাধীন সুলতানী শাসনের অভ্যুদয়

বারাণী বলেছেন যে, লখনৌতির লোকেরা বিদ্রোহের জন্য সুপরিচিত ছিল। এইজন্য লখনৌতিকে বুলঘাকপুর বা বিদ্রোহের শহর বলে অভিহিত করেছিলেন। তুর্কী বিজয়ের পর দিল্লী থেকে লখনৌতিতে প্রেরিত শাসনকর্তারা দিল্লীর দূরত্বের ও রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগের অসুবিধা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁরা জানতেন যে, লখনৌতি থেকে দিল্লী অনেক দূর।* লখনৌতির কোন শাসনকর্তার দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে অনীহা থাকলে, বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন স্থানীয় লোকেদের হাতে তিনি প্রাণ হারাতেন ও তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতেন। সাধারণতঃ লখনৌতির শাসকরা বিদ্রোহীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বহস্তে ক্ষমতা দখল করতেন ও স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন।**

লখনৌতির শাসকদের বারংবার বিদ্রোহ

জিয়াউদ্দীন বারানী তাঁর তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, অধিকাংশ লখনৌতির শাসকই দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারীর প্রতি নামে মাত্র আনুগত্য প্রকাশ করতেন। কার্যতঃ তাঁরা স্বাধীনভাবে অধীনস্থ এলাকায় প্রভুত্ব করেতেন। বঙ্গবিজয়ী বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মহম্মদ-ই-বখতিয়ার খলজীর কামরূপ ও তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতার পর ১২০৬ সালে তাঁর অনুচর আলিমর্দান খলজী কর্তৃক নিহত হন। এই আলিমর্দানই পরে সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।***

সুলতান আলাউদ্দীন তাঁর আত্মম্ভরিতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য আপামর প্রজাসাধারনের কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষ খলজী আমির ও মালিকরা তাঁকে হত্যা করে হিসামউদ্দীন আয়াজ খলজীকে লখনৌতির শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। হিসামউদ্দীন স্বাধীনতা ঘোষণা করে গিয়াসউদ্দীন আয়াজ খলজী নাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে ফরমান গ্রহণ করেন। গিয়াসউদ্দীন আয়াজ খলজী সম্পর্কে উল্লেখ করে ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেছেন যে, তিনি সকল প্রান্তের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বহু প্রাসাদোপম অট্টালিকা ও পথঘাট নির্মাণ করেছিলেন এবং তাঁর সময় লখনৌতির গুরুত্ব অভূতপূর্ব ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বভাবতঃ সুলতান ইলতুৎমিস তাঁর শক্তি খর্ব করার জন্য লখনৌতি অভিযান করেছিলেন। ফলে গিয়াসউদ্দীন দিল্লীর প্রতি মৌখিক ভাবে আনুগত্যে প্রকাশ করতে বাধ্য হন। কিন্তু ইলতুৎমিসের প্রত্যাবর্তনের পর গিয়াসউদ্দিন পুনরায় লখনৌতির স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এই সময় দিল্লী থেকে প্রেরিত সৈন্যবাহিনী ইলতুৎমিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা নাসিরউদ্দীনের অধীনে লখনৌতি অভিযান করে দখল করেছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দীন দিল্লীর

---

* দিল্লী হনুজ দূর অস্ত।

** জয়াউদ্দীন বারানী তারিখ-ই-ফিরোজাশাহী (বি-ই) পৃঃ ৮২ ।

*** আলিমর্দানকে মহম্মদ শিরাণ খলজী বিতাড়িত করেন। কিন্তু কুতুবউদ্দীন আইবাকের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি পুনরায় লখনৌতিতে ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী কোন শাসক লখনৌতির প্রভাবকে এতদূর প্রসারিত করতে সক্ষম হননি। লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার কিছুকাল পরেই শাহাজাদা নাসিরউদ্দীনের মৃত্যু হলে বঙ্গদেশে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। সুলতান ইলতুৎমিস এই বিদ্রোহ দমন করে মালিক সইফউদ্দীনকে লখনৌতিরে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

ইলতুৎমিসের দুর্বল বংশধরদের রাজত্বকালে লখনৌতির শাসকরা ইচ্ছামত ও স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করেছিলেন। ১২৫৩ সালে মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন উজুবেক-ই-তুঘরিল সুলতান মুঘিস উদ্দীন উপাধি গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি কামরূপ বিজয়ের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন। লখনৌতির বিশৃংখল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কারা ও অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক আরসেলান খান-ই সঞ্জুর এইসময় গৌড় দখল করেছিলেন। বঙ্গদেশের শাসকরা এইভাবে স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু মালিক আরসেলান খানের পুত্র তাতার খান, সুলতান বলবন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহনের পরে, লখনৌতির শাসক হিসাবে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন ও দিল্লীর সুলতানকে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিলেন। তাতার খানের মৃত্যুর পর তুঘরিল নামে একজন তুর্কী ক্রীতদাসকে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

তুঘরিল স্বল্পকালের মধ্যে সুলতান মুঘিসউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করে সুলতান বলবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন ও মসজিদে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা করেন। ১২৭৯ সালে এই বিদ্রোহের সংবাদ বলবনের কর্ণগোচর হলে তিনি অযোধ্যার শাসক আমিন খানকে তুঘরিলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু আমিন খানের বাহিনী ও পরে দিল্লী থেকে প্রেরিত অন্য দুই সামরিক অভিযান তুঘরিলের সৈন্যদের কাছে পরাজয় বরণ করেছিল। অতঃপর সুলতান বলবন স্বয়ং এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ লখনৌতির বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য অগ্রসর হন। সুলতানের আগমনের সংবাদে তুঘরিল লখনৌতি ত্যাগ করে জাজনগরের জংগলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় আকস্মিকভাবে মালিক শের-ই-আন্দাজ তুঘরিলকে নিহত করেন। ফলে লখনৌতিতে সহজেই পুনরায় দিল্লীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তুঘরিলের বিদ্রোহ দমন করার পর বলবন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

বুঘরা খাঁ ও তাঁর উত্তরসূরী

সুলতান বলবন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে লখনৌতির শাসনভার অর্পন কালে এই অশান্ত সুবা শাসনের জন্য কতকগুলি উপদেশ দান করেছিলেন। বলবনের মৃত্যুর পর বুঘরা খাঁ দিল্লীর সিংহাসনের থেকে বাংলায় রাজত্ব করাকে শ্রেয় মনে করেছিলেন। কাইকোবাদকে বিলাসলালসাময় জীবনযাপনের প্রচেষ্টা থেকে সংযত করতে বুঘরা খাঁ বা সুলতান নাসিরউদ্দীন ব্যর্থ হন। কিন্তু কাইকোবাদের অকাল ও দুঃখজনক মৃত্যুর সংবাদে বিচলিত হয়ে সুলতান নাসিরউদ্দীন সিংহাসন ত্যাগ করেন (১২৯১)। ফলে বুঘরা খাঁর উত্তরাধিকারী ও দ্বিতীয় পুত্র কাইকায়ুস ১২৯৮ সাল পর্যন্ত বঙ্গদেশে ও বিহারে রাজত্ব করেছিলেন। বিহারের শাসক শামসউদ্দীন ফিরোজ সম্ভবতঃ ১৩০১ সালে লখনৌতিতে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। ইবন বতুতার মতে তিনি বুঘরাখাঁর বংশধর। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজেকে সুলতানের পুত্র সুলতান (বা সুলতান বিন সুলতান) এই প্রচলিত উপাধিতে নিজেকে ভূষিত করেননি সেইজন্য এই তথ্য কতদূর সত্য তা বলা যায় না। কাইকায়ুস ও শামসউদ্দীন ফিরোজের সময় দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে তুর্কী শাসন প্রসারিত হয়েছিল এবং সাতগাঁও (হুগলী জেলা) ও সোনারগাঁও (ঢাকা জেলা) অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কিন্তু শামসউদ্দীন ফিরোজের রাজত্বকালে তাঁর পুত্রদের বিশেষতঃ গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের বিদ্রোহের ফলে অশান্তিপূর্ণ ছিল। পিতার মৃত্যুর

www.pathagar.com

পর সম্ভবতঃ ১৩২২ সালে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ লখনৌতি ও সোনারগাঁও উভয়স্থানে নিজের প্রভুত্ত্ব কায়েম করেছিলেন।

১৩২৪ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক লখনৌতি ও বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে দিল্লীর শাসন পুনরায় কায়েম করার জন্য সসৈন্যে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহকে পরাজিত ও বন্দী করে সমগ্র সুবে বাংলাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এই তিনটি বিভাগ হল রাজধানী লখনৌতিকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ। শেষোক্ত দুই বিভাগের রাজধানী ছিল সোনারগাঁও ও সাতগাঁও। সিংহাসনে আরোহনের পর সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক বাহাদুর শাহকে মুক্তিদান করে সোনারগাঁও-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এইসময় মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর প্রিয়পাত্র বহরাম খানকে (বা তাতার খান) সোনারগাঁও-এর শাসনকর্তার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ পুনরায় সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে বহরাম খাঁর নেতৃত্বে সুলতানের অনুগত সৈন্যবাহিনী তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেছিল। বাহাদুর শাহর মৃত্যুর পর প্রায় দশ বৎসর বঙ্গদেশ দিল্লীর শাসনাধীনে একটি অনুগত সুবা রূপে পরিচিত ছিল। এইসময় কাদের খান, বহরাম খান ওরফে তাতার খান এবং ইজউদ্দীন ইয়াহিয়া যথাক্রমে লখনৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও-এর শাসনকর্তা ছিলেন।

হিজরী ৭৩৮ অব্দে, (১৩৩৭-৩৮ খ্রীঃ) বহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর সিলাহদার (অস্ত্রবাহক) ফকরউদ্দীন মুবারক শাহ সোনারগাঁও অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেছিলেন। ফকরউদ্দীনের বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘলকের নির্দেশে কারা, লখনৌতি ও সাতগাঁও-এর শাসকরা একটি সামরিক অভিযান করেছিলেন। এই সংযুক্ত অভিযানের ফলে ফকরউদ্দীন সোনারগাঁও থেকে বিতাড়িত হন এবং কাদের খান লখনৌতি ও সোনারগাঁও উভয় স্থানের শাসনভার লাভ করেছিলেন। কাদের খান তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সোনারগাঁও বিজয়ের ফলে প্রাপ্ত লুণ্ঠনের ভাগ দিতে অস্বীকৃত হলে তারা কাদের খানকে হত্যা করেছিল। এই সুযোগে ফকরউদ্দীন সোনারগাঁও পুনরায় দখল করেন এবং লখনৌতিতে কাদের খানের একজন কর্মচারী আলি মুবারক শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক এইসময় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহের জন্য এতদূর বিব্রত ছিলেন যে, তিনি বঙ্গদেশের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ফকরউদ্দীন এই পরিস্থিতির সুযোগে লখনৌতিতে প্রাধান্য বিস্তারের মানসে মুখলিস নামে একজন গোলামের নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। আলি মুবারকের সঙ্গে সংঘর্ষে মুখলিস নিহত হন। আলি মুবারক কিছুকাল দিল্লীর প্রতি মৌখিকভাবে বশ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন। অবশেষে ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিনি সুলতান আলাউদ্দীন আলি শাহ উপাধি নিয়ে উত্তরবঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে রাজধানী পাণ্ডুয়াতে স্থানান্তরিত করেন। ১৩৪৫ সালে শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ বা হাজি ইলিয়াস তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন।

ফকরউদ্দীন পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশ) ৭৫০ হিজরী (১৩৪৯-৫০) পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। ১৩৪৬ সালে মরোক্কোর ভ্রমণকারী ইবন বতুতা তাঁর রাজত্বে পদার্পণ করেছিলেন। ইবন বতুতার বিবরণে তৎকালীন বঙ্গদেশের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ফকর-উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইখতিয়ারউদ্দীন গাজি শাহ তিন বৎসরকাল পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। অবশেষে শামসউদ্দীন ইসিয়াস শাহ তাঁর রাজ্য জয় করেন।

www.pathagar.com

ইলিয়াস শাহী বংশ

শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহর লখনৌতির সিংহাসনে আরোহনের পর থেকে [অর্থাৎ হিজরী ৭৪৩ (১৩৪২ খ্রীঃ) অথবা মতান্তরে হিজরী ৭৪৬ (১৩৪৫-৪৬ খ্রীঃ)]* বঙ্গদেশের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল। শামসউদ্দীন ইলিয়াস স্বীয় উদ্যম ও দক্ষতায় বঙ্গদেশকে রাজনৈতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং বঙ্গের সীমানার বাইরেও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি ইখতিয়ারউদ্দীন গাজি শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁও দখল করেছিলেন (১৩৫২-৩ খ্রীঃ)।

সুলতান শামসউদ্দীন ত্রিহুতে অভিযান করেন। এই রাজ্যটি অভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং সহজেই বাংলার সুলতানের পদানত হয়। এইসময় ইলিয়াস হাজি তরাই অঞ্চলে অভিযান করে নেপালের কাঠমাণ্ডুতে সসৈন্যে উপস্থিত হয়ে স্বয়ম্ভুনাথের পবিত্র মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। নেপাল থেকে তিনি প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। ১৩৫০ সাল নাগাদ নেপালে ইলিয়াস হাজির এই অভিযানকে নেপালীরা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন বলে দাবি করেন। লুণ্ঠন ছাড়া এই অভিযানের কোন স্থায়ী ফলশ্রুতি হয়নি।

অতঃপর ইলিয়াস শাহর দৃষ্টি উড়িষ্যার দিকে আকর্ষিত হয়। উড়িষ্যার গাঙ্গবংশীয় রাজারা পশ্চিমবঙ্গে বারংবার আক্রমণ করেছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের অংশবিশেষ উড়িষ্যার পদানত হয়েছিল। সমকালীন উড়িষ্যার নৃপতি দ্বিতীয় ভানুদেব ছিলেন দুর্বল এবং ইলিয়াস শাহ তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সহজেই পরাজিত করে জাজনগর ও কটক পদানত করেছিলেন এবং চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। এই অভিযানে তিনি উড়িষ্যার ধর্মস্থান ও অন্যান্য অঞ্চল লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্ন আহরণ করেন এবং ৪৪টি হাতি সংগ্রহ করেন।

এইসময় সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহর বিরুদ্ধে দিল্লী থেকে সসৈন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন।

১৩৫১ সালে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের উত্তরাধিকারী হিসাবে ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি শামসউদ্দীন ইসিয়াস শাহ কর্তৃক বঙ্গদেশে একটি স্বাধীন রাজ্যস্থাপনকেস্বভাবতই সুচক্ষে দেখেন নাই। শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ বিভিন্ন সামরিক অভিযানের মারফতে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ঐক্যসাধন করেছিলেন। তাঁর ত্রিহুত ও নেপালে অভিযান এবং উড়িষ্যায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ প্রভৃতি দিল্লীর সুলতানের উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। ইলিয়াস শাহর ক্ষমতা খর্ব করবার জন্য সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক নব্বুই হাজার অশ্বারোহী, অজস্র পদাতিক এবং একহাজার নৌকার একটি বহর নিয়ে বঙ্গদেশের বিরুদ্ধে তাঁর সামরিক অভিযান শুরু করেছিলেন। সমকালীন লেখক শামসী সিরাজ আফিফ বলেছেন যে, ফিরোজের নৌবহরের অগ্রগতির পথে প্রতিটি নদীর বাঁকে বা সুবিধাজনক স্থানে বঙ্গদেশের নৌবাহিনী বাধার সৃষ্টি করেছিল। অবশেষে দিল্লীর সামরিক বাহিনী কোশী পার হয়ে পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হয়। ইলিয়াস তাঁর রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে পলায়ন করে এইসময় একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক পাণ্ডুয়া (মালদাহ জিলার ইংলিশ বাজার থেকে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত) দখল করে ইলিয়াস শাহকে রাজদ্রোহী বলে ঘোষণা করেছিলেন। বঙ্গদেশের অধিবাসীদের ইলিয়াস শাহর বিদ্রোহ দমনে দিল্লীর সুলতানের পতাকাতলে সমবেত হবার জন্য ফিরোজ শাহ তুঘলক আবেদন করেছিলেন।

অতঃপর সুলতান ফিরোজ শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহকে একডালা দুর্গে অবরোধ করেন। দিনাজপুর জিলার ধানজর পরগনায় মহানন্দা নদীর দুইটি শাখা বালিয়া ও চিরামতী দ্বারা

* Histtory of Bengal (Dacca) Vol I পৃঃ ১০৩ প্রথমোক্ত এবং Cambridge History of India, Vol III পৃঃ ২৬৩ ও Delhi Sultanate, (Bharatiya Vidya Bhavan) পৃঃ ১৯৭ দ্বিতীয় মতের সমর্থক।

www.pathagar.com

বেষ্টিত একডালা দুর্গটি চারিদিকে জলবেষ্টিত ছিল (ইহার অস্তিত্ব বর্তমানে অবলুপ্ত)। ইলিয়াস শাহ এই দুর্গকে সুরক্ষিত করার জন্য দুর্গের চারদিক বিশেষ ধরনের এঁঠেল মাটির বিশাল প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত করেছিলেন ও চারপাশে প্রায় ৬০ ফিট চওড়া পরিখা খনন করেছিলেন। ফলে একডালা একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছিল। একডালার ভৌগোলিক পরিস্থিতি বঙ্গদেশের জলবায়ু, দিল্লী বাহিনীর এইস্থানে অবস্থানের পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। বঙ্গদেশের পাইক সৈন্যদের বীরত্ব এই দুর্গ জয়ের পথে আরেকটি বাধা ছিল। এইসময় ইলিয়াস শাহকে দিল্লী বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত করার উদ্দেশ্যে সুলতান কয়েকজন কালান্দার ফকিরের মারফতে তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের কথা প্রচার করেন এবং সৈন্যবাহিনীকেও শত্রু পক্ষেকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রত্যাবর্তনের তোড়জোর করতে বলেন। ফিরোজের সৈন্যবাহিনী দিল্লীর পথে রওনা হয়েছে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ইলিয়াস শাহ সব সতর্কতার কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং সুলতানের বাহিনীকে আক্রমণ করেছিলেন। এইজন্য দিল্লীর বাহিনী প্রস্তুত ছিল এবং সমকালীন লেখকদের মতে, ইলিয়াস হাজির সৈন্যবাহিনী সুলতানের সৈন্যদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়। শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁর অবশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে পুনরায় একডালায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু একডালা সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। শামসী সিরাজ আফি ফও সিরাত-ই-সিরোজ শাহীর লেখকদের মতে, একডালা দুর্গের অন্তঃপুরবাসিনী মুসলমান মহিলাদের আর্তনাদ কর্ণগোচর হওয়াতে সুলতান ফিরোজ তাঁদের সম্মান রক্ষার্থে ও স্বধর্মীয়দের রক্তপাতে অনীহার দরুণ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। আফিফ আরো মন্তব্য করেছেন যে, বর্ষার সূত্রপাতের জন্য ফিরোজ শাহ তুঘলককে এই অবরোধ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি ইলিয়াসের সঙ্গে আপোষে রফা করে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সঙ্গে ইলিয়াস শাহর শান্তিচুক্তির সঠিক শর্তাবলী জানা যায় না। কিন্তু দিল্লী-বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পরে শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ স্বাধীনভাবে লখনৌতিতে রাজত্ব করেছিলেন, এসম্পর্কে সন্দেহ নাই সমকালীন দিল্লী দরবারের ঐতিহাসিকরা বারংবার ইলিয়াস হাজি কর্তৃক সুলতানের দরবারে কর ওউপঢৌকন প্রেরণের কথা উল্লেখ করেছেন। সুলতান ফিরোজের বঙ্গদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর প্রতিবৎসর লখনৌতি থেকে ইলিয়াস হাজির প্রতিনিধিরা মূল্যবান উপহার নিয়ে দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এইসব বঙ্গদেশের দূতরাও দিল্লীর সুলতানের আনুকূল্য ও আনুগত্য লাভ করতেন। শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহর জীবদ্দশায় দিল্লীর সঙ্গে এই দূত ও শুভেচ্ছা বিনিময় থেকে ইহা উপলব্ধি করা যায় যে, ১৩৫৩ থেকে ১৩৫৫ সালে সুলতান ফিরোজের লখনৌতি অভিযান ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছিল কিন্তু শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সঙ্গে বঙ্গদেশের সুসম্পর্ক রেখেছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে লখনৌতির সঙ্গে দিল্লীর মৈত্রী ক্ষুন্ন হয়নি। ইলিয়াস শাহর রাজত্বের শেষার্ধে কামরূপের রাজাকে একটি সামরিক অভিযানে পরাজিত করেছিলেন। তিনি সুলতান ফিরোজের প্রত্যাবর্তনের পর পাণ্ডুয়া পুর্নদখল করে কুশি নদীর তীর পর্যন্ত স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করেন। সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ বঙ্গদেশে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা করেছিলেন। রিয়াজ-উস্-সালাতিনের লেখক শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহকে ভাঙ্গরা বা ভাঙ্গের নেশাখোর বলে উল্লেখ করেছেন এবং জিয়াউদ্দীন বারানী তাঁকে অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর শাসকরূপে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু এইসব উক্তির কোন ভিত্তি নাই। হাজি ইলিয়াস হাজিপুরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়াতে হৌজী শামসীর আদর্শে জলাধার নির্মাণ করেন। তাঁর রাজধানীতে আখি সিরাজউদ্দীন ও শেখ

www.pathagar.com

বিয়াবানীর ন্যায় দুইজন সুপ্রসিদ্ধ ফকির বাস করতেন। সিরাত-ই-ফিরোজ শাহীর মতে, তিনি ৭৫৯ হিজরীতে(১৩৫৮ খ্রীঃ) দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু মুদ্রা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ৭৫৮ হিজরী বা ১৩৫৬-৫৭ সালকে তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ বলে অনুমান করা হয়।

সুলতান সিকন্দর শাহ

ইলিয়াস হাজির মৃত্যুর পর তার পুত্র সিকন্দর লখনৌতির সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের সর্বাধিক স্মরণীয় ঘটনা হ'ল সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক কর্তৃক দ্বিতীয়বার লখনৌতি অভিযান। সুলতান ফিরোজ শাহর দরবারে এই সময় সোনারগাঁ ও-এর অধিপতি ফকরউদ্দীন মুবারক শাহর জামাতা পারসিক অভিজাত জাফর খান আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন এবং সুলতান তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। জাফর খাঁর প্ররোচনায় বা সুলতানের স্বীয় উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার জন্য ফিরোজ শাহ তুঘলক বঙ্গদেশে দিল্লীর প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করার জন্য মনস্থ করেন ও ইলিয়াস শাহর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করেন। সুলতান সিকন্দর তাঁর সিংহাসনে অভিষেকের পরই আলম খানকে দিল্লীতে স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন এবং শুভেচ্ছার নমুনা স্বরূপ দিল্লীতে কয়েকটি হাতি উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু সুলতান ফিরোজ বঙ্গবিজয়ে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন এবং তিনি জাফর খাঁকে লখনৌতির আইনসঙ্গত শাসক হিসাবে ঘোষণা করে ৮০,০০০ অশ্বারোহী, ৪৭০টি হাতি ও বিশাল পদাতিক বাহিনী নিয়ে সিকান্দারের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভিযান করেছিলেন। ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে বঙ্গদেশে পদার্পণ করার পর সিকন্দর তাঁর পিতার প্রদর্শিত সামরিক নীতি অনুসরণ করে একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। শামসী সিরাজ আফিফ উল্লেখ করেছেন যে, দ্বিতীয়বার একডালা দুর্গ অবরোধের সময় দুর্গপ্রাকারের একটি বুরুজ অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশের ভারে ভেঙে পড়ে এবং একডালা দুর্গের অংশবিশেষে ফাটল দেখা দেয়। অনেকেই দুর্গপ্রাকারের এই ভাঙ্গা অংশ দিয়ে শত্রুর উপর হামলা করতে উদগ্রীব হয়েছিলেন কিন্তু সুলতান এই প্রস্তাব নাকচ করেন। দুর্গাভ্যন্তরস্থ মুসলিম মহিলাদের সম্মান রক্ষার্থে তিনি এই ধরনের হামলার বিরোধিতা করেন। ফিরোজের দ্বিতীয় বঙ্গাভিযানও ব্যর্থ হয়।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ও অন্যান্যদের স্থায়ীভাবে বঙ্গদেশে প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার কারণ হিসেবে আফিফ দুইটি কারণ উল্লেখ করেছেন। এই দুইটি কারণ হ'ল প্রথমতঃ বঙ্গদেশের সৈন্যদের বীরত্ব ও দ্বিতীয়তঃ এই অঞ্চলের অভিজাতদের জলবেষ্টিত দ্বীপে বসবাস করার অভ্যাস। বাংলার পদাতিক বাহিনী বা পাইক সৈন্যরা বহির্শত্রুর আক্রমণ থেকে ইলিয়াস ও তাঁর পুত্রর রাজ্য রক্ষা করবার ভার গ্রহণ করেছিল। এমনকি সুলতান ফিরোজ ও তাঁর দ্বিতীয় সিন্ধু অভিযানের সময় বাংলার পাইক সৈন্যদের একটি দলকে জাফর খাঁর নেতৃত্বে তাঁর সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদভাগ রক্ষার গুরুদায়িত্ব দান করেছিলেন।*

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক অবশেষে সিকন্দরের সহিত বিরোধ মীমাংসার জন্য আজম হুমায়ুন হাইবাৎ খান নামে একজন বাঙালী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে সন্ধির শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। এই হাইবৎ খানের দুই পুত্র লখনৌতিতে উচ্চরাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। হাইবৎ খানের দক্ষতায় সহজেই শান্তি স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়। সন্ধির শর্তাবলী উভয়পক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে এবং পরস্পরের শুভেচ্ছা ও উপহার বিনিময়ের পর

* আফিফ বাংলার এই পাইক সৈন্যদের 'রেখালেহ' বলে উল্লেখ করেছেন। হোডিভালার মতে, এই শব্দের অর্থ সাহসী, এই সূত্রে সংগ্রামী পদাতিক। হোডিভালা, এস. এইচ., স্টাডিজ ইন ইণ্ডো-মুসলিম হিস্ট্রি পৃ:৩১৩। বারানী, পৃঃ ৫০৩ও দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রত্যাবর্তনের পর প্রায় দুই শতাধিক বৎসর অর্থাৎ আফগানদের অভ্যুদয়ের কাল পর্যন্ত বাংলার ব্যাপারে দিল্লী হস্তক্ষেপ করেনি।

সুলতান সিকন্দরের দীর্ঘ রাজত্বকালে তাঁর রাজধানী ফিরোজাবাদের (পাণ্ডুয়া) আশপাশে যেসব স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল তা আজও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইসব স্থাপত্যের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নমুনা পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ। এই মসজিদ উত্তর থেকে দক্ষিণে ৫০৭ ফুট এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে ২৮৫ ফুট বিস্তৃত ছিল। সমগ্র হিন্দুস্থানে ইহার তুলনা মেলাভার। এই মসজিদের অভ্যন্তরের চতুর্ভুজ অঙ্গণটি ছিল ৪০০ ফুট দীর্ঘ ও ১৫০ ফুট চওড়া একটি আয়তক্ষেত্র যার চতুর্দিক স্তম্ভপরিবৃত ছিল। এইসব স্তম্ভের সংখ্যা ছিল সাকুল্যে ৪০০। এই মসজিদের অঙ্গনের সুবিশাল চত্বরে হাজার হাজার ব্যক্তির নমাজ পাঠের জন্য স্থান সংকুলান সম্ভবপর ছিল। এই মসজিদের প্রার্থনা প্রাঙ্গন অনেকটা ধ্রুপদী নগরের জনগণের মিলনক্ষেত্রের (forum) ন্যায় মনে হতো। রিয়াজের মতে, এই মসজিদের নির্মাণকার্য ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় ও মসজিদের পশ্চিম অংশের প্রাচীর ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়েছিল। দামাস্কাসের বিশাল মসজিদের সঙ্গে তুলনীয় এই আদিনা মসজিদের মালমশলা অনেক সময় বৌদ্ধস্তূপ ও হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে গৃহীত হয়েছিল। আদিনা মসজিদ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি অট্টালিকা ও সৌধ এইযুগের স্থাপত্যের নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব সৌধের মধ্যে আখি সিরাজ-উদ্-দীনের সমাধি ও মসজিদ, গৌড় নগরীর দক্ষিণের প্রবেশদ্বারে কোটওয়ালী দরওয়াজার স্থাপত্য উল্লেখযোগ্য। অন্য যে দুইটি সমকালীন মসজিদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের মধ্যে সম্ভবত ১৩৬৩ সালে গঙ্গারামপুরে (দিনাজপুর) মৌলানা আতা নির্মিত মসজিদ ও হুগলী জেলার মোল্লা সিমলায় নির্মিত আরেকটি মসজিদ ছিল অন্যতম। পাণ্ডুয়াতে এই সময়ে শেখ আলা-উলহক নামক একজন প্রসিদ্ধ শেখ ছিলেন।

সিকন্দরের শেষজীবন শান্তিপূর্ণ হয়নি। তাঁর প্রথম বেগমের ১৭টি ও দ্বিতীয় বেগমের মাত্র একটি পুত্রের মধ্যে সুলতানের শেষোক্তর প্রতি দুর্বলতা গৃহবিরোধের কারণ হয়। অবশেষে সুলতানের বিরুদ্ধে তাঁর প্রিয়পুত্র বিদ্রোহী হয়ে সোনারগাঁও ও সাতগাঁও দখল করেন। অবশেষে সুলতান স্বয়ং পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী গোয়ালপাড়া নামক স্থানে তাঁর বিদ্রোহী পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন এবং সুলতান সিকন্দরের মরদেহ আদিনা মসজিদের চত্বরে একটি ৪২ ফুট গৃহে সমাধিস্থ করা হয় (১৩৯৩ বা ১৩৯০-৯১ খ্রীঃ)।

গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ

সিকন্দর শাহর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে আরোহন করেন। আসামের স্থানীয় বুরঞ্জী অনুসারে তিনি কামতা ও অহোম রাজ্যের বিরোধের সুযোগে পূর্বোক্ত রাজ্য আক্রমণ করলে কামতা ও অহোমের গৃহবিরোধে লিপ্ত গোষ্ঠীরা বিরোধ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলার সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করে বাংলার সুলতানকে করতোয়ার অপরপারে বিতাড়িত করেছিলেন। এছাড়া আরাকানের বিতাড়িত রাজা নরেম খেলকে তাঁর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য গিয়াসউদ্দীনের প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিমের বঙ্গদেশ আক্রমণের প্রচেষ্টা তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীনের সময় চীনের সঙ্গে বারংবার দূত বিনিময় হয়েছিল। ১৪০৫ সাল থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গদেশ থেকে বহুবার চীনে দূত প্রেরিত হয়েছিল এবং চীন থেকেও বঙ্গদেশে দূত প্রেরিত হয়েছিল। চীনা সম্রাট ইয়াংলু এদেশ থেকে বৌদ্ধ শ্রমনদের স্বদেশে আমন্ত্রন করেছিলেন। ১৪১০-১১ সালে মহারত্ন উমরাজ নামে একজন ভিক্ষু এদেশ থেকে চীনে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই ধরণের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ফলে ভারত ও

চীনের মধ্যে যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। চীন থেকে যাঁরা এইসময় এদেশ এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মৌহান। মৌহানের বিবরনী থেকে তৎকালীন যুগের অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সুলতান গিয়াসউদ্দীনের পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং তাকে স্বীয় দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু হাফিজের পক্ষে এই আমন্ত্রন গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সাঈফ্‌উদ্দীন হামজা শাহ (১৪১০-১২ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। চীনা বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, তিনি ১৪২০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু ৮১৬,৮১৭ ও ৮১৮ হিজরীতে অন্যান্য সুলতানদের নামে মুদ্রা পাওয়া যায়। অতএব চীনা বিবরণীর বক্তব্য স্বীকার করা সম্ভব নয়। তবে সাইফউদ্দীন চীনের সঙ্গে মৈত্রী ও যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন এসম্পর্কে সন্দেহ নাই। তাঁর উত্তরাধিকারী সিহাবুদ্দীন বা বায়াজিদ শাহ (১৪১৩-১৪খ্রীঃ)* ও পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহর (১৪১৪-১৫) রাজত্ব কালে ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের একজন ব্রাহ্মন জমিদার রাজা গনেশের দরবারে সর্বাধিক শক্তিশালী অভিজাত গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। সমকালীন ঐতিহাসিকদের মতে রাজা গনেশ পরে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব শুরু করেছিলেন এবং স্বীয় পুত্র যদুকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে রাজছত্র স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন। এই যদুই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালাল-উদ্‌-দীন মহম্মদ নামে, এই তথ্য ৮১৮ হিজরির মুদ্রায় পাওয়া যায়। এই ভাবে প্রথম যুগে ইলিয়াস শাহী শাসনের সাময়িক ভাবে অবসান হয়।

বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন

ফকরউদ্দীন মুবারক শাহর রাজত্ব কালে (১৪৫৪-৪৬ সালে) বিখ্যাত আরব ভ্রমনকারী ইবন বতুতা বঙ্গদেশ পরিভ্রমন করেছিলেন। ইবন বতুতা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে** তৎকালীন যুগে এই রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া ইবনবতুতা ফকরউদ্দীনের ফকীর ও পীরদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করে রাজদরবারে তাদের অত্যাধিক প্রভাবের সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন।*** উলেমা ও ফকিরদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের এই প্রচেষ্টা উত্তরভারতের রাজনীতির থেকে বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন করার প্রবণতার বিরোধী। গিয়াসউদ্দীন আয়াজ খলজীর সময় থেকে এই প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। তিনিই সর্বপ্রথম খলিফার সনদ নিয়েছিলেন ও সুলতান উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি গজনীর ঘোরীদের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১২২৫ সালে তিনি দিল্লী বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়ে বশ্যতামূলক সন্ধিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। গিয়াসউদ্দীন আয়াজ খলজী এই সন্ধির শর্তাবলী অস্বীকার করায় ইলতুৎমিস লখনৌতির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরণ করেন (১২২৭খ্রীঃ)। এই অভিযানের ফলে আয়াজ যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আয়াজ খলজীর মৃত্যুর পর কিছুকাল লখনৌতিতে দিল্লী থেকে নিযুক্ত মামলুক শাসকরা (১২২৭-১২৮৭ খ্রীঃ) বঙ্গদেশের সঙ্গে রাজধানীর আনুগত্যের সম্পর্ক

* অনেকের মতে বায়াজিদ শাহ সাঈফউদ্দীনের দত্তকপুত্র ছিলেন এবং রাজা গনেশের চক্রান্তে সাঈফউদ্দীনকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহন করেন।

** আগা মাহেদী হুসেনের ইংরাজী অনুবাদ রেহেলা অব ইবন বতুতা পৃঃ ২৩৪-৩৫; বঙ্গদেশের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বতুতার বক্তব্য নিম্নে দ্রষ্টব্য।

*** আরব ভ্রমণকারীর কাহিনী অনুসারে একজন ফকির সুলতানের বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করে রাজধানীতে সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর পুত্রকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন। এই বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

বজায় রেখেছিলেন। যদিও এইযুগেও কতকগুলি ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। এই সব ব্যতিক্রমের মধ্যে ইলতুৎমিসের রাজত্বকালেই বলখা খলজীর বিদ্রোহ, মুগিসউদ্দীন যুজবক (১২৫৩-১২৫৭খ্রীঃ) ও তুগ্রিল খাঁর বিদ্রোহ (১২৭৯) প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। বুঘরা খাঁ ও তার বংশধরগন অর্থাৎ বলবনী বংশের শাসনকালে (১২৮৬-১৩২৮ খ্রীঃ) বঙ্গদেশে স্বাধীন সুলতানী রাজত্বের পূর্বাভাষ পাওয়া যায়।

তুঘলক সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের ফলে গুজরাট, মালব, জৌনপুর, দক্ষিণ-ভারতে ও বঙ্গদেশে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। বঙ্গদেশে স্বাধীন সুলতানী শাসনের সূত্রপাতের প্রাথমিক স্তরে ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালে লখনৌতির উপর দিল্লীর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রয়াস বারংবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এইযুগে এক শ্রেণীর উলেমা ও ফকির বহির্শক্তির সঙ্গে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সহাযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে। উদাহরণ হিসাবে ফিরোজের সৈন্যবাহিনী হাজি ইলিয়াসকে একডালা দুর্গের সুরক্ষা ত্যাগ করে সরাসরি সংঘর্ষে প্ররোচিত করাতে চেয়েছিল। এই কার্যে তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে কালান্দারদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যায়। এইসময় একডালা দুর্গ জয়ে ব্যর্থ ফিরোজ কালান্দারদের মারফতে তাঁর দিল্লী প্রত্যাবর্তনের সম্পর্কে প্রচার করে ইলিয়াস শাহকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। ফলে বাংলাদেশের সৈন্যবাহিনী ফিরোজশাহর পশ্চাদাপসরণকারী সৈন্যদের আক্রমণ করে ও পরাজিত হয়। অবশ্য এর ফলে দিল্লীর সুলতান একডালা জয় করতে বা ইলিয়াস শাহকে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করতে পারেননি। কিন্তু এই ঘটনায় কালান্দার শ্রেণীর ফকিরদের দিল্লীর সুলতানের পরিকল্পনা রূপায়নে সহযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহর আমলে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের দ্বিতীয়বার বঙ্গবিজয়ের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বঙ্গদেশে স্বাধীন সুলতানী রাজ্য স্থাপিত হয়। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গদেশের রাজনীতির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্ববিরোধের মূলে ছিল উলেমা শ্রেণী ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে দরবারে অভিজাতদের নেতা রাজা গণেশের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। অবশেষে রাজা গণেশ একটি নতুন রাজবংশের সূচনা করেন। রাজা গণেশকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে চিস্তি ফকির শেখ নূর কুতুব উল ইসলাম জৌনপুরের ইব্রাহিম শার্কীকে বঙ্গদেশ আক্রমণ করতে আমন্ত্রণ জানান।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা

আরব ভ্রমণকারী ইবনবতুতা চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর মতে পৃথিবীতে কোথাও বঙ্গদেশের মতো স্বল্পমূল্যের পণ্যের বাজার ছিল না। তাঁর বক্তব্য সমর্থন করার জন্য ইবনবতুতা কয়েকটি পণ্যের মূল্য উল্লেখ করেছেন। এই মূল্য তালিকা অনুসারে চাল ৮০ রাতল (১ রাতল বা ১৪ সেরে) ১৪ দিরহামে বা মুদ্রায় পাওয়া যেত। একটি দুগ্ধবতী গরুর ৩ রৌপ্য দিনার দাম ছিল ও ৮টি মুরগী এক দিরহামে বিক্রয় হতো ও অতি সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র ৩০ কিউবিটের দাম ছিল ২ রৌপ্য মুদ্রা (দিনার)। এইসময় আফ্রিকার ভ্রমণকারী যে পণ্যমূল্যর কথা উল্লেখ করেছেন আধুনিক মুদ্রায় তার সঠিক হিসাব করা যায় না। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য যেসব শহর ও গ্রাম তিনি পরিভ্রমণ করেন তাদের তুলনায় বঙ্গদেশে পণ্যমূল্য কম ছিল এসম্পর্কে সন্দেহ নাই। চীনা বিবরণীতে তৎকালীন বঙ্গদেশের আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। চীন থেকে যে সব দূত এদেশে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মৌহান অন্যতম। এছাড়াও অন্যান্য চীনা বিবরণীতে চর্তুদশ শতকের বঙ্গদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

www.pathagar.com

চীনাদের বিবরণী অনুসারে বঙ্গদেশের জমি ছিল উর্বর। এখানে সাধারনতঃ বৎসরে দুইবার শস্য উৎপাদন হত। সেচের বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল না। পুরুষ ও নারী উভয়ই চাষের কাজে পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত ছিল। চাষাবাদের সময় ছাড়া অন্যান্য সময় এখানকার লোক কাপড় বুনত। কৃষির ক্ষেত্রে ধান বৎসরে দুইবার উৎপাদিত হত অন্যান্য শস্যের মধ্যে তিল, বাজরা, বরবটি, আদা, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন, বেগুন, নারকেল, তাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ফলের মধ্যে কলা, কাঁঠাল, আখের নাম উল্লেখযোগ্য। চিনি, মধু, মাখন, ঘি ইত্যাদির যথেষ্ট উৎপাদন ছিল।

চীনা লেখকদের মতে বঙ্গদেশে বিভিন্ন শিল্প ছিল। এই সব শিল্পের মধ্যে কাগজ, লাক্ষা, চিনি, সূতী ও সিল্কের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব শিল্পের মধ্যে বঙ্গদেশের কাগজের শিল্প প্রসিদ্ধ হয়েছিল। কারণ একটি বিশেষ গাছের ছাল-বাকলা থেকে প্রস্তুত এই কাগজ ছিল সাদা। সূতিবস্ত্রও বিভিন্ন ধরনের ছিল। এই সব বিভিন্ন সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্রের মধ্যে ৬টি বিশেষভাবে সুপরিচিত ছিল।

চীনা লেখকদের মতানুসারে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ছিল। রাজধানীতে নানা ধরণের দোকান ছিল। চীনের সঙ্গে বঙ্গদেশের যে সব পণ্যের বাণিজ্য ছিল তা হল সোনা, রূপা, সার্টিন, সিল্ক, পোর্সিলিন, তামা, লোহা, পারদ, সিন্দুর ইত্যাদি। বাংলাদেশের লোক খুব উদার, বিত্তবান ও সুসভ্য ছিল বলে চীনা বিবরণীতে বলা হয়েছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত মুদ্রাকে তংকা বলা হত যার ওজন ছিল ৮ ক্যাণ্ডারিন অর্থাৎ চীনা আউন্সের ৮/১০০ ভাগ। সাধারণ লেনদেনে কড়ি ব্যবহার করা হত।

পঞ্চদশ শতকের চীনাদের বিবরণীতে প্রাপ্ত সামাজিক চিত্র অনুসারে বঙ্গদেশের জনগণকে মোটামুটি হিন্দু ও মুসলমান এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। উভয়ের সামাজিক প্রথার পার্থক্য ছিল। হিন্দুদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তারা গোমাংস গ্রহণ করে না এবং পুরুষ ও নারী একত্রে আহার করে না। হিন্দু সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী পুনর্বিবাহ প্রচলিত ছিল না। বঙ্গদেশে সকল মানুষই বাংলাভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। কেবল সরকারী কাজে ও অভিজাতদের নিজেদের মধ্যে ফার্সী ভাষার প্রচলন ছিল। সকলেই সাদা সূতীর পাগড়ী ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল এবং চামড়ার পাদুকা ব্যবহার করত। মেয়েরা খাটো জামা পড়ত এবং সূতী, সিল্ক বা ব্রোকেড ঘুরিয়ে গায়ে জড়াত। মেয়েরা দামী পাথর বা সোনা-রূপার গহনা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। পুরুষেরা লম্বা জামা ব্যবহার করত। সৈন্যরা নিয়মিত বেতন পেত এবং তাদের জন্য রসদ সরবরাহের সুব্যস্থা ছিল।

বাঙ্গালীদের মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তির লোক ছিল। চিকিৎসক, জ্যোতিষি, শাস্ত্রবিদ এবং বিভিন্ন ধরণের কারিগর, গায়ক ও নর্তকী প্রভৃতি বৃত্তির লোকের অভাব ছিল না। সানাই বাদনে দক্ষ ও অন্যান্য যন্ত্রসংগীতে পারদর্শী বাদকরা ধনীদের ঘরে ঘরে দৈনন্দিন সকালে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য যাতায়াত করত। চীনা বিবরণী অনুসারে বঙ্গদেশ প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি ও শান্তির আবাসস্থল ছিল।

রাজা গণেশ

সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর রাজত্বকালে দিনাজপুরের রাজা গণেশের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। রিয়াজের মতে রাজা গণেশ ছিলেন ভাতুরিয়া পরগণার জমিদার এবং তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী অভিজাত ছিলেন। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে উলেমা শ্রেণী ও স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর বিরোধে বঙ্গদেশে সুলতানী শাসনে যে অভ্যন্তরীণ সংকট দেখা দিয়েছিল

www.pathagar.com

তার ফলে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান হয়।* এবং তিনি একটি নতুন রাজবংশের পত্তন করেন। রিয়াজ-উ-সালাতিনের লেখকের মতে রাজা গণেশ সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু রিয়াজের পূর্বসূরী ঐতিহাসিক নিজামউদ্দীন আমেদ ও ফিরিস্তা রাজা গণেশ কর্তৃক আজম শাহর হত্যার কথা উল্লেখ করেন নাই। ১৪১০ সালে দীর্ঘকাল রাজ্য শাসনের পর শান্তিপূর্ন ও স্বাভাবিকভাবে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর জীবনাবসান হয় এসম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু সুলতান গিয়াসউদ্দীন ও তার উত্তরসূরীদের দরবারে রাজা গণেশের প্রভাবের কিছুটা আভাস তৎকালীন চীনা বিবরণীতে অপ্রত্যক্ষ ভাবে পাওয়া যায়। এই সব বিবরণীতে জানা যায় যে, চীনা দূতদের সম্মানে পাণ্ডুয়াতে যে সব খানাপিনার আয়োজন করা হত সেখানে গোমাংস বা যে কোন ধরনের মাংস পরিবেশন নিষেধ ছিল। গণ্ডগোলের ভয়ে মদ্যপান বারণ ছিল কারণ তাতে ভব্যতার সীমাও অনেক সময় লংঘিত হয়। কিন্তু মিষ্টি গোলাপজল পানে বাধা ছিল না। সুলতানী দরবারে এই ধরনের নিয়মকানুন উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চস্তরের অভিজাতদের মধ্যে পরস্পরের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই নিদর্শন বলে অনুমান করা যায় এবং সুলতান গিয়াসউদ্দীন ও রাজা গণেশের সহযোগিতার নিদর্শন বলা যায়।** সম্ভবতঃ সুলতান গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পর রাজা গণেশের ক্ষমতা প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ফিরিস্তা বলেছেন, শিহাবউদ্দীনের রাজত্বকালে গণেশের ক্ষমতা অতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি এতদূর প্রাধান্য লাভ করেছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে খাজাঞ্চিখানার ও রাজ্যের তিনিই ছিলেন মালিক। সুলতানের মৃত্যুর পর তিনি সকল ক্ষমতা দখল করেন ও সিংহাসনে আরোহণ করেন। রিয়াজের লেখনী অনুসারে রাজা গণেশ শিহাবউদ্দীনকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু রিয়াজের পূর্বসূরী ফিরিস্তা ও নিজামউদ্দীন উভয়ই বলেছেন যে শিহাবউদ্দীনের মৃত্যুর পর গণেশ ৭বৎসর বঙ্গদেশে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর গণেশের পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সুলতান জালালউদ্দীন.উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এই যুগে গণেশ মুকুটধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেননি কিন্তু তিনি ছিলেন সিংহাসনের অধিকারীদের ক্ষমতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রতা। দরবারে সর্বাধিক শক্তিশালী গোষ্ঠীর তিনিই ছিলেন প্রধান এবং এই গোষ্ঠীতে কেবলমাত্র হিন্দু নয় মুসলমান অভিজাতরাও সামিল ছিলেন। স্বীয় প্রভাব অক্ষুন্ন রাখার জন্য রাজা গণেশ মুসলিম অভিজাতদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেছিলেন এমনকি পুত্র যদুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণেও সম্মতি দিয়েছিলেন। চিস্তি ফকির শেখ নূর কুতব-ই-আলম ও জৌনপুরের প্রসিদ্ধ ফকির হজরত জাহাঙ্গীর সিম্নানির পারস্পরিক পত্র বিনিময়ের মধ্যে রাজা গণেশের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অসন্তোষ প্রকাশিত হয়েছে এবং জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কীকে বঙ্গদেশ আক্রমণ করতে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। রিয়াজ-উস-সালাতিনেও

---

* ভাতুরিয়া পরগনার সীমা ছিল উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট; পশ্চিমে মহানন্দা ও পুনর্ভবা; পূর্বে করতোয়া (ব্লকম্যান- Contribution to the History and Geography of Bengal- পৃঃ ৫৮।) রাজা গণেশ সম্পর্কে মমতাজুর রহমান তরফদারের হুসেন শাহী বেঙ্গল, পৃঃ ৩-৪ দ্রষ্টব্য। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য পূর্বভারতের শাসকরা অনেকেই এই যুগে উলেমা শ্রেনীর বিরোধিতা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গনেশের অভ্যুত্থানের মূলে ছিল এই রাজনৈতিক পটভূমি।

** Visha Bharati Annals-1945, Vol. 1, পৃঃ ১১০-১১১ দ্রষ্টব্য। সম্ভবতঃ রাজা গণেশ ১৪০৫ থেকে ১৪০৯ সালে দ্রুত সুলতানী দরবারে প্রভাবশালী হয়েছিলেন এবং এইযুগেই বঙ্গদেশ থেকে রাজা গনেশের মৃত্যু পর্যন্ত (১৪১৪) চীনে নিয়মিত দূত প্রেরণ শুরু হয়। জৌনপুরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বঙ্গদেশে চীনের মধ্যস্থতার প্রার্থী হয়েছিল।

www.pathagar.com

বলা হয়েছে যে শেখ নূর কুতুব-ই-আলমের আবেদনে জৌনপুরের শাসক ইব্রাহিম শার্কী বঙ্গদেশ আক্রমণ করেছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে রাজা গণেশ স্বীয় পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে রাজি হয়েছিলেন। শেখ কুতুব-ই-আলম এই ব্যবস্থায় সহজে সম্মতি দান করায় শার্কী সুলতান স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। যদু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দীন মহম্মদ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। শার্কী সুলতানের প্রত্যাবর্তনের পর রাজা গণেশ পুনরায় রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়েছিলেন। ফিরিস্তা ও রিয়াজের বক্তব্য অনুসারে পুত্র যদু বা জালালউদ্দীন মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজা গণেশ নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত রাজা গণেশের নামে কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি। সুলতান গিয়াসউদ্দীন ও তাঁর উত্তরসূরীদের মুদ্রা ৮১৭ হিজরী পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। রাজা গণেশের পুত্র জালালউদ্দীনের ৮১৮ হিজরীর মুদ্রা ও কয়েকটি ৮১৯ হিজরীর মুদ্রা পাওয়া যায়। ৮২১ থেকে ৮৩৫ হিজরী পর্যন্ত তাঁর মুদ্রা নিয়মিতভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু ৮২০ হিজরীতে (ফেব্রুয়ারী, ১৪১৭, ফেব্রুয়ারী ১৪১৮) জালালউদ্দীনের মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। এই যুগে রাজা দনুজমর্দন দেব ও মহেন্দ্র দেব নামে দুইজন রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া যায়। শেষোক্ত রাজার নামে শক ১৩৪১ অর্থাৎ ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্যন্ত মুদ্রা আছে বলে অনুমান করা হয়। শেষোক্ত বৎসরে সুলতান জালালউদ্দীনের নামেও মুদ্রা পাওয়া যায়।

এইসব মুদ্রা ভিত্তিক প্রামাণ্য তথ্যের উপর নির্ভর করে ডঃ ভট্টশালী যে বক্তব্য পেশ করেছেন তাতে রিয়াজের কাহিনী অনুসরণ করে বলা হয়েছে, গণেশ রাজা দনুজমর্দনদেব উপাধি গ্রহণ করে ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং দুইবৎসর তাঁর পুত্র যদু (১৪১৯) পুনরায় সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। যদু শার্কী আক্রমণের কালে মুসলমান হলেও তৎপরবর্তী যুগে গণেশ তাঁকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন এবং তিনি মহেন্দ্রদেব উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে (অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর) যদু দ্বিতীয়বার মুসলমান হয়ে সুলতান জালালউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। যেসব ঐতিহাসিক ডঃ ভট্টশালীর বক্তব্য অনুসারে রাজা গণেশকে দনুজমর্দন দেবের সঙ্গে সনাক্ত করেছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে মহেন্দ্রদেবের সঙ্গে যদুকে সনাক্ত করতে রাজি হননি। এইসব লেখকের মতে, রাজদরবারে হিন্দু অভিজাত গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় রাজা গণেশের দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্রদেব নামে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। আবার আরেকটি মতানুসারে রাজা দনুজমর্দন দেব ও রাজা মহেন্দ্র দেব পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের স্থানীয় শাসক ছিলেন। রাজা গণেশ কখনই মুকুটধারণ করেন নাই। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহর (১৪১৪-১৫) ও তাঁর পুত্র সুলতান জালালউদ্দীনের রাজত্বকালে সিংহাসনে আরোহণ না করেও রাজ্যে প্রকৃত ক্ষমতা স্বহস্তে রেখেছিলেন।

সুলতান জালালউদ্দীন ও তাঁর বংশধররা

রাজা গণেশ সম্পর্কে আমাদের বর্তমানে সঠিকভাবে কোন তথ্য জানা নেই। কিন্তু ইলিয়াস শাহী যুগে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। এই সময়ে অভিজাত নেতৃত্বে ছিলেন রাজা গণেশ। তিনি বহুদিন রাজ্যের সকল ক্ষমতা হস্তগত করেছিলেন। গণেশ এইসময় সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন কি না এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। কিন্তু বাস্তবে তাঁর নির্দেশ রাজ্যের সর্বত্র পালিত হত। রাজা গণেশের বংশধররা এই ক্ষমতার উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিলেন। এই যুগে রাজা গণেশ ও দনুজমর্দনদেব এবং মহেন্দ্র দেবের অভ্যুত্থানে রাজ্যে হিন্দু অভিজাতদের শক্তি

www.pathagar.com

ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে সুলতান জালালউদ্দীন উপাধি গ্রহণের ফলে তাঁর শাসন ১৪১৫-১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। সুলতান জালালউদ্দিনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার মূলে ছিল মুসলমানদের হিন্দু রাজার শাসনাধীনে থাকার অনীহা। কিন্তু রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধররা সুলতান জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ্ বা তৎপুত্র সুলতান শামসউদ্দীন আহমেদ শাহ (১৪৩১-১৪৩৫ খ্রীঃ) যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাদের নীতি নির্ধারণ করেছিলেন তার মূলে ছিল উত্তর ভারতের রাজনীতি থেকে বঙ্গদেশের স্বাতন্ত্র বজায় রাখা। উত্তরভারতের প্রভাব উলেমাদের মারফতে পূর্বভারতে অনুপ্রবেশের সুযোগ লাভ করত। এই জন্য রাজা গণেশ ও উলেমা শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল।* বঙ্গদেশকে উত্তরভারতের প্রভাবমুক্ত করার জন্য সম্ভবতঃ যদুকে মুসলমান ধর্মগ্রহণে রাজা গণেশ সম্মতি দান করেন এবং যদু ইসলাম ধর্মগ্রহণে রাজি হবার মূলে একই উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে সুলতান জালালউদ্দীন মহম্মদ কূটনৈতিক দিক থেকে স্বীয় পরিস্থিতি শক্তিশালী করার জন্য চীন ও মিশরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। শার্কী সুলতানদের প্রভাব থেকে বঙ্গদেশের রাজনীতিকে মুক্ত করার জন্যই সম্ভবতঃ তিনি এই সব বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখেছিলেন। তিনি খালিফাতুল্লাহ উপাধি গ্রহণ করে কেবলমাত্র বঙ্গদেশের সুন্নীদের সমর্থন লাভ করেননি তৎসহ শার্কী সুলতানদের এদেশে প্রভাব বিস্তারের পথ রুদ্ধ করেছিলেন।

বুকানন হ্যামিলটনের বক্তব্য অনুসারে সুলতান জালালউদ্দীন মহম্মদ হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছিলেন। কিন্তু ফিরিস্তা সুলতান জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহকে তাঁর যুগের নৌশিরান বলে বর্ণনা করেন। এই যুগের সংস্কৃতে রচিত স্মৃতিরত্নহার ও পদচন্দ্রিকা অনুসারে সুলতান হিন্দুদের প্রতি উদারনীতির সমর্থক ছিলেন। অমরকোষের ভাষ্যকার পদচন্দ্রিকার লেখক বলেছেন যে, কুলিন গ্রামের (বর্দ্ধমান জিলায় অবস্থিত) বৃহস্পতি মিশ্রকে সুলতান জালালউদ্দীন সার্বভৌম পণ্ডিত অর্থাৎ সভাপণ্ডিত করেছিলেন। বৃহস্পতি মিশ্রের পুত্র বিশ্বাস রাই গৌড়েশ্বরের (অর্থাৎ সুলতান জালালউদ্দীনের) মন্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পাণ্ডুয়া, গৌড়, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, ফতাহাবাদ (ফরিদপুরের সঙ্গে সনাক্ত করা হয়) প্রভৃতি স্থান সমৃদ্ধশালী হয়েছিল।

জালালউদ্দীনের পুত্র সুলতান শামসউদ্দীন আহমেদ শাহর স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালে বঙ্গদেশের সঙ্গে চীন ও অন্যান্য বৈদেশিক শক্তিদের সঙ্গে বঙ্গদেশের যোগাযোগ অক্ষুন্ন ছিল। এই যুগে শার্কী সুলতানদের আক্রমণের আশঙ্কা নিবারণের জন্য সুলতান আহমদ শাহ হিরাটে তৈমুরের পুত্র শাহরুখের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন। ইব্রাহিম শার্কীর উত্তরসূরী মামুদ ও হুসেনের রাজত্বকালেও বঙ্গদেশের সঙ্গে জৌনপুরের শত্রুতা চলছিল। শার্কীদের পতনের পর উত্তরভারতে লোদী বংশের সুলতানদের আগ্রাসন থেকে রাজ্য রক্ষার জন্য সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ কূটনৈতিক তৎপরতা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ

গণেশের বংশধরদের রাজত্বের অবসানের পর পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন শুরু হয়। সুলতান শামসউদ্দীন আহমেদ শাহ তাঁর দরবারের আমির শাদী খান ও নাসির খানের হস্তে

* মমতাজুর রহমান তরফদার তাঁর হুসেন শাহী বেঙ্গল নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'These East Indian rulers were perhaps trying to free there respective region from North Indian political influence which could infiltrate through the Ulema domination' (পৃঃ ৪-৭ পাদটিকা)।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজত্ব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান কর্তৃক কারণে-অকারণে অভিজাতদের প্রাণনাশ, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা ও প্রজার ধন ও সম্পত্তি অপহরণ ক্রমেই সর্বসাধারণের সহ্যের অতীত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তদুপরি সুলতান ব্যয় হ্রাস করার নামে সেনাদের বেতন কমিয়ে দেন। ফলে তাদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ ছড়িয়ে পড়ে এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ ধারণ করে। এইসময় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সৈয়দ হুসেন এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। চারহাজার ভাড়াটে সৈন্যসহ সুলতান মুজাফর শাহ শহরের সুরক্ষিত কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্রোহীরা সৈয়দ হুসেনের নেতৃত্বে তাঁকে অবরুদ্ধ করেছিলেন। এইভাবে ৪ মাস অবরোধের পর মুজাফর শাহ বিদ্রোহী সৈন্যদের উপর হামলা চালাতে গিয়ে বহু অনুচরসহ নিহত হয়েছিলেন। ফিরিস্তার এই বক্তব্যের সঙ্গে নিজামউদ্দীনের কাহিনীর মিল নেই। শেষোক্ত ঐতিহাসিকের মতে, সৈয়দ হুসেন প্রাসাদরক্ষক পাইকদের সঙ্গে যোগসাজস করে গোপনে সুলতানকে হত্যা করেছিলেন। সুলতান শামসউদ্দীন মুজাফর শাহর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে হাবসী শাসনের অন্ধকার যুগের অবসান হয়।

বারবক শাহর সময় থেকে হাবসীরা দেহরক্ষী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। কালক্রমে এরা পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্যের প্রাইটোরিয়ান গার্ডদের মত রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন এবং ইচ্ছামত প্রভুকে হত্যা করে রাজা নির্বাচন করতেন। ফেরিয়া ডি সুজার লেখনী থেকে জানা যায় যে, 'এই সময় পুত্রের পিতৃরাজ্যে অধিকার স্বীকৃত হইত না, আবিসিনীয় খোজা দাসেরা প্রকৃত প্রভু ছিল।' ফিরিস্তা বলেছেন, 'যে রাজাকে মারিয়া অন্যায়পূর্বক সিংহাসন অধিকার করিতে পারিত লোকে তাহারই বশীভূত হইত।' বাবর এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেন যে, 'সুলতানের পদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এই শাসককে হত্যা করে যে সিংহাসন দখল করবে সেই সুলতান হবে। আমির, উজির ও সৈনিকরা এবং কৃষকগণ সঙ্গে সঙ্গে বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর হুকুম মানবে।' 'বাঙ্গালীরা বলে, আমরা সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করি, যে সিংহাসন দখল করে তার কথা বিশ্বস্তভাবে মেনে চলি।' কিন্তু এই মাৎস্যন্যায় বেশীকাল স্থায়ী হয়নি। কারণ, সুলতান শামসউদ্দীন মুজাফর শাহর সিংহাসন লাভের (১৪৯১ খ্রীঃ) পর প্রজা বিদ্রোহের ফলে হাবসী শাসনের অবসান হয়।

হুসেন শাহী বংশ

হাবসী শাসনের ফলে বঙ্গদেশের ইতিহাসে যে অন্ধকারময় যুগের সূত্রপাত হয়েছিল এবং মুজাফর শাহর রাজত্বের সময় সমগ্র দেশে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, ১৪৯৩ সালে সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন শাহর (১৪৯৪-১৫১৯) সিংহাসন লাভের ফলে তার অবসান হয়। ইতিপূর্বে ছয় বৎসরকাল হাবসী শাসনের যুগে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও অনবরত সিংহাসনের অধিকার হাতবদল হওয়াতে প্রজাসাধারণের মধ্যে কোন নিরাপত্তাবোধ ছিল না। সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। যারা হুসেন শাহর রাজ্যলাভের সুযোগে রাজধানীতে লুটপাটে মন দিয়েছিল, সুলতানের আদেশে তাদের অনেককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল এবং পাইক সৈন্যদের মধ্যে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য দায়ী তাদের বরখাস্ত করা হয়েছিল।

সৈয়দ হুসেন সম্পর্কে কোন কোন বিবরণীতে বলা হয় যে, তিনি আরব দেশ থেকে এসেছিলেন। স্থানীয় কাহিনী অনুসারে তিনি রংপুরের (বাংলাদেশ) স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। আবার মুর্শিদাবাদের চাঁদপাড়ায় তাঁর বাস ছিল বলে প্রচলিত স্থানীয় ঐতিহ্যে দাবি করা হয়। স্বীয় বুদ্ধি, যোগ্যতা ও প্রতিভা বলে তিনি সামান্য অবস্থা থেকে কিভাবে সুলতান মুজাফর শাহর উজীরের পদলাভ করেছিলেন এসম্পর্কে সঠিক তথ্য অজ্ঞাত। তবে হাবসী কুশাসনের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী মনে করে তিনি এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং হাবসী শাসনের পতনের পর সিংহাসনে তাঁর আরোহণ স্বভাবতঃ সর্বসম্মতভাবে সমর্থিত হয়েছিল। রিয়াজ উস সালাতিনে প্রথাগত ভাবে সিংহাসনে তাঁর নির্বাচনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সুলতান হুসেন শাহর সিংহাসন আরোহনের পর সম্ভবতঃ একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন। এই মুদ্রার লিপিতে হুসেন শাহর রাজকীয় উপাধি দেওয়া আছে।* ইতিপূর্বে বরবক শাহর আমলে সমগ্র বঙ্গদেশ গৌড়ের সুলতানের পদানত হয়েছিল। সুলতান হুসেন শাহর আমলের সাহিত্য, মুদ্রা ও লিপি থেকে জানা যায় যে, গৌড়ের প্রাধান্য প্রতিবেশী রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর বিস্তৃত হয়েছিল। এই যুগে অভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপিত হয়, বাণিজ্যের প্রসার হয় ও যুদ্ধবিগ্রহের মারফতে রাজ্যের সীমা বিস্তার লাভ করেছিল। ফলে স্থানীয় অভিজাত ও সৈনিকদের সামরিক দক্ষতার স্ফুরণ হয়। হুসেন শাহর সামরিক অভিযানের ও রাজ্য বিস্তারের কাহিনী মোটামুটি ৫টি ভাগে বিভক্ত করা যায়— (১) বিহারে রাজ্যবিস্তার, (২) কামরূপ ও আসামে যুদ্ধ, (৩) উড়িষ্যার সঙ্গে সংঘর্ষ, (৪) ত্রিপুরার সঙ্গে যুদ্ধ ও (৫) চট্টগ্রাম দখল।

সুলতান হুসেন শাহর রাজত্বকালে দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী ও জৌনপুরের শার্কী সুলতানদের সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে গৌড়ের সঙ্গে দিল্লীর বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। কারণ, ১৪৯৪ সালে শেষ শার্কী সুলতান হুসেন শাহ বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আলাউদ্দীন হুসেন শাহর হুকুমে ভাগলপুরের কহলগাঁও (বর্তমানে কলগঙ্গ) নামক স্থানে সসম্মানে শার্কী সুলতানের বসবাসের স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছিল। এই ঘটনার ফলে গৌড়ের বিরুদ্ধে সিকন্দর লোদী সশস্ত্র অভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ তাঁর পুত্র দানিয়ালকে দিল্লীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ উভয়পক্ষই আপোষে বিরোধ মীমাংসার জন্য রাজী হয়ে একটি সন্ধিতে স্বাক্ষর করেছিল। এই সন্ধির ফলে উভয়পক্ষই অপরপক্ষের শত্রুকে ভবিষ্যতে আশ্রয় না দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। সমকালীন পারসিক বিবরণী অনুসারে লোদী সুলতান এইসময় সমগ্র শার্কী সুলতানের রাজ্য গ্রাস করেছিলেন। কিন্তু মুঙ্গের ও সারণ জিলায় প্রাপ্ত লিপি অনুসারে সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহর প্রাধান্য সমগ্র উত্তর বিহার ও দক্ষিণ বিহারের অংশ বিশেষে স্থাপিত হয়েছিল। এসম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক আব্দুল করিম বাংলার সুলতান ও দিল্লীর সুলতানের মধ্যে আদৌ কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল কিনা এসম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া এই চুক্তি সম্পাদন সত্ত্বেও হুসেন শাহ শার্কী তাঁর জীবদ্দশায় (অন্ততঃ ১৪৯৯ সাল পর্যন্ত) বাংলার সুলতানের আশ্রয়ে ছিলেন। ঐতিহাসিক তরফদারের মতে হুসেন শাহ পরবর্তীকালেও এই সব অঞ্চল দখল করে থাকতে পারেন।**

ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে বাংলার সুলতানরা পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় ক্রমশঃ তাদের প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। প্রথমে সুলতান হুসেন শাহর পূর্বাঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল কামতা-কামরূপের রাজ্য গ্রাস করা। এই রাজ্যটি দীর্ঘকাল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলার সুলতানদের রাজ্যবিস্তারের পথে অলঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি করেছিল।

---

* মমতাজুর রহমান তরফদারের মতে, সুলতান হুসেন শাহ ১৪৯৪ সালে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, রাজস্ব বৃদ্ধি ও সৈন্যদের বেতন হ্রাসের পরামর্শ দিয়ে সৈয়দ হুসেন পরিকল্পিত ভাবে মুজাফ্ফর শাহকে গদিচ্যুত করার পথ প্রশস্ত করেছিলেন।এসম্পর্কে Husain Shahi Bengal by M. R. Tarafdar- পৃঃ-৩৪-৩৭ দ্রষ্টব্য।

** Hussain Shahi Bengal, পৃঃ ৩৯ -- "Husain Shah might have actually occupied these places. but this fact has been either suppressed or ignored by the Persian authorities."

www.pathagar.com

কামতার একজন প্রাক্তন মন্ত্রী তাঁর প্রভু রাজা নীলাম্বরের সঙ্গে বিরোধ করে গৌড়ের সুলতানের দরবারে স্বীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। হাবসী শাসনের বিশৃঙ্খলার সুযোগে কামতার রাজা স্বীয় রাজধানী থেকে করতোয়া নদীর তীরবর্তী ঘোরাঘাট পর্যন্ত সামরিক প্রয়োজনে রাস্তা নির্মাণ করে গৌড়ের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ বিপন্ন করেছিলেন। অতএব খেন বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের বিরুদ্ধে ১৪৯৮ সালে শাহ ইসমাইল গাজির নেতৃত্বে গৌড় থেকে একটি অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। সুরক্ষিত খেন রাজধানী কামতাপুর গৌড়ের সৈন্যদের কাছে সহজে পদানত হয়নি। কিন্তু আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনী সুকৌশলে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করে রাজা নীলাম্বরকে বন্দী করেছিল। কামতা রাজ্য দখল করে অভিযাত্রী বাহিনী হাজো পর্যন্ত পদানত করেছিল। হুসেন শাহর মালদা লিপিতে এসম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে। অহোম বুরঞ্জী অনুসারে কামতা-কামরূপ বিজয়ের পর এই স্থানে দুলাল গাজীর নেতৃত্বে একটি আফগান উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কামতা-কামরূপ অভিযানে সাফল্য সুলতান হুসেন শাহকে আসাম ও উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিযানে উৎসাহিত করেছিল। গৌড়ের সুলতানের বাহিনী এই অভিযানে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করেছিল বলে রিয়াজ উস সালাতিন ও অন্যান্য মধ্যযুগের ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে। সুলতানের প্রত্যাবর্তনের পর শাহজাদা দানিয়ালের উপর এই অভিযানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।* কিন্তু বর্ষার সূত্রপাত হবার সঙ্গে সঙ্গে আসামের রাজার নেতৃত্বে তাঁর সৈন্যরা আক্রমণকারী বাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ও তাদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। অতএব কামতা-কামরূপ জয়ে সাফল্য অর্জন করলেও হুসেন শাহর আসাম অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল।

গৌড়-উৎকল সংঘর্ষ

উড়িষ্যার সীমানা সরস্বতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সমগ্র মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা উড়িষ্যার গজপতি রাজাদের পদানত হয়েছিল। তৎকালীন যুগে উড়িষ্যার শক্তিশালী গজপতি নৃপতিদের সঙ্গে সরস্বতী নদীর** তীরবর্তী দীর্ঘ সীমানা বরাবর হুসেন শাহর বাহিনীর সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত। কিন্তু হুসেন শাহর ১৫১২ সালের সিলেট লিপিতে তাঁকে অন্যান্য স্থান সহ জাজনগর-উড়িষ্যার বিজেতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রিয়াজ উস সালাতিন ও হ্যামিলটনের পাণ্ডুয়াতে আবিষ্কৃত ষোড়শ শতকের বঙ্গদেশের পাণ্ডুলিপিতে হুসেন শাহর উড়িষ্যা পর্যন্ত সকল এলাকা দখলের কথা উল্লিখিত হয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরের ইতিবৃত্ত মাদলাপঞ্জী অনুসারে ১৫০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে ইসমাইল গাজি আরামবাগ জিলার মান্দারনের ঘাঁটি থেকে পুরী অভিযান শুরু করেন ও বিদ্যুৎবেগে কটক, জাজপুর ও অন্যান্য স্থান লুণ্ঠন করেন এবং বহু মন্দির ধ্বংস করেন। এই অভিযানের সাফল্যকে স্মরণীয় করার জন্য এইসময় জাজনগর ও উড়িষ্যার নাম মুদ্রায় অঙ্কিত হয়। প্রতাপরুদ্র দেব ইসমাইল গাজির এই আক্রমণের বার্তা পেয়ে দ্রুত তাঁর দক্ষিণ ভারত অভিযান থেকে সসৈন্যে ফিরে আসেন ও আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করে তাদের মান্দারন ঘাঁটি অবরোধ করেন। এই অবরোধ সফল হয়নি। গোবিন্দ বিদ্যাধর নামে উড়িষ্যার একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বিশ্বাসঘাতকতা করায় শত্রুপক্ষ সমূহ বিপদ থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু চৈতন্যদেবের জীবনী লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, গৌড় ও উৎকলের সীমান্ত বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এইজন্য ১৫০৯ সালে শ্রীচৈতন্য সীমান্ত পার হওয়ার সময় রামচন্দ্র খান নামে একজন উচ্চপদস্থ সীমান্ত কর্মচারী তাঁর

* এই দানিয়ালই সম্ভবতঃ দুলাল গাজি নামে পরিচিত ছিলেন। অনেকের মতে হুসেন শাহ ত্রিহুতও দখল করেছিলেন।

** এই যুগে বর্তমানে শুষ্ক এই সরস্বতী নদী গঙ্গার জলধারা বহন করত।

www.pathagar.com

সহায়তা করেন এবং শ্রীচৈতন্যের প্রত্যাবর্তনের কালেও অনুরূপভাবে সীমান্তে দুই রাজ্যের বিরোধের অবসান হয়নি।

গৌড়-ত্রিপুরা সংঘর্ষ

মোঙ্গলদের একটি শাখা আগরতলা পাহাড়ের পাদদেশ থেকে গোমতী নদীর তীরবর্তী উপত্যকায় বসবাস শুরু করেছিল। এরা তিপরাই নামে পরিচিত ছিল। আগরতলা থেকে মেঘনা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের উপর এদের প্রাধান্য প্রসারিত হয়েছিল। হুসেন শাহ্র সঙ্গে এই তিপরাইদের রাজ্য বা ত্রিপুরার সংঘর্ষ শুরু হয়। ইতিপূর্বে বঙ্গদেশের সুলতানদের সঙ্গে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে এই রাজ্যের সংঘর্ষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ সুলতান জালালউদ্দীন মহম্মদ ত্রিপুরা রাজ্যের একাংশ দখল করেছিলেন। সুলতান হুসেন শাহ্র সঙ্গে ত্রিপুরার সংঘর্ষের বিবরণী দিতে গিয়ে পরবর্তীকালের ইতিবৃত্ত রাজমালাতে বলা হয়েছে যে, হুসেন শাহ্ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে পরপর চারিটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। প্রথম অভিযান সম্পর্কে বলা যায় যে, এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় অভিযানের প্রাথমিক সাফল্যের ফলে বাংলার সৈন্যবাহিনী গৌর মালিকের নেতৃত্বে ত্রিপুরার রাজধানী রঙ্গমতীর দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এইসময় ত্রিপুরার সেনাপতি সুকৌশলে বিজয়ী বাহিনীর অগ্রগতি রোধের জন্য গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়ে নদীর জল অবরুদ্ধ করেছিলেন। ফলে যে চড়া পড়েছিল তা দিয়ে যখন শত্রুসৈন্য গোমতী পার হবার জন্য সচেষ্টা হয়েছিল তখন বাঁধ কেটে দিয়ে ত্রিপুরার সৈন্যরা জল ছেড়ে দেয়। ফলে আক্রমণকারী বাহিনীর অধিকাংশ জলের তোড়ে ভেসে যায়। তৃতীয় অভিযানও সাফল হয়নি। চতুর্থ অভিযানে কালিয়াগড় দুর্গের কাছে একটি সংঘর্ষের পর এই অভিযান অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। অনেকের ধারণা হুসেন শাহ্র ত্রিপুরা অভিযানের ফলে সম্ভবত এই রাজ্যের একাংশ বাংলার সুলতানের পদানত হয়েছিল। ১৫১৩ সালের সোনারগাঁওর লিপিতে খাওয়াস খানকে ত্রিপুরার সর-ই-লস্কর (সেনাপতি) ও মুয়াজমাবাদের উজীর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে একটি ত্রয়ী সংগ্রাম শুরু হয়। এই সংঘর্ষে গৌড়, ত্রিপুরা ও অরাকান বিজড়িত ছিল। ত্রিপুরার রাজা ধনমানিক্য মগেদের সাহায্যে ১৫১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৫১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ্র কাছ থেকে চট্টগ্রাম দখল করেন। রাজমালার বিবরণ অনুসারে হুসেন শাহ্র ত্রিপুরা অভিযানের পরও এই স্থান ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনস্থ ছিল। অবশেষে হুসেন শাহ্ এই স্থানের উপর প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু গৌড়-ত্রিপুরা সংঘর্ষের সুযোগে আরাকানের অধিপতি চট্টগ্রাম দখল করেন। হুসেন শাহ্র সেনাপতি পরগল খাঁ ও পরে তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ মগেদের বিরুদ্ধে অভিযান করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ফলে চট্টগ্রাম হুসেন শাহ্র পদানত হয়েছিল। পরগলী মহাভারত ও শ্রীকর নন্দনীর অশ্বমেধপর্বে এসম্পর্কে উল্লেখ আছে। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী ডি বরোজ বলেন, চট্টগ্রাম বাংলার সুলতানের অধীনস্থ ছিল ও আরাকানের রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

হুসেন শাহ্ সারাজীবন যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন এবং একমাত্র আসাম অভিযান ছাড়া তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি সামরিক পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করেছিল। উত্তর-পশ্চিমে সরন ও বিহারের প্রাক্তন শার্কী রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল থেকে দক্ষিণপূর্বে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং উত্তর-পূর্বে হাজো ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মান্দারন ও চব্বিশ পরগনা তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হুসেন শাহ্ স্বয়ং বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর রাজকর্মচারীদের মধ্যে রূপ ছিলেন সাকর মালিক ও তাঁর ভ্রাতা সনাতন ছিলেন সুলতানের দবিরখাস, জগাই ও মাধাই ছিলেন নবদ্বীপের কোতয়াল। গোপিনাথ বসু ছিলেন সুলতানের বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও মুকুন্দ দাস ছিলেন হুসেন শাহ্র

www.pathagar.com

চিকিৎসক। এছাড়া সুলতানের প্রধান দেহরক্ষী ছিল। কেশবচন্দ্র ছত্রী ও টাকশালের প্রধান ছিলেন অনুপ। রসমালার বক্তব্য অনুসারে ত্রিপুরা অভিযানের সময় তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গৌড় মালিক। এই সময় বাংলা সাহিত্যের বিকাশের মূলে ছিল সুলতান ও তাঁর পার্ষদদের পৃষ্ঠপোষকতা। বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত (ছোট বিদ্যাপতি), যশোবাজ খানের ন্যায় সাহিত্যিক এইযুগকে অলঙ্কৃত করেছিল। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরগল খান পরমেশ্বরকে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করতে বলেছিলেন। তাঁর পুত্র ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের গৌড়ে আগমনের সময় সুলতান তার রাজকর্মচারীদের এই সন্ন্যাসীকে সর্বদা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে ও সর্বপ্রকার সুবিধা দান করতে হুকুম দিয়েছিলেন। মুসলমান শেখ ও সুফীরা সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। পাণ্ডুয়াতে শেখ কুতুব-উল-আলমের সমাধিতে তিনি প্রায়ই পরিদর্শন করতেন। সুলতান এইস্থানকে যথাযথভাবে সংরক্ষিত করার জন্য সাহায্য করেছিলেন। প্রজাসাধারণের কাছে সুলতান হুসেন শাহ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। এইজন্য লোকে তাঁকে 'নৃপতিকুলতিলক' ও 'জগৎভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

নাসিরউদ্দীন আবুল মুজাফ্ফর নসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ)

সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দীন আবুল মুজাফর নসরত শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। সিংহাসনে আরোহনের পূর্বে তাঁকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং ১৫১৫ সালেই নসরত শাহর নাম মুদ্রায় অঙ্কিত হয়েছিল। সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে সিংহাসনে আরোহনের সময় তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল এবং সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তিনি ভাল ভাবেই অবহিত ছিলেন। নসরত শাহর কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ক্ষুরধার ও তৎকালীন যুগের কূটনৈতিক জটিলতার সমাধানের সূত্র নির্ণয়ে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

নসরত শাহর সিংহাসন আরোহনের পর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পূর্ব ও পশ্চিমে রাজ্যসীমা বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এইসময় পূর্ব ভারতে সুলতান ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে আফগানরা জোটগঠনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। নসরত শাহ স্বীয় রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্খাকে ফলপ্রসূ করতে সক্রিয় হয়েছিলেন। গুলাম হুসেন সেলিমের মতে, সুলতান নসরত শাহ ত্রিহুত পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৫২২ সালে বিহারের লোহানী আফগানরা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল ও জৌনপুর থেকে পাটনা পর্যন্ত অঞ্চলে তাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। বাংলার সুলতানের সঙ্গে স্বভাবতই লোহানীদের মৈত্রী স্থাপিত হয়। কারণ, উত্তর বিহারে ত্রিহুত ও হাজিপুর গণ্ডক-গঙ্গার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত গৌড়ের সুলতানদের পদানত ছিল। গণ্ডকের অপরপারে ও ঘর্ঘরার দুই তীরে আজমগড় পর্যন্ত বাংলার সুলতানদের অধিকার বিস্তৃত ছিল।

১৫২৬ সালে উত্তর ভারতে আফগান প্রাধান্যের অবসান হয় এবং বাবর দিল্লী ও আগ্রা দখল করেন। এইসময় নসরত শাহ মুঘল আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দোয়াব অঞ্চল থেকে বিতাড়িত আফগানরা এই সময় পূর্বদিকে আশ্রয়প্রার্থী হওয়াতে নসরত শাহর পক্ষে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। আফগানদের নেতা মারুফ (Maruf) ও নাসির লোহানীর বাহিনী মুঘলদের কাছে পরাজিত হয়ে কনৌজ ও জৌনপুর থেকে বিতাড়িত হয় এবং গাঙ্গেয় অঞ্চলে ঘর্ঘরার দক্ষিণে মুঘল প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। বাবরের বিরুদ্ধে এইসময় বিহারের বাহার খান লোহানীর মৃত্যুর পর মামুদ লোদীর নেতৃত্বে একটি মুঘল বিরোধী আফগান ঐক্য গড়ে উঠেছিল। বিয়াজিদ, বিবন (Biban), ফতে খান, শেরখান শূর প্রভৃতি আফগান নেতারা এই দলে যোগদান করেন। এই আফগান গোষ্ঠীর মুঘলদের উপর

www.pathagar.com

ত্রিমুখী আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল। প্রধানতঃ মামুদ লোদীর অযোগ্যতা, আফগান নেতাদের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও স্বার্থের সংঘাতের ফলে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। নসরত শাহ এই আফগান গোষ্ঠীর সঙ্গে বিজড়িত ছিলেন বলে বাবরের আত্মজীবনী ও সমকালীন ইতিবৃত্তে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।* কিন্তু তৎসত্ত্বেও নসরত শাহর সঙ্গে মুঘলদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। কারণ, বাবর দাবি করেছিলেন যে, মুঘল বাহিনীকে ঘর্ঘরা পার হবার সময় কোন বাধা দান করা চলবে না। নসরত এই দাবি ও মুঘলদের অন্যান্য দাবির বিষয়ে দীর্ঘসূত্রতার নীতি গ্রহণ করেন। বাংলার সুলতানের দূত ইসমাইলকে বাবর যে তিনটি শর্ত দিয়েছিলেন তা হল— (১) মুঘল সৈন্যদের বিনা বাধায় বাংলার সুলতানের অধিকৃত এলাকায় যাতায়াত করতে দেওয়া হবে; (২) বাংলার বাহিনীকে খরিদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে; ও (৩) বাংলার বাহিনীকে মুঘলদের প্রতি কটূক্তি (unbecoming words) করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এইসব শর্তের লক্ষ্য ছিল, ঘর্ঘরা ও গঙ্গা নদী খরিদে বিনাবাধায় পার হবার উদ্দেশ্যে বাবর বাংলার সুলতানের সৈন্যবাহিনীকে অপোষ-আলোচনার মারফতে অপসারিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নসরত শাহ এইসব শর্তের কোন সুস্পষ্ট জবাব দেননি বরং গঙ্গা ও ঘর্ঘরা নদীর সঙ্গমস্থলে ও তীরবর্তী অঞ্চলে মুঘলবাহিনীকে বাধাদানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। ১৫২৯ সালের মে মাসে খরিদের ফেরিঘাটের কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মুঘল-বিরোধী আফগান আঁতাতের কাছ থেকে এই যুদ্ধে নসরত শাহ কোন সাহায্য লাভ করেননি। তবে তাঁর কূটকৌশলের ফলে প্রায় দুই বৎসর কাল এই অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষ স্থগিত ছিল। মুঘল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে বাংলার সুলতান পরাজিত হয়েছিলেন। ফলে ঘর্ঘরার পূর্ব তীর পর্যন্ত বাবরের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল ও মুঘল-বিরোধী আফগানদের পরাস্ত করা বাবরের পক্ষে সহজ হয়েছিল। এইসময় বাবর বাংলার দ্বারদেশ ত্রিহুত অবধি পৌঁছে গিয়েছিলেন। এখান থেকে তিনি গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল দিয়ে গণ্ডক ও কোশী নদী পার হয়ে বাংলার রাজ্য সীমানার মধ্যে হানা দিতে পারতেন। কিন্তু অযোধ্যা ও বিহারের পরিস্থিতির উপর সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের পূর্বে বাবর পূর্বদিকে রাজ্যসীমা বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি বাংলার সুলতানের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন ও তাঁর রাজ্যসীমা লংঘন করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে দেওয়া তিনটি শর্ত স্বীকার করে নিয়ে নসরত শাহ অবশেষে বাবরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। মুঘল বিরোধী আফগান আঁতাতে নসরত শাহ সামিল ছিলেন বলে যে ধারণা অনেকে পোষণ করেন অধ্যাপক আব্দুল করিমের মতে তাঁদের যুক্তি ভিত্তিহীন। কারণ, সমকালীন ইতিবৃত্তে বা বাবর নামায় এসম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। স্টুয়ার্ট মন্তব্য করেছিলেন যে, দেওরার যুদ্ধে নসরত শাহ পরোক্ষভাবে মামুদ লোদীকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে আব্বাস শেরওয়ানী, বাদায়ুনী, ফিরিস্তা, নিজাম উদ্দীন, গুলবদন বেগম ও জৌহর যাঁরা এই ঘটনা সম্পর্কে তথ্য দিয়েছিলেন তাঁদের লেখনীতে এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই।** বাহাদুর শাহ গুজরাটে হুমায়ুনের বিরোধিতা শুরু করলে নসরত শাহর তাতে সমর্থন ছিল। কিন্তু গুজরাটের সঙ্গে আঁতাত গঠনের আগেই তাঁর জীবনের অবসান হয়।

বাবরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের বৎসর সুলতান নসরত শাহর সঙ্গে অহোমদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষ চরম পর্যায় পৌঁছেছিল। ইতিপূর্বে নসরত শাহ ১৫২৭ সালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উপরিভাগে অভিযান করে পূর্বসীমান্তে অহোমদের সঙ্গে একটি দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের সূত্রপাত করেছিলেন। বুরুঞ্জী বিবরণ অনুসারে ১৫২৯ সালে অহোম নৃপতি ব্রহ্মপুত্র নদের কিনারা দিয়ে

* Husain Shahi Bengal, পৃঃ ৭০-৭২ দ্রষ্টব্য।

** ঐ পৃঃ ৭৫-৭৬

www.pathagar.com

বাংলার সুলতানের এই অঞ্চলে সদর ঘাঁটি হাজো পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়েছিলেন। এছাড়া নৌযুদ্ধে তেমানিতে (ত্রিমোহিনী) বাংলার নৌবাহিনী অহোমদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে বাংলার সুলতানের বাহিনী কামরূপের দিকে সরে যায়। অতঃপর তারা বিট মালিকের নেতৃত্বে অহোমদের সিংগিরি ঘাঁটি আক্রমণ করেছিল। কিন্তু বিট মালিকের সিংগিরি দখলের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। ১৫৩২ সালে সুলতান নসরত শাহর মৃত্যুর পর বাংলার সেনাপতি তুরবক আহমদ অহোমদের সিংগিরি ও সালার ঘাঁটি সম্পূর্ণরূপে কব্জা করেছিলেন। কিন্তু পর পর দুইটি নৌ-যুদ্ধে একটি শিবসাগর জিলায় দিকরাই নদীতে অন্যটি তেজপুর জিলায় ভারালী নদীতে তুরবক অহোমদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। ফলে আসাম ও কামতায় বাংলার সুলতানদের প্রাধান্যের অবসান হয়।

সুলতান নসরত শাহ একজন আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুলতান একজন দূরদর্শী রাজনৈতিক হিসেবে স্বীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। নসরত শাহ পূর্বতন উদার ঐতিহ্য বজায় রেখে সরকারি কাজে ও সৈন্যবাহিনীতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ দান করেছিলেন। সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় নসরত শাহ ও তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অগ্রণী ছিলেন। পরগল খাঁর পুত্র ও তাঁর পরবর্তী চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকরনন্দী অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। আরেকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর কবিরঞ্জনের লেখনীতে সুলতান নসরত শাহর সপ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায়। নসরত শাহর রাজত্বকালে ১৫২৬ সালে গৌড়ে বড়ে সোনা মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদের আয়তন গৌড়ের অন্যান্য সৌধের আয়তনের তুলনায় বৃহত্তর ছিল। বৈদেশিক বিশেষতঃ সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে যে ধনাগম এইযুগে হয়েছিল তার প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও শহর এবং গঞ্জে নির্মিত মসজিদ ও সৌধের স্থাপত্যে। উদাহরণ স্বরূপ ১৫২৯ সালে সাতগাঁওতে, ১৫২৩ সালে সোনারগাঁওতে এবং ১৫২৩ সালে অজয়ের তীরবর্তী মঙ্গলকোটে নির্মিত মসজিদের কথা উল্লেখ করা যায়। সুলতান নসরত শাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৫৩২-৩৩ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তিনি মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করেছিলেন।

গিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রীঃ)

গিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে গদিচ্যুত করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এইসময় পুনরায় মুঘল বিরোধী একটি আঁতাত গঠন করার সম্ভবনা উজ্জ্বল হয়েছিল। কারণ বিহারের লোহানী আফগানরা ও শের খাঁ কেহই আন্তরিকভাবে মুঘলদের প্রতি অনুগত ছিলেন না। কিন্তু সুলতান মামুদের এই ধরনের আঁতাত গড়ার মতো কূটনৈতিক দক্ষতা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। ১৫৩৩ সালে হাজিপুরের বিদ্রোহী শাসনকর্তা মকদুমকে শাস্তিদানের জন্য বিহারের লোহানী শাসকের সঙ্গে মৈত্রী করে সুলতান মামুদ শাহ মুঙ্গেরের শাসনকর্তা কুতুব আলমকে সসৈন্যে হাজিপুরে প্রেরণ করেছিলেন। এই ব্যাপারে শের খাঁর মতামত তিনি অগ্রাহ্য করেন। ফলে বাংলার সুলতানের প্রেরিত বাহিনী পরাজিত হয় ও কুতুব আলম শের খাঁর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলেন। পরবর্তী আরেকটি অভিযানে বাংলার সুলতানের বাহিনীর হাতে মকদুম পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন কারণ, এই সময় শের খাঁ লোহানীদের বিরোধিতায় হাজিপুরে সাহায্য প্রেরণ করতে পারেননি। শের খাঁর অভিভাবকত্বে অধৈর্য জালাল খান লোহানী এইসময় সুলতান মামুদ শাহর আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সাহায্যে শের খাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। সুলতান মামুদ শাহ জালাল খানকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি সেনাপতি ইব্রাহিম

www.pathagar.com

খানকে বিহারে লোহানীদের সহায়তা করার জন্য সসৈন্যে প্রেরণ করেন। শের খাঁ ১৫৩৪ সালে সুরজগড়ের যুদ্ধে ইব্রাহিম খানকে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন। ফলে বিহারে ভাগলপুর পর্যন্ত শের খাঁ স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ঘটনায় বাংলার সুলতানের সামরিক শক্তির দুর্বলতা প্রকট হয়েছিল। ১৫৩৫ সালে শের খাঁ ঝাড়খণ্ডের মধ্যে দিয়ে সসৈন্যে গৌড়ের দ্বারদেশে হানা দিয়েছিলেন এবং সুলতান মামুদ শাহ প্রচুর উপঢৌকনের বিনিময়ে শের খাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পর্তুগীজ বিবরণী অনুযায়ী বাংলার সুলতান এইসময় শের খাঁকে ১৩ মণ সোনা দিয়ে শান্তি স্থাপন করেন। পরবর্তী বৎসর শের খাঁ পুনরায় সসৈন্যে গৌড় অবরোধ করেছিলেন। গৌড়ের সুলতানকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ও হুমায়ুন শের খাঁর ক্ষমতা খর্ব করার জন্য পূর্বদিকে অগ্রসর হন। কিন্তু পথে চুনার দখলের জন্য তিনি মূল্যবান সময়ের অপব্যবহার করেছিলেন। ফলে ইতিমধ্যে ১৫৩৮ সালের ৫ই এপ্রিল গৌড়ের পতন হয়। মামুদ এইসময় উত্তর বিহারে পলায়ন করে মুঘল সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে শের খাঁর হস্তে তাঁর দুই পুত্রের নিধনের বার্তা শুনে তিনি ভগ্নহৃদয়ে দেহত্যাগ করেন। নসরত শাহর সময় থেকে পর্তুগীজদের বাংলাদেশে আগমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই।

হুসেন শাহী যুগের গুরুত্ব — শাসনব্যবস্থা

হুসেন শাহী সুলতানদের রাজত্বকাল বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এইযুগে পশ্চিম ও পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে মিলমিশ লক্ষণীয়। ইতিপূর্বেকার রাঢ়া, বারেন্দ্র, বঙ্গ ইত্যাদি বিভাগের কথা লোকে বিস্মৃত না হলেও বাংলা বা বঙ্গদেশ বলতে এইসময় চট্টগ্রাম থেকে মান্দারণ, বঙ্গোপসাগর থেকে আসামের পার্বত্য এলাকার সীমা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলকেই ধরা হত। এই যুগে বঙ্গদেশের সীমানায় বিশেষ করে পশ্চিম প্রান্ত থেকে বিভিন্ন আফগান ও পরে মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এই সুলতানী বংশের সংগ্রামের সঙ্গে বাঙালীর স্বাতন্ত্র, সংস্কৃতি ও সংহতির চিন্তা জড়িত ছিল। শাসকগোষ্ঠী ও শাসিতের মধ্যে এই সূত্রে সহানুভূতির বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল। হুসেন শাহী শাসকদের রাজত্বকালে দেশের সীমানা সম্প্রসারণ, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন ও ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বংশের প্রথম দুইজন শাসকের সামরিক সাফল্য অসাধারণ কূটনৈতিক দক্ষতার ফলশ্রুতিতে এবং তৎসহ লোদী শার্কী ও খেন বংশীয় শাসকদের অবনতির জন্য বঙ্গদেশের রাজ্যসীমা প্রসারিত হয়েছিল। ফলে পশ্চিমে ঘর্ঘরা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত এলাকা বঙ্গদেশের রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ও পূর্বে চট্টগ্রামের উপর হুসেন শাহী বংশের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়েছিল এবং উত্তরে কামরূপ তাদের রাজ্যের অংশরূপে গণ্য হয়েছিল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে পরাজয় সত্ত্বেও এইসব এলাকার বহু অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করে হুসেন শাহ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন।

দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে সংঘর্ষের পরিণতিতে অবশেষে ভাগলপুর পর্যন্ত বঙ্গদেশের সীমানা প্রসারিত হয়। ছোটে সোনা মসজিদের একটি লিপিতে হুসেন শাহ ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষক উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এই ধরণের উপাধি গ্রহণ করে তাঁর বিশেষ শক্তি বৃদ্ধি হয় নাই কিন্তু সুন্নী মুসলমানদের আনুগত্য লাভের উদ্দেশ্যে হুসেন শাহ এই ধরনের সম্মানসূচক অলঙ্করণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এসম্পর্কে সন্দেহ নাই।

দিল্লীর সুলতানদের ভবিষ্যতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্বীয় রাজ্যকে শক্তিশালী করার জন্য হুসেন শাহী শাসকরা শাসনব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ ও প্রজাসাধারণের সহানুভূতির উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। সমকালীন লিপিতে যেসব তুর্কী, আফগান বা বৈদেশিক

www.pathagar.com

সামরিক শাসকদের নাম পাওয়া যায় তারা শাসনব্যবস্থার কাঠামোকে নিরপেক্ষ রেখেছিলেন এসম্পর্কে সন্দেহ নাই। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থরা এমন কি নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গেও শাসকশ্রেণীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং তারা শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। শাসনব্যবস্থায় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা গুরুত্ব পেয়েছিলেন। এই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির ফলে রাজ্যের সংহতি ও শক্তি স্বভাবতই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হুসেন শাহী যুগের শাসনব্যবস্থায় সুলতান স্বৈরতান্ত্রিক শাসক ছিলেন। হুসেন শাহ নিজেকে ইসলামের রক্ষক বলে ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। সুলতানের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী যুক্ত ছিলেন। এইসব কর্মচারী সৈয়দ, মুঘল, পাঠান ও হিন্দুদের মধ্যে থেকে যোগ্যতা অনুযায়ি নির্বাচিত হতেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁ হুসেন শাহর উজীর ছিলেন। সনাতন ও রূপ দুই ভ্রাতা সুলতানের দরবারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন ও তাঁরা দু'জনে যথাক্রমে দবির খাস ও সাকর মালিক উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কেশবছেত্রী সুলতানের প্রধান দেহরক্ষী ছিলেন ও গৌড় মাল্লিককে ত্রিপুরার অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হাজিপুরে মকদুমের ন্যায় শাসনকর্তা স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। হুসেন শাহী বংশের শাসনকালে অভিজাতশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা খান-ই-আজম, মালিক-উল-উমরা প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন। উত্তরভারতের আমির-ওমরাহদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য ছিল না। পাল ও সেন যুগের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে এবিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। বখতিয়ার খলজী বঙ্গবিজয়ের পরে এদেশে যে শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তার ভিত্তি ছিল সামন্ততান্ত্রিক এবং বিভিন্ন সামরিক শাসনকর্তাদের রাজ্যশাসনের জন্য বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব দেওয়া হত। পরবর্তীকালে সামান্য হেরফের সত্ত্বেও এই ব্যবস্থাই মোটামুটি ভাবে চালু ছিল।

হোসেন শাহী আমলে রাজ্যে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। এই বাহিনীতে পদাতিক, গোলন্দাজ, অশ্বারোহী ও হস্তিবাহিনী ছিল। এই যুগে বঙ্গদেশের শক্তিশালী নৌবাহিনী জলপথে সীমানা রক্ষা করত ও সামরিক অভিযানের সহায়ক ছিল। হুসেন শাহী আমলের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করবার উদ্দেশ্যে অনেকসময় পর্তুগীজদের নিযুক্ত করা হত।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা

রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে প্রাক্-মুঘল বঙ্গদেশে সম্ভবত ইকতা বা এই জাতীয় কোন প্রথার প্রচলন ছিল ও সামরিক শাসনকর্তারা রাজস্ব স্বত্ব লাভ করতেন। বাবরের আমলে বঙ্গদেশের শাসনকার্যে বিকেন্দ্রীকরণের যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এবং বঙ্গসাহিত্যে প্রাদেশিক শাসনে রাজস্ব আদায়কারী টিকাদারের (revenue farmer) যে চিত্র পাওয়া যায় তা থেকে এরূপ অনুমান করা স্বাভাবিক। রাজস্বই ছিল সুলতানদের আয়ের প্রধান উৎস। গড় শস্য উৎপাদনের ভিত্তিতে রাজস্ব আদায় করা হত। অন্যান্য আয়ের উৎস ছিল বন্দর, নদী পারাপারের ঘাট, নগরের প্রবেশপথ প্রভৃতি স্থান থেকে শুল্ক আদায় ইত্যাদি। অভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি ও বহির্বাণিজ্যের ফলে হুসেন শাহী যুগে বঙ্গদেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং দেশের আর্থিক উন্নতি হয়।

হুসেন শাহ আমলে জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের ফলে বহুলোকের জন্য কর্মসংস্থান সম্ভবপর হয়েছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এযুগে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। হুসেন শাহী আমলে অকুণ্ঠ জনসমর্থনের ফলে সরকার শক্তিশালী হয়েছিল। দেশে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবজাগরণ দেখা যায়। এই যুগের সমৃদ্ধির প্রতিফলন

www.pathagar.com

পাওয়া যায় নানা স্থানে নগরায়ণের মধ্য দিয়ে। কেবলমাত্র গৌড়, পাণ্ডুয়া, সাতগাঁও, সোনারগাঁও নয় এই সময় আরো বহু নগরীর পত্তন হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে জমি প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়— পতিত ও কর্ষণযোগ্য জমি। জমিদার ও প্রজার উপর রাজকর্মচারীদের শোষণ ও অবিচার সম্পর্কে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বলা হয়েছে, ডিহীদার মামুদ শরীফের আদেশে ১৫ কাঠায় বিঘার মাপ নির্দেশ করা হয়েছিল। এক বিঘার মাপ ১৫ কাঠা থেকে বেশী একথা সহজে অনুমেয়। সম্ভবতঃ প্রচলিত রীতি অনুসারে ২০ কাঠা জমিকেএক বিঘা বলা হত এবং ১৫ কাঠাকে এক বিঘা বলে গণ্য করে অনেক সময় কৃষককে বঞ্চিত করা হত। জমিদার ও কৃষকের সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় না। বঙ্গদেশের এই সময়ের সমৃদ্ধির কারণ বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি। ফলে বহুলোক, কারিগর ও শিল্পী হিসেবে শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত ছিল। এইসব শিল্পীর দক্ষতা দেশে বিদেশে সুপরিচিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলার মসলিন পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হত। বঙ্গদেশে প্রচুর রেশমবস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল। বাংলার স্বর্ণকাররা সোনা ও রূপার গহনা নির্মাণে নৈপুণ্য অর্জন করেছিল। চীনা ভ্রমণকারীরা গাছের ছাল থেকে কাগজ তৈয়ারীর কথা উল্লেখ করেছেন। বহির্দেশীয় ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে প্রমাণ করে যে, অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য এইসময় যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল। বঙ্গদেশে আমদানীকৃত পণ্যের মধ্যে ছিল লবণ ও মূল্যবান হীরা, জহরত; এবং রপ্তানীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল চাল, গম, তুলা, বস্ত্র, চিনি এবং রেশমবস্ত্র। বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে প্রচুর স্বর্ণের আমদানী হয়েছিল এবং হুসেন শাহী যুগের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। কিন্তু রৌপ্যমুদ্রার প্রচলনই ছিল বেশী। মুদ্রা হিসেবে এইযুগে কড়িরও প্রচলন ছিল। বহির্বাণিজ্যে চিনি, চাল, গম ও অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে সুপারী, তেল, আদা ও বিভিন্ন ফল ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও বহির্বিশ্বে রপ্তানী করা হ'ত। সাধারণতঃ নৌবাণিজ্যের উন্নতির জন্য বাইরের জগতের সঙ্গে যোগসূত্র সহজ হয়েছিল। বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণীতে, মধ্যযুগের প্রবাদে ও প্রচলিত কাহিনীতে এবং তৎকালীন বাংলার সওদাগরদের বিদেশ যাত্রার কথা বলা হয়েছে। চীনা ভ্রমণকারী মৌহান বাংলার সমুদ্রগামী জাহাজের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'এসব ব্যয়বহুল জাহাজ যাতে তারা বৈদেশিক জাতিদের সঙ্গে ব্যবসা করত; এদের অনেকগুলিই বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল'। বিজয় গুপ্ত ও বংশীদাসের মনসামঙ্গলে এবং কবিকঙ্কনের চণ্ডীতে বাণিজ্যের জন্য বাঙালী সওদাগরদের সপ্তডিঙা তরী বেয়ে বিদেশযাত্রার বর্ণনা আছে। কবিকঙ্কনের চণ্ডীতে পর্তুগীজদের জলদস্যুতার বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—

ফিরঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে,
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে।

ইতালীয় ভ্রমণকারী বার্বোসার বিবরণী ও বার্থেমার বক্তব্য পাঠে জানা যায় যে, তৎকালীন যুগে প্রধানতঃ দুইটি সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ ছিল। একটি দক্ষিণ-পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ, আরাকান, পেগু, থাইল্যান্ড, মালাক্কা, ইন্দোনেশিয়া, চম্পা প্রভৃতি স্থান হয়ে চীন পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। অপরটি দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে উড়িষ্যা, করমণ্ডল উপকূল, শ্রীলঙ্কা, মালাবার উপকূল দিয়ে পারস্য উপসাগর ও আরবসাগর হয়ে আরব দেশ ও আবিসিনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সমুদ্রগামী জাহাজ সম্ভবতঃ সোনারগাঁও পর্যন্ত মেঘনার পথে যাতায়াত করতে পারত। সপ্তগ্রাম বন্দর মধ্যযুগের সাহিত্যে নৌবাণিজ্যের কেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল এবং প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরের স্থান অধিকার করেছিল। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের মধ্যে ছিল সাতগাঁও, সোনারগাও ও চট্টগ্রাম। শেষোক্ত স্থানকে পর্তুগীজরা পোর্ট গ্র্যান্ডী নামে অভিহিত করতেন। বাংলা, ত্রিপুরা ও আরাকানের রাজ্যের মধ্যে এইসব বন্দর দ্বন্দ্বের কারণ হয়েছিল। জোয়াও দ্য বারোসের (Joa de Barros 1496-1570 AD) মানচিত্রে শেষোক্ত

www.pathagar.com

তিনটি স্থানের নাম আছে। পর্তুগীজরা হুসেন শাহী বংশের রাজত্বের শেষার্ধে চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও অঞ্চলে ফ্যাক্টরী নির্মাণ ও শুল্ক আদায়ের অধিকার লাভ করেছিল। বারোসের বক্তব্য অনুসারে গৌড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের প্রাচুর্য সম্পর্কে বিদেশী ভ্রমণকারীরা বারংবার উল্লেখ করেছেন। পঞ্চদশ শতকে এদেশে আগত চীনা পর্যটকরা পোষাকে ও অলঙ্কারে বঙ্গদেশের মানুষের জাঁকজমক দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। আরব ভ্রমণকারী ইবন বতুতাকে একজন স্থানীয় অধিবাসী বলেছিলেন যে, মাত্র এক টাকা ব্যয়ে তাঁর স্ত্রী ও ভৃত্য-সহ সারা বছরের খরচ-খরচা নির্বাহ হত। এতদ্‌সত্ত্বেও কবিকঙ্কন চণ্ডী ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যপাঠে জানা যায় যে, প্রাচুর্যের পাশাপাশি দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের জীবনে অনটন নিত্যসঙ্গী ছিল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

উত্তর ভারতের সঙ্গে এই যুগে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে বাংলাদেশ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করার সুযোগ লাভ করেছিল। এইযুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্ফুরণ সম্পর্কে উল্লেখ করে ঐতিহাসিক তরফদার বলেছেন যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইসময় একটি রেনেসাঁ বা নবজন্ম দেখা যায়।* হুসেন শাহী যুগের শাসকরা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং জনসংযোগের এই মাধ্যমকে জনপ্রিয়তার অন্যতম বাহন বলে গণ্য করতেন।** সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ন ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ, লৌকিক দেবদেবীর কাহিনী ও স্থানীয় সাহিত্যের বিকাশে সুলতান ও তাঁর আমলাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবও এযুগে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এইযুগে ফার্সী ও আরবী ভাষাও অবহেলিত হয়নি।

হুসেন শাহী আমলে অনুসৃত সকল ধর্মের প্রতি উদারতা ও সমন্বয় নীতি এযুগের সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম কারণ। মনসামঙ্গলের লেখক বিজয়গুপ্ত সুলতান হুসেন শাহকে 'নৃপতি তিলক' বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজ বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে সুলতান হুসেন শাহর প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন। কবি যশোরাজ খান বসু সুলতান হুসেন শাহর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তিনি সুলতান হুসেন শাহকে কবি 'জগৎভূষণ' বলে উল্লেখ করেছেন।

চট্টগ্রামের শাসক পরগল খাঁর উৎসাহে কবিন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের অংশবিশেষের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। পরগল খাঁর পুত্র ও চট্টগ্রামের পরবর্তী শাসক ছুটী খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবি শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্বের রচনা করেন। সুলতান ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অনুসরণ করে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকরাও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ষোড়শ শতকে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের জন্য শ্রীচৈতন্যের জীবনী কাব্যের বিশেষ অবদান আছে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবৎ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন। এছাড়া লৌকিক সাহিত্য, জনগণের বিশ্বাস ও পৌরাণিক কাহিনী সম্বলিত মঙ্গলকাব্য এযুগের বাংলা সাহিত্যের বিকাশের অন্যতম নিদর্শন।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য রাজসভায় সমাদৃত না হলেও বাংলা ও মিথিলায় সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে এযুগে অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস ছিল চৈতন্যজীবনী ও রাধাকৃষ্ণ লীলা কাহিনী। মুরারী গুপ্তের চৈতন্যচরিতামৃতই ছিল সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত প্রথম গ্রন্থ। হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণ লীলা নিয়ে

* M. R. Rahaman- Husain Shahi Bengal- "There was a renaissance in the field of literature", পৃঃ ৩৫০।

** অবদুল করিম - বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল পৃঃ ৪৩৮ - ৪৩৯ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

দানকেলী কৌমদী, ললিতমাধব ও বিদগ্ধ মাধব নামক নাটক রচনা করেছিলেন। বাংলাদেশের পণ্ডিতগণ এই যুগে স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রের চর্চায় সময় ব্যয় করতেন। এইযুগে নব্যন্যায়ের চর্চার জন্য নবদ্বীপ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। রঘুনন্দনের ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনা ও তর্কশাস্ত্রে রঘুনাথ শিরোমণির যশ এবং শ্রীচৈতন্যের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি এযুগে সুপরিচিত ছিল। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এইসময় বঙ্গদেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়ন হয়। কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিতদের অনেকেরই লক্ষ্য ছিল প্রাচীন ধর্মীয় প্রথা ও নিয়মগুলিকে পুনরুজ্জীবন করে নতুনের জোয়ারের বিরুদ্ধে বাঁধ দেওয়া। ফলে তাঁরা সামাজিক প্রগতি ও পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন।

হুসেন শাহী আমলে বাংলার স্থাপত্য ও শিল্প

পূর্বতন ইলিয়াস শাহী এমনকি আবিসিনীয় যুগের শিল্পের ধারাকে অনুসরণ করলেও বহু বিষয়ে হুসেন শাহী আমলের স্থাপত্য ও শিল্প বৈশিষ্ট্য পূর্বতন শিল্পরীতির থেকে পৃথক। এইসময় প্রচলিত শিল্পধারার মধ্যে অলঙ্করণের প্রবর্তন করা হয়েছিল। হুসেন শাহী আমলে নির্মিত যেসব স্থাপত্য শিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়েছে তাদের গঠন বৈচিত্র্যের বিশেষত্বকে অতুলনীয় বলা যাবে না। দীর্ঘ ও নিম্নাভিমুখী সম্মুখভাগ বিশিষ্ট আয়তাকার এই অট্টালিকাগুলিতে বক্র কার্নিস, সূচীমুখ খিলান ও প্রতিটি কোণে অষ্টভুজ চূড়া নির্মাণ করা হয়েছিল। ইঁট ও পাথরের সংমিশ্রণে নির্মিত ছোট ছোট স্তম্ভের উপর গম্বুজ নির্মাণ রীতি এইসময় প্রচলিত ছিল। বহির্ভাগে আয়তাকারের প্যানেল এবং অভ্যন্তরে প্রস্তর স্তম্ভের দ্বারা বিচ্ছিন্ন যাতায়াতের পথ ও গবাক্ষ শিল্প শৈলীতে কোন নতুন রীতির ইঙ্গিত দেয় না।

আবিদ আলির মতে, গৌড়ের প্রসিদ্ধ গুমতি দরওয়াজা (Gumti gate) ১৫১২ সালে সুলতান হুসেন শাহ নির্মাণ করেন।* বর্গক্ষেত্রাকারে গঠিত এই প্রবেশদ্বারটিতে একটি গম্বুজ ও চারটি কোণে অষ্টভুজ চূড়া নির্মিত হয়েছিল। ১৫৩১ সালে নসরৎ শাহ নির্মিত কদমরসুল মসজিদটির মধ্যস্থলে রয়েছে। প্রায় ১৯ ফিট বর্গক্ষেত্রাকারে একটি কেন্দ্রীয় কক্ষ ও তার তিনদিক ঘিরে একটি ১৫ ফিট চওড়া অলিন্দ দেখা যায়। ১৫৩৫ সালে জাহানিয়া মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এই মসজিদটি ছিল দৈর্ঘে ৫৬ ফুট ও প্রস্থে ৪২ ফুট এবং ইহাতে অষ্টভুজ চতুষ্কোণ দীর্ঘায়তন চূড়াবিশিষ্ট ক্ষুদ্র গম্বুজ নির্মিত হয়েছিল। গৌড়ের মসজিদগুলিতে প্রস্তরের বা টালির ব্যবহার করা হত। ক্যানিংহাম লোটন মসজিদের এই অলঙ্করণের বিশেষ প্রশংসা করেছেন এবং ফ্র্যাংকলিন এর কারুকার্যেও পরিপাট্যের মনোহারিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন। গৌড়ের বড়ে সোনা মসজিদ সুলতান নসরৎ শাহ ১৫২৬ সালে নির্মাণ করেছিলেন। সুলতান নসরৎ শাহর একটি লিপি যা মসজিদের একটি প্রবেশদ্বারে পাওয়া গিয়েছিল তা থেকে এবিষয়ে জানা যায়। এই মসজিদ বারোদুয়ারী নামে পরিচিত হলেও বর্তমানে এর ১১টি প্রবেশদ্বার আছে! বড়ে সোনা মসজিদ নামটি স্থানীয়ভাবে প্রচলিত হবার কারণ অনুসন্ধান করে ফ্র্যাংকলিন মনে করেছিলেন যে, এর বিশালত্বর জন্য সম্ভবত এই নামের উৎপত্তির কারণ। কিন্তু আসলে এই মসজিদের গোলাকার গম্বুজ চাকচিক্য ও বর্ণপারিপাট্যের জন্য সূর্য বা চন্দ্রালোকের স্বর্ণাভছটা দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করত এবং সেই কারণে সোনা মসজিদ নামে পরিচিত হয়েছিল।** এই মসজিদ একটি আয়তক্ষেত্র যার প্রতিটি কোণে একটি মিনার রয়েছে। ইস্টকের তৈয়ারী এই সৌধে বহিরাবরণে পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। এই মসজিদের আয়তন ছিল

---

* Memoirs of Gaur and Pandua, পৃঃ ৬৭। এইসূত্রে আবিদ আলি একটি লিপি ও ব্লকম্যানের অনুবাদ উদ্ধৃত করেছেন (ASB-1873)।

** Memoirs of Gaur and Pandua পৃঃ ৪৭।

www.pathagar.com

১৬৮ ফুট x ৭৫ ফুট। গৌড়ের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত ছোটে সোনা মসজিদ সুলতান হুসেন শাহর আমলে নির্মিত হয়েছিল। এই মসজিদটি আয়তক্ষেত্র মাপ ছিল দৈর্ঘ্যে ৮২ ফুট ও প্রস্থে সাড়ে ৫২ ফুট এবং এর উচ্চতা ছিল ২০ ফুট। এযুগে পাথরের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। ছোটে সোনা মসজিদের গঠন বৈচিত্র্য ও নকশা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

হুসেন শাহী যুগে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বাইরেও মসজিদ এবং অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। দিনাজপুর জিলার সুরাতে নির্মিত মসজিদের প্রাচীরে যে সব বিভিন্ন নকশা ও রেখাঙ্কন দেখা যায় তাতে ছোটে সোনা মসজিদের শিল্পরীতি অনুসৃত হয়েছে। লোটন মসজিদের আদর্শে নির্মিত এই মসজিদের চতুর্ভূজাকৃত কেন্দ্রীয় কক্ষটির পরিধি ছিল ১৬ ফুট ও একটি অলিন্দ ও বিভিন্ন কোণে ৬টি অষ্টকোণ বিশিষ্ট স্তম্ভ আছে। দিনাজপুরের হেমতাবাদে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত মসজিদটি ছোটে সোনা মসজিদের নমুনায় নির্মিত হয়েছিল ও ১৫২৩ সালে বাগে নির্মিত মসজিদের পরিকল্পনা ও আয়তন ছিল তাঁতীপাড়া মসজিদের ন্যায়। পাবনার নবগ্রাম মসজিদ গঠন বৈচিত্র্যে ও অলঙ্করণে লোটন মসজিদ ও গুমতি প্রবেশদ্বারকে অনুকরণ করেছে। ফরিদপুরের পাথরাইলের আউলিয়া মসজিদ ও শ্রীহট্টর শঙ্করপাশা মসজিদ যে হুসেন শাহী আমলে নির্মিত হয়েছিল তা এইসব অট্টালিকার গঠন বৈচিত্র্য ও অলঙ্করণ থেকে সহজেই অনুমেয়। এই যুগে প্রাচীন রেখার রীতির মন্দির গঠনের ধারা প্রচলিত ছিল। এইসব অট্টালিকায় উড়িষ্যার রেখারীতির সঙ্গে মসজিদ স্থাপত্যের চারচালা রীতির সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। হুসেন শাহী মসজিদের শিল্পরীতি সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বিষ্ণুপুরের মন্দিরের বহির্ভাগের গঠনবৈচিত্র্য ও অলঙ্করণ এবং কদমরসুলের শিল্পপদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে গুজরাতের বাণিজ্যিক যোগসূত্রের মারফতে এখানকার শিল্পরীতিও হুসেন শাহী আমলের মসজিদ নির্মাণ পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছিল। ছোটে সোনা মসজিদ ও তার পূর্বে নির্মিত আদিনা মসজিদের কেন্দ্রস্থল ও তার দুইটি পার্শ্ববর্তী শাখা এবং মহিলাদের বসার জায়গা আমেদাবাদের মসজিদগুলির সঙ্গে তুলনীয়। এই ধরনের গঠনবৈচিত্র্য উত্তর ভারতের মসজিদে দেখা যায় না।

এই যুগে পাথরে খোদাই কাজের উপর গুরুত্ব দান করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে যে পোড়ামাটির কাজের প্রচলন ছিল, হুসেন শাহী যুগে তা পুনরায় পরিবর্তিত রীতিতে প্রচলিত হয়েছিল। লিপির ক্ষেত্রে হুসেন শাহী আমলে তুঘরা পদ্ধতি সাধারণভাবে চালু ছিল। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সমন্বয়ের নীতি হুসেন শাহী আমলের গৌড়ের ইতিহাসে স্বর্ণময় যুগের সৃষ্টি করেছিল। অভ্যন্তরীণ প্রাচুর্য ও বহির্দেশের সঙ্গে লেনদেন ও যোগাযোগের ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে দেশ-দেশান্তরের সংযোগ হয়। ফলে ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হুসেন শাহী আমলে যে নবজাগরণ হয়েছিল তার স্থায়ী চিহ্ন ইতিবৃত্তের পাতায় সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতে এই যুগের পরধর্মসহিষ্ণুতার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সুলতান হুসেন শাহ চৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচারে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে সকলকে নিষেধ করেছিলেন।*

---

* শ্রীচৈতন্যর বিষয়ে সুলতান হুসেন শাহর হুকুম ছিল যে,
"কাজী যবন ইঁহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন যাঁহা উঁহার মন।।"
শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত, মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৪১ (সম্পাদক, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার)। উড়িষ্যার সঙ্গে সংঘর্ষের সময় হুসেন শাহর বাহিনীর হস্তে উৎকলের মন্দির ধ্বংসের ঘটনা যুদ্ধচলাকালীন পরিস্থিতির ফলশ্রুতি মাত্র। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যের আর্বিভাবের প্রাক্কালে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত ঘটনা হুসেন শাহর সিংহাসন লাভের পূর্বে হয়েছিল।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

•

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস
বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের উত্থান

বিজয়নগরের অভ্যুদয় ও সঙ্গম বংশের রাজত্ব

দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তির কাহিনী রহস্যাবৃত। এই বিষয়ে সিওয়েল (Sewell) বিভিন্ন প্রচলিত মতের উল্লেখ করেছেন। এই সব বিভিন্ন মতের ও প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে তথ্য ও প্রমাণ সহ যে সব ঐতিহাসিক সত্য সর্বজনবিদিত তার ভিত্তিতে বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সঠিক বক্তব্য অনুমান করা সম্ভব। উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের পর দিল্লীর সুলতানরা যখন দক্ষিণেও তাঁদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তৎপর হলেন তখন এর বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতে স্বাধীনতাকামী সকল শ্রেণীর লোকের সংগ্রাম ও স্বাতন্ত্র রক্ষার চেষ্টার ফলে বিজযনগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

সঙ্গমের পাঁচপুত্র কর্তৃক বিজয়নগর স্থাপনের কাহিনী সিওয়েল সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই পঞ্চভ্রাতার মধ্যে হরিহর ও বুক্ক কাকতীয় নৃপতি প্রতাপরুদ্রদেবের অধীনে কাজ করতেন। প্রধানতঃ এই পঞ্চভ্রাতার বিশেষতঃ হরিহর ও বুক্কর প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে ও দক্ষিণ ভারতে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে বিজয়নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। হরিহর এই রাজ্যের প্রথম নৃপতিরূপে সিংহাসনে আরাহণ করেন। বিজয়নগরের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মাধববিদ্যারণ্য ও তাঁর ভ্রাতা বিখ্যাত টিকাকার সায়ন হরিহর ও বুক্ককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। বিজয়নগর শহরটি তুংগভদ্রার নদীর দক্ষিণ তীরে স্থাপিত হয় ও ইহার মুখোমুখী আনাগুনডী ছিল তুংগভদ্রার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

ফাদার হেরাসের মতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রস্তর হোয়েসেল বংশীয় রাজা তৃতীয় বীর বল্লালের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল এবং হরিহর ছিলেন তৃতীয় বীর বল্লালের আত্মীয় ও সীমান্তের ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বিজয়নগর শহরটি হোয়েসলরাজ সুরক্ষিত করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ ১৩৩৬ সালে এই রাজ্য তৃতীয় বীর বল্লাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘলক কাম্পিলী বিজয়ের পর হোয়েসল রাজ্যের এই দুই কর্মচারীকে, হরিহর ও বুক্ককে, বন্দী করেন ও মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। কাম্পিলীর শাসনকর্তার বিরুদ্ধে এইস্থানে অভ্যুত্থান হলে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতান হরিহর ও বুক্ককে প্রেরণ করেছিলেন। এই সময় তৃতীয় বীর বল্লালও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। হরিহর ও বুক্ক মাধববিদ্যারন্য ও সায়নের অনুপ্রেরণায় পুনরায় স্বধর্মে দীক্ষিত হয়ে স্বাধীন বিজয়নগর রাজ্য স্থাপন করেছিলেন (১৩৩৬খ্রীঃ)। দক্ষিণ ভারতে এই সময় দিল্লীর সুলতান বিরোধী অভ্যুত্থান প্রবল হয়েছিল। এ সম্পর্কে বারানীও ইংগিত দিয়েছেন। তেলিংগানাতে এই সময় প্রলয় নায়কের উত্তরসূরীরা বীর বল্লালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সারা টোণ্ডাইমণ্ডল থেকে দিল্লীর শাসনের অবসান করে। তেলিংগানার শাসনকর্তা মালিক মকবুল এই সব বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হয়ে দিল্লীতে পলায়ন

www.pathagar.com

করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে মাদুরার সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াইতে তৃতীয় বীর বল্লাল প্রাণ হারান (১৩৪২ খ্রীঃ)। ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বুক্ক তৃতীয় বীরবল্লালের রাজ্য বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু বিজয়নগরের উৎপত্তি সম্পর্কে বিতর্কের এখনও অবসান হয়নি। হরিহর ও বুক্কের প্রয়াসে বিজয়নগরের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র মাধববিদ্যারণ্যের অনুপ্রেরণায় সম্ভবপর হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন এবং তাঁর দুই শিষ্য হরিহর ও বুক্ক বিজয়নগরে এই নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু রাজ্যের সূচনা করেছিলেন। মাধববিদ্যারণ্যের মনে তাঁর গুরু শৃংগেরী অদ্বৈত মঠের প্রধান আচার্য বিদ্যাতীর্থ দৃঢ়প্রত্যয় উৎপাদন করেছিলেন যে, তাঁর এই শিষ্যদ্বয়কে হিন্দুধর্মে পুনরায় দীক্ষিত করে দক্ষিণ ভারতে হিন্দুধর্মের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা একান্ত প্রয়োজনীয়। অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, হরিহর ও বুক্ক এবং তাঁদের অন্যান্য তিন ভ্রাতা বরঙ্গলের কাকতীয় রাজ্যের পতনের পর মুসলমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য উত্তর ভারতের আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গঠন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

বিজয়নগরের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত এখনও রহস্যাবৃত বলে অনেকে মনে করেন। এই রাজ্য স্থাপনের ফলে প্রায় তিনশতককাল পর্যন্ত উত্তরের আগ্রাসন ও পরোক্ষভাবে দিল্লীর তুর্কী সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে বাহমনি সুলতানদের রাজ্যবিস্তারের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায় তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্য পতনের পর সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিজয়নগরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় পর্তুগীজদের আগমন ও অন্যান্য দেশীয় শক্তির অভ্যুত্থান এবং বিজয়নগরের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ ও মৈত্রী তৎকালীন যুগের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

সঙ্গম বংশ (১৩৩৬-১৪৮৫ খ্রীঃ)

বিজয়নগর রাজ্যের অধিপতি প্রথম হরিহর যখন ১৩৩৬ সালে এই স্বাধীন রাজ্যটির প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন তখন এর সীমানা ছিল দক্ষিণ পশ্চিমে ধারওয়ারের নেলোর থেকে উত্তর কর্ণাটকের বাদামি এলাকা পর্যন্ত। এই রাজ্যের অভ্যুদয় দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদের পুনরুত্থান বলে যে প্রচলিত অভিমত আছে তার সমর্থন বিজয়নগরের রাজাদের নীতিতে পাওয়া দুষ্কর। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল। উত্তর ও উত্তর পূর্বে অন্ধ্ররাজ্য বিজয়নগরের প্রতিবেশী ছিল। অন্ধ্রে রাজারা ছিলেন তৃতীয় বীর বল্লালের মিত্র। হোয়েসল রাজা তৃতীয় বীর বল্লাল বিজয়নগরের ক্ষুদ্র রাজ্যটি আত্মসাৎ করার কথা চিন্তা করেছিলেন। রেড্ডীদের সঙ্গে সংঘর্ষে অবশেষে তাদের রাজ্য বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। আরোও দূরে দেবগিরিতে দিল্লীর সুলতানের শাসনকর্তা কুতালুঘ খাঁ দক্ষিণে সুলতানী সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় বীর বল্লালের রাজ্যবিস্তারের উচ্চাকাংখার জন্য বিজয়নগরের সর্বাধিক বিপদাশংকা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় বীর বল্লাল মাদুরার সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াইতে শত্রুহস্তে বন্দী হয়ে প্রাণ হারান। ফলে কালক্রমে দুর্বল হোয়েসল রাজ্য বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৩৪৬ খ্রীঃ)।

কিন্তু বিজয়নগর রাজ্যে অন্যান্য শত্রুরা সর্বদা সক্রিয় ছিল। আনাগুণ্ডী প্রবল শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা কঠিন বলে হাম্পির কাছে নতুন রাজধানী বিজয়নগরের পত্তন করা হয়। হোয়েসল রাজ্য ছাড়াও মাদুরার সুলতানের সঙ্গে প্রথম হরিহরের সংঘর্ষ হয় এবং যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। উত্তরে বাহমনি রাজ্যটি প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই বিজয়নগরের সঙ্গে তার সংঘর্ষ শুরু হয়। কারণ বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন বাহমন শাহ বিজয়নগরের উপর সার্বভৌমত্ব দাবি করেছিলেন এবং স্বভাবতঃ বিজয়নগরের অধিপতি তাঁর দাবি অগ্রাহ্য করেন। ১৩৫৬ সালে প্রথম হরিহরের মৃত্যু হয় ও তাঁর ভ্রাতা প্রথম বুক্ক সিংহাসনে আরোহন করেন। প্রথম বুক্ক ১৩৭৭ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

www.pathagar.com

বিজয়নগর রাজ্যের সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রথম থেকে অর্থ ও সৈন্যবলে এই রাজ্য শক্তিশালী হবার জন্য সচেষ্ট ছিল। অন্ধ্রবংশীয় রাজারা ও উত্তর বাহমনি রাজ্যের প্রবল বিরোধিতার দরুন বিজয়নগরকে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে হয়েছিল। বিদেশ থেকে অশ্ব আমদানী করে ও সৈন্যবাহিনীকে দক্ষ তুর্কী ও বৈদেশিক সেনানীর সাহায্যে রণদক্ষ করা হয়েছিল। কৃষির উন্নয়নের জন্য সেচের সুব্যবস্থা করে ও রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচের শোষণ মারফতে বিজয়নগরের আর্থিক দিক দিয়ে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

বিজয়নগর-বাহমনি দ্বন্দ্ব

বাহমনি ও বিজয়নগরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলে প্রধানতঃ তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণ ছিল। প্রথমতঃ তুঙ্গভদ্রা দোয়াব অঞ্চলে, দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণা গোদাবরী বদ্বীপে ও তৃতীয়তঃ মারাঠাওয়াড়াতে বা মহারাষ্ট্র অঞ্চলে এই দুইটি রাজ্যের স্বার্থের সংঘাত ও দ্বন্দ্বের ফলে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকে। তুঙ্গভদ্রা দোয়াব বা কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি চালুক্য ও চোল, যাদব ও হোয়েসল এবং বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে এই এলাকায় প্রাধান্য লাভের জন্য সংঘর্ষের কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। কৃষ্ণা-গোদাবরীর উর্বর অববাহিকা ও তার বন্দরগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যের পক্ষে যে কোন দক্ষিণী রাজ্যের কাছে কাম্য ছিল এবং এইজন্য বিজয়নগর ও বাহমনি উভয় রাষ্ট্রের মধ্য অনিবার্য কারণে সংঘাত দেখা দিয়েছিল। মারাঠাওয়াড়াতে প্রধানতঃ কোঙ্কন এলাকার নিয়ন্ত্রণের জন্য উভয় রাষ্ট্র স্বভাবতঃ আগ্রহী ছিল। পশ্চিমঘাট ও আরব সাগরের মধ্যে অবস্থিত সংকীর্ন উর্বর এই অঞ্চলের মধ্যে গোয়া বন্দর দেশজ পণ্যের রপ্তানী ও বৈদেশিক পণ্যের বিশেষতঃ ইরান ও ইরাক থেকে অশ্বের আমদানীর পথ সুগম করেছিল। রণক্ষেত্রে এই সব তেজস্বী আরবী ঘোড়ার চাহিদার জন্য বিদেশ থেকে এধরনের ঘোড়া আমদানী করা হত। এদেশে যে ধরনের অশ্ব পাওয়া যেত তার দ্বারা যুদ্ধাশ্বের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। এই জন্য দাক্ষিণাত্যের রাজাদের কাছে আমদানীকৃত অশ্ব ও গোয়া বন্দর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষের বৈশিষ্ট্য এই যে, মাঝে মাঝে যুদ্ধ বিরতি সত্ত্বেও এই দুই রাজ্যের অস্তিত্ব যতদিন বজায় ছিল ততদিন পর্যন্ত উভয়ে পরস্পরের বিরোধিতা ও শত্রুতায় লিপ্ত ছিল এবং সুযোগ বা সুবিধা পাওয়া মাত্রই একে অপরের রাজ্য আক্রমণ করতে পিছপা হত না। সামরিক সংঘর্ষের ফলে যুদ্ধক্ষেত্র ও তার আশেপাশের এলাকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হত, প্রতিবেশী গ্রাম ও জনপদের লোকজন ধনে প্রাণে মারা যেত। এই সব রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে যেপক্ষই জয়লাভ করুক না কেন নিরীহ শান্তিপ্রিয় পল্লী ও নগরে সাধারণের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। অনেক সময় তারা কোন ক্রমে প্রাণে বাঁচলেও যুদ্ধবন্দী ও ক্রীতদাসে পরিণত হত এবং নারী ও শিশুরা যুদ্ধের বর্বরতার শিকার হত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বিজয়নগরের অধিপতি প্রথম বুক্কদের মুদগলের দুর্গ আক্রমণ করে কব্জা করার পর তুঙ্গভদ্রা দোয়াবের এই সুরক্ষিত দুর্গের একটিমাত্র প্রাণী ছাড়া অন্যান্য সকলেরই জীবননাশ করা হয়েছিল। এই সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে তৎকালীন বাহমনি সুলতান প্রথম মহম্মদ শাহ বিজয়নগর আক্রমণ করে শতসহস্র হিন্দুদের হত্যা করেন। বাহমনি সুলতানদের উন্নত ধরনের কামান ও গোলান্দাজ বাহিনী তাঁদের সাফল্যের কারণ হয়েছিল। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার বিবরণী অনুসারে প্রথম বুক্ককে বাহমনি সুলতান যুদ্ধে পরাজিত করে বিজয়নগরে সসৈন্যে প্রবেশ করেন। সুলতানের নির্দেশে উভয় রাজ্যের সন্ধির শর্তাবলী নির্ধারিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল

www.pathagar.com

ও অন্যান্যসূত্রের তথ্য থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে তারিখ-ই-ফিরিস্তার বক্তব্য আংশিক সত্য এবং বিজয়নগর বাহিনীর জন্য বাহমনি সুলতান প্রতি পদক্ষেপে কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ফলে অবশেষে যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা দোয়াবের উপর প্রথম বুক্কর প্রাধান্য স্থাপিত হয়। কেবলমাত্র কৃষ্ণার দক্ষিণ তীরবর্তী কয়েকটি মহলের উপর উভয় রাজ্যের যুক্তনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অতএব এইসব শর্তাবলীতে বিজয়নগরেরই দাবি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়। প্রথম বুক্ক মাদুরার সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে এই রাজ্যটি জয় করেছিলেন ও দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত স্বীয় রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেছিলেন। ১৩৭৪ সালে তিনি চীনে একটি দূত প্রেরণ করেছিলেন। ১৩৭৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রথম বুক্কর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হরিহর বিজয়নগরের সিংহাসনে অরোহণ করেন। দ্বিতীয় হরিহর মহারাজাধিরাজ ও রাজা পরমেশ্বর প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কানানুর, মহিশূর, ত্রিচনাপল্লী, কাঞ্চী ও চিঙ্গেলপুট অঞ্চলের উপর তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রতটের গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ছিল কৃষ্ণা-গোদাবরী-বদ্বীপের উত্তরাংশে রেড্ডীরা ও দক্ষিণাংশে বরঙ্গলের রাজ্য। উড়িষ্যার রাজারা ও বাহমনি সুলতানরাও এইসব অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য আগ্রহী ছিলেন। বরঙ্গল, বাহমনি বংশের প্রতিষ্ঠাতা হাসান গাঙ্গু বাহমনিকে দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে সংগ্রামে সহায়তা করা সত্ত্বেও তাঁর বংশধররা পূর্বোক্ত রাজ্যের কাছ থেকে সুরক্ষিত কৌলস ও গোলকুণ্ডার দুর্গটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও উভয় রাজ্যের সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়নি এবং বাহমনি সুলতানদের উপহার হিসাবে বরঙ্গলের রাজারা একটি মনিমুক্ত খচিত সিংহাসন দিয়েছিলেন।

বরঙ্গল ও বাহমনি রাজ্যের অর্ধশতক ব্যাপী স্থায়ী মৈত্রীর ফলে বিজয়নগরের পক্ষে তুঙ্গভদ্রা দোয়াবের উপর কতৃত্ব বিস্তার বা বাহমনি রাজ্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। ফিরিস্তার মতে বাহমনি সুলতান ফিরোজ শাহ সাগর দুর্গ কুক্ষিগত করেছিলেন ও কৃষ্ণা পার হয়ে বিজয়নগর রাজ্য অবরোধ করেন এবং শত্রু শিবির লুণ্ঠন করেন। শান্তিচুক্তি অনুসারে উভয় রাজ্যের সীমা যুদ্ধপূর্বাবস্থায় স্থায়ী করা হয়েছিল। ফিরোজ শাহ এইসময় রাইচুর দোয়াব দখল করেন বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু পঙ্গলে (পুরাতন হায়দ্রাবাদের নালগুণ্ডা জিলায়) প্রাপ্ত একটি লিপিতে বাহমনি সুলতান ফিরোজ ও তাঁর মিত্রদের বিজয়নগর বাহিনীর কাছে পরাজয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে উভয় রাজ্যের সীমানার কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। দ্বিতীয় হরিহর বেলগাঁও ও গোয়া দখল করেন। তিনি শৈব ছিলেন কিন্তু অন্য ধর্মমতাবলম্বীদের প্রতিও উদার ছিলেন। ১৪০৬ সালে দ্বিতীয় হরিহরের মৃত্যু হলে কিছুকাল বিশৃংখলার পর তাঁর পুত্র প্রথম দেবরায় (১৪০৬-১৪২২) সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন।

প্রথম দেবরায় তুঙ্গভদ্রা দোয়াবকে স্বদখলে রাখবার জন্য বাহমনি সুলতান ফিরোজ শাহর সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিলেন। বাহমনি সুলতানের বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে প্রথম দেবরায় যুদ্ধবিরতির জন্য আবেদন করলে ফিরোজ শাহ শান্তির শর্ত হিসেবে দশ লক্ষ হুন, প্রচুর মণিমুক্তা, হস্তী ও বাঁকপুর দুর্গ এবং তৎসহ দেবরায়ের কন্যার পানিপ্রার্থী হয়েছিলেন। ফিরোজ শাহর দাবি স্বীকার করে প্রথম দেবরায় সন্ধিশর্তে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং ফিরিস্তার বিবরণী অনুসারে ফিরোজ শাহর সঙ্গে স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন।*

---

* ঐতিহাসিক বেঙ্কটরমন্নাইয়ার মতে অন্য কোন সমর্থনসূচক তথ্যের অভাবে প্রথম দেবরায়ের কন্যার সঙ্গে বাহমনি সুলতানের বিবাহ সম্পর্কে ফিরিস্তার বক্তব্য কতদূর সত্য তা বলা সম্ভব নয়। The Delhi Sultanate, পৃঃ ২৮৫।

www.pathagar.com

কিন্তু এই সন্ধির ফলে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে শান্তি বেশীকাল স্থায়ী হয়নি। কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকাকে কেন্দ্র করে বিজয়নগর, বাহমনি ও উড়িষ্যার অধিপতির মধ্যে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল। রেড্ডী রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সুযোগে প্রথম দেবরায় এই অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করেন এবং বাহমনি সুলতান ফিরোজ শাহ ও তাঁর মিত্রদের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা দোয়াবের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। এইসময় রাজমুন্দ্রির উপর বিজয়নগরের প্রাধান্য স্থাপনকে উড়িষ্যার গজপতি নৃপতি সুচক্ষে দেখেন নাই এবং সাময়িকভাবে উড়িষ্যার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হলেও পরবর্তী এক শতকেরও উপরে পূর্বসমুদ্র তীরের অঞ্চল বিজয়নগর-উড়িষ্যার দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। দেবরায় তুঙ্গভদ্রাতে বাঁধ দিয়ে সেচের উন্নতিও করেন ও রাজস্ব বৃদ্ধি করেন এবং হরিদ্রা নদীর বাঁধ প্রকল্পের রূপায়ণ করেন। দেবরায় জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর করে বিজয়নগরকে বিদ্যার পীঠস্থানে পরিণত করেছিলেন। তাঁর সময় একটি তুর্কী সৈন্যবাহিনী বিজয়নগরের প্রতিরক্ষা কাজে যুক্ত হয়েছিল।

প্রথম দেবরায়ের পর প্রথমে কয়েক মাস তাঁর পুত্র রামচন্দ্র ও পরে অন্য এক পুত্র বীরবিজয় বা বিজয় বুক্ক ৮ বৎসরের জন্য রাজত্ব করেন। তারপর তৎপুত্র দ্বিতীয় দেবরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। দ্বিতীয় দেবরায় সিংহাসনে আরোহণের পরবর্তীকালে বাহমনি সুলতান আহমেদ শাহ বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ করেন। বাহমনি সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে দেবরায় পরাজিত হয়েছিলেন। এইসময় উড়িষ্যার রাজা চতুর্থ ভানুদেবও বিজয়নগর আক্রমণ করেছিলেন এবং কোণ্ডাভিড়ু দখল করেছিলেন। দক্ষিণ কানাড়াতে প্রাপ্ত একটি লিপিতে (১৪২৯-৩০ খ্রীঃ) দাবি করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় দেবরায় তুরস্ক অশ্বারোহীদের এবং অন্ধ্র ও উড়িষ্যার রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। ফলে দ্বিতীয় দেবরায় তাঁর রাজ্য বাহমনি সুলতানদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ও রেড্ডীদের হৃতরাজ্য কোণ্ডাভিড়ু পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন। গজপতি রাজা ও তাঁর মিত্ররা পরাজিত হওয়াতে এই অঞ্চলে বিজয়নগরের প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত হয়।

সুলতান আহমদের উত্তরসূরী সুলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে পুনরায় বিজয়নগরের সঙ্গে বাহমনি সুলতানদের সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৪৩৫-৩৬ ও পুনরায় ১৪৪৩ সালে এই সংঘর্ষের অন্যতম কারণ হিসেবে এই দুইটি রাজ্যের মধ্যে মুদ্‌গল ও রায়চুর দোয়াবের উপর প্রাধান্য স্থাপনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমবারের অভিযানে সুলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ১৪৪৩ সালে বাহমনি সুলতানের আক্রমণে দ্বিতীয় দেবরায়কে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল এবং তিনি ভবিষ্যতে বাহমনি রাজ্যে হামলা করবেন না বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন। ফিরিস্তা বলেন যে, দ্বিতীয় দেবরায় বাহমনি সুলতানকে বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এন. বেঙ্কটরামায়াইয়া ফিরিস্তার এই অভিমতকে সন্দেহাতীত বলে মনে করেন না।* কারণ, তুঙ্গভদ্রা দোয়াবে অবস্থিত মুদ্‌গল দুর্গ সম্পর্কে উভয় রাজ্যের মধ্যে সন্ধির শর্তাবলীর বিষয় অধিকাংশ লেখক নীরব থাকা শ্রেয় বলে মনে করেছেন। এছাড়া বাহমনি রাজ্যের সীমা দক্ষিণে ইন্দি তালুক (বিজাপুর) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে একটি ফার্সী লিপিতে উল্লিখিত হয়েছে। অতএব দক্ষিণে কৃষ্ণা-তুংগভদ্রা দোয়াব পর্যন্ত বাহমনি রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

---

* ঐতিহাসিক বেঙ্কটরমায়াইয়ার মতে, বাহমনি রাজ্যের রাজধানী এইসময় গুলবার্গা থেকে বিদরে পরিবর্তন করা হয় কারণ, পূর্বোক্ত স্থানটি বিজয়নগরের রাজ্যের সীমায় অবস্থিত ছিল এবং বাহমনি সুলতানরা সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁদের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দেবরায় শ্রীলঙ্কা অভিযান করেছিলেন। তিনি সমুদ্রপারের বাণিজ্য পরিদর্শনের জন্য লক্ষণ বা লক্ষমন্নকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য দক্ষ মুসলমান তীরন্দাজ ও সেনানী নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৪২০ ও ১৪৪৩ সালে যথাক্রমে ইতালীয় পরিব্রাজক নিকোলাই কন্টি ও পারস্যের একজন রাজদূত আব্দুর রজ্জাক বিজয়নগর পরিদর্শন করেছিলেন এবং তাঁরা উভয়ই এই রাজ্যের গৌরবের বর্ণনা করেছেন। ১৪৪৬ সালে দ্বিতীয় দেবরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যুর পর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে কিছুকাল দ্বিতীয় দেবরায়ের ভ্রাতা দ্বিতীয় বিজয় রায় ও দ্বিতীয় দেবরায়ের পুত্র মল্লিকার্জুন যুক্তভাবে সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেছিলেন। কিছুকাল পরে প্রথমোক্ত জন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। রাজ্যের এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে বাহমনি সুলতান ও উড়িষ্যার নৃপতি কপিলেন্দ্র ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর আক্রমণ করেছিলেন। এইসময় দ্বিতীয় বিজয় রায় পদত্যাগ করাতে নাবালক মল্লিকার্জুনের উপর রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব বর্তেছিল। এইসময় চন্দ্রগিরির সামন্ত নরসিংহ শালুভের সক্রিয় প্রচেষ্টায় ও বীরত্বে সাম্রাজ্য রক্ষা পায়। কিন্তু কোন্ডাভিড়ু ও উদয়গিরির ন্যায় সুরক্ষিত দুইটি স্থান ও এই দুইটি স্থানের দুর্গ উড়িষ্যার হিন্দু নৃপতির পদানত হয়েছিল। এই দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে বিজয়নগর আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

মল্লিকার্জুনের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তর সূরী দ্বিতীয় বিরুপাক্ষের রাজত্বকালে বাহমনি সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহ তাঁর প্রসিদ্ধ উজীর মামুদ গাওয়ানের পরামর্শে প্রথমে ছলবলে কৌশলে খেলনার দুর্ভেদ্য দুর্গটি জয় করেছিলেন এবং পরে গোয়া পদানত করেন। শেষোক্ত স্থানের পতন বিজয়নগরের রাজাদের পক্ষে অপূরণীয় আর্থিক ও বাণিজ্যিক ক্ষতিসাধন করেছিল। কারণ, গোয়ার বন্দরের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল। এইসময় উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রর মৃত্যুর ফলে তাঁর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। বিরুপাক্ষ এই সুযোগে অন্ধ্রে স্বীয় অধিকার পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হননি। কিন্তু তাঁর উদ্যোগী সামন্ত নরসিংহ সালুভ উড়িষ্যার অধিপতি ও বাহমনি সুলতানদের বিরুদ্ধে অভিযান করে অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চল ও মসলিপত্তম পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং উড়িষ্যার গজপতি রাজার অধীনস্থ উদয়গিরি, নেলোর, চিঙ্গেলপুত, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি স্থান দখল করেছিলেন। এছাড়া নরসিংহ শালুভ দক্ষিণে বিদ্রোহী অভিজাত ও নায়েকদের পরাজিত করে দক্ষিণ ও পূর্বে মহিশূর জিলা ও উত্তরে কাবেরী উপত্যকার বহু অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন। ১৪৮৫ সালে বিরুপাক্ষ সম্ভবত তাঁর একটি পুত্রের হস্তে নিহত হয়েছিলেন। ফলে রাজ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং এই সুযোগে নরসিংহ শালুব বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।* ফলে ১৪৮৬ সালে সঙ্গম বংশের অবসান হয়। নরসিংহ শালুব

* এইখানে বিজয়নগর-বাহমনি রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষে কয়েকটি দিক স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ এই বিবাদ ধর্মীয় সংঘাতের ফলশ্রুতি নয়, কারণ বরঙ্গল ও উড়িষ্যা অনেক সময় এই বিরোধে বাহমনি সুলতানদের আগ্রাসনের পথ প্রশস্ত করেছে। আবার অন্যদিকে বিজয়নগর, বাহমনি রাজ্য ও উড়িষ্যা বিভিন্ন দক্ষিণের স্বাধীন হিন্দু রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে একইসঙ্গে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। ফলে পশ্চিম ভারতের মালব ও গুজরাট দাক্ষিণাত্যের রাজ্যদের বিরোধে অনেক সময়ে বিজড়িত হয়ে পড়ত। আবার পূর্ব ভারতের উড়িষ্যার গজপতি রাজারা একদিকে বঙ্গদেশে অপরদিকে দক্ষিণ ভারতে নানা অভিযান প্রেরণ করেছিলেন এবং সুদর করমণ্ডলের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ও মাদুরা পর্যন্ত অভিযান করতে দ্বিধাগ্রস্থ হন নাই। ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান তৃতীয় আহমদ তাঁর উজীর মামুদ গাওয়ানকে দরবারের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হয়ে মৃত্যুদণ্ড দান করেন। ফলে বাহমনি রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল। স্বল্পকালের মধ্যে বাহমনি রাজ্য, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমেদনগর, বেরার ও বিদর এই পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল।

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম শালুভ বংশ।*

শালুভ বংশ (১৪৮৬-১৫০৩ খ্রীঃ)

শালুভ বংশের প্রতিষ্ঠাতা নরসিংহ শালুভ স্বীয় যোগ্যতার বলে বাহমনি সুলতান ও উড়িষ্যার অধিপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করে বিজয়নগরের হৃতস্থানগুলি পুনরুদ্ধার করেছিলেন। সেনাপতি নরসনায়ক তাঁকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন। নরসিংহ শালুভ মাত্র ছয় বৎসরকাল রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর দুই পুত্র পর পর বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসনে তাঁদের অযোগ্যতার দরুণ রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব সেনাপতি নরসনায়কের উপর বর্তে ছিল। ১৫০৩ সালে নরসনায়কের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র বীর নরসিংহ রাজ্য পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৫০৫ সালে শালুভ বংশের শেষ নরপতিকে হত্যা করে বীর নরসিংহ বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম তুলুব বংশ।

তুলুব বংশ (১৫০৩-১৫৭০ খ্রীঃ)

তুলুব বংশের প্রতিষ্ঠাতা বীর নরসিংহ ১৫০৫ থেকে ১৫০৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বীর নরসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-৩০) বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিজয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। রাজত্বের প্রথম দিকেই অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন করে ও বিজয়নগরের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করেন।

১৫০৯ সালে বাহমনি সুলতান মহম্মদ শাহ, যে সব সামন্ত ও অভিজাত তখন অন্তত নামে তাঁর অধীনতা স্বীকার করতেন তাঁদের সহযোগিতায় বিশেষতঃ বিজাপুরের ইউসুফ আদিল শাহর প্ররোচনায়, বিজয়নগরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বাহমনি সুলতান ও তাঁর মিত্ররা যুদ্ধে পরাজিত হন এবং বিজাপুরের ইউসুফ আদিল শাহ রণক্ষেত্রে নিহত হন। কৃষ্ণদেব রায় ১৫১২ সালে তুঙ্গভদ্রা দোয়াব ও রায়চুর দখল করেন এবং গুলবার্গা দুর্গটিকে কব্জা করেন। সুলতান মহম্মদ শাহকে বাহমনি সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করে কৃষ্ণদেব রায় দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কারণ, যতদিন বাহমনি সুলতানের অস্তিত্ব নামেমাত্র বজায় ছিল ততদিন প্রধান প্রধান সামন্ত রাজ্যগুলির ঐক্যবদ্ধ হবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত ছিল।

অতঃপর তিনি উম্মাতুরের পালায়িগারদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। শ্রীরঙ্গপত্তম ও শিব-সমুদ্রমে পালায়িগারে সামন্ত গঙ্গরাজার দুইটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এই দুইটির মধ্যে শেষোক্তটি কাবেরী নদীর দুইটি শাখার মধ্যস্থিত একটি দ্বীপে অবস্থিত ছিল এবং দুর্ভেদ্য বলে খ্যাত ছিল। দুই বৎসর অবরোধের পর কৃষ্ণদেব রায়ের সৈন্যবাহিনী এই দুইটি দুর্গ দখল করেছিল। এইসময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয়লাভের প্রচেষ্টায় গঙ্গরাজার সলিল সমাধি হয়। ফলে শিবসমুদ্রম দুর্গটিও কৃষ্ণদেব রায়ের পদানত হয়েছিল।

১৫১৩ সালে কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যার অধিপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে তাঁর পূর্বসূরীদের রাজত্বকালে হৃতরাজ্যগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য সামরিক অভিযান শুরু করেছিলেন। প্রাথমিক স্তরে বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনী উদয়গিরির দুর্গ দখল করেছিল। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোন্ডাভিডু দুর্গ ও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চল কৃষ্ণদেব রায়ের বাহিনীর পদানত হয়।

---

* শালুভদের অভ্যুত্থান প্রথম সিংহাসন অপহরণ বা First usurpation ও তুলুবদের অভ্যুত্থান Secsond usurpation নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

এই অভিযানে বহু অভিজাত সহ গজপতি বংশীয় রাজপুত্র বীরভদ্র বিজয়নগর বাহিনীর হস্তে বন্দী হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণার তীরবর্তী এলাকায় বিজয়নগরের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। তৃতীয় অভিযানে কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যার নৃপতিকে পরাজিত করে কোন্ডাপল্লী ও বেজওয়াডা দখল করেছিলেন। এইসব অভিযানে উড়িষ্যার বহু অভিজাত ও রাজপরিবারের ব্যক্তি বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় তাঁদের সকলের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করেছিলেন এবং রাজপুত্র বীরভদ্রকে একটি প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে স্বীয় দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। এরপর রাজা কৃষ্ণদেব রায় উত্তর-পশ্চিমে সীমাচলম পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং ভেঙ্গী পদানত করেছিলেন। অতঃপর কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যার রাজধানী কটক আক্রমণ করার মনস্থ করেন। কিন্তু ১৫১৮ সালে গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব অবশেষে সন্ধি স্থাপনের জন্য প্রার্থনা করলে উভয় রাজ্যের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। গজপতিএকটি কন্যার সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায় বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কৃষ্ণার উত্তরস্থিত যেসব এলাকা যুদ্ধের জন্য উড়িষ্যার হস্তচ্যুত হয়েছিল তা প্রত্যার্পণ করা হয়েছিল। উড়িষ্যার গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায়ের সংঘর্ষের সুযোগে গোলকুণ্ডার কুলী কুতুবশাহ তেলেগু এলাকায় স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তৎপর হয়েছিলেন। তিনি উড়িষ্যার গজপতির নৃপতির কাছ থেকে কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ও ইলোর, রাজমুন্দ্রী, কোন্ডাপল্লী অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ করে কোন্ডাভিড়ু দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। এইস্থানে বিজয়নগর বাহিনীর হস্তে তাঁর সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হয়।

রাজা কৃষ্ণদেব রায় ১৫১২ সালে বিজাপুরের ইসমাইল আদিল খানের কাছ থেকে রায়চুর দোয়াবের দুর্গটি দখল করেছিলেন। কিন্তু উড়িষ্যার সঙ্গে বিজয়নগরের সংঘর্ষের সুযোগে বিজাপুরের সুলতান পুনরায় রায়চুর পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ১৫২০ সালে কৃষ্ণদেব রায় তাঁর সেনাপতি সালুভ টিম্মাকে বিজাপুরের সুলতানের বাহিনীকে রায়চুর দোয়াব থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন এবং বিজয়নগরের বাহিনী এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কৃষ্ণদেব রায়ের সামরিক সাফল্যের ফলে বিজাপুরের গুলবর্গা দুর্গটি সম্পূর্ণ ধূলিস্যাৎ হয় বলে পর্তুগীজ ভ্রমণকারী নুনিজের বিবরণীতে উল্লিখিত হয়েছে। এইভাবে পশ্চিম দিকে দক্ষিণ কোঙ্কন এবং পূর্বে ভিজাগাপট্টম ও দক্ষিণে ভারতের শেষ সীমা পর্যন্ত বিজয়নগরের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। বিজাপুর থেকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার আগে কৃষ্ণদেব রায় পূর্বতন বাহমনি সুলতান বংশের পুনঃস্থাপনের প্রচেষ্টায় সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ শাহর যে তিনটি পুত্রকে বিজাপুরের সুলতান কারারুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনকে সিংহাসনে স্থাপন করেছিলেন ও অন্য দুইজনকে বিজয়নগরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পুরাতন বাহমনি বংশের পুনঃস্থাপনের এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

কৃষ্ণদেব রায় পর্তুগীজদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন। পর্তুগীজরা আরব ও পারসিক বণিকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছিল ও মিশরের নৌবাহিনীকে পরাজিত করেছিল। ফলে মধ্যযুগের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অত্যন্ত জরুরী, আরব ও পারসিক যুদ্ধাশ্ব বিদেশ থেকে সরবরাহের একচেটিয়া বাণিজ্য পর্তুগীজদের করতলগত হয়েছিল এবং পর্তুগীজদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার জন্য কৃষ্ণদেব রায় এইসব যুদ্ধাশ্বের একমাত্র ক্রেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। Sewell-এর ভাষায় বলা যায় যে, 'he benefitted largely by the import of horses and other requisites।' পর্তুগীজরাও তাঁর কাছ থেকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অজস্র নগর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে নানাপ্রকার ব্যবসায়িক সুবিধালাভের প্রত্যাশায় কৃষ্ণদেব রায়ের সুনজরে পড়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন। তিনি পর্তুগীজ শাসনকর্তা আলবুর্কাককে ভাটকলে (Bhat Kal) একটি দুর্গ নির্মাণের আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন এবং বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে

www.pathagar.com

পর্তুগীজরা গোয়ার দুর্গ ছিনিয়ে নিলে কৃষ্ণদেব রায় তাদের অভিনন্দিত করেছিলেন। কিন্তু পর্তুগীজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে তিনি মদত দান করেননি এবং কালিকটের জামরিনের বিরুদ্ধে তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি ছিলেন না। এমনকি ১৫২২ সালে গোয়ার নিকটবর্তী মূল ভূখণ্ড জয় করার জন্য পর্তুগীজরা উদ্যোগী হলে তিনি এই ঘটনার প্রতিবাদের প্রতীক নমুনা হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করার জন্য একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের মেঘ অপসারিত হবার পরই পর্তুগীজদের সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায়ের সুসম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হয়। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভায় ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক অজস্র পর্তুগীজ ভ্রমণকারী, বণিক ও অভিযাত্রীকে আকর্ষিত করেছিল। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী পায়াস (Paes) রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন যে, তাঁর ন্যায় জ্ঞানী ও গুণী নৃপতি তৎকালীন যুগে বিরল ছিল। কৃষ্ণদেব রায় কেবলমাত্র রাজ্যবিস্তার করেই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁর রাজসভায় জ্ঞানীদের সমাদর ছিল। সর্বধর্মে সমভাব এবং উদারতা, পরাজিত শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শন, পাত্রমিত্র প্রজাসাধারণের প্রতি দাক্ষিণ্য, বৈদেশিকদের সমাদর, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বিনয়, প্রজাহিতৈষণা ও দেবদ্বিজে ভক্তির জন্য রাজা কৃষ্ণদেব রায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তিনি অতুলনীয় ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে বিজয়নগর গৌরবের চরম শিখরে পৌঁছেছিল।

কৃষ্ণদেব রায় সাহিত্যসেবী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তেলেগু সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ সুবিদিত। নরসিংহ শালুবের রাজত্বকাল থেকে তেলেগু সাহিত্যের স্বর্ণযুগের সূত্রপাত হয়। কৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং একজন কবি ও সুলেখক ছিলেন। তাঁর লিখিত 'আমুক্ত মাল্যাদা' তেলেগু সাহিত্যের নাম করা কাব্যগ্রন্থ। তাঁর রাজসভার আটজন বিশিষ্ট তেলেগু কবি অষ্টদিক গজ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এইভাবে তেলেগু সাহিত্যের পৃষ্টপোষকতার জন্য কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকাল চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। বৈদেশিক বণিক ও ভ্রমণকারীদের প্রতি রাজা কৃষ্ণদেব রায় সদয় ছিলেন। রাজধানীর সৌন্দর্যবৃদ্ধির দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। এইযুগে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণমন্দির নির্মিত হয়েছিল (১৫১৫) এবং নরসিংহ শালুবের প্রস্তরমূর্তি ১৫২৮ সালে স্থাপিত হয়েছিল। V. A. Smith মন্তব্য করেছেন যে, "The dark pages of the sanguinary story of the medieval kingdoms of the Deiccan, whether Hindu or Muslim, are relieved by few names of men who claim respect on their personal merits. The figure of Krishnadevaraya stands out as one such."*

কিন্তু বিজয়নগর সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে বিপদ ঘনীভূত হচ্ছিল। কারণ, বিজয়নগরের উত্তরে প্রতিবেশী সুলতানী রাজ্যগুলি ও বিজয়নগরের উচ্চাভিলাষী প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহে সাম্রাজ্যের বিপদাশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। শেষোক্তদের মধ্যে মাদুরার ও কেন্দ্রীয় বিভাগের শাসনকর্তারা রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। এইসব বিদ্রোহী প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের একজনের বিদ্রোহ কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালেই দমন করা হয়েছিল এবং অন্যান্য বিদ্রোহ কৃষ্ণদেব রায়ের উত্তরসূরীর রাজত্বকালের শুরুতে প্রশমিত হয়।

অচ্যুত রায়

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর (১৫২৯ অথবা মতান্তরে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে) বিজয়নগরের সিংহাসনে কৃষ্ণদেব রায়ের সম্পর্কিত ভ্রাতা অচ্যুত রায় আরোহন করেছিলেন। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী ন্যুনিজ

* V. A. Smith, Oxford History of India (4th Ed.) ed. Percival Spear. p-307।

www.pathagar.com

তাঁকে যেরূপ দূর্বল, কুচক্রী ও অত্যাচারী শাসক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ সাহিত্য ও লিপির প্রামাণিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, রাজত্বের প্রথমার্ধে তিনি যেসকল বাধাবিঘ্ন, বিদ্রোহ ও বৈদেশিক শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছিলেন অচ্যুত রায় কঠোর হস্তে সেসবের মোকাবিলা করে স্বীয় দক্ষতা প্রমাণিত করেছিলেন। অচ্যুত রায় বিদ্রোহী মাদুরার শাসনকর্তাকে দমন করেন ও তাঁর আশ্রয়দাতা ত্রিবাঙ্কুরের রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। কিন্তু শাসনকার্যে শিথিলতার জন্য তাঁর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সেই সুযোগে অচ্যুত রায়ের স্বজনপরিজনরা ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন। এইসময় তুলুব বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ রাম, তিরুমল ও ভেকন্ট নামে আরবিড়ু বংশীয় তিনভ্রাতা অন্যান্য অসন্তুষ্ট প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাম্রাজ্যের ক্ষমতা দখলের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই সব অভ্যন্তরীণ দলাদলি ও বিবাদের ফলে বিজয়নগরে ধ্বংসের বীজ উপ্ত হয়েছিল ও রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্থ করেছিল।

১৫৪১ বা ১৫৪২ সালে অচ্যুত রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বেন্টকাদ্রি বা প্রথম বেন্টক সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছয় মাসের বেশী রাজত্ব করেন নাই। তার মৃত্যুর পর অচ্যুত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব রায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। সদাশিব রায়ের রাজত্বকালে আরবিড়ুবংশীয় মন্ত্রী রামরায় কার্যতঃ সকল ক্ষমতা দখল করেছিলেন।

রামরায় বিজয়নগরের পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে সক্রিয় হস্তক্ষেপ করেন। এই লক্ষ্যে পৌঁছনর জন্য বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমদনগর প্রভৃতি দক্ষিণী সুলতান বংশের বিরোধে রামরায় ভিন্ন ভিন্ন সময় বিভিন্ন বিবাদমান পক্ষের সঙ্গে যোগদান করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এইসব রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ বিরোধে রামরায় কখনও এই পক্ষে কখনও ওপক্ষে যোগদান করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে রামরায় বিজয়নগরের পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং সাময়িকভাবে কিছুটা সাফল্য অর্জনও করেছিলেন। ফলে তিনি স্বীয় ক্ষমতার বিষয়ে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ও দাম্ভিক হয়ে পড়েন এবং এই অতি দর্পই শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়েছিল। ১৫৪৩ সালে রাম রায় বিজাপুরের বিরুদ্ধে আহমদনগর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গে একটি মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বিজাপুরের অন্যতম মন্ত্রী আসাদ খানের প্রচেষ্টায় এই মৈত্রী শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। ১৫৫৮ সালে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও বিজয়নগর সম্মিলিত ভাবে আহমদনগর আক্রমণ করেছিল। এইসময় বিজয়নগর বাহিনীর কার্যকলাপে আহমদনগরের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে তাদের প্রতি বিরূপ হয়েছিল।

বিভিন্ন কারণে ইতিপূর্বে বিজয়নগর সম্পর্কে দক্ষিণী সুলতানদের প্রচণ্ড আক্রোশ জন্মেছিল। এই আক্রোশ বহুকাল ধরে তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি করে জ্বলছিল। রামরায়ের ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য ও বিজয়নগর বাহিনীর প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মানসে ১৫৬৪ সালে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমদনগর ও বিদরের সুলতানদের বিজয়নগর বিরোধ মৈত্রী রূপ পরিগ্রহণ করেছিল। একমাত্র বেরারের সুলতান এই মৈত্রীতে যোগদান করেন নাই। তালিকোটাতে সুলতানদের সম্মিলিত বাহিনী প্রথমে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে তালিকোটা থেকে ৩০ মাইল দূরে এই স্থানটি রাক্ষসী ও তঙ্গাডী নামে দুইটি গ্রামের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ১৫৬৫ সালের ২৩শে জানুয়ারী উভয় পক্ষের মধ্যে এইস্থানে যে সংঘর্ষ হয় তা ইতিহাসে তালিকোটার যুদ্ধ নামে পরিচিত। বিজয়নগর বাহিনীর সংখ্যাধিক্যের দরুণ সুলতানদের সম্মিলিত বাহিনী সরাসরি সংঘর্ষে অবতীর্ণ না হয়ে আপোষ-আলোচনার নামে কালক্ষেপ করতে শুরু করেছিল। এই সুযোগে সুলতানরা

www.pathagar.com

রামরায়ের অনুগত দুই মুসলিম সেনাপতিকে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য প্ররোচনা দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে উপরুক্ত দুই সেনাপতি সসৈন্যে বিপক্ষে যোগদান করেছিলেন। ফলে বিজয়নগর বাহিনী প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও অবশেষে পরাজিত হয়। রামরায় সম্মিলিত সুলতানী বাহিনীর হস্তে বন্দী হন এবং নিজাম শাহ্ তাঁকে স্বহস্তে নিহত করেন। তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের গৌরবরবি অস্তমিত হয়েছিল।

যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর রামরায়ের ভ্রাতা তিরুমল সমস্ত রাজকোষ ও সম্পদ ১৫৫০টি হাতির সাহায্যে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তিরুমল রাজা সদাশিব ও রাজ পরিবারের সমস্ত মহিলা ও পরিজন সহ পলায়ন করেন। কিন্তু বিজয়ী মুসলমান বাহিনী যখন তিনদিন পরে শহরে উপস্থিত হয়েছিল তারপর থেকে পাঁচ মাস তারা লুটপাট ও নির্যাতন থেকে বিজয়নগরকে কোন রেহাই দেয়নি। বিখ্যাত লেখক Sewell বক্তব্য করেছেন যে, "With fire and sword, with cowbars and axes they carried on day after day their work of destruction. Never perhaps in the history of the world has such havoc been wrought and wrought so suddenly, on so splendid a city; ...."

পরবর্তীকালের বিজয়নগরের ইতিহাস ও আরবিড়ু বংশ

তালিকোটার যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন কোন লেখক মন্তব্য করেছেন যে, "Vijayanagar never recovered from the blow।"* তালিকোটার যুদ্ধকে ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংঘর্ষ বলে গণ্য করা যায়। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু প্রাধান্যের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে ধূলিস্যাৎ হয়েছিল। ফলে দাক্ষিণাত্যে পুনরায় উত্তরভারত থেকে নব উদ্যমে সাম্রাজ্যবিস্তারের পথে একটি বিশেষ বাধা অপসারিত হয়েছিল। কারণ, সপ্তদশ শতকে মারাঠা শক্তির উত্থানের পূর্বে এই ধরনের প্রচেষ্টায় বাধাদানের ক্ষমতা অন্য কোন শক্তি অর্জন করেনি। আধুনিককালের গবেষকদের মতে, তালিকোটার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে বিজয়নগরের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল এসম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে বিজয়নগরের রাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। এইজন্য একজন লেখক মন্তব্য করেছেন যে, "Talikota is the climactric, but not the grand climactric of the Vijayanagar Empire," বিজয়নগরের আরবিড়ু বংশীয় নৃপতিরা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। কিন্তু উত্তরের সীমান্ত থেকে অনবরত আক্রান্ত হওয়ার দরুণ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের এবং অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্য অবশেষে বিজয়নগরের পতন হয়।

তালিকোটা যুদ্ধের পরবর্তীকালে বিজয়ী দক্ষিণী সুলতানরাও বিশেষ লাভবান হন নাই। কারণ এতকাল বিজয়নগরের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতাই কেবল এই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতানদের একসূত্রে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। এখন পুনরায় তারা নিজেদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। রামরায়ের ভ্রাতা তিরুমল তালিকোটার পরাজয়ের পর পেনাগুণ্ডীতে সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র স্থানান্তরিত করেছিলেন। তিনি বিজয়নগরের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তালিকোটার বিপর্যয়ের পর প্রায় ছয়বৎসরাধিক কালের মধ্যে রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। অবশেষে ১৫৭০ সালে পেরুমল স্বয়ং বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহন করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ আরবিড়ু বংশ নামে পরিচিত হয়। শেষপর্যন্ত সদাশিবের কি হয়েছিল এসম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কিন্তু বিজয়নগরের লিপিতে বহুকাল তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

* Advanced History of India, K. A. Nilkanta Sastri, G. Srinivaschari পৃঃ ৪২৬।

www.pathagar.com

তিরুমল দক্ষিণের নায়কদের স্বাধীনতায় স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু মহিশূরের ওডেয়াররা এবং ভেলোর ও কেলাডীর নায়করা তাঁর প্রতি অনুগত ছিল। তিরুমল স্বীয় রাজ্যকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে প্রতি বিভাগে তাঁর এক একজন পুত্রকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। পেনগুণ্ডীকে সদর দপ্তর করে তেলেগু দেশের শাসক হিসেবে তিরুমল তাঁর পুত্র শ্রীরঙ্গকে নিযুক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র রাম কানাড়া অঞ্চলের শাসনকর্তা হিসেবে শ্রীরঙ্গপত্তমকে তাঁর রাজধানীতে পরিণত হয়েছিলেন। তিরুমল রাজত্ব করার দুইবৎসর পর স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর তাঁর উত্তরসূরী শ্রীরঙ্গ বা দ্বিতীয় রঙ্গ কর্নাটকের সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৫৮৫ সালে শ্রীরঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় ভেঙ্কট অগ্রজের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। দ্বিতীয় ভেঙ্কটকে পরবর্তী বিজয়নগরের নৃপতিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। চন্দ্রগিরিকে রাজধানী করে তিনি প্রায় চতুর্বিংশ বৎসরের অধিক সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের মুসলমান সুলতানদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে সাফল্যলাভ করেছিলেন। তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কার রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করেছিল। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করে দ্বিতীয় ভেঙ্কট রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধির সূচনা করেছিলেন। তিনি গোলকুণ্ডার সুলতানকে যুদ্ধে পরাজিত করে উদয়গিরির উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিলেন এবং স্বীয় রাজ্যসীমা কৃষ্ণানদী পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। এইসব কৃতিত্বের জন্য দ্বিতীয় ভেঙ্কটকে বিজয়নগরের সর্বশেষ সফল নৃপতি হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তিনি সাম্রাজ্যকে অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হন নাই এবং কোণ্ডাভিড়ুর উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ভেঙ্কটের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ফলে বিজয়নগর রাজ্যের অবক্ষয়ের ও পতনের পথ প্রশস্ত হয়। বিজয়নগরের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য শাসক তৃতীয় রঙ্গের শতপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়নি। এইসময় প্রাদেশিক শাসকরা ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক এবং উচ্চাভিলাষী ও কেন্দ্রের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। এছাড়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানের আগ্রাসী নীতির ফলে বিজয়নগর যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অবশেষে বিজয়নগরের হিন্দু সামন্তরাই এই রাজ্যের পরম শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। বিজয়নগরের পতনের কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করে একজন লেখক এইসব সামন্ত ও প্রাদেশিক শাসকদের দায়ী করে বলেছেন যে, প্রাদেশিক শাসকদের দম্ভ, স্বার্থপরতা, আনুগত্যের অভাব ও পারস্পরিক বিরোধের জন্য বিজয়নগরের পরবর্তী শাসকরা সুলতানদের আগ্রাসনের বাধাদানে সম্পূর্ণ অপারগ করেছিল। ফলে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানরা অবশেষে এই হিন্দুরাজ্যটি দখল করেছিলেন। এই সুযোগে শ্রীরঙ্গপত্তম ও বেদনুরের প্রাদেশিক শাসকরা এবং মাদুরা ও তাঞ্জোরের নায়েকরা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। বিজয়নগরের সর্বশেষ নৃপতি তৃতীয় রঙ্গ মহিশূরে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাজসভা বজায় রেখেছিলেন। শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের (১৬৭৪ খ্রীঃ) কিছুকাল পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিজয়নগর দক্ষিণ ভারতে প্রায় তিনশতক প্রাধান্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা কালের অমোঘ বিধানে চিরতরে অবলুপ্ত হয়েছিল।*

---

* A History of South India, K. A. NilKanta Sastri, পৃঃ ৩০৫।

www.pathagar.com

বিজয়নগরের শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এবং এই সম্পর্কে বৈদেশিক বিবরণী

বিজয়নগরের অধিপতিরা সর্বদা ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে শাসন পরিচালনা করতেন। বিজয়নগরের রাজাদের 'রাজধর্ম সম্পর্কে উচ্চধারণা ছিল। কৃষ্ণদেব রায় তাঁর রাষ্ট্র সম্পর্কিত গ্রন্থে রাজাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, "With great care and according to your power you should attend to the work of protecting (the good) and punishing (the wicked) without neglecting anything that you see or hear."* তিনি রাজাকে প্রজাদের উপর করের মাত্রা সর্বদা সহনীয় করার জন্য বলেছিলেন। বিজয়নগরের রাজা একটি মন্ত্রী পরিষদ নিযুক্ত করতেন। সাধারণতঃ রাজ্যের প্রভাবশালী অভিজাতরাই এই মন্ত্রীসভার সদস্য পদ লাভ করতেন। সমগ্র রাজ্য কয়েকটি মণ্ডলমে বিভক্ত ছিল। এইসব মণ্ডলম বা প্রদেশগুলি আবার কয়েকটি নাড়ু (জিলা) এবং নাড়ুগুলি কয়েকটি স্থল ও গ্রামে বিভক্ত ছিল।

বিজয়নগরে চোল রাজ্যের ন্যায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামীণ শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত নায়েক পদ এই গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার স্বাধীনতা ও উদ্যোগ বিনষ্ট করেছিল। প্রথমের দিকে কেবলমাত্র রাজপুত্রদের মধ্য থেকেই প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হত। পরবর্তীকালে শাসক সামন্তগোষ্ঠী সদস্যদের ও অভিজাত পরিবারের বংশধরদেরও এই পদে বহাল করার প্রথা চালু করেন। প্রাদশিক শাসনকর্তারা যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের নিজস্ব রাজসভা ছিল। প্রাদেশিক শাসকরা উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করতেন ও তাঁদের অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতেন প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্ব নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলনের অধিকারী ছিলেন। এইসব শাসনকর্তাদের কার্যকাল তাঁদের যোগ্যতা ও শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল এবং এ সম্পর্কে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। কোন নতুন কর বসানো বা কোন পুরানো কর তুলে দেওয়ার অধিকার তাঁদের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হত। প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসক কেন্দ্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দিতে দায়বদ্ধ ছিলেন এবং কেন্দ্রকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যবাহিনীও প্রেরণ করতে হত। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য আয় ছিল ১২,০০০,০০০ প্যাগোডা এবং এই আয়ের প্রায় অর্ধেক কেন্দ্রের কোষাগারে যেত।

অনেক এলাকা যুদ্ধের ফলে বিজয়নগরের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের শাসনভার বশ্যতার বিনিময়ে পূর্বতন নৃপতিদের হাতে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া বিজয়নগর সাম্রাজ্যে সামরিক প্রধানদের নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কোন কোন অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করা হত। এই ধরনের পলিগার বা নায়কদের দেওয়া জমিকে আসারম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব নায়কদের নির্দিষ্ট সংখ্যক পদাতিক সৈন্য, অশ্ব ও হস্তিবাহিনী রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সরবরাহ করতে হত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বাৎসরিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিতে হত। সামন্ত ও আধা-সামন্তদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিজয়নগর নানাধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল।

কেন্দ্রের শাসন প্রধানত বিজয়নগরের রাজা ও তাঁর উপদেষ্টা এবং রাজসভার উপর নির্ভরশীল ছিল। ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন যে, "The king and the court led an extravagant and luxurious life in striking contrast to the modest living standard of the rest of the population."** রাজসভায় যুদ্ধেবন্দী বা বিদেশ থেকে

* Medieval India (Part 1) Satish Chandra (NCRT) পৃঃ ৮৭।

** A History of South India by Nilkanta Sastri, পৃঃ ৩১৪।

www.pathagar.com

আমদানীকৃত অনেক সুন্দরী বারাঙ্গনা নিযুক্ত ছিলেন যাঁরা নৃত্যগীতের মারফতে রাজা ও তাঁর পারিষদদের মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত থাকতেন।

রাজপরিবারের মহিলারা সুশিক্ষিতা ছিলেন এবং বিভিন্ন কলায় পারদর্শিণী হতেন। প্রয়োজনে এইসব রাজঅন্তপুরিকা রাজ্যশাসন ও রণক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম ছিলেন। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী পায়েস (Payes) বিজয়নগর রাজ্যের ভ্রমণ বৃত্তান্তে (১৫২০-২২ খ্রীঃ) ও অন্যান্য বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণে বিজয়নগরের রাণীদের ব্যয়বহুল প্রাসাদের ও তাদের সেবায় নিযুক্ত অজস্র নারীদের সম্পর্কে, এবং প্রাসাদ অন্তপুরিকাদের বিলাসবহুল আভরণ ও অলংকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই রমণীকুলের অনেকে নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তাঞ্জোরের রঘুনাথ নায়কের রাজসভায় যেসব সুশিক্ষিতা মহিলা কবি ছিলেন তাঁরা বিভিন্ন ভাষায় ব্যাখ্যা দেবার যোগ্যতা রাখতেন। উচ্চকোটির সমাজে মহিলাদের ভূমিকা বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সতীপ্রথা অভিজাত সমাজে অপরিচিত ছিল না। কিন্তু এই প্রথার চলন সাধারণভাবে দেখা যায় না।

দিনে অন্ততঃ একবার রাজা খোলা দরবারে উপস্থিত হয়ে জনগণের অভিযোগ শুনতেন এবং এই আমদরবারের জাঁকজমক বিদেশাগত দূত ও ভ্রমণকারীদের চাকচিক্যে ও ঐশ্বর্যে চমক লাগিয়ে দিত। এইখানে বিদেশীদূতরা পরিচয়পত্র পেশ করতেন ও সামন্ত নৃপতিরা কর দান করতেন এবং প্রজারা তাদের নানা অভিযোগ পেশ করত। যুদ্ধের সময় রাজা স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু অধিকাংশ সময় তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতিদের সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হত। সাধারণতঃ সাহিত্যে চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীর কথা উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু এরমধ্যে রথারোহী সৈন্যদলের বাস্তবে কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। হস্তিবাহিনীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং হিউয়েন সাঙ বলেছেন যে, মহারাষ্ট্রে রণহস্তীকে যুদ্ধের পূর্বে মদ্যপান করানোর প্রথা ছিল। অশ্বারোহী বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য আরব অশ্বব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উত্তম জাতীয় অশ্ব উচ্চমূল্যে সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যের নৃপতিরা পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হতেন। বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হত। উভয়পক্ষের গোলন্দাজরা ছিলেন সাধারণতঃ বিদেশী। প্রতিরক্ষায় দুর্গের ভূমিকার গুরুত্ব ছিল। দুর্গ অবরোধ করা ও দখল করার পদ্ধতি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান অর্জিত হয়েছিল। সৈন্যবাহিনীতে সকল শ্রেণীর লোককে গ্রহণ করা হত এবং যুদ্ধের সময় সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেত। এছাড়া সামন্তবাহিনীর সংযোগের ফলে সৈন্যবাহিনী আকারে স্ফীত হত। রাজার নিজস্ব দেহরক্ষী বাহিনী ছিল। পরাজিত সেনাপতিকে নারীর পোষাক পরিধান হিসাবে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হত বলে হিউয়েন সাঙ্ এবং একাদশ শতকের চোল লিপিতে উল্লিখিত হয়েছে।

এই যুগে বড় বা ছোট নৌঅভিযান সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু এইসময় নৌ-বাহিনীর বিষয়ে বিশদ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। পশ্চিম উপকূলে রেবতী দ্বীপ ও পুরীতে বাদামীর চালুক্যদের বিজয়কাহিনী, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে পল্লব, পাণ্ড্য, চোল ও বিজয়নগরের নৌঅভিযান এবং সর্বোপরি শ্রীবিজয়ে রাজেন্দ্রচোলের নৌসাম্রাজ্য স্থাপন থেকে দক্ষিণী রাজ্যগুলির নৌশক্তির ঐতিহ্যের কথা জানা যায়। কিন্তু তৎকালীন যুগের ভারতীয় রাজন্যরা নৌশক্তিতে অধিকতর দক্ষ ও শক্তিশালী পাশ্চাত্য অভিযাত্রীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হতে সক্ষম হননি।

www.pathagar.com

সামাজিক অবস্থা

বিজয়নগর সাম্রাজ্যে বহু বিদেশীর আগমন হয়েছিল। এইসব বিদেশীদের মধ্যে ছিলেন আরব, ইহুদী, চীনা ও মালয়ের এবং পূর্বাঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা। পরবর্তীকালে পর্তুগীজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এইসব বিদেশাগতদের অনেকে বিজয়নগর সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। তাছাড়া স্থানীয় রাজাদের লিপি, সাহিত্য ও অন্যান্য সূত্রে আমরা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাই।

সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মণরা সর্বাধিক সম্মানিত ছিলেন। জাত ও পেশার মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকলেও এই সম্পর্ক অপরিবর্তনীয় ছিল না। নানা নতুন সমস্যার চাপে যখন জাতপাতের পূর্বতন মূল্যবোধের মান বজায় রাখা রক্ষণশীল এমনকি রাজনৈতিক বাধা সত্ত্বেও কঠিন হত তখন পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ত। রাষ্ট্রের সেবায় যে সব বেসামরিক ও সামরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রয়োজন ছিল তাতে ব্রাহ্মণদের নিয়োগের কোন বাধা ছিল না। কৃষ্ণদেব রায় ব্রাহ্মণ-সৈন্যাধ্যক্ষদের বিশ্বস্ততার উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু, সাধারণতঃ ব্রাহ্মণরা বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য হতেন এবং ধর্মীয় ও সাহিত্য বিষয়ে চর্চা করে জীবনযাপন করতেন। ব্রাহ্মণরা পঠন-পাঠনকে এবং সামাজিক কল্যাণকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করতেন বলে সমাজে অতি সম্মানিত হতেন।

জাতিভেদ প্রথা সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থা হিসাবে রাজশক্তির সমর্থন লাভ করেছিল এবং সর্বজনগ্রাহ্য আর্থ-সামাজিক কাঠামোরূপে গৃহীত হয়েছিল। বর্ণবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর খাদ্য, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি ব্যাপারে স্বাতন্ত্র বজায় ছিল আবার সেচের কাজে বা মন্দিরের পূজার্চনা বা অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় ও স্থানীয় শাসনের ব্যাপারে তাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করার ব্যাপারে কোন দ্বিধা ছিল না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজ নিজ দাবি অপেক্ষা কর্তব্য সম্পর্কে অধিক সচেতন ছিল। এই পরিস্থিতিতে সামাজিক সহযোগিতার ও সংহতির মধ্যে বিরোধ ও সংঘাতের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু এই সব বিরোধ ও সংঘর্ষ স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষনস্থায়ী ছিল।

খাদ্য ও পোষাকে স্থান, কাল ও পাত্র অনুসারে পার্থক্য দেখা যায়। এবিষয়ে তৎকালীন লিপি, সাহিত্য ও বৈদেশিক বিবরণী থেকে জানা যায়। বিজয়নগরের অধিবাসীদের পোষাকের সম্পর্কে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বর্ণনা প্রসঙ্গে বারথেমা (Varthema) বলেছেন যে, "তাদের পোষাক ছিল এই ধরণের—বিত্তবান লোকেরা ছোট জামা পড়ত এবং তাদের মাথায় মুরদের রীতিতে সোনা ও রেশমের কাপড় থাকত, কিন্তু পায়ে কিছুই পরত না। কোমরে একটুকরো কাপড়ের ফালি ছাড়া সাধারণ লোকেরা প্রায় নগ্ন দেহে বিচরণ করত। রাজা মাথায় যে সোনার ব্রকেডের টুপি ধারণ করতেন তার দৈর্ঘ্য হত মাত্র দুই বিঘৎ এবং তিনি যখন যুদ্ধে যেতেন তখন একটি তুলা নির্মিত বর্ম ধারণ করতেন যার উপর থাকত সোনালী মুদ্রা ও নানা ধরনের রত্ন খচিত একটি পোষাক।"

জনগণের একাংশ যেমন ব্রাহ্মণ, জৈন, শৈব শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন নিরামিষাশী। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর লোকেদের খাদ্য সম্পর্কে কোন বিশেষ বিধিনিষেধ ছিল না। তারা নানারকমের ফল, শাকসবজী ও তৈল ছাড়া গোমাংস ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের পশুমাংস গ্রহণ করত। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী নুনিজের মতে বিজয়নগরের রাজারা প্রায় সর্বভুক ছিলেন। একমাত্র গরু ও মহিষের মাংস তাঁরা গ্রহণ করতেন না। কারণ গবাদি প্রাণীকে তাঁরা পূজার্চনা করতেন। নুনিজ মন্তব্য করেছেন যে, "বিজয়নগর রাজ্যের সকল প্রকার প্রাণীর মাংস, শূয়োর, মৃগমাংস,

www.pathagar.com

ঘুঘু, তিতির ও অন্যান্য ধরনের পাখীর মাংস এমন কি চড়ুই পাখী, ইঁদুর, বিড়াল ও গিরগিটি সবই বিসনাগ (অর্থাৎ বিজয়নগরের) বাজারে বিক্রয় করা হত।" যদি খাদ্যদ্রব্যের এই জাতীয় তালিকা যা পর্তুগীজ ভ্রমণকারী নুনিজ ও পায়াসের (Paes) লেখনী থেকে পাওয়া যায় তা বাস্তবানুগ হয় তাহ'লে ভিনসেন্ট স্মিথের সঙ্গে ঐক্য মত হয়ে বলতে হয় যে, কৃষ্ণদেব রায় ও অচ্যুত রায়ের ন্যায় হিন্দুধর্মে একান্ত বিশ্বাসী (যাঁরা বিষ্ণুর বিশেষ ধরনের অবতারে একান্তভাবে আস্থাশীল ছিলেন) তাঁদের সময়কার রাজা ও প্রজার পক্ষে এটা একটা অদ্ভুত খাদ্য তালিকা। সম্ভবতঃ বিজয়নগরের বসবাসকারী নিম্নবর্গের মানুষ এইভাবে বাছবিচার না করে সকল ধরনের প্রাণীর খাদ্য গ্রহণ করত। পর্তুগীজ ভ্রমণকারীদের বিবরণীতে বিজয়নগর রাজ্যে অজস্র পশুবলির কথা উল্লিখিত হয়েছে। পায়াসের মতে রাজা স্বচক্ষে ২৪টি মোষ ও ১৫০টি মেষ বলি দেখতেন এবং নয়দিনের প্রসিদ্ধ উৎসবে ২৫০টি মোষ ও ৪,৫০০ মেষ বলির নিয়ম ছিল। এই সব প্রাণীর প্রাণনাশ করা হত খাড়ার একঘায়ে।

শিক্ষা ও খেলাধূলা

শিক্ষা পদ্ধতির সম্পর্কে বলা যায় সংস্কৃতই ছিল উচ্চশিক্ষার মাধ্যম। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম ছিল আঞ্চলিক ও মাতৃভাষা এবং গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষকের প্রতিপালনের জন্য চাষের জমি দান করা হত। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তামিল, তেলেগু, মারাঠি ও প্রাকৃত ভাষার প্রচলন ছিল। গ্রামের পাঠশালা গাছের ছায়াতে বা মন্দিরের চাতালে বসত। পাঠশালার গুরুমহাশয়কে (বাত্তি বা অক্কারিগা) গ্রামের মাতব্বর বা রাজকর্মচারীদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য করা হত এবং তাঁরা নিজেদের উপর ন্যস্ত বিশেষ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবেন এই শর্তে জমি উপভোগ করতেন। পিয়েট্রো ডেলাভেলা (১৬২৩ খ্রীঃ) এই গ্রাম্য পাঠশালা ও তাদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ দিয়েছেন। ব্রাহ্মণদের উচ্চতর শিক্ষায় একচেটিয়া অধিকার ছিল। বিজয়নগরের রাজারা উচ্চতর শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাহমনি সুলতানরা ও তাঁদের উত্তরসূরীরা আরবী-ফার্সীতে শিক্ষার সমর্থক ছিলেন এবং মাদ্রাসা ও মোক্তবের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বিজয়নগরের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে খেলাধূলার জন্য ক্রীড়াঙ্গন ছিল। এইসব ক্রীড়াঙ্গনে রাজার চিত্তবিনোদনের জন্য নানা ক্রীড়ানুষ্ঠান হ'ত যার মধ্যে পশুপক্ষীর লড়াই, কুস্তি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। পর্তুগীজ ভ্রমনকারী নুনিজ বিজয়নগরে নারী মল্লযোদ্ধার কথাও উল্লেখ করেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে জুয়া, নানা ধরনের দৌড় প্রতিযোগিতা, মোরগের লড়াই, মোষের লড়াই প্রভৃতি জনপ্রিয় ছিল। বিভিন্ন ধরনের মেলা ও উৎসবের অভাব ছিল না। সাপের খেলা, যাদুর খেলা, লোকনৃত্য, বনভোজন প্রভৃতি সাধারণের আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ ছিল।

আর্থিক অবস্থা—বিদেশীদের বর্ণনায় বিজয়নগরের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে যেসব বৈদেশিক ভ্রমণকারী বিজয়নগর পরিভ্রমণ করেছিলেন তাঁদের বর্ণনা থেকে এই রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে দুইজন বিদেশী ভ্রমণকারী ইতালীয় নিকোলাই কন্টি (১৪২০ খ্রীঃ) ও পারসিক রাজদূত আব্দুর রজ্জাক (১৪৪২-৪৩ খ্রীঃ) বিজয়নগর সম্পর্কে বিবরণীতে এই রাজ্যের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করেছেন। কন্টি বলেছেন "এই শহরটি পরিধিতে ছিল ৬০ মাইল; এর প্রাচীর পর্বতের সানুদেশ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এবং যেসব উপত্যকা পর্বতের সানুদেশ পর্যন্ত ছিল তাদের ঘিরে রেখেছিল যাতে এর সীমা বৃদ্ধি পায়। এই শহরে নব্বই হাজার অস্ত্রধারণে সক্ষম ব্যক্তি আছে বলে অনুমান করা

www.pathagar.com

হয়। ....এইখানকার অধিপতি ভারতের অন্য যে কোন স্থানের নৃপতির তুলনায় অধিক শক্তিশালী।" আব্দুর রেজ্জাক বলেছেন যে, "দেশটির জনসংখ্যা এত বেশী যে, যুক্তিসঙ্গত পরিমিত স্থানের মধ্যে তা বর্ণনা করা অসম্ভব। রাজার খাজাঞ্চিখানায় গর্ত খনন করে তাতে গলান সোনায় পরিপূর্ণ করা হয়েছে যার ফলে এটি পিণ্ডাকৃত হয়ে রয়েছে। এখানকার সকল অধিবাসীরা উচ্চ বা নীচ এমনকি বাজারের কারিগররাও কানে, হাতে, গলায়, কব্জি ও আঙ্গুলে স্বর্ণালংকার ধারন করে।" পর্তুগীজ ভ্রমণকারী ডোমিনিগাস পায়স লিখেছেন, "এখানকার রাজার প্রচুর ধনদৌলত ও প্রচুর সৈন্য ও হাতি আছে। কারণ, এদেশে সংখ্যাতীত হাতি পাওয়া যায়, ...এই শহরে সকল জাতির ও গোষ্ঠীর লোক দেখতে পাওয়া যাবে কারণ এখানকার বাণিজ্যের প্রসারতা ও এখানকার মূল্যবান পাথর বিশেষতঃ হীরকের অস্তিত্ব।" পর্তুগীজ পর্যটক পায়সের বিবরণীতে আরো জানা যায় যে, বিজয়নগরে সবরকমের খাদ্যশস্য, চাল, গম, বার্লি, বিন, ডাল, ঘোড়ার খাদ্যশস্য ও মানুষের আহার্য্য খাদ্যশস্য সস্তায় এই শহরের বাজারে বিক্রয় হত। এডওয়ার্ড বার্বোসা (১৫১৮) বিজয়নগর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন যে, এই শহরটি ছিল বিশাল ও জনসংখ্যায় পরিপূর্ণ। তিনি আরও বলেছেন, "the seat of an active commerce in country diamonds, rubies from Pegu, silks of China and Alexanaria and cinnabar (সিন্দুর), camphor, musk, pepper and sandal from Malaber।"

কৃষি ও শিল্প

বিজয়নগর সম্পর্কে বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের লেখনী সূত্রে এই রাজ্যের অভূতপূর্ব আর্থিক সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। এই রাজ্যের অধিকাংশ লোকই কৃষিনির্ভর ছিল এবং গ্রামে বাস করত। জমির মালিকানা পাওয়া অত্যন্ত সম্মানের ব্যাপার ছিল এবং সকলেই অন্ততঃ একটি ছোটখাট জমির মালিকানা লাভ করার জন্য সচেষ্ট ছিল। অতএব গ্রাম ছিল কৃষকদের বসতি ও গ্রাম্যসভাগুলিতে ভূস্বামীদের সমাবেশ হ'ত। রাজ্যের অনেক অংশে কিছুকাল অন্তর অন্তর চাষযোগ্য জমির পুনর্বণ্টনের রীতি চালু ছিল। এছাড়া ছিল অজস্র ভাগচাষী যারা কৃষিতে শ্রমদান করত ও উৎপন্ন ফসলের অংশ পেত। এই সময় ভূমিহীন চাষীদের একাংশ ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল এবং স্থানীয় কোন ব্যাপারে ভূমিহীন চাষীদের কোন মতামত গ্রহণ করা হ'ত না। কারিগর ও পেশাদার মিস্ত্রীরা সাধারণের ব্যবহার্য জমির অংশ দাবি করতে পারত এবং প্রতিটি কাজের জন্য আলাপ-আলোচনা করে কাজের মজুরী স্থির করার প্রথা ছিল। নিম্নবর্গের লোকেরা গৃহকর্ম্ম বা অন্যান্য সাফাই কাজে নিযুক্ত হত। সাধারণের ব্যবহারযোগ্য জমিতে তাদের অংশ ছিল। দৈনন্দিন শ্রমিকদের শস্য দিয়ে মজুরি দেওয়া যেত। জমিতে ঠিকাপ্রজা বসানোর রীতি প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ মন্দিরের জমি বা কোন পৌরসভা অথবা যৌথ সংস্থার জমিতে এইরূপ ঠিকাপ্রজা বসানোর প্রথা প্রচলিত ছিল। এইসব প্রজারা যে অধিকার ভোগ করত তাতে তারা জমির আংশিক মালিকানা উপভোগ করার অধিকারী হত। বিভিন্ন ধরনের জমি, রাজধানীর নিকটবর্তী বাগানের জন্য নির্দিষ্ট জমি, কৃষিকর্মের জন্য ব্যবহৃত ভূখণ্ড, বনভূমি প্রভৃতি থেকে কর আদায়ের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবস্থা করা হত। বিজয়নগরে গোলাপ ফুলের ব্যবসায়ীর সংখ্যা লক্ষ্য করে রজ্জাকের মনে হয়েছিল, বিজয়নগরে খাদ্যশস্যের আর গোলাপের প্রয়োজন ও চাহিদা একই প্রকার ছিল। সেচের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলে অবহিত ছিল। খরস্রোতা নদীতে বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ত এবং প্রয়োজনে খাল খননের মারফতে জলাধার নির্মাণ করে যে সব অঞ্চলে চাষের জলের অভাব তা পূরণ করা হ'ত। কৃষির প্রসারের জন্য উদ্যোগ নেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত গোপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন

www.pathagar.com

বৃদ্ধি ও সরবরাহের দিকে নজর দেওয়া হ'ত। গোচারণের জন্য পৃথক জমি নির্দিষ্ট ছিল। বিভিন্ন লিপিতে গোপালনের কথা জানা যায়। বিত্তবানদের খাদ্য তালিকায় 'ঘি' একটি উপাদেয় বস্তু বলে গণ্য হত। এছাড়া মন্দিরে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য ও পূজা অর্চনার কাজে ঘি-র প্রয়োজন ছিল।

শিল্প, বাণিজ্য ও যোগাযোগ

সাধারণতঃ অধিকাংশ শিল্পোৎপাদনের উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় বাজারের পণ্যের চাহিদা মেটানো। কিন্তু ভ্রাম্যমান বণিকরা ও বণিক সংঘগুলির অস্তিত্বর জন্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। সুতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন প্রধান শিল্পগুলির অন্যতম ছিল এবং তন্তুবায় সংঘ স্থানীয় ব্যাপারে আন্তরিকতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করত। রাজ্যের বিভিন্ন বন্দর থেকে নানা ধরনের সূক্ষ্মবস্ত্রের রপ্তানীর কথা সমকালীন তথ্য ও লিপি থেকে জানা যায়। ধাতুশিল্প ও অলঙ্কারের নির্মাণ শৈলী শিল্পোৎকর্ষের চরমশীর্ষে পৌঁছেছিল। লৌহশিল্প প্রধানতঃ অস্ত্রনির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং পালনাদের ন্যায় এলাকায় এবিষয়ে দক্ষতার জন্য সুপরিচিত হয়েছিল। লবণ উৎপাদন প্রধানতঃ সরকারের হাতে ছিল এবং সরকারের এই সূত্রে প্রচুর রাজস্ব লাভ হত। বস্ত্রবয়ন, খনিজশিল্প ও ধাতুশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল সুগন্ধি দ্রব্যের কারখানা।

সমস্ত শিল্প ও কারিগরি কার্যকলাপ জাতি ও বর্ণের এবং সংঘের ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল এবং সমবায়ের মারফতে তাদের কাজ চলত। ফলে কারিগর ও বণিক সংঘগুলি অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। আব্দুর রাজ্জাক মন্তব্য করেছেন যে, প্রতিটি পৃথক সংঘ বা শিল্পের লোকেদের বিপণী পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী পায়েস বলেছেন যে, "প্রতিটি রাস্তায় মন্দির আছে যা আমাদের দিকের ন্যায় কারিগর বা বণিক প্রতিষ্ঠানের সংঘের সঙ্গে যুক্ত।"

অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ সবসময় পাওয়া যায় না। পণ্যের যাতায়াতের জন্য জলপথ বা সেচের খাল ব্যবহৃত হত না। প্রধান সড়কগুলি সাধারণতঃ ২৪ ফুটের বেশী চওড়া না হওয়াতে চাকাওয়ালা যানবাহনের পক্ষে যাতায়াতের অসুবিধা ছিল। উপকূল দিয়ে নৌ ও জাহাজ চলাচলের জন্য দ্রুত যোগাযোগ সহজ ছিল। রাস্তাঘাট নিরাপদ ছিল না এবং বিশৃঙ্খলার সময় ডাকাতি ও রাহাজানি বৃদ্ধি লাভ করত। বিজয়নগর ও বাহমনি সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠার পর যাতায়াত ও যোগাযোগের পথ সহজ ও সুগম হয়েছিল। বৈদেশিক বিবরণীতে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের কথা জানা যায়। পর্তুগীজ ও অন্যান্য বৈদেশিকরা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সেসব মূল্যবান তথ্য রেখে গেছেন সেসব তথ্য বিশেষত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের পরিস্থিতির উপর আলোকসম্পাত করে।

বাণিজ্যের জন্য বিজয়নগর রাজ্যের আর্থিক উন্নয়ন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভ্যন্তরীণ উপকূলবর্তী ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে বিজয়নগরের সঙ্গে বহুদেশের লেনদেন ছিল। সমুদ্রপথে মালাবার উপকূলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল কালিকট। আফ্রিকা ও আরব দেশগুলির পক্ষে এইটি ছিল নিরাপদ পোতাশ্রয়। বিজয়নগরের অধিনে ভারত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ, চীন, আরবদেশ, পারস্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, আবিসিনিয়া ও পর্তুগাল প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। প্রধানতঃ বস্ত্র, চাল, লৌহ, শোরা, চিনি এবং মশলাপাতি বিদেশে রপ্তানী করা হত। আমদানীকৃত পণ্যের মধ্যে ছিল ঘোড়া, হাতি, মুক্তা, তামা, পলা, পারদ, চীনাংশুক ও ভেলভেট। সাধারণতঃ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

গরুর গাড়ীতে, মালবহনকারীদের মাথায় বা ভারবহনকারী পশুদের স্কন্ধে পণ্য বহনের রীতি ছিল। উপকূলবর্তী বাণিজ্য বা সমুদ্রপারের দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক পণ্যের লেনদেন জাহাজে পরিবহন করা হত। বার্বোসা বলেছেন, দক্ষিণ ভারতের জন্য মালদ্বীপে জাহাজ নির্মাণ করা হত। বিজয়নগরের রাজারা যে বিশাল নৌবহর রাখতেন তা সমকালীন লিপি থেকে প্রমাণিত হয়। এই রাজ্যের অধিবাসীরা পর্তুগীজদের আগমনের পূর্বে জাহাজ নির্মাণে দক্ষ ছিল। বিজয়নগরের অধিবাসীরা কিভাবে সামুদ্রিক পরিবহনের ব্যবস্থা করত সে সম্পর্কে সঠিকভাবে আমাদের জানা নাই।

ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর ভাষায় বলা যায় যে, "Coinage was never the monopoly of a single central power, though this condition was very nearly realised for sometime under Vijayanagar.* বিজয়নগরে স্বর্ণ ও তাম্রের বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা ছিল, কিন্তু রৌপ্য মুদ্রার মাত্র একটি সংস্করণই পাওয়া যায়। এইসব মুদ্রার উপর নানা দেবদেবীর, যাঁরা শাসকের উপাস্য বা জীবজন্তুর প্রতীক, তাঁদের প্রতিকৃতি খোদাই করা হ'ত। এ যুগে বিভিন্ন ও নানাধরনের মুদ্রার প্রচলনের বিশেষ অসুবিধা হ'তএই সম্পর্কে সন্দেহ নাই। সমাজের উচ্চস্তরের লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল, কিন্তু তৎকালীন লিপিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সাধারণ মানুষ অতিরিক্ত করভারে পীড়িত ছিল। স্থানীয় প্রশাসকদের শোষণের ফলে জনগণ চরম দুর্দশাগ্রস্থ হলে দেশের সর্বোচ্চ রাজশক্তি সময় বিশেষে প্রজামঙ্গলের জন্য হস্তক্ষেপ করতেন।

সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প

বিজয়নগরের অধিপতিরা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এইযুগে দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষত তামিল সাহিত্যের বিকাশের মূলে বিজয়নগরের রাজাদের সক্রিয় উৎসাহ ছিল। বিজয়নগরের নৃপতিদের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতের কৃষ্টি ও শিল্পের ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব উন্নতির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

বেদের বিখ্যাত টীকাকার সায়ন (মৃত্যু ১৩৮৭ খ্রীঃ) দ্বিতীয় হরিহরের মন্ত্রী ছিলেন। সায়নের ভ্রাতা ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাধববিদ্যারণ্য বিজয়নগরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। বিজয়নগরের রাজারা শুধু নিজেরাই বিদ্বান ও সুশিক্ষিত ছিলেন না, তাঁরা সাহিত্যের বিকাশের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বিজয়নগরের অধিপতিরা শৃঙ্গীরি মঠের সন্ন্যাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তেলেগু কবিরা নরসিংহ সালুভের কীর্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। সাহিত্যের দিক্পালদের বিজয়নগরের রাজারা নানা উপাধিতে ভূষিত করতেন।

সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বিজয়নগরের অধিপতিদের মধ্যে কৃষ্ণদেব রায় সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। দার্শনিক ও ধর্মশাস্ত্রের পণ্ডিতরা, কবি ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁর সময়ে বিজয়নগরের রাজসভায় সমবেত হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কৃষ্ণদেব রায়ের অনুরাগ সুবিদিত ছিল। কিন্তু তিনি তেলেগু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তেলেগু সাহিত্যে তার অবদান অবিস্মরণীয়। এই সাহিত্যের স্বর্ণযুগ শালুব নরসিংহর সময় থেকে শুরু হয়েছিল এবং কৃষ্ণদেব রায়ের সময় পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ

* A History of South India, পৃঃ ৩৩৮।

www.pathagar.com

করেছিল। কৃষ্ণদেব রায়ের সময় তেলেগু সাহিত্যের নবযুগের সূচনা হয়েছিল এবং সাহিত্যে এই প্রেরণার সূত্রপাতের মূলে ছিল তাঁর নিজের রচিত গ্রন্থ 'আমুক্তমাল্যদা'। ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী এই গ্রন্থকে "One of the five great kavyas in Telegu" বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই গ্রন্থের মারফতে তেলেগু সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাবের সূত্রপাত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। কৃষ্ণদেব রায় সংস্কৃতেও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বিক্রমাদিত্য ও তাঁর নবরত্ন সভার মতো কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভায় সমবেত সাহিত্যিকদের সুনাম দিকে দিকে প্রবাদ কাহিনীর ন্যায় প্রচলিত ছিল। তাঁরা 'অষ্টদিক্‌গজ' নামে খ্যাত। এইসব সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন পেড্ডন। পেড্ডনের কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে কৃষ্ণদেব রায় তাঁকে 'অন্ধ্রকবিতা মিতামহ' এই উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

সাহিত্য ও কাব্যের প্রতি কৃষ্ণদেব রায়ের পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুরাগের ফলশ্রুতি সুদরপ্রসারী হয়েছিল। তাঁর প্রদর্শিত পথে পরবর্তীকালের বিজয়নগরের রাজারা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারে যথাসাধ্য প্রযত্ন করেছিলেন। কৃষ্ণদেব রায়ের উত্তরসূরীরা কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং তেলেগু সাহিত্যের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন। রাজনৈতিক পটভূমিকায় নানা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ও ঝড়ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাকে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে মনে করতেন। রামরায় এবং আরবিড়ু বংশীয় অন্যান্য নৃপতিরা এই ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন এবং রামরায়ের ভ্রাতাদের আমলে বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুত্থান হয়েছিল। এই জন্য নাটক, সংগীত, নৃত্যকলা, ব্যাকরণ, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়নগরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

স্থাপত্য ও শিল্প

বিজয়নগরের গৌরবের যুগে এই শহর এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল। বিজয়নগরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই যুগে দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্য, চিত্রকলা ও শিল্প উন্নতির শিখরে উঠেছিল। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগরের রাজারা তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে হাম্পিতে বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিদেশী ভ্রমণকারীর বিবরণ থেকে এই অতুলনীয় নগরী সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। এইসব বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের মধ্যে ইতালীয় পরিব্রাজক নিকোলাই কন্টি ও পারসিক দূত আব্দুর রেজ্জাক পঞ্চদশ শতকে, ও কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে (১৫০৯-২৯ খ্রীঃ) পর্তুগীজ ভ্রমণকারী পায়স ও নুনিজ বিজয়নগরের বিবরণী রেখে গেছেন। এছাড়াও অন্যান্য যেসব ইউরোপীয় ভ্রমণকারীর নাম উল্লেখযোগ্য, তাদের মধ্যে বারথেমা (১৫০২-৬ খ্রীঃ) ও বার্বোসার (১৫০০-১৫১৬) নাম অন্যতম।

আব্দুর রজ্জাকের মতে বিজয়নগরের বিস্তৃতি ছিল ৬৪ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এবং এই শহরের কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য সাতটি প্রাচীর পরিবেষ্টিত দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত এলাকা অতিক্রম করতে হ'ত। পর্তুগীজ পর্যটক পায়স বিজয়নগর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এই শহর ছিল "as large as Rome and very beautiful to look at।" তিনি আরো বলেছেন যে, বিজয়নগরের রাজপ্রাসাদ যেরূপ বিশাল স্থান জুড়ে ছড়িয়ে ছিল তার বিস্তৃতি লিসবনের সমস্ত দুর্গগুলির এলাকা থেকেও বেশী। তালিকোটার যুদ্ধে জয়লাভ (১৫৬৫ খ্রীঃ) করার পর বিজয়ী দক্ষিণ ভারতের সুলতানদের বাহিনী এই সৌন্দর্যমণ্ডিত নগরীর উপর অভূতপূর্ব ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল। কিন্তু সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে আজও বিজয়নগরের প্রাচীন ঐতিহ্য ও গৌরবের নিদর্শন পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

বিজয়নগরের অপূর্ব শিল্পসম্ভার সমন্বিত রাজপ্রাসাদের ক্ষতবিক্ষত ভিত ছাড়া অন্য কিছুই অবশিষ্ট নাই। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া যায় বিজয়নগরের রাজাদের দরবারের একাংশ এবং তাঁদের সিংহাসন বেদীর অংশবিশেষ, যা উড়িষ্যার জয়লাভের (১৫১৩ খ্রীঃ) কীর্তি হিসেবে কৃষ্ণদেব রায় নির্মাণ করেছিলেন এবং পায়সের বর্ণনায় যাকে বিজয়স্তম্ভ বলা হয়েছে। এই ধ্বংসাবশেষগুলি এখনও বিজয়নগরের শিল্পকীর্তির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। পার্সি ব্রাউন এই দুইটিকে যথাক্রমে পারসিকদের ও মুঘল সম্রাটদের প্রাসাদের দরবার-ই-আম এবং দরবার-ই-খাসের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে, এইসবস্থানে বিজয়নগরের রাজাদের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সভাগৃহ ছিল।

অন্যান্য প্রাসাদগুলির ধংসাবশেষ থেকে তাদের চরিত্র অনুধাবন করা কঠিন। কিন্তু এদের মধ্যে যেগুলি মোটামুটি লুঠেরাদের আক্রমণ ও কালের প্রভাব থেকে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষায় কিছুটা সক্ষম হয়েছে তাদের মধ্যে পদ্মমহল, পিলখানা এবং দুইটি স্তম্ভাকৃতি কাঠামো, যাকে ভুলক্রমে জেনানা বা অন্দরমহলের নিরীক্ষণ স্তম্ভ বলে অনেক সময় ধরা হয়, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি একটি চতুর্ভুজাকার চত্বর যার প্রান্তিক অংশ দুইবার পুনর্নির্মিত হয়েছে এবং ইহা একটি দ্বিতল কাঠামো। শিল্পের ক্ষেত্রে এই দালানের নির্মাণরীতি স্থানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। অতএব এর স্থাপত্য ও অলঙ্করণ ইন্দো-ইসলামিক প্রভাবের দ্বারা প্রসূত বলে যে বক্তব্য Longhurst রেখেছেন তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় যে প্রাসাদটি ভুলক্রমে হাতির পিলখানা বলে উল্লেখিত হয়েছে সেটিতে ইসলামিক ও দেশীয় রীতির সমন্বয়ের ফলে উভয়রীতির অঙ্গাঙ্গী মিলন দেখা যায়। এর স্তম্ভটির প্রথম স্তরের অপূর্ব খিলানগুলি ইসলামিক প্রথা অনুসরণ করেছে এবং এর দেশীয় পদ্ধতিতে নির্মিত দেওয়াল বন্ধনীগুলির ভারসাম্য সহজেই রক্ষা করছে। এইজন্য অধ্যাপক সরসী কুমার সরস্বতী মন্তব্য করেছেন যে, Here in this striking building the Islamic and indigenous convention may be seen to have been blended in a harmonious and organic manner'.। তৃতীয় সৌধ দুইটি বা তথাকথিত যে দুইটি নিরীক্ষণ স্তম্ভের কথা উল্লিখিত হয়েছে তারা সুউচ্চ এবং তাদের একটি উপরের তলা নির্মিত হয়েছিল। এই উপরের তলার দুই পাশে ঝুলন্ত বারান্দা আছে।

মন্দির স্থাপত্যের শিল্পশৈলী ও ভাস্কর্য

বিজয়নগরের স্থাপত্যরীতি ও শিল্পশৈলী তার মন্দির স্থাপত্যকে সর্বাধিক ঐশ্বর্য্যশালী করেছে। এযুগে যে সমস্ত মন্দির গঠন করা হয়েছে তাদের শিল্পরীতিতে হিন্দু শিল্পকলার ও সংস্কৃতির নবোন্মেষের সূচনা পাওয়া যায়। এই শিল্পধারা দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে, রীতি ও পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্তন এনেছিল। এর প্রতিটি বৈশিষ্ট এবং শৈলী অভিনব শিল্পসৌন্দর্যের বিকাশের পরিচয় দেয়।

এই যুগের মন্দিরের কাঠামো ও সংগঠনগুলি অনেক বেশী প্রসারিত ও বিস্তৃত হয়েছিল। মন্দির এলাকার মধ্যে এইসময় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন কাঠামো যার মধ্যে ছিল স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ, ছোট ছোট গর্ভগৃহ, আর মঞ্চ যেগুলি পূজাপদ্ধতি জটিলতার সাক্ষ্য দেয়। এইসব' সংযোজনের মধ্যে অন্যতম ছিল বৈশিষ্ট্য ও কারুকার্যপূর্ণ কল্যাণমণ্ডপ ও স্তম্ভযুক্ত মঞ্চের অলঙ্করণ যার সৌন্দর্য ছিল দর্শনীয়। এই কল্যাণমণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ও তাঁর সঙ্গিনী দেবীর বাৎসরিক বিবাহোৎসবের অভ্যর্থনা ও পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হ'ত। মন্দিরের আরাধ্য দেবতার ও সঙ্গিনীদেবীর মূর্ত্তির জন্য পৃথক মন্দির ছিল। বিজয়নগরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের রীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল তার অপূর্ব সমৃদ্ধশালী সূক্ষ্ম এবং জটিল অলঙ্করণ ও কারুকার্য। মন্দির স্থাপত্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তথাকথিত 'হাজার স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ' যা ছিল স্তম্ভের সারিযুক্ত

www.pathagar.com

একটি বৃহৎ হলঘর। সাধারণতঃ এইসব সুউচ্চ স্তম্ভের স্তরে স্তরে নানা ধরনের ভাস্কর্য খোদাই করা ছিল। এইসব ভাস্কর্যে দুরন্ত অশ্ব ও অন্যান্য অনেক জন্তু-জানোয়ার ও কাল্পনিক পশু স্তম্ভগাত্রের কালোপাথরে খোদিত হয়েছে। একটি সুবৃহৎ স্তম্ভ চতুপার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি স্তম্ভ পরিবৃত ছিল যেগুলিতে সামান্য আঘাতে ভারতীয় সঙ্গীতের সাতটি সুরেলা আওয়াজ পাওয়া যেত। এছাড়াও নানাধরনের স্তম্ভ নির্মাণ রীতির প্রচলন ছিল এবং পাণ্ড্যযুগে প্রবর্তিত মন্দিরের সম্মুখে গোপুরম নির্মাণ পদ্ধতির ঐতিহ্য বজায় রাখা হয়েছিল। মন্দির ও স্তম্ভগাত্রের নানা ধরনের শিল্পকর্ম ও অলঙ্করণের অবিরত ধারায় বিভিন্ন কাহিনী ও উপকথা সম্বলিত কারুকার্য অপূর্ব সৌন্দর্য ও শিল্পকলার সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল।

বিজয়নগর তার অজস্র মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। এই নগর কেবলমাত্র রাজধানী হিসেবে নয় 'মন্দিরনগর' হিসেবেও সকলের কাছে পরিচিত হয়েছিল। তখনকার পুণ্যার্থীদের কাছে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল বিটলস্বামী মন্দির ও হাজারা রাম মন্দির। পূর্বোক্ত মন্দিরের অলঙ্করণ বৈচিত্র্যে ও সৌষ্ঠবে সর্বাধিক আকর্ষণীয় ছিল। এই মন্দিরের নির্মাণ শুরু হয় দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালে ও অচ্যুত রায়ের আমলেও এটির কার্য সম্পূর্ণ হয়নি। মূল মন্দিরটি বিষ্ণু বা বিঠলের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল। পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত এই মন্দিরের কাঠামো ছিল দৈর্ঘ্যে ২৩০ ফুট ও উচ্চতায় মাত্র ২৫ ফুট। তিনটি ভাগে বিভক্ত এই মন্দিরে ছিল একটি মহামণ্ডপ, সম্মুখভাগে একটি স্তম্ভযুক্ত উন্মুক্ত হল, একটি অর্ধ-মণ্ডপ, মধ্যভাগে একই ধরনের বদ্ধ একটি 'হল' ও পশ্চাদভাগে গর্ভগৃহ। ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন যে, "The rest of the temple is a unified structure, rectangular in shape, 135 feet by 67 feet and its external walls are embellished with the usual arrangement of pilasters, niches and canopies."* এই মন্দিরের অন্যান্য কাঠামোর স্থাপত্য শৈলীর ঔজ্জ্বল্য কল্যাণমণ্ডপের সৌন্দর্যের তুলনায় ম্লান, এবং এর আয়তন মহামণ্ডপের অর্ধেক ছিল। কল্যাণমণ্ডপের কাছে এবং মহামণ্ডপের প্রবেশদ্বারের মুখোমুখি দেবরথ নির্মিত হয়েছিল।

বিজয়নগর-শিল্পশৈলীকে নিখুঁত ও যথাযথ সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করার প্রয়াস হাজারা রাম মন্দির নির্মাণরীতিতে দেখা যায়। হাজারা রাম মন্দিরের কাঠামো ছিল তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রায়তন। প্রধান মন্দির ছাড়া সঙ্গিনী-দেবী মূর্তির জন্য গর্ভগৃহ, একটি কল্যাণমণ্ডপ ও অন্যান্য ছোটখাট মন্দির এবং অঙ্গনকে ঘিরে উঠেছে একটি ২৪ ফিট সুউচ্চ প্রাচীর। এই মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে পূর্বদিকের থেকে একটি সুষম বিন্যস্ত সমতল বারান্দা হয়ে একটি 'হলে পৌঁছতে হবে। এই সভাগৃহ বা হলটি সারিবদ্ধ কালোপাথরের ৪টি করে স্তম্ভের উপর রয়েছে এবং এই স্তম্ভগুলি প্রতিটি চতুষ্কোণের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। এই সভাগৃহে প্রবেশ করার আরো দুইটি প্রবেশদ্বার আছে। রামায়নের থেকে গৃহীত ঘটনাবলী এই মন্দির গাত্রের ভাস্কর্যের সৌষ্ঠবকে বৃদ্ধি করেছে।

আরো যেসব অজস্র মন্দির বিজয়নগরের সাম্রাজ্যের চারিদিকেছড়িয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে ফার্গুসন তাদপত্রীর (রাজধানী বিজয়নগর থেকে ১০০ মাইল দঃ পূর্বে) মন্দিরের গঠনশৈলীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, সম্ভবতঃ বিটলস্বামী মন্দিরের সৌন্দর্যকেও এই মন্দিরের শিল্পশৈলী উৎকর্ষে অতিক্রম করেছিল। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এইসব মন্দিরগুলি কোন একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত ও প্রত্যেক প্রজন্মের দানে সম্পদশালী হয়ে উঠত। বিজয়নগরের রাজারাও তাঁদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধির

---

* A History of South India (Oxford- 4th ed.) পৃঃ ৪৮৩।

www.pathagar.com

জন্য অনেক দানধ্যান করেছিলেন। এইসব ধর্মীয় স্থানের বৈশিষ্ট্য হল তথাকথিত হাজারস্তম্ভের মণ্ডপ। চিদাম্বরমের পার্বতী মন্দির (দঃ আর্কট), কাঞ্চিপুরমের একাম্রনাথ ও বরদারাজ মন্দির সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, এদের অঙ্গনগুলির বিস্তার লক্ষ্যণীয়। দক্ষিণভারতের অনেক মন্দিরের স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য হল তাদের মধ্যে কাল্পনিক মূর্তি সমূহের অদ্ভুত সমাবেশ। শ্রীরঙ্গপত্তমের শেষগিরিমণ্ডপের দুরন্তবেগে ধাবমান অশ্বগুলি প্রায় নয় ফুট পর্যন্ত উঠেছে। এযুগের গোপুরমগুলি দক্ষিণ ভারতের শিল্পের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছিল।

কেবলমাত্র স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেই নয়, চিত্রকলা ও সংগীতে দক্ষিণ ভারতের শিল্পীরা বিজয়নগরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। এইসব চিত্রকলার চিহ্নমাত্র আজ নাই। কিন্তু পর্তুগীজ ভ্রমণকারীদের ও আব্দুস রজ্জাকের বিবরণী পাঠে নিঃসন্দেহে এই যুগের চিত্রকলার উৎকর্ষ সম্পর্কে জানা যায়। সংগীতের সম্পর্কেও বিজয়নগরের রাজারা যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় ও রামরায় সংগীতে পারদর্শি ছিলেন। সংগীতের গুণগত দক্ষতা ও মানের এই যুগে উন্নতি হয়। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে জনগণের মধ্যে নাটক ও অভিনয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। বিজয়নগরের রাজারা ধর্মপালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং ইহুদী, মুসলমান, ক্রিশ্চান, জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, হিন্দু সকল মতের প্রতি উদার ব্যবহার করতেন। বার্বোসা মন্তব্য করেছেন যে, "The king allows such freedom that every man may come, and go to live according to his own creed without suffering annoyances and without enquiry, whether he is a Christian, Jew, Moor or Hindu." এককথায় বলা যায় যে, দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে বাহমনি সুলতানদের রাজত্ব

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে কয়েকজন আমির তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে দৌলতাবাদ শহরটি কব্জা করে ইসমাইল মক্ নামক একজন অভিজাতকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। যেসব অভিজাতরা দক্ষিণে বিদ্রোহী হয়েছিলেন তাঁরা আমিরান-ই-সদা নামে কথিত গোষ্ঠীর অঙ্গ ছিলেন। ইসমাইল মক্ বৃদ্ধ ও অশক্ত ছিলেন বলে স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন। এইসময় অভিজাতরা হাসান নামে আরেকজনকে তক্তে স্থাপন করেন। এই হাসানই আবুল মুজাফর আলাউদ্দীন বাহমন শাহ উপাধি গ্রহণ করে ৩রা আগস্ট, ১৩৪৭ সালে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন এবং গুলবার্গায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। হাসানের প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম হয় বাহমনি বংশ। দক্ষিণী ঐতিহাসিক ফিরিস্তা বলেছেন, হাসান জীবনের প্রথমভাগে গাংগু নামে এক জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের দাস ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে সুব্যবহার লাভ করেছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতার প্রতিদানে হাসান স্বীয় প্রতিষ্ঠিত সুলতানী বংশের নাম দিয়েছিলেন বাহমনি বংশ। কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ এই কাহিনী অলীক বলে মন্তব্য করেছেন। পারস্যের বিখ্যাত নৃপতি বাহমন বিন ইসফান্দারের বংশধর বলে প্রচলিত কাহিনীও ঐতিহাসিক সত্য বলে গ্রাহ্য হয়নি। রিজভী বলেছেন, হাসান ছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর প্রসিদ্ধ সেনাপতি জাফর খানের ভ্রাতুষ্পুত্র।*

* "Wonder that was India, Vol-II, পৃঃ ৭৭ দ্রষ্টব্য)।
ডঃ কানুনগরের মতে হাসান গাংগু ছিলেন একজন ধর্মান্তরিত হিন্দু বা ধর্মান্তরিত হিন্দুর বংশধর। এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য A. L. Srivastava-র Sultunate of Delhi পৃঃ ২৬৫-৬৬ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে চতুর্দশ শতকে যেসব স্বাধীন সুলতানী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের বাহমনি রাজ্য, পশ্চিমে গুজরাতের সুলতান বংশ এবং পূর্বে গৌড়ের স্বাধীন সুলতানরা ছিলেন অন্যতম। এইসব সুলতানী বংশের প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের রাজারা, এবং রাজপুতানার বিশেষত মেওয়ারের রাণারা ও উড়িষ্যার নৃপতিরা। দিল্লীর সুলতানগণ ও জৌনপুর এবং মালবের শাসকরাও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতেন। প্রাক্-মুঘলযুগে এই রাজ্যগুলির মধ্যে সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনও কখনও বিরতি সত্ত্বেও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এই সংঘর্ষ ধর্মীয় ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিভক্ত করেনি, কারণ অধিকাংশ সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে এইসব প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। দিল্লীর সুলতানী শাসনের অবক্ষয়ের যুগে উত্তরভারতের মেওয়ার ও গুজরাট এবং মালব, দক্ষিণে বিজয়নগর ও বাহমনি, আবার উড়িষ্যা ও বিজয়নগরের সংঘর্ষ এবং পূর্বাঞ্চলে গৌড় ও উড়িষ্যার মধ্যে বিরোধ এই যুগের ইতিবৃত্তের কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী হিসেবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সমস্ত বিরোধ ও সংঘর্ষে যখন হিন্দুস্তান ব্যাপৃত ও দিল্লীর লোদী সুলতানরা তাঁদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতিবেশী রাজ্যদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত এবং অভিজাতদের ষড়যন্ত্রে দুর্বল, সেই সুযোগে বৈদেশিক আক্রমণের ফলে এক নতুন রাজশক্তির উত্থান হয়।

উত্তর ভারতে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সময় যেসব রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল তাদের তুলনায় দাক্ষিণাত্যে এইসময় শক্তিশালী রাজবংশের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্য প্রায় দুইশত বৎসরের অধিককাল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। দক্ষিণের রাজ্যগুলি কেবলমাত্র বিশাল ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত রাজধানী ও নগরের ভিত্তি স্থাপন করেনি, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগের প্রসার হয়েছিল, আইন ও শৃঙ্খলার স্থিতি হয়েছিল এবং সাধারণ মানুষের কারিগরী ও হস্তশিল্পের, কৃষি, অর্থনৈতিক ও শৈল্পিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। উত্তরভারতের রাজ্যগুলি যখন কেবলমাত্র যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ব্যাপৃত ছিল সেইসময় দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর ও বাহমানি রাজ্যে দীর্ঘকাল অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল এবং স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাহমনি সুলতানদের পতন এবং তালিকোটার যুদ্ধের পরে বিজয়নগরের ধ্বংস পর্যন্ত উভয় রাজ্যের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সত্ত্বেও এই পরিস্থিতির বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

আলাউদ্দীন হাসান বাহমনি ১৩৪৭ সালে বাহমনি বংশের ক্ষমতা সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আফগান ভাগ্যান্বেষী এবং স্বীয় যোগ্যতায় বাহমনি সুলতানদের সাম্রাজ্য প্রসারিত করেন। বিদর, মালখেদ, গোয়া, দেবল, কোলাপুর ও তেলেঙ্গানায় তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। হাসান গুলবার্গায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করে সমগ্র রাজ্যকে চারটি প্রদেশ বা তরফে ভাগ করেছিলেন এবং প্রত্যেকটি তরফে একর্জন আমির বা শাসনকর্তাকে নিযুক্ত করেছিলেন। এই তরফগুলি হল গুলবার্গা, দৌলতাবাদ, বেরার ও বিদর। এইসব তরফের শাসনকর্তাদের সৈন্যবাহিনী রাখার এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগ করার অধিকার ছিল। ১৩৫৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি হাসানের মৃত্যু হয়।

বাহমনি সুলতানদের ও বিজয়নগরের রাজাদের স্বার্থের সংঘাত হয়েছিল প্রধানতঃ তিনটি পৃথক পৃথক এলাকায়। এই তিনটি এলাকা হ'ল কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর ব-দ্বীপ এলাকা, তুঙ্গভদ্রার দোয়াব এবং মহারাষ্ট্র। কৃষ্ণা-গোদাবরীর ব-দ্বীপ এলাকা ছিল অত্যন্ত উর্বর। এই অঞ্চলের বন্দরগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের পক্ষে সহায়ক ছিল এবং

www.pathagar.com

স্বভাবত তুঙ্গভদ্রা দোয়াব অঞ্চলের দখলদারী লড়াইয়ের সঙ্গে কৃষ্ণা-গোদাবরী এলাকার নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রাম অনেক সময় যুক্ত হয়ে পড়ত। তুঙ্গভদ্রা দোয়াবের অর্থনৈতিক গুরুত্বের জন্য এই অঞ্চল বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ হয়েছিল এবং উভয় রাজ্যই এই অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তৎপর ছিল। কোঙ্কণকে কেন্দ্র করে মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ হচ্ছে পশ্চিমঘাট ও আরব সাগরের মধ্যে অবস্থিত গোয়া বন্দর। এই বন্দর রপ্তানী ও আমদানীর জন্য বিখ্যাত ছিল। বিশেষত ইরাক ও ইরান থেকে প্রেরিত অশ্বের আমদানীর অন্যতম প্রধানদ্বার গোয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে চলতে থাকে এবং এই দুইটি রাজ্যের যতদিন অস্তিত্ব ছিল ততদিন এই বিরোধ চলে। এই সব সংঘর্ষের ফলে উভয় রাজ্যের প্রচুর সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ও জীবননাশ হয়েছিল। এইসব ঘটনার অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। ১৩৪৭ সালে প্রথম বুক্কর তুঙ্গভদ্রা অঞ্চলে মুদ্গল দুর্গ দখলের সময় একজন ব্যতীত দুর্গের সকল অধিবাসীর প্রাণনাশ হয়েছিল। এই ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাহমনি সুলতান প্রথম মহম্মদ শাহ্ মুদ্গল দুর্গটি পুনরায় দখল করার সময় হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করার শপথ গ্রহণ করেছিলেন। এই সূত্রে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয় তাতে প্রচুর রক্তক্ষয়ের পর সাতমাস পরে উভয়পক্ষ রণক্লান্ত হয়ে শান্তি স্থাপন করতে রাজি হয়েছিল। যার ফলে শান্তি স্থাপনের শর্ত হিসেবে স্থির হয় যে যুদ্ধপূর্ব স্থিতি অবস্থা ফিরিয়ে আনা হবে এবং তুঙ্গভদ্রা দোয়াবকেউভয়ে সমানভাবে ভোগ করবে। এইসময় শান্তির শর্তাবলীতে বলা ছিল, যুদ্ধের সময় বেসামরিক লোকজনের প্রাণহানি করা চলবে না। যদিও পরবর্তীকালে এই শর্ত পালন সব সময় করা হয়নি তাহলেও এর দ্বারা যুদ্ধের সময় মানবিকতার নীতি পালনের জন্য সচেতনভাবে দক্ষিণ ভারতে প্রচেষ্টা হয়েছিল, এসম্পর্কে সন্দেহ নাই।

আলাউদ্দীন বাহমন শাহর উত্তরাধিকারী সুলতান প্রথম মহম্মদ শাহ (১৩৫৮-১৩৭৩) বরঙ্গলের রাজ্য আক্রমণ করে কৌলাসের ঘাঁটি ও গোলকুণ্ডার গিরিদুর্গ দখল করেছিলেন। এই পর্যন্ত স্বীয় রাজ্যের সীমা নির্দেশ করে সুলতান মহম্মদ ভবিষ্যতে বরঙ্গল রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করবেন না বলে নিজের ও তাঁর উত্তরসূরীদের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দান করেন। বরঙ্গলের সঙ্গে বাহমনি রাজ্যের মৈত্রী অতঃপর প্রায় অর্ধশতক স্থায়ী হয়েছিল। ফলে বিজয়নগরের পক্ষে তুঙ্গভদ্রা এলাকা সম্পূর্ণ স্বদখলে আনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এইভাবে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকার সময় কোন পক্ষই বিশেষ লাভবান হয়নি। এবং কোন একপক্ষ সাময়িক ভাবে জয়লাভ করলেও শেষপর্যন্ত ফলাফলের বিশেষ হেরফের দেখা যায় না।

প্রথম মহম্মদের পর তাঁর পুত্র মুজাহিদ সিংহাসনে আরোহনের পর বৈদেশিক আমির-ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। দরবারে বৈদেশিক ও দক্ষিণী আমিরদের মধ্যে এরফলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও সংঘর্ষের নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু বিজয়নগরের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। সুলতান মুজাহিদের সম্পর্কিত ভ্রাতা দায়ুদ তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু দায়ুদ স্বয়ং কিছুকাল বাদে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান এবং অভিজাতরা আলাউদ্দীন বাহমন শাহর এক পৌত্র দ্বিতীয় মহম্মদ শাহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ্ ১৩৭৮ থেকে ১৩৯৭ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তিনি মক্তব, মসজিদ ও খানকাহ বা ফকিরদের আবাসস্থল নির্মাণে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান।

www.pathagar.com

দুর্ভিক্ষের সময় প্রজার কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি একবার মালব ও গুজরাট থেকে শস্য আমদানীর জন্য দশ হাজার গবাদি পশু ব্যবহার করেছিলেন। সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ শাহর মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য পুত্রদের দুইজন পরপর দুই মাসাধিক কাল রাজত্ব করেন। অতঃপর আলাউদ্দীন বাহমন শাহর আরেকটি পৌত্র তাজ্জাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩৯৭-১৪২২) সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

বুরহন-উল-মাসিরের লেখক বলেছেন যে, সুলতান তাজউদ্দীন ফিরোজ শাহ কোরাণ নকল করে স্বীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন। শাসক হিসেবে সুলতান ফিরোজ শাহর কোন তুলনা ছিল না এবং তাঁর সুবিচারের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি তৎকালীন সুলতানদের ন্যায় নারী ও সুরাতে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিজয়নগরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাঁর সময় পুনরায় শুরু হয়। বিজয়নগরের অধিপতি প্রথম দেবরায় (১৪০৬-১৪২২) তাঁর কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। ফলে তুঙ্গভদ্রা বাহমনি রাজ্যের দক্ষিণ সীমা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল এবং বিজয়নগরের একজন রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ১৩৯৮ ও ১৪০৬ সালে পর পর দুইটি অভিযান বিজয়নগরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে সুলতান ফিরোজ শাহ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ১৪২০ সালে বিজয়নগর ও বরঙ্গলের অধিপতির সম্মিলিত বাহিনীর কাছে পানগুলের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। এই সময় বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে যারফলে বিজয়নগরের বাহিনী বাহমনি রাজ্যের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলি পদানত করেছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ এইসময় স্বীয় ভ্রাতা আহমদ শাহ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন এবং ১৪২২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন, আহমদ শাহ তাঁকে হত্যা করেছিলেন।

সুলতান আহমদ শাহর রাজত্বকাল (১৪২২-৩৫) অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে বাহমনি রাজ্যর পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সুলতান আহমদ শাহর রাজত্বকালে বাহমনি রাজ্যের রাজধানী গুলবর্গা থেকে বিদরে (১৪২৫) স্থানান্তর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শেষোক্ত স্থানের আবহাওয়া ছিল মনোরম ও পরিবেশ স্বাস্থ্যকর। দ্বিতীয়তঃ, এইসময় থেকে দক্ষিণী ও বিদেশাগত আমিরদের দরবারে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়েছিল। দক্ষিণী আমিররা ছিলেন স্থানীয় মুসলমান। আফ্রিকা থেকে আগত আমিররা, যাঁরা দরবারে উচ্চপদলাভ করতে পারেননি, দক্ষিণী আমিরদের সমর্থক ছিলেন। বিদেশাগত আমিররা ছিলেন অধিকাংশ ইরাণ, ইরাক, তুরাণ ও আরবদেশ থেকে আগত ভাগ্যান্বেষী এবং তাঁরা কেন্দ্রে ও প্রদেশে উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন। ফলে দক্ষিণী আমিররা তাঁদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। এছাড়া দক্ষিণী আমিরা ছিলেন সুন্নী মতাবলম্বী আর বিদেশাগত আমিররা ছিলেন শিয়া। এইসব বিদেশাগত আমিরদের পরদেশী বলা হ'ত। অতএব ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ তাদের সংঘর্ষে তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল।

আহমদ শাহর রাজত্বকালের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হ'ল বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বাহমনি রাজ্যের বলিষ্ঠ নীতির অনুসরণ। আহমদ শাহ বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। ফলে বিজয়নগরের অধিপতি বাহমনি সুলতানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বরঙ্গল আক্রমণ করে তিনি এই রাজ্যের নৃপতিকে নিহত করেন। ১৪২৪ সালে বরঙ্গল বাহমনি সুলতানের কুক্ষিগত হয়েছিল। এছাড়া সুলতান প্রথম আহমদ শাহ মালবের সুলতান হুশাঙ্গ শাহকে পরাজিত করেন এবং কোঙ্কনের আক্রমণ করে সেখানকার হিন্দু নৃপতিকে পরাজিত করেন। কিন্তু সুলতান আহমদ শাহর গুজরাট অভিযান সাফল্য লাভ করে নাই। কবি শেখ আজারী এবং মৌলনা শরফউদ্দীন তাঁর দরবার অলঙ্কৃত করেছিলেন।

www.pathagar.com

আহমদ শাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দীন (১৪৩৫-১৪৫৮) সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। সুলতানের ভ্রাতা মহম্মদ বিজয়নগরের অধিপতির সাহায্যে এইসময় বিদ্রোহী হন। সুলতান এই বিদ্রোহ দমন করে মহম্মদকে রায়চুর দোয়াবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের নিরসন করে সুলতান কোঙ্কন আক্রমণ করেন এবং এখানকার হিন্দু নৃপতিকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। এইসময় বিজয়নগরের অধিপতি দ্বিতীয় দেবরায় বাহমনি রাজ্য আক্রমণ করে প্রাথমিক ভাবে সাফল্য অর্জন করলেও পরে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে করদানে স্বীকৃত হয়েছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে দক্ষিণী ও পরদেশীর বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। ১৪৫৮ সালে সুলতান আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন শাহ (১৪৫৮-১৪৬১) সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। স্বল্পকয়েক বৎসর রাজত্বের মধ্যে হুমায়ুনের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার এক দানবীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুতে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। হুমায়ুন শাহ খাজা মামুদ গিলানী (গাওয়ান) নামে একজন ইরানীয়কে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। মামুদ গাওয়ান বিবদমান আফকি ও দক্ষিণীদের ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ করে রাষ্ট্রের মঙ্গলে আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন।

মামুদ গাওয়ান

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র দ্বিতীয় নিজামউদ্দীন সিংহাসন লাভ করেন। এইসময় রাজমাতা মকদুম জাহানা, খাজা জাহান ও মামুদ গাওয়ানের সহায়তায় রাজ্য পরিচালনার ভারগ্রহণ করেন। সুলতানের নাবালকত্বের সুযোগে উড়িষ্যা ও তেলেঙ্গনার রাজারা বাহমনি রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের আগ্রাসনের প্রয়াস সাফল্য লাভ করেনি। মালবের সুলতান মামুদ খলজী ১৪৬১-৬২ সালে বাহমনি রাজ্য আক্রমণ করে বিদর অবরোধ করেছিলেন। এইসময় গুজরাটের সুলতানের সময় মত হস্তক্ষেপের ফলে এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়। একবৎসর পরে মামুদ খলজী পুনরায় দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করে দৌলতাবাদ অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু এইবারেও গুজরাটের সুলতান মামুদ বেগরার আগমনের সংবাদে তাঁকে মালবে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল।

১৪৬৩ সালের জুলাই মাসে সুলতান নিজামউদ্দীনের মৃত্যু হয়। পরবর্তী সুলতান তাঁর ভ্রাতা সুলতান মহম্মদ (১৪৬৬-৮২) ছিলেন মাত্র নয়বৎসর বয়স্ক। অতএব রাজ্যশাসনের ভার পূর্বতন তিনজন রাজপ্রতিনিধির উপরই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু দুইবৎসর পর খাজা জাহানের মৃত্যু হয় এবং রাজমাতা সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। ফলে মামুদ গাওয়ানের উপর বাহমনি রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হয়েছিল। এইসময় রাজ্যের স্বার্থে তিনি দক্ষিণীদের রাজ্যের রাজনীতিতে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং সরকারী কাজকর্মে হিন্দু প্রধানদেরও সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন।

রুশভ্রমণকারী এথেনেসিয়াস নিকোতিন ১৪৬৯ থেকে ১৪৭৪ সাল পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে খাজা ইউসুফ খোরাসানি এই ছদ্মনামে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বাহমনি রাজ্য সম্পর্কে একটি বিবরণ দিয়েছেন। নিকোতিনের মতে, "The land is overstocked with people; but those in the country are very miserable whilst the nobles are extremely opulent and delight in luxuary."*

মামুদ গাওয়ান বাহমনি রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির জন্য শক্তি প্রয়োগে দ্বিধা করেননি। মালবের খলজী শাসকরা গণ্ডোয়ানা, বেরার ও কোঙ্কনে প্রাধান্যের জন্য বাহমনি সুলতানদের সঙ্গে

* Wonder that was India, Vol-II, পৃঃ ৭৯ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিলেন। ১৪৬৬ সালে মামুদ খলজী বাহমনি রাজ্যের উপর হামলা করেছিলেন। কিন্তু বাহমনি সুলতানের বাহিনী সহজেই এই আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়েছিল এবং পরবর্তী বৎসর বাহমনি সুলতান মালবের অধীনস্থ খেরলা দখল করেছিলেন। অবশেষে মামুদ গাওয়ানের প্রচেষ্টায় উভয় রাজ্যের মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল। এই সন্ধিতে মালবের সুলতানকে খেরলা প্রত্যার্পণ করা হয় এবং বেরার বাহমনি সুলতানের রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত হয়। পশ্চিম প্রান্তে মামুদ গাওয়ানের সামরিক অভিযানগুলি বিশেষত পশ্চিমের উপকূলে ও কোঙ্কন অঞ্চলে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিল। ১৪৭০ সালে মামুদ গাওয়ান রামগড় দখল করেছিলেন। তিনি কোঙ্কনের হিন্দু রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন। এই সূত্রে বহু সুরক্ষিত দুর্গ বাহমনি রাজ্যের হস্তগত হয়। মামুদ গাওয়ান সঙ্গমেশ্বরের অধিপতিকে পরাজিত করে খেলনার দুর্গটি বাহমনি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং গোয়া দখল করেন (১৪৭২)। ইতিমধ্যে দৌলতাবাদে বিদ্রোহ দেখা দিলে তথাকার শাসনকর্তা ইউসুফ আলি এই বিদ্রোহ দমন করেন। বেলগাঁওর প্রধান বিজয়নগরের প্ররোচনায় বিদ্রোহী হয়ে গোয়া অবরোধ করায় সুলতান তৃতীয় মহম্মদ স্বয়ং মামুদ গাওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহীদের দমনে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং বেলগাঁও দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। মামুদ গাওয়ান দুর্গের প্রাচীর বারুদের সাহায্যে উড়িয়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিলেন। বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে গোয়া ও দেবলের উপর প্রাধান্য স্থাপনের পর বাহমনি সাম্রাজ্যের প্রসার হয়েছিল। এই অঞ্চলে বাহমনি সাম্রাজ্যের প্রভাব বিস্তার বিজয়নগরের পক্ষে সমূহ ক্ষতিসাধন করেছিল এসম্পর্কে সন্দেহ নাই। মামুদ গাওয়ান উড়িষ্যার বিরুদ্ধে অভিযান করে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন এবং উড়িষ্যার নৃপতিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বহু ধনরত্ন ও হাতি উপঢৌকন হিসেবে দিতে বাধ্য করেছিলেন। এইভাবে বিভিন্ন অভিযানে সাফল্য অর্জন করার ফলে বাহমনি রাজ্যের সীমা উত্তরে খান্দেশ, দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী, উত্তর-পূর্বে উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে গোয়া সহ বিস্তৃত অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল।

মামুদ গাওয়ানের প্রভাব বৃদ্ধিতে তাঁর বিরোধীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। সুলতান তৃতীয় মহম্মদের কাছে মামুদ গাওয়ানের বিরোধী কিছু দক্ষিণী আমির একটি জাল দলিলের সাহায্যে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনেন। এই সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান না করেই মত্ত অবস্থায় সুলতান তৃতীয় মহম্মদ গাওয়ানের মৃত্যুদণ্ডের হুকুম দান করেছিলেন। পরে তিনি স্বীয় ভ্রান্তি উপলব্ধি করেন, কিন্তু তখন এই ঘটনার কোন প্রতিকারের উপায় ছিল না। মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুতে বাহমনি রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। ১৪৮১ সালে মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর বাহমনি রাজ্যে গোষ্ঠীগত লড়াই বিশেষত দক্ষিণী ও বিদেশী আমিরদের ঝগড়া চরমে পৌঁছেছিল। ফলে বাহমনি রাজ্যের অবশেষে পতন হয় এবং ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচটি সুলতানী রাজ্যে বিভক্ত হয়। Taylor মামুদ গাওয়ানের মৃত্যু সম্পর্কে মন্তব্য করে যথার্থ বলেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর ফলে বাহমনি রাজ্যের ধ্বংসের সূত্রপাত হয়েছিল। ১৪৮২ সালের ২২শে মার্চ সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

মামুদ গাওয়ান ছিলেন একজন বিদেশী। কিন্তু তিনি রাজ্যের উন্নতিকল্পে দক্ষিণী ও বিদেশীদের বিরোধের মীমাংসা করে তাদের উভয়গোষ্ঠীর সহযোগিতার মারফতে রাজ্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি রাজ্যের প্রয়োজনে হিন্দুদেরও উচ্চপদে নিযুক্ত করতেন। মামুদ গাওয়ানের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতা হ্রাস করেছিল। এইসব শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের আগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতা এতদূর বৃদ্ধি

www.pathagar.com

পেয়েছিল যে তারা বারংবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলত। মামুদ গাওয়ানের সময় চারটি জিলাকে ৮টি ভাগে বিভক্ত করে তাদের প্রত্যেকটির অংশবিশেষকে সরাসরি কেন্দ্রের শাসনাধীন করা হয়েছিল এবং কেন্দ্রশাসিত সেই সব অঞ্চলের রাজস্ব স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। স্থানীয় শাসনকর্তাদের এলাকার একটি মাত্র দুর্গের উপর নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হত এবং এলাকার বাকি দুর্গগুলির ভার কেন্দ্রের নিযুক্ত সেনাপতিদের হাতে অর্পিত হয়েছিল। সব উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের কিছুটা নগদে আর বাকি ইকতার রাজস্ব থেকে বেতন দেওয়ার পদ্ধতি চালু হয়েছিল। ইকতার রাজস্ব আদায় ও তার থেকে সৈন্যদের বেতন দানের বিষয়ে হিসেব-নিকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাঁরা ইকতা লাভ করতেন তাঁরা দায়ী ছিলেন। জমির মাপজোকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ও রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্রের সঠিকভাবে পুনরায় সুসংগঠিত করা হয়েছিল এইভাবে চাষীর দেয় রাজস্বর সঠিক পরিমাণ নির্ধারণের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। প্রত্যেক তরফ বা প্রদেশে সুলতানের ব্যয় নির্বাহের জন্য খাসজমি ছিল।

মামুদ গাওয়ান সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী অটোমন তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদের সঙ্গে এবং ইরাক ও মিশরের শাসকদের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। এছাড়া গুজরাট, জৌনপুর ও মালবের সুলতানদের সঙ্গে মামুদ গাওয়ানের চিঠির আদানপ্রদান চলত। মামুদ গাওয়ান বিদরে একটি উচ্চ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এইভাবে মামুদ গাওয়ানের প্রচেষ্টায় বাহমনি রাজ্যে দাক্ষিণাত্যের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

বাহমনি রাজ্যের পতন

মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর বাহমনি রাজ্যের শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং গাওয়ানের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তৃতীয় মহম্মদ স্বীয় ভ্রান্তির কথা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এই ভুল সংশোধন করার কোন উপায় ছিল না এবং সুলতান স্বয়ং এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

সুলতান তৃতীয় মহম্মদের পর তাঁর অকর্মণ্য ও অযোগ্য পুত্র মামুদ শাহ (১৪৮২-১৫১৮) সিংহাসন লাভ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে দক্ষিণী ও বিদেশাগত অভিজাতদের মধ্যে গোষ্ঠী বিরোধ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্ব স্ব প্রধান হয়ে পড়েছিলেন। এই সময় বাহমনি রাজ্যের সীমা সংকুচিত হয় এবং সুলতান মামুদ শাহর কর্তৃত্ব রাজধানী ও তার উপকণ্ঠে সীমাবদ্ধ ছিল। সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর তাঁর তিনজন সুলতান একের পর এক সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। সুলতান মামুদের উত্তরসূরীদের রাজত্বকালে কাসিম বারিদ উল মামালিক এবং শেষোক্তর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আমির আলি বারিদের অঙ্গুলী হেলনে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করতেন। ১৫১৮ থেকে ১৫২৬ সালের মধ্যে মোট চারজন সুলতান বাহমনি রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। বাহমনি রাজ্যের শেষ সুলতান কলিমুল্লাহ শাহ বিদর থেকে আহমেদনগরে স্থান পরিবর্তন করেন এবং ১৫২৬ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর বাহমনি রাজ্য পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এই পাঁচটি রাজ্যের ও তাদের শাসকবংশের নাম হচ্ছে যথাক্রমে বেবারের ইমাদ শাহী বংশ, আহমেদনগরের নিজাম শাহী বংশ, বিজাপুরের আদিলশাহী বংশ, গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী বংশ ও বিদরের বারিদ শাহী বংশ।

উপসংহার

বাহমনি রাজ্য প্রায় একশত পঁচাত্তর বৎসরকাল স্থায়ী হয়েছিল এবং এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ১৮ জন সুলতান রাজত্ব করেছিলেন। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ধর্মীয় বিরোধ

www.pathagar.com

দাক্ষিণাত্যের এই যুগের রাজনৈতিক চালিকাশক্তি ছিল না। সামরিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের প্রশ্ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফলশ্রুতি নয়। পশ্চিমে মালব ও গুজরাট দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে বিজড়িত হয়ে পড়েছিল। পূর্বদিকে উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল, এবং করমণ্ডল উপকূলের বাণিজ্যের উপর প্রাধান্য স্থাপনের জন্য সচেষ্ট ছিল। এর ফলে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। গোয়া ও দেওলে বাহমনি রাজ্যের প্রাধান্য স্থাপনের ফলে ইরান, ইরাক ও আরব দেশগুলির সহিত এই রাজ্যের বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। দক্ষিণ তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণা দোয়াবকে কেন্দ্র করে বিজয়নগরের সঙ্গে বাহমনি রাজ্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। ১৪৮১ সালে মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর আমিরদের আত্মকলহ, বিদেশাগত ও দক্ষিণী আমিরদের বিরোধ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে বাহমনি রাজ্যের পতন হয়।

রুশপরিব্রাজক নিকেতিন ১৪৬৯ থেকে ১৪৭৪ সালের মধ্যে বাহমনি রাজ্য পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর মতে, বাহমনি রাজ্যে সাধারণ মানুষ ছিলেন দরিদ্র এবং অভিজাতরা ধনী ও বিলাসী। এই রুশ ভ্রমণকারী বলেছেন যে, অভিজাতদের রৌপ্যনির্মিত আসনে বহন করে সামনে ও পেছনে অনেক ঘোড়-সওয়ার ও পদাতিকের সঙ্গে জাঁকজমক সহকারে পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ত। তাঁর বক্তব্য অনুসারে— "They are wont to be carried on their silver beds, proceeded by some twenty chargers caparisoned in gold, and followed by 300 men on horseback and 500 on foot, and by hornmen, ten torch bearers and ten musicians."

কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের এই আকাশপাতাল পার্থক্য এবং অভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে অন্যান্য বহু প্রকার দোষত্রুটি সত্ত্বেও বলা যায় যে, বাহমনি রাজ্য উত্তর-দক্ষিণের সংস্কৃতির মেলবন্ধন রচনা করেছিল। আবার স্বকীয় স্বাতন্ত্রের মহিমায় বাহমনি রাজ্যে যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল তারসঙ্গে উত্তরের কৃষ্টির পার্থক্য ছিল। বাহমনি রাজ্যের উত্তরসূরী সুলতানী বংশগুলি এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ধারাক ও বাহকছিল এবং পরবর্তীকালে মুঘল সংস্কৃতি দাক্ষিণাত্যের ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করেছিল।

দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি স্বাধীন সুলতানী বংশ

বাহমনি রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে পাঁচটি স্বাধীন সুলতানী বংশের অভ্যুত্থান হয়েছিল। তারা বাহমনি রাজ্যের উত্তরসূরী হিসেবে যে রাজ্যলাভ করেছিল তাতে সন্তুষ্ট ছিল না এবং স্ব স্ব সীমা বৃদ্ধির জন্য তৎপর হয়েছিল। ফলে এই পাঁচটি সুলতানী বংশ অনবরত পরস্পরের সঙ্গে এবং প্রতিবেশী অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল। আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ছিল এই পাঁচটি সুলতানী বংশের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী। কিন্তু এই পাঁচটি রাজ্যের বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমদনগর, বেরার ও বিদরের শাসকদের প্রত্যেকের ঐতিহ্য সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। আহমদনগরের রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মালিক আহমেদ। তাঁর পিতা নিজাম উল মুলুক বাহরী হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ও দাস থেকে পদোন্নতি করে বাহমনি রাজ্যের একজন শক্তিশালী সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। বিজাপুরের সুলতানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদিল শাহ ছিলেন একজন বহিরাগত ও শিয়া মতাবলম্বী মুসলমান। গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী বংশের সুলতানও শিয়া ছিলেন

www.pathagar.com

এবং এই রাজ্যটি ছিল পূর্বতন বরঙ্গলের হিন্দু নৃপতির অধীন। গোলকুণ্ডার প্রতিষ্ঠাতা কুতবশাহ ছিলেন বাহমনি রাজ্যের একজন প্রাক্তন তুর্কী উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এইসব রাজ্যের সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিরোধ এবং সংঘর্ষ অভ্যন্তরীণ শান্তি বিনষ্ট করেছিল। কারণ পরদেশী ও দক্ষিণী আমিরদের মধ্যে গোষ্ঠীগত ঝগড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। •

এই পাঁচটি সুলতানী রাজ্যের সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ বাহমনি রাজ্য থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। কিন্তু বৈদেশিক ক্ষেত্রে এই পাঁচটি রাজ্যের সুলতানরা অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন কারণ প্রতিটি রাজ্যই প্রতিবেশীর সীমালংঘন করে কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা করেছিল। ফলে এই পাঁচটি সুলতানী বংশ অনবরত পরস্পরের সঙ্গে ও অন্যান্য আশপাশের রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। সাধারণতঃ দুইটি শক্তিশালী সুলতানী রাজ্য একটি তৃতীয় সুলতানী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতেন এবং ক্ষুদ্রতর শক্তিগুলি যেপক্ষ তাদের স্বার্থরক্ষায় সর্বাধিক নিরাপত্তার আশ্বাস দিত সেই পক্ষের সঙ্গে হাত মেলাত। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপনের প্রচেষ্টা ও স্বার্থরক্ষার প্রয়াস অনেক সময় আবার শত্রুতার কারণে পরিণত হ'ত।

বেরারের আলি ইমাদ শাহ গোদাবরী নদীর উত্তরে পাথরী নামকস্থানটি বুরহন নিজাম শাহর (১৫১০-৩৩) হাতে অর্পণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। বুরহন নিজাম শাহ স্বীয় পিতৃপুরুষ, যাঁরা হিন্দু ছিলেন, তাঁদের বাসভূমি হিসেবে এই স্থানের জন্য অনেক সুবিধা দিতে রাজি ছিলেন। নিজাম শাহ ১৫১৮ সালে এই স্থান বলপূর্বক দখল করেছিলেন। তিনি মাহুর নামক অঞ্চলটিও ইমাদ শাহর কাছ থেকে অধিকার করেন ও বেরার লুণ্ঠন করেন। খান্দেশের সঙ্গে বেরার মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ ছিল। বুরহন নিজাম শাহকে সহায়তা করেছিলেন বিদরের বারিদ শাহ। বেরার ও খান্দেশের পরাজিত সুলতানরা গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহর নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং শেষোক্ত সুলতান তৎপর হয়ে আহমেদনগর আক্রমণ করেছিলেন। প্রায় তিনবৎসরকাল সংঘর্ষের পর নিজাম শাহ গুজরাটের সুলতানের সঙ্গে অত্যন্ত হীন শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর বিজাপুরের সুলতান ইসমাইল আদিল শাহ তিনমাস বিজয়নগরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে রায়চুর ও মুদ্‌গল জয় করেছিলেন। এছাড়া গোলকুণ্ডার সুলতানও কৃষ্ণার তীরবর্তী কতকগুলি জিলা এবং গোদাবরীর পারে উত্তরদিকে রাজমুন্দ্রী পর্যন্ত এলাকা বিজয়নগরের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছিলেন। কিন্তু অচ্যুত রায় বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে রায়চুর ও মুদ্‌গল পুনরায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু ১৫৪০ সালে বিজাপুরের ইব্রাহিম আদিল শাহ (১৫৩৪-১৫৫৮) শিয়া মতবাদের পরিবর্তে সুন্নী সম্প্রদায়ে যোগদানে মনস্থ করেছিলেন। আবার আহমেদনগরের সুন্নী মতাবলম্বী বুরহন নিজাম শাহ সমসাময়িক কালে শিয়া সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিলেন। এই ঘটনা উভয় রাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি করেছিল। ১৫৪২ সালে বিজাপুরের সুলতান আহমেদনগরের কাছ থেকে সোলাপুর দখল করেন এবং শেষোক্ত রাজ্য গোলকুণ্ডা ও বিজয়নগরের সঙ্গে মিলিত হয়ে হৃত স্থান পুনরুদ্ধারের জন্য বিজাপুর আক্রমণ করেছিলেন। ফলে সুলতান ইব্রাহিম সোলাপুর

www.pathagar.com

আহমেদনগরকে প্রত্যার্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং বিজয়নগরের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে সম্মত হয়েছিলেন। ইব্রাহিম আদিল শাহর নির্যাতনের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য শাহজাদা আবদুল্লা পর্তুগীজদের নিকট গোয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পর্তুগীজরা এই সুযোগে ১৫৪৮ সালে শাহজাদা আবদুল্লার সঙ্গে একটি সন্ধি স্বাক্ষর করে তাঁকে সালসেট ও বারদেজ এইদুইটি বন্দর পর্তুগীজদের হস্তান্তর করতে বাধ্য করেছিলেন। অপর দিকে ১৫৭৪ সালে আহমেদনগরের মুর্তাজা নিজাম শাহ বেরার রাজ্যটি কুক্ষিগত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে বিজাপুরের ইব্রাহিম আদিল শাহর পুত্র ও উত্তরাধিকারী আলি আদিল শাহ (১৫৫৮-৮০) শিয়া সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। তাঁর সমকালীন গোকুণ্ডার সুলতান ইব্রাহিম কুতুবশাহ (১৫৫০-৮০) সুলতান কুলী কুতুবউল মুলকের উত্তরসূরী ছিলেন। তিনি স্থানীয় তেলেগু সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। সুলতান ইব্রাহিম জিজিয়া আদায় করতেন না এবং হিন্দু মন্দির ও ব্রাহ্মণদের উপসত্ত্ব হিসাবে ভূমি দান করেছিলেন। ফলে তিনি স্বীয় হিন্দু প্রজাদের ও প্রতিবেশী হিন্দু প্রধানদের সমর্থন লাভ করেছিলেন।

বিজাপুরের আলি আদিলশাহ কল্যানী ও সোলাপুর আহমেদনগরের হুসেন নিজাম শাহর (১৫৫৩-৬৫) কাছ থেকে কেড়ে নেবার জন্যে বিজয়নগরের সঙ্গে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৫৫৯-৬১ সালে বিজাপুর ও বিজয়নগরের এই মৈত্রী কখনও আহমেদনগর ও বেরার এবং কখনও আহমেদনগর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগ্রাসনে লিপ্ত ছিল। এর ফলে বিজয়নগরের রাজপ্রতিনিধি রামরায় সময় বিশেষে দক্ষিণের মুসলিম রাজ্যগুলির ভাগ্যনিয়ন্ত্রতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিজয়নগর এই সুযোগে রায়চুর দোয়াব সহ অন্যান্য বহু এলাকা কুক্ষিগত করে তার সীমা বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়েছিল। দক্ষিণের সুলতানী রাজ্যগুলির মধ্যে এইভাবে ঈর্ষা ও পারস্পরিক সংঘাতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি পেয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে সুলতানরা তাঁদের বিরোধের মীমাংসা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। সুলতান হুসেন নিজাম শাহ বিজাপুরের ইব্রাহিম কুতুবশাহর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন এবং পূর্বোক্তের অনুপ্রেরণায় ইব্রাহিম কুতুবশাহ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে হুসেন নিজাম শাহর সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হয়েছিলেন। এই মৈত্রীকে দৃঢ় করার জন্য বিজাপুরের শাহজাদা আলি আহমেদনগরের শাহজাদী চাঁদবিবিকে বিবাহ করেন এবং আলির সহোদরার সঙ্গে হুসেনের পুত্রের বিবাহ হয়। সোলাপুর দুর্গটি যৌতুক হিসাবে বিজাপুরের শাহজাদা ও চাঁদবিবির বিবাহে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে বারিদ শাহও এই মৈত্রীতে যোগদান করেছিলেন।

অতঃপর আলি আদিল শাহ রামরায়কে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার কাছ থেকে যেসব স্থান বিজয়নগর দখল করেছিল, সেই সব হৃত এলাকা প্রত্যর্পন করতে বলেছিলেন। এই দাবি স্বভাবতঃ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এই সব দাবি পুরনের অজুহাতে সম্মিলিত দক্ষিণী সুলতানদের বাহিনী বিজয়নগরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ন হয়। ২৩শে জানুয়ারী ১৫৬৫ সালে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্যদলকে বেরার ছাড়া অন্য চারজন দক্ষিণী সুলতানের বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেছিল। বিজয় বাহিনী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য বিজয়নগর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেছিল। তালিকোটার দক্ষিণী সুলতানদের জয়লাভের মূলে ছিল তুর্কী সেনাপতি রুমী খানের দক্ষ গোলন্দাজ বাহিনী।

www.pathagar.com

তালিকোটার বিজয় দক্ষিণ ভারতের বিজয়ী সুলতানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও বিরোধের মীমাংসা করেনি বরং বৃদ্ধি করেছিল। হুসেন নিজাম শাহর মৃত্যুর পর মূর্তজা নিজাম শাহ (১৫৬৫-৮৮) আহমেদনগরের সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ও বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ মিলিতভাবে পর্তুগীজদের পশ্চিম উপকূল থেকে বিতাড়িত করার জন্য আক্রমণ করেছিলেন। কালিকটের জামোরিন এই দুই সুলতানের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। পর্তুগীজ নৌবাহিনী মালাবারে জামোরিনের নৌসৈন্যদের পরাজিত করেছিল এবং দাবল অবরোধ করেছিল। এই সময় বিজাপুরের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ চরমে পৌঁছলে এই রাজ্যটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মূর্তাজা নিজাম শাহ স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পর্তুগীজদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। ১৫৭১ সালে আদিল শাহও পর্তুগীজদের সঙ্গে চুক্তি করে যুদ্ধের অবসান করেন এবং চারবৎসর পরে এই চুক্তি একটি সন্ধির মারফতে সমর্থিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে বিজাপুর পর্তুগীজদের অনুমোদন পত্র গ্রহণ করে হরমুজ থেকে অশ্ব ক্রয় করে গোয়া বন্দর দিয়ে আমদানী করবার সুবিধা লাভ করেছিল এবং পর্তুগীজরা বিজাপুরের প্রজাদের জোরকরে ধর্মান্তকরণ করে ক্রিশ্চান হতে বাধ্য করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

১৫৭৪ সালের এপ্রিল মাসে মূর্তাজা নিজাম বেরার এবং ১৬১৮-১৯ সালে দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ বিদর দখল করেছিলেন। কিন্তু এইসময় উত্তর ভারত থেকে মুঘল আক্রমণ আসন্ন হয়ে পড়েছিল। অবশেষে মুঘল শক্তি একে একে দক্ষিণের সব কয়টি সুলতানী রাজ্য গ্রাস করেছিল এবং হিন্দুস্তানের ইতিহাসে এক নবঅধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

সমকালীন দক্ষিণ ভারতের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য

বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের পরাস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে উভয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ষোড়শ শতকে স্থলপথে উত্তর ভারতে মুঘলদের আগমন ও সাম্রাজ্য বিস্তার ও পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে দক্ষিণ ভারতের উপকূলে পর্তুগীজদের আগমনের ফলে যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের শাসকরা বা শেষোক্ত রাজ্য ভেঙ্গে যেসব সুলতানী বংশের সৃষ্টি হয়েছিল তাঁরা এইসব ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করেননি। মুঘলরা উত্তর ভারতে প্রথমে ও পরে দক্ষিণে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। পর্তুগীজরা বৈদেশিক বাণিজ্যে একচেটিয়া প্রাধান্য স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়ছিলেন। কিন্তু তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভ করেনি। বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের শাসকরা বা তাদের উত্তরসূরীরা ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী ও যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী থেকে এই দুইরাজ্যের বহুবিষয়ে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। রোমিলা থাপরের মতে 'উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে একই ধরনের সামন্ততান্ত্রিক বিন্যাস লক্ষিত হয়।'*

দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর ও বাহমনি সুলতানরা ও তাঁদের উত্তরসূরীরা রাজ্য শাসন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত স্বার্থানুসন্ধানী ছিলেন এবং ধর্মীয় উম্মাদনা

* রোমিলা থাপর—ভারতবর্ষের ইতিহাস

www.pathagar.com

অপেক্ষা বাস্তব রাজনীতির দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়েছিলেন। রাজ্য পরিচালনা ও বাণিজ্য বৃদ্ধির স্বার্থে বিজয়নগর প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। বাহমনি সুলতানরাও বৈদেশিক বাণিজ্যকে গুরুত্বদান করেছিলেন। পর্তুগীজদের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখার জন্য উভয় রাজ্য সচেষ্ট ছিল। কৃষ্ণদেব রায় পর্তুগীজদের অশ্বের যোগানদার হিসাবে গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু গুজরাট ও বাহমনি সুলতানদের বিরুদ্ধে তিনি পর্তুগীজদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। সমাজের উপরের স্তরের লোকেরা বিলাসলালসাময় মদির-মধুর জীবনযাপন করত। সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই যুগে 'গতিশীলতার' বদলে রক্ষণশীলতা প্রাধান্য পেয়েছিল। বিজয়নগর হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের কেন্দ্র বা হিন্দু ধর্মের হয়ে লড়াই করার জন্য সক্রিয় রাজনীতি করেনি। বরং উড়িষ্যা ও অন্যান্য হিন্দু রাজ্যের সঙ্গে বিরোধে অনেক সময় বিজয়নগর লিপ্ত ছিল। বাহমনি সুলতানরা বা তাদের উত্তরসূরী দক্ষিণের সুলতানরা ধর্মের ধ্বজাধারী ছিলেন না। মন্দিরগুলি প্রচুর অর্থ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে এক একটি স্থানীয় এলাকার কেন্দ্র ছিল। তাঁতী ও কুমোর অপেক্ষা ছুতোর, স্বর্ণকার ও কামারদের খাতির বেশী ছিল। কৃষক ও মজুর শ্রেণীর মানুষ খাজনা ও ঋণের দায়ে পীড়িত ছিল।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

•

সুলতানী যুগের শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন দিক

দিল্লীর সুলতানদের রাজত্বকালে যে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল ইলতুৎমিস, বলবন, আলাউদ্দীন খলজী, মহম্মদ বিন তুঘলক, ফিরোজ শাহ্ তুঘলক ও পরবর্তী লোদী ও সৈয়দ শাসকদের আমলে তার বিবর্তন হয়েছে। সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিস সুলতানী শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। আলাউদ্দিন খলজী এই শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত করেছিলেন; তুঘলকদের রাজত্বকালে এই ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। লোদী ও সৈয়দ বংশের রাজত্বকালে এই শাসনব্যবস্থার অবক্ষয়ের সূত্রপাত হয়। শেরশাহ তাঁর স্বল্পকালীন রাজত্বকালে এই ব্যবস্থাকে পুণরুজ্জীবিত করেছিলেন। মুঘল শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য আকবর বহু বিষয়ে তাঁর কাছে ঋণী এসম্পর্কে সন্দেহ নাই।

খিলাফৎ ও সুলতান

ভারতে মধ্যযুগের পরিস্থিতিতে যে শাসন পদ্ধতি ও কাঠামোর সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সুলতানই রাজ্যের রাজনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্ত্রতা ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ইসলামিক ধারণা অনুসারে বাগদাদের খলিফা সকল সুন্নী মুসলমানদের সার্বভৌম এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সর্বেসর্বা ছিলেন। অতএব এই বক্তব্য অনুসারে সুলতানের পক্ষে তাঁর প্রজাদের উপর রাজনৈতিক প্রাধান্য দাবি করা বা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রতা হওয়া কি ভাবে সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক I. H. Qureshi বলেছেন যে "How did the Sultan of Delhi fit into this picture? He owned a nominal allegiance to the Caliph, but for all practical purposes he was an independent ruler."* যে সময় বাগদাদের খলিফা ক্ষমতার শিখরে ছিলেন তখন বিভিন্ন বিজিত রাজ্যের শাসনকর্তারা খলিফার দ্বারা নিযুক্ত হতেন। বিশেষ কোন অঞ্চলে একজন ইসলামিক অভিযাত্রী স্বীয় বাহুবলে প্রাধান্য স্থাপন করলেও তিনি খলিফার সনদ গ্রহণ করে সেইস্থানে বা বিজিত অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। গজনীর সুলতান মামুদের ন্যায় শক্তিশালী শাসক বাগদাদের খলিফা কাদির বিল্লাহর সনদ গ্রহণ করতে এইজন্য দ্বিধা করেন নাই। এই ধরণের খলিফার স্বীকৃতির মারফতে ইসলামিক জগতের ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় করা হত এবং বিভিন্ন স্থানের শাসকরা খলিফা ইসলামের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতেন।

দিল্লীর তুর্কী সুলতান শামসউদ্দীন ইলতুৎমিস বাগদাদের খলিফার খিলাৎ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। এই সময় থেকে দিল্লীর সুলতানরা মুদ্রায় নিজেদের খলিফার প্রতিনিধি বলে বর্ণনা করতেন ও খলিফার নামে শুক্রবারে মসজিদে খুতবা পাঠ করা হত। কার্যত সকল ক্ষমতা সুলতানের হস্তগত ছিল। কিন্তু ১২৫৮ সালে বাগদাদের খলিফা আল-মুসতাসিম বিল্লাহ মোঙ্গলদের হাতে নিহত হওয়ার পরও দিল্লীর সুলতানরা খলিফার সার্বভৌমত্বের সম্পর্কে এই কাল্পনিক তথ্য প্রচারে দ্বিধা করেননি। সুলতান আলাউদ্দীন খলজী এক নতুন ধর্মপ্রচারের কথা

* The Delhi Sultanate, Bharatiya Vidya Bhavan, পৃঃ ৪৪৪।

www.pathagar.com

চিন্তা করেন, কিন্তু এই অলীক ভাবনা কোটয়াল আলা উল মুলুকের পরামর্শে ত্যাগ করেছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীনের পুত্র কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজী নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে যখন চতুর্দিকে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তখন তিনি মিশরে প্রবাসী আব্বাসিদ খলিফার এক বংশধরের কাছ থেকে সনদ আনার ব্যবস্থা করে রাজ্যের পরিস্থিতি শান্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মুবারক খলজী যেমন খলিফা উপাধি গ্রহণের দরুণ কোন বিদ্রোহের সম্মুখীন হননি, মহম্মদ বিন তুঘলকও খালিফার স্বীকৃতি লাভের কথা সাড়ম্বরে প্রচার করে বিদ্রোহ দমনে সাফল্য অর্জন করেননি। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকও মিশরবাসী আব্বাসিদ খলিফার কাছ থেকে সনদ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। এই আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, খলিফার সঙ্গে দিল্লীর সুলতানদের সম্পর্ক ছিল আনুষ্ঠানিক। খলিফার স্বীকৃতিতে ক্ষমতাসীন সুলতান নৈতিক সমর্থন লাভ করতেন এবং ইসলামিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতেন। অতএব বাস্তবে দিল্লীর সুলতানরা কারো অধীনস্ত ছিলেন না। কিন্তু তত্ত্বগত দিক থেকে তাঁরা ছিলেন বাগদাদের খলিফার প্রতিনিধি।

সুলতান

রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ও প্রধান সুলতান নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পুঁথিগত ভাবে যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতা রাজ্যের সমস্ত সুন্নী জনগণের বা মিলাতের উপর ন্যস্ত ছিল সেইজন্য সুলতান ছিলেন মিলাতের নির্বাচিত প্রতিভূ। বাস্তবে এই ধরনের নির্বাচন করা সম্ভবপর ছিল না বলে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের অধিকার শেষপর্যন্ত সুলতানের হাতেই ছিল। এমনকি মৃত্যুপথযাত্রী সুলতানের মনোনয়ন করা উত্তরাধিকারীর অধিকারও অনেক সময় স্বীকৃতি লাভ করত। এইভাবে নির্বাচন ও মনোনয়নে উভয় পদ্ধতি দিল্লী সুলতানের উত্তরসূরী স্থির করার ব্যাপারে অনুসৃত হত। সুলতানরা যে মনোনয়ন করতেন আমির ওমরাহদের দ্বারা তা অনুমোদিত হওয়া আবশ্যিক ছিল। দিল্লীর সুলতান উত্তরাধিকারী স্থির করার জন্য বংশানুক্রমিক দাবিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি কখনও গৃহীত হয় নাই। সফল সামরিক ও জঙ্গি নেতা অনেক সময় ক্ষমতাশালী হয়ে জোরজবরদস্তি করে রাজসিংহাসন দখল করেছেন এমন উদাহরণ বিরল নয়। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বাহুবলে পূর্বতন বংশকে উৎখাত করলেও জালালউদ্দীন খলজী রাজ্যের সূচনাতে প্রথমে দিল্লীতে পদার্পণ করতে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। কারণ দিল্লীর নাগরিকরা পূর্বতন ইলবারী তুর্কী বংশের প্রতি অনুগত ছিল।

সুলতানদের স্বৈরতন্ত্র শরিয়তের দ্বারা সীমিত ছিল। সুলতান কোরাণের বিধি অনুসারে শাসন পরিচালনা করতে বাধ্য ছিলেন। সুলতানের কেবলমাত্র কোরাণের বিধি অনুসারে শাসন চালু করবার দায়িত্ব ছিল। তিনি হাদিসের সাহায্যে ও উলেমাদের বক্তব্য অনুসারে শরিয়তের ব্যাখ্যা গ্রহণ করতেন। দিল্লীর সুলতানরাই ছিলেন সাম্রাজ্যের কার্যকরী ক্ষমতার প্রধান পরিচালক এবং অধিকাংশ উলেমা সুলতানের বশংবদ ছিলেন। উলেমাদের মধ্যে মতবিরোধের ক্ষেত্রে সুলতানের ব্যাখ্যাই কার্যকরী করা হত। দিল্লীর সুলতানদের মনস্তুষ্টির জন্য উলেমারা শরিয়তের বিধান ব্যাখ্যা করার সময় স্বৈরতন্ত্রের সমর্থনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বক্তব্য রাখতেন।* এইভাবে একটি নবগঠিত রাজ্যের প্রয়োজনে ও কেন্দ্রীভূত শাসনের বিবর্তনের ফলে দিল্লীর সুলতানরা স্বাভাবিকভাবে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। এছাড়া সুলতান ছিলেন প্রধান বিচারক, দেশের সমস্ত বিচারব্যবস্থার আধার। সৈন্যবাহিনীরও সুলতান ছিলেন প্রধান সেনাপতি। তাঁর শক্তির ভিত্তি ছিল সামরিক ও ধর্মীয়।

---

* কাজি মুঘিসউদ্দীনের ন্যায় দুই একজন উলেমা সুলতানের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে শরিয়তের ব্যাখ্যা দেবার দুঃসাহস করেছিলেন। কিন্তু আলাউদ্দীন খলজী মুঘিসউদ্দীনের ব্যাখ্যা মেনে স্বীয় ক্ষমতা খর্ব করেন।

www.pathagar.com

কালক্রমে সুলতান সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ছায়া বলে অনেকের ধারণা হয় এবং সুলতানরাও সিংহাসনলাভকে ঈশ্বরদত্ত আশীর্বাদ বলে মনে করতে শুরু করলেন। সুলতান শরিয়তে আইন অনুসরণ করলেও তাঁদের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু এইভাবে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়াতে সুলতানরা কালক্রমে মুলক বা শক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। কোন সাংবিধানিক উপায়ে সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব ছিল না এবং একমাত্র সাফল্যজনক বিদ্রোহ বা গৃহযুদ্ধের মারফতে একজন শক্তিশালী সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করা সম্ভবপর ছিল। এইজন্য স্বৈরতান্ত্রিক সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পদ্ধতি তৎকালীন যুগে জানা ছিল না এবং সৈন্যবাহিনীর সমর্থন থাকলে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি কায়েম করা সম্ভব ছিল।

ইবন খালদুন মন্তব্য করেছেন, "If the ruler uses force the subjects are corrupted." কিন্তু যেখানে কার্যত রাষ্ট্রক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে সেখানে তাদের স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। I. H. Qureshi-র মতে, সুলতানের স্বৈরাচারী হওয়া সম্ভবপর ছিল না কারণ, আমির ও মালিকদের সহযোগিতা ভিন্ন রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভবপর ছিল না এবং উলেমাদের কাছ থেকে ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারের সমর্থন সর্বদা পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু এইসব আমিরওমরাহ্ বা উলেমারা ছিলেন মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠীরই অঙ্গ। কুরেশী বলেছেন, "There is no sanction for unbridled tyranny except the timidity of the people, and the Indian populace during the Middle Ages was by no means timid or even forebearing; on the other hand the people were mostly war-like, refactory and rebelious."* এছাড়া দেশের বহু অঞ্চল সেইসময় অরণ্যে আবৃত ছিল ও জনবসতি ছিল বিরল, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রাস্তাঘাটের সুবিধা ছিল না এবং দ্রুত যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না। বিদ্রোহী সশস্ত্র অসংগঠিত অভ্যুত্থানকেও দমন করতে সৈন্যদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব সুলতানের পক্ষে যথেচ্ছাচার করা সব সময় সম্ভবপর ছিল না।

দিল্লীর সুলতানরা জাঁকজমকে পারস্যের সাসানীয় নৃপতিদের অনুকরণ করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা সার্বভৌমত্ব ও গৌরব প্রচার করতেন এবং প্রজাসাধারণের মধ্যে বাদশাহর মহিমা ও ক্ষমতার মর্যাদা প্রচার করার প্রয়াস করেছিলেন। সুলতান যখন শোভাযাত্রা সহকারে প্রাসাদের বাইরে যেতেন তখন প্রজাদের অভিযোগের সম্বন্ধে আবেদন শুনে প্রতিকার করতেন।

কেন্দ্রীয় সরকার

কিন্তু কোন স্বৈরতন্ত্রই অপরের সহযোগিতা ছাড়া কার্যকরী হয় না। স্বৈরতন্ত্রকেই জনগণ ও প্রজাসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখতে হয় কারণ, তা না হলে রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এইজন্য সুলতান বাড়-ই-আম বা সর্বসাধারণের জন্য আহুত দরবারে প্রজাদের সকলের সঙ্গে মিলিত হতেন। "The general audience was the occasion for the persecuted and the needy to claim the Sultan's protection. It was in these public darbars that the monarchs discharged the formal duties appartaining to his office."** কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জরুরী আলোচনার জন্য ও গোপনে শলা-পরামর্শের জন্য সুলতান তাঁর অন্তরঙ্গদের আহ্বান করতেন। সুলতানের এইসব উপদেষ্টাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ উলেমা, বিশ্বস্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও সুলতানের ব্যক্তিগত বন্ধুরা আহুত হতেন। এইসব উপদেষ্টা ও অন্তরঙ্গদের নিয়ে যে মজলিস-ই-খালওয়াত গঠিত হ'ত তা সময় সময় সুলতানের আহ্বানে মিলিত হত। খাস দরবারে খান, আমির ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা

---

* See The Delhi Sultanate, পৃঃ ৪৪৫-৪৪৭।

** See The Delhi Sultanate, পৃঃ ৪৪৫-৪৪৭।

www.pathagar.com

সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপ ও নীতি নির্ধারণে সাহায্য করতেন।

রাজকীয় প্রাসাদ ও বাসস্থানের এলাকা গঠন ছিল বিশাল। কারণ, সুলতানের প্রাসাদ, হারেম, ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী এবং পোষ্যরা, খাস জমি ও কারখানা সবকিছু রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে জড়িত ছিল। সুলতানের রাজকীয় প্রাসাদ ও দেহরক্ষী এবং গৃহস্থালী সংক্রান্ত সংগঠনের সর্বকিছু ওয়াকিল-ই-দার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। তিনি রাজকীয় গৃহস্থালীর সঙ্গে সংযুক্ত সকলের বেতন ও প্রাপ্য ঠিক মত দেবার ব্যবস্থা করতেন। এছাড়া রাজকীয় অনুষ্ঠানের সকল বিষয়ে ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল আমির-ই-হাজিব বা বারবাকের উপর। তিনি ওয়াকিল-ই-দারের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী ছিলেন। রাজদরবারের সকল আচার-আচারণ ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা তাঁর নির্দেশ মত করা হত। তাঁকে সাহায্য করার জন্য অনেক সহায়ক হাজির ছিলেন। রাজকীয় গৃহস্থালীতে আমির-ই-হাজিব ও অন্যান্য হাজিবরা রাজকীয় অনুষ্ঠানগুলির ব্যবস্থা করতেন এবং তাঁদের বিনা অনুমোদনে কেওই সুলতানের কাছে উপস্থিত হবার অনুমোদন লাভ করতেন না। রাজকীয় গৃহস্থালীর প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করার জন্য ছিল রাজকীয় কারখানা। এই রাজকীয় কারখানার সংখ্যা ছিল সাধারণতঃ ছত্রিশটি। কারখানা অর্থে ফ্যাক্টরীতে রাজদরবারের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করা হত। রাজকীয় কারখানার একটি জামদারখানা থেকে রাজ্যের সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপাদন হত। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক সোনার ব্রোকেড বানানোর জন্য ৫০০ তাঁতী ও রেশমবস্ত্রের জন্য চারহাজার কর্মী নিযুক্ত করেছিলেন। সরকারী কারখানায় অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সবই উৎপাদন হত। কারখানার একটি বিভাগ ছিল সরকারী অশ্বশালা। এই অশ্বশালার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল আমির-ই-আখুর-বাক-এর উপর। এছাড়া হাতিশালা বা পীলখানার ভার ছিল শাহ্না-ই পীলের উপর। এইজন্য কারখানাগুলি বিভিন্নভাবে সুলতানের সৈন্যবাহিনীর, রাজদরবারের ও রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগের নানা প্রয়োজন মেটানোর জন্য দায়-দায়িত্ব লাভ করেছিল।

সুলতান ও তাঁর মন্ত্রীবর্গ

কোন স্বৈরতন্ত্রই অপরের সাহায্য ভিন্ন কার্যকর হয় না। সুলতান শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে আমির-ওমরাহদের সহায়তা গ্রহণ করতেন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করতেন। এইসব মন্ত্রীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উজীর। এছাড়া ছিলেন আরিজ-ই-মামালিক, দেওয়ান-ই-ইনসা ও দেওয়ান-ই-রিসালত। অনেক সময় নায়েব বা নায়েব-ই-মামালিক, সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। সুলতান দুর্বল হলে নায়েব রাষ্ট্রের ক্ষমতার অনেকখানি করায়ত্ত করতেন এবং উজির ও অন্যান্য মন্ত্রীরা সেই তুলনায় নাম মাত্র ক্ষমতার ব্যবহার করতেন এবং শেষোক্তরা নায়েবের মুখাপেক্ষী ছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ সুলতানের ক্ষমতাই রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ছিল এবং নায়েব নাম মাত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ও উজীরের অধীনস্থ ছিলেন। সদর-উস-সুদর এবং দেওয়ান-ই-কাজীর পদ, যা সর্বদাই একই ব্যক্তির অধীন ছিল, পরবর্তী যুগে মন্ত্রীর পর্যায় উন্নীত হয়েছিল। রাজকীয় গৃহস্থালীর নিয়ামক ওয়াকিল-ই-দার এবং বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানের পরিচালক আমির-ই-হাজিরের দায়িত্বও যেকোন মন্ত্রীর পদের গুরুত্ব অপেক্ষা কম ছিল না।

উজীর

উজীর সম্বন্ধে বলা যায় যে, বেসামরিক শাসনব্যবস্থার তিনিই ছিলেন সুলতানের সর্বোচ্চ পদাধিকারী। দুর্বল সুলতানদের অধীনে উজীর ছিলেন সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী (ওয়াজীর উল তাফরিজ)। কিন্তু শক্তিশালী সুলতানদের শাসনকালেও উজীরের হাতে প্রচুর ক্ষমতা থাকত। কেন্দ্রের রাজস্ব বিভাগ উজীরের অধীন ছিল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের জন্যও

www.pathagar.com

উজীরের উপর দায়িত্ব ছিল। বেসামরিক কর্মচারীদের নিয়োগ ও পরিদর্শন, রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ও রাজকীয় বিভিন্ন বিভাগের ব্যায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ও দৃষ্টি রাখা উজীরের দায়িত্ব ছিল। স্থানীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা বেআইনীভাবে অর্থব্যয় করলে তা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা তাঁর অন্যতম কর্তব্য বলে গণ্য করা হ'ত। সামরিক বিভাগের সর্বপ্রকার প্রয়োজন সম্পর্কে উজীরকে অবহিত করা হত। উজীরের দপ্তর সকল আয় ও ব্যায়ের হিসাব-নিকাশের জন্য দায়ী ছিল; এবং বিভিন্ন বিভাগের বেতনের ব্যবস্থা ও ইকতা বণ্টনের ব্যবস্থা করত। উপযুক্ত ছাত্র ও জ্ঞানীগুণীদের বৃত্তিদান এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের সাহায্য করা উজীরের দপ্তরের অন্যান্য কাজের মধ্যে অন্যতম ছিল। এইজন্য শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত সকল বিভাগের উপর উজীর দৃষ্টি রাখতেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তা থেকে সাধারণ কৃষককে পর্যন্ত সকলকেই উজীর বা উজীরের দপ্তরের কর্মচারীদের সঙ্গে কোন না কোন কারণে যোগাযোগ রাখতে হ'ত।

উজীরের দপ্তর দেওয়ান-ই-ওয়াজিরত বলে উল্লিখিত হয়েছে। উজীরের যিনি প্রধান সহায়ক ছিলেন তাকে নায়েব-উজীর বলা হ'ত এবং প্রয়োজনে তিনি উজীরের দপ্তরের দায়িত্ব পালন করতেন। নায়েব-উজীরের পরবর্তী পদের অধিকারী ছিলেন যথাক্রমে মুসরিফ-ই-মামালিক ও মুসতাওফি-ই-মামালিক যাঁদের কাজকে মহাগাণনিক (Accountant General) ও প্রধান হিসাব পরীক্ষকের (Auditor General) সঙ্গে তুলনা করা চলে। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় মহাগাণনিক (Accountant General) রাজ্যের আয়ের হিসাব দেখতেন এবং হিসাব পরীক্ষক (Auditor General) ব্যয়ের হিসাবনিকাশ করতেন। এই দুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁদের দপ্তরে বহু সহকর্মী ও করণিক নিযুক্ত করতেন।

A. B. M. Habibullah-র মতে উজীরের পরেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল আরিজ-ই-মামালিকের (Arize-i-Mamalik) বা দেওয়ান-ই-আরিজের। ইকতাদারদের নামের তালিকা (Master-roll of military assignees) রাখা, সৈন্যবাহিনীতে লোক সংগ্রহ করা, সশস্ত্রবাহিনীর অস্ত্রসম্ভার ও লড়াই করার দক্ষতার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা, প্রভৃতি আরিজের অন্যতম কর্তব্য ছিল। সৈন্যদের বেতনদানের ভারও তাঁর উপর ছিল এবং আরিজের বহু নায়েব ছিল। যুদ্ধের সময় সররবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখা ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের দায়িত্বগ্রহণ করা ছিল নায়েবদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। আরিজ কখনও কখনও সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করতেন। বলবনের আরিজ ইমাদ উল মুলুক অনেক সময় সৈন্যদের নিজের সঙ্গতির থেকে পুরস্কৃত করতেন। ইমাদ উল মুলুক তাঁর কর্তব্যপরায়ণতার জন্য প্রশংসিত হয়েছিলেন। আরিজ হিসেবে তিনি স্বীয় দপ্তর ও তার কর্মচারীদের দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য মুকতিদের উৎকোচ দান বন্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন খলজী সামরিক বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। আরিজ সম্ভবত ইকতা লাভ করতেন। ইমাদ উল মুলুক তাঁর নিজস্ব ইকতার বহু গ্রাম জনস্বার্থে দান খয়রাত করেছিলেন।

মন্ত্রীসভার মধ্যে তৃতীয় বিভাগ ছিল দেওয়ান-ই-আশরফ যা পরবর্তীকালে দেওয়ান-ই-ইনসা নামে পরিচিত। এই বিভাগের কাজ ছিল রাজকীয় ঘোষণাপত্রের মুসাবিদা করা ও স্থানীয় রাজকর্মচারীদের সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ রাখা। এই বিভাগে অনেক সচিব বা দবির কাজ করতেন এবং এইসব সচিবদের প্রধান ছিলেন সদর উল মুলুক। সুলতানের একান্ত সচিবকে দবির-ই-খাস বলা হত। তিনি সুলতানের সঙ্গে থাকতেন এবং সুলতানের চিঠিপত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া ফতেনামা বা বিজয়বার্তার মুসাবিদা করা ও সরকারি কাগজপত্র রাখা তাঁর কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল।

মন্ত্রীসভার চতুর্থ বিভাগ দেওয়ান-ই-রসালত বা রিসালত বলে উল্লিখিত হয়েছে। অধ্যাপক A.B.M. Habibullah-র মতে এই বিভাগকে বৈদেশিক দপ্তর বলা যায়। বৈদেশিক শাসকরা যেসব রাজদূত বা প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন তার সঙ্গে এই বিভাগের যোগাযোগ

www.pathagar.com

থাকত এবং কূটনৈতিক যোগসূত্র এই দপ্তরের মারফতে করা হত। I. H. Qureshi-র মতে কিন্তু দেওয়ান-ই-রিসালত ধর্মীয় ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং শিক্ষার্থী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বৃত্তি দান করত। Dr. A. L. Srivastav মন্তব্য করেছেন যে, 'Dr. Habibullah's view seem to be correct for apart from the error of interpretation committed by Dr. Qureshi, the theory would have made duplication inevitable as there was from the very beginning, an officer-in-charge of religious affairs, endowments and charity. He was called Sadr-us-Sudr.'*

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্য দুইটি বিভাগ ছিল সদর-উস-সুদর ও দেওয়ান-ই-কাজা। অনেকসময় একই ব্যক্তি এই উভয় পদে নিযুক্ত হতেন। প্রথমোক্ত পদের অধিকারী হিসেবে তিনি শেখ-উল-ইসলাম নামে পরিচিত ছিলেন ও সুলতানের ধর্মীয় সংক্রান্ত ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। এইজন্য তাঁকে সদর-ই-জাহান বা সদর-উস-সুদরও বলা হত। ঐতিহাসিক মিনহাজ-উদ-দীন বহুবার এই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই পদের অধিকারী সুলতানের ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেষ্টা হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ করতেন, জুম্মাবার বা শুক্রবারের প্রার্থনায় নেতৃত্বদান করতেন এবং স্থানীয় মসজিদগুলির খাতিব ও ইমাম নিযুক্ত করতেন। তিনি ইহতিসব সংগঠনের (Ihtisab organisation) প্রধান হিসেবে পৌরসভার কর্মচারী ও নৈতিক চরিত্র পরিদর্শকদের (moral censor) প্রত্যেক মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নিযুক্ত করতেন। প্রধান কাজি হিসেবে তিনি বিচারবিভাগের সকল কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করতেন এবং বিচারবিভাগীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু কার্যকলাপের জন্য দায়ী ছিলেন। বিচার-বিভাগের সকল দায়িত্ব প্রধান বিচারপতি বা কাজি-উল-কাজাতের উপর ন্যস্ত ছিল।

রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত মন্ত্রীর নাম ছিল বারিদ-ই-মামালিক। রাজ্যের সমস্ত ঘটনা যার কোন গুরুত্ব আছে বা যে ঘটনা ইঙ্গিতবহ তা গোপন সংবাদ সরবরাহকারীরা বারিদ-ই-মামালিকের দপ্তরে পৌঁছে দিত। এইজন্য রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহের প্রধান হিসেবে তাঁকে গণ্য করা যায়। শাসনবিভাগের প্রতিটি অংশের সদর দপ্তরে একজন করে বারিদ নিযুক্ত হতেন এবং তার দায়িত্বে কেন্দ্রের কাছে স্থানীয় সংবাদ প্রেরণ করত। এই ব্যবস্থার ফলে স্থানীয় রাজকর্মচারীদের জনগণের উপর অত্যাচার ও অবিচার করার সুযোগ কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা ছিল।

মন্ত্রীরা সকলেই সুলতানের অধীন ছিলেন ও তাঁদের কার্যকলাপের জন্য সুলতানের কাছে দায়ী ছিলেন। অতএব সমবেতভাবে সুলতানের কাজের সমালোচনা করা বা বাধাদান করা এইসব মন্ত্রীদের পক্ষে প্রশ্নাতীত ছিল। এইসব মন্ত্রীরা কার্যত ছিলেন বিভাগীয় প্রধান ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের পরিচালক। সময় বিশেষে কোন একজন অভিজাত নায়েব-উল-মুলুক নামে অভিহিত হতেন। সুলতান শক্তিশালী হলে এই উপাধি একটি শূন্যগর্ভ শব্দ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু কখনও কখনও এই উপাধিধারী সামরিক সংগঠনের প্রধান হিসেবে কাজ করতেন ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসন পরিচালনা করতেন।

প্রাদেশিক শাসন

দিল্লীর সুলতানী শাসনে সমগ্র রাজ্যে কোনদিনই একই ধাঁচের প্রদেশ ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। এর কারণ হিসেবে অধ্যাপক এ. বি. এম. হাবিবউল্লাহ্ বলেছেন

---

* A. L. Srivastava, The Sultanate of Delhi, পৃ-১১৪, ২৮৬, A. B. M. Habibullah, The Foundation of Muslim Rule in India, পৃ-১১৮; The Delhi Sultanate, পৃ-১১৪।

www.pathagar.com

যে, 'Limited as the state's man power was, the setting up of a uniform civil administration over all parts of the dominions was out of the question.'* সাধারণত তুর্কী বিজয়ীরা সুরক্ষিত কসবা এবং শিবিরে বাস করতেন এবং উলেমা, সুফী ও ফকিররা গ্রামাঞ্চল ও শহরের বাইরে অমুসলমান জনগণের মধ্যে অনুপ্রবেশ শুরু করেন। তুর্কী শাসনের প্রথমার্ধে প্রধান লক্ষ্য ছিল সহজে ও নিয়মিতভাবে রাজস্ব আদায় করা। কিন্তু খলজী শাসনের সময় থেকে স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় এই বিকেন্দ্রীকরণ ও ঢিলেঢালা ভাবের অবসান হয়।

দুই ধরনের স্থানীয় বা প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার অস্তিত্বের কথা সুলতানী যুগের প্রথম যুগ থেকে জানা যায়। প্রথম শ্রেণীর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্ট ছিল না কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সীমিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভৌগোলিক দূরত্বের জন্য বঙ্গদেশের শাসনকর্তা অনেকসময় আধা স্বাধীন কিন্তু দিল্লীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। প্রায় একইরকম ভাবে গুজরাট, জৌনপুর, মালব, খান্দেশ ও দক্ষিণের প্রাদেশিক শাসনকর্তারা খলজী ও তুঘলক আমলে সীমাহীন ক্ষমতা উপভোগ করতেন। ত্রয়োদশ শতকে সুলতানী শাসনব্যবস্থা সামরিক বাহিনীর প্রধানের মধ্যে বিভক্ত ছিল। সরাসরি কেন্দ্রীয়শাসনের বাইরে অবস্থিত এইসব সামরিক শাসকের অধীনের এলাকাগুলি ইক্‌তা নামে পরিচিত এবং ইক্‌তার প্রধানকে মুক্‌তি বলা হত। বৃহৎ ও সমস্যাসংকুল প্রদেশ বা সীমান্তে বা দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত প্রদেশের শাসনকর্তারা ওয়ালী নামে অভিহিত হতেন। করদাতা অধীনস্থ হিন্দু রাজারা যারা সুলতানের বশংবদ ছিল তাদেরও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রায় সমপর্যায় ভুক্ত বলে গণ্য করা হত।

প্রাদেশিক শাসনকর্তা প্রদেশের শাসনসংক্রান্ত বিষয়ের প্রধান ছিলেন এবং তাঁর অধীন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা প্রদেশের শাসনে মুক্‌তি বা ওয়ালির নির্দেশ মত চলতেন। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার আদর্শেই সংগঠিত ছিল। কিন্তু যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি বা কর্মচারীরা প্রাদেশিক শাসনের প্রতি বিভাগে সজাগ দৃষ্টি রাখবার জন্য নিযুক্ত হতেন সেইজন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকতে হ'ত। প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনীর প্রধান বা আরিজ কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক বিভাগের প্রধান আরিজ-ই-মামালিকের কাছে দায়ী ছিলেন। বঙ্গদেশের শাসনব্যবস্থায় এর ব্যতিক্রম হয়নি কেবলমাত্র প্রাদেশিক বিভাগগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না।

সুলতান বা কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণত প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিল না। যতদিন মুক্‌তি বা ওয়ালি নিয়মিত প্রাদেশিক শাসনবাবদ ব্যয় বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত খাজনা নিয়মিত কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রেরণ করতেন এবং কেন্দ্রকে সামরিক সাহায্য প্রেরণে অবহেলা করতেন না ততদিন কেন্দ্র প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে অযথা হয়রানি করার প্রয়োজন অনুভব করত না। মুক্‌তি বা ওয়ালিরা তাদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব ও বাকি উদ্বৃত্ত খাজনা কেন্দ্রের কাছে নিয়মমাফিক পেশ করতে বাধ্য ছিল। ওয়ালি ও মুক্‌তিদের অন্যতম কর্তব্য ছিল শরিয়তের বিধি পালনের দিকে লক্ষ্য রাখা উলেমা ও মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতা করা ও রক্ষা করা, সুবিচার কার্যকরী করার দিকে দৃষ্টিদান, পথঘাট ও পথিকের নিরাপত্তা বিধানে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা করা। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক স্বীয় পুত্র ফতে খানকে সিন্ধুর শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করার সময় কৃষককে অতিরিক্ত শোষণ ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে বলেছিলেন, জ্ঞানী ও ধর্মপ্রাণদের সাহায্যে অগ্রসর হতে উপদেশ দিয়েছিলেন ও প্রজাসাধারণের স্বার্থের দিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেন্দ্রে দুর্বল সুলতানের

* A. B. M Aabibullah, The Foundation of Muslim rule in India পৃঃ-২০৭।

www.pathagar.com

শাসনকালে প্রদেশগুলি স্ব স্ব প্রধান হয়ে পড়ত এবং বিকেন্দ্রীকরণ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের দুর্বল বংশধরদের রাজত্বকালে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য এইজন্য বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং প্রদেশগুলি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

হিন্দুস্তানে শাসনকার্য পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা তুর্কী বিজয়ীদের ছিল না। এইজন্য অধীনতা স্বীকার করে যেসব হিন্দু রাজ্য করদানে স্বীকৃত হয়েছিল তাদের অস্তিত্বকে বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল। এছাড়া সামরিকভাবে সরাসরি যেসব স্থানে তুর্কীরা শাসন পরিচালনার ভার নিয়েছিল সেখানে বেসামরিক কাজে বিশেষত ভূমিরাজস্বের মূল্যায়ন ও সংগ্রহের কাজে গ্রামে ও গঞ্জে অমুসলমানদের সহযোগিতা ছাড়া দৈনন্দিন শাসন পরিচালনা করা সম্ভবপর ছিল না।

তুর্কী শাসকশ্রেণী নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। শহরে ছিল সৈন্যবাহিনীর শিবির বা উর্দু। রাজধানী বা ছোটখাট সুরক্ষিত কসবার বাইরে অমুসলমান জনসাধারণের সরকারের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল ক্ষীণ। হাবিবউল্লাহ্ মন্তব্য করেছেন যে, ইসলামের প্রচারকরা ছাড়া শাসকশ্রেণীর আর কারো সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের প্রজাদের বিশেষ সংযোগ ছিল না। অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহের সময় সামরিক বাহিনীর লোকেদের সঙ্গে শাসিতদের যোগাযোগের সম্ভাবনা ছিল। কিছু কিছু বণিক ও অমুসলমান জনগণের সঙ্গে শাসক শ্রেণীর যোগাযোগ ছিল। এছাড়া রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ও শাসন পরিচালনার জন্যই তুর্কী শাসকশ্রেণী সাধারণ মানুষের খোঁজখবর রাখতে বাধ্য হতেন এবং অন্য কোন বিষয়ে তাদের সরাসরি সংযোগ ছিল না। খলজী যুগ থেকে এই পরিস্থিতির ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে।

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা

ত্রয়োদশ শতকে সম্ভবত ইকতার অধীন স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সংগঠিত হয় নাই। কিন্তু চতুর্দশ শতকে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে প্রদেশগুলিকে কতগুলি শিকে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি শিকের উপর একজন শিকদার ছিলেন। সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে প্রদেশগুলি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হলে কালক্রমে শিকগুলি সরকার নামে অভিহিত হয় এবং সরকারের প্রধান শিকদার-ই-শিকদারান বা প্রধান শিকদার নামে পরিচিত হলেন। এইসময় থেকে শিকদারকে পরগণার সঙ্গে সংযুক্ত একজন রাজকর্মচারীরূপে গণ্য করা হত। পরগণার সঙ্গে কৃষকদের সরাসরি সংযোগ ছিল। এইজন্য সরকারের কাছে পরগণার গুরুত্ব ছিল সমধিক। পরগণার সঙ্গে যেসব রাজকর্মচারী যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন একজন আমিল বা পরবর্তীকালের শিকদার ও একজন মুসারিফ যাঁকে আমিন বা মুন্সিফ বলা হত এবং একজন খাজাঞ্চি, দুইজন কারকুন ও একজন কানুনগো। মুন্সিফের কাজ ছিল রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা ও সঠিক বিচার করা। কৃষকের স্বার্থ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কোন কোন স্থানে একজন চৌধুরীর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বনির্ভর গ্রামগুলিই ছিল শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। গ্রামের প্রধান রাজস্ব আদায়ের জন্য সাহায্য করতেন। গ্রামের রাজস্ব আদায়ের হিসাবপত্র রাখবার জন্য একজন পাটোয়ারি ছিলেন। মুকদ্দম, চৌধুরী প্রভৃতি রাজস্ব আদায়কারীরা অনেকসময় কৃষকের কাছ থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতেন। এই শোষণ বন্ধ করার জন্য আলাউদ্দীন খলজী গ্রামের পাটোয়ারির খাতার হিসেব থেকে কৃষকের কাছে আদায়কৃত ও রাষ্ট্রের প্রাপ্য প্রতিটি 'দাম' আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং গ্রামের ক্ষমতাশালী ব্যক্তির উপর চাপানো করভার যাতে দুর্বলের ঘাড়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে রাজকর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

বিচারব্যবস্থা ও শান্তিরক্ষা

বিচারবিভাগ বা দেওয়ান-ই-কাজীর উপর দেশের বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল। দিল্লীর সুলতানী শাসনের যুগে শরিয়তের আইনকে স্বীকৃতি দান করা হয়েছিল এবং তত্ত্বগত দিক থেকে সুলতানের উপর এই আইন কার্যকরী করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।

সুলতান ছিলেন বিচার-বিভাগের প্রধান এবং সপ্তাহে দুইদিন বিচারক হিসেবে স্বয়ং মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করতেন ও অভিযোগ শুনতেন। সাধারণত সুলতানের কাছে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক হিসেবে অন্যান্য আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন পাঠানো হত, আবার সরাসরি সুলতানের কাছে বিচারের জন্য প্রথমেই মামলা বা অভিযোগ উপস্থিত করা যেত। ধর্মীয় ব্যাপারে সুলতানকে বিচারে সাহায্য করতেন প্রধান সদর বা সদর-উস-সুদর ও মুফতি। ধর্মনিরপেক্ষ বা জাগতিক বিষয়ে বিচারকার্যে সুলতান কাজি-উল-কাজাতের সহায়তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু সুলতানী আমলে এই উভয় পদাধিকারী এক ও অভিন্ন ব্যক্তিই ছিলেন এবং বিচারকার্যে ধর্মীয় ব্যাপারে ও জাগতিক প্রশ্নে তাঁরা যথাক্রমে প্রধান সদর ও কাজির ভূমিকা পালন করতেন।

বিচারবিভাগে কাজিই ছিলেন প্রধান, কিন্তু আসলে সুলতান স্বয়ং বিচার-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করতেন। সুলতান যখন বিচারকার্যে লিপ্ত থাকতেন না সেইসময় কাজি সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে অন্যান্য আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন গ্রহণ করতেন। কিন্তু কাজির বিচার ও রায় সুলতানের মর্জি অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারত। প্রাদেশিক কাজি ও তাঁর নিম্নস্তরের কাজি এবং আমির-ই-দাদ প্রভৃতির নিয়োগ, বদলি বা বরখাস্তের সময় সম্ভবত প্রধান কাজির সুপারিশ গ্রহণ করা হ'ত কিন্তু এবিষয়ে সুলতানের মতামত ও অনুমোদন গ্রহণ করা হ'ত। আমির-ই-দাদের কাজ ছিল অভিযুক্তকে ও সাক্ষীকে আদালতে উপস্থিত করা এবং আদালতের রায় কার্যকরী করা। প্রত্যেক প্রদেশে আমির-ই-দাদের প্রতিনিধি ছিল ও প্রতিটি শহরে যেখানেই কাজি নিযুক্ত ছিল একজন দাদবেক তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রত্যেক শহরে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশবাহিনী ছিল। পুলিশের প্রধান ছিলেন কোতোয়াল। ফৌজদারী মামলার বিষয়ে অনুসন্ধান ও বিচার কোতয়ালের কর্তব্যের অঙ্গ ছিল। কোতয়ালের অন্যান্য কার্যকলাপের মধ্যে পৌরসভার ও শান্তিরক্ষার কার্যের নানা কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। জনস্বার্থের খাতিরে ও বাজার নিয়ন্ত্রণ, সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পথঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দিকে দৃষ্টি দেওয়া এরূপ নানাবিধ কাজ কোতোয়ালকে করতে হত।

তৎকালীন বিচারব্যবস্থার সম্পর্কে উল্লেখ করে একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, "The monarchs did not interfere with the duties of the qazis whose independence was respected; he, however, could dismiss any qazi who was found unworthy of his charge."* কিন্তু ডঃ শ্রীবাস্তব এই সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং তাঁর মতে, "Notwithstanding Dr. I. H. Qureshi's rhetoric contemporary persian chronicles yield the above picture in brief. Their perusal reveals glaring defects in the administrations of Justic."** বিচার-ব্যবস্থায় কোন সুশৃঙ্খল সংগঠন ছিল না এবং বিভিন্ন আদালতের এক্তিয়ার সম্পর্কে কোন বিধিসম্মত বিভাগ ছিল না। সমগ্র রাজ্যে বিচারপদ্ধতি সঠিক নিয়মকানুন অনুসারে পরিচালিত ছিল না। একই মামলা প্রাদেশিক কাজির আদালতে বা শহরে কাজির সামনে বা সর্বোচ্চ আদালতে উত্থাপন করা যেত। শরিয়তের বিধি,

---

* See The Delhi Sultanate (Bharatiya Vidya Bhavan) পৃঃ-৪৫১)।

** The Sultanate of Delhi, A. L. Srivastava, পৃঃ-৩০১)।

www.pathagar.com

মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ বা মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসায় প্রযোজ্য ছিল। অমুসলমানদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসায় প্রথাসিদ্ধ বিধি প্রয়োগ করা হত। ফৌজদারী বিধি কঠোর ছিল ও কারাগারের অবস্থা শোচনীয় ছিল। আলাউদ্দীনের সময় যারা কারান্তরালে প্রেরিত হ'ত তাদের জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ ছিল। আবার দুর্গ ও প্রাসাদে আমির ও বিত্তবানদের বন্দী রাখার কথাও জানা যায়। ফৌজদারী বিধির কঠোরতা হ্রাসের জন্য কারান্তরালে অত্যাচার কমানোর উদ্দেশ্যে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সংস্কার ও প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু সুদূর গ্রামাঞ্চলে ও সমগ্র দেশে পঞ্চায়েত ও গোষ্ঠী এবং বণিক সংস্থা বা সংঘগুলি ছিল আত্মনির্ভরশীল ও প্রথাসিদ্ধ বিচার ও বিচারের ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ইকতা

সুলতানী শাসনের আমলে কৃষকের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত শস্য ও ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ এবং শাসকশ্রেণীর মধ্যে বিভাজনের যে পদ্ধতি চালু ছিল তাকে ইকতা নামে অভিহিত করা হয়। ইকতার মারফতে তাই দুইটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা করা হত। রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজস্ব সংগ্রহ ও বিভাগই ছিল ইকতার উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক হাবিবউল্লাহর ভাষায় বলা যায়, "The chronicls use the word *iqta* and *wilayat* to indicate the division of the kingdom. The former, which means literally, a portion, is used much more frequently, seemingly with a technical meaning, on the exact determination of which depends a clear understanding of the nature of local administration."* ইকতার প্রধানকে বলা হত মুক্তি। ঘোরী সুলতানদের হিন্দুস্তান আগমনের পূর্বে মধ্যএশিয়াতে এই পদ্ধতি চালু ছিল এবং হিন্দুস্তানে তুর্কী বিজয়ীরা সেখান থেকেই সম্ভবত এই প্রথা গ্রহণ করেন। একজন সেলজুক রাজনৈতিকের বক্তব্য অনুসারে "মুক্তি যাঁরা ইকতা লাভ করতেন তাদের প্রজা বা কৃষকদের কাছ থেকে সঠিক পদ্ধতিতে প্রাপ্য যে রাজস্ব (মল) আদায় করতে বলা হয়েছিল, তাছাড়া অন্য কোন অধিকার ছিল না।" সামরিক ব্যাপারে মুক্তিদের অনেক ক্ষমতা দেওয়া ছিল। মুক্তিরা তাঁদের অধীনে একদল সৈন্যপোষণ করতেন এবং সুলতানের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের তলব অনুসারে তাদের প্রেরণ করতেন। দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে নিজাম-উল-মুলুক লিখেছিলেন যে, মুক্তিরা কেবলমাত্র কর বিশেষত ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ ও আদায়ের অধিকার রাখে। এই অধিকার তারা ততদিনই উপভোগ করতে সক্ষম যতদিন সুলতান তাদের একাজে নিযুক্ত রাখতে ইচ্ছুক। ইকতার প্রধান হিসেবে মুকতির কতকগুলি কর্তব্যও ছিল। এইসব কর্তব্যের অন্যতম হচ্ছে একদল সৈন্যবাহিনী পোষণ করা ও সুলতানের প্রয়োজনে এই সৈন্যবাহিনী সরবরাহ করা। সৈন্যবাহিনী পোষণ ও অন্যান্য কর্তব্য পালনের ব্যয় ইকতার আয় থেকে নির্বাহ হত। কেম্‌ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার (১ম খণ্ডে) বলা হয়েছে, "The muqti was thus tax collector and army pay master (also commander) rolled into one।** যে সকল এলাকা ইকতা হিসেবে দেওয়া ছিল না সেগুলি খালিসা নামে পরিচিত ছিল এবং সুলতানের নিযুক্ত রাজস্ব সংগ্রহকারীরা বা আমিলরা সেখানে রাজস্ব আদায় করে খাজাঞ্চিখানায় জমা দিত।

---

* The Foundation of Muslim Rule in India, পৃঃ-২০৯।

** Cambridge Economic History of India, Vol-I, পৃঃ-৬৮।

www.pathagar.com

ইক্তার বিবর্তন

উত্তরভারতে তুর্কী বিজয়ের পর বিজিত স্থানগুলি সৈন্যাধক্ষ্যদের মধ্যে বিভক্ত করা হয়েছিল। এসব সৈন্যবাহিনীর প্রধানরা লুণ্ঠন ও কর আদায়ের মারফতে শাসনের ব্যয় নির্বাহ করতেন। অথচ ঘুরী তুর্কীরা ইকতা শব্দের সঙ্গে এতদূর পরিচিত ছিলেন যে মুক্তি ও তাঁদের শাসিত এলাকাকে ইকতা বা কখনও যথাক্রমে ওয়ালি এবং ওয়ালিয়াত নামে অভিহিত করতেন। সুলতানী শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর বিজয়ী সেনাপতিদের অধীন ও নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলি সুলতানের এক্তিয়ারে ইকতায় পরিণত হয়। নিজাম-উল-মুলুক মন্তব্য করেছিলেন যে, মুক্তিরা সুলতানের অনুমোদন অনুসারে কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন এবং সুলতানের প্রয়োজনে তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য দান করতেন। শামসউদ্দীন ইলতুৎমিস (১২১০-১২৩৬ খ্রীঃ) থেকে শুরু করে পরবর্তী সব দিল্লীর সুলতানরা মুক্তিদের এক ইকতা থেকে আরেক ইক্তায় কয়েক বৎসর অন্তর স্থানান্তরিত করার প্রথা চালু করতে সচেষ্ট ছিলেন। কেন্দ্রের প্রয়োজনে মুক্তি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে সুলতানের শক্তি বৃদ্ধি করতে বাধ্য ছিলেন। মুক্তিরা তাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার অংশ বিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইকতায় নিজেদের অনুচরদের মধ্যে অনেক সময় বিতরণ করতেন এবং এইভাবে মুকতিরা অধিকাংশ সময় তাঁদের অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর বেতন দানের সমস্যার সমাধান করতেন।

সুলতানরা তাঁদের 'খালিসা' বৃদ্ধি করার জন্য সর্বদা তৎপর ছিলেন। ভাতিন্দার খালিসার* সাহানা রূপে ইলতুৎমিস তাঁর একজন ক্রীতদাসকে নিযুক্ত করেছিলেন। ইলতুৎমিসের সময় সুলতানের নিজস্ব কেন্দ্রিয় ২০০০/৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্যকে দোয়াবের কয়েকটি গ্রামের রাজস্বের উপসত্ব দেওয়া হয়েছিল। এইগুলিকে ইকতা বলা হত। মুক্তিদের অনুচরদের অধীন এলাকাগুলির সঙ্গে এই সব অঞ্চলের তুলনা করা চলে। বলবনের (১২৬৬-৮৬ খ্রীঃ) রাজত্ব কালেও এই সব শামসী অশ্বারোহীরা বা তাদের বংশধররা দোয়াবের ইকতা উপভোগ করছিলেন। সুলতান বলবন, যেসব ইকতা-উপভোক্তার থেকে সামরিক বা অন্য কোন সেবা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, সেই শামসী অশ্বারোহীদের ক্ষেত্রে ইকতার বদলে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

বলবনী বংশের পতনের পূর্ব থেকে দিল্লীর সুলতানরা দাবি করেন যে ইকতার উদ্বৃত্ত রাজস্ব কেন্দ্রের খাজাঞ্চি খানায় জমা দিতে হবে। ইকতা থেকে যে পরিমাণ কর আদায়ের সম্ভাব্য হিসাব করা হত তার থেকে মুক্তি যে সৈন্যবাহিনী পোষণ করতেন তার ব্যয় বাদ দিলে অবশিষ্ট অর্থ রাজস্বের উদ্বৃত্তের হিসাবের ভিত্তি বলে ধরা যেতে পারে। সুলতান বলবন ইকতার কর সংগ্রহ ও ব্যায়ের যথাযথ হিসাব রাখার জন্য মুক্তির সঙ্গে একজন করে খাজা (হিসাব রক্ষক) নিযুক্ত করতেন।

সুলতান আলাউদ্দীনের সময় ইকতার বিবর্তন

সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সময় দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল। এইসময় সাম্রাজ্যের পূর্বতন এলাকাগুলিতে কৃষকদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব পুরোদস্তুর আদায়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। শাসকশ্রেণীর আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইকতার সংগঠনেরও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হয়। দূরদূরান্তরের অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে দিল্লীর উপকণ্ঠে ও নিকটবর্তী বহু এলাকা খালিসার অন্তর্ভুক্ত হয় ও দোয়াবের কেন্দ্রীয় অঞ্চল রোহিলখণ্ডের সঙ্গে

---

* We hear occasionally of Khalisah areas, comprising cities and districts, which were governed by amils or shana is lead' of the muqti, Latterly, the terms came to have a purely fiscal connotation but in the 13th century its administrative organisation was also different. Foundation of Muslim Rule in India. পৃঃ-২১৪।

www.pathagar.com

যুক্ত হয়'। ফলে সুলতানের নিজস্ব অশ্বারোহী বাহিনীর সৈন্যদের গ্রামাঞ্চলে ইকতা দেওয়ার প্রথা অবলুপ্ত হয়েছিল ও তাদের নগদে বেতন দেবার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ১৩৫১ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কায়েম ছিল। সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সময় নতুন ভূমি হস্তান্তর ব্যবস্থা ও কৃষিকর সংগ্রহের নীতি চালু হয়। এই সময় থেকে ইকতাতে আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়।

প্রত্যেক ইকতা থেকে আদায়কৃত করের (খরাজ) একটি আনুমানিক হিসাব এই সময় দেওয়ান-ই-ওয়াজিরাতের কাছ থেকে পাওয়া যেত। এই আনুমানিক সম্ভাব্য আয়ের হিসাবকে বেশী করে দেখানোর সর্বদাই একটা প্রচেষ্টা ছিল। এই সম্ভাব্য আয়ের একটি অংশ থেকে মুক্তি বা ওয়ালির অধীন সৈন্যবাহিনীর জন্য ব্যয় হবে বলে ধরা হত। যে এলাকা থেকে এই ব্যয় উসুল হবার আশা ছিল দেওয়ান তাঁর আয়ব্যয়ের হিসাবে কার্যতঃ তা আলাদা করে দেখাতেন। বাদবাকী অংশ মুক্তির নিজস্ব ইকতার আয় হিসাবে গণ্য করা হত। এই অংশ থেকে মুক্তি নিজের বেতন ও তাঁর কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করতেন। মুক্তি এই সব ব্যয় ও সৈন্যবাহিনীর জন্য ব্যয় নির্বাহের পর বাকি উদ্বৃত্ত রাজস্ব কেন্দ্রের খাজাঞ্চি খানায় জমা দিতেন।* মুক্তিরা স্বভাবতঃ তাদের আয়ব্যায়ের হিসাবে কারচুপি করে সুলতানকে ও কেন্দ্রীয় খাজাঞ্চিখানাকে ফাঁকি দেওয়ার প্রচেষ্টা করতেন। অপরদিকে এই মুক্তিরাই আবার তাদের অধীনস্থদের কাছ থেকে প্রতিটি পাইপয়সা আদায় করতেন। মুক্তিরা স্বভাবতঃ তাঁদের আয়ের হিসাবে কারচুপি করে সুলতানকে দেয় উদ্বৃত্ত কর ফাঁকি দেওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। অপরদিকে এই মুক্তিরাই আবার তাঁদের অধীনস্থ ইকতার কর্মচারীদের তহবিল তছরূপ বন্ধ করার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যগ্র ছিলেন। সুলতান তাঁর মুক্তিদের সম্পর্ক ও শেষোক্তরা তাঁদের অধীনস্থদের কারচুপি ও তছরূপের প্রবণতায় সন্দেহ পোষণ করতেন। অতএব উভয় ক্ষেত্রেই হিসাব পরীক্ষার সময় সঠিক হিসাব আদায়ের জন্য জোরজুলুম এমনকি কারাগারে প্রেরণ ইত্যাদি প্রায় প্রচলিত প্রথার ন্যায় চালু ছিল।

সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সময় শরফকোই নামে একজন মন্ত্রীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। ঐতিহাসিক বারানী বলেছেন যে, তিনি গ্রামের পাটোয়ারী বা হিসাবরক্ষকদের খাতা দেখে কর ফাঁকির পথ বন্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং দোষী রাজস্ব আদায়কারীদের শৃংখলিত করে রাখতেন। সামান্য তহবিল তছরূপের অপরাধেও তিনি অমানুষিক শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। আরেকজন সমকালীন ঐতিহাসিক শামসি সিরাজ আফিফও মন্তব্য করেছেন যে শরফকোইর সময় অতিরিক্ত পরিমাণে রাজস্ব বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়েছিল।

ইকতা সম্পর্কে তুঘলক আমলে নীতি

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক প্রচলিত ইকতা সম্পর্কিত ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা করেননি। তিনি কেবল ইকতা সম্পর্কে অনুসৃত নীতিতে কঠোরতা হ্রাস করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের নির্দেশে দেওয়ান-ই-ওয়াজিরতকে বাৎসরিক হিসাবে ১/১০ বা ১/১১ অংশের অধিক আনুমানিক আয় বৃদ্ধি করার অধিকার দেওয়া হয়নি। কারণ সুলতান মনে করতেন ইকতা থেকে আদায় বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা করলে মুক্তিরা এই গুরুভার বহনের দায় কৃষকের উপর চাপিয়ে দেবে। এছাড়া মুক্তিরা মঞ্জুরীকৃত আয় অপেক্ষা ১/১০ থেকে ১/২০ অংশ খরজ বৃদ্ধি করলে এবিষয়ে কড়াকড়ি ভাবে বাধা দান করা হবে না বলে স্থির হয়েছিল। কিন্তু ইকতার যে অংশ সৈন্যবাহিনীর বেতনের

---

* He had to pay into the treasury all realization above the amount allowed for the pay of the army and for his own income', CEHI, Vol-1, পৃ-৭০।

www.pathagar.com

জন্য নির্দিষ্ট ছিল তার থেকে মুক্‌তিরা যাতে কোন কিছু গ্রহণ করতে না পারেন এসম্পর্কে নির্দেশ ছিল। বেতনের বাইরে অধীনস্থ কর্মচারীরা সামান্য কিছু অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করলে (আদায়ের শতকরা ০·৫ বা শতকরা ১ ভাগ) তাদের সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হয়েছিল।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ আরো প্রসারিত হয়েছিল। এই সময় রাজস্ব ও কর সংগ্রহকারীর কার্যভার ও সৈন্যবাহিনী রাখার দায়িত্বকে পৃথকীকরণ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সম্ভবতঃ আয়বৃদ্ধির জন্য এইরূপ পৃথকীকরণ ব্যবস্থা চালু হয়। বারানী উল্লেখ করেছেন যে নিজাম মায়িন নামে একজন ব্যক্তি কয়েক লক্ষ টাকা প্রতিশ্রুতিতে 'কারা' নামক ইকতার ইজারা গ্রহণ করেছিলেন এবং নসরৎখান নামে একজন ব্যবসায়ী এককোটি তংকা দেবার বিনিময়ে বিদর ও আশেপাশের অঞ্চলের ইজারা নিয়েছিলেন। ইসেমী বলেছেন একই ভাবে আলিশাহ খলজী 'গোবর' নামক স্থানটিকে স্বনিয়ন্ত্রনে এনে প্রতিবৎসর একটি নির্দিষ্ট অর্থ দেওয়ানে জমা দিতেন। কিন্তু এই স্থানের জন্য আরো দেড়গুণ বেশী অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিল বলে গুলবর্গার ইকতার ভারপ্রাপ্ত শরণ নামে একজন হিন্দুকে পরে 'গোবরের'ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বারানীর উল্লিখিত অন্য দুইটি উদাহরণ থেকেই এটা সুস্পষ্ট যে এই দুইটি ক্ষেত্রেই ঠিকাদারদের সৈন্য পোষণ করার কোন দায়িত্ব ছিল না এবং সামরিক বাহিনীকে পোষণকরার জন্য আলাদা বন্দোবস্ত ছিল। ইবনবতুতা তাঁর আমরোহা বাজারের বিবরণীতে একই ইকতায় কিভাবে পাশাপাশি দ্বৈতশাসনের পৃথক ব্যবস্থা চালু ছিল সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

আমরোহার বাজারের রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন ওয়ালী (ওয়ালী আল-খরাজ) ছিলেন যিনি নিজেকে শুধুমাত্র ওয়ালী নামেই জাহির করতেন। এই ওয়ালী আজিজ খেমারের অধীন ১,৫০০ গ্রামের রাজস্ব ছিল ৬ মিলিয়ন তংকা। এই আয়ের একবিংশতি অংশ স্বীয় বেতন হিসাবে রেখে বাকি রাজস্ব তিনি কেন্দ্রীয় খাজাঞ্চিখানায় জমা দিতেন এবং প্রচুর পরিমাণ শস্য দিল্লীতে প্রেরণ করতেন। পাশাপাশি এইস্থানে একজন আমির বা সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। আজিজের সঙ্গে একটি বিরোধের সুযোগে আমিরের সৈন্যবাহিনী ওয়ালীর প্রাসাদ অবরোধ করেছিল। একথা ধরে নেওয়া যায় যে আমিরের সৈন্যরা বেতনের তাগিদ দেবার জন্য ওয়ালির উপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল কারণ এই সূত্রে ওয়ালী যে অভিযোগ পেশ করেছিলেন তা থেকে জানা যায় যে তাঁর খাজাঞ্চিখানা থেকে আমিরে একজন ক্রীতদাস বেশ কিছু অর্থ জোরজবরদস্তী করে নিয়ে গিয়েছিল।

আরবী ভাষায় লেখা গ্রন্থ মামালিক-আল-আবসারে মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়কার ইকতার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দশহাজার সৈন্য রাখার অধিকারী একজন খান থেকে একশ জনের উপরয়ালা সিপাহিশালার সকলকেই বেতনের বদলে ইকতা দেওয়া হত। বেতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ও বিন্যাস করে ইকতাগুলির যে আনুমানিক আয় নির্ধারিত করা হত বাস্তবে তা আনুমানিক আয় অপেক্ষা কম। কিন্তু সৈন্যদের নগদে বেতন দেওয়া হত এবং ইকতার আয় সৈন্যাধ্যক্ষর ব্যক্তিগত বেতন হিসাবে ধরা হত। অতএব ইতিপূর্বে খলজী ও গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের আমলে সৈন্যবাহিনীর বেতনের জন্য ইকতার একটি নির্দিষ্ট অংশ আলাদাভাবে রাখার যে ব্যবস্থা ছিল তার প্রয়োজন রইল না। ইকতার যে অংশ সৈন্যাধক্ষ্যের বেতনের জন্য প্রয়োজন তাই তাঁকে দেওয়া হ'ত। সম্ভবতঃ মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় দক্ষিণ ভারতে আমিরন-ই-সদার বিদ্রোহের মূলে ছিল এই ব্যবস্থা যার ফলে ইকতার থেকে অতিরিক্ত লাভের পথ বন্ধ হয়েছিল।

www.pathagar.com

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় ইকতা ব্যবস্থা

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালে (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রীঃ) অভিজাতরা অনেক সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিলেন। সুলতানের আদেশে সমগ্র রাজ্যের আনুমানিক আয়ের হিসাব রাজত্বের চারবৎসরের মধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই হিসাব অনুসারে সাম্রাজ্যের মোট আয় ধরা হয় ৬,৭৫,০০,০০০ তংকা বা ৬,৮৫,০০,০০০ তংকা। সর্বপ্রথম এই আয়ের অংককে জমা বলে উল্লেখ করা হয়। সুলতান ফিরোজের রাজত্বে জমার এই অংকের কোন হেরফের বা বৃদ্ধি হয়নি। ফলে মুক্তিরা নিশ্চিন্ত ছিল যে শাহী খাজাঞ্চিখানায় দেয় অর্থ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা নেই। রাজদরবারে তাদের হিসাব পরীক্ষা করানো এখন মুক্তিদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছিল। ফিরোজ তুঘলক অভিজাতদের ব্যক্তিগত বেতন বৃদ্ধি করেছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় একজন খানের বেতন ছিল ২,০০,০০০ তংকা। ফিরোজ তুঘলকের সময় খান ও মালিকদের তাঁদের ব্যক্তিগত আয় হিসাবেই ৪,০০,০০০ তংকা, ৬,০০,০০০ বা ৮,০০,০০০ তংকা পর্যন্ত ছিল এবং উজীরের ক্ষেত্রে ১৩,০০,০০০ তংকা অবধি ছিল। এই আয়ের পরিবর্তে তাঁরা পৃথক ইকতা এবং পরগণা লাভ করতেন। এই সম্বন্ধে আফিফ যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার অর্থ হল মুক্তির ব্যক্তিগত আয় থেকে সৈন্যদের বেতনের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলকে পৃথক করা ছিল না। কিন্তু পৃথকীকরণ করার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থাও ছিল না এবং কালক্রমে তা সম্ভবত নাম মাত্র হয়ে দাড়িয়েছিল।

সাধারণভাবে সুলতান ফিরোজ সাম্রাজ্যের জমি ইকতা হিসাবে বিতরণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরে অনুপ্রাণিত হয়ে সাম্রাজ্যের রাজস্ব জনগণের মধ্যে হস্তান্তর করেন। এমনকি ইকতা ও পরগণাগুলিও তাঁর এই নীতি থেকে রেহাই পায়নি। ফলে খালিসার এলাকা হ্রাস পায়। অবশিষ্ট খালিসাতেও সুলতান সৈনিকদের বেতন দেবার জন্য গ্রামগুলির রাজস্বকে ওয়াজব অর্থাৎ বেতনের পরিবর্তে প্রাপ্ত বা মোয়াজব বলে উল্লেখ করা হত। যেসব সৈনিক এভাবে বেতন পেতেন না তাঁদের খাজাঞ্চিখানা থেকে নগদে বা অভিজাতদের ইকতার রাজস্ব থেকে যে উদ্বৃত্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয় তার উপর ভিত্তি করে বেতন দেবার হুকুমনামা বা ইতলাক দেওয়া হ'ত। আফিফ বলেছেন যে, সৈনিকরা অনেক সময় তাদের ইতলাক ফাটকাবাজদের কাছে ১/৩ অংশ মূল্যে বিক্রয় করে দিত এবং শেষোক্তরা যে সব ইকতার থেকে ইতলাক পেত সেখান থেকে ইতলাকের মাত্র অর্ধেক মূল্য আদায় করতে সক্ষম হ'ত।

সুলতান ফিরোজ তুঘলকের সময় উত্তরাধিকারীত্বের গুরুত্বদান করা হয়েছিল। আফিফ মৃতব্যাক্তির উত্তরাধিকারীর প্রতি ফিরোজের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। ফলে দেখা যেত যে, একই ইকতা বংশপরম্পরায় একই পরিবারের লোকেরা উপভোগ করে' হন। ওয়াজিবের মারফতে এই নীতির প্রচলনের ফলে একজন সৈনিকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বা পুত্রের অবর্তমানে জামাতা অথবা এইরূপে কোন নিকট সম্পর্কের উত্তরাধিকারীর অভাবে ক্রীতদাস এবং বিধবারাও উত্তরাধিকার লাভ করতেন।

সৈয়দ ও লোদী সুলতানদের আমলে ইকতা প্রথা

দিল্লীর সিংহাসনে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের উত্তরাধিকারীদের পক্ষে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন সম্ভবপর হয়নি। তারিখ-ই-মুবারক শাহীতে উল্লিখিত হয়েছে সুলতান মুবারক শাহ (১৪২১-৩৪ খ্রীঃ) লাহোরের ইকতা ১৪২১ সালে একজন অভিজাতকে হস্তান্তর করার সময় তৎসহ দুই হাজার অশ্বারোহী তাঁর অধীনে রেখেছিলেন। ইকতার দায়িত্বের সঙ্গে এইযুগেও সৈন্যবাহিনী পোষণের দায় গ্রহণ করতে হ'ত বলে মনে হয় এবং এক ইকতা থেকে অন্য ইকতায় বদলী করার দৃষ্টান্তও এই সময় বিরল নয়। এই ধরনের বদলীকে ব্যতিক্রমী ঘটনার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় ইকতা উত্তরাধিকারী সূত্রে

www.pathagar.com

পাওয়া যেত। ১৪৩০ সালে খিজির খানের অধীনে প্রায় ত্রিশবৎসর বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করার পর সৈয়দ সেলিমের মৃত্যু হয়। এই সময় মধ দোয়াবে বহু পরগণা ও ইকতা এবং তবরহিন্দের দুর্গ তাঁর শাসনাধীনে ছিল। এছাড়া সুলতান মুবারকশাহ তাঁকে সরসূত জেলা ও আমরোহার ইকতা দিয়েছিলেন। সৈয়দ সেলিমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের এই সকল স্থান দেওয়া হয়েছিল।

লোদী সুলতানদের আমলে (১৪১১-১৫২৬ খ্রীঃ) এই ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। কেবলমাত্র সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সামান্য হেরফের করা হয়েছিল। এই সময় থেকে ইকতা শব্দটি অবলুপ্ত হয় ও তার স্থলে সরকার ও পরগনা প্রভৃতি নামের প্রচলন হয়েছিল। এই নামগুলি রাজ্যের এলাকার বিভাগকে নির্দেশ করত। প্রত্যেক সরকারের কতকগুলি পরগনা বিভক্ত ছিল। কোন কোন অভিজাতের এক্তিয়ার সরকার নামে পরিচিত ছিল। যেসব পরগনা সরকারের বা প্রাক্তন ইকতার অধীন ছিল তাদের সেই অভিজাতের সরকার বলে ধরা হত। প্রত্যেক সরকারের একটি 'জমা' বা আনুমানিক রাজস্বের হিসাব ছিল। এই আনুমানিক রাজস্ব প্রতিটি সরকার যে অভিজাত বা আমিরকে দেওয়া হত তাকে সেই সরকারের সামরিক ও অন্যান্য আয়ব্যয় ও দায়িত্বর বিষয়ে সচেতন করে দিত।

সরকারের ভারপ্রাপ্ত আমিররা অনেক ক্ষেত্রে এই আনুমানিক আয় অপেক্ষা অধিক রাজস্ব সংগ্রহে সক্ষম হ'ত। সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীঃ) এই অতিরিক্ত আয় দাবি করতেন না বলে সুনাম অর্জন করেছিলেন। এইসব মুখ্যগ্রহীতারা তাঁদের হস্তে প্রদত্ত এলাকার বা পরগণার অংশ আবার স্ব স্ব অনুচরদের মধ্যে বিতরণ করতেন এবং এইসব অনুচররা নিজেদের এলাকার থেকে কিছু অংশ সৈন্যদের বেতন দেওয়ার জন্য ভাগ করে দিতেন। লোদী আমলে ইকতার উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন ইকতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলি বিনষ্ট হয়নি এবং মুঘলদের কাছে এই বৈশিষ্ট্যগুলি হস্তান্তরিত হয় যার ভিত্তিতে শেষোক্তরা তাঁদের জাগীর প্রথার প্রসার করেছিলেন।

ইকতা প্রথার মধ্যে সামন্ততন্ত্রের বীজ উপ্ত ছিল কি না এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ রাজধানীর কাছাকাছি এলাকায় সরাসরি কেন্দ্রের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এছাড়া প্রতিটি পরগণায় সরকারী কর্মচারীরা কৃষকের সংস্পর্শে আসতেন। আলাউদ্দীন খলজী গ্রামের হিসাবরক্ষক বা পাটোয়ারীর খাতার থেকে রাজস্ব আদায়ের হিসাব গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং উদ্বৃত্ত রাজস্ব কেন্দ্রের খাজাঞ্চিখানায় জমা দেবার নির্দেশ কঠোরভাবে চালু করেছিলেন। পাটোয়ারী ছাড়া রাজস্ব আদায় করা ও তার হিসাবরক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ও দুইজন নথিলেখক,—একজন ফার্সী ও একজন হিন্দি ভাষায়, নিয়মিত কেন্দ্রকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের খবরা-খবর সম্পর্ককে সুলতানকে অবহিত রাখতেন। গ্রাম্য প্রধানরা খুট, মুকদ্দম ও চৌধুরীরা গ্রামাঞ্চলের প্রধান কর্মচারী ছিলেন।

ইকতা প্রথার মাধ্যমে রাজস্বের আয়ে ও বন্টনের যে ব্যবস্থা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল তাতে মুক্তি বা ইকতাদারদের রাজস্ব আদায় নিজস্ব বেতন ও সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের খরচ ব্যতীত সমস্ত উদ্বৃত্ত রাজস্ব কেন্দ্রে প্রেরণ করার নিয়ম ছিল। সুলতান আলাউদ্দীনের সময় এ বিষয়ে যাতে কোন গাফিলতি না হয় তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। ইকতা যাঁরা লাভ করতেন তাদের একস্থান থেকে আরেক স্থানে বদলী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অতএব জমিদারীর মালিক বা ভূস্বামীদের মত তাদের ক্ষমতা বা প্রভাব কোন একটি বিশেষ স্থানের উপর স্থায়ী হবার আশা প্রায় ক্ষেত্রেই ছিল না। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় রাজস্ব আদায়ের ভার যাদের দেওয়া হত তাদের সৈন্যবাহিনীর দায়িত্বভার না দেওয়ার রীতি অনেক ক্ষেত্রে চালু ছিল। এইসময় সৈন্যবাহিনীর জন্য আলাদা করে সেনাধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

বাস্তবে দেখা যায় যে, কেন্দ্রে সরকার দুর্বল হলে বিকেন্দ্রীকরণ শক্তি স্বাভাবিকভাবেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। ইকতার ক্ষেত্রে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। যখনই দিল্লীর সিংহাসনে কোন দুর্বল সুলতান রাজত্ব করতেন তখনই সেই সুযোগে অনেক ইকতার অধিকারীরা স্বাধিকার কায়েম করার জন্য বংশানুক্রমিকভাবে ইকতা দখলে রাখার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকতেন। এইভাবে ইলতুৎমিসের দুর্বল বংশধরদের রাজত্বকালে দোয়াব অঞ্চলে ইলতুৎমিসের অশ্বারোহীবাহিনীর যে সকল ব্যক্তি ইকতা উপভোগ করতেন তাঁরা ও তাঁদের বংশধররা নিজেদের অধিকার উত্তরাধিকারী সূত্রে কায়েম করেছিলেন। এমনকি গিয়াসউদ্দীন বলবনও এই শামসী অশ্বারোহীদের সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাধান করতে সক্ষম হননি এবং তিনি একটি আপোষরফার মারফতে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে শামসী অশ্বারোহীদের বংশধরদের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

সুলতান ফিরোজশাহ্ তুঘলকের আমলে ও তাঁর উত্তরসূরীদের রাজত্বকালে সুলতানী শাসনের শেষপর্বে ইকতার অধিকারকে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার বলে অনেকক্ষেত্রেই স্বীকৃতি দান করা হয়েছিল। সুলতান ফিরোজশাহ্ তুঘলক কেবলমাত্র পুত্র বা অন্য বংশধরদের নয় এমনকি উত্তরাধিকারীর অভাবে ক্রীতদাসেরও ইকতার উপর দাবি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এইভাবে ভূমিরাজস্ব আদায়কারীরা ক্রমে সামন্ত ও আধা সামান্তদের মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগলাভ করেছিলেন। এইজন্য কোশাম্বী মন্তব্য করেছেন যে, ''Ultimately Firuz Tughlaq yielded to feudalism from below, and ruled without rebellion till nearly the end of his reign.* ইরফান হাবিবের মতে সুলতানী আমলে এই ব্যবস্থা কোন সামাজিক বিপ্লব নয়, একে কৃষির ক্ষেত্রে শোষণ ব্যবস্থার নবরূপায়ণ বলা যায়। এই শোষণ ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে এক নাগরিক পরগাছা জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছিল। দাস-শ্রমের নাগরিকদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। ফিরোজশাহ্ তুঘলকের রাজত্বকাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এসেছিল সে সম্পর্কে হাবিব মন্তব্য করেছেন যে, 'It united political power with economic power more fully than ever before vesting the control over the bulk of the surplus in the hands of a ruling class whose composition was determined not by inheritence but formally by the will of the sovereign.'** হাবিবের মতে কৃষকের অবস্থা এই ব্যবস্থায় আধা-ভূমিদাসের (semi-serf) ন্যায় হয়েছিল। অতএব একে সামন্ততান্ত্রিক বলে মনে হতে পারে আবার ক্ষমতার প্রচণ্ড কেন্দ্রীকরণ থেকে একে 'প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র' (oriental dspotism) বলা যায়। মধ্যযুগের ভারতের অর্থনীতি এই অর্থনীতিতে নাগরিক জীবনযাত্রার বিকাশ আরেকটি বৈশিষ্ট্য। মুঘলযুগে এই সব বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল এবং আরো বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু এই সূত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে মধ্যযুগের ভারতে কর্ষণযোগ্য ভূমির বাহুল্য থাকায় কৃষক অতিরিক্ত শোষণ বা অত্যাচারের সম্মুখীন হলে চাষাবাদের জন্য পুরাতন কৃষির জমি ত্যাগ করে নয়া আবাদের পত্তন করতে পারত। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের রাজস্ব হ্রাস ও আর্থিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ছিল। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের সময় দোয়াবে কৃষক বিদ্রোহ এই ধরনের ঘটনার অন্যতম উদাহরণ। এইজন্য বলবন স্বীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে রাজস্ব সম্পর্কে মধ্যপন্থী নীতি অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছিলেন। বারানী কৃষককে রাষ্ট্রের খাজাঞ্চি খানার খাজাঞ্চি বলে উল্লেখ করেছেন। স্বভাবতই এই রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রয়োজনে সুলতানরা কৃষকের ও কৃষির স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং মুক্তি ও রাজস্ব আদায়কারীদের অতিরিক্ত শোষণ বন্ধ করতে তৎপর ছিলেন। সুলতানী আমলে

---

* D D Kosambi, *An Introduction to the study of Indian History* (2nd Ed.), পৃঃ-৩৩৭।

** 'Economic History of the Delhi Sultanate', *Indian Historical Review*, Vol. IV, No.2, Jan 1978.

www.pathagar.com

মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারিগরী দক্ষতার উন্নতি হয়েছিল ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল।

রাজস্ব ও অন্যান্য কর

হিন্দুস্তানে সুলতানী আমলে যেসব সূত্রে রাজকোষে আয় বৃদ্ধি করা হ'ত তা সুন্নী আইনবিদরা যতদূর সম্ভব হানাফী মতের অনুসারে প্রবর্তন করেছিলেন। ভারতে তুর্কী শাসকরা গজনীর সুলতানদের উত্তরসূরী হিসেবে এদেশেও এই পদ্ধতি অনুসরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। শরিয়ত অনুসারে সুলতানী আমলে রাষ্ট্রের আয়ের ভিত্তি নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এইগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কৃষিজ উৎপাদনের উপর কর যাকে খরাজ ও উশর নামে উল্লেখ করা হয়; দ্বিতীয়তঃ, জিম্মি বা ইসলামিক রাষ্ট্রে অমুসলমানদের নিকট সুরক্ষার বিনিময়ে প্রাপ্য মাথাপিছু কর বা জিজিয়া; তৃতীয়তঃ, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ের ফলে লব্ধ লুণ্ঠিত ধনের এক পঞ্চমাংশ যা খামস্ নামে পরিচিত এবং চতুর্থতঃ, মুসলমানদের থেকে আদায়ীকৃত আয়করকে জাকৎ নামে অভিহিত করা হত। শেষোক্ত কর যদিও রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত হত তাহলেও এই কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ কেবল বিশেষ কতকগুলি ব্যাপারে ব্যয় করা যেত। কারণ, এই কর মুসলিম প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করে মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যই ব্যয় করা হতো। মধ্যযুগে ভূমি রাজস্বই ছিল রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান সূত্র। ভূমি-রাজস্বর ব্যাপারে খরাজ ও উশর এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা সম্ভবপর হয়নি। শেষোক্ত কর ছিল মুসলিমদের অধীন ভূমি থেকে উৎপাদনের অথবা প্রাকৃতিক জলসম্পদে সমৃদ্ধ ভূমির উৎপাদনের উপর এক দশমাংশ রাজস্ব। কিন্তু খরাজ ও উশর-এর মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা বেশীদিন সম্ভব হয়নি কারণ অমুসলমানরা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। ফলে তাদের জমিও উশর-এর আওতায় গৃহীত হয় এবং মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে ভূমি-রাজস্বের পার্থক্য বজায় রাখার সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠে। কালক্রমে মুসলমান ও অমুসলমান সকলের কাছ থেকে আদায়কৃত ভূমি-রাজস্বের প্রতি খরাজ শব্দটি প্রযোজ্য হয়ে পড়েছিল।* বলবন তাঁর পুত্র বুঘর খাঁকে এসম্পর্কে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার থেকে অনুমান করা যায় যে, খরাজ আদায়ে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল সেটা নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী নির্ধারিত হত। কারণ, বলবন বলেছিলেন, 'প্রজাদের কাছ থেকে খরাজ আদায়ের সময় মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে খুব বেশী বা খুব কম আদায় করা চলবে না'। আলাউদ্দীন খলজী এসম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা সুবিদিত। সুলতান বিদ্রোহের আশঙ্কায় ও রাজকোষে আয় বৃদ্ধির জন্য দোয়াবে উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ রাজস্ব দাবি করেন।

জিজিয়া বা মাথা পিছু কর (Poll-tax) কেবলমাত্র অমুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা হত। যাঁরা জিজিয়া দিতেন তাঁদের 'জিম্মি' (Zimmi) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জিম্মিদের সামরিক কাজ থেকে অব্যহতি দেওয়ার নিয়ম ছিল। যেসব কারণে জিজিয়া অমুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা হ'ত তা হল, (১) জাকৎ থেকে তাদের অব্যহতি দান, (২) বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণ থেকে মুক্তি, (৩) স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধে নিজেদের

---

* A. B. M. Habibullah এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, "In the land revenue the distinction between Khuraj and Ushr- the latter being a tax of !/10th of the produce of land held by the Muslims or watered by natural means- could not be maintained when non-Muslims began to accept Islam in large numbers were allowed to retain their lands, so that, at an early date of the history of Islam, the Khara and had come to be applied both on Muslim and non-Muslim holders." *Foundation* পৃঃ ২৩২।

www.pathagar.com

প্রচলিত ধর্ম ও রীতি অনুযায়ী মীমাংসার অধিকার, (৪) জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষার নিশ্চয়তা লাভ। জিজিয়া যে হারে আদায় করা হ'ত তা দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, সন্ধি ও চুক্তির মারফতে অনেক সময় জিজিয়ার জন্য একটি হার নির্ধারিত হত। দ্বিতীয়তঃ, বিজিত অঞ্চলের জনগণের উপর ইমাম জিজিয়া আদায়ের যে হার স্থির করতেন তার উপর ভিত্তি করতে এই কর উশুল করার বিধি ছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাধারণত ধনীদের বৎসরে ৪৮ ডিরহাম এবং যারা ধনী নয় অথচ সচ্ছল তাদের ২৪ ডিরহামের অধিক জিজিয়া দিতে হতো না। দরিদ্ররা বৎসরে ১২ ডিরহাম জিজিয়া দিত। জিজিয়ার আওতায় পড়ত না শিশু ও নারী, উন্মাদ ও শারীরিক দিক দিয়ে পঙ্গু ব্যক্তি, বৃদ্ধ ও অন্ধরা এবং কর্মবিহীন দরিদ্ররা। অধ্যাপক হোডিভালার মতে, সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক যখন ব্রাহ্মণদের উপর জিজিয়া কর বসানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি যে হারে কর আদায়ের হুকুম দেন তা সর্বনিম্ন হারের থেকেও কম। এসম্পর্কে হোডিভালা মন্তব্য করেছেন যে, সুলতান ব্রাহ্মণদের থেকে যে ১০ তংকা করে আদায় করেন তার প্রতিটির মূল্য ছিল মাত্র ৫০ জিতল।*

কিন্তু ধনী, সচ্ছল ও দরিদ্রের পার্থক্য কি ভাবে নির্ধারিত হবে এসম্পর্কে মতভেদ ছিল। অনেকের মতে যাঁরা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কাজ করত তাদের দরিদ্রর পর্যায় ফেলা যায়; যারা বিত্ত থাকা সত্ত্বেও কাজ করে তাদের সচ্ছল বলা যায় এবং যাদের কর্মবিহীন অলস জীবনযাপন করার আর্থিক ক্ষমতা আছে তাদের ধনীর পর্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হ'ত। আবার অনেকে অভিমত পোষণ করতেন যে, যাদের জীবনধারণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট বিত্ত সবসময় জোটে না তাদের দরিদ্র, যাদের জীবনযাত্রার জন্য যা প্রয়োজন সেরূপ বিত্তের জোগান আছে তারা মধ্যবিত্ত ও শেষোক্তদের থেকে অবস্থাপন্নরা ধনী।**

ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তব বলেছেন যে, কোন কোন আধুনিক লেখকদের মতে, জিজিয়া একটি ধর্মনিরপেক্ষ কর এবং অমুসলমানদের কাছ থেকে এই কর আদায় করা হত কারণ, তাদের সামরিক বিভাগের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হ'ত। আর মুসলমানদের কাছ থেকে জাকৎ আদায় করা হ'ত। শ্রীবাস্তব তাঁর Sultanate of Delhi গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, ''As Jizya was not charged from the Muslims and as there was no fixed rule that its proceeds should be spent for religious purposes only, it was included by the Muslim jurists among the secular taxes. The view that Jizya is a secular tax on the basis of the above classification is evidently untenable.' ১৫৬৪ সালে আকবর জিজিয়া তুলে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। আওরঙ্গজেব পুনরায় জিজিয়া আদায়ের ব্যবস্থা বহাল করেছিলেন।

কিন্তু অধ্যাপক হাবিবুল্লাহর মতে, একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, জিজিয়া শব্দ কেবলমাত্র মাথাপিছু দেয় কর (capitation tax) হিসেবে বর্তমানে অনেকে বা পরবর্তী অনেক লেখকরা যেভাবে ব্যাখ্যা করেন তা বিশ্বাস করার ভিত্তি নাই।*** আবার ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের মত গোঁড়া সুলতান সব অমুসলমানদের 'জিজিয়া'র আওতায় আনা কর্তব্য এই

---

* Studies in Indo-Muslim History, by S. H. Hodivela, পৃঃ ৩৩৬-৩৭. The Sultan did not demand from them ten tankas of higher value or denomination each of which had an exchange value of 64 Jitals, but lighter pieces of lower denominadtionm, valued at only fifty Jitals each.

** Muhammadan theories of finance by Aghnides, পৃঃ ৪০৪।

***''...there seem good reasons to believe that the term Jizya was not used exclusively in the sense of capitation tax, as is understood today or as interpreted by later writers.'' Foundadion of Muslim Rule in India, পৃঃ ২৩৩।

www.pathagar.com

ধারণার বশবর্তী হয়ে ব্রাহ্মণদেরও এই কর দিতে বাধ্য করেছিলেন। ইতিপূর্বে তাদের জিজিয়া দিতে হত না। জিজিয়ার জন্য অনেকে ধর্মান্তকরণের ব্যাপারে উৎসাহ দিতে রাজি ছিলেন না।*

•

অন্যান্য কর

অন্যান্য করের মধ্যে খামস্ (Khams) যা যুদ্ধের লুণ্ঠিত অর্থের এক-পঞ্চমাংশ ছিল। এই ব্যাপারে সুলতানরা শরিয়তের বিধি মেনে চলতেন একথা বলা যায় না। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক মন্তব্য করেছেন যে, ইতিপূর্বে যুদ্ধে লুণ্ঠিত অর্থের ৪/৫ অংশ সরকারের জন্য রেখে ১/৫ অংশ বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করার প্রথা চালু ছিল যা যুদ্ধে লুণ্ঠিত ধনসম্পদের বিভাজনে শরিয়তের বিধানের বিপরীত বলে গণ্য করা যায়। ১২৫৯ সালে উলুঘ খান মেওয়াটিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেলব্ধ ৩০,০০০ তংকার সবটাই খাজাঞ্চিখানায় প্রেরণ করেছিলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভেলুণ্ঠিত অর্থও রাষ্ট্রের খাজাঞ্চিখানায় সামিল করা হত। কুবাচার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইলতুৎমিস যে লুণ্ঠিত ধন পেয়েছিলেন তার সবটাই বাজেয়াপ্ত করেন। ত্রয়োদশ শতকে যুদ্ধবিগ্রহ ও শত্রুকে ধ্বংসের জন্য সামরিক অভিযানের সংখ্যাধিক্যের কারণে প্রচুর লুণ্ঠিত ধনে খাজাঞ্চিখানা পরিপূর্ণ হবার সম্ভাবনা ছিল। ১২৩৩ সালে চণ্ডেলা ও অন্যান্য হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলশ্রুতিতে লুণ্ঠিত অন্যান্য হিন্দু অর্থের ১/৫ অংশই হয়েছিল প্রায় ২৫ লক্ষ তংকার কাছাকাছি। জাকৎ ছিল ধর্মীয় কর। মামলুক সুলতানী যুগে এই করের ক্ষেত্রে শরিয়তের নির্দেশ মানা হত কিনা জানা যায় না। এই কর থেকে অর্জিত অর্থ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য বা উলেমাদের বৃত্তির জন্য বা ধর্মীয় সংগঠনের বৃত্তিদানের জন্য ব্যবহৃত হত। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় সীমানা পার হয়ে আসা পণ্যের উপর জাকতের হারে শুল্ক আদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে সাধারণভাবে শুল্ক আদায়ের কথাই বলা হয়েছে কারণ, অমুসলমানদের ক্ষেত্রে এই হার দ্বিগুণ করা হ'ত।

এছাড়া আরো বিভিন্ন কর আদায় করা হত। এইসব করগুলির মধ্যে শরিয়তের বিধান বহির্ভূত ও বেআইনী যেসব কর আদায় হ'ত সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক অবলুপ্ত করেছিলেন। এইভাবে যেসব কর অবলুপ্ত হয়েছিল তার একটি তালিকা সমকালীন ঐতিহাসিকদের লেখায় পাওয়া যায়। কিন্তু সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলক খাল খনন ও সেচের উন্নতি করে যেসব কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করেছিলেন তাদের উপর নিয়মানুসারে নতুন কর বসান। এছাড়া খনি ও মাটির নিচে প্রাপ্ত ধনসম্পদ, উত্তরাধিকারবিহীন সম্পত্তি, আবগারি কর ও শুল্ক ইত্যাদি সরকারের প্রাপ্য ছিল। সুলতানকে দেয় নজরানা এবং অধীন রাজান্যদের প্রাপ্য কর ও খালিসা থেকে প্রাপ্ত আয় রাজস্ব বৃদ্ধি করত।

কৃষি অর্থনীতি ও কৃষিকর

সুলতানী শাসনে অবস্থা স্থিতিলাভ করলে কৃষি অর্থনীতি থেকে উদ্বৃত্ত আয় রাজকোষের আয়ের প্রধান সূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সূত্রগুলির মধ্যে একটি ছিল ইকতা, যার মাধ্যমে শাসকশ্রেণী যাবে কৃষি উৎপাদনের উদ্বৃত্ত নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিত। এছাড়াও সুলতানের সরাসরি শাসনাধীন খালিসা জমি ও হিন্দু রাজাদের দেয় কর থেকে আয় রাজকোষে জমা হত ও সুলতানের ও কেন্দ্রের নানা প্রয়োজন মেটাত। বিভিন্ন কারণে উলেমাদের ও খানকার ব্যয়বহন করার জন্য এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ওয়াকফ জমি দান করা

* সুলতান আলাউদ্দীন খলজী তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুরকে দক্ষিণভারতে জিজিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কারণ, জিজিয়া রাজকোষে আয়ের একটি অন্যতম সূত্র ছিল।

www.pathagar.com

হত। মাদ্রাসা, মসজিদ, সমাধিস্থল ও কবরখানা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে খাজাঞ্চিখানা ব্যয়বরাদ্দ করত।

ঘুরীর বিজয়ের পর উত্তরভারতে যখন সুলতানী শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হয় তখন রাজস্ব আদায়ের যেসব প্রচলিত প্রথা চালু ছিল তার বিশেষ কোন পরিবর্তন না করে তৎসহ নবপ্রতিষ্ঠিত তুর্কী শাসকদের দাবি যুক্ত হয়েছিল। কালক্রমে সুলতানী শাসনের শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রথিত হলে ইসলামিক শাসনের আদর্শের ভিত্তিতে কর সংগ্রহ করে রাজস্ব বৃদ্ধি করার পদ্ধতি, যার সঙ্গে তুর্কী শাসকশ্রেণী অভ্যস্ত ছিলেন, তা অনুকরণ করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এসম্পর্কে কোন নথিভুক্ত বিবরণ পাওয়া যায় না। সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর আমলে উত্তরভারতের একটি সুবিশাল এলাকা জুড়ে একই ধরনের করব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়।*

সুলতান আলাউদ্দীন খলজী রাষ্ট্রের আয় যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করেছিলেন ও প্রজাদের হাতে অতিরিক্ত ধন সঞ্চয়ের পথ রুদ্ধ করেছিলেন। প্রথমত বারানীর বক্তব্য অনুসারে তিনি কৃষকদের উপর ত্রিবিধকর চাপান। এইগুলি হল খরাজ (একে 'খরাজ-ই-জিজিয়া' বলা হত) অর্থাৎ কৃষিকর, চরাই বা পশুচারণ কর, ও ঘরাই বা গৃহকর। দ্বিতীয়তঃ চাষের, জমি মাপজোক করে উৎপাদনের অর্ধেক রাজস্ব হিসেবে দিতে হত। Cambridge Economic History of India–তে এই বিষয়ে মন্তব্য করে বলা হয়েছে যে, "The land cultivated under each crop was measured; the yeild was estimated per unit of area (biswa); and then by multiplying the area by the yeild of the produce was to be worked out. ** এইভাবে উৎপাদনের অর্ধাংশ প্রতিটি কৃষকের কাছ থেকে, কারো প্রতি কোন বিশেষ অনুগ্রহ না করে, কঠোরভাবে আদায় করা হত। বারানী বলেছেন, রাজস্ব আদায় কঠোরভাবে করার নির্দেশ ছিল। সেইজন্য কৃষকরা তাদের উৎপাদন বিক্রি করে নগদে রাজস্ব দিত। অন্যত্র বারানী বলেছেন যে, কৃষকরা শস্যের ভাগ থেকে দিত। কিন্তু শেষোক্ত প্রকারে রাজস্ব সংগ্রহ দিল্লির নিকটবর্তী দোয়াবে খালিসা জমির ক্ষেত্রে সম্ভবত প্রযোজ্য। সেখান থেকে খাজনা রাজকীয় কোষাগারে জমা করার প্রথা ছিল। আবার আরেক জায়গায় এই লেখক বলেছেন যে, দোয়াবের রাজস্ব সৈন্যদের বেতনদানে ব্যয় করা হত। অতএব মনে হয়, আলাউদ্দীন শস্য উৎপাদনের ভাগমাত্র কয়েকটি স্থানে করেছিলেন যাতে দুর্ভিক্ষের সময় বা দেশে শস্য উৎপাদন কম হলে রাজকীয় গুদামে সংগৃহীত শস্য থেকে অভাব পূরণ করা যায়।***

তৃতীয়তঃ সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর প্রবর্তিত রাজস্ব সংস্কারে ক্ষমতাশালী মধ্যসত্বভোগীরা যাতে তাদের দেয় কর দুর্বলদের উপর চাপিয়ে দিতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হত। সুলতান আলাউদ্দীন খুট, মুকদ্দম, চৌধুরী প্রভৃতিদের কাছ থেকে প্রাপ্য আদায়ের উদ্দেশ্যে গ্রামের হিসাবরক্ষক বা পাটোয়ারীর হিসাবের খাতা পরীক্ষা করে সরকারের প্রাপ্য কড়ায়গণ্ডায় আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলক (১৩২০-৫) সুলতান আলাউদ্দীনের রাজস্ব ব্যবস্থাকে ঈষৎ পরিবর্তন করেন ও খুট, মুকদ্দমদের কিছুটা সুবিধা দান করেন। তিনি আলাউদ্দীনের নির্দেশ অনুসরণ করে খুট ও মুকদ্দমদের কৃষকের কাছ থেকে সেস (Cess) আদায়ে নিষেধ করেছিলেন; যার ফলে কৃষককে খরাজ সহ সেস দিতে হত না। খুট ও মুকদ্দমরা তাদের কৃষি ও গোধনের করের হাত থেকে রেহাই দিয়েছিল। এইভাবে সুলতান গিয়াসউদ্দীন যেসব কর্ষিত জমিতে ফসল হ'ত ও যেসব জমিতে ফসল পাওয়া যেত না উভয় ক্ষেত্রে কৃষকদের অতিরিক্ত

* ইকতা সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

** CEHI Vol I, পৃ: ৬১ দ্রষ্টব্য।

*** CEHI, Vol I, পৃ: ৬৩-৬৪।

www.pathagar.com

সেসের হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। পরবর্তী সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের (১৩২৫-৫১) আমলে সমগ্র সাম্রাজ্য গুজরাট থেকে বঙ্গদেশ, গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের গ্রামগুলির ন্যায়, কঠোর কর সংগ্রহের ব্যবস্থার আওতায় আনা হল। দ্বিতীয়তঃ, সুলতান সমগ্র এলাকার কৃষিকর অতিরিক্ত বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বারানীর মতে, চাষীদের উপর অতিরিক্ত সেস বসানো হয়েছিল। ইয়াহিয়া বিন আহমেদ তাঁর গ্রন্থ তারিখ-ই-মুবারক শাহীতে বলেছেন ৩টি প্রধান কর চরাই, ঘরাই ও জমির মাপজোকের পর উৎপাদিত ফসলের মূল্যের উপর কর কঠোরভাবে আদায় করা হত। এর ফলে দিল্লীর উপকণ্ঠে ও দোয়াবে বিরাট কৃষক অভ্যুত্থান দেখা দেয়। কারণ, দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও সুলতান কর আদায়ের কঠোরতা হ্রাস করেননি। সমকালীন লেখনী বিশেষতঃ বারানীর বক্তব্য থেকে অনুমান করা হয় যে, সুলতান গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ রাজস্ব হিসাবে আদায় করার জন্য যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তার ফলে কৃষকরা বিদ্রোহ করে। উচ্চবিত্ত কৃষকরা অর্থাৎ খুঁট ও মুকদ্দমরা তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই বিদ্রোহ দমনে সুলতান সৈন্য প্রেরণ করলে কৃষকরা জঙ্গলে আশ্রয়গ্রহণ করে। সমগ্র দোয়াব যাকে দিল্লীর শস্যভাণ্ডার বলা হত সেখানে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও চাষাবাদের অভাবে শস্য ও পণ্যের মূল্য আকাশস্পর্শী হয়ে পড়ে। ১৩৩৪-৩৫ সালে দোয়াবে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয় এবং এই দুর্ভিক্ষ প্রায় সাতবৎসর স্থায়ী হয়েছিল।* সুলতান দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। চাষাবাদের উন্নতির জন্য তিনি কৃষিঋণ দান করেন ও সেচের জন্য কুয়ো খনন করেন। কৃষির উন্নতির জন্য সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক একটি নতুন বিভাগ খুলেছিলেন। এই বিভাগের নাম দেওয়া হয় দেওয়ান-ই-আমিরকোহি। কিন্তু এর ফলে বিশেষ লাভ হয় নাই।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-৮৮) রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ফিরোজ তুঘলক পূর্বতন আমলের তাকাভি ঋণ তুলে দিয়ে ও রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজস্ব আদায়কারীদের উপর নির্যাতন প্রথা বন্ধ করে পরিস্থিতির উন্নতি করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় নথিপত্র পরীক্ষা করে খালিসা জমির রাজস্ব স্থায়ীভাবে নির্ধারিত করেছিলেন। তৃতীয়তঃ, সুলতান ফিরোজ কোরানের অনুমোদিত নয় এরূপ ২৪টি কর অবলুপ্ত করেছিলেন। এসবের মধ্যে ছিল পশুচারণ বা চরাই ও প্রতিটি গৃহের উপর কর। কেবলমাত্র খরাজ, উশর, খামস, জাকৎ ও জিজিয়া আদায় করা হত এবং যেসব জমি সরকারি সেচখালের জলে উপকৃত হত তাদের থেকে হক-ই-সিরাব বা সেচকর আদায় করা হত। সেচের সুবিধার জন্য সুলতান ফিরোজ পাঁচটি খাল খনন করেছিলেন ও অজস্র কূপ খনন করেছিলেন। উন্নত ধরনের বীজ বপণ, আখের চাষ, তৈলবীজ, পোস্তবীজ ইত্যাদির চাষে তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন। উদ্যান সৃষ্টি, ফল ও ফুলের গাছ রোপণ প্রভৃতি কাজে তাঁর আগ্রহ ছিল। ফলে একদিকে যেমন রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে অপরদিকে জনগণের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ফিরোজ তুঘলকের শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি ছিল সামন্ত ও আধাসামন্ত শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি। সুলতান স্বয়ং রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন এলাকা ইজারা দান করেন। ইকতার দলিল দালালের মারফতে উচ্চহারে বিক্রয় করা হ'ত। তিনি সকল শ্রেণীর অমুসলমানদের জিজিয়া দিতে বাধ্য করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। ফিরোজ তুঘলকের পূর্বে ভূমিকরকে জিজিয়া বা খরাজ জিজিয়া বলে উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

* ঐ, Vol. 1, পৃঃ ৬৩-৬৪।

www.pathagar.com

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের পরবর্তীকাল

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের পরবর্তীকালে রাজস্ব বিষয়ক ও কৃষিকর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। এইযুগে সম্ভবত কৃষকের কাছ থেকে ভূমি-রাজস্ব পুরোপুরি আদায় করা হ'ত। কিন্তু অধিকাংশ সময় করআদায়কারী ছিল হয় কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা কোন বংশানুক্রমিক ভূমির মালিক। দিল্লী থেকে কোন কেন্দ্রীয় শাসকের নিযুক্ত কর্মচারীর ক আদায়ের উদাহরণ এযুগে বিরল। পরবর্তীকালে প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে লোদী সুলতানদের আমলে যখন পণ্যমূল্য অত্যন্ত কম ছিল সেইসময় রাজস্ব নগদে না দিয়ে উৎপন্ন পণ্যে দেবার রীতি স্বীকৃত হয়েছিল। সমগ্র দুনিয়াতে এই যুগে রৌপ্যের অভাবে মুদ্রামূল্য হ্রাস পেয়েছিল এই কারণে কৃষকদের পক্ষে নগদে রাজস্ব দেবার জন্য বাজারে যথেষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করা খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুলতান কৃষকদের এই অসুবিধা দূর করার জন্য ইকতার মালিকদের উৎপন্ন শস্যে রাজস্ব সংগ্রহের হুকুম দিয়ে তাদের দুর্দশা মোচনে সম্ভবত অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে নতুন পৃথিবী বা আমেরিকায় যাতায়াতের ও বাণিজ্যের রৌপ্য আমদানী শুরু হয়ে যাওয়াতে পরিস্থিতিতে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল সেইজন্য ফলে পুনরায় শেরশাহ সুরের (১৫৪০-৫) ও আকবরের আমল থেকে আবার রাজস্ব নগদে সংগৃহীত হতে থাকে।

মধ্যযুগের ধর্ম ও রাষ্ট্র

বর্তমান যুগে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে দাবি করে। কিন্তু মধ্যযুগে রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক ছিল অনেক বেশী ঘনিষ্ট। ইসলামের এদেশে আগমনের বহুপূর্বে তার ধর্মীয় অনুশাসনের কাঠামো জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তার বক্তব্য রেখেছে (যেমন অন্যান্য ধর্মেও দেখা যায়)। অধ্যাপক নুরুল হাসান বলেছেন যে, "ইসলামীয় আইন-ব্যবস্থা যাকে বলা হয় শরিয়ৎ, তাতে মানব-জীবনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়েই বক্তব্য রাখা হয়েছে।"*

ইসলামের সাংবিধানিক আইনে দুনিয়াকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। এই দুইটি ভাগ হল, দার-উল-ইসলাম বা ইসলামের ধর্মাবলম্বীদের বাসস্থল ও দার-উল-হারব বা অবিশ্বাসীদের দেশ। হিন্দুস্তানে মুসলিম প্রাধান্য স্থাপনের পরবর্তীকালে দিল্লীর সুলতানরা প্রায় সকলেই আব্বাসিদ খলিফাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেছেন এবং নিজেদের খালিফার ডানহাত বা সঠিক প্রতিনিধি বলে মুদ্রায় বর্ণনা করেছেন ও এইযুগে খালিফার নামে খুতবা পাঠ করেছেন।

সর্বপ্রথম বাগদাদের খলিফার ফরমান আদায় করে ইসলামিক জগতের সঙ্গে দিল্লীর সুলতানদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিলেন ইলতুৎ[illegible] খলিফার আনুগত্যের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নিয়ে তিনি ইলবারি তুর্কীশাসন হিন্দুস্তানে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ইলতুৎমিস ধর্মের নামে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করতে রাজি ছিলেন না। এইজন্য বিভিন্ন মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রধ্বংসকারী দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে পঙ্গপালের মতো মোঙ্গলবাহিনী খোয়ারজিমের সুলতান জালালউদ্দীন মাঙ্গবারানীর সন্ধানে হিন্দুস্তানের সীমানায় হানা দিলে ইলতুৎমিস ইসলামিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রক্ষার নামে খোয়ারজিমের শাহকে আশ্রয় দিয়ে দিল্লীর তুর্কীশাসনকে বিপন্ন করেননি।

ইলতুৎমিসের সমকালীন গৌড়ের স্বাধীন সুলতান গিয়াসউদ্দীন আয়াজ খলজীও বাগদাদের খলিফার স্বীকৃত পেয়েছিলেন ও তাঁর কাছ থেকে ফরমান এনেছিলেন। কিন্তু তার জন্য হিন্দুস্তানে খলিফার স্বীকৃত দুই সুলতান নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করেননি এবং

---

* মধ্যযুগের ভারত, রাষ্ট্র ও ধর্ম-সংক্রান্ত কিছু সমস্যা, সৈয়দ নুরুল হাসান, সম্পাদক অনিরুদ্ধ রায়, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোং, পৃ. ১।

www.pathagar.com

ইলতুৎমিসের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করার অপরাধে দিল্লীর সুলতান আয়াজকে আক্রমণ করে যুদ্ধে নিহত করেছিলেন। আবার সুলতান আলাউদ্দীনের পুত্র সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজী নিজেকেই খলিফা বলে ঘোষণা করেন।

মূলতঃ বাগদাদের খলিফার স্বীকৃতি সুলতানের তাজের একটি অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে ব্যবহার করাই ছিল লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আনুগত্য লাভের জন্য দিল্লীর সুলতানরা মুদ্রায় নিজেদের খলিফার ডানহাত বলে বর্ণনা করেছেন এবং খলিফার নামে খুতবা উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন যুগেও বাস্তব রাজনীতিতে খলিফার স্বীকৃতিতে সুলতানের ক্ষমতা বা প্রভাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন তারতম্য দেখা যেত কিনা এসম্পর্কে সন্দেহ করার কারণ আছে। উদাহরণস্বরূপ সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের শেষার্ধে বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রাক্তন আব্বাসিদ খলিফার এক বংশধর, যিনি মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নামে মুদ্রা বার করেন। অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর সকল মুসলমানই ১২৫৮ সালে মোঙ্গলদের আক্রমণে বাগদাদের শেষ খলিফা আল মুস্তাসিম চেঙ্গিজের পৌত্র হুলাগু খানের বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য খলিফার প্রাক্তন বংশধরের ফরমানের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন যাতে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ১৩৪৪ সালে মিশর থেকে প্রাক্তন আব্বাসিদ খলিফের বংশধরদের এক প্রতিনিধি হাজি সৈয়দ সরসরী খলিফার ফরমান নিয়ে দিল্লীতে উপস্থিত হলে তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয় বিদেশী পর্যটক ইবন বতুতা তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মারফতে প্রজা সাধারণের সুলতানের প্রতি সমর্থন লাভ করবেন বলে আশা করেছিলেন। রিজভী মন্তব্য করেছেন যে, 'The fact that the descendant has already dead was known to the Muslim elite but the Sultan counted on the support of Muslim masses in the country'.*

খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেও সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের পক্ষে কোন রাজনৈতিক ফয়দা তোলা সম্ভব হয়নি। আবার সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর পুত্র সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজী যখন নিজেকেই খলিফা বলে ঘোষণা করেছিলেন তারও কোন রাজনৈতিক ফলাফল বাস্তব পরিস্থিতির উপর পড়েনি।

এইজন্য মুসলিম সুলতানরা মুলুক বা রাজকীয় শক্তির উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্র স্থাপন করেছেন। জিয়াউদ্দীন বারানী তাঁর তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী ও ফতোয়া-ই-জাহান্দারীতে এই বক্তব্যের উপর জোর দিয়েছেন এবং সুলতানকে 'মর্তে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব' বলে উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে রিজভীর ভাষায় বারানীর বক্তব্যকে বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয় যে, 'In the interests of propagating God's word, enforcing the faith of Mohammad, annihilating the enemies of the faith, and their own self-preservation, Muslim Khalifas and kings were compelled to adopt the manners and customs of the great Iranian emperors.'

---

* S. A. A. Rigzvi, The Wonder that was India, Vol-II (Sioqwick & Jackon), পৃঃ-১৫৮-১৫৯। খলিফা ও সুলতানের সম্পর্কের বিষয়ে প্রখ্যাত ইমাম আল-গাজালীর (১০৫৮ সালে জন্ম), মত উল্লেখযোগ্য। তাঁর মত অনুসারে সুলতানের বাস্তবে সকল ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু তিনি খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নিদর্শন হিসেবে খুতবায়, শুক্রবারের প্রার্থনায় ও মুদ্রায় খলিফার নামোল্লেখ করবেন। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য Political thought in Medieval Islam (Cambridge University Press—1962), E.I. Rosenthal— পৃঃ ৪৩ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালে পুনরায় খলিফার ফরমান ও সম্মানসূচক পোষাক দিল্লীতে প্রেরিত হয়েছিল। এইসময় শাহজাদা ফতে খান ও উজীর খান-ই-জাহান ও খলিফার কাছ থেকে উপহার লাভ করেছিলেন। সৈয়দ ও লোদী বংশের যথাক্রমে প্রথম ও শেষ সুলতান খিজির খাঁ ও ইব্রাহিম লোদী ব্যতীত অন্যান্য সকলেই খলিফার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে কায়রোর আব্বাসিদ খলিফার দ্বারা আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের ফলে অটোমন সুলতান সেলিম (১৫১২-২০) খলিফার পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি মিশর জয় করেন এবং মক্কা ও মদিনা স্বদখলে রাখেন। ভারতের সুর বংশীয় সুলতানগণ অটোমন তুর্কী সুলতানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

উলেমাদের ভূমিকা

মধ্যযুগের শাসকশ্রেণীর মধ্যে যাঁরা শরিয়ত বিশেষজ্ঞ তাঁদের সাধারণত আহল-এ-কলম বা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এইসব উলেমা ছাড়া দরবেশ, সৈয়দ, পীর প্রভৃতিকেও বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য করা হত; কিন্তু প্রথমোক্তরাই ছিলেন এঁদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, উলেমারা সুলতানের সহযোগী ও পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করতেন ও বিচার বিভাগীয় ও ধর্মসংক্রান্ত উচ্চপদে নিযুক্ত হতেন। এই উলেমারা ও সৈয়দ প্রভৃতি গোঁড়া মুসলমান ধর্মমত ব্যাখ্যা করতেন ও সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং শিয়াদের বিরোধী ছিলেন। ইসলামের আইনে যে চারটি মতকে সুন্নীদের মতানুসারে ভাগ করা যায় তাহল, হানীফই শাফাই, হানবলি এবং মালিকি। এদেশের উলেমারা হানীফের আদর্শ অনুযায়ী বিধান দিতেন। উলেমাদের পাঠক্রম যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল তার মধ্যে ছিল মুসলিম শাস্ত্রবিধির বিভিন্ন দিক, আরবী বর্ণপরিচয়, হাদীস, কালান প্রভৃতি। স্বভাবতই জনসাধারণকে ধর্মপথে আকৃষ্ট করবেন বলে এঁরা কাজ করতেন এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত থাকায় শ্রেণী হিসেবে উলেমাদের গুরুত্ব ছিল অন্য কোন কারণে নয়। এইসব উলেমারা উদারমতাবলম্বীদের বিরোধী ছিলেন।

ইসলামের আদর্শে ইসলামিয় রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণ জিম্মি নামে অভিহিত হত। তারা জিজিয়ার বিনিময় ইসলামীয় রাষ্ট্রে জীবন, সম্মান, সম্পত্তি ও ধর্মীয় আচরণ পালনের জন্য রাষ্ট্রের সুরক্ষা লাভ করত। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে গোঁড়া উলেমাদের অনেকেই মনে করতেন যে, জিম্মিরা ইসলামীয় রাষ্ট্রে মুসলমানদের সমকক্ষ নয়। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা সুলতানকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে ভারতে তুর্কী বিজয়ের পরবর্তীকালে সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং দুই একটি স্থান ছাড়া অধিকাংশ অঞ্চলে জিম্মিরা সমগ্র হিন্দুস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব এই পরিস্থিতিতে উলেমাদের মত অনুসরণ করে গোঁড়া ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব মেনে চলা সম্ভবপর ছিল না। এই সম্পর্কে জিয়াউদ্দীন বারানী তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে বলবনের উক্তিতে সুলতান ইলতুৎমিসের একটি বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন। এই উক্তিতে বলা হয়েছে যে, 'সুলতানের পক্ষে ধর্মবিশ্বাস মেনে (দিনদারি) কাজ করা সম্ভব নয়। তার পক্ষে এটাই যথেষ্ট যদি তিনি ধর্মবিশ্বাস রক্ষা (দিন পানাহি) করতে পারেন।'* গিয়াসুদ্দিন বলবন (১২১৬-৮৬) সিংহাসনে আরোহন করার পর রাষ্ট্রের ব্যাপারে অমির ওমরাহ বা উলেমাদের প্রভাব বরদাস্ত করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর ধারণা অনুসারে সুলতান ছিলেন ঈশ্বরের ছায়ামাত্র। এইজন্য উলেমাদের ধর্মের

---

* মধ্যযুগের ভারত (কে. পি. বাগচি), 'মধ্যযুগের ভারতে রাষ্ট্র ও ধর্ম সংক্রান্ত কিছু সমস্যা', পৃঃ ৪-৫ থেকে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

ব্যাপারে প্রভাব সুলতানের সার্বভৌম ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারে না। সুলতান উলেমাদের অর্থলোভী বলে মনে করতেন। ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হিসেবে সকল বিষয়ে সুলতানের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতেন। এইজন্য ইরানীয় শাহদের অনুকরণে দরবারে চোখধাঁধানো জাঁকজমক ও সিজদা ও পায়বুস (অর্থাৎ সুলতানকে আভূম সেলাম ও পদচুম্বন) প্রভৃতি প্রথার প্রবর্তন করেন। এইসব উদাহরণ থেকে ও অন্যান্য ঘটনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সুলতানী আমলে উলেমাদের প্রভাব মেনে বা শরিয়তের নিয়ম অনুসরণ করে রাজ্যশাসন নয়, রাজ্যশাসন তবে 'জাহানদারির ভিত্তিতে অর্থাৎ রাষ্ট্রবিদ্‌দের চিন্তা ও বৈষয়িক জ্ঞানের ভিত্তিতে'।*

সুলতানী শাসনে সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কিত ধ্যানধারণা সাধারণত সিংহাসনের অধিকারীর মনোভাব এবং চতুর্পার্শ্বের পরিবেশের উপর নির্ভর করত। সুলতানের সার্বভৌম ক্ষমতার একটি দিক ছিল বাস্তব পরিবেশ যার দার্শনিক তথ্য তক্তেতাউসের মালিকের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'ত এবং স্বভাবতই তাঁরা স্বশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন অর্থাৎ মূলুক প্রতিষ্ঠিত করতেন। ফলে স্বৈরতান্ত্রিক সুলতানরা অধিকাংশ সামরিক শক্তির উপর আস্থা রাখতেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় শক্তিশালী আমির-ওমরাহের ও উলেমাদের কাজ ছিল সুলতানকে নানা বিষয়ে উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া। নানাভাবে এই সূত্রে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে তাঁরা প্রতিপত্তি বিস্তারের ও মত চালাতে সচেষ্ট হতেন। ধর্মের নামে উলেমারা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজেদের গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য মৌলবাদী মতকে প্রাধান্য দানের জন্য আগ্রহী ছিলেন।

তুর্কী শাসকগোষ্ঠী শাসিতের তুলনায় অনেক সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিলেন। নিজেদের মধ্যে সংহতি বজায় রাখার জন্য ইসলামের ঐক্যের প্রতি আবেদন ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং উলেমাদের সাহায্য গ্রহণ করে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হ'ত। এছাড়া শরিয়তের বিধান মেনে চলা সকল শাসকের পক্ষে আবশ্যিক ছিল। সুলতান রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে ফরমান জারি করতে পারতেন। কিন্তু ধর্মীয় আইন এবং এই সম্পর্কে সর্বসম্মত মতামত বা ইজমা-ই-উম্মত পরিবর্তন করার অধিকার তাঁর ছিল না। এই ধর্মীয় আইনের ব্যাখ্যার জন্য তাঁকে উলেমাদের উপর নির্ভর করতে হত।** উলেমাদের আসল কাজ ছিল হিন্দুস্তানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ব্যাপারে সঠিক নেতৃত্ব দান করা। কিন্তু এব্যাপারে বেশীরভাগ উলেমাদের ব্যর্থতা সমকালীন ইতিহাসে সুবিদিত। বিভিন্ন সুলতানরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুলতান কায়কোবাদকে উলেমারা রোজা পালনের কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন ও কোরানের বিধানের ইচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখা করেছিলেন। এইসব আলমদের কাছ থেকে বুঘরা খাঁ তাঁকে দূরে থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র যারা অর্থলোভ ত্যাগ করে শরিয়তের অনুসরণ করে তাদের কাছে ধর্ম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলকও উলেমাদের সম্পর্কে একই ধরনের অভিমত পোষণ করতেন। আমির খসরুর অভিমত ছিল, বিচারকার্যে নিযুক্ত উলেমা বা কাজিরা ইসলামীয় আইন সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন।*** মধ্যযুগের সুলতানী শাসনকে ধর্মীয় শাসন আখ্যা দেওয়া যায় কি? অর্থাৎ ইসলামের আগমনের পরে ভারতের মাটিতে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু হয়েছিল তাকে কি ধর্মীয় রাষ্ট্রের পর্যায় ফেলা যায় বা

* মধ্যযুগের ভারত (কে. পি. বাগচি), 'মধ্যযুগের ভারতে রাষ্ট্র ও ধর্মসংক্রান্ত কিছু সমস্যা', পৃঃ ৪-৫ থেকে উদ্ধৃত।

** এই বিষয়ে আলোচনার জন্য Khunda Baksh, Politics in Islam, পৃঃ ১১২-১১৫ দ্রষ্টব্য।

*** কে. এস. আশরফের হিন্দুস্তানের জন-জীবন ও জীবনচর্চা (পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা-৬) অনুবাদ Life & Conditions of the People of Hindustan, অনুবাদক তপতী সেনগুপ্ত, পৃঃ ৫৫-৬০ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা যায় কিনা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, মধ্যযুগের ইতিহাসবিদ্ কিছু লেখক ইসলামের আগমনের পর অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিশেষত হিন্দুদের দুর্দশার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, জিজিয়া কর দেওয়া সত্ত্বেও 'জিম্মি' বা অমুসলমানদের মধ্যযুগে সুলতানী শাসনের আমলে নিকৃষ্ট ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হত। এমনকি শিয়া মুসলমানরা নানাভাবে নির্যাতনের সম্মুখীন হতেন।

সুলতানী রাজ্যের নীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মীয় বলা যায় কিনা এসম্পর্কে সুলতান আলাউদ্দীন খলজী ও কাজি মুঘিসউদ্দীনের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ আলোকসম্পাত করে। এই আলোচনা প্রধানত চারিটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে হয়। প্রথমতঃ, কাজির মতে, হিন্দুদের প্রতি দমননীতি অবলম্বন করা শরিয়তের বিধান অনুযায়ী অনুমোদন করা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ, কাজি অপরাধীদের কঠোর ও অমানবিক দণ্ডদান ইসলামের বিধিলংঘনের সামিল বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তৃতীয়তঃ, কাজি মুঘিসউদ্দীনের কাছে সুলতান দেবগিরি থেকে লুণ্ঠিত ধনদৌলত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। সুলতানের অপ্রীতিভাজন হবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও তিনি মন্তব্য করেন যে, সৈন্যবাহিনী ও বয়েৎ-উল-মল বা খাজাঞ্চিখানাকে এই লুণ্ঠিত অর্থের প্রাপ্য অংশ না দিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে এবং ব্যক্তিগত বিলাসব্যাসনে ব্যয় করে সুলতান আলাউদ্দীন শরিয়তের বিধিলংঘন করেছেন। সর্বশেষে সুলতানের প্রশ্নের উত্তরে কাজি মন্তব্য করেছিলেন যে, শরিয়তের বিধি অনুসারে সুলতান তাঁর নিজস্ব ও রাজপরিবারের ব্যায়ের জন্য খাজাঞ্চিখানা থেকে একজন সৈনিক বা উচ্চপদস্থ সেনানীর বেতন বা তদাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অর্থ ন্যায়সঙ্গত ভাবে দাবি করতে পারেন। মুঘিসউদ্দীনের ন্যায় স্বাধীনচেতা উলেমা গোঁড়া মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু অধিকাংশ উলেমার পক্ষে সুলতানের বিরোধিতা করার সাহস ছিল না। তাঁরা অধিকাংশ ছিল অজ্ঞ এবং শিক্ষাগত বা অন্য কোন গুণের তাঁরা অধিকারী ছিলেন না। তাছাড়া স্বৈরাচারী শাসন সমর্থন করে এইসব উলেমা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করত। ইসলামের অনুশাসন লংঘন করে ফতোয়া জারি করতে তারা দ্বিধা করত না।

অপরদিকে সুলতানরা শরিয়তের বিধির প্রায় কোনটাই পালন করতেন না। অধিকাংশ সুলতানও শরিয়তের বিধি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন এবং উলেমারা, কাজি মুঘিসের ন্যায় দু'চারজন ছাড়া, সুলতানদের আজ্ঞাবহ ছিলেন এবং তাঁদের ইচ্ছাকে কার্যকর করার জন্য আপোষরফা করতেন। শরিয়তের আদর্শ, নির্বাচন নীতি, উত্তরাধিকার নীতি, শাস্ত্রানুসারে অনুমোদিত কাজ ও শাস্ত্রবিরোধী কাজ সুলতানের ইচ্ছামত নির্ধারিত হত এবং এইজন্য সুলতান আলাউদ্দীন সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর বক্তব্য, পেশ করেছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীনের বক্তব্য সংক্ষেপে ছিল, প্রজারা অবাধ্য হলে তাদের ইচ্ছামত শাস্তিদান করতে সুলতান বাধ্য হন এবং এই শাস্তি শরিয়ত সম্মত কিনা তার খোঁজ সুলতানের জানা নেই। তিনি মন্তব্য করেন যে, "আমি জানি না ইহা শরিয়তের অনুমোদিত বা অনুমোদিত নয়, যা কিছু রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক ও পরিস্থিতির বিচার করে বিচক্ষণ বলে মনে হয়, আমি সেই আদেশই দিয়ে থাকি। আমি জানি না, এর জন্য শেষবিচারের দিনে ঈশ্বর আমার বিষয়ে কি করবেন।"

সুলতানদের এই স্বেচ্ছাচারিতা উলেমারা অনেক সময় যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেছেন এবং তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। সুলতানদের ধর্ম সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিমত যাই হোক না কেন, তাঁরা সর্বদা নিজেদের ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় তৎপর বলে ঘোষণা করতেন ও নানা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মারফতে সাধারণের কাছে একথা প্রচার করতেন। কারণ, শাসক তুর্কী

www.pathagar.com

ও অন্যান্য শাসকশ্রেণীর জাতিগোষ্ঠী, যারা রাষ্ট্রে প্রভাবশালী তাঁরা ছিলেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী। উলেমাদের একশ্রেণী সুলতানের সকল কার্যকে সমর্থন করতেন।* অনেক গোঁড়াপন্থী সুলতানের উদাহরণ মধ্যযুগে পাওয়া গিয়েছে এবং তাঁদের পরধর্মদ্বেষ বিশেষত হিন্দুদের উপর নির্যাতনের কথা সমকালীন উলেমাদের লিখিত ইতিবৃত্তে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এমনকি বারানীর রচনা পড়লেও বোঝা যায় যে, রাজ্যশাসনে ব্যস্ত সুলতানের পক্ষে ধর্মরক্ষকের (দীন-পানাহি) ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি ধর্ম সংক্রান্ত যে চারটি বিষয়ে কার্যকরী অংশগ্রহণ করতেন তার মধ্যে ছিল প্রথমতঃ, ইসলামিক ধর্মমতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যের মধ্যে প্রকাশ্যে শাস্ত্রীয় ধর্মানুষ্ঠানে বিচ্যুতির প্রতিবিধান করা ও কঠোর শাস্তিদান করা, তৃতীয়তঃ, ধর্মভীরু মুসলমানদের ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা এবং যতদূর সম্ভব ন্যায়বিচারের বন্দোবস্ত করা। চতুর্থতঃ, এইভাবে দিল্লীর সুলতানরা হিন্দুস্থানে মুষ্টিমেয় মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাত করে চলতেন কারণ, বিশাল হিন্দু জনসমুদ্রের নিজেদের স্বাতন্ত্র ও পরিচয় বজায় রাখার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সুলতানের পক্ষে ইসলামকে অবলম্বন করা আবশ্যক ছিল।

এইজন্য মধ্যযুগের বিশেষতঃ তুর্কী আক্রমণ ও শাসনের প্রথম যুগের ইতিবৃত্ত হিন্দু বিদ্বেষের কাহিনী বলে অনেকে দাবি করেন। কারণ, এইযুগের সুলতানরা ধর্মাশ্রিত রাষ্ট্র স্থাপন করে ইসলামের স্বার্থে অমুসলমানদের দাবিয়ে রেখেছিলেন এবং মুসলমান শাসনের ইতিহাস হিন্দুদের দমন করে রাখবার ইতিহাস। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে তুর্কী আক্রমণকারী গজনীর সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরীর এবং সুলতান ফিরোজ তুঘলক ও মুঘল আমলে সম্রাট আওরঙ্গজেবের কথা উল্লেখ করা হয়। এমনকি মধ্যযুগে হিন্দু বিদ্বেষের ফলশ্রুতিতে বঙ্গদেশে এইযুগের হিন্দু স্থাপত্যের নমুনা বিরল বলে দাবি করা হয়েছে।** ১৯৭০ সালের এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণামূলক প্রবন্ধে ডেভিড জে, ম্যাকাচনের অজস্র সচিত্র উদাহরণ এই ভিত্তিহীন বক্তব্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়।*** অতএব সুলতানী আমলে উলেমা ও গোঁড়াপন্থীদের কাহিনী পাঠ করে বা কয়েকটি মন্দির ও ধর্মস্থানের সঞ্চিত অর্থ লুণ্ঠিত হবার ঘটনা বর্ণনা করে এবং জিজিয়া আদায়ের উদাহরণ থেকে মধ্যযুগের রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করা যায় না। এইভাবে ইতিহাসের বিশ্লেষণ আধুনিক যুগে অচল।

মূলতঃ তুর্কী ও মুঘলরা এই দেশ দখল করেন যুদ্ধ করে যেমন ভাবে বিভিন্ন জাতির আর্য-অনার্য সংঘর্ষ হয়েছিল। শক-হূণ ও গ্রীকরা এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী এদেশে এসেছেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ও সেই একই পথে এসেছে পাঠান ও মুঘল এবং তৎপূর্বে আরবরা। এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এসে কিন্তু তারা অন্যান্য পূর্বসূরীদের মতো এদেশের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোকে মেনে নিয়েছিল। এইজন্য যে ফিরোজ তুঘলক ব্রাহ্মণদেরও জিজিয়া দিতে বাধ্য করেন, তিনিই আবার প্রজার বিশেষত কৃষকের স্বার্থরক্ষায় তৎপর হন এবং রাজস্বের ক্ষতি করেও বহু করের অবলুপ্তি করেন। মন্দির যেমন যুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়েছে, দিল্লী সুলতানের সঙ্গে জৌনপুরে সুলতানের সংঘর্ষে তেমনি মসজিদও ধ্বংস হয়েছে।**** ধর্মের নামে মধ্যযুগের সুলতানরা অনেক সময় জিগির তুলতেন। এটা ছিল তাদের প্রচারধর্মী

* এই সম্পর্কে পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ হিন্দুস্তানের জন-জীবন ও জীবন চর্চা, পৃঃ ৫৫-৬০ দ্রষ্টব্য।

** Ancient Bengal Dr. R. C. Majumdar, C. G. Bharadwaj & Col cal, পৃঃ ৬০৩-৬০৪।

*** ASB Vol-XI, 1970 NOSI.

**** ভারতবর্ষের ইতিহাস-রোমিলা থাপার পৃঃ ২৫৯ পাদটিকা।

www.pathagar.com

কার্যকলাপ। কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রের স্বার্থে অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর স্বার্থে শাসন চালাতেন এবং সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী নয়, ধর্মদ্রোহী বলে চিহ্নিত করা হত এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, মধ্যযুগের রাষ্ট্র ধর্মাশ্রিত ছিল। বরং এইযুগের রাষ্ট্র সুলতান ও শাসকশ্রেণীর শক্তি বিশেষত সামরিক শক্তির উপরই নির্ভরশীল ছিল। এই সুযোগে দরবারে অনুগত উলেমারা ঘোষণা করতেন, সুলতানের অনুগত হওয়া মানে খোদাকেই মানা করা।*

* হিন্দুস্তানের জনজীবন দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

•

আর্থিক পরিকাঠামো

কৃষক ও কৃষি

মধ্যযুগের ভারতের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিজ উৎপাদন থেকে যে আয় হ'ত তার উপর নির্ভরশীল ছিল। তুর্কী বিজয়ের পর সুলতান এবং আমির-ওমরাহদের প্রাধান্য রাজধানী ও শহরাঞ্চলে কায়েম হলেও পূর্বতন শাসকরা রায়, রাণা, মুকদ্দম, খুট, চৌধুরী প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে তাঁদের প্রভাব বজায় রেখেছিলেন। সর্বনিম্নস্তরে ছিলেন কৃষকরা। কৃষকরা জিজিয়া ও ভূমি-রাজস্ব বা খরাজ দিতেন এবং সেইজন্য তাঁরা যে অঞ্চলের বা গ্রামের জমি চাষ করতেন সেই স্থান ত্যাগ করে অন্য অঞ্চলে বসবাস ও চাষাবাদ শুরু করলে, পূর্বতন জমির ইকতা রাজস্ব ও জিজিয়া আদায়ের ভার, যাঁর হাতে ছিল, তিনি স্থানত্যাগীদের কাছ থেকে কর আদায়ে অক্ষম হতেন। এই কারণে কৃষকদের ভূমিত্যাগ করতে বাধা দেওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। জিয়াউদ্দীন নামে একজন সেনানীকে সামরিক অস্ত্রক্রয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য ও ব্যক্তিগত খরচের জন্য একটি গ্রাম থেকে জিজিয়া ও খরাজ বা ভূমিরাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই অঞ্চল থেকে কৃষকরা থানেশ্বরে কাজীদের অধীনে চাষাবাদ শুরু করলে জিয়াউদ্দীন এইসব কৃষকদের প্রত্যাবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। থানেশ্বরের কাজিরা তদুত্তরে, কৃষকরা ব্যক্তিগত ভাবে স্বাধীন এবং তাদের ফিরে যেতে বাধ্য করা যাবে না বলে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে যে দাবি পেশ করা হয়েছিল তাহ'ল জিজিয়া ও খরাজ আদায়ের অধিকার, ব্যক্তি হিসেবে কৃষকের উপর মালিকানার দাবি নয়। জমি চাষ করলে কৃষকের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় করা যায় ও গ্রামবাসী হিসেবে মাথাপিছু জিজিয়া দাবি করা যায়। অতএব তাদের ভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র বসবাস করার বিরোধিতা করা জিয়াউদ্দীনের ন্যায় ভূমিরাজস্ব ও জিজিয়া আদায়ের হক বা অধিকার প্রাপ্ত সেনানীর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল এবং থানেশ্বরের কাজিদের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য দাবি উত্থাপন করা সম্ভব ছিল।

এই সূত্রে কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া-তে ভারতীয় মধ্যযুগের কৃষকের অবস্থা ভূমিদাসের থেকে কোন অংশে উন্নত নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ, তারা ইচ্ছামত যে কোন স্থানে বাস করতে পারত না। ভূমিদাসের ন্যায় তারা অবশ্য কোন কোন জিনিস যেমন বীজ, গবাদি পশু ও চাষীর যন্ত্রপাতি বিক্রয় করতে পারত। নগদে ভূমিরাজস্ব দেওয়ার জন্য কৃষিজ পণ্য বাজারে বিক্রয় করার অধিকারও কৃষকের ছিল।* কিন্তু এই যুগে কৃষককে জোরজবরদস্তি কোন স্থান ত্যাগে বাধা দেওয়ার পথে অনেক অসুবিধা ছিল। প্রথমত, স্মরণ রাখা দরকার যে, মধ্যযুগে হিন্দুস্তানে যখন তুর্কী শাসন উত্তর ভারতে প্রসারিত হয় সেইসময় জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ ছিল অধিক। অতিরিক্ত ভূমিরাজস্ব আদায়ে বা অন্য কোন

---

* Cambridge Economic History of India, Vol I, পৃ: ৫৪।

www.pathagar.com

প্রকারে জবরদস্তি করে চাষীকে জমি চাষে বাধ্য করার প্রচেষ্টাতে, অনেক দূরদর্শী রাজনৈতিক উৎসাহ দেন নাই। বারানী মন্তব্য করেছেন যে, "কৃষকরা মুসলমানদের খাজাঞ্চীখানার খাজাঞ্চী।" বলবন স্বীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে সৈনিক, কৃষক ও বণিকদের স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে উপদেশ দিয়েছেন।* সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন তাঁর পুত্রকে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে অতিরিক্ত আদায়ের ফলে চাষীরা নিঃস্ব না হয়ে পড়ে অথবা অতিমাত্রায় উদারনীতির ও নিম্নহারে রাজস্ব আদায়ের ফলে তারা নিজেরা সঞ্চয় করার সুযোগ লাভ করে কালে কালে অবাধ্য এবং বিদ্রোহী হয়।

খূট, মুকদ্দম ও গ্রাম্য প্রধানের প্রভাব

তুর্কী বিজয়ের ফলে প্রচলিত ভূমিব্যবস্থায় আপতঃদৃষ্টিতে কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়নি। তুর্কী শাসন মেনে নিয়ে পূর্বতন হিন্দুশাসকরা রায়, রাণা, রাওয়াত, খূট, মুকদ্দম, চৌধুরী প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে চাষীদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। মধ্যযুগের ইতিবৃত্তকাররা প্রথমের দিকে গহড়বাল নৃপতি জয়চাঁদের ন্যায় শক্তিশালী হিন্দু রাজাদের রায় বলে অভিহিত করলেও পরবর্তীকালে অর্থাৎ তুর্কীশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর যে কোন কর-প্রদানকারী হিন্দুপ্রধানের প্রতি এই শব্দ ব্যবহার করতেন। মুকদ্দম শব্দটি আরবী ভাষা থেকে এসেছে।** মুকদ্দমের অর্থ গ্রামের প্রধান পদের অধিকারী বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই শব্দটি প্রযোজ্য। মোরল্যান্ডের মতে খূট ছিলেন একজন হিন্দু প্রধান। অধ্যাপক হোডিবালা খূট শব্দটি সংস্কৃত গ্রামকূট বা গ্রামের প্রধানের সঙ্গে সনাক্ত করেছেন,*** বারানী এই দুইটি শব্দই গ্রামের প্রধান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। গ্রামাঞ্চলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন চৌধুরী এবং গ্রাম্য প্রধান হিসেবে চৌধুরীর নামের উল্লেখও বারংবার পাওয়া যায়। ইবন বতুতা সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে হিন্দুস্তান পরিভ্রমণের বিবরণ তাঁর 'রেহেলা' বা ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করার কালে চৌধুরীকে একটি 'সাদি' বা একশত গ্রামের প্রধান ও স্থানীয় অবিশ্বাসীদের নেতৃস্থানীয় বলে উল্লেখ করেছেন (ইংরাজি অনুবাদ, ডঃ আগা মাহেদি হুসেন)। এইভাবে সমগ্র গ্রামাঞ্চলের মানুষ খূট থেকে বালাহার বা পরিচারক ও সাফাইকাজের নিম্নবর্গের লোক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। আবার কৃষিকর্মে নিযুক্ত সকলের অবস্থা সমান ছিল না। কারণ, কৃষি কর্মের অবস্থার তারতম্য ছিল।

চতুর্দশ শতকে গ্রামাঞ্চলের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহ'ল এক-একটি গ্রামের জনসংখ্যা ছিল ২০০ বা ৩০০। চাষাবাদের জন্য প্রত্যেক চাষীর আলাদা-আলাদা চাষের ক্ষেত ছিল। এইসব ক্ষেত্রে আয়তনের প্রকারভেদ ছিল। এর মধ্যে খূটের বা গ্রামের প্রধানের বিস্তীর্ণ চাষের জমির সঙ্গে বালাহারের বা গ্রামের সাফাইকর্মী ও নিম্নবর্গের মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষের ক্ষেতকে গণ্য করা যায়। কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া-র মতে কৃষিতে নিযুক্ত চাষীদের অধীন বিভিন্ন জমির আয়তনের আকারভেদের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে কৃষকের শ্রেণীবিন্যাসের নিচেও কিছু লোক ছিল। গ্রামাঞ্চলের মানুষের সেবার কাজে নিযুক্ত এইসব লোকের কোন নিজস্ব চাষের ক্ষেত ছিল না এবং এইসব নিম্নবর্গের অজস্র লোক ছিল ভূমিহীন। তারা জাতে ছিল সাফাইকর্মীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সমকালীন তথ্য থেকে এদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না এবং কেবলমাত্র পরবর্তীকালের পরিস্থিতি থেকে এদের সম্পর্কে জানা যায়।

---

* জিয়াউদ্দীন বারানী, তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, পৃঃ ৭৯।

** এলিয়ট অ্যান্ড ডাউসন, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এজ ট্রোল্ড বাই ইটস ওন হিস্টোরিয়ানস, দ্বিতীয় খণ্ড (আলিগড়), ভূমিকা : অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব, পৃঃ ৭০।

*** W.H.Moreland, The Agrarian System of Moslem India, p.p. 225-26; S. H. Hodivala, Studies in Indo-Muslim History, p. 277-79.

www.pathagar.com

রাজস্ব সংগ্রহ ও দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থা চালু রাখার জন্য তুর্কী শাসকশ্রেণীকে গ্রামাঞ্চলে খুট ও মুকদ্দম বা গ্রাম্য প্রধানদের সহযোগিতার উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হত। সুলতান ও তাঁর নিযুক্ত মুক্তি বা ইকতার মালিক গ্রামের প্রধান খুট ও মুকদ্দমের সহযোগিতায় সহজে রাজস্ব সংগ্রহ করতে সক্ষম হতেন। যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রামের পুনর্বাসনের ও চাষাবাদের পুনরায় নতুন করে শুরু করার প্রয়োজন হ'ত তখন পুরনো গ্রাম্যপ্রধানকে বা তার পরিবারের কোন ব্যক্তিকে গ্রামের প্রধান নিযুক্ত করে তবেই এই কাজ সম্ভব ছিল।* হিন্দু উচ্চশ্রেণীর লোকের গ্রামাঞ্চলে এই প্রভাব খর্ব্ব করার জন্য বারানী বারংবার তুর্কী শাসকশ্রেণীকে সচেতন করার প্রচেষ্টা করেছেন। কাজি মুঘিসের সঙ্গে আলোচনায় সুলতান আলাউদ্দীন খলজী মন্তব্য করেন যে, খুট ও মুকদ্দমরা তেজী অশ্বে আরোহণ করতেন, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করতেন, পরস্পরের মধ্যে লড়াই করতেন ও শিকারে যাত্রা করতেন কিন্তু খাজাঞ্চিখানায় এক জিতলও কর হিসেবে দিতেন না। বরং রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তারা তিনটি প্রধান কর খরাজ-ই-জিজিয়া বা ভূমিরাজস্ব, ঘরাই বা গৃহকর ও চরাই বা গবাদি পশুর কর দান থেকে অব্যাহতি দাবি করতেন এবং গ্রামবাসীদের উপর কিসমৎ-ই-খোটই নামে তাদের নিজস্ব কর আদায় করতেন। এই কারণে সুলতান তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে এইসব অতিরিক্ত শক্তিশালী প্রজাদের শাসন করতে চেয়েছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর লক্ষ্য ছিল বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে শক্তিশালী ও প্রভাবশালীদের যে রাজস্ব বা জিজিয়া দেবার কথা সে করভারের বোঝা সাধারণ কৃষকের উপর তারা চাপিয়ে না দেয়। 'বালাহার থেকে খুট' সকলেই যেন রাজকর দিতে বাধ্য থাকে। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে খুট ও মুকদ্দমরা যে বিশেষ সুবিধাভোগ করত তা খর্ব করতে সুলতান আলাউদ্দীন সচেষ্ট হয়েছিলেন।

খুট ও মুকদ্দমরা অবশ্য কৃষক ছিল। কৃষক হলেও এই স্তরের ব্যক্তি গ্রামাঞ্চলের প্রায় অভিজাত পর্যায় উন্নীত হয়েছিল, এসম্পর্কে সন্দেহ নেই। যখনই তাদের আর্থিক ও তৎসহ সামাজিক ও অন্য সবদিক থেকে সমৃদ্ধি ও প্রভাব বৃদ্ধি পেত তখন তারা শীর্ষস্থানীয় আঞ্চলিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হত। কিন্তু পরিস্থিতির অবনতি হলে খুট ও মুকদ্দমরা পুনরায় সাধারণ কৃষিজীবীর পর্যায় নেমে আসত ও দৈনন্দিন পরিশ্রম করে আহার ও জীবিকার সংস্থান করতে বাধ্য হত। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক (১৩২০-২৫) খুট ও মুকদ্দমদের প্রতি অনেক উদারনীতি অবলম্বন করেছিলেন এবং সুলতান আলাউদ্দীনের কঠোর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেছিলেন। পূর্বোক্ত সুলতান খুট ও মুকদ্দমদের তাদের চাষাবাদ ও গৃহপালিত গরু-মহিষের জন্য কর আদায় বন্ধ করেন। কিন্তু সুলতান কৃষকদের কাছ থেকে সেস আদায় করতে খুট ও মুকদ্দমদের নিষেধ করেছিলেন। ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের রাজত্বকালে (১৩৫১-৮৮) এই স্তরের কৃষকদের উপর থেকে প্রায় সকলপ্রকার চাপ অপসারিত হয়েছিল এবং খুট ও মুকদ্দমদের ঘরবাড়ী, ঘোড়া, গরু, শস্য এবং তৈজসপত্রে ভরপুর ছিল। আরেকজন লেখক গ্রামের সমৃদ্ধি বর্ণনা করে যা বলেছেন, সম্ভবত সাধারণ কৃষকের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় বলে কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি-র লেখক মন্তব্য করেছেন। যদিও এই মন্তব্যের সম্পর্কে যুক্তিপ্রদর্শন করেননি।**

শামসী সিরাজ আফিফের মতে তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীর*** মতে রায়তের গৃহে এত শস্য, ধন-দৌলত, অশ্ব ও তৈজসপত্র জমা হয়েছিল যে তা বলা যায় না। প্রত্যেকের প্রচুর পরিমাণ সোনা-রূপা ও অজস্র জিনিসপত্র ছিল। কৃষকদের ঘরের মেয়েরা কেওই গহনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়নি। প্রত্যেক কৃষকের গৃহে পরিষ্কার বিছানার চাদর, ঝকঝকে শোবার পালঙ্ক, প্রচুর তৈজসপত্র ও অনেক ধন-রত্ন ছিল। আফিফের এই বক্তব্য অতিরঞ্জিত হলেও এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলের সমৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমৃদ্ধি কেবলমাত্র খুট ও

* Baden Powell, Origin and Growth of the Indian Village Community, পৃঃ-১২।

** CEHI, Vol-I, পৃঃ ৫৫ দ্রষ্টব্য।

*** Afif, S., Tarikh-i-Firuz Shahi, পৃ: ৯৯-১০০।

www.pathagar.com

মুকদ্দমদের জীবনে নিবদ্ধ ছিল এবং সাধারণ কৃষক এই সমৃদ্ধির অংশীদার ছিল না এসম্বন্ধে সমকালীন ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। সেইজন্য সম্ভবত একথা বলাই নিরাপদ হবে যে, কৃষিজীবীদের উপরেরতলার স্বার্থ যেহেতু সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল সেইজন্য খুট ও মুকদ্দমদের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কৃষিজীবীরাও খানিকটা এই সমৃদ্ধির অংশ পেয়েছিল।*

রায়, রানা, চৌধুরী

খুট ও মুকদ্দমদের উপরের স্তরে ছিলেন গ্রামাঞ্চলের অভিজাত শ্রেণী। এইসময় অভিজাত শ্রেণীর গঠন ও ক্ষমতা নানা পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথম যুগে মিনহাজ এই শ্রেণীকে রায় ও রানা নামে উল্লেখ করেছেন এবং রানার অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধানদের রাওত নাম দেওয়া হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকে বারানী এই ধরনের বিন্যাসের প্রচলন গ্রামাঞ্চলের অভিজাত শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। বলবনের (১২৬৬-৮৬) উক্তির মাধ্যমে ঐতিহাসিক বারানী বলেছেন, ৬/৭ হাজার সুলতানী অশ্বারোহীর পক্ষে রায় এবং রানাদের লক্ষ পাইক ও ধনুর্কী মোকাবিলা করা সম্ভব। সুলতান জালালউদ্দীন খলজীর বিরুদ্ধে কারার শাসনকর্তা মালিক চাজ্জু বিদ্রোহী হলে বাওত ও পাইকরা দলে দলে তাঁর বাহিনীতে যোগদান করতে আসে বলে বারানী উল্লেখ করেছেন।

তুর্কী শাসনের প্রাথমিক স্তরে শাসকশ্রেণী এইসব রায় ও রানাদের কাছ থেকে নিয়মিত কর আদায় করতেন। সুলতান ও মুক্‌তিরা পুরাতন প্রচলিত রাজস্ব আদায়ের কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। ১২১৭ সালে জৌনপুরের কাছে প্রাপ্ত একটা ইটের উপর খোদাই করা লিপিতে ও ১২২৭ সালে শাহজাহানপুর জিলায় প্রাপ্ত একটা তামার লিপিতে এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। সুলতান ইলতুৎমিসের কথা সার্বভৌম নৃপতি হিসেবে শেষোক্ত লিপিতে বলা হয়েছে। হিন্দুস্তানের তুর্কী শাসকদের নিয়মিত করদান করলে তাঁরা রায় বা রানাদের গ্রামাঞ্চলের কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ সহজে করতেন না এবং রাজস্ব আদায় ও শাসনভার তাঁদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়নি।

সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালে গাজি মালিক বা গিয়াসুদ্দিন তুঘলক যখন দিপালপুরের শাসনকর্তা তখন ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ তুঘলকের সঙ্গে ঐ অঞ্চলের একজন রায়ের কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে বিরোধ হয়। এইযুগে একটি নির্দিষ্ট করের বদলে কৃষকের উপর থেকে রাজস্ব আদায় করে সুলতানের খাজাঞ্চিখানায় পেশ করা এইসব গ্রামাঞ্চলের মধ্যবর্তী শ্রেণীর অন্যতম কাজে পরিণত হয়েছিল। পূর্বোক্ত রায় যাঁর নাম ছিল রানমল ভাট্টি এই বৈবাহিক বন্ধনে স্বেচ্ছায় সম্মতিদান করতে অস্বীকৃত হওয়াতে গাজি মালিক রানমলের কাছ থেকে অগ্রিম এক বৎসরের রাজস্ব দাবি করেন এবং অনাদায়ে রানমলের অঞ্চল তালবন্দিতে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে মুকদ্দম ও চৌধুরীদের উপর রাজস্ব আদায়ে নানা অত্যাচার করেছিলেন। ফলে স্বীয় অধীন কৃষকদের দুর্দশায় বিচলিত রানামল ভাট্টি গাজি মালিকের প্রস্তাবে সম্মতিদান করে ফিরোজ তুঘলকের সঙ্গে স্বীয় কন্যার বিবাহে রাজি হয়েছিলেন। এই ঘটনার সূত্রে বলা যায় যে, গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবীরা তুর্কী শাসনের আমলে মধ্যবর্তী শ্রেণী রায়, রানা, মুকদ্দম, চৌধুরী এবং সুলতানী শাসকবর্গের উভয়ের অধীন ছিল। যদিও সুলতানের নিযুক্ত শাসনকর্তা প্রয়োজনবোধে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন ও চতুর্দশ শতকে প্রাক্তন অভিজাত শ্রেণীর অবক্ষয় হয়েছিল, তাহলেও গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত উৎপাদন রাজকোষে শাসকশ্রেণীর স্বার্থে সঠিকভাবে সংগ্রহের জন্য মধ্যবর্তী শ্রেণীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। অভিজাত শ্রেণীর স্থলে এবং সম্ভবত তাদের একটি অংশ এবং গ্রামপ্রধানদের (খুট ও

* সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে দোয়াবে, যে কৃষক বিদ্রোহ হয় তাতে প্রমাণিত হয়েছিল যে, কৃষকরা উচ্চস্তরের ও সাধারণ শ্রেণীর স্বার্থের কারণে ঐক্যবদ্ধ হ'তে দ্বিধাগ্রস্ত হত না। এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য নিম্নে দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

মুকদ্দমদের) থেকে একটি অংশ নিয়ে একটিনতুন উঠতি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই নবসৃষ্ট গ্রামীণ উচ্চবর্গের মধ্যে সর্বপ্রথম চৌধুরীর নাম উল্লেখ করতে হয়।

ফরিদ (পরবর্তীকালের শের শাহ) বিহারে ও পূর্বাঞ্চলের উত্তরপ্রদেশে যে সব জিলা সিকন্দর লোদীর (১৪৮৯-১৫১৭) রাজত্বকালে তাঁর পিতার নিযুক্ত রাজস্বসংগ্রহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন তাদের দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। একভাগ ছিল মুকদ্দম ও কৃষকদের অধীন ও অন্য ভাগ ছিল জমিদারের যাদের আবার কখনও কখনও মুকদ্দম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষোক্তদের সম্পর্কে সমকালীন ইতিহাসে মন্তব্য করা হয়েছে যে 'এরা তাদের অঞ্চল (ওয়ালিত) থেকে দেওয়ানে যা দিতে হয় তার থেকে অনেক বেশী (রাজস্ব হিসাবে) সংগ্রহ করে।'

ইবন বতুতা কতকগুলি গ্রামের কথা ঐক্যবদ্ধভাবে শাদি (অর্থাৎ একশত) বলে উল্লেখ করেছেন এবং হাজার বা এক হজার গ্রামের জিলার কথাও বলেছেন। চতুর্দশ শতকে কতকগুলি গ্রাম এক সঙ্গে পরগণা নামে উল্লিখিত হয়েছে। ষোড়শ শতকে ও সপ্তদশ শতকে প্রতিটি পরগণায় বংশপরম্পরায় জমিদার ছিলেন চৌধুরী। এই চৌধুরীই পরগণার রাজস্ব সংগ্রহের জন্য দায়ী ছিলেন। শাদি ও পরগণার সঙ্গে চৌধুরী নাম যুক্ত অতএব উভয় সমার্থক শব্দ বলে সহজেই অনুমেয়। চতুর্দশ শতকে গ্রামাঞ্চল দুইভাগে বিভক্ত হয়েছিল। সাধারণ চাষী ও জমিদার। উচ্চবর্গের গ্রামাঞ্চলের রাজস্ব সংগ্রহকারীদের সঙ্গে কৃষকদের পার্থক্য ছিল এবং বারাণী তিনটি শ্রেণীর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ তিনটি শ্রেণী হ'ল তুর্কশাসক গোষ্ঠী হিন্দু রাজস্ব সংগ্রহকারী বা খুট, মুকদ্দম, চৌধুরী ও সাধারণ কৃষক। উচ্চবর্গের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের রাজস্ব সংগ্রহকারীদের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য তুর্কী শাসকশ্রেণী আগ্রহী ছিলেন। অনেক সময় এই রাজস্ব সংগ্রহকারীরা তাদের দেয় রাজস্ব কৃষকের উপর চাপিয়ে দিত।* গ্রামাঞ্চলের মানুষকে রাজস্ব সংগ্রহকারী মধ্যস্বত্বভোগী রায় রানা, চৌধুরী ও প্রায় সমপর্যায় খুট ও মুকদ্দম এবং সর্বনিম্নে সাধারণ চাষী ও অন্যান্য নিম্নবর্গ সাধারণত এই দু'ভাগ করা যায়।

রাজস্বনীতি

প্রথম যুগে ঘোরী বিজয়ের পর উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইতিপূর্বে প্রচলিত রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার বিশেষ রদবদল দেখা যায় না। কেবলমাত্র প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থার উপর তুর্কী শাসকদের দেয় কর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কালক্রমে যখন সুলতানদের শাসন আরো সুদৃঢ় হয়েছিল তখন সম্ভবতঃ রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতিতে ইসলামিক প্রথার অনুপ্রবেশ হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকে দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় শেষোক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা হয় যদিও এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। হিন্দুস্তানের যেসব অঞ্চল তুর্কী শাসনাধীন ছিল সেখানে চাষীদের উৎপাদনের একটি অংশ খাজাঞ্চিখানায় খরাজ বা ভূমিরাজস্বরূপে দিতে বলা হয়েছিল। এই খরাজ ছিল দুই প্রকারের খরাজ-ই মুকাসিমা বা সমানুপাতিক রাজস্ব অর্থাৎ উৎপাদন অনুসারে অনুপাতিক হারে রাজস্ব এবং খিরাজ-ই-ওয়াজিফাহ বা জমির মাপ অনুসারে নির্ধারিত রাজস্ব যার সঙ্গে উৎপাদনের কোন সম্পর্ক ছিল না কারণ শেষোক্ত ব্যবস্থায় রাজস্বের হার জমির এলাকার উপর নির্ভরশীল এবং পূর্ব নির্ধারিত। সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর পূর্বে জমির মাপজোক করে রাজস্ব নির্ধারণে সর্বত্র একই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য কোন সুলতান তৎপর হয়েছিলেন বলে জানা যায় না।

---

* W. H. Moreland, Agrarian System of Moslem India, পাদ টিকায় পৃঃ ৩২, বলেছেন যে, 'Barani speaks of the Hindus', but here and in various other passages where the phrase occurs, the context makes it plain that he is thinking of the upper classes, not of peasents. Taking his book as a whole I would infer that he thought of the kingdom as consisting not of two elements but of three Hindus, Muslims and the 'herd' or peasants.'

www.pathagar.com

তুর্কী শাসকরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভূমি রাজস্ব ব্যতীত শাসন পরিচালনা সম্ভবপর নয় এবং সেইজন্য কৃষককে শোষণ করে এই নয়া শাসকশ্রেণী যতদূর সম্ভব রাজস্ব আদায় করতে চেয়েছিলেন। যার ফলে কৃষকদের অনেক সময় একটি মাত্র গরু ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকত না।* কিন্তু এই প্রসঙ্গে তুর্কী শাসকশ্রেণীর যে নীতি তা বলবন (১২৬৫-৮৭ খ্রীঃ) স্বীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে বলেছিলেন, "আবার যখন প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগৃহীত হবে একটি মধ্যপন্থা অনুসরণ করতে হবে। এই সংগ্রহ এত উচ্চ হারে যেন না হয় যাতে তারা চরম অভাবে পড়ে বা এত নিম্নহারে না হয় যাতে তারা প্রচুর জমা করে এবং যার ফলে অবাধ্য ও আনুগত্য প্রদর্শনে বিমুখ হয়"।** অর্থাৎ সুলতান বলবনের নীতির সারাংশ হল, চাষীদের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব শোষণ করা, কিন্তু এই কৃষিনীতির আরেকটি লক্ষ্য ছিল তাদের একেবারে নিঃস্বে পরিণত না করা। কারণ, রাজস্ব আদায়ের জন্য মধ্যস্বত্বভোগী বা খূট, মুকদ্দম ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলে কৃষকের কাছ থেকে যে পাওনা গ্রহণ করতেন তার জন্য চাষীদের অর্থনৈতিক ভার বহন করতে হত। রাজস্ব নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের চাষী ও উচ্চতর মধ্যস্বত্বভোগীর সম্পর্কে অতিরিক্ত শোষণ অপেক্ষা মাঝামাঝি পন্থা গ্রহণের নীতি অনুসরণ করা শ্রেয় বিবেচনা করে বলবন তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

আলাউদ্দীনের রাজস্বনীতি

সুলতান আলাউদ্দীন খলজী সর্বপ্রথম জমির মাপজোক করে রাজস্বের হার উৎপাদনের ৫০ ভাগ করেন। এই দাবি কৃষকের পক্ষে অতিরিক্ত ছিল। তদুপরি সুলতান গো-চারণের ও প্রতিটি গৃহের উপর যথাক্রমে চরাই ও ঘরাই নামে কর চাপিয়েছিলেন এবং তার নায়েব ওয়াজির শরফকোই প্রতিটি কৃষককের কাছ থেকে এই রাজস্ব কঠোরভাবে আদায় করতেন। এছাড়া একবার রাজস্ব নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর তা নগদে দেবার রীতি চালু হয়েছিল। বারানী এক জায়গায় বলেছেন যে, কৃষকরা ফসলের অংশ দিয়ে রাজস্ব মেটাত। কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার মতে রাজস্ব সাধারণত নগদেই দিতে হ'ত এবং এই নীতি খালিসার অন্তর্গত অঞ্চলের প্রতিও প্রযোজ্য ছিল, দোয়াবের প্রায় সবটাই খালিসা ছিল। অতএব এই বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে যেসব অঞ্চল থেকে শস্য রাজস্ব রূপে সংগৃহীত হ'ত, অভাব বা দুর্ভিক্ষের সময় ব্যবহারের জন্য রাজকীয় শস্যভাণ্ডারে তা রাখা হ'ত। এই ব্যবস্থা দিপালপুর ও লাহোর থেকে রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ এবং রাজ্যের সর্বত্র কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

খূট ও মুকদ্দমরা অর্থাৎ কোন মধ্যস্বত্বভোগীকে রাজস্বদান থেকে রেহাই দেওয়া হ'ত না। আলাউদ্দীনের নায়েব উজীর শরফকোই গ্রামের হিসাবরক্ষক বা পাট'ওয়ারির খাতা থেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে পাওনা জেনে নিয়ে তা উসুল করতেন। এক্ষেত্রে খূট ও মুকদ্দমেরা নিজেদের দেয় রাজস্ব সাধারণ চাষী বা ক্ষেতমজুরের উপর চাপাতে পারতেন না। আলাউদ্দীন নিয়ম করেছিলেন যে রাজস্ব আদায়ের সময় দেখতে হবে যে, বিত্তবান ও প্রভাবশালীদের বোঝা যাতে সাধারণের উপর চাপান না হয় এবং খূট, বালাহার ও সাধারণ চাষীর উপর একই নিয়ম প্রযোজ্য হয়। আফিফ বলেছেন বাৎসরিক খাজনা নগদে অগ্রিম দাবি করলেও আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে কেহ কোন গোলমাল করতে সাহস করেনি। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার, এই রাজস্ব ব্যবস্থায় আলাউদ্দীন মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর সমহারে খাজনা আদায় করলেও তা খূট বা মুকদ্দমদের সম্পূর্ণ নিঃস্ব করেনি এবং কৃষক যে রাজস্ব দিত তার একমাত্র

---

* শামসী সিরাজ আফিফ, তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, পৃঃ ৯৮।

** জিয়াউদ্দীন বারানী, তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, পৃঃ ১০০। এই সূত্রে নিজামুদ্দিন আমেদের তবকত-ই-আকবর পৃঃ ৯৫, ও মোরল্যান্ড, এগরেরিয়ান সিসেটেম ইন মোসলেম ইন্ডিয়া পৃঃ ২৬, ২৯ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

আদায়কারী ছিল রাষ্ট্র। মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ থেকে সে মুক্ত ছিল। আলাউদ্দীনের প্রথা সামান্য রদবদল সহ বহুদিন চালু ছিল।* এইভাবে খরাজ বা মাল অর্থাৎ রাজস্ব ও কৃষকের উদ্বৃত্ত শাসকশ্রেণী আত্মসাৎ করত। এই নীতির সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সময় কৃষক কেবলমাত্র রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট রাজস্ব বা কর দিত এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভ করেছিল।

আলাউদ্দীনের পর রাজস্বনীতির কঠোরতা হ্রাস

সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর পুত্র ও উত্তরাধিকারী সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজীর রাজত্বকালে এই কঠোর রাজস্বব্যবস্থা শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র চারবৎসর রাজত্বের পর নাসিরউদ্দীন খসরু শাহ ১৩২০ সালে তাঁকে হত্যা করে স্বল্পকালের জন্য দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। অতঃপর গিয়াসউদ্দীন তুঘলক (১৩২০-২৫ খ্রীষ্টাব্দে) তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর রাজস্ব নীতির কঠোরতা হ্রাস করেছিলেন। একটি নতুন সুলতানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি উচ্চপদস্থ আমির ও মালিকদের কাছে প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ে নরম নীতি অনুসরণ করেন এবং প্রাদেশিক রাজস্ব গুপ্তচরদের নিকট প্রাপ্ত খবর বা অনুমানের ভিত্তিতে এক-দশমাংস বা এক-দশমাংশের অধিক বৃদ্ধি করা চলবে না বলে নিয়ম করেন। তিনি খূট ও মুকদ্দমদের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু সুবিধাদান করেছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর ন্যায় গিয়াসউদ্দীন তুঘলকও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, খরাজের উপর কৃষকের কাছ থেকে কোন 'সেস' (কিসমৎ) আদায় করা চলবে না। খূট ও মুকদ্দমদের চাষাবাদ ও গবাদি পশুর জন্য করদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। আলাউদ্দীন জমির মাপজোক করে রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন, কিন্তু এখন রাজস্ব উৎপাদিত ফসলের উপর নির্ধারিত হ'ত। আবাদযোগ্য ভূমির সীমানা বৃদ্ধি করার জন্য এইসময় উৎসাহ দান করা হয় এবং খূট ও মুকদ্দমরা আলাদা করে চাষাবাদ ও গরুর জন্য করদান থেকে অব্যাহতি পায়।

মহম্মদ বিন তুঘলকের নীতি

পরবর্তী সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে (১৩২৫-৫৩ খ্রীঃ) রাজস্ব পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্র এই নীতি প্রয়োগের প্রচেষ্টার জন্য নির্দেশ দান করা হয়। অর্থাৎ কেবলমাত্র দোয়াবের গ্রামগুলিতে নয়, গুজরাট, মালব, দাক্ষিণাত্য, সুদূর দক্ষিণে ও বঙ্গদেশে এই রাজস্বনীতি প্রসারিত হয়েছিল। দ্বিতীয়স্তরে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক কৃষিকর বৃদ্ধি করেন। এই বৃদ্ধি কি পরিমাণে করা হয়েছিল তা সমকালীন লেখনী থেকে জানা যায় না। কারণ জিয়াউদ্দীন বারানী তাঁর তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই বৃদ্ধি ছিল দশ বা বিশভাগ অধিক। কিন্তু উভয় অর্থেই রাজস্বর বৃদ্ধিতে যে চাপ কৃষির উপর হয় তা বহন করা কোন ক্ষেত্রেই চাষীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এই জন্য কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার লেখক বলেছেন যে, বারানীতে এক থেকে দশ বা বিশ ভাগ অধিক বলে যা বলা হয়েছে তা কেবল সমকালীন লোকের কাছে নাটকীয়ভাবে এই বৃদ্ধির পরিমাণকে বোঝানোর জন্য।** বারাণীর মতে কৃষকের উপর অতিরিক্ত ও নতুন আবওয়াব বা কর বসান হয়েছিল। তারিখ-ই-মুবারক শাহীতে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি গৃহের

---

* কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬২, ও বারানী, পৃঃ ২৮৭; এই সূত্রে পিপল এন্ড পলিটিক্স ইন আর্লি মিডিয়াভ্যাল ইন্ডিয়া, এ কে সেন (আই বি ডি কলি) পৃঃ ১২২-১২৫ দ্রষ্টব্য।

** কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার লেখক মন্তব্য করেছেন যে, "The enhancement to uncertain, The statement that the enhancement was increased ten fold and twenty fold is almost hyperbolical," CH I, Vol-III, পৃঃ ১৪৫।

www.pathagar.com

উপর কর ও গো-চারণের জন্য কর এই সঙ্গে আদায় করা হ'ত এবং কঠোরভাবে শেষোক্ত কর আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিটি গরুকে ছাপ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এছাড়া সরকারীভাবে উৎপাদনের হিসাব করা হ'ত এবং কঠোরভাবে কর আদায়ের উদ্দেশ্যে নির্দেশদান করা হয়েছিল। সরকারীভাবে উৎপাদনের হিসাব করা হ'ত এবং মূল্য নির্ধারণের সময় এই করের নগদ-মূল্য, বাজারে প্রচলিত বিক্রয়ের তৎকালীন মূল্যের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত ভাবে, সরকার কর্তৃক গৃহীত শস্যের দাম অনুসারে আদায় করার রীতি চালু করা হয়েছিল।*

দোয়াবের বিদ্রোহ

এইভাবে রাজস্ব ও কর বৃদ্ধির ফলে রায়তদের দুর্দশা হয়। তৎসহ অনতিবিলম্বে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের ফলে দিল্লীর আশপাশে ও দোয়াব অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষের অগ্নিশিখা ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকে। এইসব অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ চাষী ও গ্রামবাসী সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়াতে তাদের মধ্যে আনুগত্য হ্রাস পায়। "দুর্বল ও নিঃসম্বল চাষীরা" বারানীর ভাষায়, "সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছিল এবং বিত্তবান কৃষকরা যাদের সঙ্গতি ও ক্ষমতা ছিল তারা বিদ্রোহী হয়েছিল। সমগ্র এলাকা বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। চাষাবাদ সম্পর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছিল।" দোয়াবের এইরূপ পরিস্থিতির কথা দূরদূরান্তরে চাষীদের কর্ণগোচর হওয়াতে তারাও ভবিষ্যতে তাদের উপর এই ধরনের হুকুমনামা জারি হবে মনে করে আনুগত্য ত্যাগ করে এবং চাষাবাদ ছেড়ে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। বারানী মন্তব্য করেছেন যে, সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক যে দুই বৎসর (১৩৩২-৪) দিল্লীতে ছিলেন দোয়াব অঞ্চল অতিরিক্ত কঠোরভাবে রাজস্ব দাবি করাতে এবং বিভিন্ন প্রকারের আবওয়াব বা অতিরিক্ত সেস আদায় করায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুরা শস্যের গোলায় অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে ফেলেছিল ও গোয়াল থেকে গরু বার করে দিয়েছিল। সুলতান শিকদার ও ফৌজদারদের এইসব অঞ্চল ধ্বংস করতে এবং লুণ্ঠন করতে হুকুম জারি করেছিলেন। তারা বহু খুট ও মুকদ্দমকে হত্যা করেছিল এবং অনেককে তারা অন্ধ করে দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে যেসব কৃষক সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল তারা দলবদ্ধভাবে জঙ্গলে আশ্রয়গ্রহণ করেছিল এবং দোয়াব ও তার আশপাশ অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। অতএব সুলতানের অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের নীতির ফলে একটি কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল জনশূন্য ও ধ্বংস হয়েছিল। বারানী সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের দোয়াবে রাজস্ব আদায়ের নীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে আরো বলেছেন যে, এইযুগে সুলতান শিকারের জন্য বারান জিলায় (বর্তমান বুলন্দশহর অঞ্চল) উপস্থিত হন এবং সমগ্র অঞ্চলটি লুটপাট করে ধ্বংস করার হুকুম জারি করেন। এছাড়া কনৌজ থেকে ডালামাও পর্যন্ত সমগ্র এলাকা সুলতান স্বয়ং লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেছিলেন। যাদের সুলতানের সৈন্যরা গ্রেপ্তার করতে পেরেছিল তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। অধিকাংশ জঙ্গলে পলায়ন করে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা করেছিল। সুলতানী সৈন্যবাহিনী বনাঞ্চল ঘিরে ফেলে যাকে পেয়েছিল তাকেই হত্যা করেছিল।**

বারানীর বক্তব্য থেকে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজস্বনীতির কঠোরতার ফলে এবং কৃষকদের কাছ থেকে জোরজবরদস্তি করে অতিরিক্ত কৃষিকর আদায়ের উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ করাতে একটি সুদরপ্রসারী কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল যার নেতৃত্বে ছিলেন উচ্চবর্গের কৃষকরা খুট ও মুকদ্দম প্রভৃতি। সুলতানের রাজস্ব ও কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত দাবি এতই উচ্চহারে ছিল যে, চাষীরা স্বভাবতই তা আদায়ে বাধাদান করেছিল। তাদের

* তারিখ-ই-মুবারকশাহী ইয়াহিয়া বিন আহমেদ আবদুল্লা সিরহিন্দী, পৃঃ ১০১-১০২, কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া পৃঃ ৬৩।

** তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, (বি আই) পৃঃ ৪৭২, ৪৭৯-৮০।

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে সুলতান রাজস্ব আদায়কারীদের শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতাদান করেন ও ফৌজদারের সৈন্যবাহিনী এমনকি আমিরন-ই-সদাদের প্রেরণ করেন। এর ফলে কৃষক অভ্যুত্থান দমনে দোয়াব অঞ্চলে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা অভূতপূর্ব। কারণ, অধিকাংশ এলাকায় কৃষকরা অতিরিক্ত রাজস্বদানে অপারগ হয়ে বনে-জঙ্গলে আশ্রয়গ্রহণ করে সুলতানের মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের নীতি ব্যর্থ করে দিয়েছিল। এইসব বনাঞ্চল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা ঘিরে ফেলে কৃষক বিদ্রোহ দমনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। সুলতান স্বয়ং এই ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেও সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ফলে দিল্লীর শস্যভাণ্ডার দোয়াব থেকে রাজস্ব আদায় বেশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আরব ভ্রমণকারী ইবন বতুতার বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, এমনকি ১৩৪২ সালেও কোল (আলিগড়) এবং তার আশপাশের গ্রামাঞ্চল বিদ্রোহীদের হাতে ছিল।*

বারানীর মতে, দোয়াবে অধিকাংশ এলাকা কৃষকদের চাষাবাদ পরিত্যাগের জন্য ও তাদের দুর্দশা বৃদ্ধি পাওয়াতে এইস্থান থেকে দিল্লীতে শস্য আমদানী হ্রাস পায় ও হিন্দুস্তানের অন্যান্য প্রদেশ থেকে শস্য আমদানী অপ্রতুল হয়ে পড়ে। যার ফলে দিল্লীতে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা দেয় ও দোয়াবের সর্বত্র তা প্রসারিত হয়। শস্যের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। এই সময় অনাবৃষ্টির দরুণ এই দুর্ভিক্ষ আরো চরম আকার ধারণ করে এবং ১৩৩৪-৫ সালে শুরু হয়ে প্রায় সাত বৎসর কাল এই দুর্ভিক্ষ স্থায়ী হয়েছিল।**

কৃষক বিদ্রোহের জন্য সুলতানের দায়িত্ব

রাজস্ব বৃদ্ধি ও কৃষকের উদ্বৃত্ত শোষণ ছিল শাসক গোষ্ঠীর অন্যতম লক্ষ্য। ইতিপূর্বে আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালে (১২৯৬-১৩১৬) কৃষকের উৎপাদনের শতকরা পঞ্চাশভাগ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হয়েছিল। কিন্তু তার ফলে কোন কৃষক অভ্যুত্থানের ঘটনার কথা শোনা যায় না। কিন্তু মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে (১৩২৫-১৩৫১) দোয়াবে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজস্ব বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে এক অভূতপূর্ব কৃষক বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই কৃষক বিদ্রোহের কারণ হিসেবে বিভিন্ন কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। আগা মহাদী হুসেনের মতে, খোরাসান বিজয়ের জন্য সংগৃহীত সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়ার পর বেকার সৈন্যরা দোয়াবের বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এছাড়া বাহাউদ্দীন ও কিসলি খানের বিদ্রোহ এবং উলেমা ও শেখদের সুলতানের প্রতি বিরূপ মনোভাব, সুলতানের নীতির ব্যর্থতা প্রভৃতি কৃষক বিদ্রোহের প্রসারের জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।*** কিন্তু সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সময় বারংবার বৈদেশিক আক্রমণ ও যুদ্ধবিগ্রহে দেশ ব্যতিব্যস্ত ছিল। মোঙ্গলদের লুণ্ঠন ও অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত করতে হয়েছিল এবং কঠোর অর্থনৈতিক নিয়ম প্রবর্তন করে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা বিধি প্রবর্তন করতে হয়েছিল। সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজীর রাজত্ব কালে (১৩১৬-১৩২০) এইসব নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শি[illegible] হয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৃষকের উপর শাসকগোষ্ঠীর রাজস্ব আদায়ের নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তনের কথা শোনা যায় না। এইসময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে হিন্দুস্তানে মোঙ্গল আক্রমণের ঘটনার কথা শোনা যায় না। অতএব আলাউদ্দীন খলজীর যুগের সংগৃহীত মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনীরও আর প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু এই সৈন্যবাহিনীর

---

* কেম্ব্রিজ, ইকনমিক, হিষ্ট্রি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪, ঐ।

** কেম্ব্রিজ, ইকনমিক, হিষ্ট্রি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৪।

*** A M Hussain, Rise and Fall of Muhammad Bin Tughlaq, পৃঃ ১৫১-১৫২, দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

প্রাক্তন সৈন্যরা কৃষকদের সঙ্গে যোগদান করে কোন বিদ্রোহের উস্কানী দিয়েছে বলে জানা যায়নি। অতএব দোয়াবে বেকার সৈন্যদের বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে যোগদান করার ফলে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল বলে অনুমান করা যায় না।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে রাজস্ব বৃদ্ধি বিশেষতঃ দোয়াবে কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের সিংহভাগ রাজস্বরূপে আদায়ের প্রচেষ্টা কোন অশ্রুতপূর্ব উপায়ে চাষীদের শোষণ করার প্রয়াস নয় যার ফলে তাঁর রাজত্বকালে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ হয়। এই যুগে কৃষক বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধান করতে হলে সুলতানের রাজস্ব আদায়ের নীতিকে দায়ী করতে হয়। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক রাজস্ব আদায়ের জন্য গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের উপর একইসঙ্গে আঘাত হেনে ছিলেন। প্রথমত তাঁর অদূরদর্শী নীতির ফলে স্থানীয় রায়, রানা, খুট, মুকদ্দম ও চৌধুরী ও চাষীরা সকলেই রাষ্ট্রের অতিরিক্ত রাজস্বের দাবিতে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। সুলতান আলাউদ্দীন খলজী রাজস্ব বৃদ্ধি করে উৎপাদিত শস্যের শতকরা পঞ্চাশভাগ আদায় করেছিলেন এবং কৃষকের উপর অতিরিক্ত করভার চাপিয়ে নগদে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ থেকে চাষীদের রক্ষা করার জন্য কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখা হ'ত এবং নিয়ম করা হয়েছিল, বিত্তবানদের উপর যে রাজস্ব বা করভার আছে তা দুর্বলদের উপর চাপানো যাবে না। অর্থাৎ রাজস্ব আদায়কারীর অত্যাচার থেকে কৃষককে রক্ষা করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক এরূপ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তিনি ভ্রান্ত রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতী অনুসরণ করে গ্রামাঞ্চলে খুট, মুকদ্দম, চৌধুরী ও চাষীদের সবার বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সকল স্তরে মানুষের বিরোধিতায় তাঁর নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। দোয়াব এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৃষকেরা চাষাবাদ ত্যাগ করে বনেজঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সুলতান তাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই কঠোর নীতির ফলে রাষ্ট্র রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, প্রজাসাধারণের আনুগত্যও হারিয়েছিল। অনাবৃষ্টির ফলে শস্যের হানি ও দুর্ভিক্ষ মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে কৃষক বিদ্রোহের আরেকটি কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছিল।

মধ্যযুগের ভারতে জনসংখ্যার অপেক্ষা আবাদযোগ্য ভূমি বেশী ছিল। কারণ, দেশের অনেক জায়গা অনাবাদী ছিল এবং চাষাবাদের অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। কৃষকের উপর অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য জোরজবরদস্তি করলে তাদের নতুন স্থানে বসতি স্থাপন ও আবাদ করে চলে যাবার সম্ভাবনা ছিল। মহম্মদ বিন তুঘলক এরূপ একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং অবশেষে এই সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্য দোয়াবে এবং অন্যান্য স্থানে যেখানে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার সংশোধনের জন্য কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

দেওয়ান-ই-আমির কোহী

বারানী সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে অতিরিক্ত রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কৃষিক্ষেত্রে এই বিপর্যয় দেখে সুলতান চাষাবাদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। রাজস্ব বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টার একটা সম্পর্ক আছে। রাজস্বের অতিরিক্ত বৃদ্ধি যেমন চাষের অবনতির কারণ হয়েছিল তেমনি কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয় লক্ষ্য করে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য পরবর্তীকালে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক শস্য উৎপাদনে উন্নতি ও আবাদের প্রসারের জন্য প্রয়াস করেছিলেন।

এই কারণে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে কৃষকদের আবাদের প্রসার এবং কৃষি উন্নতির ও কূয়াখননের জন্য সোনধার বা অগ্রিম ঋণ

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। এই ধরনের কৃষি-ঋণ পরবর্তীকালে মুঘল শাসন-ব্যবস্থায় ও বর্তমানকালে অনুসৃত হয় এবং তাকাভী নামে সুপরিচিত।* ১৩৪৬-৪৭ সালে মহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লীতে যখন বসবাস করছিলেন সেইসময় চাষের উন্নতির জন্য একটি সুদরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছিল। বিভাগ যে মন্ত্রকের অধীন ছিল তাহাকে দেওয়ান-ই-আমির-কোহী নাম দেওয়া হয়। এই বিভাগের অধীনে কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁরা বিশাল ভূখণ্ডের আবাদ করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন এবং এর প্রতিটি অংশে তাঁদের শস্য বপন করার জন্য বলা হয়েছিল। এই শস্য বপনের সময় বিভিন্ন ক্ষেতে যে বীজ ইতিপূর্বে চাষ করা হত তার বদলে অন্যপ্রকার বীজ বপন করতে নির্দেশ দান করা হয়। ফলে গমের বদলে বার্লি, আখের বদলে গম, খেজুরের বদলে আখ এইভাবে নানা জমিতে নানাপ্রকার শস্যবীজ অদলবদল করে বপন করার নির্দেশ ছিল এবং প্রায় ১০০ শিকদার এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। এছাড়া সুলতানের এই পরিকল্পনার সুযোগে অনেক সুবিধাবাদী ও অর্থলোলুপ ব্যক্তি খাজাঞ্চিখানা থেকে নানাধরনের সহায়তা ও ঋণগ্রহণ করে চাষাবাদের প্রসার ও পতিত জমি উদ্ধার করার নামে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করেছিল। অসৎ রাজকর্মচারীরাও এই অজুহাতে সরকারী খাজাঞ্চিখানার অর্থ তছনছ করেছিল। বারানীর মতে দুই বৎসরের মধ্যে প্রায় সত্তর লক্ষ বা ততোধিক তংকা যারা পতিত জমি উদ্ধার করে চাষাবাদের প্রসার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাদের দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই এলাকার একশভাগ এমনকি হাজারভাগের জমিতে পরবর্তী তিন বৎসরেও চাষাবাদ প্রসারিত হয়নি। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক ১৩৫১ সালে সিন্ধুতে থাট্টা অঞ্চলে তাঘির বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত থাকাকালে আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। যদি তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করতেন তাহলে এইসময় অসৎ রাজকর্ম্মচারী ও জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে যারা সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করেছিল তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হ'ত।**

মহম্মদ বিন তুঘলকের পরবর্তীকালে রাজস্বনীতি

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক তার পূর্বসূরীর কৃষি সংক্রান্ত সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছিলেন এবং কৃষিতে সেস আদায় করার প্রথা তুলে দিয়েছিলেন। খরাজের উপর শতকরা ৪ ভাগের বেশী কোন আদায় ফিরোজ নিষেধ করে দিয়েছিলেন বলে সমকালীন ঐতিহাসিক শামসী সিরাজ আফিফ দাবি করেছেন।*** এছাড়া সুলতান ফিরোজ 'ঘারী' ও 'চরাই' আদায় বন্ধ করে কৃষকের অবস্থার উন্নতি বিধান করেন। কিন্তু এইসব কর তুলে দিলেও ফিরোজ শাহ তুঘলক অমুসলমানদের মাথাপিছু জিজিয়া আদায় করেন। ইতিপূর্বে ভূমিরাজস্বকেই খরাজ-জিজিয়া বলে উল্লেখ করার প্রচলন ছিল এবং কৃষকের কাছে আলাদাভাবে জিজিয়া বলে কোন কর আদায় করা হত না। এখন থেকে আলাদাভাবে জিজিয়া আদায়ের ফলে কৃষকের উপর একটি মাথাপিছু কর বসেছিল যার থেকে নারী ও শিশুদের স্বভাবত বাদ দেওয়া হ'ত। কাজেই ঘারী নামক করটি তুলে দিলেও তার স্থলে প্রায় একই ধরনের একটি কর বা জিজিয়া কৃষকের কাছ থেকে আদায় করা হত।**** যেসব চাষের জমি সরকারী খাল খননের ফলে লাভবান হয়েছিল সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে (১৩৫১-৮৮) একটি জলকর বা হক-ই-

* কেম্ব্রিজ ইকনমিক, হিস্ট্রি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫ দ্রষ্টব্য।

** তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী-জিয়াউদ্দীন বারানী, পৃঃ ৪৯৮-৯৯।

*** কেম্ব্রিজ, ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ-৬৬।

**** ঐ, পৃঃ ৬৬।

www.pathagar.com

শিরাব আদায় শুরু হয়। প্রধানত বর্তমান হরিয়ানা প্রদেশে এইসব খাল ছিল এবং এইখানে পূর্বোক্ত কর আদায় করা হ'ত বলে কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই হক-ই-শিরাব ছিল উৎপাদনের এক দশমাংশ। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালে প্রজাসাধারণ বিশেষতঃ কৃষকরা সমৃদ্ধির মুখ দেখেছিল বলে সমকালীন লেখকরা দাবি করেছেন। শামসী সিরাজ আফিফের বক্তব্য অনুসারে তাঁর রাজত্বকালে কোন দুর্ভিক্ষ দেখা যায়নি। একই লেখক বলেছেন যে, শস্যের মূল্য কোন কোন সময় বৃদ্ধি পেয়ে 'মন' প্রতি সাময়িকভাবে এক তংকা হয়ে যেত। কিন্তু এই পরিস্থিতি বেশীকাল স্থায়ী থাকতে দেওয়া হয়নি। সুলতান ফিরোজ শাহ তাঁর খান, মালিক ও জমির ফাটকাবাজদের উদার ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে তাঁর সময় জাগীর প্রথার বহুল প্রচলন হয় এবং জমি নিয়ে ফাটকাবাজি শুরু হয়েছিল। কিন্তু তিনি বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন। যারমধ্যে চাষের উন্নতির জন্য তিনি যে পাঁচটি খাল খনন করেছিলেন সেগুলি অন্যতম।* খরাজ, জিজিয়া, জাকৎ ও খামস এই চারটি কর শরিয়তের বিধি অনুসারে আদায় করা অনুমোদিত ছিল। অন্যান্য ২৪টি সেস এবং সবজির জন্য যে কর ইতিপূর্বে চালু ছিল তা তুলে দেওয়া হয়। জিজিয়া থেকে ব্রাহ্মণরা এতদিন বাদ পড়েছিলেন কিন্তু ফিরোজ শাহ তাঁদের এই করের আওতায় আনেন। কেবল বৃদ্ধ, অশক্ত, বেকার, নারী ও শিশুরা, অন্ধ ও উন্মাদ প্রভৃতিরা জিজিয়া দিতেন না। এই জিজিয়া কেবলমাত্র জিম্মি বা ইসলামের রাজত্বে 'সুরক্ষিত' অন্য ধর্মের লোকেদের কাছ থেকে, সামরিক কাজ থেকে অব্যাহতি লাভ ও সুরক্ষার জন্য, নেওয়া হ'ত। ধনী, মধ্যমশ্রেণী ও সাধারণ খেটে-খাওয়া লোকেদের কাছে জিজিয়া বিভিন্ন হারে আদায় করা হত। ফিরোজ ব্রাহ্মণদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাদের সর্বনিম্ন হারেরও থেকে কম জিজিয়া দান করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে খরাজ বা ভূমি রাজস্বকেই খরাজ-ই-জিজিয়া বলে উল্লেখ করার প্রচলন ছিল। ধনী মুসলমানদের জাকৎ বা সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ অংশ অথবা শতকরা আড়াইভাগ সোনা, রূপা ও মূল্যবান সম্পদ থেকে দরিদ্র মুসলমানদের জন্য দান করতে বলা হয়। যুদ্ধে লুণ্ঠিত সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য ছিল এবং তাকে খামস বলা হত। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক প্রজাদের উপর থেকে করের ভার লাঘব করতে সচেষ্ট ছিলেন।

তুঘলকদের পরবর্তীযুগ

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের পরবর্তীযুগে বিকেন্দ্রীকরণ শক্তির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষকরা ভূমিকর ও রাজস্ব দিলেও সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা না হয়ে প্রাদেশিক শাসক বা স্থানীয় বংশানুক্রমিক অথবা পিতৃপুরুষের থেকে প্রাপ্ত স্থানীয় শাসকদের খাজাঞ্চিখানা পূর্ণ করত। পরবর্তীকালের লোদীদের আমলে আমির-ওমরাহ ও মালিকরা ভূমিকর ও রাজস্ব নগদের পরিবর্তে কৃষকের কাছ থেকে শস্য ও ভূমির উৎপাদন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন এবং প্রয়োজনে যে কোন মূল্যে তা বিক্রয় করতে রাজি হতেন। এই পরিবর্তনের মূল কারণ হ'ল রৌপ্যের অভাবের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র মূল্যমান হ্রাস। ফলে কৃষকদের পক্ষেও নগদে ভূমিরাজস্ব দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অতএব কৃষকরা যাতে সহজে ভূমিকর ও ভূমিরাজস্ব দিতে সক্ষম হয় সেই জন্যই সম্ভবতঃ সুলতান ইব্রাহিম তাদের কাছ থেকে পাওনা ভূমিরাজস্ব উৎপাদিত ফসল থেকে মিটিয়ে নেবার জন্য রাজস্ব সংগ্রহকারীদের প্রতি পরোয়ানা জারি

* শামসী সিরাজ অফিফ পৃঃ ২৯৫, বারাণী ৫৫২-৫৪, ৫৭১, ৫৭৪ ইত্যাদি। সুলতান ফিরোজ যে সব সেচ খাল খনন করেন তার বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইয়াহিয়া লিখিত তারিখ-ই-মুবারক শাহী (ইং অনুবাদ, কে. কে. বসু' পৃঃ ১৩০-৩১, ১৩৭ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

করেছিলেন। কিন্তু যখন আমেরিকা মহাদেশ থেকে লব্ধ রৌপ্য আমদানী শুরু হল তখন মূল্যমানও বৃদ্ধি হতে শুরু করে। ফলে পুনরায় নগদে ভূমিরাজস্ব আদায়ের পথে সকল বাধা অপসারিত হয়। অতএব শের শাহর (১৪৪০-৫) অধীনে পুনরায় নগদে ভূমিরাজস্ব আদায় করার প্রথা চালু হয়েছিল এবং আকবরের রাজত্বকালে নগদে ভূমিরাজস্ব গ্রহণ পদ্ধতিই বহাল রাখা হয়েছিল।

বাণিজ্য, বণিক ও কারিগর

সুলতানী আমলে শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পণ্যের চাহিদা নগরের জনবহুল বিশেষতঃ অভিজাত অঞ্চলে ব্যবসা ও বাণিজ্যকে প্রসারিত করেছিল। এছাড়া উপকূলবর্তী সামুদ্রিক বাণিজ্য হিন্দুস্তানের সঙ্গে প্রাচীনযুগ থেকে পারস্য উপসাগর ও সেখান থেকে স্থলপথে মেসোপটেমিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত চলত। এছাড়া সামুদ্রিক বাণিজ্য লোহিতসাগর হয়ে মিশরের পথে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। ভারত ও সিন্ধুর থেকে পণ্য ইরাক ও খোরাসানে রপ্তানী হত এবং হরমুজ হয়ে পরেসিক উপসাগর পর্যন্ত যেতে। জেড্ডা ও এডেনে ভারতীয় বণিকদের উপনিবেশ ছিল এবং এই দুইটি অঞ্চল লোহিতসাগরের বন্দরগুলির পণ্য সরবরাহের কেন্দ্র ছিল। এই বন্দর দুইটির নিকটবর্তী ধোফার (Dhofar) বন্দর থেকে ভারতে অশ্ব রপ্তানী করা হত। প্রথমের যুগে আরবরা সিন্ধুর দেবল বা দেওলকেই প্রধান বন্দর হিসাবে ব্যবহার করলেও পঞ্চদশ শতকে সিন্ধুনদের নিম্নভাগে লাহিড়ী ভাণ্ডারের বন্দর হিসাবে গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। গুজরাটের ক্যাম্বে, দিউ, সুরাট, রানাডে প্রভৃতি পোতাশ্রয় থেকে লোহিতসাগর, পূর্ব আফ্রিকা, হরমুজ ও মালাবারের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রসিদ্ধ বন্দরগুলির মধ্যে মালাবার ও মালাক্কার নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময় শেষোক্ত পোতটি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম বন্দর বলে গণ্য হ'ত এবং বিভিন্ন দেশীয় বণিকরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার লাভজনক ব্যবসাবাণিজ্য ছিল। এই সময় ভারত ও চীনের মধ্যে লাভজনক ব্যবসা বাণিজ্য চলছিল।

সুলতানী যুগে বিশেষতঃ চতুর্দশ শতকে নগদে লেনদেন বৃদ্ধি পায় ও সরাসরি নগদ টাকায় কারবার চালানোর রীতি জনপ্রিয় হয়েছিল। দিল্লীর ন্যায় সুবিশাল রাজধানী শহরের বিশাল বিস্তৃতি ও তার জনসংখ্যার চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে শাসকশ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি নজর দিয়েছিলেন। দেবগিরী (দৌলতাবাদ) ক্যাম্বে, লাহোর, মূলতান, লখনৌতি, অনহিলওয়াড়া (পত্তন), কারা ইত্যাদি বহু নগরে এইসময় বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির পরিপূর্ণ প্রসার সমগ্র সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়। সুলতানী আমলে নগরায়ণ ও অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে ছিল গ্রামাঞ্চলের শোষণ।

গ্রাম থেকে শহরে খাদ্য, রসদ ও কাঁচামাল আসত। গ্রামাঞ্চলের কৃষিকর ও রাজস্বের পরিমাণ এই সময় অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালে (১২৯৬-১৩১৬) রাজস্ব ছিল সর্বোচ্চ অর্থাৎ উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ। বারানীর বক্তব্য অনুসারে কৃষকরা শস্যক্ষেত্রের পাশেই উদ্বৃত্ত ফসল কারবানী বা শস্য-পরিবহনে দক্ষ বণিকদের কাছে (সমবেতভাবে চলমন কারবাণী) বিক্রয় করত। দশ বা বিশহাজার বলদের পৃষ্ঠে যারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খাদ্যশস্য শহরে আনত সমকালীন সুফীরা তাদের 'নায়ক' (nayaks) বলে অভিহিত করেছেন। এই সময় গোযান অপেক্ষা বলদের পৃষ্ঠে খাদ্যশস্য পরিবহনের ব্যবস্থা চালু

www.pathagar.com

ছিল। মুর ভ্রমণকারী ইবন বতুতা বলেছেন যে, আমরোহা থেকে দিল্লীতে ৩০,০০০ মণ শস্য ৩ হাজার বলদের পৃষ্ঠে বহন করা হত। সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি এক কঠোর ও নরম পদ্ধতীর সংমিশ্রণ ছিল যার ফলশ্রুতিতে শস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছিল। বারাণী বলেছেন যে, সুলতান কারবানীদের পরিবারবর্গকে গবাদিপশু ও তৈযর্জপত্র জামিনে আটক রেখে শস্যসরবরাহ অব্যাহত রাখতে বাধ্য করতেন। কারবানীদের প্রধানদের সুলতান প্রয়োজনে কারাগারে নিক্ষেপ করার ভীতি প্রদর্শনও করতে দ্বিধা করতেন না। অপরদিকে, নাসিরউদ্দীন বলেছেন যে, সুলতান আলাউদ্দীন নায়কদের মহার্ঘ পোষাক, খাজাঞ্চিখানা থেকে অর্থ সাহায্য দান (ঋণ হিসাবে ধরা যায়) ও পারিবারিক দায়িত্বের ভারগ্রহণ করে শহরে শস্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিলেন। অন্তত, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুলতানের রাজত্বকালে ব্যবসায়ীদের হাতে যে মূলধন মজুত ছিল তা শস্য ক্রয় ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। গ্রাম থেকে শহরে খাদ্য ও কাঁচামাল আসত কিন্তু তার বদলে শহরের কোন পণ্য গ্রামের প্রয়োজন ছিল না। গ্রামাঞ্চলের উপর যে পাহাড় পরিমাণে করের বোঝা ছিল তাতেই গ্রাম ও শহরের লেনদেনেরও হিসাব-নিকাশের ভারসাম্য রক্ষিত হত।

সমগ্র দেশে বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য সুলতানী আমলে কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল যাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ রক্ষা পায়। সমগ্র দেশে শিরা-উপশিরার মত পাকা রাস্তা ও পায়ে চলার পথ ছড়িয়ে ছিল। বড় বড় সড়ক যা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করত তাদের মাঝে মাঝে কিছু দূর অন্তর বুরুজ দিয়ে পথের নিশানা দেওয়া হত এবং চারিটি তীরের পাল্লার দূরত্বে একটি করে সরাইখানার ব্যবস্থা ছিল। গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আয়জ খলজী একটি সুবিশাল বাঁধ তৈয়ারী করে তার সহায়তায় বন্যা প্রতিরোধক সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। অর্থব্যায় করে ধনীরা অশ্বারোহনে এবং সাধারণ লোকে গোযানে পরিবহনের ব্যবস্থা করত। সরকারের নিজস্ব ডাক (বারিদ) ছিল। সরকারী সংবাদ বদলী ঘোড়সওয়ারের মারফতে দ্রুত প্রেরণের ব্যবস্থা চালু ছিল। বেসরকারীভাবে প্রাপকদের নাম বাজারে ঘোষণার মারফতে স্থান থেকে স্থানান্তরে পত্রবিলিরও প্রথা প্রচলিত ছিল। দূরদূরান্তরের বাজারে যে সব পণ্য এইসব বাণিজ্যের মারফতে লেনদেন হ'ত তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত। স্থলপথে প্রধানতঃ অশ্বের আমদানী হত ও প্রধান রপ্তানীর মধ্যে ছিল ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী। এই ধরনের বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল মূলতান। আমদানীকৃত পণ্যের মধ্যে রেশম ছিল লাভজনক। এই পথেই ইরান ভারত থেকে নীল নিয়ে যেত। মূলতানের নিজস্ব প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নানা পণ্য যথা মিছরী ও ঘি যথাক্রমে দিল্লী ও লাহোর এবং সরসৌতি (সিরসা) থেকে আমদানী করত।

মূলতানে আমদানী ও রপ্তানীকৃত পণ্যের অধিকাংশ হয় পুনরায় দিল্লী থেকে রপ্তানী হ'ত অথবা দিল্লীতেই গৃহীত হত। দিল্লীতে অশ্বের ও ক্রীতদাসের জমজমাট দুইটি বাজার ছিল। আমরোহা থেকে খাদ্যশস্য, কোল (আলিগড়) ও মিরাট থেকে মদ, মালবের ধর থেকে পান পাতা, আউধ (অযোধ্যা) থেকে মোটা কাপড়, দেবগিরি থেকে মসলিন, লখনৌতি (বঙ্গদেশ) থেকে বিভিন্ন রঙের রঙীন কোরা কাপড়, সুদর তাব্রিজ (ইরান) থেকে ব্রোকেড আমদানী হ'ত।

অশ্বের ব্যবসা বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলার রাজধানী নদীয়াতে প্রথম পদার্পণ করার সময় তাঁকে ও তাঁর সঙ্গী অশ্বারোহীদের দেখে লোকে তাদের অশ্বব্যবসায়ী বলে ধরে নিয়েছিল। বঙ্গদেশ হিমালয় অঞ্চল থেকে অশ্ব আমদানী করত। সাইমন ডিগরী অনুমান করেন যে, এই ঘোড়াগুলি হিমালয়ের টাট্টু ঘোড়া নয় দক্ষিণপশ্চিম চীনের উন্নতমানের অশ্ব।

www.pathagar.com

বণিক

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিভিন্ন শ্রেণীর বণিকের দ্বারা পরিচালিত হত। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা মধ্যএশিয়া থেকে দিল্লীতে লাভজনক ব্যবসার জন্য আসতেন। দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত হবার জন্য বিহার থেকে আগত এক সূফী গজনী ও দিল্লীর বাজারে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হয়েছিলেন। এমনকি ত্রয়োদশ শতকেও গুজরাটের হিন্দু বণিকরা তাদের সততার দ্বারা মুসলমানদের মনে দাগ কেটেছিলেন। তারা সঠিক দামে পণ্য বিক্রয় করত বলে কোন দরাদরি হ'ত না। লাহোরের বণিকরা ক্রেতার কাছে পণ্যের বিক্রিয়মূল্য দ্বিগুণ করে বলত। এই ধরনের লেনদেনের অভ্যাস গুজরাটের বণিকরা জঘন্য বলে মনে করতেন। তাদের প্রশ্ন ছিল এই ধরনের ব্যবসায়িক অভ্যাস যে শহরে তার অস্তিত্ব কি করে বেশী কাল বজায় থাকা সম্ভব? সুলতান ইলতুৎমিসের পুত্র মুইজউদ্দীন বহরাম শাহর রাজত্বকালে (১২৪১ খ্রীঃ) মোঙ্গলরা লাহোর আক্রমণ করলে এখানকার বণিকরা বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে মুক্তি মালিক কারাকুসের সঙ্গে কোন রূপ সহযোগিতা করেনি কারণ মধ্যএশিয়াতে মোঙ্গল খানেদের অনুমোদনপত্র নিয়ে তাঁরা বাণিজ্য করতেন। কিন্তু যখন মোঙ্গলদের হাত থেকে শহর মুক্ত হল তখন এইসব প্রভাবশালী বণিকদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়নি।* কারণ দিল্লীর সুলতানরা বিদেশ থেকে ক্রীতদাস ও ঘোড়া এবং অন্যান্য বহু পণ্য আমদানীর জন্য বণিকদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। অনেকের মতে দূরদূরান্তরের বাণিজ্যের অনেকটা মূলাতানী বা মূলতানের অধিবাসী বণিকদের হাতে ছিল। হামিদউদ্দীন নামে মূলতানের একজন ধনী বণিক তিনপুরুষ ধরে সুদে ধার দেওয়া ছাড়া আর কিছুই জানতেন না। সুলতান আলাউদ্দীনের সময় তিনি দিল্লীর প্রধান কাজি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুফীরা অনেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন এবং সুলতানের নিজস্ব ব্যক্তিগত কক্ষে পূর্বে অনুমোদন গ্রহণ না করেও তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল। বণিকদের প্রধান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মোগলযুগের শেষার্ধ পর্যন্ত মালিকুত- তুজ্জা বলে অভিহিত করা হত।

সুলতানী যুগে ও মুঘল আমলে হিন্দু বণিকরা স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা লাভ করতেন। সাধারণতঃ তাদের মূলতানী ও সাহু বলা হত। দূরদেশের বাণিজ্যে সাধারণত মূলতানের বণিকরা নিযুক্ত হতেন বলে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানী ও রপ্তানীতে ব্যাপৃত বণিকরা সকলেই মূলতানী নামে অভিহিত হতেন। এঁদের মধ্যে কেও কেও নিশ্চয় মুসলমান ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বারাণী যেভাবে তাদের ও সাহুদের একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন তাতে অনুমান হয় যে, তারা অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন এবং বাণিজ্য ও সুদে অর্থবিনিয়োগ করতেন। তৎকালীন যুগে এইসব বণিকরাই ব্যাঙ্কের কাজ করতেন।

আলাউদ্দীন খলজী যখন বিলাসদ্রব্যের মূল্যহ্রাসের প্রচেষ্টা করেন তখন মূলতানীদের বিশ লক্ষ তংকা অগ্রিম দিয়ে দিল্লীতে উৎকৃষ্ট মানের পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। তৎকালীন যুগের অভিজাতরা প্রয়োজনে মূলতানী ও সাহুদের কাছ থেকে নগদে তংকা ঋণ হিসাবে গ্রহণ করতেন। সুলতান বলবনের সময় (১২৬৬-৮৬) দিল্লীর অভিজাতরা মূলতানী ও সাহুদের কাছ থেকে প্রচুর ঋণ গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন।

অভিজাতরা অগ্রিম স্বীয় ইকতার উপর কবজাহ বা ড্রাফটের (Draft) মারফতে মূলতানীদের ঋণ পরিশোধ করতেন। যখনই কোন অভিজাত তাঁর দরবারে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আহ্বান করতেন তখন এই অভিজাতদের অনুগত কর্মচারীরা কবজাহ বা ড্রাফ্‌ট (Draft) দিয়ে সুদসহ সাহুদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন। বারাণীর বক্তব্য থেকে এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, এমন কি সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর কঠোর শাসনের সময়ও মূলতানী ও

* Riziv, The Wonder That was India, Vol-II, পৃঃ ২২৬। তবকত ই নাসিরী (ইং অনুবাদ রাভের্টী) পৃঃ ৬৫৫-৬৫৬, পাদটিকা।

www.pathagar.com

অঞ্চল থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত খনি এলাকা ছড়ানো ছিল। কচ্ছ থেকে প্রাপ্ত লৌহর দ্বারা নির্মিত কোরিজের তরবারির সুনাম সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল এবং একাদশ ও দ্বাদশ শতকের প্রাপ্য তথ্য (Geniza records) থেকে জানা যায় যে, এইসময় মধ্যপ্রাচ্যে দাক্ষিণাত্য থেকে লৌহ ও স্টীল রপ্তানী করা হত। অন্যান্য খনিজ অঞ্চল কেবলমাত্র আইন-ই-আকবরী ও সপ্তদশ শতকের তথ্য থেকে সনাক্তকরণ করা সম্ভবপর হয়েছে। সম্ভবত, রাজস্থানের খনিগুলিতে মুঘলযুগের ন্যায় তাম্র উৎপাদিত হত। স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে ভারতের উৎপাদন ছিল সীমিত। এই জন্য অধিকাংশ স্বর্ণ ও রৌপ্য ভারতে বিদেশ থেকে আমদানী করা হ'ত এবং এইসব মূল্যবান ধাতু কখনই রপ্তানী করা হ'ত না। হীরকের খনিগুলি দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিল। পঞ্চদশ শতকে গণ্ডোয়ানার খনিতে হীরক পাওয়া যেত। আইন-ই-আকবরীতে কালিঞ্জরের হীরকখনির ন্যায় অন্যান্য খনির কথা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বে এইসব খনি সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া মর্কোপোলো তুতিকোরিণে মুক্তা আহরণের উদ্দেশ্যে সুক্তি সংগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন।

বয়ন শিল্প ঃ হিন্দুস্তানে বয়নশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, চিনি, নীল ও কাগজ শিল্পের গুরুত্ব ছিল অগ্রগণ্য। গুণগত দিক দিয়ে উচ্চমানের বিলাসপণ্যের একাংশ বাইরের থেকে আমদানী করা হ'ত। তৎকালীন যুগের শিল্পের মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল বয়ন শিল্প। অধ্যাপক ইরফান হাবিব দাবি করেছেন যে, চরকার প্রবর্তনের ফলে সূতীবস্ত্রের উৎপাদনের কারিগরিতে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন করা সম্ভবপর হয়েছিল। দক্ষিণী ঐতিহাসিক ইসেমী ১৩৫০ সালে সম্ভবত সর্বপ্রথম সুলতান রাজিয়া (১২৩৬-৪০) সম্পর্কে আলোচনা সূত্রে মন্তব্য করেছিলেন, 'সেই মহিলাকেই একমাত্র উত্তম বলা যায় যিনি সর্বদা চরকায় কাজ করেন কারণ সাম্মানিক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হলে মেয়েদের বুদ্ধিভ্রংশ হবার সম্ভাবনা আছে।'* ইরানে দ্বাদশ শতকের কবি আনওয়ারী ও নিজামীর কাব্যে এই চরকার অস্তিত্বের ইংগিত পাওয়া যায় এবং সেইজন্য ইরফান হাবিব মন্তব্য করেছেন যে, চরকা হিন্দুস্তানে মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে এসেছিল এবং ১৪শ শতকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল। তকলীর পরিবর্তে চরকার প্রচলনের ফলে সুতোর উৎপাদন প্রায় ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একাদশ ও দ্বাদশ শতকের দুইটি অভিধানে উল্লিখিত পিনজানা শব্দে আসলে ধুনুরীর তুলোধোনার যন্ত্র সম্পর্কে ইংগিত আছে বলে স্বীকার করে নিলেও কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার (১ম খণ্ড) লেখকের অভিমত অনুসারে এই গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রটি হিন্দুস্তানে অবশ্যই মহম্মদ ঘুরীর এদেশ বিজয়ের পূর্বাহ্নেই এসেছিল। একাদশ শতকে মুসলিম জগতে এই যন্ত্রের প্রচলনের সম্পর্কে ফার্সী কবি আসীরউদ্দীন আখসীর কাব্যে উল্লেখ পাওয়া যায় ও এই যন্ত্রটি মুসলমানদের আগমনের পরে হিন্দুস্তানে প্রবর্তিত হয়েছিল**। চরকা ও ধুনুরীর তুলোধোনার যন্ত্রর প্রচলন সুলতানী আমলে বয়ন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করেছিল এবং সুতোর মূল্যহ্রাসের সহায়ক হয়েছিল। এই যুগে পূর্বেকার তুলনায় তাঁতীর কারিগরিতে যে উন্নতি সম্ভব হয়েছিল তাতে সুতী উৎপাদনের বৃদ্ধির দরুন তাঁতীদের সংখ্যাও স্বভাবতঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সম্ভবতঃ এই সময় থেকে মাথাপিছু হিন্দুস্তানের জনগণের ব্যবহারযোগ্য পরিধানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

হিন্দুস্তানে এই সময় যে সব বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র উৎপাদন করা হত তাদের নাম জানা থাকলেও তাদের 'মান' সম্পর্কে বা অন্য কোন বিষয়ে জানা যায়। দরিদ্র ও দরবেশরা যে বস্ত্র

---

*কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ১ম খণ্ড, দ্রষ্টব্য, It has been suggested that there was an important improvement in cotton production technology through the introduction of spinning wheel.' (পৃঃ ৭৭)।

www.pathagar.com

ব্যবহার করত তাকে 'পট' বলা হত। সাধারণত দিল্লীতে এই ধরনের বস্ত্র অযোধ্যা থেকে আনা হত। তুর্কী ও সৈনিকদের জন্য ব্যবসায়ীদের পক্ষে মিহিন বস্ত্র আমদানী করা আবশ্যিক ছিল। অভিজাত ও ধনীরা শ্রীহট্ট ও দেবগিরির মসলিন ব্যবহার করতেন। এছাড়া ছিল মূল্যবান ক্যালিকোর (kirpas) বস্ত্র। সুতী, রেশমী-পশমী প্রভৃতি নানা ধরনের বস্ত্র ব্যাপকভাবে হিন্দুস্তানে বয়ন শিল্পের মারফতে উৎপাদিত হত। কিন্তু অভিজাতদের ব্যবহারের জন্য নানা ধরনের মিহি কাপড় যথা ভৈঁরো, সলাহাতি, শিরিন বাফতা ইত্যাদি উৎপাদন করা হ'ত এবং শীতকালে নানাধরনে পশুলোমের তৈরী বস্ত্র ধনীরা ব্যবহার করতেন। এইসব বস্ত্রের কারুশিল্পে শিল্পীদের অসাধারণ নৈপুণ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আমীর খসরুর লেখনী থেকে জানা যায়। দিল্লী, দেবগিরী, বাংলাদেশ, গুজরাট ও অন্যান্য শহরে রুচিসম্মত সূক্ষ্মবস্ত্র উৎপাদন হ'ত ও মসলিন পট্টবস্ত্র ও জরির কাপড়ের মজুত ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল। দেশে ব্যাপক তুলো চাষ হ'ত। পশমের সরবরাহের জন্য মেষপালন করা হ'ত। পার্বত্য অঞ্চল ও সমভূমিতে মেষপালনের ফলে পশমের উৎপাদন যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ধনীরা দামী ফার ও পশম অনেক সময় বিদেশ থেকে আমদানী করত।

সাধারণতঃ হিন্দুস্তান থেকে বিদেশে তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানী করা হ'ত। এই রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুজরাট ও বঙ্গদেশের তুলাজাত পণ্য ও অন্যান্য উৎপাদিত শিল্প সামগ্রীর চাহিদা ছিল। এ সম্পর্কে আমির খসরুই কেবল নয় বিদেশী পর্যটকদের বিবরনী থেকেও জানা যায়। মাহুয়ান বার্থেমা ও বার্বোসা সকলের দাবিতেই বঙ্গদেশের সূক্ষ্ম মসলিনের সৌন্দর্য ও নানা বৈচিত্র আকর্ষণীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশের শাসনকর্তা বুঘরা খাঁ স্বীয় পুত্র ও দিল্লীর সুলতান কায়কোবাদকে বঙ্গদেশের সূক্ষ্ম বস্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। বঙ্গদেশে উৎপন্ন মাথার পাগড়ী বা শিরবন্দ ও ইউরোপীয় মহিলাদের ব্যবহৃত স্কার্ফ জাতীয় কাপড় সম্পর্কে এবং বিভিন্ন ধরনের এ-দেশীয় মহিলাদের পরিধেয় শাড়ী যথা নমন, লিজতি, কৈঁতার, দৌজার, সিনরফ ইত্যাদির বিষয়ে বার্থেমার বিবরণীতে পাওয়া যায়। হিন্দুস্তানে কাগজের ন্যায় গুটি পোকার চাষ চীন দেশ থেকে এসেছিল এবং বঙ্গদেশে গুটিপোকা চাষ চালু ছিল। বাংলাদেশের নিজস্ব প্রয়োজনে রেশম ও সূতীবস্ত্র, শাড়ী ও ধুতী বিপুল পরিমাণে বোনা হত। এ বিষয়ে গুজরাটও পিছিয়ে ছিল না। বার্থেমার মতে কাম্বে হিন্দুস্তানের রপ্তানীকৃত বস্ত্রের অর্ধেক যোগান দিত। শেষোক্ত স্থানের রেশমবস্ত্র এতই মূল্যবান ছিল যে এই ধরনের কাপড় সুলতান আলাউদ্দীন খলজী স্বনিয়ন্ত্রনে রেখেছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত অন্যান্য নানাধরনের সুতীবস্ত্রের উৎপাদন এখানে হ'ত। কেবলমাত্র সুতীবস্ত্র নয় মসলিন, তাফতা, সার্টিন গালিচা ইত্যাদি গুজরাট থেকে সরবরাহ হ'ত। কাপড় রঙ করার জন্য রঞ্জন শিল্প জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।* রেশম ও সিল্কের বস্ত্র বয়নে দিল্লীর তাঁতীরা দক্ষ ছিল। গুজরাটের সিল্কের কাপড় ও পট্টল বস্ত্র ছিল অতুলনীয়। উপরুক্ত স্থানে বোনা কাপড়ে নানাধরনের নক্‌সা দেখা যেত। আলাউদ্দীন খলজী দেবগিরী লুণ্ঠন করে যেসব অমূল্য ও মহার্ঘ্য জিনিস এনেছিলেন বারানী তার মধ্যে পট্টলের কথা উল্লেখ করতে বিস্মৃত হননি। দশশতকের পূর্বেই কাশ্মীরের শাল শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক চীনা সম্রাটকে কাশ্মীরী শাল উপহার হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের গালিচার প্রচলন হিন্দুস্তানে পশম বোনার রীতি ও গালিচা উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করতে শাসকশ্রেণীকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

বয়নশিল্পের শ্রমিক—বয়নশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংস্থার নানারূপ প্রকারভেদ ছিল। ধুনুরী কাজের জন্য নিজেই ফেরী করে ঘুরে বেড়াত। সুতোবোনার কাজ মেয়েরা ও ক্রীতদাসীরা ঘরে বসে চরকার সাহায্যে কাজ করত। তাঁতীরাও স্বগৃহে বসে তাঁতে কাজ করত এবং সাধারণত

* পূর্বোলিখিত আসরফের গ্রন্থ হিন্দুস্তানের জনজীবন, পৃঃ ১৬৫-১৬৭ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সাহরা, অভিজাত ও আমলাদের পাশাপাশি, নির্বিঘ্নে তাদের ধনদৌলতের মালিকানা ভোগ করতেন। ইবন বতুতা দৌলতাবাদের বণিকদের সাহু বলে উল্লেখ করে তাদের মিশরের আকারিম বা করিমদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতকে করিমদের শিথিল বণিক সংঘ (corporation) লোহিতসাগর ও ভারতসাগরে বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। সম্ভবত ইবন বতুতা ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন যে, করিমদের ন্যায় সাহুরাও বিভিন্ন বাণিজ্যিক কার্যকলাপে সহযোগিতায় অভ্যস্ত ছিলেন। ভারতীয় বণিকদের এই ধরনের সহযোগিতার মূলে বর্ণ ও জাতিগত ঐক্যের অবদান ছিল বলে অনুমান করা হয়। এই যুগেই সর্বপ্রথম ভারতীয় বাণিজ্যের ইতিহাসে দালালদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তারা ক্রেতা ও ছোট ছোট উৎপাদকের মধ্যবর্তী যোগসূত্র হিসাবে কাজ করত। দালালরা তাদের মক্কেলদের হয়ে গুদাম থেকে মালপত্তর খালাসের জন্য প্রতিভূ হিসাবে কাজ করত, শুল্ককর দানের ব্যবস্থা করত এবং ব্যবসায়ীদের পণ্য গুদামে বহন করে নিয়ে যাবার ও সেগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করত। দালালরা তাদের খদ্দেরদের জন্য কাপড়ের ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করত, উৎপাদককে অগ্রিম দিত এবং বিভিন্ন উপায়ে লেনদেনের ক্ষেত্রে সাহায্য করত। সুলতান আলাউদ্দীন খলজী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু যে কোন বৃহৎ বাজারে তাদের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় হওয়াতে দালালদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা সম্ভবপর হয়নি। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক দালালদের দেয় কর তুলে দিয়েছিলেন।

সামুদ্রিক বাণিজ্য ও বণিক

সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে, তুলনামূলক ভাবে এই পথ কম বিপজ্জনক ছিল। সমুদ্রপথের বাণিজ্যের উপর মুর বণিকরা আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য এই মুর বণিকরা প্রায় একচেটিয়াভাবে কুক্ষিগত করেছিল। বার্থেমার মন্তব্য এই বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে, 'The Pagans (Hindus) do not navigate much, but it is the Moors who carry the merchandise.'* কিন্তু করমণ্ডল মালাবার উপকূলে ইবন বতুতার বক্তব্য অনুসারে জাহাজ নির্মাণের ঐতিহ্য ও ধারা অব্যাহত ছিল। বঙ্গদেশে জাহাজ নির্মাণের দেশীয় পদ্ধতির কথা এবং আরব ও চৈনিক পদ্ধতির প্রভাবে নির্মিত জলযানের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। ইবন বতুতা বঙ্গদেশে চট্টগ্রাম ও গৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতানদের মধ্যে গঙ্গার মোহনায় নৌযুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। চীনা সূত্রে প্রাপ্ত প্রামাণিক তথ্য অনুসারে বঙ্গদেশে নির্মিত চতুর্দশ শতকের শেষার্ধে এবং পঞ্চদশ শতকে জাহাজ দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে যাতায়াত করত এবং চীনাদের তরনী বা জাংকের (Junk) পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্মিত হত এবং পর্তুগীজরা অনেকে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গোপসাগরে জাহাজগুলির কতকগুলিকে 'জাংক' বলে উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকে এইসব জাহাজকে মক্কার 'ধোওয়ার' ন্যায় বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের চীনা জাংক তাদের বিশাল আকৃতি ও দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ব্যবহারের দরুণ সমুদ্রে একাধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে চীনের ইউয়ান সম্রাট রাজধানী দিল্লীতে দূত প্রেরণ করেছিলেন। ইবন বতুতার মতে কারাজলে একটি বৌদ্ধ স্তুপ বা মন্দিরের (যা দিল্লী বাহিনীর কারাজল অভিযানে ধ্বংস হয়) পুনর্গঠনের জন্য এই সময় অনুরোধ করা হয়েছিল অথবা এই দৌত্য কেবলমাত্র চীনা সম্রাটের সার্বভৌমত্বের দাবির অঙ্গও হতে পারে। যাইহোক, সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক এই সময় ইবন বতুতাকে চীনে তাঁর দূত হিসাবে প্রেরণ করেন।

* বার্থেমার ভারত ভ্রমণ ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সমাপ্ত হয়। কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ১ম খণ্ড পৃঃ ১২৯।

www.pathagar.com

চীনের একশতদাস ও একশত দাসী এবং বহু মূল্যবান ব্রোকেড, রত্ন, বস্ত্র, ইত্যাদি দৌত্যের সঙ্গে প্রেরিত হয়েছিল এবং ইবন বতুতার সঙ্গে দিল্লীর সুলতান যে সকল উপহার প্রেরিত করেন তাতে বহু মূল্যবান সামগ্রী, দাসদাসী বিশেষত নর্তক ও নর্তকী ছিল। পঞ্চদশ শতকে মা হুয়ান বঙ্গদেশে এসে কেবলমাত্র মুসলিম বণিকদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এর কারণ সম্ভবত তিনি স্বধর্মের লোকেদের সঙ্গেই কেবল যোগাযোগ করেছিলেন। মাহুয়ান বলেছেন, বঙ্গদেশের সুলতান বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতেন এবং চীনা সম্রাটকে উপঢৌকন প্রেরণ করতেন।

ইউয়ানদের পরবর্তী মিঙ সম্রাটরা চীনের বাণিজ্য প্রসারে আরো সক্রিয় হন। চেঙ্গিজের বংশধর ইউয়ান সম্রাটরা ইন্দোচীন, জাভা, শ্রীলঙ্কায় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মিঙরাও চীনের প্রভাব সম্প্রসারণে সেইরূপ সক্রিয় হয়েছিলেন। কিন্তু ১৪৩৪ সাল থেকে ভারত মহাসাগরের উপকূলে চীনের বাণিজ্যিক মিশনের প্রসারের প্রচেষ্টার অবনতি হয় কারণ এই যুগে খোজা গোষ্ঠীর কাছ থেকে কনফুসিয় আমলারা চীনা সম্রাটের দরবারে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং নৌবিভাগের প্রসার অপেক্ষা উত্তর সীমান্ত রক্ষার দিকে তারা অধিকতর নজরদারী শুরু করেছিল। মধ্যযুগের বাণিজ্যিক লেনদেনে প্রধানত এই সময় বিলাস পণ্য ও মশলার প্রাচুর্য দেখা যায়।

এই যুগের ভারতীয় নৌবাণিজ্যের একদিকে হয়েছিল চীনের বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগ অপর দিকে ভূমধ্যসাগরের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে লেনদেন। এছাড়া আরব সাগর, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উপকূল অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক যোগসূত্র সক্রিয়ভাবে স্থাপিত হয়। মালাবার গোলমরিচ উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। চীনের রেশম বস্ত্র বা চীনাংশুকের জন্য ভারতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে চাহিদা ছিল। অপরদিকে মার্কো পোলো ও বার্বোসা মধ্যযুগে চীনে গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলাপাতির চাহিদার কথা উল্লেখ করেছেন। বৈদেশিক বিলাস দ্রব্যের ও রত্নর জন্য চীনে ও মুসলিম জগতে চাহিদা মেটাতে দক্ষিণ ভারতের হীরক পারসিক বণিকদের মারফতে রপ্তানী হ'ত। বঙ্গদেশের বিভিন্ন ধরনের সূতীবস্ত্রের চতুর্দশ শতকে বিদেশে চাহিদা ছিল।

ভারতে প্রধানত বিলাস সামগ্রী ও সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় সব রকমের অশ্ব ও অশ্বতর আমদানী হ'ত। পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে আমদানীকৃত যুদ্ধাস্ত্র সামরিক কারণে জরুরি ছিল। আবার ভারতের উদ্বৃত্ত শস্য পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে খাদ্যের ঘাটতি মেটানোর জন্য রপ্তানি করা বাণিজ্যিক লেনদেনের অন্যতম অঙ্গ বলে গণ্য হ'ত। বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে রেশমী মখমল, নক্সাদার পর্দা ও ঘর সাজাবার বিবিধ উপকরণ উল্লেখযোগ্য। সুলতানরা প্রতিবছর উৎকৃষ্ট অশ্ব উপহার দানের জন্য সংগ্রহ করতেন। ইয়েমেন থেকে সুশিক্ষিত ঘোড়া ও হরমুজ, এডেন এবং পারস্য থেকে নানা ধরনের অন্যান্য ঘোড়া আমদানী করা হত।

মালেশিয়া ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা জোরদার ছিল। যে সব পণ্য হিন্দুস্থান থেকে এইসব অঞ্চলে রপ্তানী হত তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল গুজরাটের বহুমূল্য রত্ন, নীল, তুলা, পশুচর্ম, সূতীবস্ত্র ও বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্র, দক্ষিণী চন্দন কাঠ, দস্তা, আফিং, তিল তেল প্রভৃতি। বার্থেমা ও বার্বোসা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর অন্যতম ধনীদেশ হিসাবে গণ্য করতেন। কারণ এইখানে তুলো, আদা, চিনি, পশুমাংস ও খাদ্যশস্য প্রচুর পরিমাণে ছিল। এইজন্য ইবন বতুতা বঙ্গদেশকে দোজখ পুর-ই-নিয়মত (সর্বপ্রকার আশীর্বাদে পূর্ণ নরক) বলে বর্ণনা করেছেন। ইবন বতুতার কাছে বঙ্গদেশের বর্ষা ও জলমগ্ন গ্রাম ও নগরী, পথঘাট ও বসতি অসহনীয় ছিল। কিন্তু তিনি দেশের প্রাচুর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এই অঞ্চলে সর্বাধিক সস্তায় পণ্য বিক্রয় হত বলে উল্লেখ করেছেন। কে এম আশরফ মন্তব্য করেছেন যে, "বহির্বাণিজ্যের জন্য উত্তর গুজরাটের ক্যাম্বেয়ত (ক্যাম্বে)

www.pathagar.com

ও বাংলাদেশের 'বাঙ্গলা' বন্দর দুইটি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। বার্থেমার বিবরণ মত এই দুটি বন্দর সমস্ত 'পারস্য, তাতার দেশ, তুরস্ক, সিরিয়া, বারবারি (অর্থাৎ আফ্রিকা)। আরবীয় ফেলিক্স, ইথিওপিয়া, ভারত এবং আরও অসংখ্য বসতিপূর্ণ দ্বীপপুঞ্জে রেশমী ও সূতিবস্ত্র সরবরাহ করত। বার্থেমা আরো বলেছেন, যে ক্যাম্বেতে বছরে প্রায় ৩০০ জাহাজ আসত এবং বাংলাদেশে ৫০টি জাহাজ ভর্তি করার মত সূঁতী ও রেশম বস্ত্র উৎপাদিত হত।*

বহির্বাণিজ্যে বিশেষতঃ সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিদেশীরা বিশেষতঃ মুররা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এমনকি উপকূলবর্তী বাণিজ্যে ও জাহাজী সম্পদের মালিকানাতেও মুষ্টিমেয় গুজরাটি বেনিয়া দক্ষিণ ভারতে চেট্টি ও ভারতের বাসিন্দা মুর বণিক ছাড়া বিদেশীদেরই কুক্ষিগত ছিল।

ইবন বতুতার বিবরণীতে তাজউদ্দীন ইবন আল কাবলানী নামে একজন মিশরীয় কারিমী বণিকের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তিনি স্থলপথে মহম্মদ বিন তুঘলকের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাজউদ্দীনের কেরলের কুইলনের সঙ্গে পৈতৃক সম্পর্ক ছিল। তাজউদ্দীন আল কাবলানী মালাবার, শ্রীলঙ্কা ও অন্যান্য অঞ্চলে জাহাজ প্রেরণ করতেন। ক্যাম্বের অধিকাংশ বণিক ছিল বিদেশী। এমনকি ক্যাম্বের বণিকদের মধ্যে মালিক-উল-তুজ্জুর বা সর্বপ্রধান বলে দিল্লীর সুলতান কর্তৃক সম্মানিত ব্যক্তিও ছিলেন বিদেশাগত। পশ্চিম উপকূলে মুসলিম বণিকদের মধ্যে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিলেন তাঁদের অনেকেই ভারতের বাইরে থেকে এসেছিলেন। ইসমাইলি বা বোহরা সম্প্রদায়ের অনুগামী প্রধানরা গান্ধারের রাজসভার অন্যতম বণিক বলে গণ্য হতেন। কিন্তু পশ্চিম উপকূলের সর্বাধিক শক্তিশালী মুসলিম বণিক ও জাহাজের মালিক জামাল-উদ্-দীন স্থানীয় অধিবাসী বলে গণ্য হতেন। ইবন বতুতার কাছ থেকে পশ্চিম উপকূলের জাহাজের মালিকদের সম্পর্কে যথেষ্ট সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি দুইবার জাহাজের মালিক হিসেবে দিল্লীর সুলতানদের উল্লেখ করেছেন।

একবার মালিক-উল-তুজ্জার মিত্র শিহার-আল-দীন সুলতানের অনুগ্রহণের দানে প্রাপ্ত ধনদৌলতে বহু পণ্য ব্যবসা করার জন্য সংগ্রহ করে ক্যাম্বে থেকে হরমুজে যাত্রা করেন। মুর পর্যটকের লেখনী থেকে জানা যায়, পরবর্তীকালে দিল্লী সুলতানের কিছু জাহাজ কালিকট বন্দরে শীতকালে নোঙর ফেলেছিল। এই ক্যাম্বে উপসাগরের মুখেই গান্ধারের হিন্দুরাজা একটি বাণিজ্য ও একটি রণতরী ইবন বতুতার সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। পশ্চিম-উপকূলে বাণিজ্যের পথে প্রধান বিঘ্ন ছিল জলদস্যুদের লুন্ঠন। মার্কোপোলোর বক্তব্য অনুসারে ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে সিন্ধুর ব-দ্বীপে, কাথিয়াওয়াড়ে ও মাকরানে এই জলদস্যুতা-বৃত্তি হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু এই উপকূলের বাসিন্দারা উপকূলের ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের লভ্যাংশের ভাগ বসানোর উদ্দেশ্যে শুল্কগ্রহণ, পণ্য বাজেয়াপ্ত করত ও সৈনিকদের মজুরী ইত্যাদি গ্রহণ করত। পোলোর মতে, ত্রয়োদশ শতকের থানের হিন্দু শাসকের এবং ইবন বতুতার বক্তব্য অনুসারে কানারায় অবস্থিত বাকনোরের (ফাকনোর) হিন্দু শাসক ও তাঁর মুসলিম নৌবাহিনীর অধ্যক্ষের এবং গোয়ার নিকটস্থ হোনাউর বা হিন্নাউরের (Honavar or Hinnawr) সুলতান এই জলদস্যুদের মারফতে উপকূলের নৌবাণিজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। শেষোক্ত স্থানের শাসক সুলতান জামালউদ্দীনের গোয়া আক্রমণের সময় ইবন বতুতা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইবনবতুতার বিবরণী থেকে জানা যায় যে, প্রাথমিকভাবে সাফল্য লাভ করলেও পরে এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়। হোনাউর অবশেষে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বাহিনীর পদানত হয়েছিল।

* কে এম আশরাফ, হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবনচর্চা, পার্ল পাবলিশার্স, কলি, পৃঃ ১৯১ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

যেসকল মুসলিম বণিক ভারতীয় বাণিজ্যে পশ্চিম-উপকূলে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই বিদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও এদেশের বাণিজ্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। গান্ধারের মুসলমান সমাজের প্রধান যাঁরা শাসকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা ভারতীয় ইসলামিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সুলী নামে পরিচিত কুইলনের বণিকরা ধনী ছিলেন এবং তাঁদের বোহরা, খোজাদের সঙ্গে সনাক্তকরণ করা হয়। পরবর্তীকালের মালাবার ও শ্রীলঙ্কার বোহরা, খোজারা এই সুলীদেরই বংশধর। হোনাউর সুলতান জামালউদ্দিনের ও তাঁর অনুচরদের ও স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করতে হত এবং তারা শাফী মতবাদের অনুগামী ছিল।*

এই যুগে সপ্তদশ শতকের ক্যাম্বের বীরজী ভোরার ন্যায় সামুদ্রিক বাণিজ্যে লিপ্ত হিন্দু বা জৈন বণিক বা সুরাটে সপ্তদশ শতকের দালালদের নাম বিশেষ পাওয়া যায় না। গান্ধারের হিন্দুরাজা ক্যাম্বের উপসাগরে ইবন বতুতার ব্যবহারের জন্য বাণিজ্য ও রণতরী দিয়েছিলেন এবং কালিকটের অধিপতির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ একটি জাংক তাঁর সমুদ্র যাত্রার জন্য দেওয়া হয়েছিল। মার্কো পোলো বলেছেন যে, 'লার' (লাট বা দক্ষিণ গুজরাটের) অঞ্চলের বাসিন্দারা বিদেশী বণিক যারা কেনাবেচা করতে এদেশে অসত তাদের 'দালাল' হিসেবে মুসলিম বিজয়ের পূর্বে কাজ করত। হিন্দু শাসকরা (সম্ভবত চালুক্য রাজারা) করমন্ডল উপকূলে হীরা ও মুক্ত কেনার জন্য তাদের নিয়োগ করতেন। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বার্বোসার বক্তব্য অনুসারে করমন্ডল উপকূলের চেট্টিয়াররা ও মালাক্কার 'মুররা' অত্যন্ত ধনী ছিলেন এবং তারা জাহাজ বা জাংকের (Junk) মালিক ছিলেন। সম্ভবত মুসলিম বিজয়ের পূর্বে রচিত দুইটি ভারতীয় পুঁথিতে গুজরাটের হিন্দু বণিকদের সঙ্গে প্রাচীন হরমুজে অবস্থিত তাদের প্রতিনিধিদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে হরমুজে বসবাসকারী অজস্র বৈদেশিকদের শৈল্পিক দক্ষতা ও কারিগরী মানের উন্নতি হয়েছিল। তাদের মধ্যে ভারতীয়দের নাম পাওয়া যায়। প্রায় দেড় শতাধিক বৎসর পরেও এইস্থানে একজন ব্রাহ্মণ যোগীর বিবরণী জানা যায়।

শিল্প, কারিগর ও শিল্পী এবং নাগরিক অর্থনীতি

হিন্দুস্তানে সুলতানী যুগে শৈল্পিক দক্ষতা ও কারিগরী মানের উন্নতি হয়েছিল। নাগরিক অর্থনীতির প্রসার হয়েছিল। উত্তর ভারতে খনিজ পদার্থের মধ্যে সম্বর হ্রদের খনিজ পদার্থ সহজলভ্য ছিল। এই সূত্রে সম্বর হ্রদ থেকে প্রাপ্ত নুনের নাম উল্লেখযোগ্য। সল্ট রেঞ্জের (কোহ-ই-জুদের) খনির কোন উল্লেখ আবুল ফজলের পূর্বে পাওয়া যায় না। কিন্তু হিউয়েন সাঙ এখানকার খনির কথা উল্লেখ করেছেন। সুলতানী আমলেও স্বভাবতঃ এইস্থানের খনিগুলি চালু রাখা হয়েছিল।

হিন্দুস্তানে উৎপাদিত ধাতুগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল উৎকৃষ্ট লৌহ আকর। এই উৎকৃষ্টমানের তৈরী হিন্দুস্তানের 'দামাস্কাস স্টীল' বিশ্ববিখ্যাত ছিল। গোয়ালিয়রের পার্বত্য

---

* ইবন বতুতার বিবরণীতে বলা আছে যে, মাদুরার সুলতান মালদ্বীপে তাঁর শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর সাহায্যে অভিযান প্রেরণ করেন। অন্যান্য বিদেশী বণিকদের মধ্যে মিথকল (Mithqal) নামে একজন আরব বণিক চীন, ইয়েমেন ফার্সে ও ভারতে বাণিজ্যের জন্য তরী প্রেরণ করতেন এবং কালিকটে বসবাসকারী ইলিয়াস নামে এক ব্যক্তি জাহাজের মালিক ছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে। ক্যাম্বেতে ইলিয়াস ছাড়া বোহরা ইব্রাহিম নামে আরো একজন প্রসিদ্ধ জাহাজের মালিক ছিলেন যাঁর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য ৬টি জাহাজ মজুত রাখা হত। বিখ্যাত রুশ ভ্রমণকারী নিকেতিন ১৪৬৯ বা ৭০ সালে ভারতীয় জাহাজ (tava) করে হরমুজ থেকে ৬ সপ্তাহ বাদে মাকরাননের উপকূলে এবং ক্যাম্বেতে এসেছিলেন এবং চাউল (তানার নিকট ও আধুনিক বম্বের কাছে) এই জাহাজ পৌঁছেছিল। কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

খরিদ্দারের দেওয়া সুতো বোনার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করত। স্বর্ণ, রৌপ্য ও রেশমবস্ত্র সাধারণতঃ কারখানার মারফতে বয়ন করার জন্য দক্ষ কারিগরের হাতে দেওয়া হ'ত। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের কারখানায় চারহাজার রেশমের বস্ত্রবয়নে দক্ষ ও সূচীশিল্পে নিপুণ তাঁতী বিভিন্ন ধরনের সাম্মানিক বস্ত্র ও রত্নালংকার খচিত পোষাক নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত ছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের কারখানায় জামাদারখানা বা বস্ত্র নির্মাণের বিভাগের জন্য প্রতি শীতে প্রায় ৬০,০০০ তংকার জামা তৈয়ারীর কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করত। আর এই কারখানারই ফরাসখানা বা গালিচাবিভাগ বছরে প্রায় ২ ০,০০০ তংকার গালিচা বা কার্পেট সরবরাহে ব্রতী ছিল।

ধাতুশিল্পের কারিগর—হিন্দুস্তানের ধাতুশিল্প সারা বিশ্বে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। ফকরুদ্দীন মুবারক শাহর মতে, ভারতের কারিগরদের নির্মিত তরবারি সর্বদেশের মধ্যে কাঠিন্যের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং এই ভারতীয় তরবারীর মধ্যেও 'মান-গোহর' তরবারী ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। সিন্ধু-তীরবর্তী অঞ্চলের একধরনের কারিগরকে মুবারক শাহ্ দক্ষতায় প্রথম স্থান দিয়েছিলেন।* জেনিজা নথি (Geniza records) থেকে জানা যায়, দাক্ষিণাত্যের ব্রোঞ্জ ও পিতল শিল্পের জন্য তামা ও সীসা বিদেশ থেকে আমদানী করা হ'ত এবং এমনকি এডেন থেকে বাসনপত্র নির্মাণের জন্য ফরমাশ পাওয়া যেত। ভারতে ধাতুশিল্পের উন্নয়নের ঐতিহ্য যার অন্যতম সাক্ষ্য আজও দিল্লীর লৌহস্তম্ভ এবং সুপ্রাচীন বিগ্রহগুলিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগেও সেই ঐতিহ্য সমানে বহন করে চলেছিল। সুলতানী যুগের মুদ্রাব্যবস্থা ধাতুশিল্পের ও কারিগরি বিদ্যার উচ্চমানের আরেকটি সাক্ষ্য।

স্থাপত্য শিল্পের বাস্তুকার ও কারিগর— এদেশের কুশলী বাস্তুকারদের ও রাজমিস্ত্রীদের মূল উপাদান ছিল ইট বা পাথর। ইসলামের আগমনের ফলে সারসেনিক রীতির প্রভাব এদেশের স্থাপত্য পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছিল। চুনের আস্তর দান, গম্বুজ ও খিলান বানানোর রীতি ও দ্রুত নগরায়ণের ফলে চতুর্দশ শতকে স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন হয়েছিল। ভারতীয় দক্ষ কারিগরের কলাকুশলতা আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের নগর ও সৌধে তার স্বাক্ষর রেখে গেছে। সুলতান আলাউদ্দীন খলজী প্রায় ৭০,০০০ রাজমিস্ত্রী ইমারত গড়ার কাজে নিয়োগ করেছিলেন এবং ফিরোজের অধীনে অনেক সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি ৪,০০০ ক্রীতদাসকে এই বিদ্যায় দক্ষতা অর্জনের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। বাবরের আগ্রা প্রাসাদকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য প্রায় ৬৮০ জন পাথরের কাজে দক্ষ স্থপতি ছিল এবং অন্যান্য স্থানেও তিনি বহু কৌশলী কারিগরের নিয়োগ করেছিলেন। চিতোর, গোয়ালিয়রের নানা সুরম্য অট্টালিকা এবং দিলওয়ারার ন্যায় সৌন্দর্যের প্রতীক মন্দির ভারতীয় কারিগরেরই অবদান।

অন্যান্য শিল্পের মধ্যে কাগজশিল্প চীন থেকে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে ক্রমেই তার প্রভাব বিস্তার করে বাগদাদ, সমরকন্দ ও মধ্যপ্রাচ্যে অষ্টম শতকে এবং জার্মানিতে চতুর্দশ শতকে প্রসারিত হয়েছিল। কাগজ উৎপাদনের প্রক্রিয়া তার ব্যবহারের পূর্বে প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও ত্রয়োদশ শতকের আগে তার প্রকৃত ব্যবহার দেখা যায় না। গুজরাটে ১২২৩-২৪ সালে কাগজের পুঁথির নমুনা পাওয়া যায়। কাগজের লিখিত বক্তব্যের কাজ হয়ে গেলে সেই কাগজ পুর্নব্যবহারের যোগ্য করে তোলার জন্য তাকে ধুয়ে মুছে সাফ করা হত। কিন্তু চতুর্দশ শতকে

---

* পূর্বোলিখিত হিন্দুস্তানের জন জীবন, পৃঃ ১৭০ পাদটীকা ৩ দ্রষ্টব্য। ভারতে নির্মিত দামাস্কাস তরবারী পৃথিবী বিখ্যাত ছিল।

** ঐ পৃঃ ৭৮।

www.pathagar.com

কাগজের অভাব সম্ভবত ছিল না কারণ দিল্লীর মিষ্টান্ন বিক্রেতারা কাগজকে মোড়ক হিসেবে কাজে লাগাত। কিন্তু কাগজ কিনে পেশাদারী মজুরী দিয়ে লেখা ব্যয়সাধ্য ছিল।

অন্যান্য শিল্প

কাগজ ছাড়া হিন্দুস্তানে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিনি উৎপাদন হত। আখমাড়াইয়ের কলে আখ থেকে রস, এবং গুড় উৎপাদন হত। বঙ্গদেশ থেকে চিনি বিদেশে রপ্তানী হত এবং নানাধরনের মণ্ডা, মিঠাই ও পায়েস তৈয়ারী হত। এছাড়া মধু সংগ্রহের প্রথাও চালু ছিল। চর্মকার বা চামার শ্রেণী চামড়ার লাগাম জিন, রপ্তানীর ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য চামড়ার পুলিন্দা, জুতো, পশু-পাখীর মূর্তি খোদিত কালো মাদুর করার উদ্দেশ্যে পশুচর্ম ব্যবহার করত। এছাড়া হাতির দাঁত ও পলার কাজে, প্রবালের ও ঝুঁটা পাথরের কাজে, নকল মুক্তোর কাজে এবং কাঠের কাজে বহু দক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। গ্রামে ও গঞ্জে, শহরে ও বন্দরে যেসব শিল্পী ও শিল্পী সংঘ ছিল তাদের সুবিধা-অসুবিধার ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। শিল্প সংঘগুলি জাতিভেদ প্রথাকে ভিত্তি করে গঠিত ছিল।

রাজকীয় কারখানা

রাজকীয় কারখানায় নিযুক্ত কারিগররা ছাড়া অন্যান্য শিল্পকর্মীরা পুরাতন ও পরিচিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করত। তাদের অনুপ্রাণিত করা বা পৃষ্ঠপোষকতার জন্য রাষ্ট্রের বা অভিজাতদের উদ্যোগের অভাব ছিল। ধনীরা তাদের সীমিত প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যাগ্র ছিল এবং দক্ষ শিল্পীরাও বৃহত্তর জনগণের কথা মনে রেখে উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রাখত না। বরং শিল্পসংঘ ও জাতিভেদ প্রথা শিল্পের উৎকর্ষের ও বিকাশের পক্ষে বাধা ছিল। কিন্তু দক্ষতায় ভারতীয় কারিগররা কলাকৌশলের ক্ষেত্রে উচ্চমানে পৌঁছেছিল এবং অসাধারণ নৈপুণ্যের অধিকারী হয়েছিল।

অনেক সময় ব্যবসায়ীরা পণ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য নিজেদের তত্ত্বাবধানে কারিগর নিযুক্ত করে নানাধরনের দ্রব্য উৎপাদন করত। সুলতান ও তাঁর প্রাসাদের যে সব পণ্যের প্রয়োজন হ'ত তা সরবরাহ করার জন্য সুসংগঠিত ও বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত কারখানা ছিল। এইসব রাজকীয় কারখানার সংখ্যা ছিল ৩৬টি। পরবর্তীকালে প্রাদেশিক শাসকরাও সুলতানের অনুকরণে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। দরবারের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে নানা ধরনের শিল্পদ্রব্য উৎপাদন ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাজকীয় কারখানায় তৈয়ারী বস্ত্রের ন্যায় উৎকৃষ্ট বস্ত্র সারা দেশে পাওয়া যেত না। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় স্বর্ণতন্তু নির্মাণের জন্য ৪০০০ কারিগর নিযুক্ত ছিল। এইসব কারখানা থেকে পর্দা, জুতা, টুপি থেকে পরিধানের বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়ার জিন ইত্যাদি সরবরাহ করা হত। I. H. Qureshi বলেছেন যে, "The Kerkhanas catered not only to the needs of the royal household but also to the requirements of the army and variors departments of the state." ফিরোজ তুঘলক বহু ক্রীতদাসকে রাজকীয় কারখানায় নিযুক্ত করেছিলেন।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

সমাজ ও সংস্কৃতি

•

মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি

মধ্যকালীন ভারতের সঠিক সামাজিক চিত্র পাওয়া সহজসাধ্য নয়। সমকালীন পারসিক বিবরণীতে রাজনৈতিক ইতিহাস প্রধান্য লাভ করেছে। ফলে সামাজিক জীবনধারার বর্ণনা সমসাময়িক ইতিবৃত্তে প্রাঞ্জল নয়। আবার হিন্দু কাহিনীকারদের লেখনীও এবিষয়ে ত্রুটি মুক্ত নয়। সৌভাগ্যবশতঃ বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকে মধ্যযুগের ভারতের সামাজিক ও অন্যান্য যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার থেকে এদেশের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়। আমির খসরুর মতো ভারতীয় লেখক এবং আলবেরুণী ও ইবন বতুতার ন্যায় বৈদেশিক ভ্রমণকারীর লেখনী মধ্যযুগীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর আলোকসম্পাত করে। কিন্তু ইবন বতুতার ভারত ভ্রমণকাহিনী থেকে যে চিত্র পাওয়া যায় বাবরের হিন্দুস্তানের বর্ণনার সঙ্গে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট, কারণ তুঘলক আমলের পর ভারতে বহু পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল।

শাসকগোষ্ঠী

তুর্কীরা যখন হিন্দুস্তানে রাজ্য স্থাপন করে তার কিছুকালের মধ্যে ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে মোঙ্গলরা চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে উত্তরপশ্চিম সীমান্তে হানা দিয়েছিল। তারপর থেকে বারংবার হিন্দুস্তানে মোঙ্গল আক্রমণ হয়েছে। তার ফলে দলে দলে মধ্যএশিয়ার বহু বিতাড়িত জাতিগোষ্ঠী এদেশে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ইতিপূর্বেও তুর্কী বিজয়ীদের সঙ্গে পারসিক, আফগান থেকে অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের অভিযাত্রীরা ভারতবর্ষে এসেছিল এবং তুর্কীদের সঙ্গে এদেশে বসবাস করতে শুরু করে। মোঙ্গল বিজয়ের ফলশ্রুতিতে এইসব বিদেশাগত বিজয়ী শাসকদের স্থায়ীভাবে হিন্দুস্তানকে বাসভূমি এবং মাতৃভূমি হিসেবে গণ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী স্বজাত্যাভিমানের জন্য স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। তুর্কীরা এই বিষয়ে অগ্রণী ছিল। সুলতান বলবন তুর্কী ছাড়া অন্য গোষ্ঠীর প্রতি উন্মাসিক মনোভাব পোষণ করতেন এবং নিম্নবর্গের মুসলমান, যারা তুর্কী নয়, তাদের শাসনকার্যের সঙ্গে সংযুক্ত রাখার বিরোধী ছিলেন। এমনকি ত্রয়োদশ শতকেও শাসকশ্রেণী জাতিবিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই অনৈক্যের বহিপ্রকাশ ছিল স্বাভাবিক। শাসকশ্রেণীর নানা গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম ছিল তুর্কী, খলজী, তুঘলক প্রভৃতি। এদের মধ্যেও আবার দাস এবং স্বাধীন ব্যক্তি সমপর্যায়ভুক্ত ছিল না। পরবর্তী যুগে লোদীদের রাজত্বকালে তুর্কী জাতির স্বাতন্ত্র অবলুপ্ত হয় ও ভারতীয় মুসলমান সমাজের নানা বৃত্তির এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেমিশে তারা একাকার হয়ে যায়। কিন্তু আফগান ও হাবসী বা অবিসিনীয়রা যারা আফ্রিকার আবিসিনিয়া থেকে ক্রীতদাস হিসেবে এদেশে এসেছিল তারা বহুকাল স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিল। শেষোক্তরা দিল্লীর সুলতানী আমলে বিশেষত রাজিয়ার রাজত্বে,* বাহমনি সুলতানদের অধীনে ও গৌড়ের শাসকশ্রেণী হিসেবে প্রভূত প্রভাবশালী ছিলেন। কালক্রমে ইমাদ-উদ্-দীন রিহানের ন্যায় ভারতীয় মুসলমান সুলতানী দরবারে

---

* সুলতান রাজিয়ার প্রিয়পাত্র ছিলেন হাবসী ক্রীতদাস জামালউদ্দীন ইয়াকুত। ভারতীয় মুসলমান খসরু শাহ মধ্যযুগে দিল্লীর সিংহাসনে ৫ মাসের জন্য সুলতান হিসেবে রাজত্ব করেন।

www.pathagar.com

বলবনকে সাময়িকভাবে পদচ্যুত করে উজীর হয়েছিলেন। খলজীর আমলে মালিক কাফুর ও সুলতান নাসিরউদ্দীন খসরু শাহ (১৩২০ খ্রীঃ), তুঘলক যুগে মালিক মকবুল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা ভারতীয় বংশজাত ছিলেন। এইভাবে মধ্যযুগের শাসকশ্রেণীর মধ্যে কালক্রমে গোষ্ঠীগত পার্থক্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এমনকি মোঙ্গলরা যারা মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে ভারতে বসবাস শুরু করে ও নয়া মুসলমান নামে পরিচিত হয় তারাও কালক্রমে নিজেদের স্বাতন্ত্র জলাঞ্জলী দিয়ে অন্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

শাসকগোষ্ঠীকে কার্যকলাপের ও বৃত্তিগত ভিত্তিতে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। এই দুইটি বিভাগ হ'ল আহল-ই-সৈফ ও আহল-ই-কলম এবং এই শেষোক্ত শ্রেণীতে যাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তাঁদের অধিকাংশ জ্ঞাত তথ্য অনুসারে বৈদেশিক হলেও তুর্কী ছিলেন না। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন উলেমা, লেখক প্রভৃতি উচ্চবর্গের ব্যক্তিরা। আমির ওমরাহদের সঙ্গে সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের মানুষের মধ্যে খাতিব, দবির ও উজীরদেরও গণ্য করা হত। খ্রীশ্চান ধর্মযাজকদের ন্যায় সুসংগঠিত না হলেও এই গোষ্ঠীর কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ছিল। বিচার বিভাগের পদ ও ধর্মীয় কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ এদের মারফতে সম্পন্ন করার বিধি ছিল। এইজন্য ইমাম, খাতিব, মুতাসির, মুফতি ইত্যাদি রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন। স্বভাবত শেষোক্তরা শিক্ষা পরিচালনা ও পরিদর্শনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সদর-উস-সদরের এইসব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ সর্বজনস্বীকৃত ছিল।

আহ্‌ল-ই-সৈফ বা 'যোদ্ধা গোষ্ঠীর' অন্তর্ভুক্তদের সামাজিক সম্মান শাসনকার্যে বা সামরিক পদমর্যাদার উপর নির্ভরশীল ছিল। এই পদমর্যাদা যথাক্রমে খান, মালিক, আমির, সিপাহ-সলার, সর-ই-খেল ইত্যাদিতে বিভক্ত ছিল। পারিবারিক ঐক্যের প্রতীক হিসাবে খেলের নাম পরবর্তীকালে অবলুপ্ত হয় যদিও পরিবারকে কেন্দ্র করে অভিজাতদের সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। একমাত্র কুতুবউদ্দীন আইবাক ব্যতীত সিপাহি সালার উপাধি কারোও ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবহৃত হয়নি এবং অভিজাতরা অধিকাংশ আমির, মালিক ও খান নামে অভিহিত হতেন।

জনসাধারণ

উচ্চবর্গের মানুষ ছাড়া মুসলিম সমাজে সাধারণ লোকের মধ্যে নানাস্তরের লোক ছিলেন। মধ্যযুগের মুসলমান সমাজের অধিকাংশ জনগণ নগরের অধিবাসী ছিলেন। তাদের মধ্যে কারিগর, দোকানদার, করণিক ও ছোট ব্যবসায়ী প্রভৃতির সমাবেশ হয়েছিল। এইসব নাগরিকদের মধ্যে বড় বড় ব্যবসায়ী ও বণিক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কারণ তাঁরাও শহরবাসী ছিলেন। কিন্তু যেসব ধনী ও প্রভাবশালী বণিক সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিলেন, যাঁদের অনেক সময় 'তাজির' এবং 'মালিক-আল-তুজ্জার' নামে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা অভিজাত সমাজে সহজেই অনুপ্রবেশ করার সুযোগ লাভ করতেন। শহরবাসীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সুলতান ও অভিজাতদের অধীন ক্রীতদাসরা। এইসব ক্রীতদাসদের একাংশ আবার পদোন্নতির ফলে রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠেছিল এবং আমির ওমরাহের পদমর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই ক্রীতদাসরা অধিকাংশ কারিগরী কাজে বা গৃহকর্মে নিযুক্ত ছিল এবং সরকারের কারখানায় নিযুক্ত ছিল। শহরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি অংশ ছিল হিন্দু বণিকরা ও নাগরিক জীবনে বিশেষত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক হাবিবউল্লার মতে, "In point of fact the influence born of wealth which the Hindu bankers, and traders enjoyed would entitle them even to a position of aristocracy; Barani complains that they even outdid the Muslims in pomp and material

www.pathagar.com

comforts."* এমনকি বারানী অত্যন্ত দুঃখের ও পরিতাপের সঙ্গে একথাও বলেছেন যে, ধনী হিন্দুরা অশ্বারোহণ করে ও পাল্কিতে যাতায়াত করে, আর দরিদ্র মুসলমানরা তাদের দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়।

তুর্কী শাসকগোষ্ঠী সুন্নী মুসলমান ছিলেন এবং আব্বাসিদ খলিফার আনুগত্য স্বীকার করতেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিয়া মতের অনুগামী হওয়াকে সুচক্ষে দেখা হত না। শিয়া মতাবলম্বীদের অনেক ক্ষেত্রে মুলাহিদা, কারামিতা নামে অভিহিত করা হ'ত ও কঠোরভাবে দমন করা হ'ত। শিয়ারা ফতেমিদ বংশের অনুগত ছিল। শেষোক্তদের আলমুটে সদর দপ্তর ছিল। বিভিন্নভাবে অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে শিয়া মতাবলম্বীদের একটি অংশ ফিদাই (fidais) নামে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গড়ে তুলেছিল। রাজিয়ার রাজত্বকালের শেষার্ধে 'নূর তুর্কের' নেতৃত্বে চরমপন্থী শিয়ারা দিল্লীর জামা মসজিদে হামলা করে ও বহু সুন্নী মুসলমানকে হত্যা করে। সামরিক বাহিনীর সহায়তায় তাদের দমন করতে হয়েছিল।

হিন্দুস্তানের অধিকাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বাস করত এবং শহরের উচ্চকোটির বাদশা, আমির ও বিত্তবানদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবনের বিশেষ মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক কে এম আশরফ মন্তব্য করেছেন যে, "ভারতীয় পল্লীর পরিবেশ, জীবনযাত্রা প্রণালী ও উৎপাদন ব্যবস্থা অনুযায়ী এদেশে স্বাভাবিকভাবে যৌথ পরিবার প্রথা গড়ে উঠেছে"। মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্বতন্ত্র। বিভিন্ন বিষয়ে যথা মুসলিম উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত আইন, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে এই পার্থক্য সুস্পষ্ট। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর স্থান পুরুষের অধীন বলে নির্দিষ্ট ছিল।**

নারীর স্থান

হিন্দুশাস্ত্রে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর স্থান পুরুষের তুলনায় হীন বলে গণ্য করা হত। তারা বাল্যে পিতা, যৌবনে পতি এবং বার্ধক্যে পুত্রর দ্বারা পালিত হ'ত। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, মুসলিম সমাজে নারীর স্থান খুব উচ্চে ছিল। কয়েকজন প্রতিভাসম্পন্ন ও ব্যক্তিত্বশালী মহিলা এযুগের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এইসব মহিলার মধ্যে রাজিয়ার নাম সর্বাধিক পরিচিত। কারণ, দিল্লীর সুলতানী শাসনের যুগে তিনিই একমাত্র নারী যিনি মুকুটধারণ করে সাফল্যের সঙ্গে কয়েক বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এছাড়াও অন্যান্য যেসকল মহিলা সমকালীন ইতিবৃত্তে তাঁদের কূটবুদ্ধি ও যোগ্যতার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁরা হলেন ইলতুৎমিসের অন্যতম বেগম তুর্কান খাতুন, সুলতান নাসিরউদ্দীনের মাতা মালিকা জাহানা ও সুলতান জালালউদ্দীনের প্রধান বেগম যিনি সুলতানের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্থানে কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের মাতা মকদুমা-ই-জাহানার সুফী এবং উলেমাদের প্রতি দানখয়রাত সম্পর্কে ইবন বতুতার লেখনীতে উল্লেখিত হয়েছে।

কিন্তু সাধারণভাবে স্ত্রীলোকেরা পর্দার আড়ালে বাস করতেন। কোন কোন লেখকের মতে, দিল্লীর সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে নারীর অবস্থার আরো অবনতি হয়। এই অবনতির মূলে ছিল বাল্য বিবাহ ও পর্দা প্রথা।*** কিন্তু মুসলিম সমাজেও নারীর সামাজিক স্থান সুউচ্চ ছিল না। তুর্কী সমাজে নারীর কিছুটা স্বাধীনতা ছিল কিন্তু পারসিক সমাজে নারীর

---

* Foundation of Muslim rule in India, (3rd Ed.), পৃঃ ২৪৮।

** হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবনচর্যা দ্রষ্টব্য, পৃ ঃ ২১৭ দ্রষ্টব্য।

*** Medieval Indian culture, A. L. Srivastav, Shivlal Agarwala & Co. পৃ: ২২-২৩। ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তবের মতে প্রাচীন ভারতে নারীর সামাজিক অবস্থা সুউচ্চ ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগে তার আরো অবনতি হয়।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা দেওয়া হ'ত না। দিল্লীর সুলতানী আমলে উচ্চকোটি সমাজে দুই-একজন নারী তাদের স্বপ্রতিভায় সমুজ্জ্বল হলেও সাধারণত নারীর স্থান ছিল পর্দার আড়ালে এবং পুরুষের নিচে। পর্দা প্রথার সূত্রপাত সম্পর্কে নানা বিতর্ক আছে। হিন্দু সমাজে নারীকে অন্তরালবর্তিনী রাখার প্রচলন অনেকদিন থেকে চালু ছিল এবং তুর্কী আক্রমণের যুগে ও পরবর্তীকালে বারংবার মোঙ্গল আক্রমণের কালে এই প্রথা আরো প্রসারিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল শাসকগোষ্ঠীর অভিজাতদের আচার-আচরণের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অগণিত সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে এই পর্দা-প্রথার যে বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না তার অন্যতম প্রমাণ লোক সাহিত্যে বিশেষ করে মালিক মহম্মদ জয়সী, বিদ্যাপতি প্রভৃতির লেখনীতে পাওয়া যায়। এই যুগে প্রচলিত দুইটি বিশেষ প্রথার নাম এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি প্রথার একটি হ'ল সতী হওয়ার সামাজিক রীতি যাকে একজন লেখক 'আদিম যুগ ও বর্বর অতীতের জীর্ণ অবশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়' বলে বর্ণনা করেছেন। এর ফলে পতির মৃত্যুর পর স্ত্রীকে সহমরণে পাঠানোর প্রথা সমাজে চালু ছিল। প্রধানত হিন্দু সমাজে এই সতীদাহ সুলতানের অনুজ্ঞাপত্র ছাড়া প্রচলিত ছিল। অবশ্য বিধিমত করা যেত না। কিন্তু সে যুগে সতীদাহপ্রথা বন্ধ করা যায়নি এবং আশরফের মতে, "মুসলিমদের মধ্যে এই জাতীয় ঘটনা ঘটার উদাহরণ আমরা খুব বেশী পাইনি"। এই প্রসঙ্গে আরো একটি প্রথার কথা উল্লেখ্য সেটি হ'ল, জৌহর প্রথা বা জৌহরব্রত পালন। এই প্রথার উৎপত্তির মূল কারণ যুদ্ধে পরাজিত বন্দী বা অসামরিক ব্যক্তি বা নারীরা শত্রুর অমানবিক আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানলে আত্মবিসর্জন দিতেন। প্রধানত, রাজপুতদের মধ্যেই এই রীতির চলন ছিল। তৈমুরের আক্রমণের সময় অনেক মুসলিম যোদ্ধা রাজপুতদের উদাহরণ অনুসরণ করে জৌহর প্রথার অনুসরণ করেছিলেন। শত্রুর হাতে পড়ার থেকে নিজের ও স্বজনদের প্রাণহরণ করা তাঁরা শ্রেয়ঃ বলে মনে করতেন।

পোষাকের ব্যাপারে মুসলিম ও হিন্দুদের পার্থক্য

মুসলিম অভিজাতরা তাঁদের গায়ে আঁটোসাটো পোষাক বা কাবা, পেশোয়াজ ও শীতকালে ফারের কোট ও উৎসবে নানা রঙের ওভারকোট পরতেন এবং মাথায় কুলাহ্ বা তাতার টুপি ধারণ করতেন। আটপৌরে পোষাক হিসেবে তাঁরা পায়জামা, পাতলা মাপের পাগড়ি ও জামা পরতেন। দরিদ্র শ্রেণীর হিন্দু বা মুসলমানদের প্রচেষ্টা ছিল কোনক্রমে স্বল্পবস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করা। আলবেরুণী যখন ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন তখনকার দরিদ্র ও ধনীর পোষাকের পার্থক্য বর্ণনা করার সূত্রে মন্তব্য করেছেন যে, দরিদ্ররা এক আঙ্গুল পরিমাণ কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করার প্রচেষ্টা করত আর ধনীরা পোষাকে এতবেশী বস্ত্র ব্যবহার করত যাতে 'ঘোড়ার জিন' বানানো যেত। সমাজের উচ্চকোটি হিন্দুরা বায়বহুল পোষাক ব্যবহার করত ও অনেক সময় অভিজাত মুসলমানদের অনুসরণ করত, যার ফলে অঙ্গাভরণের বিশেষ চিহ্ন দ্বারাই তাদের হিন্দু বলে সনাক্ত করা সম্ভব ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রাজপুতদের কর্ণাভরণ তাদের বিশিষ্ট চিহ্ন ছিল। অভিজাত হিন্দুরাও পাগড়ী ব্যবহার করতেন। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণরা তিলক কাটতেন ও বহুমূল্য ধুতী পরিধান করতেন।* সাধারণ মানুষ একটি ধুতী ও কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা কাপড় ব্যবহার করত। মেয়েরা মসলিনের থান, কাঁচুলি বা অন্তর্বাস ও অনেকে ঘাগরা, চোলা এবং আঙ্গিয়া, স্কার্ফ ইত্যাদি ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল।

* K. S. Lal মন্তব্য করেছেন যে, The Muslims all over the country dressed heavily but the Hindus were scantily dressed [Twilight of the Sultanate, পৃ: ২৭]। কিন্তু ঐ লেখকই লিখেছেন যে, "The Hindu aristocracy dressed like the Muslim aristocracy" (ঐ)।

www.pathagar.com

নিকোলাই কন্টির মতে, 'তারা অত্যাধিক গরমের জন্য বেশী জামাকাপড় ব্যবহার করতে পারত না এবং এই একই কারণে স্বর্ণালী ও রক্তভা বন্ধনীযুক্ত চপ্পল পরত।'

আহার্য ও পানীয়

আধুনিক কালের তুলনায় সুলতানী আমলে আহার্যের ও পানীয়ের মূল্য অনেক সস্তা ও সহজলভ্য ছিল। সমকালীন লেখক ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকে একথা সহজেই অনুমেয়। অভিজাত, সুলতান ও আমিরওমরাহরা রসনা তৃপ্তিকর নানাধরনের খাদ্যগ্রহণের ব্যবস্থা করতেন। রাজকীয় রন্ধনশালায় যে খাদ্য প্রস্তুত হ'ত তার মধ্যে সুলতান ও আমিরওমরাহদের খাদ্য এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের খাদ্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল। পানীয় হিসেবে ঠাণ্ডা ও শীতল পানীয়র ব্যবস্থা ছিল। ভোজসভায় নানা পদের বৈচিত্র্য থাকত এবং খাদ্যের অবশিষ্ট ভিক্ষুকদের মধ্যে বিতরণ করা হ'ত। মুসলমানরা শুয়োরের মাংস বা জবাই না করা মাংস, নিষিদ্ধ খাদ্য বলে গ্রহণ করত না। হিন্দুরা বিশেষত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা, নিরামিষাশী ছিল। কিন্তু আমিষ গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল না এবং মদ্যপান নিষিদ্ধ হলেও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ও শূদ্ররা উৎসবে অনুষ্ঠানে মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে মদ নিষিদ্ধ পানীয় ছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই নিষিদ্ধ পানীয় মুসলিম সমাজে প্রায় সকল স্তরের লোকের কাছে জনপ্রিয় ছিল। সুলতান আলাউদ্দীন খলজী রাজ্যে বিদ্রোহের কারণ নির্দেশ কালে মদ্যপানকে অন্যতম বলে গণ্য করেছিলেন। সুলতানের কঠোর বিধিনিষেধ ও শাস্তির ভয় অগ্রাহ্য করে এইসময় দিল্লীতে বাইরের থেকে মদের চোরাচালানের কথা বারানী উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন যুগে হিসাব অনুযায়ী একজন সাধারণ মানুষের একমাসের ব্যয় ১ তংকা বা ৪৮ জিতল ছিল। আফিফ বলেছেন যে, ৬ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে পাল্কি বাহকরা মাত্র অর্ধ তংকা পেত। দিল্লী শহরে যানবাহন অজস্র ছিল এবং সেই কারণে সাধারণ মজুরের আয় সুসময়েও ১ তংকার বেশী ছিল বলে মনে হয় না। অতএব মূল্যমান কম হওয়া সত্ত্বেও জনগণ কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন করত এসম্পর্কে সন্দেহ নেই।*

---

* এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য শামসী সিরাজ আফিফের-তারিখ-ই ফিরোজ শাহী, পৃঃ ১৩৬; কে, এম, আশরফের লাইফ এন্ড কন্ডিশন অব দি পিপল অব হিন্দুস্তান, পৃঃ ১৩১ অথবা ঐ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ এবং এইচ, নেলসন রাইটের দি কনোয়েজ এন্ড মেট্রোওলজিস অব দি সুলতান অব দিল্লী, পৃঃ ৭৩ দ্রষ্টব্য। এই সূত্রে উল্লেখ করা যায় যে, আলাউদ্দীন, মহম্মদ-বিন-তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালের মূল্যমান নিয়ে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, মহম্মদ তুঘলকের সময় গম, যব, ধান, ডাল, মসুর, চিনি, ভেড়ার মাংস ইত্যাদির দাম চড়ে গিয়েছিল এবং ফিরোজ তুঘলকের আমলে মূল্যমান আবার সুলতান আলাউদ্দীনের সময়ের মত হয়েছিল। (হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্চা পৃঃ ২১১, এবং পিপল এন্ড পলিটিক্স ইন আর্লি মিডিয়াভ্যাল ইন্ডিয়া পৃ: ২৮-২৯ দ্রষ্টব্য)। ইবন বতুতার বিবরণী অনুসারে মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় লখনৌতির কয়েকটি পণ্যের মূল্য উল্লেখ করে বলেছেন, দুনিয়ার অন্য কোথাও পণ্যমূল্য এত সস্তা নয়। কিন্তু বঙ্গদেশের জলবায়ু, বিশেষত বর্ষা এই আরব পর্যটকের কাছে অসহনীয় মনে হওয়াতে তিনি এই স্থানকে 'দোজখ পুর ই নিয়ামত' বলে মন্তব্য করেছিলেন। ইবন বতূতা উল্লিখিত কয়েকটি পণ্যের মূল্যের নমুনা নিচে দেওয়া হল—

১) চাল ৮০ রাত্তল (১ রাত্তল = ১৪ সের) ৮ দিরহাম
২) দুগ্ধবতীগাভী ৩টি রৌপ্য দিনার
৩) ৮টি মুর্গী ১ দিরহাম
৪) ১৫টি কপোত ২ ঐ
৫) ভেড়া ১ ২ ঐ
৬) চিনি ১ রাত্তল ৪ ঐ
৭) গোলাপজল ঐ ৮ ঐ
৮) ঘি ঐ ৪ ঐ
৯) ৩০ কিউবিট সূক্ষ্মসূতীর কাপড় ২ দিনার ইত্যাদি

রেহলা, (ইং অনুবাদ) আগা মাহেদি হুসেন, পৃঃ ২৩৪-৩৫, হিস্ট্রি অব বেঙ্গল (ঢাকা), ২য় খণ্ড পৃঃ ১০১-২ আধুনিক মুদ্রার মানে এই মূল্যের রূপান্তর সম্পর্কে দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

উৎসব, আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধূলা

মধ্যযুগের ভারতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যয়বহুল আমোদ-প্রমোদের অভাব থাকলেও হিন্দুদের নানা উৎসব এবং বারোমাসে তেরোপার্বণ লেগেই থাকত এবং এছাড়া ছিল দোল, বসন্ত পঞ্চমী, দশেরা, ঈদ, শব-বরাত, উরস বা সন্তদের নামে বার্ষিক উৎসব ইত্যাদি। মনোরঞ্জনের জন্য নাচগান ছিল সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং তার জন্য দোলের উৎসব, হিন্দোলা, শাবনী প্রভৃতি সব কিছুতেই একটি উৎসবের বাতাবরণ জড়িয়ে থাকত। এইসব অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হ'ল 'জশন' যখন বিশেষ পর্ব উপলক্ষে নাচগান, আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হ'ত যার থেকে আপামর জনসাধারণ সাধারণত বাদ পড়তেন না।

খেলাধূলা ও শরীরচর্চার নানা ব্যবস্থার প্রচলন সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। এইসব ক্রীড়ার মধ্যে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও সামরিক বৃত্তির উৎসাহদান করা হত। সেইজন্য মল্লযুদ্ধ, তরবারী সঞ্চালন, ঘোড়দৌড় ও চৌগন বা পোলোর কথা এযুগে শোনা যায়। প্রথম মামলুক সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবাক লাহোরে চৌগন খেলার সময় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারান। জিয়াউদ্দীন বারানী আফসোস করেছেন যে, বিত্তবান হিন্দুরা অশ্বারোহনে যাতায়াত করতেন ও দরিদ্র মুসলমানরা তাদের কাছে ভিক্ষা করতেন।* রাজপুতরা অশ্বারোহণে দক্ষ ছিলেন। অসি ক্রীড়া ও দ্বন্দ্বযুদ্ধ তৎকালীন যুগে সামরিক ও শরীরচর্চার অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। মৃগয়া ও শিকার সুলতান এবং আমির ওমরাহদের বিলাসবহুল জীবনে একটি অংগ ছিল। বাইরের খেলাধুলার সঙ্গে ঘরে বসে শতরঞ্চ এবং দাবা, পাশা ও তাস খেলা এদেশে প্রচলিত ছিল। অনেকের মতে, বাবরই শেষোক্ত খেলার প্রবর্তক ছিলেন এবং আকবর এই খেলার কিছু কিছু সংস্কার করেছিলেন।** এছাড়া পায়রা ওড়ানো ও মোরগের লড়াই-এর ন্যায় আমোদপ্রমোদ সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ও অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় চালু ছিল। যাদুকর, বাজিকর প্রভৃতি নানা খেলার মাধ্যমে লোককে চমৎকৃত করত এবং সর্বসাধারণের দৃষ্টিনন্দন অনুষ্ঠান করত।

হিন্দু সমাজ

মধ্যযুগের হিন্দুসমাজ বর্ণবৈষম্যের দ্বারা বিভক্ত ছিল। উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ ও অন্ত্যজদের মধ্যে বৈষম্য তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত পরে কঠোরভাবে মানা হত। কিন্তু বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজদের সম্পর্কে আলবেরুণীর বক্তব্য অনেক সময় অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। ব্রাহ্মণরা অনেক সময় ক্ষত্রিয়দের বৃত্তিতে যোগদান করত। খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতকেই সিন্ধুতে একটি শূদ্র রাজবংশ স্থাপিত হয়েছিল। কায়স্থরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছিল ও ক্ষত্রিয়রা সমাজে উচ্চবর্ণের মধ্যে অন্যতম ছিল। সুলতানী যুগে শূদ্রদের কাছে পুরাণ পাঠে বাধা অপসারিত হয়েছিল এবং বৈদিকচর্চার অবনতি হয়েছিল। সাধারণভাবে সমাজে হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি ভাগ ছিল এবং হিন্দুসমাজের বর্ণবৈষম্য কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশেষত ধর্মান্তরিত মুসলমানদের প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু মুসলমান সমাজ বর্ণবৈষম্য বা বৃত্তির ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল না। যদিও পিঠারী, জেলে, জোলা, দর্জি, কসাই, মেষপালক ইত্যাদি কতকগুলি বৃত্তি সাধারণত নিম্নবর্গের মুসলমানদেরই একচেটিয়া ছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকের শাস্ত্র নির্দেশের বহির্ভূত বৃত্তি গ্রহণে

---

* ফতোয়া-ই-জাহান্দারী-বারানী (১৯৪৮-এর ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে প্রকাশিত আংশিক ইং অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

** হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্চা পৃঃ ৩১১-১২; কিন্তু বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া, পঃবঙ্গ) এ অন্য ধরনের তাস বহুকাল চালু ছিল।

www.pathagar.com

অনীহা ছিল না। এর অন্যতম উদাহরণ হিসেবে রূপ ও সনাতনের কথা উল্লেখ করা যায়। এই দুইজনই গৌড়ে হুসেন শাহী শাসনকালে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। সমকালীন লেখক বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস বলেছেন ব্রাহ্মণরা প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করে শাস্ত্রের পঠন-পাঠনে জীবন অতিবাহিত করত। কিন্তু বাস্তবে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। দারিদ্র পীড়িত ব্রাহ্মণদের যে কোন বৃত্তি গ্রহণ মনুস্মৃতিতে সমর্থন করা হয়েছে। প্রাক-খলজী বিজয় যুগের বঙ্গদেশে ও পরবর্তী কালের হিন্দুসমাজে জাতপাত প্রথার বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। গন্ধবণিক, তন্তুবায়, কুম্ভকার, কর্মকার, তাম্বুলিক, মালাকার, শঙ্খবণিক, কংসকার, নাপিত, গোয়ালা, জালিয়া (জেলে), ডোম, চামার, চণ্ডাল প্রভৃতি উচ্চ ও নীচবর্ণের বিভিন্ন বৃত্তিতে সমাজ বিভক্ত ছিল। বার্বোসার বিবরণী অনুসারে বিদেশাগত আরব ও ইরানীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং করমণ্ডল ও মালাবারের উপকূল অঞ্চলে তারা ইসলাম ধর্ম প্রসারের জন্য মূলত দায়ী ছিল। মালাবারে আরব বাসিন্দারা মোপলা নামে পরিচিত ছিল। মোপলারা বৃত্তিতে নাবিক ও কৃষিজীবী ছিল। এইসব বহিরাগতরা স্থানীয়ভাবে বিবাহ করে ভারতীয় জনসমুদ্রে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। গৌড়ের হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ আরব বংশীয় ছিলেন এবং তিনি একজন অভিজাত পারসিক মহিলাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন।* কথিত আছে সুলতান হুসেন শাহ তাঁর পারসিক বিবাহজাত কন্যা রৌশন আখতার বানুর সঙ্গে কুতুবউল আশাগীনের বিবাহ দেন ও তাঁদের বংশধররা মুঘল রাজত্বকাল পর্যন্ত সোনারগাঁওতে সুপরিচিত জমিদার ছিলেন।

বার্বোসার ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, অভিজাত মুসলমানরা বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁরা ইস্টক নির্মিত প্রাসাদে বাস করতেন এবং প্রত্যেকের গৃহে স্নানাগার ছিল। পাণ্ডুয়ার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে একটি রাজকীয় হামামের নিদর্শন পাওয়া যায়। পোষাকের ও পাগড়ীর রত্নখচিত আভরণ, রেশমের আজানুবিলম্বিত পরিধান ও বিলাসবহুল খাদ্য ও পানীয় বঙ্গদেশের অভিজাত উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের বৈভবের সাক্ষ্য ছিল। নৃত্য-গীত, নানাপ্রকার সুরার ব্যবহার ও উৎসবের জাঁকজমক এই অভিজাত শ্রেণীর রুচির ও বিলাসের পরিচয় দিত। ১৫৩৮ সালে স্বয়ং মুঘল সম্রাট হুমায়ুন বঙ্গদেশে অভিজাতদের প্রাসাদ ও হর্মরাজির সৌন্দর্য, সাজানো বাগান ও কৃত্রিম ঝরনার বাহার দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। লোকসঙ্গীত ও বীরগাথা জনমনে প্রভাববিস্তার করেছিল। এইসব লোকগীতির মধ্যে 'হিন্দোলা ও শাবনী'র নাম উল্লেখযোগ্য। বিনোদন হিসাবে নাচের প্রতি লোকের আকর্ষণ ছিল। বৈষ্ণবগীতি ও নৃত্য, গুজরাটি গরবা, আফগানদের লোকগীতির ধারা জনপ্রিয় ছিল। রাধাকৃষ্ণ লীলা ও রামকথা বিশেষত তুলসীদাসের দোঁহা সাধারণের কাছে প্রিয় ছিল। এইসময় কিন্তু নাটকের অবক্ষয়ের ফলে বিশেষত বিদূষক ও ভাঁড় এবং নানা ধরনের সঙের ও লোকনাট্যের অবনতির লক্ষণকে প্রকট করে। এইসব বিনোদন বিত্তবানের ও দেবালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা ক্রমেই সীমিত হয়ে পড়ে। ফলে সুকুমার শিল্পের প্রসার ও শিল্পীদের বিকাশ ক্ষুন্ন হয়েছিল।**

সংস্কৃতি ও শিল্প

শিল্প ও শিল্পী এবং সংস্কৃতি ও স্থাপত্য শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। এই যুগে দেশী ও বিদেশী প্রভাব শিল্প, স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল। ঐতিহাসিক হাবিবউল্লাহর মতে, মামলুক সুলতানরা বিশেষ কোন সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে গৌরব

** Hussain Shahi Bengal, Momtazur Rahman Tarafdar (Asiatic Society, Dacca).

*** পৃঃ ৩১৪-১৫, আশরফ হিন্দুস্তাদের জনজীবন ও জীবন চর্যা পৃঃ ৩৭৩।

www.pathagar.com

করতে পারেন না।* সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় এক শতাব্দী পর তুঘলকদের রাজত্বকালে বলিষ্ঠ সৃজনশীল প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতকে সংস্কৃতির প্রধান উৎস ছিল হিন্দুস্তানের সীমা বহির্ভূত মুসলিম সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ঐতিহ্য কারণ ভারতীয় ভাবনা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারার উপর এইসময় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তৎসত্ত্বেও অন্তত একজন মুসলিম লেখক তাঁর সাহিত্যকীর্তিতে, রচনায় ও বিষয়বস্তুর রূপায়ণে এবং ভাষার দিক দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে ধরা হয়। তাঁর রচনার নাম 'সন্দেসরসক'। অপভ্রংস ভাষায় 'রাস' ধরনের এই লেখার রচয়িতা ছিলেন দ্বাদশ শতকের মূলতানবাসী মীর হাসানের পুত্র আব্দুর রহমান যিনি সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় সাহিত্যে সমান দক্ষ ছিলেন। এই সাহিত্যকীর্তি মুসলমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর ভারতীয়করণের ইঙ্গিত যার সর্বোত্তম বিকাশ দেখা গিয়েছিল আমির খসরুর লেখনীতে। খসরু হিন্দি কাব্যের চিত্রকল্পের ও বিষয়বস্তুর ব্যবহার করেছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতকলার প্রতি খসরুর প্রীতি ও তার উন্নতিতে নানা সংযোজন এবং হিন্দুস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি পেশ প্রভৃতি থেকে তাঁর সৃজনীশীল প্রতিভা ও ভারত-প্রীতি যে কতদূর আন্তরিকতাপূর্ণ তা জানা যায়।** সুলতানী আমলে সর্বোত্তম সাহিত্যিক প্রতিভার স্ফুরণ সম্ভবত আমির খসরুর লেখনীর মারফতে বিকশিত হয়েছিল ও সর্বশ্রেণী এবং ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের সেতুবন্ধ রচনায় প্রয়াসী হয়েছিল।

সামরিক প্রয়োজনের চাহিদা যতই জরুরী হোক না কেন, মামলুক সুলতানরা সাহিত্যের স্থায়ী মূল্যবোধকে অবহেলা করেন নাই। লেখনীকে সুলতানরা তরবারীর ন্যায় জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তুর্কী বিজয়ের প্রাথমিক স্তরে বিখ্যাত লেখক, পণ্ডিত ও দার্শনিক আল-বেরুনী হিন্দুস্তান সম্পর্কে জানবার জন্য এদেশে এসেছিলেন এবং তাঁর লেখা থেকে তৎকালীন হিন্দুস্তানের পরিস্থিতি, এদেশের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হয়। এই অনুসন্ধিৎসার উৎস কিয়দংশে বাস্তব প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছিল এসম্পর্কে সন্দেহ নাই। ধর্মীয় কারণে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থ ও ধর্মীয় আচার আচরণ বিষয়ক পুস্তক রচিত হয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে ইতিবৃত্ত ও রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত রচনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যানুরাগ, সাহিত্যের ইতিকথা ও রচনাবলীর বিকাশ দেখা দেয়নি। মামলুক সুলতানদের সাহিত্যের প্রীতি ছিল ঐতিহ্যগত এবং মোঙ্গল অত্যাচারের ফলে দলে দলে বৈদেশিক লেখক দিল্লীতে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল। এই যুগে হজরত-ই দিল্লীর সাংস্কৃতিক বিকাশে বিভিন্ন ধারার সংযোজিত হয়েছিল। জিয়াউদ্দীন বারানী প্রতিটি শাসকের আমলে কবি, ধর্মতত্ত্ববিদ্, আইনজ্ঞ, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও শৈল্পিক রচনাকার ও পত্রলেখকদের দীর্ঘ তালিকা পেশ করেছেন। গদ্য লেখকদের মধ্যে সাহিত্যের ইতিবৃত্তকার মহম্মদ আউফী, ইতিহাস ও রাজনৈতিক মতাদর্শের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ লেখক ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ এবং ইতিবৃত্তকার হাসান নিজামী ও মিনহাজ-উস-সিরাজের নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি কেবলমাত্র ইতিবৃত্তকার ছিলেন না। কারণ, রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও ধর্মগ্রন্থের উপর ব্যাখ্যা ও মন্তব্য এবং আইন-সংক্রান্ত বই ও ধর্মীয় প্রার্থনাপুস্তক রচনায়ও দক্ষ ছিলেন। কাব্যরচনা সর্বত্রই সমাদৃত হ'ত এবং সাহিত্যচর্চার সঙ্গে কাব্যরচনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। রাষ্ট্র থেকে যেসব কবি ও লেখক ভাতা পেতেন বা সুলতান, শাহজাদা বা আমির ওমরাহদের দরবার যে সকল লেখক অলঙ্কৃত করতেন তাদের সংখ্যা ছিল অগণিত। এইসব লেখকদের এক

---

* শরফের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩২৫-২৬ ও The Fundadion of Muslim Rule in India, পৃঃ ২৫২-৫৩ দ্রষ্টব্য।

** আমির খসরু সম্পর্কে বিস্তারিত অলোচনার জন্য নিম্নে দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

একজনের জ্ঞানভাণ্ডার বিভিন্ন বিষয়ে গভীর ও সুদূরবিস্তারী ছিল। প্রবন্ধকার, ঐতিহাসিক, ধর্মতত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য ছিল না। কবি, সাহিত্যিকরা বা লেখকরা সকলেই স্ব স্ব প্রতিভায় সমুজ্জ্বল ছিলেন এসম্পর্কে সন্দেহ নাই। বলবনের দরবারে কেবলমাত্র স্বনামখ্যাত ধর্মোপদেষ্টা, জ্ঞানী-গুণী ও কবির সমাবেশ হয়নি। এইসময় সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, জ্যোতির্বেত্তারাও দিল্লীর দরবার অলঙ্কৃত করেছিলেন। চিকিৎসার জগতে ও রোগ-নিরাময়ে সঠিক ঔষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বদরুদ্দীন দামাস্কী ও হাসানউদ্দীন মেরিক্কার নাম স্বনামধন্য। এছাড়া হামিদুদ্দীন মুতরিজ অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় যেমন দক্ষ ছিলেন চিকিৎসার ক্ষেত্রেও একই ধরনের সুনাম অর্জন করেছিলেন। হিন্দুস্তানে ধ্রুপদী ফার্সী কাব্যের বিকাশে এমনকি ইরানীয় লেখকদেরও ঈর্ষান্বিত হবার কারণ কেবলমাত্র খসরুর অমর লেখনীই নহে, ত্রয়োদশ শতকের প্রতিভাবান কবি আমির হাসান সিজেজির কাব্যধারাও দায়ী। আমির খসরু তাঁর আরেকজন সমকালীন লেখকেরও উচ্চপ্রশংসা করেছেন। শেষোক্ত লেখকের নাম হল বাদায়ুনের রুকমুহমেরা। মুসলমান কবিদের হিন্দি রচনা ও হিন্দুদের উর্দুতে রচনার উদাহরণ এ যুগে বিরল নয়। ফার্সী, আরবী, তুর্কী ভাষার সঙ্গে এদেশীয় ভাষার সংমিশ্রণে উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল। মালিক মহম্মদ জয়সীর হিন্দি ভাষায় পদ্মিনীর কাহিনী রচনা করেন।

হিন্দুদের লিখিত গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করার রীতি সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালের পূর্বে বিশেষ চালু হয়নি। শেষোক্ত সুলতানের রাজত্বকালে সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ দরবারের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও ইতিপূর্বে বঙ্গদেশে আলি মর্দান খলজীর রাজত্বকালে কামরূপের একজন ধর্মান্তরিত যোগীর সহায়তায় লখনৌতির ইমাম ও প্রধান কাজী রুকণউদ্দীন সমরকন্দী অমৃতকুম্ভ নামে যোগের উপর একটি গ্রন্থের আরবীভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, শিক্ষার মান খুবই উচ্চ ছিল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পৃষ্ঠপোষকতা লাভে বঞ্চিত ছিল না। যে কোন নববিজত স্থানে যে প্রতিষ্ঠান সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত হত সেটা হল মাদ্রাসা। এছাড়া মসজিদের সঙ্গে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত হ'ত। ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরিচালনায় বহু বিদ্যালয় ছিল আবার রাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্যেও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হ'ত। সুলতান ইলতুৎমিস তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীনের নামে দিল্লীতে বহু অর্থব্যয়ে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। মূলতানে ফিরোজী মাদ্রাসা নামে আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। বঙ্গদেশের খলজী শাসকরাও বহু এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। বারানী বলেছেন যে, তুর্কী বিজয়ের পর হিন্দুস্তানে প্রতিষ্ঠিত এইসব উচ্চ শিক্ষায়তনে বহু নামকরা অধ্যাপকরা শিক্ষাদান করতেন। তুঘলক বংশের রাজত্বকালে কেবলমাত্র দিল্লীতেই একহাজার মাদ্রাসা ও মসজিদের সঙ্গে সংযুক্ত দুইহাজার মাক্তব ছিল। এই পরিসংখ্যান থেকে তাঁদের পূর্বসূরী মামলুক সুলতানদের রাজত্বকালে শিক্ষাপ্রসার সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা যায়।

ঐতিহাসিক হাবিবউল্লা মন্তব্য করেছেন যে, ইতস্তত ছড়ানো সজীব ও নির্জীব অলঙ্কৃত মূর্তি, দেওয়ালে আঁকা বা খোদাই করা অথবা আসবাবপত্র, পতাকা, তাঁবু, ঘোড়ার জিন, অস্ত্রশস্ত্রের উপর অলঙ্করণ থেকে আমাদের পক্ষে সহজেই অনুমান করা সম্ভব যে, মামলুক সুলতানদের আমলে শৈল্পিক কল্পনা পরমোৎকর্ষলাভ করেছিল।* সুলতান ফিরোজ শাহ

* Foundation of Muslim Rule in India, পৃঃ ২৫৫ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

তুঘলক দেওয়ালে সজীব পদার্থের রঙীন চিত্র অঙ্কণ নিষেধ করেছিলেন। সিরাত-ই-ফিরোজ শাহীর পুঁথিতে অঙ্কিত বিভিন্ন নির্জীব পদার্থের চিত্র থেকে তৎকালীন যুগে লিখিত গ্রন্থে চিত্রাঙ্কনের মারফতে সুশোভিত করার প্রমাণ পাওয়া যায়।* সুন্দর হস্তাক্ষর পাথরে বা কাগজের উপর যে অপূর্ব শিল্পের ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি করত তা ভাস্কর্য বা মৃৎশিল্পের রূপকারের ন্যায় দৃষ্টিনন্দন ছিল। তথাকথিত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সংগীত মানুষকে আকর্ষিত করত এবং সকলরকম উৎসবের অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে গণ্য হত। সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যকলা সংযুক্ত ছিল। ভারতীয় সঙ্গীত স্বভাবতঃ কালক্রমে শাসকশ্রেণীকে আকৃষ্ট করেছিল এবং সঙ্গীতের জগতে স্বদেশী ও বিদেশাগত ধারার সংমিশ্রণে গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমির খসরু স্বয়ং একজন নামকরা গায়ক ছিলেন। তিনি স্বরচিত কয়েকটি কাব্য হিন্দুস্তানী সুরের মারফতে গীতরচনার সঙ্গীতশৈলীকে অনুসরণ করেছিলেন এবং সঙ্গীতের জগতে নবনব রাগের উদ্ভাবন করেছিলেন।

আচার-আচরণ ও রীতিনীতিতে স্বল্পকালের মধ্যে তুর্কী প্রভাবের স্থলে পারসিক এমনকি ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসলমানদের ধারা বিদেশাগত তুর্কী শাসকগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিল। সম্ভবত আইবাক ও ইলতুৎমিসের সঙ্গীসাথীরা সাধারণত তুর্কী ভাষা ব্যবহার করতেন। কিন্তু এদেশে তুর্কী ভাষার প্রচলন বেশীকাল স্থায়ী হয়নি। কারণ ফার্সীর ক্রমবর্ধমান প্রসার এবং শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক প্রয়োজনবোধে দেশীয় ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা এইসব স্থানীয় ভাষায় প্রভাব বৃদ্ধি করেছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন তুর্কী জাতির শ্রেষ্ঠত্বে আস্থাশীল ছিলেন এবং ভারতে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের প্রতি উন্নাসিক মনোভাব পোষণ করতেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানীর লেখনীতেও** বারংবার এই ধরনের উন্নাসিক মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তুর্কী ভাষার ও প্রভাব এদেশে স্থায়ী হয়নি এবং এই ভাষায় কোন গ্রন্থ হিন্দুস্তানে রচিত হয়নি। বলবন তাঁর বংশমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রাচীন ইরানীয় দরবারের প্রথা ও আচার দিল্লীতে স্বীয় দরবারে প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর বংশধরদের পারসিক ঐতিহ্যের অনুকরণে কাইখসরু, কাইকোবাদ, কাইমুর প্রভৃতি নাম রাখা হয়েছিল। সুলতান বলবন ইসলামিক বুদ্ধিজীবী জগতের নেতৃত্ব দানে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামিক সভ্যতার অন্যতম রক্ষাকর্তা, ধারক ও বাহক হিসেবে বলবন পারসিক ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

হিন্দুস্তানে আগত তুর্কীদের পক্ষে পরিবেশের প্রভাবকে অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব হয়েছিল। উচ্চবংশীয় তুর্কীরা এমনকি চাজ্জু, হামিদরাজা প্রভৃতি ভারতীয় নাম গ্রহণ করত। পানপাতার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং মেয়েদের বিবাহে পণদান প্রথা এতদূর চালু ছিল যে, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক দরিদ্র মাতৃপিতৃহীন মুসলমান মেয়েদের বিবাহে পণ দিয়ে সহায়তা করতেন। হিন্দু সমাজের জাতিবৈষম্য প্রথার প্রভাব এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে শেখ নাসিরউদ্দীন চিরাগ-ই-দিল্লী আফশোষ করে বলেছেন, দিল্লীতে বিভিন্ন বৃত্তির মুসলমানদের জন্য আলাদা গোরস্তান নির্দিষ্ট ছিল।***

দিল্লীতে যেসব বিদেশাগত তুর্কী খলজী বা ইরানীরা বাস করতেন তাঁরা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল বসবাস করার জন্য বহু বিষয়ে স্থানীয় ভাষা, রীতি-নীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে

* এ বিষয়ে পাটনা খুদাবক্স সংগ্রহালয় সুরক্ষিত সিরাত-ই-ফিরোজ শাহীর পুঁথি দ্রষ্টব্য।

** বারানী ভারতীয়দের 'ভাত-খাওয়া হিন্দুস্তানী' বলে বিদ্রুপ করেছেন, তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, পৃঃ ১৮২ দ্রষ্টব্য।

*** Foundadion of Muslim rule India, পৃঃ ২৫৬-৫৭।

www.pathagar.com

গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বঙ্গদেশে এই প্রভাব কতদূর সুদূর প্রসারী হয়েছিল এসম্পর্কে মন্তব্য করে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিবৃত্তকার দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন যে, "মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হইতে আসুন না কেন এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস নিবন্ধন বাঙ্গলা তাহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল।"*

স্থাপত্য

এইযুগের স্থাপত্যকে 'ইন্দো-সারাসেনিক' বা 'পাঠান' বলে ফার্গুসনের ন্যায় অনেকে অভিহিত করেছেন, আবার হ্যাভেল এইযুগের স্থাপত্যর 'আত্মা ও দেহ' সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় বলে মন্তব্য করেছেন। বাস্তবে এইযুগে যে স্থাপত্যর সৃজন হয়েছিল তা ভারতীয় ও ইসলামিক উভয় রীতির সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ের আরেকটি উদাহরণ। সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইসময় এই ধরনের যুক্ত সাধনার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। স্যার জন মার্শালের মতে, 'ইন্দো-ইসলামিক শিল্প কেবলমাত্র ইসলামিক শিল্পের একটি স্থানীয় সংস্করণ নয়' অথবা 'একে হিন্দু-শিল্পের পরিবর্তিত রূপ বলা যায় না'। সাধারণভাবে ' ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য উভয় উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে যদিও সবসময় এই গ্রহণের মাত্রার সর্বত্রই তারতম্য রয়েছে।'

যখন ইসলামিক ধারা খ্রীষ্টীয় সপ্তম দশকের মধ্যভাগ থেকে এদেশে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করেছিল তখন ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন রীতি এদেশে চালু ছিল। এছাড়া আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আরব, পারসিক বা তুর্কী প্রভৃতি যেসকল ইসলামের অনুসরণকারীরা পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ থেকে ইসলামিক ধারার বাহক হিসেবে এদেশে এসেছিলেন তাঁরা ঐসব অঞ্চলের রীতিকেই বহন করে এনেছিলেন। এইসব রীতির সংমিশ্রণ এইযুগে ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত রুচির প্রয়োজনে একটি ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সৃষ্টি করেছিল, যা জৌনপুর, বঙ্গদেশ, বিজাপুর, গুজরাট প্রভৃতি প্রতিটি প্রদেশে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত। দিল্লী ইসলামিক প্রাধান্যের কেন্দ্র ছিল এবং এখানকার স্থাপত্যেও সেইজন্য ইসলামিক প্রভাবের আধিক্য দেখা যায়। জৌনপুর ও দাক্ষিণাত্যে অপরদিকে স্থানীয় প্রভাব প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং বঙ্গদেশে শাসকগোষ্ঠী স্থাপত্যে ইষ্টকের ব্যবহার শুরু করেন। স্থানীয় রীতিতে গঠিত কাঠামোতে শিল্পীর বাটালী দিয়ে সযত্নে খোদাই করা অলঙ্করণের ফলে বঙ্গদেশের স্থাপত্য সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিল। এই স্থাপত্য পূর্বতন হিন্দুরীতিতে অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। পশ্চিমভারতও গুজরাতিরীতিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিল। পশ্চিমভারতে এর ফলশ্রুতিতে মধ্যযুগে কয়েকটি অপূর্ব সৌধ নির্মিত হয়েছিল। কাশ্মীর উপত্যকায়ও প্রচলিত কাঠের তৈয়ারী সৌধনির্মাণরীতি, যা হিমালয়ের এই প্রান্তে বহুকাল চালু ছিল, তাকে অনুসরণ করা হয়।

বহিরাগত ও স্থানীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণের কতকগুলি হেতু ছিল। প্রথমত, মধ্যযুগের ভারতের তুর্কী বিজয়ীরা তাঁদের প্রয়োজনে স্থপতি ও বাস্তুকার, কারিগর ও ভাস্কর হিসেবে ভারতীয় শিল্পীদের নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শেষোক্তরা স্বদেশের শৈল্পিক ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে পরিচিত ছিল। তাছাড়া বিদেশী আক্রমণের সময়ে অনেক হিন্দু ও জৈন মন্দিরের মালমশলা মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। ভারতীয় ও ইসলামিক স্থাপত্যরীতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুইটি বিষয়ে তাদের মিল ছিল। ফলে উভয়ের সংমিশ্রণের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। স্যার জন মার্শালের মতে কোন কোন মন্দির ও মসজিদের নির্মাণ পরিকল্পনায় প্রকোষ্ঠ বা স্তম্ভ বেষ্টিত অঙ্গন ছিল। যেসব মন্দির এই ধরনের পরিকল্পনায় নির্মিত

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ চন্দ্র (প্রকাশক দাশগুপ্ত এন্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা) অষ্টম সংস্করণ, পৃঃ ৭৪।

www.pathagar.com

সেগুলি স্বাভাবিকভাবে মসজিদ হিসেবে পরিবর্তিত করা সম্ভব হ'ত এবং বিজয়ীরা সর্বপ্রথম এইভাবে সেগুলিকে ব্যবহার করত। দ্বিতীয়ত, হিন্দু ও ইসলামিক স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মন্দির বা মসজিদকে সূক্ষ্মভাবে সৌন্দর্যমন্ডিত করার জন্য সৌধগাত্রকেসুসজ্জিত শিল্প কর্মে ভূষিত করা। উভয় রীতি অলঙ্করণের উপর নির্ভরশীল ছিল। দিল্লীতে এইযুগের যেসব প্রসিদ্ধ স্থাপত্যের নমুনা আছে তাদের মধ্যে কুতুব এলাকার মসজিদ ও কুতুবমিনারের নাম উল্লেখযোগ্য। স্থাপত্য নির্মাণের কাজে সর্বপ্রথম কুতবউদ্দীন আইবাক কুওয়েত-উল-ইসলাম মসজিদের সৃষ্টি করেছিলেন। এই মসজিদ ১১৯৫ সালে শুরু হয় এবং ১১৯৯ সালে শেষ হয়। একটি হিন্দু মন্দিরের ভিত্তির উপর এই মসজিদ গঠন করা হয় এবং প্রায় ২৭টি হিন্দু ও জৈন মন্দির থেকে গৃহীত মালমশলা এই মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আজমীরে সুলতান কুতুবউদ্দীনের আমলে নির্মিত দ্বিতীয় সৌধ হচ্ছে আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া নামে মসজিদ। চৌহান নৃপতি বিগ্রহরাজ বিশালদেবের নির্মিত একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় ও মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করা হয়েছিল।

কুতুবউদ্দীনের আমলে যে তৃতীয় সৌধটি পরিকল্পিত হয়েছিল তার নাম হচ্ছে কুতুবমিনার। ১১৯৯ সালে কুতুবমিনারের পরিকল্পনা হয় এবং ইলতুৎমিসের আমলে এই মিনার সম্পূর্ণ হয়েছিল। শুরুতে কুতুবমিনার আজানের 'ডাক' দেবার জন্য নির্মিত হয়, পরে কুতুবমিনারকে বিজয়স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হত। এই সৌধটি রূপরেখায় ও পরিকল্পনায় ছিল মূলত ইসলামিক এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই। কুতুবমিনারের কাজ সম্পূর্ণ করা ছাড়া সুলতান তাঁর পরলোকগত জ্যেষ্ঠ পুত্রের কবরের উপর 'সুলতান ঘড়ি' নামে একটি স্মৃতিসৌধ গঠন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি আরো কয়েকটি সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। সুলতান ঘড়ির তুর্কী শাসনাধীনে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য স্মৃতিসৌধ এবং এর স্থাপত্যকলায় যে কারুকার্য দেখা যায় তার অলঙ্করণে হিন্দু কলাকৌশলের উপাদানের প্রভাব সর্বাধিক। কিন্তু ইলতুৎমিসের রাজত্বকাল থেকে সুলতানী যুগের স্থাপত্যে ইসলামের স্থাপত্যরীতির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুলতান ইলতুৎমিস আড়াই-দিন-কা- ঝোপড়ার ও কুয়েত-উল-ইসলামের মসজিদের সঙ্গে সামান্য সংযোজন করেছিলেন এবং শেষোক্ত মসজিদের সম্মুখে একটি আবরণ নির্মাণ করেছিলেন। বলবনের নির্মিত রাজপ্রাসাদের নাম ছিল 'রক্তিম প্রাসাদ'। দিল্লীতে শেষোক্ত সুলতানের স্মৃতিসৌধ সম্পূর্ণ ইসলামিক স্থাপত্যরীতির দ্বারা প্রভাবিত। সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সময়কার স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগায় জামায়েত খানা মসজিদ ও কুতবমিনার এলাকায় নির্মিত আলাই দরওয়াজা সুপ্রসিদ্ধ। এছাড়া সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে আরো বহু সৌধ নির্মিত হয়েছিল। এই যুগের স্থাপত্যশিল্পে ইসলামিক প্রভাবের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। তুঘলক যুগের স্থাপত্য ছিল অলঙ্কার বর্জিত ও অনাড়ম্বর। এর মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তুঘলক সুলতানরা অর্থাভাবের জন্য শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এইযুগের স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে তুঘলক শাহর স্মৃতিসৌধ, তুঘলকাবাদ শহর ও ফিরোজ শাহ্ কোটলার নাম উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক রমিলা থাপরের মতে, 'গিয়াসুদ্দীনের সমাধিসৌধে ভারতীয় ও ইসলামী রীতির মিলনের অদ্ভুত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে'। হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যরীতির পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল ও অনেক হিন্দুরীতি যেমন পদ্মফুল নতুন স্থাপত্যরীতির অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে একটি নতুন স্থাপত্যরীতির সৃষ্টি হয়েছিল। সৈয়দ ও লোদী যুগের স্থাপত্যে খলজী আমলের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পাঠান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌধ নির্মাণ করেছিলেন সিকন্দার লোদীর উজীর। এই সৌধটির নাম ছিল মোতিকা মসজিদ। (ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

প্রাদেশিক স্থাপত্য— জৌনপুর ও বঙ্গদেশ

১৪০০ থেকে ১৪৭৮ সালের মধ্যে ইব্রাহিম, মামুদ ও হুসেন শারকীর রাজত্বকালে জৌনপুরে একটি নতুন স্থাপত্য রীতির সৃষ্টি হয়েছিল যা সন্দেহাতীতভাবে হিন্দুরীতির দ্বারা প্রভাবিত।

www.pathagar.com

এর বৃহদায়তন ঢালু দেওয়াল, চর্তুভুজ স্তম্ভ, বারান্দা ও কুটরী হিন্দু স্থপতির দ্বারা পরিকল্পিত। জৌনপুরের মসজিদে প্রচলিত আজানের ডাক দেওয়ার জন্য যে ধরনের বুরুজ নির্মাণের পদ্ধতি চালু ছিল সেইপ্রকার বুরুজ অনত্র দেখা যায় না। বাস্তব ক্ষেত্রে জৌনপুরের সৌধগুলি প্রাচীন মন্দিরের মালমশলায় গঠিত হয়েছিল। জৌনপুরে স্থাপত্যের নিদর্শনের মধ্যে ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শুরু এবং ১৪০৮ সালের মধ্যে নির্মিত অটলাদেবী মসজিদ এই স্থানের অপূর্ব শিল্পকলার অন্যতম নিদর্শন। জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ্ শার্কী (১৪৫২-৭৮) জামি-ই-মসজিদ নির্মাণ করেন। পঞ্চদশ শতকে নির্মিত লালদরওয়াজা মসজিদের নামও উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনের মধ্যে ইব্রাহিম শাহ্ শার্কীর আমলে নির্মিত জাহানঝেরি ও খালিস মুখলিসের ভগ্ন বহির্ভাগ দর্শনীয় স্থাপত্যের নমুনা হিসেবে উল্লেখ্য।

বঙ্গদেশের স্থাপত্যে এইসময় দুইটি রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। প্রধানতঃ ইষ্টকের ব্যবহার এই স্থাপত্যে প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং পাথরের ব্যবহার মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভের উপর ধনুকাকৃত খিলান ও মুসলিম শিল্পে গৃহীত হিন্দু মন্দির স্থাপত্যের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছে। বাঁশের কাঠামোর ন্যায় বক্রাকৃতি কার্নিস এবং তৎসহ্ পদ্মের প্রতীকের অলঙ্করণের সুষমায় সজ্জিত খোদাইতে এযুগের ইসলামিক ও হিন্দু স্থাপত্য মিলেমিশে নতুন রীতির সৃষ্টি করেছিল। পাণ্ডুয়ার ৪০০ গোলগম্বুজ যুক্ত ১৩৬৮ সালে সুলতান সিকন্দর নির্মিত মসজিদ তার বিশালত্ব ও সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ। সুলতান হুসেন শাহ্র আমলে ওয়ালী মহম্মদ নির্মিত ছোটে সোনা মসজিদ, হুসেন শাহ্র পুত্র নসরৎ শাহ্র আমলে নির্মিত গৌড়ের বড়ে সোনা মসজিদ (১৫২৬) ও কদম রসুল (১৫৩০) গৌড়ের অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম।

গুজরাট

প্রাদেশিক স্থাপত্য রীতির মধ্যে গুজরাটের রীতিকে অতুলনীয় বলা যায়। তুর্কী বিজয়ীদের আগমনের পূর্বে গুজরাটের নিজস্ব স্থাপত্য ও শিল্পরীতি ছিল কলাকৌশল ও ভাবসমৃদ্ধ। তুর্কী বিজয়ীরা স্থানীয় কলাকুশলীদের দক্ষতার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং সুন্দর সুন্দর সৌধ নির্মাণে তৎপর হয়েছিলেন। এইসব হর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল সূক্ষ্ম কাঠের কাজ, পাথরের জাফরীর সৌন্দর্যের বাহার ও অজস্র অলঙ্করণ। প্রাচীন মন্দির ও হর্মের মালমশলা নিয়ে গুজরাটের রাজধানী আহমেদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ শাহ এই শহরে বিশাল সৌধরাজি নির্মাণ করে রাজধানীকে সুশোভিত করেছিলেন। ১৪১১ সালে নির্মিত আহমেদাবাদের জাম-ই-মসজিদ সুলতান আহমেদ শাহ্র অন্যতম স্থাপত্য কীর্তি বলে গণ্য করা হয়। আহমেদ শাহ্র স্মৃতিসৌধ এই যুগের স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পনিদর্শন। বার্জেসের মতে, গুজরাটের রীতিতে সর্বাঙ্গীণ শৈল্পিক সৌন্দর্যের সঙ্গে কারিগরি উৎকর্ষের নিদর্শনের সমন্বয় সাধন এমন কতকগুলি মহত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে যা তাদের স্থানীয় শিল্পকর্মেও দেখা যায় নি। চম্পানির শহরে মহম্মদ বেঘরার স্মৃতিসৌধ ও দুর্গাভ্যন্তরের প্রাসাদ গুজরাট স্থাপত্যরীতির অন্যতম নিদর্শন। গুজরাটের শিল্প ও শিল্পরীতি সম্পর্কে বার্জেস প্রশংসায় সোচ্চার ছিলেন। অধ্যাপক সরসী কুমার সরস্বতী গুজরাটের স্থাপত্য সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন যে, 'In no other country or territory could the circumstances be more favourable for a happy blending of two alien architecëural traditions.'*

মালব—মালবের পুরাতন রাজধানী ধরে যে দুইটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল তাদের গম্বুজ ও স্তম্ভে হিন্দুরীতির স্থাপত্য সুস্পষ্ট। কিন্তু অত্যাল্পকালের পর মাণ্ডুতে রাজধানী পরিবর্তনের পর

* The Delhi Sultanate পৃঃ ৭০৯-৭১০।

www.pathagar.com

সেখানে যেসব নতুন সৌধ নির্মিত হয়েছিল তাতে মুসলিম স্থাপত্যকলার বা দিল্লীর স্থাপত্যের ঐতিহ্য প্রাধান্য লাভ করেছিল। মালবের স্থাপত্যের রূপরেখা এদেশীয় স্থাপত্য রীতির থেকে গৃহীত বা অনুকরণ করা ঐতিহ্যের বদলে ধনুকাকৃতি চূড়া বিশিষ্ট সৌধের প্রাধান্য দেখা যায়। নর্মদার বিস্তীর্ণ মালভূমির ধারে মাণ্ডু শহরের সুরক্ষিত দুর্গকে কেন্দ্র করে যেসব অপূর্ব হর্মরাজি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে সুলতান হুসেন শাহ পরিকল্পিত ও মামুদ খলজী কর্তৃক রূপায়িত বিখ্যাত জাম-ই-মসজিদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই মসজিদের সঙ্গে যেসব সৌধের নাম করা যায় তা হল হিন্দোলা মহল ও জাহাজ মহল এবং হুসেঙ শাহর সমাধি স্মৃতিসৌধ। এছাড়া মাণ্ডুর হর্মরাজির মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ ছিল বাজবাহাদুর ও রূপমতীর প্রাসাদ, এইসব স্থাপত্যের অধিকাংশের নির্মাণ কার্যে শ্বেতপাথর ও বেলেপাথরের ব্যবহার দেখা যায়। কাশ্মীরের সুলতানরা প্রাচীন কাঠ ও পাথরের কাঠামো গঠনের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু তৎসহ এইসব কাঠামোর উপর ইসলামের সঙ্গে যুক্ত গঠনসংক্রান্ত ও আলঙ্কারিক উপাদান ব্যবহৃত হয়েছিল। এইভাবে কাশ্মীরের স্থাপত্য শৈলীতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় চিন্তার যুক্ত সাধনা মিলিত হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতের শৈলী—দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য শৈলীতে ভারতীয় তুর্কী, আরবিক ও পারসিক এই বিভিন্ন ধারার মিলন হয়েছিল। গুলবার্গের জাম-ই-মসজিদ, দৌলতাবাদের চাঁদমিনার (১৪৩৫), বিদরের মামুদ গাওয়ানের মহাবিদ্যালয় (১৪৭২) ও অন্যান্য অনেক সৌধ শেষোক্ত সমন্বয়ের রীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বাহমনি যুগের বহু সৌধ পুরাতন হিন্দু আমলের মন্দিরের স্থানে নির্মিত হয়েছিল এবং এইসব মন্দিরের উপাদান নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ফলে হিন্দু শিল্পের প্রভাব স্বভাবতঃ এইসব সৌধে সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বাহমনি রাজ্যে যেসব ভাগ্যান্বেষী পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে কাজের সন্ধানে এসেছিলেন তাদের মারফতে তুর্কী ও মিশরীয় উপাদানের আমদানী হয়েছিল আর পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যেসব পারসিকরা দলে দলে এই রাজ্যে এসেছিলেন তাঁদের মাধ্যমে পারসিক উপাদান এই রাজ্যে আমদানী হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে স্থানীয় দক্ষিণী শিল্প ক্রমে স্বমহিমায় বিকশিত হতে থাকে। বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতানদের সৌধগুলি পরবর্তী শতকে ভারতীয় শিল্পী ও কারিগরদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। স্যার জন মার্শালের মতে, 'এর অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছিল এই যে, ভারতীয় প্রতিভা বৈদেশিক প্রভাবকে ছাপিয়ে এইসমস্ত নতুন সৃষ্টির উপর আরো বেশী গভীরে তাদের ছাপ রেখেছিল'।

দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগরের নৃপতিদের সহায়তায় স্থাপত্য ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সময় নির্মিত মন্দিরগুলি এই স্থাপত্যকলার অপূর্ব নিদর্শন। বৈদেশিক বিবরণীতেও বিজয় নগরের যুগের শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শনের কথা জানা যায়। বিটলস্বামী মন্দির বিজয়নগর শিল্পরীতির একটি অতুলনীয় প্রতীক বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।*

হিন্দু স্থপতিরা পশ্চিমভারতে বিশেষত গুজরাটে ইসলামের প্রভাবে একটি গুজরাটি রীতির সৃষ্টি করেছিল।** কিন্তু রাজপুতানায় প্রাক্-ইসলাম ঐতিহ্য স্থাপত্যরীতি বহুকাল প্রচলিত ছিল। রানা কুম্ভের কীর্তিস্তম্ভ (১৪৪০ খ্রীঃ) পঞ্চদশ শতকের রাজপুত রীতির অন্যতম উদাহরণ। চিতোরে দ্বাদশ শতকে নির্মিত একটি তুলনামূলক ভাবে আকারে ক্ষুদ্র স্তম্ভের অস্তিত্ব ও তার পূর্বসূরীর নমুনা দেখা যায়। রানা কুম্ভর সময় রণপুরে নির্মিত চৌমুখ মন্দির (যোধপুর) তার স্থাপত্যশৈলীর জন্য প্রসিদ্ধ। বর্তমানে রাজপুতানায় মধ্যযুগের যেসব প্রাসাদ দেখা যায়

---

* বিজয়নগরের শিল্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

** 'In Western India the traditional skill of the Hindu builders found a new expression in the Gujarati Muslim style', The Delhi Sultanate (Bharatiya Vidya Bhavan) পৃঃ-৭২৪।

www.pathagar.com

সেগুলির অধিকাংশ হয় মুঘল যুগে নির্মিত বা পুনর্নির্মিত হয়েছিল। তৎপূর্বেকার প্রাসাদ এবং এইসব পুনর্নির্মিত প্রাসাদগুলিতেও পুরাতনের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাক্-মুঘলযুগের গোয়ালিয়র দুর্গের মানসিংহের প্রাসাদকে সর্বাধিক আকর্ষণীয় বলে উল্লেখ করা যায়। এই প্রাসাদের স্থাপত্যের মধ্যে স্থানীয় রীতির প্রতিফলন দেখা যায়। আকবর তাঁর আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি ও অন্যান্য স্থানের প্রাসাদ নির্মাণের সময় গোয়ালিয়রের মানসিংহ প্রাসাদের পরিকল্পনার থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

এইভাবে ইসলামের আগমনের প্রাথমিক স্তরে সংঘর্ষ ও বিরোধ শুরু হলেও ক্রমান্বয়ে পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দুস্তানে উভয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়। সমাজে, স্থাপত্যে, শিল্পে ও জীবনের অন্যান্য বিভাগে এই সমন্বয় উভয়ের মিলনের পথ প্রশস্ত করেছিল। আকবরের সিংহাসনে আরোহনের ফলে তা বাস্তবায়িত হয় এবং পরবর্তীকালেও তার ধারা ভারতীয় জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছিল।*

মধ্যযুগের হিন্দুস্তানে ইতিহাস রচনা—মুসলিম ইতিবৃত্তকাররা

সাধারণত ১২০৬ সালে কুতুবউদ্দীন আইবাকের সিংহাসনারোহনের সময় থেকে ভারতে তুর্কী শাসনের সূত্রপাত বলে ধরা হয়। কিন্তু আরবদের 'সিন্ধু-বিজয়' (৭১২ খ্রীঃ) থেকে হিন্দুস্তানে আরব শাসনের যুগ শুরু হয়। আরবরা হিন্দুস্তানের অন্যত্র তাদের প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে হিন্দুস্তানের হিন্দু রাজ্যগুলি তুর্কী আক্রমণের ফলে বিধ্বস্ত হয় এবং উত্তর ভারতে তুর্কী প্রাধান্য স্থাপিত হয়। এইযুগের ভারতের আরব ও তুর্কী বিজয় সময় সম্পর্কে ও তৎসহ মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে আমরা সমকালীন লেখকদের কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি। ফলে এইসব ঐতিহাসিকদের লেখনী এবং সমকালীন সাহিত্যিক ও ইতিহাস আশ্রিত লোকগাঁথা তৎকালীন যুগের উপর আলোকসম্পাত করেছিল। ইতিপূর্বে ভারতের হিন্দুরাজাদের রাজত্বকালের সম্পর্কে ঐতিহাসিক লেখনীর বিশেষ অভাব দেখা যায়। কিন্তু তুর্কী শাসনের যুগে মধ্যযুগের ইতিবৃত্তকাররা সেই অভাব পূরণ করেছিলেন। এইসঙ্গে সমকালীন লিপি ও স্থাপত্য এবং লোকগাঁথা ও শিল্প মধ্যযুগের ইতিহাসের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে আমাদের সাহায্য করে। মধ্যযুগের ইতিহাস রচনায় তৎকালীন লেখক ও ইতিবৃত্তকারদের বিবরণী আমাদের সর্বাধিক সাহায্য করে। এইসব লেখকদের মধ্যে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তাঁদের নাম নিম্নে বিবৃত হল। এইযুগের ইতিহাসকে সমকালীন ইতিবৃত্ত, সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, প্রাদেশিক ইতিহাস ও পরবর্তীকালের লেখকদের বিবরণী প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

সমকালীন ইতিবৃত্তের মধ্যে হিন্দুস্তানে তুর্কী আক্রমণের প্রাথমিক স্তরে লেখা আবু নাসের বিন মহম্মদ আল উতবীর লেখা গ্রন্থ 'কিতাব-উল-ইয়েমিনীতে' গজনীর সুলতান সবুক্তগীন ও তৎপুত্র গজনীর সুলতান মামুদের রাজত্ব ও বিজয় কাহিনীর বিবরণ ১০২০ সাল পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে। উতবীর লিখিত ইতিহাসে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে বিস্তারিত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। 'কিতাব-ই-ইয়েমিনী'র দেওয়া সাল ও তারিখের যথার্থতা সম্পর্কে নানা কারণে বর্তমান কালের ঐতিহাসিকদের আস্থার অভাব রয়েছে। উতবী যেসব বর্ণনাময় ভাষা ও অলঙ্কারের ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর গ্রন্থ ইতিবৃত্ত থেকে সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও ঐতিহাসিকরা সবুক্তগীন ও গজনীর মামুদের সমকালীন লেখক ও তৎকালীন যুগের অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে উতবীকে গুরুত্ব দিয়েছেন। উতবী লিখিত বিবরণীতে এমন সব ঘটনার উল্লেখ আছে যা থেকে সুলতান মামুদের সময়কার গজনীর সাধারণ মানুষের জীবন

* J.A.S.B., 1970, Vol.Xii, David MacCutchion -এর মতে বঙ্গদেশে ইসলামের আগমনের পর স্থাপত্যে যে নিজস্ব স্বকীয় রীতির সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে সন্দেহ নাই।

www.pathagar.com

যে সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ ছিল না তাও জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উতবী গজনীর সুলতান মামুদের আমলের একটি দুর্ভিক্ষের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে রুটির অভাবে অনাহারে দরিদ্র সাধারণের অসহায় মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা আছে। জেমস রেনল্ডস 'কিতাব-ই-ইয়েমিনীর ইংরাজি অনুবাদ করেছেন।

'জাইন-উল-আকবরের' লেখক আবু সৈয়দ গারডিজি কর্তৃক পারস্যের ইতিহাসে সুলতান মামুদ গজনীর সম্পর্কে যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে তাঁর কার্যকলাপের উপর আলোকসম্পাত করা হয়েছে। এই গ্রন্থ থেকে মামুদের জীবনী সম্পর্কে জানা যায় এবং এইখানে যেসব তারিখ ও ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেগুলির যথার্থতা সন্দেহাতীত।

'তারিখ-ই-বৈহাকীর' লেখকের নাম আবুল ফজল মহম্মদ বিন হাসান আল বৈহাকী। এই গ্রন্থে সুলতান মামুদের ও মাসুদের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তাঁদের পূর্বসূরীদের সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে। এই গ্রন্থ থেকে গজনীর দরবারের আমির ওমরাহদের গোষ্ঠী বিরোধ সম্পর্কেও জানা যাবে। 'তারিখ-ই-বৈহাকী' বা 'তারিখ-ই-মাসুদী' এই যুগের ইতিহাসের একটি মূল্যবান সূত্র।

তাজ-উল-মাসিরের লেখক হাসান নিজামী ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে বিধর্মী হিন্দুদের উপর তুর্কী বিজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর লেখনী ধারণ করেছিলেন। তিনি তাঁর লিখিত ইতিবৃত্তে অকারণ ও অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা ও বাক্যবিন্যাসের সৃষ্টি করেছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। সুলতানী শাসনের প্রাথমিক স্তরে কুতুবউদ্দীন আইবাক ও ইলতুৎমিসের রাজত্বকাল সম্পর্কে এই গ্রন্থে সমকালীন বিবরণ পাওয়া যায়।

'তরকত-ই-নাসিরী'তে তুর্কী আক্রমণের সময়ও হিন্দুস্তানে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমকালীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। তৎকালীন যুগের ইতিবৃত্তের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল মিনহাজউদ্দীন আবু উমর বিন মিনাহা-উদ্দীন-আল-জুঝানী সংক্ষেপে মিনহাজ-উস-সিরাজের লিখিত তরকত-ই-নাসিরী। মুসলিমদের ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্তসার এই গ্রন্থ ১২৬০ সালে সম্পূর্ণ হয়। হিন্দুস্তানে তুর্কী বিজয় বিশেষত সুলতান মহম্মদ ঘোরীর আমলেও তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ মিনহাজের লেখনী থেকে জানা যায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, এই গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা ও তারিখগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্বাসযোগ্য। মিনহাজের লিখিত ইতিহাস কেবলমাত্র সমকালীন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নহে অনেক ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং এই সব ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দিল্লীর প্রধান কাজির পদ সুলতান নাসিরউদ্দীনের আমলে এই ঐতিহাসিক বহুকাল অলঙ্কৃত করেছিলেন। মিনহাজের লেখনী প্রধানত দরবারের জীবনযাত্রা, আমির ওমরাহদের কাহিনীকে কেন্দ্র করে বলা হয়েছে। তিনি তুর্কী গোষ্ঠীর সমর্থক ছিলেন। সুলতান মহম্মদ ঘোরী ও ইলতুৎমিস এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি মিনহাজের সহানুভূতি ছিল। বলবনের সমর্থক হিসাবে তুর্কী গোষ্ঠীর বিরোধী ইমাদ-উদ্-দীন রিহানের ন্যায় এদেশীয় আমিরের কার্যকলাপের প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি ছিল না। মিনহাজের লিখিত বিবরনী থেকে সুলতানী শাসনের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী ১২৬০ সাল পর্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু ১২৬০-১২৬৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সুলতান নাসির-উদ্-দীন মামুদের রাজত্বের শেষপর্যায় থেকে বলবনের সিংহাসন লাভ পর্যন্ত কোন সমকালীন বিবরণ পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থ মেজর রাভেট্রি (Maj. Raverty) দক্ষতার সঙ্গে ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন এবং তৎসহ অনেক মূল্যবান টিকা সংযোজন করেছিলেন।

তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক স্তরে আরো কয়েকজন সমকালীন লেখকের নাম করা যায়। এইসব লেখকদের মধ্যে শেখ আব্দুল হাসান বা ইবন-উল-আসিরের গ্রন্থের নাম 'কামিল -উত-তওয়ারিখ'। এই গ্রন্থ মধ্যএশিয়ার ইতিবৃত্ত এবং লেখক স্বয়ং মেসোপটেমিয়ার অধিবাসী

www.pathagar.com

ছিলেন। এই লেখক আফগানীস্থানের ঘোর নামক রাজ্যের শাসক শানসাবানী বংশ সম্পর্কে বিশেষত, মহম্মদ ঘুরীর হিন্দুস্তান বিজয়ের বিষয় একটি বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণে হিন্দুস্তানের তুর্কী বিজয়ের ঘটনা ও তারিখ সম্পর্কে লেখক যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করলেও তাঁর বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত। সম্ভবত এইসব ঘটনার জন্য লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এই পর্যায় আরেকটি সর্বকালীন মূল্যবান গ্রন্থ 'তারিখ-ই-ফকর-উদ্-দীন' মুবারক শাহী লেখক ফখর-ই-মুদাবির সমসাময়িক কালের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তুর্কী শাসকদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বর কথা উল্লেখ করেছেন।

মিনহাজ্-উদ্দীনের লেখনীতে ১২৬০ সালের পর সমকালীন ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। প্রায় পাঁচ বৎসর পর সুলতান বলবনের রাজত্বকাল থেকে জিয়াউদ্দীন বারানীর গ্রন্থ তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে লিপিবদ্ধ আছে। বারানী মহম্মদ বিন তুঘলকের আমল ও ফিরোজশাহ তুঘলকের রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসরকাল পর্যন্ত ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। বারানীকে ইলিয়ট 'পক্ষপাত দুষ্ট ঐতিহাসিক' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নামেমাত্র উল্লেখ করেছেন কারণ সেইসব ঘটনার কথা বলে বারানী স্বীয় পৃষ্ঠপোষকের বিরাগভাজন হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক ফিরিস্তা পর্যন্ত এইজন্য বারানীকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ফলে যে সব ক্ষেত্রে এমনকি বারানী ও শাসকগোষ্ঠীকে নিন্দা করেছেন সেইসব ঘটনার গুরুত্ব স্বভাবত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বারানী সুলতানের দরবারের ঘটনাবলীর সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন এবং বহু বিষয়ে বিশেষত রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাঁর লিখিত ইতিহাসে ঘটনাবলী সঠিক পরম্পরা রক্ষিত হয়নি এবং দিন ও তারিখ যথাযথভাবে উল্লিখিত হয়নি। বারানীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল রক্ষণশীল। এইসব ও অন্যান্য দোষ ক্রটি সত্ত্বেও বলবন থেকে তুঘলক বংশের রাজত্বকাল অন্ততঃ ফিরোজ তুঘলকের সিংহাসনারোহনের প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত বারানীর লিখিত তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীর উপর ঐতিহাসিকদের এই যুগের বিবরণের জন্য অনেকটা নির্ভর করতে হয়। সুলতান ফিরোজ শাহর আমলে অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'ফতুহাত-ই-ফিরোজ-শাহী' সুলতান কর্তৃক লিখিত একটি ৩২ পাতার ক্ষুদ্র পুস্তক যাতে ফিরোজশাহ কর্তৃক ঘোষিত বিশেষ নির্দেশগুলি দেওয়া আছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার গুরুত্বের কারণ এই গ্রন্থের মারফতে রক্ষণশীল সুলতানের মনোভাব ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটি হল 'সিরাত-ই-ফিরোজশাহী'। এই দ্বিতীয় গ্রন্থটি সম্ভবত সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের নির্দেশ অনুযায়ী ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়েছিল। এই পুস্তিকাতে প্রথমোক্ত গ্রন্থের বক্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সিরাত-ই-ফিরোজশাহীতে সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের কার্যকলাপের বিরবণ পাওয়া যায়।

সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের রাজত্বকাল সম্পর্কে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তৈমুরের হিন্দুস্তান আক্রমণের পর একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের নামও তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' এবং লেখকের নাম শামসী সিরাজ আফিফ। তিনি ১৩৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের প্রিয়পাত্র ছিলেন। শামসী সিরাজ আফিফের লিখিত ইতিবৃত্তে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এই লেখক অন্য যে সব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বর্তমানে তা আর পাওয়া যায় না।

জিয়াউদ্দীন বারাণীর সমকালীন ঐতিহাসিক ইসেমী তাঁর লিখিত মহাকাব্য ধরণের গ্রন্থ ফুতুহ-উস-সালাতিনে ১৩৫০ সাল নাগাদ গজনীর ইয়েমিনী বংশের অভ্যুত্থান থেকে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস রচনা করেছেন। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী পরিবর্তনের সময় ইসেমী বাধ্য হয়ে দৌলতাবাদে গিয়েছিলেন এবং

www.pathagar.com

পথে তাঁর পিতামহের মৃত্যু হয়। ইসেমি পরবর্তীকালে বাহমনী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন বাহমন শাহর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন ও দক্ষিণ ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে তিনি দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই কারণে ইসেমী সুলতানের কঠোর সমালোচক ছিলেন।

তৈমুরের আক্রমণের ফলে তুঘলক শাসনের অবসান হয়। মালফুজৎ-ই-তৈমুরীতে বা তৈমুরের নিজস্ব আত্মজীবনীতে এই কাহিনীর বিশদ বিবরণ লেখা আছে। এই গ্রন্থ তুর্কী ভাষা থেকে ফার্সী ভাষায় শাহজাহানের আমলে আবুতালিব হুসেনী কর্তৃক অনূদিত হয়। তৈমুরের মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বৎসর পর তাঁর পৌত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় শরফ-উদ্-দীন আলি ইয়াজ্দি মালফুজৎ-ই-তৈমুরীর অনুসরণে জাফরনামা নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রথমোক্তরই প্রায় পুনরাবৃত্তি। কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থকে ভাষা ও অলঙ্করণে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা হয়েছে।

সৈয়দ বংশ সম্পর্কে একমাত্র সমকালীন গ্রন্থের নাম হল 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'। এই গ্রন্থের লেখক সিরহিন্দের ইয়াহিয়া বিন আহমেদ সৈয়দ বংশের দ্বিতীয় সুলতান মুবারক শাহর (১৪২১-৩৪ খ্রীঃ) মৃত্যুর স্বল্পকাল পরেই এই পুস্তক রচনা করেছিলেন। দিল্লী সুলতানী আমলের ঐতিহাসিকরা প্রায় সকলেই ছিলেন সুন্নী। কিন্তু একমাত্র তারিখ-ই-মুবারক শাহীর লেখক ছিলেন শিয়া। এই গ্রন্থ মুইজউদ্দীন মহম্মদ ঘুরীর সময় থেকে শুরু হয় এবং সৈয়দ বংশের তৃতীয় নৃপতি মহম্মদের আমলে শেষ হয়। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর ইতিবৃত্তের 'ঘটনাবলী বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত এবং ক্ষমতাশালী ফিরোজশাহর অভিষেক পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তৎপরবর্তী যুগের ঘটনা (লেখকের স্বয়ং) দেখে লিখেছেন।' বারানীর পর ইয়াহিয়া ঐতিহাসিক হিসাবে সকলের আস্থা অর্জন করেছেন এবং ১৪০০ থেকে ১৪৩৪ সাল পর্যন্ত সৈয়দ রাজত্বকালের তিনিই একামাত্র বিশ্বাসযোগ্য লেখক। পরবর্তী যুগের লেখকরা নিজামউদ্দীন আহমেদ থেকে ফিরিস্তা পর্যন্ত সকলেই ইয়াহিয়ার বিবরণের উপর নির্ভর করেছেন।

আফগান শাসন সম্পর্কে লোদী যুগের প্রথমার্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিকের বিবরণ পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত দুইটি পুঁথি 'ওয়াকিত-ই-মুশতাকী' ও 'তারিখ-ই-মুশতাকী' আপাতদৃষ্টিতে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে মনে হতে পারে। এই দুইটি পুঁথির লেখক শেখ রিজ কুলাহ ১৪৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পুঁথিতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও মাঝে মাঝে নানা কাহিনী দেওয়া আছে। লোদী রাজত্বের প্রথমার্ধে এইসব ঘটনা সমকালীন ইতিবৃত্তের উপর সম্ভবত কিছুটা আলোকসম্পাত করতে সক্ষম হয়েছিল। শূর বংশের শাসনকাল সম্পর্কেও এইসব ঘটনা থেকে সর্বপ্রথম জানা যায়। সিকন্দর লোদী, শেরশাহ ও ইসলাম শাহ কর্তৃক জনকল্যাণ মূলক ও কৃষির উন্নতি ও প্রজামঙ্গলের বিষয়ে যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল বলে লেখক উল্লেখ করেছেন তার থেকে এইসব সুলতানদের প্রজাহিতৈষণার কথাও জানা যায়।

বহলুল লোদীর রাজত্বকালে সপ্তদশ শতকে লিখিত তিনটি গ্রন্থ লোদীদের বিষয় বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই তিনটির মধ্যে প্রথমটির নাম 'তারিখ-ই-শাহী' বা 'তারিখ-ই-সালাতিন-ই আফগানা' যার লেখক আহমদ ইয়াদগার ১৬০১ সালে এই গ্রন্থের রচনা করেন ও হিমুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয়টির নাম 'মাকজানা-ই-আফঘানা'র লেখক নিয়ামতুল্লা ১৬১২ সালে তাঁর লিখিত পুস্তক রচনা করেছিলেন এবং ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বের শেষাবধি ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তৃতীয়টির লেখক ছিলেন আবদুল্লা। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫-১৬২৭ খ্রীঃ) তিনি গ্রন্থ রচনা করেন ও দায়ুদ শাহর মৃত্যু (১৫৭৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত আফগানদের ঐতিহাসিকবিবরণ তাঁর পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এছাড়া ফিরিস্তা,

www.pathagar.com

নিজামউদ্দীন. বাদায়ুনী প্রভৃতি পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা এই যুগের ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন এবং প্রথমোক্ত দুইজন প্রাদেশিক স্বাধীন সুলতানদের সম্পর্কেও তথ্য পরিবেশন করেছিলেন।

কয়েক জন বৈদেশিক লেখক যথা তাসখন্দ থেকে আগত বদর-উদ্-দীন যিনি মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে দিল্লীতে কিছুকালের জন্য বসবাস করেছিলেন। মামালিক-উল-আবসারের লেখক শিহ্যব-উদ্-দীন আল উমরীর (১৩০১-১৩৪৮) নাম এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়। প্রথোমোক্ত জনের কাব্য থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঠিক তারিখ নির্ণয় সম্ভবপর হয়েছে। দ্বিতীয় জন দামাস্কাসের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ভারতাগত পর্যটকদের কাহিনী ও বিবরনী থেকে তাঁর হিন্দুস্থান সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

কাব্য ও সাহিত্যে ইতিহাসের প্রতিফলন—সমকালীন সাহিত্যে আমির খসরুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।* আমির খসরু ১২৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও সুলতান বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ কালে মহম্মদ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এবং খান-ই-শহীদ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এই সময় আমির খসরু কিছুকাল মোঙ্গলদের হাতে বন্দী হন এবং এই সূত্রে তাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পরবর্তীকালে দিল্লীর বিভিন্ন সুলতান কাইকোবাদ, জালাল-উদ্-দীন খলজী, আলাউদ্দীন খলজী, কুতুবউদ্দীন মুবারক খলজী ও গিয়াসউদ্দীন তুঘলক খলজীর নিকট খসরু পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ১৩২৫ সালে তার মৃত্যু হয়। আমির খসরু ছিলেন মূলত একজন কবি। কিন্তু তাঁর যেসব কাব্য ও গদ্য রচনা আমরা পাই তাঁর অনেকগুলির বিষয়বস্তুই ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তিতে রচিত। খসরুর মসনভী ও দিওয়ানগুলি সমকালীন ইতিহাসের উপর আলোকসম্পাত করেছে। খসরুর লেখার মধ্যে যেগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কিরন-উস-সাদায়িন (১২৮৯), মিফতা-উল-ফুতুহ (১২৯১), আশিকা (১৩১৬), নুহসিপির (১৩১৮)। তুঘলকনামা সুলতান গিয়াসউদ্দীনের রাজ্যাভিষেক সংক্রান্ত লেখা এবং খাজায়িন-উল-ফুতুহ দক্ষিণ ভারতে আলাউদ্দীনের বিজয়াভিযান বিশেষত মালিককাফুরের দাক্ষিণাত্যের রাজ্যজয় বর্ণনা করেছে।

প্রথমোক্ত গ্রন্থ বলবনের দ্বিতীয় পুত্র লখনৌতির শাসনকর্তা বুঘরাখাঁর সঙ্গে তাঁর পুত্র ও দিল্লীর সুলতানের অর্থাৎ কাইকোবাদের সাক্ষাৎকার ও তৎপ্রসঙ্গে হিন্দুস্তানের নানা বিষয় বিশেষত রাজধানীর বিষয়ে অনেক আলোচনা আছে। দ্বিতীয়টিতে সুলতান জালালউদ্দীন খলজীর সামরিক অভিযানগুলির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় গ্রন্থ আশিকাতে দেবলা দেবী (গুজরাট নৃপতি কর্ণদেবের কন্যা) ও শাহজাদা খিজির খাঁর প্রেম কাহিনী। এছাড়া এই গ্রন্থে খসরু মোঙ্গলদের হাতে তাঁর বন্দীদশা ও পলায়ন এবং হিন্দুস্তানের ও তার নারীদের সৌন্দর্য মহিমা বর্ণনা করেছেন। নু-সিপির নামক গ্রন্থে মুবারক খলজীর রাজত্বকালে সামরিক অভিযান বর্ণনা করা হয়েছে। তুঘলকনামায় গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের রাজ্যাভিষেক ও খাজায়িন-উল-ফুতুহ বা তারিখ-ই-আলাই আলাউদ্দীন খলজীর দক্ষিণ ভারত বিজয় সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছে। এছাড়া আমির খসরুর লেখনীর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন হিন্দুস্তানের সামাজিক অবস্থা ও দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে চিত্র পাওয়া যায়। আমির খসরুর সমকালীন কবি হাসান সানজারী বা মিরহাসান দিহলবী তাঁর ফুবাদ-উল-ফুওয়াদে প্রখ্যাত সুফী সাধক নিজাম উদ্-দীন আউলিয়ার বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন।

---

* খসরুর নাম কোন কোন লেখক আবুল হাসান ইয়েমিন-উদ্-দীন খসরু বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনাকরা হয়েছে।

www.pathagar.com

এছাড়া এ যুগে কাব্যে ইতিহাস রচনার জন্য ইসেমী, বদর চাচ প্রভৃতির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মির খুরদ ও আব্দুল হকের ন্যায় লেখকরা তৎকালীন যুগের সাধকদের জীবনী ও বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রাদেশিক ও স্থানীয় ইতিহাস

প্রাদেশিক ও স্থানীয় ইতিহাসের মধ্যে 'চাচ নামা'র নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই চাচ নামা আরবী ভাষা থেকে ফার্সীতে অনুবাদ করেন মহম্মদ আলি বিন মহম্মদ কুফী। এই গ্রন্থটি নাসিরউদ্দীন কুবাচার নামে উৎসর্গীকৃত। মহম্মদ বিন কাশিমের পূর্বে ও পরে সিন্ধুর পরিস্থিতি সম্পর্কে এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে জানা যায়।

তারিখ-ই-সিন্ধ ওরফে তারিখ-ই-মাসুমীর লেখক ছিলেন ভাক্করার মীর মহম্মদ মাসুম। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এই গ্রন্থে আরবদের সিন্ধুবিজয় থেকে আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে সিন্ধুর ইতিহাস দেওয়া আছে। আর দুইটি পরবর্তীকালের লিখিত গ্রন্থ হল মিরতাহির মহম্মদ নিসানীর তারিখ-ই-তাহিরী (১৬৫৪-৫৫) এবং তুফাত-উল-কিরণ। শেষোক্ত গ্রন্থের লেখক ছিলেন আলি শের কোয়ানী। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য, তুফাত-উল-কিরণ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে লিখিত হয়েছিল এবং এর তৃতীয় খণ্ডে সিন্ধুর ইতিহাস সর্বাপেক্ষা বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। কাশ্মীর সম্পর্কে হাইডার দুঘলাতের তারিখ-ই-রশীদী মুসলিমদের কাশ্মীর অধিকারের ইতিবৃত্ত। রাজতরঙ্গিনীর সহিত এই গ্রন্থের কাহিনী যুক্ত করলে কাশ্মীরের মুসলিম অধিকার পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। কাশ্মীরের অধিপতি ইউসুফ শাহর (১৫৭৮ খ্রীঃ) একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হাইদার আলি প্রধানত রাজতরঙ্গিনীকে ভিত্তি করে 'তারিখ-ই-কাশ্মীর' রচনা করেছিলেন। অবশ্য তৎসহ তিনি কিছু সংযোজন করেন। ১৬২০-২১ সাল নাগাদ এই গ্রন্থ লেখা সম্পূর্ণ হয়।

গুলাম হুসেন সেলিম, বখতিয়ার খলজীর বঙ্গবিজয় থেকে ১৭৮৮ সাল অর্থাৎ এই গ্রন্থ রচনার তারিখ পর্যন্ত, বঙ্গদেশের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। সেলিম লিখিত ইতিহাস রিয়াজ-উস্-সালাতিনের বিবরণীতে বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে ও তারিখ নির্ধারণে অনেক ভ্রান্তি আছে। স্থানীয় ঐতিহ্য ও কাহিনী এই ইতিবৃত্তে স্থান লাভ করেছে।

মুসলিম বিজয় থেকে ১৬১১ সাল পর্যন্ত গুজরাটের ইতিহাস মিরাট-ই-সিকন্দরীতে দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের লেখকের নাম সিকন্দর বিন মহম্মদ। গুজরাটের ইতিবৃত্তের সম্পর্কে ফার্সী ভাষায় লিখিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আলি মহম্মদ খানের (১৭৫৬-১৭৬১ খ্রীঃ) মিরাট-ই-আহমদী এবং মির আবু তুরাবওয়ালীর তারিখ-ই গুজরাট উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আবদুল্লা মহম্মদ বিন ওমর আল-মাক্কী লিখিত জাফর উল ওয়ালিয়া বি মুজ্জাফর ওয়া আলিহ বা আরবী ভাষায় লিখিত গুজরাটের ইতিহাস এই স্থানের ইতিবৃত্তের একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

গুলবার্গা ও বিদর এবং আহমেদনগরের নিজামশাহী বংশের ইতিহাস সৈয়দ আলি তবাতবার লিখিত বুরহান-ই-মায়াসির অন্যতম উল্লেখযোগ্য পুস্তক। লেখক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, ১৫৯১-৯২ সালে এই গ্রন্থে লেখা শুরু হয় ও ১৫৯৫-৯৬ সালে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয়েছিল। তাজকিরাত-উল-মুলকের লেখক রফিউদ্দীন শিরাজী বিজাপুরের আদিল শাহী বংশের ও সমকালীন ভারতীয় ও পারসিক রাজবংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৬১১-১২ সালে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়।

বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকের মতে, বরঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের অধীনস্থ হরিহর ও বুক্ক আনাগুণ্ডীতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন ও এই ব্যাপারে বিদ্যারণ্যর সাহায্য লাভ করেছিলেন। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে তাঁদের স্থাপিত নতুন রাজধানীর নাম হয় বিজয়নগর। এই

www.pathagar.com

বক্তব্য প্রধানত কানাড়ার প্রচলিত সূত্র দ্বারা সমর্থিত। আরেকটি মতবাদ অনুসারে, বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠাতারা কর্নাটিক বংশীয় ছিলেন এবং হোয়েসল রাজাদের অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন। হোয়েসল রাজ তৃতীয় ও চতুর্থ বীরবল্লালের মৃত্যুর পর তাঁরা এই স্থানে রাজত্ব করেছিলেন। এইসব বক্তব্য থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, হরিহর ও বুক্ক দক্ষিণ ভারতে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের সংগ্রামে সেখানকার হিন্দু রাজা ও জনগণের সমর্থন লাভ করেন। তাঁরা বরঙ্গলের নৃপতি প্রতাপরুদ্রের বংশধর কৃষ্ণনায়ক ও অন্যান্য অনেকে সমর্থন লাভ করেছিলেন। সমকালীন মুসলিম ঐতিহাসিকরা এই উত্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণ ভারতের ঐতিহাসিকলিপি* ও দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে বৈদেশিক বিবরণীতে এই উত্থানের কথা উল্লিখিত হয়েছে।**

পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক

পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে নিজামউদ্দীন আহমেদের 'তরকত-ই-আকবরী' এবং আব্দুলকাদের বাদায়ুনীর 'মুনতাখাব-উত-তওয়ারিকে' মুসলমানদের হিন্দুস্তানে শাসনের শুরু থেকে আকবরের রাজত্বকাল অবধি ইতিবৃত্ত রচনা করেছিলেন। এছাড়া 'গুলশান-ই-ইব্রাহিমীর' লেখক মহম্মদ কাসিম হিন্দু শাহ খাঁকে সাধারণত ফিরিস্তা নামে অভিহিত করা হয়। তিনি গজনীর সুলতানদের আমল থেকে ১৬০৬-৭ সাল পর্যন্ত হিন্দুস্তানের ইতিহাস রচনা করেছিলেন।

এইসব লেখকরা ছাড়া এদেশে প্রচলিত কথা ও কাহিনী, বিভিন্ন প্রান্তের স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষায় রচিত ইতিবৃত্ত থেকে সমকালীন যুগের রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক ও জনগণের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে চন্দ্রন্যায় শূরীর হামির মহাকাব্য, জয়সিংহ শূরীর হামির মদমর্দন মহাকাব্য, গৌরীকান্ত ওঝা সম্পাদিত জয়নাকের পৃথ্বীরাজ বিজয় (আজমীরের বৈদিক যন্ত্রালয়, ১৯৪১) প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। রাজস্থানের ইতিবৃত্তের মধ্যে চাঁদবরদাইর পৃথ্বীরাজ রাসো ও মালিক মহম্মদ জয়সীর পদ্মাবত হিন্দীতে লেখা রাজস্থানের ইতিকথা কাহিনী। অসম বুরুঞ্জি (এস কে ভুইঞা সম্পাদিত) অসমের স্থানীয় ইতিবৃত্ত এবং দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা প্রাচীন বঙ্গের কাব্য ও প্রচলিত কাহিনী। এইসব লোকগাঁথা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের জনজীবনের উপর আলোকসম্পাত করে। মধ্যযুগের ইতিহাসের নানা সূত্রের সন্ধান লোকসাহিত্যের বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যের মারফতে জানা যায়।

বৈদেশিক বিবরণী

যে সব বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী থেকে মধ্যযুগের ভারত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা যায়, তাদের মধ্যে তুর্কী আক্রমণের প্রথম যুগে আলবেরুণীর লেখা 'তারিখ-উল হিন্দ' অন্যতম। আলবেরুণী খোয়ারজিম থেকে গজনীতে সুলতান মামুদের দরবারে এসেছিলেন এবং সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের সমসাময়িক কালে হিন্দুস্তান পরিভ্রমণ করেন। আলবেরুণী ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও এদেশের রীতিনীতি দর্শন ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বেশ কিছুকাল ভারতে বসবাস করেছিলেন। মামুদের বারংবার হিন্দুস্তান আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে হিন্দুস্তানের নৃপতিদের পরাজয় ও পতনের কারণ বিশ্লেষণ করে আলবেরুণী এদেশের বর্ণ ও জাতিবৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন ও বিদেশী আক্রমণের মুখে এদেশীয় রাজাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব সম্পর্কে ইংগিত করে মন্তব্য করে বলেছেন যে, তুর্কী আক্রমণের ফলে হিন্দুরা অনু পরমাণুতে পরিণত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

---

* Historical Insciptions of South India. পৃঃ ৮৩-৮৫।

** ফুতুহ. ... ১৪-১৭; Sewell A Forgotten Emp, পৃঃ ১১।

www.pathagar.com

১৩৩৩ সালে মরোক্কোর পর্যটক ইবনবতুতা সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন। ইবনবতুতাকে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লীর কাজীর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রায় আট বৎসরকাল ইবনবতুতা এই পদে বহাল ছিলেন। অতঃপর সুলতান অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। মুক্তিলাভ করে ইবনবতুতা চীনা সুলতান মহম্মদের দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। চীনে যাবার পথে জাহাজ ডুবির ফলে মরক্কোর এই পর্যটক মালদ্বীপে আশ্রয়গ্রহণ করে কিছুকাল এই স্থানে অতিবাহিত করেন। কিন্তু বৎসরান্তে তিনি পুনরায় দক্ষিণ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং সেখান থেকে চীনে যাত্রা করেন। অতঃপর মক্কায় একবার হজ যাত্রা করবার পর ১৩৪৯ সালে স্বদেশে ফিরে যান। স্বদেশ থেকে মধ্য এশিয়া একবার ঘুরে এসে তিনি শেষবারের মতো মরক্কোয় বসবাসের জন্য মনস্থির করেছিলেন। ইবনবতুতার ভ্রমণকাহিনী বা রেহলায় সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ফার্সী ভাষায় লিখিত সমকালীন ইতিবৃত্তগুলির অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, তিনি দিল্লীর সুলতান বা স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর অনুগ্রহ বা নিগ্রহের তোয়াক্কা করতেন না। কিন্তু যেহেতু মরক্কোর এই পর্যটকের স্থানীয় ভাষা সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না সেইজন্য বহু বিষয়ে তিনি অজ্ঞ ছিলেন। তাছাড়া চলতি গুজব বা প্রচলিত কাহিনীর ও গল্পকথার সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্য বজায় রেখে সত্য উদ্‌ঘাটন করতে ইবনবতুতা বহুক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। তৎসত্ত্বেও বহুকাল এদেশে বসবাস করার ফলে ও স্থানীয় লোকজনের আচার-ব্যবহার এবং প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দরুণ ইবনবতুতার বিবরণীতে হিন্দুস্তানের সাধারণ মানুষের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা যায়। বহু বিষয়ে অন্যান্য সমকালীন লেখকদের তুলনায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ ছিল। ইবনবতুতা বঙ্গদেশেও এসেছিলেন। এখানকার জিনিস পত্রর দাম অত্যন্ত সস্তা ছিল এবং তাই দেখে ইবনবতুতা মন্তব্য করেছেন যে, বঙ্গদেশকে 'দোজখ পুর-ই-নিয়ামত' বা উত্তম জিনিসেপূর্ণ নরক বলা হয়। বাংলাদেশের স্যাঁতসেতে আবহাওয়ার দরুণ এবং অনবরত বর্ষার জন্য মরক্কোর পর্যটক এইস্থানকে পছন্দ করতেন না এবং ভাল জিনিসে পরিপূর্ণ হলেও এইদেশকে 'নরক' বলেও অভিহিত করতে দ্বিধা করেননি।

ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটক হিন্দুস্তানে এসেছিলেন। এইসব ইউরোপীয়দের মধ্যে ফ্রাংকেসিয়ান ফ্রেয়ার মন্টেকোরভিনোর জন (John of Monte Corvino) এবং মার্কো পোলো দুইজনই চীনে যাতায়াতের পথে ভারতে এসেছিলেন। মার্কো পোলো ১২৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর ভেনিস শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা নিকোলো পোলো ব্যবসা সূত্রে চেঙ্গিজের বংশধর চীনের সম্রাট কুবলাই খানের দরবারে উপস্থিত হন। মার্কোপোলো এইসূত্রে পিতার সঙ্গে মাত্র পাঁচবৎসর বয়সে চীনে কুবলাই খানের রাজ্যে পৌঁছেছিলেন। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে পিতা ও পিতৃব্যের সঙ্গে মার্কো পোলো পারস্যের ভাবী মহিষী এক চীনা রাজকুমারী ও রাজদূতকে নিয়ে সমুদ্রপথে পারস্যে রওনা হন। পথে দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য রাজ্য ও করমণ্ডল উপকূল, মালাবার, গুজরাত, সিংহল ও অন্যান্য স্থান ঘুরে প্রায় দু'বছর পর পারস্যে পৌঁছেছিলেন এবং সেখান থেকে যাত্রা করে ১২৯৫ সালে ভেনিসে পদার্পণ করেন। ইউল (Yule) সম্পাদিত মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনীতে ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে দক্ষিণ ভারতের ও সিংহল সহ অন্যান্য স্থানের বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়া ১৪২০ সালে ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্টি দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করে এই সাম্রাজ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিবরণ রেখে গেছেন।

কালিকটের জামোরিনের দরবারে পারস্যের রাজদূত আব্দুর রজ্জাক (১৪২০) বিজয়নগর রাজ্য পরিভ্রমণ করেছিলেন। আব্দুর রজ্জাকের লেখনী থেকে আমরা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিস্তারিত বিররণ পাই। এইযুগে বিজয়নগরের সমাজ ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে রজ্জাক তাঁর বিবরণীতে যথেষ্ট আলোকসম্পাত করেছেন এসম্পর্কে সন্দেহ নাই।

www.pathagar.com

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বিজয়নগরের সঙ্গে পর্তুগীজ বণিকদের সুসম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে বিজয়নগরে বহু পর্তুগীজ বণিক যাতায়াত করেন এবং তাদের লেখনী থেকে এই রাজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এইসব পর্তুগীজ বিবরণীর লেখকদের মধ্যে ডোমিনিগোস পায়েস ও ফেরনাও নুনিজ ছিলেন অন্যতম। বিজয়নগরের সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি কৃষ্ণদেব রায়ের (১৫০৯-১৫২৯ খ্রী) রাজত্বকালে এই দুইজন পর্তুগীজ বণিক বিজয়নগরে এসেছিলেন। পায়েস ও নুনিজ উভয়ই কৃষ্ণদেব রায়কে বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলে বর্ণনা করেছেন। ডোমিনিগোস পায়েস ১৫২২ সালে যখন বিজয়নগরে পদার্পণ করেন সেইসময় এই রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে উঠেছিল। নুনিজের বিবরণীতে বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। চীনা পর্যটকরা পঞ্চদশ শতকে দৌত্যকার্যে এদেশে আসেন। এই পর্যটকদের মধ্যে ছিলেন মহুয়ান। শেষোক্ত পর্যটক বাংলাদেশ ও মালাবার সম্পর্কে তাঁর বিবরণ রেখে গেছেন। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে বার্থেমা (১৫০৩-১৫০৮) ও দুয়ার্তে বার্বসা (১৫১৬) ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। রুশ ভ্রমণকারী এথেনেসিয়াস নিকিতিন (১৪৭০-৭৪) বাণিজ্যিক সূত্রে বাহমণি রাজ্যে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, এখানকার সাধারণ লোক অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। কিন্তু অভিজাতশ্রেণী বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। এইসব বৈদেশিক পর্যটকদের মধ্যে ইবনবতুতা, আব্দুর রজ্জাক ও তুর্কী সেনাপতি সিদি আলী রঈস সর্বাধিক শিক্ষিত ছিলেন এবং প্রথমোক্ত জন বহুকাল হিন্দুস্তানে বসবাস করার ফলে এদেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে সর্বাধিক সুপরিচিত ছিলেন। ইবন বতুতা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা স্বদেশে লিপিবদ্ধ করেন এবং কোনপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা বা ভীতির জন্য তাঁর তথ্যকে গোপন বা বিকৃত করেননি।*

মূল্যায়ন

এযুগে সমকালীন যেসব তথ্য লেখক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে পাওয়া যায় তা কতদূর নির্ভরযোগ্য অনেকসময় সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। কারণ, সমকালীন লেখকরা দুই একজন বাদে অধিকাংশ দরবারে পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাশা করতেন বা ইসেমীর ন্যায় কেউ কেউ তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে ব্যক্তিগত ক্রোধ বা ধারণারবশে ইতিহাসের ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশনে দ্বিধা করতেন না। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে ধর্মান্ধতাও সময় সময় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু আশরফের মতে, 'মুসলিম ঐতিহাসিক বা বিদগ্ধ সাহিত্যসেবীরা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে হিন্দু সমাজজীবনের বিকৃত ছবি উপস্থিত করেছেন এ ধারণা ভুল। হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সংস্কৃতিগত কোন বিরোধ তো ছিলই না, পরন্তু হিন্দু-মুসলিম উভয় সংস্কৃতির ধারা মিলে-মিশে একধারায় পরিণত হওয়ার দিক অতিদ্রুত এগোচ্ছিল। কাজেই হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কোন অবকাশ ছিল না।'**

জিয়াউদ্দীন বারানী বা আব্দুল কাদের বাদাউনীর ন্যায় গোঁড়া ধর্মান্ধ লেখকরা তাঁদের লেখনীতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, প্রথম যুগের সংঘাতের পর হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির ধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে এক সমন্বয়ের যুক্ত সাধনায় পরিণত হচ্ছিল। এইজন্য আমির খসরু ও মালিক মহম্মদ জয়সীর রচনাতে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, 'A serious drawback of all the historical writers of the period is that their vision seldom extended beyond the court, the capital, the ruler and the aristocracy, and they hardly ever noticed

* পূর্ব্বোক্ত হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্চা পৃঃ ৩২ দ্রষ্টব্য

**ঐ, পৃঃ ৩৪।

www.pathagar.com

the people at large or gave any information about their lives and activities, social manners, customs, economic condition etc.'* জনগণের সম্বন্ধে কোন ভাবনা-চিন্তা, দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বিষয়ে কোন মন্তব্য বা জনজীবন সম্পর্কে কোন কৌতূহল সমকালীন দরবারের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট ঐতিহাসিকদের কাছে আশা করা বৃথা। কিন্তু বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা এসম্পর্কে অনেক খবর লিপিবদ্ধ করেছেন। সমকালীন লেখকদের মধ্যে খসরু ও জয়সীর ন্যায় কবি ও সাহিত্যিকদের লেখনীতে জনজীবনের কথা ধরা পড়েছে। বৈদেশিক পর্যটকদের মধ্যে ইবনবতুতা হিন্দুস্তানে বহুকাল বসবাস করেছিলেন এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বতুতার লেখনী থেকে জানা যায়। জনজীবনের চিত্র সূফী ও ভক্তিধর্মের প্রচারকদের জীবনী ও বাণীতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

এছাড়া ধর্মীয় জীবনে ও হিন্দু-মুসলিম ধর্মের সংযোগের ফলশ্রুতিতে এই যুগে সুফী ও ভক্তিধর্মের স্রোত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যুক্তসাধনার সৃষ্টি করেছিল। সুফী ও ভক্তিধর্মের নেতৃত্ব দিয়ে যুগচেতনার পুরোধা হিসাবে যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁদের মারফতে আমরা এইসময়কার জনমনের ধর্মচেতনার গভীরতায় মৈত্রী ও মিলনের চিত্র লাভ করি। চৈতন্য, নানক, কবির, দাদুর প্রভৃতি সাধকরা এই ধর্মচিন্তার নায়ক ছিলেন। জনগণের মধ্যে ভক্তিধর্মের প্রচারক ও সুফী-সাধকদের বাণীর প্রভাব এক মিলনের সেতুর সৃষ্টি করেছিল।

হিন্দুস্তানে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ এবং আমির খসরু

তুর্কী আক্রমণকারীরা হিন্দুস্তান বিজয়ের সঙ্গে এদেশে আরবী ও পারসিক ভাষা ও সাহিত্যের ধারা বহন করে এনেছিলেন। সুলতান মামুদ গজনীর সঙ্গে যেসব লেখক হিন্দুস্তানে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন আবু রিহান আলবেরুণী। শেষোক্ত মনীষীর লেখনীতে আমরা একাদশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দুস্তানের সম্পর্কে বিশেষত হিন্দুদের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পাই। তিনি এদেশে বহুকাল বসবাস করে সংস্কৃত অধ্যায়ন করেন এবং সেযুগের ভারতীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন ও হিন্দুস্তানের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন।

পরবর্তী হিন্দুস্তানের তুর্কী বিজয়ী সুলতান মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গেও বহু পণ্ডিত কবি ও সাহিত্যিক ভারতে এসেছিলেন। এইসব লেখকদের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন তাজউদ্দীন হাসান, রুকনউদ্দীন হামজা, শিহাবউদ্দীন মহম্মদ রশিদ, মারাঘার নাজুকী এবং বালখের কাজী হামিদ।

কুতুবউদ্দীন থেকে ইলতুৎমিস গজনীর ও ঘোরীর বিজয়ীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দিল্লীর সুলতানরাও একই নীতি অনুসরণ করেন। কুতুবউদ্দীন আইবক (১২০৬-১২১০ খ্রীঃ) কবি, লেখক ও সাহিত্যিকদের প্রতি এতই উদার ছিলেন যে, তিনি লাখেবক্স উপাধি লাভ করেন (অর্থাৎ তিনি উদার হস্তে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করতেন)। কুতুবউদ্দীন আইবাকের উত্তরসূরী ইলতুৎমিস (১২১১-১২৩৬ খ্রীঃ) কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত সুলতান থেকেকোন অংশে কম উদ্যোগী ছিলেন না। বিদ্যোৎসাহী ইলতুৎমিসের দরবারে বহু প্রথম শ্রেণীর পারসিক সাহিত্যের কবি, লেখক ও সাহিত্যিক অলঙ্কৃত করেছিলেন। এইসব সাহিত্যসেবীর মধ্যে খাজা আবু নাসির (সাধারণত নাসিরী নামে পরিচিত), সমরকন্দের আবু বকর্ বিন মহম্মদ রুহানী, তাজউদ্দীন দাবির এবং নুরুদ্দীন মহম্মদ অওফী সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। শেষোক্ত জন লুবাব-উল-আলবাব এবং যওয়ামি-উল-হিকায়ৎ ওয়া-লেওয়ামী-উর রিওয়ায়েতের ন্যায় লেখক ছিলেন।

---

* Delhi Sultanate-Perface XX VIII.

** খসরু সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনার জন্য নিম্নে দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সুলতান ইলতুৎমিসের দুর্বল বংশধরদের রাজত্বকালে প্রায় তিরিশ বৎসরকাল শাহী দরবারে জ্ঞানী ও গুণী এবং লেখক ও সাহিত্যিকের সমাবেশ সম্পর্কে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দরুণ বিশেষ কিছু জানা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সুলতান ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ শাহের (১২৪৬-১২৬৫ খ্রীঃ) রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ কবি ফকরউদ্দীন নূনাকী (কাব্যিক নাম আমেদ) ও মিনহাজউদ্দীন সিরাজ (ঐতিহাসিক মিনহাজ) ইলতুৎমিসের সময় দরবারে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং নাসিরউদ্দীন মামুদের রাজত্বকালেও এরা রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। শেষোক্ত ঐতিহাসিক ১২৬০ সাল পর্যন্ত ইসলামিক জগতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের দরবার ইসলামিক জগতে সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। এইসময় বর্বর মোঙ্গলরা তাদের লুণ্ঠন, হত্যা ও ধ্বংসকার্যের মারফতে সারা মধ্যএশিয়ার মুসলিম সভ্যতার উপর বিপর্যয়ের ঝড় বহন করে এনেছিল। এই পরিস্থিতিতে মধ্যএশিয়ার মুসলমান কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও বিদগ্ধ ব্যক্তিরা দলে দলে হিন্দুস্তানে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলন। দিল্লীতে বলবনের দরবারে এইসব মুসলিম আশ্রয়প্রার্থীরা সাদরে গৃহীত হতেন।

বলবন ও তৎপরবর্তীকাল

বলবনের দরবারে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে বহু জ্ঞানী-গুণী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, পারসিক সাহিত্যে যশস্বী লেখক, কবি ও সাহিত্যিক সমবেত হয়েছিলেন। এইসময় হজরত-ই-দিল্লী পারসিক সাহিত্যের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ, যিনি পরবর্তীকালে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ কালে জীবনদান করে খান-ই-শহীদ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সুপরিচিত হয়েছিলেন। হিন্দুস্তানের পারসিক সাহিত্যের সর্বকালীন সুপরিচিত কবি ও লেখক আমির খসরু ও মীর হাসান দিহলবী উভয়েই খান-ই-শহীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের প্রথম জীবনের কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন। আমির খসরু ছিলেন সয়েফউদ্দীন মামুদ নামে হিন্দুস্তানে একজন তুর্কী আশ্রয়প্রার্থীর কনিষ্ঠতম পুত্র। ১২৫৩ সালে উত্তরপ্রদেশের পাটিয়ালিতে আমির খসরুর জন্ম হয়, এবং অতি অল্পবয়সে খসরু তাঁর কাব্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি সকল ধরনের কবিতা লেখায় দক্ষতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন এবং হিন্দুস্তানের পারসিক সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু গীতিকাব্যে তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ অতুলনীয়। আমির খসরু সুপ্রসিদ্ধ সূফী সাধক শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার অনুগামী হয়েছিলেন। বলবন থেকে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক পর্যন্ত প্রত্যেক দিল্লীর সুলতানের দরবারে আমির খসরু পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। আমির খসরুর লেখা অজস্র রচনাবলীর মধ্যে আছে কাব্য, কাহিনী, মসনভী এবং ইতিহাস। এইসব লেখার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনার যথা মাতল-অ-উল-আনওয়ার, সিরিন-ওয়া-ফারহাদ, লায়লা-ওয়া-মজনু, আইনা-ই-সিকন্দরী, ইশত-হ-বিহিস্ত, দেবলরানী ওয়া খিজির খান, কিরান-ওস-সাদায়িন, মিফতা-উল- ফুতুহ, নুহ সিপির প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। হজরত আমির খসরু দেহলবী ১৩২৫ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আমির খসরুর সমকালীন কবি হাসান আলাই সানজারী শেখ নিজামউদ্দীন আওলিয়ার অনুগামী ছিলেন। তাঁর ফাওয়াইদ-উল-ফুয়াদে ১৩০৭-১৩২২ সালের মধ্যে শেখের কথামৃত লিখে রেখেছেন। সূফী দর্শনের পক্ষে এই গ্রন্থ অমূল্য সম্পদ। আমির হাসান দিহলবী তাঁর গজলগুলির জন্য প্রসিদ্ধ এবং হিন্দুস্তানের সাদী নামে পরিচিত। ১৩২৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর দরবারে পারসিক ভাষার কবি হিসেবে অন্য আরো কয়েকজন লেখকের সুনাম ছিল। এইসব কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন সদরউদ্দীন আলি, হামিদউদ্দীন রাজা, মৌলনা আরিফ, আব্দুল হাকিম এবং শিহারউদ্দীন সদর নিশিন।

www.pathagar.com

তুঘলক যুগের সাহিত্য

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের রাজত্বের সূত্রপাতের কথা এবং যে পরিস্থিতিতে তিনি সিংহাসন লাভ করেছিলেন এই বিষয়ে আমির খসরুর পুস্তক 'তুঘলক-নামা' থেকে জানা যায়। সুলতান গিয়াসউদ্দীনের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ বিন তুঘলক জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর দরবার বহু কবি, লেখক ও সাহিত্যের সেবকের পদধূলি দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছিল। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী ১৭ বৎসর সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। বারানী লিখিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', 'ফতোয়া-ই-জাহান্দারী' ইত্যাদি গ্রন্থ এইযুগের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সানা-ই-মুহম্মদী, সালাত-ই-কবির, ইনায়েৎ-ই-নামা ইলাহী, হজরৎ-নামা ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আমির খসরু ও আমির হাসানের ন্যায় ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন-বারানী ও শেখ নিজামউদ্দীন আওলিয়ার অনুগামী ছিলেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে এই ঐতিহাসিক দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে অর্থকষ্টে পড়েছিলেন। শেখ নিজামউদ্দীনের পবিত্র সমাধিস্থলের এলাকায় তাঁর মরদেহ কবরস্থ করা হয়েছিল।

মহম্মদ বিন তুঘলকের দরবারের আরেকজন বিদ্বৎজন ও কবি ছিলেন চাচ (বা তাসখন্দের বদর-উদ্দীন মহম্মদ)। তিনি দীর্ঘকাল দিল্লীতে বসবাস করেছিলেন ও এইসময় স্বীয় পৃষ্ঠপোষক সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের নামে প্রশস্তিমূলক কাব্য রচনা করেন। তাঁর দিওয়ান ও শাহনামা নামে দুইটি গ্রন্থ সুপরিচিত। ঐতিহাসিক ইসেমী এইযুগের একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। তাঁর 'ফুতুহ-উস-সালাতিন' গজনীর সুলতানদের রাজত্বকাল থেকে ১৩৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত হিন্দুস্তানের মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে কাব্যে রচিত ইতিহাস। তিনি দিল্লী সুলতানদের অন্যতম উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে দেবগিরি (দৌলতাবাদ) গিয়েছিলেন। পিতৃপুরুষানুক্রমে ইলবারী তুর্কী সুলতানদের আমল থেকে ইসেমী দিল্লী সুলতানী শাসনের সম্পর্কে বহু তথ্য পেয়েছিলেন। ফিরদৌসীর শাহনামার আদর্শে এই পুস্তক রচনা করা হয়েছিল এবং বাহমনি বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হাসান গাংগুর (১৩৪৭-১৩৫৮) নামে ইসেমী তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলক জ্ঞানী ও গুণীদের পৃষ্ঠপোষক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বছরে তিনি ৩৬ লক্ষ অর্থ সুপণ্ডিত ও কবিরদের জন্য ব্যয় করতেন। তিনি ইতিহাসের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বয়ং 'ফুতুহ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থের লেখক ছিলেন বলে দাবি করা হয়। এই গ্রন্থে ফিরোজ শাহর রাজত্বকালে যেসব বিধি ও আইন জারি করা হয় এবং জনস্বার্থে যেসব কার্য করা হয়েছিল সে সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সুলতান ফিরোজের আমলে শামসী সিরাজ আফিফ নামে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সুলতানের আমলের বিস্তারিত বিবরণ তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে লিখেছিলেন। সুলতান ফিরোজের দরবার বহু গুণীজন অলঙ্কৃত করেছিলেন। অজ্ঞাত পরিচয় একজন লেখক 'সিরাত-ই-ফিরোজ শাহী' নামে একটি সমকালীন গ্রন্থে এইযুগের ইতিহাসের উপর আলোকপাত করেছিলেন। অনেকের মতে, সুলতান স্বয়ং এই গ্রন্থের রচয়িতা।

পরবর্তী তুঘলক আমলের একজন সুপরিচিত ঐতিহাসিকের নামে মহম্মদ বিহামদ খানী এবং তাঁর লিখিত গ্রন্থের নাম 'তারিখ-ই-মহম্মদ-ই'। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার আমল থেকে ১৪৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত এই গ্রন্থে ইসলামের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সৈয়দ যুগের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন সরহিন্দের ইয়াহিয়া বিন আহমেদ। তাঁর লিখিত ইতিহাসের নাম তারিখ-ই-মুবারক শাহী। এই পুস্তক সৈয়দ বংশের দ্বিতীয় শাসক মুইজউদ্দীন মুবারক শাহর (১৪২১-৩৪ খ্রীঃ) নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এই গ্রন্থ সৈয়দ বংশের রাজত্বকালে রচিত একমাত্র সমকালীন ইতিহাস।

www.pathagar.com

বিভিন্ন রাজ্য ও রাজধানী বহির্ভূত এলাকায় পারসিক সাহিত্যের বিকাশ

প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতেও সাহিত্যসেবীরা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সিন্ধুতে সৈয়দ মৈনুল হক ভক্করের সৈয়দদের বংশাবলী রচনা করেছিলেন এবং এই বংশাবলীর নাম দিয়েছিলেন মনবা-উল-আনসার (১৪২৬-২৭ খ্রীঃ)। বিহারে ইব্রাহিম ফারুকী ফারাহাঙ্গ-ই-ইব্রাহিমী বা শরফ-নামা-ই-ইব্রাহিমী নামে একটি অভিধান রচনা করেন। দাক্ষিণাত্যের বাহমনি সুলতানরা ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। সুলতান তাজউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩৯৭-১৪২২) জ্যোতিষ শাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। দৌলতাবাদে তিনি যে মানমন্দির নির্মাণের প্রচেষ্টা করেন সুলতানের মৃত্যুর ফলে তার নির্মাণকার্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাহমনি রাজ্যের প্রসিদ্ধ উজীর খাজা মামুদ গাওয়ান বিদ্বান ও সুকবি ছিলেন এবং তিনি প্রতিভাবান ইরানীয় কবি আব্দুল রহমন জামইকে দাক্ষিণাত্যে আমন্ত্রণ করেন। মামুদ গাওয়ান পত্রাবলী বা রিয়াজ-উল ইনশা এবং প্রবন্ধ সংগ্রহ বা মনাজির-উল-ইনশা ও একটি দিওয়ানের রচয়িতা ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মুল্লাহ আব্দুল করিম মাসির-ই-মামুদ শাহী নামে একটি গুজরাটের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং তবকত-ই-আকবরীতে এই গ্রন্থের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

গুজরাটে সুলতান মামুদ বেগরাহর (১৪৫৮-১৫১১ খ্রীঃ) পৃষ্ঠপোষকতায় ফজলউল্লাহ জৈন-উল-আবিদিন, প্রাচীনকাল থেকে নবম হিজরী শতক পর্যন্ত একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন। মামুদ আয়াজ রচিত মিফতা-উস-সুরুর-ই-আদিল শাহী নামে একটি গ্রন্থ ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউসুফ আদিল শাহর নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এই গ্রন্থে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও মেয়েদের বৈশিষ্ট্যের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

লোদী সুলতান সিকন্দর লোদী বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং গুলরুখী এই ছদ্মনামে কাব্যরচনা করতেন। লোদী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন দিল্লীর শেখ জামালউদ্দীন। সিয়ার-উল-আরিফিন ও মিহির-উ-মাহ-এর লেখক হিসেবে তিনি পরিচিত। পানিপথের যুদ্ধের পর তিনি বাবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করার দরুণ মুঘল সম্রাটের সুনজরে পড়েছিলেন। কিন্তু এই যুগেরই আরেকজন লেখক আব্দুল কুদ্দুস ইব্রাহিম লোদীকে সমর্থন করে মুঘল সম্রাটের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন।

সংস্কৃত থেকে ঔষধি, জ্যোতিশাস্ত্র, সংগীত ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ে বাস্তব প্রয়োজনে পারসিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই ধরনের একটি অনুবাদ গ্রন্থের নাম দালাল-ই-ফিরোজশাহী এবং এর অনুবাদক আজিজউদ্দীন খালিদ কিরমানী। থানেশ্বরের আব্দুল আজিজ শামস সংগীত ও নৃত্য বিষয়ক একটি গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে পারসিক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। হিন্দি ভাষায় প্রথম মসনভি তুঘলক যুগে লিখিত হয়। এই গ্রন্থ সংস্কৃত কাহিনী লোরিক ও চন্দার কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। বাহমনি সুলতান প্রথম আহম্মদ শাহর (১৪২২-৩৩) নির্দেশে দুর্গারাশি সালিহোত্রর সংস্কৃত গ্রন্থ পারসিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং মালবের খলজী সুলতান গিয়াস-উদ্দীনের (১৪৬৯-১৫০০) রাজত্বকালে এই একই ধরণের একটি সংস্কৃত পুস্তক পারসিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। উভয় গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের ঘোড়া, তাদের গুণ ও মান এবং দোষ-ত্রুটি, রোগ ও চিকিৎসার কথা আলোচিত হয়েছে। সিকন্দর লোদীর পৃষ্ঠপোষকতায় মহম্মদ বিন শেখ জিয়া অভিধান রচনা করেন। সিকন্দর লোদীর নামে উৎসর্গিত এই গ্রন্থ ফরঙ্গি-ই-সিকন্দরী নামে পরিচিত। জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর দালাল-ই-ফিরোজ শাহী এবং সংগীত ও অন্যান্য বহু বিষয় সাংস্কৃত থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ পারসিক ভাষায় এইযুগে অনুবাদ করা হয়েছিল।

সুফী সাহিত্য

এইযুগে ধর্মীয় সাহিত্যের মধ্যে সুফীদের লেখা বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়। সুফী সাহিত্যের মধ্যে

www.pathagar.com

শরফ-উদ্-দীন-বু-আলি কালান্দার লিখিত মকতুবত (ধর্মীয় পত্রাদি), হিকমতনামা (জ্ঞানের গ্রন্থ) ও অন্যান্য এই জাতীয় পুস্তকের মধ্যে শেখ ফরিদের পৌত্রর লেখা আনেয়ার-উল-মজলিসের (আলোচনাসভার আলোখ্য) নাম উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ হাসান আলাহ্ সানজারীর লেখা ফুদ-উল-ফুওয়াদ (হৃদয়ের পক্ষে লাভজনক) নামক গ্রন্থের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। খায়ের-উল-মজলিসে (সর্বশ্রেষ্ঠ সভা) শেখ নাসিরউদ্দীন চিরাগ-ই-দিল্লীর বাণী সংগ্রহ করেছেন হামিদউদ্দীন কালান্দর। শেখ নাসির উদ্দীন সৈয়দ মহম্মদ বিন মুবারক কিরমানী আসিয়ার-উল-ওলিয়া গ্রন্থের লেখক হিসাবে পরিচিত। শেখ শরফউদ্দীন আহ্মদ বিন ইয়াহিয়া, শেখ নাজিবউদ্দীন ফিরদৌসীর শিষ্য ছিলেন। তিনি যেসব বই লিখেছেন তার মধ্যে ইরসাদ-উস-মালিকিন ওয়া বুরহন-উল আরিফিন সুফীদের নীতির উপর এবং ফওয়াবিদ-ই-রুকনী সুফী ধর্মীয় বক্তব্যের উপর লেখা।

এইভাবে সুলতানী আমলে পারসিক ভাষায় বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্মীয় বিষয়ে এইযুগের লেখকরা নানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং গ্রন্থকাররা অধিকাংশ ছিলেন জাতিতে ইরানীয়। এই আমলের পারসিক সাহিত্য হিন্দুস্তানের সমকালীন ও পরবর্তীকালের ভাষা, সাহিত্য ও ধর্মীয় চিন্তা বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই যুগের পারসিক ভাষায় লেখকদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের উপর আলোকসম্পাত করে এইসব লেখকরা আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করেছেন।

আমির খসরু

হিন্দুস্তানে পারসিক ভাষায় সাহিত্যিকদের মধ্যে আমির খসরুই সম্ভবত প্রথম লেখক যিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এদেশীয় ধ্যান ধারণা ও বিষয় এবং চিত্রকল্প ব্যবহার করেছিলেন। খসরু অনেক ক্ষেত্রে দুই পংক্তির যুগলবন্দী কাব্যচয়নে হিন্দী ও পারসিক শব্দের মিল করেছেন। সংগীতে খসরু অনেকসময় ফার্সী ও হিন্দী পংক্তির সংযোজনের জন্য একটি অন্তর আরেকটি পংক্তি জুড়ে দেওয়ার রীতির প্রবর্তন করেন। খসরু নানা বিষয়ে লিখেছিলেন এবং তাঁর কাব্য পরিকল্পনায় যেসব চিত্রপ্রকল্প ও বিষয়বস্তু পাওয়া যায় তাতে হিন্দুস্তানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও এদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্রের বন্দনা প্রাধান্য পেয়েছে। আমির খসরু তাঁর প্রসিদ্ধ মসনভী নুহ-সিপহরে হিন্দুস্তানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জলহাওয়া, এদেশের মানুষ এমনকি পশুপাখী, বৃক্ষ লতাপাতার সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। কবি হিন্দুস্তানকে স্বদেশ বলে মনে করতেন বলেই বলেছেন, 'বতনে হিন্দ ফিরদৌস অস্ত'। (হিন্দুস্তান হচ্ছে স্বর্গভূমি)।

আমির খসরু ছিলেন একাধারে ঐতিহাসিক, সভাকবি ও আমত্য। তিনি বলবন ও মুইজউদ্দীন কাইকোবাদের সময় ও খলজী সুলতানদের রাজত্বকালে এবং গাজী তুঘলকের আমলে একই সঙ্গে এই তিনটি ভূমিকা দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। খসরু ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক কিন্তু তিনি অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের ভূমিকা নিরপেক্ষভাবে পালন করেছেন এবং এই ভূমিকায় তাঁর সাফল্য প্রশংসনীয়। সমকালীন যুগের সামরিক গোষ্ঠী এবং অভিজাত ও উচ্চবংশীয়দের সঙ্গে আমত্য হিসেবে মেলামেশা তৎসহ শেখ নিজামউদ্দীন আওলিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা খসরুকে সমাজজীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরের মানুষের, অভিজাত ও সাধারণের, সঙ্গে সুপরিচিত করেছিল। এইজন্য রাজনৈতিক ইতিহাসের সূত্র হিসেবে ও সামাজিক অবস্থার সম্পর্কে খসরুর লেখনী যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। কে. এম. আশরফের মতে খসরুর দিওয়ান, কুল্লিয়াত (কবিতা সংকলন), বিশেষত 'মতল' অ-উল-অনওয়ার বিশ্লেষণ করলে সেযুগের আচার-আচরণ ও নীতিজ্ঞানের নমুনা পাওয়া যায়। খসরু ইজাজ-ই-খসবী নামে পত্রসাহিত্যে প্রমাণ করেছিলেন যে, 'তিনি জনগণের মাঝখান থেকেই উঠে এসেছিলেন এবং

www.pathagar.com

মনপ্রাণ ঢেলে জনতার ভিড়ে মিশে থেকেই তিনি নিজেকে খুঁজে পেতেন।'* তিনি নির্দ্বিধায় জনগণের একজন হয়ে সাধারণ মানুষ ও মামুলী বিষয় সম্পর্কে আন্তরিক ও মনখোলা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। খসরু পত্রসাহিত্যের মধ্য দিয়ে অলংকারবহুল শব্দ ব্যবহার করে এবং চমক ও ধাঁধার আড়ালে আত্মগোপন করে চিত্তাকর্ষক শিক্ষাপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন এবং সামাজিক রীতিনীতি ও নৈতিক আচরণ সম্পর্কে লিখেছেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি খসরুকে তাঁর স্বকীয় ভাবনা-চিন্তা প্রকাশের জন্য এই ধরনের সীমারেখা টানতে বাধ্য করেছিল বলে আশরফ অভিমত প্রকাশ করেছেন।**

আমির খসরুর লেখনী থেকে তৎকালীন যুগের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনাবলী উদ্ধার করা যায়। কিন্তু তিনি ইতিবৃত্তকার হিসেবে গ্রন্থরচনায় সচেষ্ট ছিলেন না। তাঁর তুঘলক নামা, মিফতাহ-উল-ফুতুহ, এবং গদ্যে খাজাইন-উল-ফুতুহ, আলাউদ্দীন খলজীর দাক্ষিণাত্য অভিযানের বিবরণ ছিল ঐতিহাসিক গ্রন্থ। কিরন-উস-সাদায়িন সুলতান বলবনের দ্বিতীয় পুত্র লখেনৗতির শাসনকর্তা বুঘরা খানের সঙ্গে বলবনের পৌত্র ও বুঘরা খানের পুত্র দিল্লীর সুলতান কাইকোবাদের সাক্ষাৎ বর্ণিত হয়েছে ও তৎসহ দিল্লীর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মিফ তাহ-উল-ফুতু হতে (১২৯১ খ্রীঃ) জালালউদ্দীন খলজীর সামরিক অভিযান বর্ণনা করা হয়েছে। এবং নুহ্-সিপিহ্‌রে (১৩১৮ খ্রীঃ) মুবারক খলজীর সামরিক কীর্তি ও তৎসহ হিন্দুস্তানের প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সৌন্দর্যের কথা বর্ণিত আছে। এছাড়া আমির খসরুর লেখা গদ্যে খাজাইন-ইল-ফুতুহ বা তারিখ-ই-আলাইতে আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালের প্রথম ১৬ বৎসর বিশেষত মালিক কাফুরের অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। এই অভিযান সম্পর্কে খসরুর বিবরণ জিয়াউদ্দীন বারানীর গ্রন্থের দেওয়া কাফুরের দক্ষিণের অভিযানের বর্ণনা থেকেও অধিক তথ্যবহুল। এইসব গ্রন্থের সঙ্গে যদি খসরুর লেখা আশিফা বা দেবল রানী খিজির খান কাব্য ও তুঘলকনামা যোগ দেওয়া যায় তাহলে তাঁর ঐতিহাসিক ঘটনাকেন্দ্রিক গ্রন্থের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। আশিকা প্রধানত দেবলরানী ও খিজির খানের রোমান্টিক কাহিনী এবং তৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত। তুঘলক নামা ভারতীয় বশংদ্ভুত সুলতান নাসিরুদ্দীন খসরু শাহর উত্থান ও পতন এবং তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠার কাহিনী।

এইসব গ্রন্থের অধিকাংশ ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমির খসরু তাঁর নিজস্ব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেন নাই। খসরু এইসব পুস্তক রচনা কালে যতদূর সম্ভব পাঠকদের কাছে সত্যনিষ্ঠ হতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সভাসদ্ হিসেবে তাঁর যে ভূমিকা ছিল তাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা সম্ভব ছিল না। খসরুর ঐতিহাসিক লেখা কাব্য-প্রতিভার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এসম্পর্কে সন্দেহ নাই।

আমির খসরুর জীবন আলেখ্য ও প্রতিভার কথা আলোচনা সূত্রে ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি দিতে হয়। কারণ তুর্কী শাসনের সূত্রপাত থেকে তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি সুলতান ও সুলতানী আমলে সভাসদ হিসেবে তিনি অবহিত ছিলেন এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে খসরু রাজা ও রাজ্যের পরিবর্তনের ও যুগের নানা বৈচিত্র্যের কথা তাঁর লেখনীতে কখনও সরল ও স্বচ্ছ এবং অনেকসময় আলঙ্কারিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার তাঁর কাব্যে হিন্দুস্তানের পশুপক্ষী, ফল-ফুল, ধনধান্যে ভরা সবুজ প্রান্তর ও জনগণের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। আমির খসরু ছিলেন মহান সুফী সাধক নিজামউদ্দীন আওলিয়ার অনুগামী এবং তাঁর

---

* আশরফ, 'হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্যা অবতরণিকা', পৃঃ ২০।

** ঐ, পৃঃ ২১-২২।

www.pathagar.com

লেখনীর মারফতে এই আনুগত্য ভাষা পেয়েছে। রাজধানী দিল্লীর প্রতি খসরুর আকর্ষণ ছিল প্রবল। এইযুগে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলরা বারংবার হিন্দুস্তানে হানা দিয়ে তার শান্তিপূর্ণ গ্রাম, জনপদ ও শহরকে তছনছ করেছিল। খসরু তাঁর লেখনীতে মোঙ্গলদের বর্বরতার কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁদের 'শ্বেতদানব' নাম দিয়েছিলেন। মোঙ্গলদের হাতে বন্দীদশায় থেকে তাদের অত্যাচার ও বর্বরতা সম্পর্কে কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল। এছাড়া মোঙ্গলরা মধ্যএশিয়ার ইসলামিক সভ্যতার কেন্দ্র সমরকন্দ, বোখারা, খিবা এমনকি বাগদাদ পর্যন্ত ধ্বংস করে দিয়েছিল। হিন্দুস্তান ছিল মোঙ্গল বিতাড়িত রাজা উজীর, আমির ওমরাহ্ ও সাদারণ মানুষের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এইজন্য হিন্দুস্তানের তুর্কীশাসক থেকে আশ্রয়প্রার্থী বিদেশীরা সকলেই পরিস্থিতির চাপে এদেশকে স্বদেশ বলে গণ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমির খসরুর কাছে হিন্দুস্তান ছিল মাতৃভূমি। তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে সেইজন্য হিন্দুস্তানকে স্বর্গভূমি বলে ঘোষণা করেছিলেন।

আমির খসরু ছিলেন দরবারের কবি। নগরের বিলাসীজীবন ও দিল্লীর সুলতান ও আমির ওমরাহদের প্রাচুর্য ও বিলাস-লালসাময় মদির মধুর জীবনযাত্রার তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী এবং অভিজাতশ্রেণীর লাগামবিহীন সান্ধ্য মজলিসের নৃত্য ও গীত এবং শাকী ও সুরার সঙ্গে কবি পরিচিত ছিলেন। সংগীত ও বাদ্যে খসরুর প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। যন্ত্র ও সুরের তাল তাঁকে নব নব বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার ও সুরের মূর্চ্ছনা সৃষ্টির দিকে আকর্ষিত করেছিল।

কিন্তু নাগরিক সভ্যতার বৈভব ও সংস্কৃতির মধ্যে থেকেও আমির খসরু সভ্যতার ভারবাহী খেটে-খাওয়া মানুষ সম্পর্কে বিস্মৃত হননি। নিজামউদ্দীন আওলিয়ার মানবদরদী বাণী তাঁকে দরবার থেকে এই মহান সুফীসাধকের দরগায় টেনে নিয়ে গেছে এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ তাঁকে বিচলিত করেছে। এইজন্য খসরু তাঁর কুল্লিয়াত-ই-খসরুতে ঘোষণা করেছেন যে, 'রাজকীয় মুকুটের প্রতিটি রত্ন দরিদ্র কৃষকের চোখের জল থেকে ঝরা জমাট রক্তবিন্দু ছাড়া আর কিছু নয়।' কবি পত্র সাহিত্যের (ইজাজ-ই-খসরুবী) একস্থানে মন্তব্য করেছেন যে, 'তিনি সুলতান, কৃষক, ব্যবসায়ী ও মজদুরদের যাদের কপোল নিঃসৃত ঘাম মাটিতে পড়ে মুক্তোয় পরিণত হয়, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা করতেন।'* হিন্দুস্তানের সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসার জন্য খসরু ভাষা ও সাহিত্যকেমাধ্যম করেছিলেন। তুর্কী বিজয়ের প্রাথমিক সংঘাতের পর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে সমন্বয় প্রচেষ্টা চলছিল আমির খসরু ছিলেন তার পথিকৃৎ। তাঁর কাব্য ও সাহিত্যে পারসিকের সঙ্গে আরবী শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে খসরু হিন্দি শব্দ, বাক্য ও রীতি ব্যবহার শুরু করেন। তিনি সম্ভবত হিন্দি ভাষায় কাব্য লেখা শুরু করেন। একজন লেখক মন্তব্য করেছেন যে, 'তিনিই পারসিক ছন্দকে হিন্দীতে জনপ্রিয় করেছিলেন এবং পারসিক ও হিন্দির সমন্বয়ের পথ প্রদর্শক ছিলেন। আবার তিনিই হিন্দীকে প্রাকৃতির ও অপভ্রংশের প্রভাবমুক্ত করেন । অবশেষে উর্দু নামে একটি নতুন ভাষার উদ্ভব হয়েছিল।**

আমির খসরু কেবলমাত্র সমন্বয়ের পথিক ছিলেন না, তাঁর অন্তর শেখ নিজামউদ্দীন আওলিয়ার আশীষে উদ্ভাসিত ছিল। সেইজন্য ধর্মের ভেদাভেদ, জাতিগত বিরোধ এবং বিচ্ছিন্নতা খসরুর অন্তরকে স্পর্শ করেনি। গোঁড়ামী তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করেনি এবং জীবনের শেষভাগে তিনি শেখ নিজামউদ্দীনকে আশ্রয় করে কাটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমির খসরুর জীবনাবসানের পূর্বেই এই মহান সুফী সাধকের দেহান্ত হয়।

---

* Medieval India—a miscellany-Vol.-I Material Historical interest in Izaz-i-Khusravi-Syed Hasan Askari, পৃঃ ৭।

** Patriotism in Amir Khasrau by S. Sahabuddin Abdur Rahaman (Indo Iranica - Vol-XV ও সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (৪২ সংখ্যক দ্বিতীয় পত্র, ৪৬ বৎসরের সংখ্যা)।

www.pathagar.com

সুলতানী আমলে সুফী মতবাদের ইতিকথা ও সূত্রপাত

খ্রীষ্টীয় দশম শতকে ইসলামের ইতিহাস বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এইসময় আব্বাসিদ খালিফাতের প্রাধান্যের স্থলে তুর্কীদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। এইযুগে চিন্তা ও ধর্মের ক্ষেত্রে এবং আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণার মধ্যে নতুন অনুপ্রেরণা আসে যার ফলে সুফী মতবাদের সূত্রপাত এবং অতীন্দ্রবাদের উদ্ভব হয়। চিন্তার জগতে এর ফলশ্রুতিতে যুক্তিভিত্তিক দর্শনের (মুতাজিলা) প্রভাবের অবসান হয়েছিল এবং কোরান ও হাদিসের (ইসলামের প্রবর্তক মহম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের ঐতিহ্য) আস্থাভাজন রক্ষণশীল ঐস্লামিক মতবাদের এবং সুফী মতবাদের উত্থান হয়েছিল। যুক্তিবাদীরা সংশয় ও নাস্তিকতা প্রসার করতে তৎপর ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। কারণ এদের বক্তব্যে ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টি মূলত অভিন্ন বলে দাবি করা হয়েছিল এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য অবলুপ্ত করার প্রচেষ্টা হয়েছিল।

ইসলামিক অতীন্দ্রবাদীরা পরবর্তীকালে সুফী বলে অভিহিত হয়। অনেকে মনে করেন, সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে ধনদৌলতের প্রাচুর্য এবং নৈতিক অবক্ষয়কে যেসব আধ্যাত্মবাদীরা সুনজরে দেখেন নাই তাঁরা সুফী অতীন্দ্রবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেইজন্য ডঃ ইউসেফ হোসেনের ন্যায় অনেকে মনে করেন যে, সুফীবাদের জন্ম ইসলামের মধ্যে থেকেই হয়েছিল। ডঃ এ এল শ্রীবাস্তবের মতে, হিন্দুস্তানে সুফী মতবাদ হিন্দু ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস এবং আচার ও প্রথার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। চিস্তিরা বহু হিন্দু প্রথা এবং পর্ব পালন করতেন। আত্মার এবং পরমাত্মার সম্পর্কের সঙ্গে প্রেমিক ও প্রেমিকার সম্পর্কের ধারণা, সুফীরা হিন্দুদের থেকেই গ্রহণ করেছিল। এছাড়া অহিংসা এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার যে মতবাদ ভারতীয় সুফীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের থেকেই গৃহীত হয়েছিল। তৃতীয়ত, কঠিন ও কষ্টকর কৃচ্ছ্রসাধনের এবং তপশ্চর্যার মারফতে সিদ্ধি লাভের পথ প্রশস্ত করার নীতি সম্ভবত হিন্দু ও বৌদ্ধদের থেকেই সুফীরা গ্রহণ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ সুফীদের মধ্যে প্রচলিত সাধন পদ্ধতির মধ্যে পাস-ই-আনফাস (প্রাণায়াম), ধ্যান, চিল্লা (নির্জন ঘরে বা স্থানে ৪০ দিন কৃচ্ছ্র সাধন), চিল্লা-ই-মা-কুস (৪০ দিন ধরে ঘরের ছাদে বা গাছের ডালে পা বেঁধে ও মাথা জমিতে রেখে সাধনে লিপ্ত থাকা) এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় সাধনা সামা বা ভক্তিগীতের কথা উল্লেখ করা যায়। সুফীরা যোগীদের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। নাথযোগীরা চিস্তি খানকাহতে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করতেন এবং হটযোগের উপর লেখা অমৃতকুণ্ড আরবী ও পারসিক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।*

ওহাদৎ-উল-উজুদের দর্শন

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে সুফী মতবাদের বক্তব্য সকল সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা, যা ইবন আরাবীর (১১৬৫-১২৪০) ন্যায় সুফীদের লেখনীতে প্রচারিত হয়েছিল, তা ইসলামের আত্মিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্গরূপে গণ্য হয়।

এই বক্তব্যে 'হক' ও 'খালক' স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সনাক্তকরণ করা হয়। অর্থাৎ সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঈশ্বরই সত্য, সমস্ত প্রাকৃতিক বহির্প্রকাশে একমাত্র ঈশ্বরই বাস্তব। ফুতুহাত-ই-মক্কাইয়াতে এই চিন্তাধারা প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে—"There is nothing but God, nothing in existence other than He; there is not even a 'there' where the essence of all thing is one." রক্ষণশীল মুসলমানরা এই মতের নিন্দা করলেও ভারতীয়

* Islam in Medieval India by S. A. A. Rizzvi (The Cultural History of India). In the words of Rizzvi, "Various anedotes indicate that Sufis approved of some ethical values of the Yogi's as well as of their corporate way of living". পৃঃ ২৮৬-২৮৭ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সুফীরা এই বক্তব্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা মানবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সরাসরি সংযোগের কথা চিন্তা করেছিলেন।

মানবাত্মার ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি অতীন্দ্রভাবে মিলিত হবার সম্ভাবনার কথা সুফী চিন্তাধারার অঙ্গ ছিল। এইভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগের চিন্তায় সুফীরা এতদূর সাধনায় মগ্ন থাকতেন যে মুহূর্তের জন্য এই চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা তাদের পক্ষে অসহনীয় ছিল। সুফীরা অতীন্দ্রবাদের সাধনায় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য সকল প্রকার জাগতিক সুখ ও ঐশ্চর্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এইজন্য অধিকাংশ সুফী ক্ষমতাবান শাসকশ্রেণীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা পছন্দ করতেন না। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সুফীদের লক্ষ্য ছিল সরাসরি ঈশ্বরের সঙ্গে বুদ্ধি ও আবেগের মারফতে অতীন্দ্রভাবে সংযোগ স্থাপন করা এবং তৎসহ মানবের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা।

প্রথমের দিকে সুফী-সাধকরা অনেকে যেমন রাবেয়া (খ্রীঃ অষ্টম শতকের প্রসিদ্ধ মহিলা সাধিকা) এবং খ্রীষ্টিয় দশম শতকে মনসুর বিন হালাজ মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যোগসূত্রের উপর গুরুত্ব দান করেছিলেন। এই সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের জন্য মৌলবাদীদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ উপস্থিত হয় এবং মনসুরের ন্যায় সাধকের নাস্তিকতা ও ধর্ম-বিরোধিতার জন্য প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু এর ফলে সুফী মতবাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়নি বরং এর দ্রুত প্রসার হয়েছিল। আল গাজালী (প্রয়াণ বৎসর ১১১২) মৌলবাদী ও সুফী মতবাদের সমর্থক উভয়পক্ষের কাছে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি অতীন্দ্রবাদ ও ইসলামিক মৌলবাদীদের মধ্যে সমঝোতা করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি কতকটা সাফল্য অর্জন করেন। আল গাজালী বলেন যে, ঈশ্বর সম্পর্কে সত্যকারের জ্ঞান ও তাঁর ঐশ্চর্য সম্পর্কে উপলব্ধি যুক্তির মারফতে নয়, দৈব কৃপায়ই সম্ভব। এইভাবে মুতাজিলা বা যুক্তিবাদী বক্তব্যের উপর আল গাজালী চরম আঘাত হানেন। অতএব সুফীদের কাছে দৈবপ্রাপ্ত কোরান অতীন্দ্রবাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় পথনির্দেশক রূপে গৃহীত হয় এবং তৎসহ হাদিসের বক্তব্য তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

সুফীদের কর্মকান্ড ও সংগঠন

সুফীরা অতীন্দ্রবাদের সাধনার পথে একনিষ্ঠ ছিলেন এবং ইসলাম ও মানবতার সেবায় জীবনোৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের গুণগ্রাহী বহু ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণের কাছে তাঁদের আচার-আচরণ ও ঈশ্বরের আরাধনা সহজবোধ্য ছিল। অধিকাংশের ব্যবহৃত হিন্দী সম্পর্কে সুফীরা ওয়াকিবহাল ছিল। এইজন্য সুফীদের ভাষায় অনেক হিন্দী শব্দ পাওয়া যায়। এইভাবে ভবিষ্যতের উর্দুর ভিত্তি স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতকে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক বা মিশনারীরা যেভাবে সাধারণ মানুষকে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন, সুফীসাধকরাও সেইভাবে প্রেম, প্রেরণা, জাগতিক ও সামাজিক উন্নতি সর্বোপরি মুক্তির প্রথম সোপান হিসেবে ধর্মান্তকরণকে লোকের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

সুফীরা প্রাচীন যুগের মুনি ঋষির আশ্রমের ন্যায় লোকালয় থেকে বহুদূরে তাঁদের আশ্রম বা খানকাহ স্থাপন করতেন এবং নিম্নবর্গের মানুষ ও হরিজনদের প্রতিবেশী হিসাবে গ্রহণ করতেন। খানকাহর প্রাণকেন্দ্র ছিল তার পীর বা গুরু যাঁকে তাঁর মুর্শিদরা (শিষ্য) শেখ বা খাজা নামে অভিহিত করত। এই খানকাহগুলিতে ছিল খড়ে ঢাকা মাটির একটি বা দুইটি ঘরের কুটির। অনেক সময় বৃহৎ-স্তম্ভযুক্ত জামায়েত খানাওর উদাহরণও পাওয়া যায়। খানাকাহগুলি স্থানীয় অধিবাসীদের দানের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু কালক্রমে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়াতে খানকাহগুলি সমৃদ্ধশালী হয়। সুরাবর্দি গোষ্ঠী বা সিলসিলার ন্যায় যেসব সুফীরা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট ছিলেন তাঁরা প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতেন।

www.pathagar.com

আবুল ফজলের মতে মোটামুটি হিন্দুস্তানে যেকয়টি সুফী সিলসিলা ছিল তাদের সংখ্যা ১৪টি। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে চিস্তিয়া সুরাবর্দিয়া, নাক্সবন্দিয়া, কাদিরিয়া, ফিরদৌসী প্রভৃতি সিলসিলাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হ'ত। সাধারণত সুরাবর্দিয়া সিলসিলা সিন্ধু, মুলতান ও পাঞ্জাবে দেখা যেত এবং তাদের কোন কোন পীর দিল্লী ও অযোধ্যায় বাস করতেন। আজমীর ও রাজস্থানের কয়েকটি শহরে, বিহার, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা এবং দাক্ষিণাত্যে প্রধানত চিস্তি সুফীরা নিজেদের শাখা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। চিস্তিদের জনপ্রিয়তার মূল কারণ হল তাদের ভারতীয় পরিবেশ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং চিস্তিরা কিছু কিছু হিন্দু প্রথা ও পালা পার্বনকে গ্রহণ করেছিলেন।

চিস্তি সিলসিলা

হিন্দুস্তানে চিস্তি সিলসিলার প্রবর্তক ছিলেন শেখ মুইনউদ্দীন চিস্তি। তিনি ১১৪১ সালে পূর্ব পারস্যের সিজিস্তান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশবেও পিতৃহারা হন। তরুণ বয়সে খাজা ওসমানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম তরাইয়ের যুদ্ধের পূর্বে তিনি আজমীরে চৌহান রাজশক্তির প্রধান কেন্দ্র ও হিন্দুর ধর্মের ঘাঁটিতে বসবাস শুরু করেছিলেন। শেখ মুইনউদ্দীন চিস্তির উদার মনোভাব, সাধারণ জীবনযাত্রা এবং ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীত প্রাণ সকলকেই আকর্ষিত করেছিল। ১১৩৬ সালে তাঁর মৃত্যুকালে শেখ মুইনউদ্দীন চিস্তি সর্বসাধারণের নিকট খাজা নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন ছিলেন হিন্দু।

খাজা মুইনউদ্দীন চিস্তির দুইজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে একজন ছিলেন শেখ কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার খাকী (প্রয়ানের বৎসর খ্রীঃ ১২৩৫) ও আরেকজন ছিলেন শেখ হামিদউদ্দীন তাঁর নাগোরী (প্রয়ানের বৎসর খ্রীঃ ১২৭৪)। শেখ হামিদউদ্দীন সম্ভবত একজন দিল্লীর বণিকের পুত্র ছিলেন এবং তাঁর পিতামাতা ঘুরী বিজয়ের পূর্বে দিল্লীতে বসবাস শুরু করেছিলেন। শেখ হামিদ অতি অল্প বয়সে শেখ মুইনউদ্দীনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং সমস্ত রকম রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রভাব থেকে দূরে রাজস্থানে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সাধারণ কৃষকের জীবন যাপন করেছিলেন। তিনি আল-গাজালীর লেখা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সব ধর্মের প্রতি সমদৃষ্টির জন্য তিনি হিন্দুদের কাফের আখ্যা দিতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরামিষাশী ছিলেন। তিনি স্থানীয় ভাষা, যাকে পারসিক সাহিত্যে হিন্দাবী বলে অভিহিত করা হয়, সেই ভাষা গ্রহণ করেন। পারসিক অতীন্দ্রবাদী কাব্যের হিন্দাবীতে যে অনুবাদ তিনি করেছিলেন তাকে এই ভাষায় শ্রেষ্ঠ অনুবাদ বলা যায়।

শেখ কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার খাকী ফারগানার আউসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শেখ মুলতান হয়ে দিল্লীতে পদার্পণ করলে সুলতান ইলতুৎমিস তাঁকে সাদরে স্বীয় প্রাসাদের কাছে বসবাস করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু শেখ এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে শহরের বহির্দেশে একটি খানকাহতে স্বীয় ডেরা বাঁধেন। এছাড়া সুলতান ইলতুৎমিসের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি শেখ-উল-ইসলামের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হন। কিন্তু সুলতানের সকল প্রকার সংস্কৃতির পরিকল্পনাতে শেখ কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার খাকী তাঁকে সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। শেখ কুতুবউদ্দীন 'সমা' গানের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হতেন এবং একবার এইগানের মধ্যে তিনি ৪ দিন ভাব সমাধিতে ছিলেন ও পঞ্চমদিনে এই ভাব সমাধিতেই দেহত্যাগ করেন (১৫ই নভেম্বর, ১২৩৫ খ্রীঃ)।

শেখ ফরিদ-উদ্দীন গঞ্জ-ই-শক্কর

উত্তর ভারতে সুফী মতবাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য পাকপত্তন বা অযোধায়নের বাবা ফরিদউদ্দীন গঞ্জ-ই-শক্করের (১১৭৫-১২৬৫ খ্রীঃ) অবদান অনস্বীকার্য। অল্পবয়সেই তিনি শেখ

www.pathagar.com

কুতুবউদ্দীনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং কঠিন সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে হানসি ও পরে পাক পত্তনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বাবা ফরিদ বহু স্ত্রী ও পুত্রকন্যা দ্বারা পরিবৃত থাকতেন এবং তাঁর অজস্র শিষ্য ছিল। শেখ ফরিদ দারিদ্রের জন্য অনশনে ও ধর্মালোচনায় দিনাতিপাত করতেন। তিনি স্থানীয় ভাষায় কথা বলতেন এবং পাঞ্জাবী ভাষা যেহেতু জনসাধারণের বোধগম্য ছিল সেইজন্য এই ভাষাতেই আলোচনা করতেন। তিনি বহু খানকাহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শেখ ফরিদের শিষ্যরা তিনটি শাখা সিলসিলা স্থাপন করেছিলেন। এই শাখা সুফী সিলসিলাগুলির নাম হল যথাক্রমে শেখ জামালউদ্দীন প্রতিষ্ঠিত জামালিয়া সিলসিলা যা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি, শেখ নিজামউদ্দীন প্রতিষ্ঠিত নিজামিয়া সিলসিলা এবং শেখ আলাউদ্দীন প্রতিষ্ঠিত সাবিরই সিলসিলা।

শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া

১২৩৬ সালে বাদায়ুনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশবেই পিতৃহারা হয়েছিলেন। শেখ নিজামউদ্দীন কুড়ি বৎসর বয়সে বাবা ফরিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দিল্লীতে গিয়সপুরে (বর্তমানে যেখান নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সমাধি) বসবাস শুরু করেছিলেন। বাবা ফরিদ তাঁর এই প্রিয় শিষ্যকে খিলাফত-নামা দিয়ে চিস্তি অতীন্দ্রবাদ প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। দীন দরিদ্র ও সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বহু অভিজাত শ্রেণীর লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লী থেকে দেবগিরি, মূলতান থেকে লখনৌতি সর্বত্র শেখ নিজামউদ্দীনের খানকাহর শাখা প্রসারিত হয়েছিল। চিস্তি সিলসিলার প্রধানরা শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেননি। শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া পরপর ৭ জন সুলতানের শাসনকালে জীবিত ছিলেন কিন্তু তিনি কারো দরবারে পদার্পণ করেননি। সুলতান জালালউদ্দীনের একান্ত বাসনা সত্ত্বেও শেখ নিজামউদ্দীন সুলতানের দরবারে পদার্পণ করেননি এবং সুলতান মুবারক খলজীর আহ্বান উপেক্ষা করে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হতে অস্বীকার করেছিলেন। তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়াকে সুলতান নাসিরউদ্দীন খসরু শাহর প্রতি সহানুভূতিশীল বলে মনে করতেন। সেই কারণে তিনি শেখকে সুচক্ষে দেখেন নাই এবং গৌড় অভিযানের পর এই সুফী সাধককে শাস্তি দেবেন বলে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া মন্তব্য করেছিলেন 'দিল্লী হনুজ দূর অস্ত' এবং তুঘলক সুলতান গৌড় থেকে প্রত্যাবর্তন করে দিল্লীতে পদার্পনের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। ১১৩৫ সালে শেখ নিজামউদ্দীন দেহত্যাগ করেন। প্রসিদ্ধ কবি ও লেখক আমির খসরু ও তাঁর সমকালীন লেখক আমির হাসান এবং ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী শেখের অন্যান্য বহু শিষ্যের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম।

চিস্তি সিলসিলার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সুফীদের মধ্যে শেখ নাসিরউদ্দীন চিরাগ-ই-দিল্লী সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শেখ নিজামউদ্দীনের শিষ্য ছিলেন। শেখ নিজামউদ্দীন তাঁর উত্তরাধিকার বা খলিফা হিসাবে শেখ নাসিরউদ্দীনকে নিযুক্ত করেছিলেন। সুফীদের ঐতিহ্য অনুসারে শেখ নাসিরউদ্দীন সুলতানী দরবারের সুফীদের জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করার বা পৃষ্ঠপোষকতা করার প্রচেষ্টায় বাধা দান করেছিলেন। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক এই কারণে সুফীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তী সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক শেখ নাসিরউদ্দীনকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের সমস্যা ও দুর্দশা শেখ নাসিরউদ্দীনকে সর্বদা চিন্তিত ও বিষণ্ণ রাখত। প্রার্থনা ও পঠন পাঠন এবং ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পনই ছিল শেখ নাসিরউদ্দীন চিরাগ-ই-দিল্লীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

ষোড়শ শতকে ফতেপুর সিক্রির নিকট প্রসিদ্ধ সুফী সাধক শেখ সেলিম চিস্তি তাঁর পূর্ব সুরীদের ন্যায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। মুঘল সম্রাট আকবর ফতেপুর সিক্রির নিকট শেখ

www.pathagar.com

সেলিম চিস্তির খানকাহতে তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে গিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, শেখ সেলিম চিস্তির আশীর্বাদে শাহজাদা জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। শেখ সেলিম চিস্তির মরদেহ ফতেপুর সিক্রির জাম-ই-মসজিদে সমাহিত করা হয়েছিল এবং মুঘল সম্রাট আকবর এই সমাধির উপর এই অপূর্ব স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করেছিলেন।

হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশে সূফী প্রভাব বিস্তার

শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার শিষ্যদের প্রভাবে চিস্তি সিলসিলার শাখা-প্রশাখা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশে প্রসারিত হয়েছিল। শেখ সিরাজউদ্দীন বা আখী সিরাজ (প্রয়ান বৎসর ১৩৫৭) বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম সূফী মতবাদের প্রবর্তক এবং তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী শেখ আলা উল হক (প্রয়ান ১৩৯৮ খ্রীঃ), শেখ নূর-কুতুব-ই-আলম (প্রয়ান ১৪১০ খ্রীঃ) ও সৈয়দ আশরফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (প্রয়ান ১৪০৫ খ্রীঃ) বঙ্গদেশে, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের আধ্যাত্মিক জীবনকে প্রভাবিত করেছিলেন। চিস্তি প্রভাবে বঙ্গদেশে সত্যপীরের আন্দোলন প্রবর্তিত হয়েছিল এবং সুলতান হুসেন শাহ ও তাঁর উত্তরসূরীরা হিন্দুধর্ম পুস্তকের বঙ্গানুবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে শেখ বুরহানউদ্দীন (প্রয়ান ১৩৪০ খ্রীঃ), শেখ মুন্তাখার ও খাজা হাসান সূফী সিলসিলার প্রবর্তক ছিলেন। গুলবার্গার সৈয়দ মহম্মদ গেসু দরজের (প্রয়ান ১৪২২ খ্রীঃ) দ্বারা সূফী আন্দোলন অনুপ্রাণিত হয়েছিল। মালবে এই আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন ওয়াজিউদ্দীন ইউসুফ (প্রয়ান ১৩২৮ খ্রীঃ), শেখ কামালউদ্দীন ও মৌলনা মুগিসউদ্দীন। সূফী মতবান গুজরাটে শেখ হুসামউদ্দীন সুলতানী (প্রয়ান ১৩৫৪ খ্রীঃ), শেখ বরক-উল্লাহ্ ও সৈয়দ হাসান কর্তৃক প্রচারিত হয়েছিল। এই যুগে যেসব আঞ্চলিক রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল সূফী খানকাহগুলি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

চিস্তিদের জনপ্রিয়তার কারণ ছিল তাদের উদার চিন্তাধারা। শেখ মুইনউদ্দীন চিস্তির মতে ঈশ্বরের আরাধনা আর কিছুই নয় বিপন্নকে সাহায্য করা, অসহায়ের সহায়তা করা এবং ক্ষুদার্তকে আহার দেওয়া। হিন্দুদের উপনিষদের চিন্তাধারা তারা বহুক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন। আমির খসরু তাঁর কাব্যে হিন্দুদের সম্পর্কে সূফী দৃষ্টিভঙ্গী কাব্যে প্রকাশ করেছেন। তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে,

নিস্ত হিন্দু আরচি কি দিনদার চু মন।
হস্ত বাসীই যায় বা কারার ছু মন।।

(যদিও ধর্মে হিন্দু আমার মতন নয়, তবুও সে আমার ন্যায় একই ব্যাপারে বিশ্বাসী।)

খসরু তাঁর নুহ-সিপির (বা নবম স্বর্গ) নামক কাব্যগ্রন্থে দাবি করেছেন যে, এদেশের সবই অন্যদেশ থেকে উত্তম। এদেশে চিস্তিরা সম্ভবত এই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলে ধর্মান্তকরণে গুরুত্ব দান করেননি।

সুরাবর্দি সিলসিলা

সূফী সিলসিলাদের মধ্যে চিস্তিদের পরেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সুরাবর্দি সিলসিলা যার প্রবর্তক হিসেবে শেখ শিহাবউদ্দীন উমর সুরাবর্দির (প্রয়াণ ১২৩৪ খ্রীঃ) নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সুরাবর্দী সিলসিলাকে সংগঠনের মারফতে শক্তিশালী করবার কৃতিত্ব দেওয়া হয় শেখ বহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়াকে (প্রয়াণ ১২৬২)। তিনি মুলতানে একটি খানকাহ স্থাপন করেছিলেন এবং সিন্ধু ও তার আশপাশ অঞ্চলের বহু লোক তাঁর খানকাহতে আকৃষ্ট হয়ে যোগাযোগ রাখত। জ্যাকেরিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী চিস্তিদের থেকে সম্পর্ণ পৃথক ছিল এবং তিনি কৃচ্ছ সাধনে বিশ্বাসী ছিলেন না। শেখ বহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়া ইসলামের সমস্ত বহিরঙ্গের প্রথা মেনে চলতেন

www.pathagar.com

এবং যে সমস্ত হিন্দু আচার আচরণ সূফীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল তা বর্জন করতেন। তিনি শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। শেখ বহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়ার একজন শিষ্য 'উচে' একটি খানকাহ্ স্থাপন করেছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে সুরাবর্দি সিলসিলার অন্যতম প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন শেখ জালালউদ্দীন বুখারী (প্রায়ণ ১৩৮৪ খ্রীঃ)। শেখ রুকনউদ্দীন আবুল ফতাহ (প্রয়াণ ১৩৩৫ খ্রীঃ) সুরাবর্দি সিলসিলার প্রভাব বিস্তৃত করেছিলেন।

উচ এবং মুলতান সুরবর্দি সিলসিলার প্রধান কেন্দ্র ছিল। সুরাবর্দিদের ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে মতামত বহু বিষয়ে চিস্তিদের চিন্তাধারা থেকে পৃথক ছিল। সুরাবর্দি সাধকদের অনেকে সুবিস্তৃত জায়গীর উপভোগ করতেন, রাষ্ট্র ও রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতেনএবং তাঁরা অনেকে ধর্ম ও সামাজিক প্রশ্নে বহু বিষয়ে রক্ষণশীল ও অনমনীয় মনোভাব পোষণ করতেন। চিস্তি সিলসিলার সঙ্গে এই ধরনের বহু প্রশ্নে সুরাবর্দিদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী বলেছেন যে, সুলতান ইলতুৎমিসকে সৈয়দ নুরউদ্দীন মুবারক গজনভী হিন্দুদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সুরাবর্দিদের মধ্যে অনেকে উদার মনোভাব পোষণ করতেন। বঙ্গদেশে লেখা শেখ শুভোদয়াতে শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজির প্রতি হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও এই সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী জানা যায়।

ফিরদৌসী সিলসিলা

সমরকন্দের শেখ বদরউদ্দীন দিল্লীতে ফিরদৌসী সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শেখ বদরউদ্দীন ছিলেন শেখ সৈফউদ্দীন বাখারজীর শিষ্য। পরবর্তীকালে ফিরদৌসী সিলসিলার সূফীরা বিহারকে তাঁদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। ফিরদৌসী সিলসিলার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুফীসাধক ছিলেন শেখ শরফউদ্দীন মুনয়েরী (প্রয়াণ ১৩৭১ খ্রীঃ)।

কাদিরিয়া সিলসিলা

কাদিরিয়া সিলসিলা দ্বাদশ শতকে শেখ মুহায়িউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হিন্দুস্তানে পরবর্তীকালে শাহ্ নিমুতুল্লা কাদেরীর (প্রয়াণ ১৪৩০ খ্রীঃ) প্রচেষ্টায় গুরুত্ব অর্জন করে। সৈয়দ মকদুম মহম্মদ গিলানী (প্রয়াণ ১৫১৭) কাদিরিয়া সিলসিলাকে সংগঠিত করেছিলেন। এই সিলসিলার সদস্যদের মতামত বারংবার পরিবর্তিত হয়েছে। শেখ দাউদ, শাহ আবুল মায়ালী ও অন্যান্যরা ছিলেন রক্ষণশীল ও সর্বসাধারণে তাঁদের মত প্রচারের স্বপক্ষে। আবার মিয়া মীর, মোল্লা শাহ বাদখশী ও অন্যান্য অনেকে উদার মতাবলম্বী হলেও সিলসিলার অতীন্দ্র রহস্য সম্পর্কে কেবলমাত্র নির্বাচিত ও অনুগতদের কাছে প্রচার করার পক্ষপাতী ছিলেন। কাদিরিয়া সিলসিলার একটি তৃতীয় গোষ্ঠী উভয় মতবাদের মধ্যবর্তী পন্থা অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন।

নকশবন্দি সিলসিলা

এই সিলসিলার শাখা হিন্দুস্তানে পরবর্তীকালে এসেছিল এবং খাজা বাকী বিল্লায়হ (প্রয়াণ ১৬০৩ খ্রীঃ) হিন্দুস্তানে এই সিলসিলার প্রথম প্রবর্তক। খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দির (১৩১৭-১৩৮৯) পর এই সিলসিলা 'নাকশবন্দিয়া' নামে অভিহিত হয়। ইসলাম নীতির প্রতি এই সিলসিলা একাগ্র আনুগত্য প্রকাশ করেছিল এবং ধর্মীয় আইন কঠোরভাবে অনুসরণ করত। ধর্মীয় ব্যাপারে কোন নয়া নীতি গ্রহণের বিরুদ্ধে নাকসবন্দীরা রায় দিয়েছিল।

হিন্দুস্তানে পরবর্তীকালের অর্থাৎ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। এই তিনটির নাম হল শত্তারি সিলসিলা, মাহদবী আন্দোলন

www.pathagar.com

ও রৌশনিয়া সম্প্রদায়। এই তিনটি আন্দোলনের মধ্যে ভক্তি আন্দোলনের মূলনীতি প্রতিফলিত হয়েছিল।

উপসংহার

সূফী আন্দোলন সমকালীন হিন্দু ধর্মীয় আচরণের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল এসম্পর্কে সন্দেহ নাই। কিন্তু সূফী প্রভাব থেকে হিন্দুরা নিজেদের স্বাতন্ত্র ও দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। নিম্নবর্গের হিন্দুরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সূফীদের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখেছিলেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সূফী প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। মুঘল সম্রাট আকবরের আমল থেকে হিন্দুদের সঙ্গে সূফীদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে সূফী চিন্তা, আচার ও আচরণ বহুক্ষেত্রে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের কাছে কদর পেয়েছিল। সুরবর্দী ও নকশবন্দি সিলসিলার সূফীরা মুসলিম অতীন্দ্রবাদকে ভারতীয় চিন্তাধারা থেকে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু চিস্তি সিলসিলার বক্তব্যের সঙ্গে হিন্দু বেদান্ত দর্শনের অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল। এমনকি চিস্তিদের সূফী মতাদর্শ হিন্দু বেদান্তবাদের থেকে গৃহীত বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন। এর ফলশ্রুতিতে পারসিক ভাষায় শিক্ষিত হিন্দুরা চিস্তি সিলসিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সূফী মতবাদ দ্রুত হিন্দুস্তানে প্রসারিত হয়েছিল।*

যেসব হিন্দুরা সূফী দর্শন গ্রহণ করেছিলেন তারা পারসিক ভাষায় সূফী সাহিত্য রচনা করেন। এই ঘটনা থেকে ভারতের জনমানসে সূফী মতবাদের প্রভাব ও প্রসারের কথা উপলব্ধি করা যায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে হিন্দু ও মুসলমান জনমানসের গভীরে সূফী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ সম্পর্কে জানা যায়। স্যার যদুনাথের মতে, দুইটি কারণে সূফী মতবাদ প্রসারিত হয়েছিল। প্রথমতঃ, মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের ফলে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল তা সূফী চিন্তাধারা প্রসারে সহায়তা করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র এবং সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টার মধ্যে হিন্দুস্তানের মুক্তির পন্থা রয়েছে এই চিন্তা উভয় সম্প্রদায়কে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। হিন্দু মুসলমান যুক্তসাধনার ফলশ্রুতিতে ভক্তি আন্দোলনের ও সূফী চিন্তাধারার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

---

* A. L. Srivastav-এর মতে "Sufism of the chisthi variety is mainly an offshoot of the Videanta of the Hindus, and therefore persian educated Hindus leaned towards it, the result was a rapid spread of sufsm in India." Medieval Indian Culture by A. L. Srivastava, পৃঃ ৯৫।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

•

ভক্তি আন্দোলন

হিন্দুধর্মে জন্মান্তরবাদের চিন্তা অনুসারে মানবাত্মার পুনর্জন্মবাদ একটি সুপ্রাচীন ও সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা। কর্মফল ভোগের জন্য মানবাত্মার পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ থেকে মুক্তি পাওয়ার তিনটি পন্থা বা মার্গ আছে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি মার্গ এই তিনটির যেকোন মার্গ সঠিক ভাবে অনুসরণ করলে মানবাত্মা মুক্তি লাভে সক্ষম হয়। সুলতানী আমলে (১২০৬-১৫২৬ খ্রীঃ) হিন্দুস্থানে ভক্তি মার্গের প্রচারক কয়েকজন বিশিষ্ট সন্ত মানবাত্মার মুক্তির পথিকৃৎ হিসাবে ভক্তি আন্দোলনকে জোরদার করেছিলেন।

ভক্তি আন্দোলনের প্রচারকদের বৈশিষ্ট হল তারা কোন বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না ও কোন বিশেষ ধর্ম বা গোষ্ঠীর হয়ে প্রচারে লিপ্ত ছিলেন না। সেইজন্য ভক্তি মার্গের সন্তরা কোন বিশেষ ধর্মের মতবাদকে বা মতবাদের পবিত্র গন্থকে গুরুত্ব দেননি বা আচারানুষ্ঠান পালন করেননি। এই সন্তরা বন্ধনমুক্ত আত্মসাধনা ও আত্মসংস্কারের মারফতে মুক্তির আলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। ভক্তি আন্দোলনের বিশেষ বক্তব্য ছিল ঈশ্বর এক ও অভিন্ন এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায় একই ঈশ্বরের ভজনা করার বাসনায় তাঁকে কৃষ্ণ, রাম, রহিম, শিব প্রভৃতি বিভিন্ন নাম দিয়েছেন।

এইজন্য ভক্তি আন্দোলনের প্রচারকদের বক্তব্য ছিল ঈশ্বরকে মন্দির, মসজিদ বা ধর্মস্থানে নয় বরং মানুষের হৃদয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। কারণ মানবের হৃদিকুঞ্জেই লীলাময়ের দর্শন পাওয়া যায় ও কৃপা লাভ হয়। ভাব ও ভক্তির আধার মানবদেহ সত্যধর্মের পবিত্র মন্দির। ধর্মের ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত করার জন্য এই সব সত্যকে উপলব্ধি করা ও প্রেম ভক্তির পথে ঈশ্বর আরাধনা ও সাধনার জন্য ভক্তি ধর্মের নির্দেশ আছে। এই ধরনের সুকঠিন পথ অতিক্রম করার জন্য গুরুর সাহায্য ও নির্দেশের প্রয়োজন। তৎসহ ঈশ্বরের কৃপা ভক্তি সাধনায় সিদ্ধি লাভের পথে নিয়ে যায়। এই কারণে ভক্তিধর্মে ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা বলা হয়েছে। কেবলমাত্র যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপলব্ধি হয় না, তার জন্য প্রয়োজন ভাব ও ভক্তি। আর তাই বলা হয় যে, 'বিশ্বাসে লভয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর'। ভক্তিধর্মের মূল তত্ত্বগুলির মমার্থ প্রচলিত কথা ও কাহিনীর মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল এবং শাস্ত্রীয় বচন ও সাম্প্রদায়িক বক্তব্য অপেক্ষা ভক্তিধর্মের মাধ্যমে সার্বজনীন সত্য জনগণের কাছে বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। জনগণের কাছাকাছি আসার জন্য ও তাঁদের বক্তব্যকে সহজ সরল করার উদ্দেশ্যে ভক্তিধর্মের প্রচারকরা সংস্কৃতের বদলে অবহেলিত ও দলিত এবং নিম্নবর্গের শ্রেণীর পক্ষে সহজে বোধগম্য কথিত আঞ্চলিক ভাষার সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন।

ভক্তিধর্মের প্রচারকরা রক্ষণশীল ধর্মের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁদের উত্তরসূরীরা নিজেদের গোষ্ঠীবদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত করেহিলেন। বহুক্ষেত্রে তাঁরা অন্যান্য সম্প্রদায় সম্পর্কে উদারতা ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর বক্তব্যকে গ্রহণ করার সহনশীলতা

www.pathagar.com

ত্যাগ করে স্ব স্ব গোষ্ঠীর মধ্যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আবদ্ধ হয়েছিলেন। ফলে তাঁরাও সার্বজনীনতা বিসর্জন দিয়ে হিন্দুধর্মেরই মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন। ভক্তিধর্মের উত্তরসাধক পথিকৃৎ ও প্রবক্তাদের বক্তব্য থেকে সরে গিয়েছিলেন। শিখ ধর্মে প্রবর্তক গুরু নানকের অনুসরণকারীরা মধ্যযুগের ভক্তিধর্মের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে এ বিষয়ে পৃথক ছিলেন। এইজন্য তারা হিন্দুস্তানের একাংশে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং মধ্যযুগের ভক্তিধর্মের ধ্যানধারণার কিছুটা প্রতিনিধিত্বের দাবি রাখেন। কিন্তু নানকের অনুসরণকারীদের প্রেক্ষাপট প্রস্তুত হয়েছিল সম্ভবতঃ ধর্ম অপেক্ষা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভাবের ফলশ্রুতিতে শিখধর্মের প্রভাব বিস্তারের পক্ষে তৎকালীন যুগ ও গুরু নানকের পরবর্তী গুরুদের কালে অনুকূল ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় ভক্তিধর্মের প্রভাব হিন্দুধর্মের চিন্তা আচার ও আচরণের বা হিন্দুধর্মের কাঠামোর অভ্যন্তরীণ ও বহিরঙ্গে বিশেষ কোন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি।

ভক্তি আন্দোলনের উৎস

ভক্তি আন্দোলনের উৎস ছিল সুপ্রাচীন হিন্দু চিন্তাধারার জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আকুতি সকল জীবাত্মারই শেষ লক্ষ্য এবং মোক্ষলাভ করার জন্য জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই ত্রিধারার মধ্যে যেকোন একটির অনুসরণ করা যায়। এই ত্রয়ীর মধ্যে ভক্তির পথে চলার জন্য মধ্যযুগের যে সব সাধকরা উপদেশ দিয়েছেন তাঁরাই সুলতানী আমলে ভক্তিধর্মের পথিকৃৎ ও পন্থা নির্দেশক এবং ভক্তি আন্দোলনের প্রবর্তক। অতএব ভক্তি আন্দোলনের উৎস ছিল, ঈশ্বর এক ও অভিন্ন এবং সর্বব্যাপী এবং মূর্তি বা দেবস্থানে পূজার্চনার মাধ্যমে নয় ভক্তির মাধ্যমেই তাঁকে আরাধনা করলে যে মুক্তি লাভ সম্ভব এই চিন্তা থেকে ভক্তি আন্দোলনের উৎপত্তি একথা সর্বজনবিদিত। ঋকবেদ থেকে ঈশ্বর এক ও নানারূপে তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এই বক্তব্য প্রচারিত এবং একই সত্যকে ঋষিরা নানারূপে বর্ণনা করেছেন একথা প্রাচীন কাল থেকে স্বীকৃত। অতএব বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা একই ঈশ্বরের বন্দনা মাত্র। এইজন্য গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে আমাতেই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে মুক্তি দেব।'

পরবর্তীকালে দশম শতকে বৈষ্ণব সাহিত্যে ঈশ্বরের কৃপা ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের চিন্তা এবং প্রেম ভক্তির ধারণাকে জোরদার করেছিল। ভগবত পুরাণ ও দ্বাদশ শতকের জয়দেবের গীতিগোবিন্দ পাঠে জানা যায় ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রেম ভক্তকে মনে নানা অনুভূতির মধ্য দিয়ে নিষ্কাম ভক্তিধর্মের পথে নিয়ে যায়। মধ্যযুগের ভক্তি সাধকরা যে সাধনা ও পন্থার নির্দেশ করেছেন তার বক্তব্যগুলি হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে বৌদ্ধ ও জৈনরা বর্ণবৈষম্য অগ্রাহ্য করারও আঞ্চলিক ও মাতৃভাষায় ধর্মোপদেশ প্রচারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। লোকায়ত্ত ধর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঐতিহ্যের এ বিষয়ে অবদান ছিল। ভক্তিধর্মের সাধকদের গুরুত্ব ছিল সমাধিক তাঁরা সর্বসাধারণের কাছে ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ ও নিষ্কাম প্রেমেরও জ্বলন্ত ভক্তির উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। মধ্যযুগে যখন ধর্মীয় জীবনে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তখন ভক্তিধর্মের এইসব সাধক তাঁদের জীবন ও সাধনার মারফতে জনসাধারণের মধ্যে ভক্তিধর্মের জোয়ার এনেছিলেন।

ভক্তিধর্মের উপর ইসলামের বিশেষতঃ সুফীদের প্রভাব সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব চিন্তার প্রভাব হিন্দুধর্মকে ত্রয়োদশ শতক থেকে প্রভাবিত করে বলে

www.pathagar.com

অনেকে অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব চিন্তা ইসলামের অনুসরণকারীদের প্রতিই প্রযোজ্য এবং বিধর্মী বা কাফেরদের নয়।* এক্ষেত্রে ভক্তিধর্মের উপর ইসলামের সরাসরি কোন প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ ইসলামের গোঁড়া সমর্থক বা হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলরা ভক্তি আন্দোলনের উদারতাকে প্রভাবিত করতে পারেন নি। কিন্তু সুফী সাধকদের সাধন প্রণালী ও মতবাদ দ্বারা মধ্যযুগের সন্তরা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা এসম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। সুফী সাধনার প্রভাব সম্ভবত উত্তর ভারতে ভক্তিধর্মের উপর পড়েছিল এবিষয়ে, অনেকে নিঃসন্দেহ। সুফী সাধকবৃন্দ হিন্দুস্তানে যথেষ্ট সমাদরে ছিলেন এবং তাঁদের আচার-আচরণ, ও উদার মনোভাব জনগণের মনে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। এইজন্য ইসলাম ধর্মের প্রসার সহজ হয়েছিল। সুফী সাধকরা নিম্নবর্গের মানুষের কাছাকাছি ছিলেন। সুফীদের খানকাহগুলিতে দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর মানুষরা ও অন্যান্যরা জাতি-ধর্মনির্বিশেষে বিনাব্যয়ে আহার ও আশ্রয় লাভ করত। সুলতান জালালউদ্দীন খলজীর আমলে সিদি মোল্লা নামে একজন সুফীর খানকাহে বহুলোক দৈনিক বিনাব্যয়ে আহার গ্রহণ করিতেন এবং দরিদ্র থেকে আমির সকলের যাতায়াত ছিল। এইজন্য সুলতান এই খানকাহ্ বলবনের উত্তরাধিকারীদের পুনরায় ক্ষমতা দখলের জন্য ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র বলে সন্দেহ করেছিলেন।

সুফী জীবনচর্চার সঙ্গে ভক্তিধর্মের সাধকদের অন্যান্য অনেক বিষয়ে মিল ছিল। সুফীদের সমবেত প্রার্থনা সংগীত ভক্তিধর্মের সংগীতকে প্রভাবিত করেছিল। সুফী ও ভক্তিধর্মের সাধক উভয়েই প্রাণায়ম, পীর বা গুরুকরণ, অন্যধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি সহনশীলতা এবং প্রেম ও ভক্তির মারফতে পরমাত্মার প্রাপ্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এইজন্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, "It has been pointed out that not only in ideology, but also in the poetic representation of the same, there is a general similarity between the poetry of medieval saints and Sufi poets on the one hand and the Buddhist sahajiyas on the other. It is therefore argued that medieval mysticism is a product of the reaction of Sufism agaist the Sahajiya background."**

স্মরণ রাখা প্রয়োজন অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও সুফী মতবাদ এবং ভক্তিধর্মের প্রচারকদের মধ্যে সৌসাদৃশ্য আছে। সুফী সাধুদের বাণী যেমন রক্ষণশীল ইসলামী গোঁড়ামীর সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল, ভক্তিধর্মের উৎসও ছিল রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন। ডঃ ক্ষেত্রগুপ্তর ভাষায় বলা যায়, "এদেশে ভক্তিবাদী আন্দোলন প্রায়ই জন্মকালে শাস্ত্রীয় ধর্মানুশীলনের কঠোরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মতো। হিন্দু ধর্মশাসিত এবং ব্রাহ্মণ্য নিয়ন্ত্রিত ধর্মের বিধিবিধানের বিরুদ্ধে মধ্যযুগে-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ভারতের ভক্তি আন্দোলন বিচিত্র রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করে। কোথাও কোথাও এই প্রতিবাদী আন্দোলনের উদ্ভব অন্ত্যজ শ্রেণীগুলির মধ্য থেকে।"***

ভক্তি আন্দোলন ও ইসলামী সুফীসাধনা ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানদের খুবই স্বল্পসংখ্যকের উপর তাঁদের প্রভাব পড়েছিল এবং কোন আন্দোলনই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই দুইটি আন্দোলন সমান্তরালভাবে চলেছিল এবং তাদের মধ্যে মেলবন্ধনের প্রচেষ্টারও অভাব হয়নি। কিন্তু ইসলামী সুফী আন্দোলন ও ভক্তিধর্মের মধ্যে আন্তরিক কোন গভীর আত্মীয়তার

---

* It would be idle to pretend, therefore, that the equality or brotherhood of Islam could have any effect than a willing conversion to the faith in order to escape the rigorous distinction of Hindu society and religion--Dr R. C. Majumdar (Delhi Sultanahe, Bharatiya, Bhevaan).

** Delhi Sultanate পৃঃ-৫৫৪।

*** সেকালের চৈতন্য, একালের চৈতন্য- পৃঃ ৯৬, ঐ পৃঃ ৫৮।

www.pathagar.com

আকর্ষণ না থাকলেও, পরবর্তীকালে এদের সম্পর্ক সহজ ছিল। ফলে ফকির-বাউলদের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে চৈতন্য স্বয়ং পরমতত্ত্বরূপে গৃহীত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক রমিলা থাপারের মতে "যদিও সূফীমতবাদ আগেকার ভক্তিমতবাদেরই আরেক রূপ ছিল, ভক্তিমতবাদকে সূফীরা নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল।" *

চৈতন্যের সঙ্গে সূফীসাধনার কোন যোগ ছিল এধরণের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু চৈতন্য নিজেকে বাউল বলে পরিচয় দিয়েছেন। এইসূত্রে চৈতন্য চরিতামৃতে তাঁর উক্তি স্মরণীয়

দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি মহা বাউল নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিনু গমন।

চৈতন্যের সঙ্গীত প্রীতি এবং বাউল সাধনায় সংগীতের গুরুত্ব সূফী সাধনার সঙ্গে তাদের যোগসূত্রের ফলশ্রুতি বলে অনেকে অনুমান করেন। নানকের সংগীতপ্রীতি সুবিদিত। কবীর ছিলেন জোলা এবং সাধারণের ভাষায় তাঁদের মনের কথা বলতেন। কবির সম্পর্কে উল্লিখিত আছে :

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ
প্রগট কিয়া কীবরনে সপ্তদ্বীপ নবখন্ড।**

নানক সূফীসাধনার সঙ্গে স্বদেশে ও বিদেশে পরিচিত হয়েছিলেন। বর্ণাশ্রম ধর্মী হিন্দু সমাজ তুর্কী আক্রমণের পর আরো রক্ষণশীল হয়ে পড়েছিল। হিন্দু সমাজের উচ্চকোটির লোকেরা যখন শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য ও সহযোগিতায় আগ্রহ প্রদর্শন করে নিশ্চিত জীবন যাত্রা লাভ করতে ব্যগ্র সেইসময় আবার তাঁরা অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি রক্তচক্ষু এবং তাদের শোষণে অগ্রণী।*** অধিকাংশ ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রবক্তরা এই অন্ত্যজশ্রেণীর মধ্যে জাগরণের জোয়ার আনবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ভক্তিধর্মের প্রসার

ইসলামের আগমনের প্রভাব হিন্দুস্তানের চিন্তাধারার উপর প্রভাব ফেলেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দু ধর্মের প্রধান দুই গোষ্ঠী ছিল শৈব ও বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ধর্মের দুই প্রধান প্রচারক রামানন্দ ও বল্লভ। উত্তর ভারতের বৈষ্ণবদের উপর এই দুইজনের প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু ভক্তিধর্মের উৎপত্তি কেবলমাত্র ইসলামের প্রভাবে সম্ভব হয়েছিল একথা বলা যায় না। কারণ খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে কৃষ্ণ ও রামকে কেন্দ্র করে যে ভক্তিধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল ভাগবত গীতা মারফতে তার প্রসার হয়। অতএব ভক্তিধর্মের সংগে ইসলামী ধ্যান ধারণার যা কিছু সংযোগ ও তার ফলাফলের জন্য পরবর্তীকালের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। হিন্দুদের ধর্মীয় গোষ্ঠীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতবাদ থাকা সত্ত্বেও তাদের বক্তব্য ছিল মূলতঃ এক। দক্ষিণ ভারতে ভক্তিধর্মের প্রাচীনকাল থেকেই অস্তিত্ব ছিল। মধ্যযুগের ভক্তি ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন রামানন্দ।

রামানন্দ

মধ্যযুগের নবভক্তি আন্দোলন উত্তর ও দক্ষিণে সমান্তরালভাবে হয়। এই ভক্তি আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা ছিলেন রামানন্দ। এছাড়া তেলেগু ব্রাহ্মণ নিম্বারক ত্রয়োদশ শতকে বারানসীর

---

* রমিলা থাপার, ভারত বর্ষের ইতিহাস (ওরিয়েন্ট লংম্যান লিঃ) পৃঃ ২৩২।

** শ্রীচৈতন্য একালে দৃষ্টিকোণ : ভক্তি ভাবনার ত্রিধারা-বিজিত কুমার দত্ত পৃঃ ৫৮-৫৯।

*** W.H. Moreland-এর এইজন্য তিনটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন—শাসকগোষ্ঠী, এতকাল যাঁরা দেশ শাসন করতেন অর্থাৎ উচ্চকোটির হিন্দুরা এবং কৃষক। Agrarian System of Moslem India পৃঃ ৩২, মোরল্যান্ডের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে আমরা শহুরে কারিগরদের নাম যোগ করতে পারি।

www.pathagar.com

উপকণ্ঠে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণের ভজন সংগীত করে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। দক্ষিণ ভারতের ধর্মীয় শিক্ষাগুরুর মধ্যে বল্লভাচার্যের (১৪৭৯-১৫৩১) নাম উল্লেখযোগ্য। বল্লভাচার্য কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তেলেগু। গুজরাতে ও রাজস্থানে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

কিন্তু প্রধানত রামানন্দকে উত্তর ভারতে ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা বলে গণ্য করা হয়। রামানন্দ ছিলেন দক্ষিণ ভারতে ভক্তিধর্মের প্রবর্তক রামানুজের শিষ্য। দাক্ষিণাত্যে ভক্তি আন্দোলন রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের ক্রমবর্ধমান শুষ্ক আচার বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীরূপে দেখা দিয়েছিল। এই আন্দোলনের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল বেদান্তের বুদ্ধিজীবী চিন্তাধারার প্রাধান্যের বিরুদ্ধে হৃদয়ের ভাবোচ্ছাস ও ভক্তির প্রকাশ। রামানন্দের আবির্ভাব ও প্রয়ানের তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু যেহেতু রামানন্দের শিষ্য ও স্বভাবত সমসাময়িক ছিলেন কবীর সেইজন্য পূর্বোক্ত ভক্তিধর্মের প্রবক্তা চতুর্দশ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং ভক্তি ধর্মের প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়। কারণ সেকেন্দার লোদীর রাজত্বকালে (১৪৮৯-১৫১৭) কবীরের আবির্ভাব হয়েছিল। রামানন্দ উত্তরভারতে শিক্ষালাভ করেন। বেনারসে ও প্রয়াগে শিক্ষালাভ করে তিনি ভারতের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করেছিলেন। সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়েছিল। তিনি রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু রামানুজের শিক্ষা ও দর্শন তিনি আরো প্রসারিত করেছিলেন।

বিভিন্ন জাতির ও বর্ণের যে সব শিষ্য তাঁর ছিল তাদের মধ্যে রামানন্দ উচ্চ ও নীচ জাতির কোন ভেদাভেদ করেন নাই এবং ব্রাহ্মণ ও শূদ্র শিষ্যদের কোন পার্থক্য রামানন্দের কাছে ছিল না। রামানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মণ কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের অনুগামী কোন শূদ্রের সঙ্গে অন্নগ্রহণে তাঁর আপত্তি ছিল না। রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে শূদ্ররাও ছিলেন। তাঁর প্রধান বারোজন শিষ্য ছিলেন আশানন্দ, সুরানন্দ, সুখানন্দ, পরমানন্দ, মহানন্দ, পীপা (এক রাজপুত রাজ্যের শাসক), কবীর (জোলা), ভবানন্দ, সেনা (একজন নাপিত), ধামা (জাট কৃষক) শ্রী অনন্দ এবং রবিদাস (মুচি)। যদিও ইতিপূর্বেকার বৈষ্ণবরা অন্ত্যজদের সম্পর্কে সর্বদা সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন তাসত্ত্বেও অন্ত্যজদের তাঁরা সমদৃষ্টিতে দেখেন নাই। রামানন্দ তাঁর শিক্ষায় এই বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়েছিলেন। রামানন্দ মহিলাদেরও তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। এইভাবে নারী ও পুরুষ উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ সকলের প্রতি রামানন্দের সমদৃষ্টি প্রমাণিত হয়। রাধা-কৃষ্ণের স্থলে তিনি রাম-সীতার আরাধনা ও ভজন প্রবর্তন করেন এবং সর্বজীবের প্রতি করুণা ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রচার তিনি করেছিলেন। মাতৃভাষায় ধর্মপ্রচার ও সংস্কৃতের পরিবর্তে মাতৃভাষার ব্যবহারে রামানন্দ পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন—"Ramananda may be said to have begun what is known as the religious renaissance in Medieval India"* রামানন্দ হিন্দিতে ভক্তিধর্মের প্রচার করেন। ফলে বৈষ্ণবধর্ম সহজে জনগণের বোধগম্য হয় ও প্রসারিত হয় এবং হিন্দি সাহিত্যের বিকাশ হয়। শূদ্র ও নিম্নবর্ণের সকল শ্রেণীর মধ্যে এই শিক্ষা প্রসারিত হয়েছিল। সকল শিষ্যের মধ্যে সমব্যবহার করার জন্য রামানন্দের বৈষ্ণবধর্ম ও শিক্ষার ফলশ্রুতিতে অবশেষে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও পারিবারিক জীবন পবিত্র বলে গণ্য হয়। রামানন্দ জাতিবর্ণের বিভক্ত সমাজের উচ্চ নীচ বর্ণভেদ চিন্তা দূর করেননি কিন্তু বর্ণভেদের কড়াকড়ি হ্রাস পেয়েছিল এবং শূদ্র ও ব্রাহ্মণ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুধ হয়ে

* The Delhi Sultanate (Bharaatiya Vidhya Bhavan) পৃঃ-৫৬০।

www.pathagar.com

কাজ করতে শিখেছিল। অতএব সামাজিক সাম্য স্থাপন করলেও বর্ণ-বিভক্ত সমাজের ভেদবুদ্ধি তিনি অনেকটা দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার

বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিক জীবনকে প্রধানত দুইটি পৃথক ধর্মীয় চিন্তাধারা প্রভাবিত করেছিল। একটি ধারায় প্রবাহিত ছিল এদেশের বৈষ্ণব ঐতিহ্য ও ধর্মীয় চিন্তা। অপরদিকে যে ধর্মীয় চিন্তা বাঙালীর মানসকে প্রভাবিত করেছিল তার মধ্যে ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মে বৈষ্ণব ধারা বহির্ভূত আধ্যাত্মিক সাধনা ও আরাধনা। বৈষ্ণব ধর্মের অনুপ্রেরণার প্রধান সূত্র হল ভাগবত পুরাণ যার মধ্যে থেকে এসেছিল কৃষ্ণ লীলা সম্পর্কে গুণ কীর্তন ও ভক্তি। পাল রাজাদের শাসনকালে এর সূত্রপাত হয় এবং জয়দেবের ভক্তি রসাপ্লুতগীতগোবিন্দে দ্বাদশ শতকে এর পরিণত দেখা যায়। ভাগবত পুরাণের বহির্ভূত অন্য একটি সূত্র গীতগোবিন্দ বঙ্গদেশের বৈষ্ণবধর্মকে প্রভাবিত করেছিল। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণের একান্ত প্রেমাস্পদ রাধার ভূমিকার গুরুত্ব বর্ণনা করে জয়দেব কৃষ্ণ-লীলার সঙ্গে অন্য একটি মাত্রা যোগ করেছিলেন। এই সময় থেকে বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনে রাধা-কৃষ্ণ প্রেম প্রধানত মুখ্য আকর্ষণ রূপে দেখা দিয়েছিল। কারণ প্রত্যেক বৈষ্ণব ভক্তের সাধনার প্রধান লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিকতার চরমপ্রাপ্তি হিসাবে এই অপ্রাকৃতলীলার অংশীদার হওয়া।

বৈষ্ণব ভক্তিবাদের বহির্ভূত ধর্মীয় ধারার ও প্রভাবের দুইটি উৎস ছিল যারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত। এই দুইটি ধারার একটি ছিল বৌদ্ধধর্মের যার প্রভাব পালযুগ পর্যন্ত দেখা যায় এবং পাল রাজত্বের অবসানের পর যার অবক্ষয় শুরু হয়। বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের যুগে বৌদ্ধ সহজিয়ারা তাদের দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যবাদী ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা ও কঠোর নিয়মকানুনের পাশ থেকে মুক্তি লাভের জন্য সমাজের অনেক নিম্নস্তরের মানুষ সহজিয়াদের দুর্জ্ঞেয় মতবাদ অনুসরণ করেছিল। পরবর্তীকালে নিত্যানন্দ গোস্বামীর পুত্র বীরভদ্র খেতুরীর উৎসবে 'নেড়ানেড়ী' নামে পরিচিত সহজিয়াদের বৈষ্ণব সমাজে স্থান দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক তরফদারের মতে তান্ত্রিক যোগী এবং বৌদ্ধ সহজিয়ারা অথবা নাথপন্থীরা মুসলমান সমাজেও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন এবং অনুগামীর সংখ্যাবৃদ্ধি করেছিলেন। বৈষ্ণব সহজিয়ারা তাঁদের বিচিত্র আচারআচরণ গোপনে পালন করত। মহায়ান বৌদ্ধমতের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সহজিয়া রহস্যবাদের সৃষ্টি হয়। তারা কঠোর মহায়ান আধ্যাত্মিক নিয়ম শৃংখলার বিরোধী ছিল ও প্রাকৃতিক কারণে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দিয়েছিল। ফলে ইন্দ্রিয় সংযম নহে বরং ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিকে সাধন মার্গের সহজ পথ বলে মনে করত।*

রক্ষণশীল ও উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে স্মৃতিশাস্ত্রের কঠোর নিয়মাবলী সমাজের নিম্নবর্ণের সঙ্গে উচ্চবর্ণের ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। তুর্কী বিজয়ের পর উচ্চবর্ণের লোকেরা শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল এবং সহজেই প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। এই সব উচ্চবর্ণের লোকেরা শাসকগোষ্ঠীর কাছে নতশীর হলেও অন্ত্যজদের প্রতি রক্তচক্ষু ছিল। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বর্ণাশ্রয়ী ব্যবস্থার কঠোরতা নিম্নশ্রেণীর কাছে অসহ্য হয়ে পড়েছিল এবং সূফীদের প্রভাব ধর্মান্তকরণ সহজ হয়েছিল। অপরদিকে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে মনসা, চণ্ডী, গোরক্ষনাথের পূজা ও নাথযোগীদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৈষ্ণবদের প্রভাব ও কৃষ্ণ-লীলা এবং কৃষ্ণভক্তির প্রভাব ভক্তিআন্দোলনকে প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবে জোরদার করেছিল। বঙ্গদেশে চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণবধর্ম ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়েছিল।

---

* Husain Shahi Bengal -M.K. Tarafdar পৃঃ-১৫, ১৭৭-১৭৯, ১৮৩।

www.pathagar.com

প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্য যুগের বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব

সেনবংশের রাজত্বকাল থেকে বৈষ্ণবধর্ম বঙ্গদেশে রাজসভাকেও প্রভাবিত করেছিল। জয়দেব রচিত রাধা-কৃষ্ণ লীলা কাহিনী 'গীত-গোবিন্দ' এই যুগে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। জয়দেব সেনরাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। কেবলমাত্র জয়দেব নয় লক্ষ্মণসেনের রাজসভার অন্যতম কবি উমাপতি ধর কাব্যে এবং স্বয়ং সম্ভবতঃ রাজা লক্ষ্মণসেনের লেখা বলে অনুমান করা হয় এরূপ কাব্যে রাধাকৃষ্ণের নাম উল্লেখিত আছে। কিন্তু মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের লেখক বড়ু চণ্ডীদাস বা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। * চণ্ডীদাসের এই গীতি কাব্যে বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের রচনার সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে একথা সকলেই জানেন যে শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) স্বয়ং চণ্ডীদাসের গীত শ্রবণের বা কাব্যপাঠের পক্ষপাতী ছিলেন। অতএব মনে হয় কবি তাঁর সমকালীন বা পূর্বসূরী ছিলেন এবং এই কারণে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে, চণ্ডীদাসের আর্বিভাবের কাল সম্ভবতঃ ছিল ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

বাংলাসাহিত্যে চন্ডিদাস—সমস্যার জটিলতা দেখা দেওয়ার, কারণ মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা 'বড়ু', 'দ্বিজ' এবং 'দীন' এই তিনজন চণ্ডীদাসের সন্ধান পাই এবং উপাধির ভিন্নতায় এঁদের পৃথক অস্তিত্বের সূত্র পাওয়া যায়। এই তিনজনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের লেখায় বড়ু চণ্ডীদাস বা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসই ছিলেন চৈতন্যদেবের সমকালীন অথবা পূর্বসূরী এবং ১৪৫০ বা এমন কি ১৪০০ সালে আর্বিভূত হয়েছিলেন। বর্তমানে রাধাকৃষ্ণ লীলা সংক্রান্ত প্রায় ১২০০ চণ্ডীদাসের গীতকাব্য সংগৃহীত হয়েছে এবং তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন-সহ আর মাত্র বিশ-পঁচিশটি গীতিকাব্য বড়ু চণ্ডীদাস রচিত বলে অনুমান করা হয়। চণ্ডীদাসের লেখায় পাওয়া যায় চর্যারীতির প্রাকৃত ছন্দ ও লৌকিকরীতির সমন্বয় গঠিত সাধুরীতির নির্দশন এবং অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের মতে 'সেই সময় থেকে এই সাধুরীতিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ নিদর্শন।'

গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেবের সমসাময়িক লেখক বড়ু চণ্ডীদাস নানাভাবে পূর্বোক্ত কবির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ও গীতগোবিন্দের মধ্যে রচনায় ও গঠনে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের কাব্য ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নানা পদের তুলনা করলে দেখা যায়, বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অনেকের কাছে সেকেলে ও আদিম কাব্যরসের নমুনা হিসাবে প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে গীতিকাব্যের ছন্দ, সুর ও সংগীতের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। বাংলার ভক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের মারফতে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মধুর ছন্দে উপযুক্ত প্রেক্ষাপটের সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল।

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে মৈথিলী ভাষায় কাব্যরচনা করলেও তাঁরা রাধাকৃষ্ণের সম্পর্কে লেখা কাব্য বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ভাবধারার অঙ্গ বলে গণ্য হয়। বিদ্যাপতির লেখা প্রায় একহাজার গীতিকাব্য সংগৃহীত হয়েছে। চণ্ডীদাসের কাব্যের বিষয়ের সঙ্গে এই সব কাব্যের বিশেষ পার্থক্য নাই, কিন্তু বিদ্যাপতি ঠাকুর তার উচমার্গের চিন্তা ও মার্জিত ভাষায় ধ্রুপদী দর্শনকে প্রকাশিত করেছিলেন। বিদ্যাপতির কাব্য কেবলমাত্র মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি বাংলাদেশে বৈষ্ণবদের মধ্যে তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য জনপ্রিয় ছিল এবং বঙ্গদেশে

* বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য পৃঃ ২২। হলয়ুধ মিশ্রের শেখ শুভোদয়া (ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত) সম্ভবতঃ ১৪শ বা ১৫শ শতকে লিখিত হয়। এই গ্রন্থে কতকগুলি চলতি জনপ্রিয় কাহিনীর সংকলন পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ও শ্রীরামচণ্ডী নমঃ একই সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে, পৃঃ ১৩১।

www.pathagar.com

সাধারণের মন ও প্রাণকে ভাবাবেগে আপ্লুত করেছিল। বিদ্যাপতির শিব ও দেবী সংক্রান্ত কবিতা মৈথীলিভায়ায় এখনও জনপ্রিয় সংগীত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কাছে কবির আত্মসমর্পণ একান্তভাবে বৈষ্ণবভক্তের প্রাণের কথা বলে গণ্য করা হয়। বিদ্যাপতির আকুতি 'মাধব বহুত মিনতি করে তোয়, দেয়ি তুলসীতিল দেহ-সমির্পিনু দয়া জনু ন ছোড়বী মোয়"। বৈষ্ণবজনের আবেগকে ভাষা দিয়েছি।

শ্রীচৈতন্য

বৈষ্ণব ধর্মের সকল মতের সমন্বয় সাধনের প্রতীক রূপে যাঁর তিমির বিদারী উদার অভ্যুদয়ের ফলশ্রুতিতে বাংলা তথা ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারিত হয়েছিল সেই শ্রীচৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীঃ) নদীয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর অনন্য অবদানের প্রত্যক্ষ ফলে শুধুমাত্র বাংলা ও উড়িষ্যা নয় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষত পূর্ব ভারতে গৌড়িয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারিত হয়। শ্রীচৈতন্যের প্রেম ও ভক্তির বানী তৎকালীন তুর্কী-পাঠান রাজত্বকালের শেষার্ধে ও প্রাক-মুঘল শাসনের আমলে স্মার্ত্তব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের সকল অবহেলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রেম ও ভালবাসা বিতরণ করেন। তিনি সমাজে বর্ণবৈষম্য সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করেন নাই। কিন্তু জাত-পাতের বিচারকে শ্রীচৈতন্য অস্বীকার করে পংতি ভোজনে সকল বর্ণের ও জাতির লোকেদের উৎসাহিত করেছিলেন। *

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য-সমাজে নানা কঠোর বিধির দ্বারা স্মৃতি ও শাস্ত্রের নিয়ম কানুন চালু ছিল। অপরদিকে লৌকিক ধর্ম সাধারণের মধ্যে মনসা পূজা, চন্ডীর আরাধনা ধর্মপূজার মারফতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। অতএব সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেরা অন্ত্যজ ও নিম্নবর্ণের প্রতি রক্তচক্ষু ছিলেন এবং লৌকিক ধর্মের প্রভাব থেকে প্রাচীন ধর্মীয় কাঠামোকে জাতপাতের বেড়াজাল দিয়ে রক্ষা করতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। ব্রাহ্মণরা অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যাচর্চায় সময় অতিবাহিত করতেন এবং নব্য ন্যায়ের ন্যায় দুর্বোধ বিষয়ের চর্চায় তাঁদের চিন্তাধারাকে পরিচালনা করে নিম্নবর্গের মানুষের ভাবনা চিন্তা থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখতেন। ফলে সমাজের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের ও লৌকিক ধর্মের এবং সহজিয়া সাধনার প্রভাব প্রসারিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য বুদ্ধিজীবীদের নিরস শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষা প্রেমভক্তির ধর্মকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় শক্তি ও তন্ত্রের সাধনা প্রসার লাভ করেছিল। গীতা ও ভাগবতের ন্যায় গ্রন্থ পাঠ বা বিষ্ণু ও কৃষ্ণের নাম স্মরণ করা অপেক্ষা লৌকিক দেব-দেবীর পূজা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে প্রাক্-চৈতন্যযুগে 'দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গ ও উড়িষ্যার এক অতিশয় নৈতিক দুর্গতির দিন উপস্থিত হয়েছিল।' এর কারণ হিসাবে বলা যায় সমাজের উচ্চকোটির মানুষদের মধ্যে এমনকি রাজসভাতে ও ধর্মের ধ্বজাধারীদের মধ্যেও বিলাসলালসাময় এক মদির মধুরভাবের প্রভাব প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এই নৈতিক অবক্ষয় সাধারণ মানুষ গ্রস্থে প্রভাবিত করেছিল। উচ্চ থেকে নিম্নস্তরের সকলকে এই অধঃপতন ও রুচিবিকার থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এবং ভক্তিধর্মের নির্মলধারায় তাদের সিঞ্চিত করার জন্য শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম সমাজকে এক নতুন ভাবধারায় আপ্লুত করেছিল যার প্রভাবে সংস্কৃত ও মাতৃভাষা এবং সাহিত্যে নবজীবনের সঞ্চার হয়।

প্রাক্-চৈতন্য যুগে বঙ্গদেশে যে সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বর্ণাশ্রম বিভক্ত হিন্দু সমাজে উচ্চবর্ণ ও অন্ত্যজ এবং নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য নানা মত ও পথের

---

* কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত (দেবসাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ) পৃঃ ২৮২-২৮৩।

www.pathagar.com

জটিলতা দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। এই কারণে সামাজিক ও ধর্মীয়ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনার দাবি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছিল। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন ব্রাহ্মণ্যরক্ষণশীল কঠোর স্মার্তশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং সকল বাধা অতিক্রম করে সমাজকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত হতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

তুর্কী বিজয় এদেশের স্মৃতিশাস্ত্র নির্দেশিত উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ বিভক্ত বর্ণাশ্রম আশ্রিত হিন্দু সমাজের কাঠামোতে ও চিন্তাধারায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সূফী ও সহজিয়া মতবাদের ফলে জাতপাত কণ্টকিত সমাজ থেকে অন্ত্যজ ও সমাজের উৎপীড়িত অংশের উপর ইসলামী প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল ও অনেকে এই ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তার বিধি বন্ধন একদিকে কঠোর করেছিল, অপরদিকে নিম্নবর্গের মধ্যে প্রচলিত কিছু কিছু দেব-দেবীর পূজা অর্চনাকে স্বীকৃতি দান করেছিল। শ্রীচৈতন্যের সমকালীন নবদ্বীপে মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, বাশুলী প্রভৃতির আরাধনার কথা বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লিখিত আছে। এই ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে শ্রীচৈতন্য বর্ণ বিভক্ত সমাজকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি অস্বীকার করেছিলেন। চৈতন্যের মতে হরিভক্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের মাপকাঠি। কাজেই 'হরিভক্তপরায়ণ চণ্ডাল হরিভক্তিহীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' যবন হরিদাসকে তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে সমান্তরালভাবে তৎকালীন সমাজে সচলতা আনার উদাহরণ দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে ভক্তি আন্দোলন উৎপীড়িত জনমানসে আলোড়ন এনেছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অন্ত্যজরা ও নিম্নবর্গের মুক্তির পথ-নির্দেশ লাভ করেন। যারা স্মার্ত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ ধর্ম বাংলাদেশে কঠোর বিধিবিধানের ব্যাবধানে যেসব আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে অবহেলিতদের পশ্চাতে ফেলে রেখেছিল। চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের বন্যায় যে সামাজিক সচলতার সৃষ্টি হয় তার ফলে প্রেমভক্তির জোয়ারে সহজে তাঁরা বিভক্ত সমাজে গুরুত্ব লাভে সক্ষম হয়েছিল এবং পূর্বেকার বর্ণাশ্রিত সমাজের বন্ধনভেদ করে মর্যাদা লাভ করেছিল।

প্রাক-চৈতন্য যুগে বিধর্মীর হস্তে জল গ্রহণ করলে তাকে জাতিচ্যুত করা হত। স্মৃতিশাস্ত্র শাসিত সমাজে যেখানে ব্রাহ্মণরাই স্তর বিন্যাসে শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন সেখানে এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার কোন ক্ষমা ছিল না। অনিচ্ছাকৃত বা এমনকি জোর জবরদস্তির দরুণ কোন ব্যক্তি যবন বা বিধর্মীর খাদ্য ও জল গ্রহণে বাধ্য হলে তাকে জাতিচ্যুত বলে গণ্য করা হত। হুসেন শাহ তাঁর বেগমের কথায় পূর্বতন প্রভু সুবুদ্ধি রায়কে জোর করে 'করোয়ার পানি' (বা ফকিরে বদনার জল) পানে বাধ্য করেছিলেন কারণ সুবুদ্ধি রায় একসময় মালিক হিসাবে হুসেন শাহকে বেত্রাঘাতে শাস্তি দিয়েছিলেন। স্মার্ত পণ্ডিত সমাজ প্রায়শ্চিত্তির বিধানের রায়কে তপ্ত ঘৃতপানে প্রাণত্যাগ করতে নির্দেশ দান করেছিল। শ্রীচৈতন্যের স্মরণাপন্ন হলে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করতে কারণ 'এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে* কেবল এই ধরণের জাতিচ্যুতির ঘটনা নয় ধর্মপালনে বাধা দানের বিরুদ্ধে শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্তনের মারফতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন। চাঁদ কাজী সংকীর্তন নিষেধের হুকুম জারি করেন। শ্রীচৈতন্য পরিচালিত কীর্তনীয়ারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কাজীকে ধর্মপালনের স্বাধীনতাতে স্বীকৃতি দান করতে বাধ্য করেছিলেন। চৈতন্যের প্রেমধর্ম সর্বধর্মের মানুষকে হিন্দু, মুসলমান, চণ্ডাল সকলকে ভক্তিআন্দোলনের সামিল করেছিল। সমান্ততান্ত্রিক সমাজে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা শাসকগোষ্ঠীর কাছাকাছি ছিল সেই স্বার্থানুসন্ধানীরা ভক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল।**

---

* শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত-কৃষ্ণদাস গোস্বামী-(দেব সাহিত্য কুটীর), পৃঃ ৪৬৬।

** অতএব বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্যের উক্তিতে বলা হয়েছে "চণ্ডাল, চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে বিপ্র বিপ্র নহে, যদি অসৎ পথে চলে।"

www.pathagar.com

বর্ণ বিভক্ত হিন্দু সমাজে হরিদাস রামদাস প্রভৃতি যারা কৃষ্ণপ্রেমে আকুল শ্রীচৈতন্য তাঁদের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দান করে সামাজিক সচলতা সৃষ্টি করেন। ভক্তি আন্দোলনের মূলে ছিল হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সাধনার অবদান। এই আন্দোলন শহরে বণিক ও কারিগরদের প্রভাবিত করেছিল। জি. বোনগার্ড লেভিনের মতে, 'পরবর্তী পর্যায়ে ভক্তি আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দের ভাব অনুভূত হয়। এই আন্দোলন সমাজের নিষ্পেশিত স্তরের (বিশেষত শহরের বণিক ও কারিগরদের) সামন্তশাসনের সম্পর্কে অসন্তোষ ও বিরোধিতা ধর্মীয় ও অতীন্দ্রবাদের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়েছিল।'* শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি কেন্দ্রিক আন্দোলন সর্বস্তরের মানুষের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-শূদ্র ও অন্ত্যজদের মুক্তির পথ নির্দেশক হয়ে সমাজকে শক্তিশীল করেছিল। এই সূত্রে ডাঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল মন্তব্য করেছেন যে, 'শ্রীচৈতন্যদেবের নেতৃত্বে বঙ্গদেশে যে ভক্তি আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তাতে সমাজের নিষ্পেশিত অংশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।... স্বভাবত গৌড়িয় বৈষ্ণববাদ সমাজের নিম্নস্তরে যে সব মানুষ ছিল বিশেষ করে যারা সামাজিক উন্নতি ও সচলতার প্রত্যাশা করত, তাদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল।'**

শ্রীচৈতন্য তার ভক্তিধর্ম আপমর চণ্ডাল সকলের কাছে প্রচার করেছিলেন। সুবুদ্ধি রায়কে তিনি 'নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর সংকীর্তন' বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। এইজন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে—স্ত্রী বালবৃন্দ আর চণ্ডাল যবন। যেই তোমার একবার পায় দরশন। কৃষ্ণনাম লয়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত। আচার্য হইল সেই তারিল।*** ভক্তি আন্দোলন সমাজের নিম্নস্তরের ও অবহেলিতদের মুক্তিজগৎ আন্দোলনে পরিণত হয়। খেতুড়ীর উৎসবে এইজন্য নৈড়ানেড়ীদের নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের প্রভাবে বিজাতীয় ক্ষত্রিয় সহজেই সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে বৈষ্ণব বলে স্বীকৃতি লাভ করে। সমাজের উর্ধ্বগতির সচলতা ভক্তিধর্মেরই অবদান। এর ফলে সমাজে স্তরান্তর ও ক্রমোচ্চ সচলতার সৃষ্টি হয়েছিল। চৈতন্যের শিষ্যদের মধ্যে অব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য অব্রাহ্মণ ভক্তরা গৌড়ীয় সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে স্থান লাভ করেছিলেন। নবশাখদের গোষ্ঠী ও সুবর্ণ বণিকেরা তিলি, মালী, তাম্বুল, বণিক, গোয়ালা, বারুই, কামার-কুমোর, গন্ধবণিকদের সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বণিক ও কারিগরদের বৈষ্ণবধর্মের এই কারণে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। এইসব বৈষ্ণব বণিকদের মধ্যে অনেকের বৃন্দাবনে গমনের তাৎপর্য কেবলমাত্র ধর্মীয় নয় তার বাণিজ্যিক গুরুত্বও ছিল। উত্তরাপথে বাণিজ্যপথের উপর বৃন্দাবনের অবস্থান বৈষ্ণব বণিক ও কারিগরদের আগ্রার মারফতে উত্তর ভারতের ও পশ্চিম এবং মধ্যএশিয়ার বাণিজ্যপণ্য ও উৎপাদন এবং উৎপাদিত শিল্পের সঙ্গে পরিচিত করেছিল। বহির্ভারতের সঙ্গে স্থলপথে বণিকগোষ্ঠীর যোগসূত্র বাংলার শিল্পোৎপাদনে ও বাণিজ্যে যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল তা ফলশ্রুতি সামাজিক সচলতার সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগই বঙ্গদেশের বণিকদের উত্তরভারতে যোগাযোগ স্থাপনের অন্যতম প্রধান কারণ। এই যোগসূত্র বাণিজ্যিক সফলতার বীজ উপ্ত করেছিল কিন্তু তাতে জল সিঞ্চিত হয়নি।****

---

* শ্রীচৈতন্য, জাতি, বর্ণ-ভেদ ও সামাজিক সচলতা-কাননবিহারী গোস্বামী (শ্রীচৈতন্য একালের দৃষ্টিকোণ)। শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত-কৃষ্ণদাস গোস্বামী (দেব সাহিত্য কুটীর) পৃঃ ১২৮-১২৯ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (১ম খণ্ড)-প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, মস্কো, পৃঃ ২২৫ (লেখক কর্তৃক বঙ্গানুবাদ)।

** Social Mobility in Bengal-Its Sources and Constraints, পৃঃ ৫৮-৫৯ (বঙ্গানুবাদ)।

*** কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী (দেবসাহিত্য কুটীর) পৃঃ ৩৩৩।

**** চৈতন্য, জাতি-বর্ণ-ভেদও সামাজিক সচলতা কানন বিহারী গোস্বামী (শ্রীচৈতন্য একালের দৃষ্টিকোণ)। এই বিষয়ে A Cultural History of India-তে (Ed. Basham) Jordozn-এর Hindu Devotionalism-এর উপর নিবন্ধ, পৃঃ ২৬৮ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

শ্রীচৈতন্য সমাজের অবহেলিত এবং নিষ্পেশিতদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করেছিলেন। ভক্তি আন্দোলন বর্ণাশ্রয়ী আচার-অনুষ্ঠান এবং কুসংস্কার ও পূজা অর্চনা কন্টকিত সমাজে প্রেমভক্তির বন্যায় প্রাণের সঞ্চার করেছিল। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যের পরধর্মসহিষ্ণু, উদার ও মানবিক প্রেমধর্ম প্রতিষ্ঠানিক গুরুত্ব লাভ করে। ফলে বৈষ্ণব মহান্তদের মধ্যে অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে অবজ্ঞার প্রবণতা দেখা যায়। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে মঠমন্দিরের মহান্তদের প্রতিপত্তি লাভের প্রচেষ্টা শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে নানা আবর্জনা বহন করে এনেছিল ফলে সামাজিক সচলতার স্রোত স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

মহারাষ্ট্র

বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কারকদের শিক্ষা ও কঠোর সাধনা মহারাষ্ট্রকে প্রভাবিত করেছিল। ত্রয়োদশ শতকের সাধক জ্ঞানেশ্বর ও জ্ঞানদেব (১২৭১-৯৬) মহারাষ্ট্রে সর্ব প্রথম ভক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। তিনি বারাকরী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায় গান্ধারপুরে বিটেবার (বিষ্ণুর) মন্দিরে তীর্থ যাত্রার ব্যবস্থা করতেন। জ্ঞানেশ্বরের সমকালীন ভক্তিধর্মের প্রচারক ছিলেন নামদেব (১২৭০-১৩৫০)। মাতৃভাষায় ধর্মপ্রচার ও জনগণের মধ্যে কীর্তনের ধরণের প্রার্থনার প্রবর্তনে যে পদ্ধতি জ্ঞানদেব সূত্রপাত করেছিলেন তার দ্বারা নামদেব ও আরো অনেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন। নামদেব নিজে ছিলেন একজন দর্জি এবং তাঁর সঙ্গীরা অনেকেই নিম্নবর্ণের থেকে এসেছিলেন। মহারাষ্ট্রের ভক্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ সকলেই জনগণকে জাতিবর্ণ কন্টকিত সমাজব্যবস্থা থেকে মুক্ত করতে আগ্রহী ছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল রাম ও রহিমে কোন পার্থক্য নাই। সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তুকারাম, রামদাস, একনাথ প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের পরবর্তী ভক্তি আন্দোলনের প্রচারকরা কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মের উচ্চশ্রেণীর কাছে নয় অন্ত্যজ ও নিম্নবর্গের মধ্যেও প্রেমভক্তির বাণী প্রচার করেন। নামদেব ও জ্ঞানদেব এবং তাঁদের অনুগামীরা বিটোবা বা বিষ্ণুকে ইষ্টদেব হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা গার্হস্থ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন ও সন্ন্যাস গ্রহণ সম্পর্কে অনীহা পোষণ করতেন। তাঁরা জাতিবর্ণবৈষম্যের বেড়াজাল ছিন্ন করে উচ্চ থেকে নিম্নবর্ণে ভেদাভেদ দূর করেছিলেন। মহারাষ্ট্রে এই প্রেমধর্ম আন্দোলন সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। নামদেব ঘোষণা করেছিলেন হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই অন্ধ কারণ তারা মন্দির ও মসজিদে ঈশ্বরের আরাধনা করতে চায় অথচ ঈশ্বর উপাসনার জন্য মন্দির মসজিদের প্রয়োজন নেই। পরবর্তী যুগে কবির, নানক, চৈতন্য, রাইদাস, দাদু সকলেই এই ধরণের উক্তি করেছিলেন।

একনাথ (১৫৩৩-৯১ খ্রীঃ) জ্ঞানেশ্বর কৃত ভাগবত গীতার পুনঃপ্রচার করেছিলেন এবং মারাঠী জনগণের মধ্যে রামায়ণ কথা প্রচার করেছিলেন। একনাথ ছিলেন গৃহী, পুঁথী রচনা ও গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করে তিনি জীবনযাপন করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁকে একজন অতীন্দ্রবাদী বলে সকলে স্বীকার করেন। তাঁর ভক্তি সঙ্গীত বা কীর্তন মারাঠী ঐতিহ্যের এক মূল্যবান সম্পদ।

তুকারাম (১৫৯৮-১৬৫০ খ্রীঃ) সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি কেবল মহারাষ্ট্রের নন সম্ভবতঃ সারা ভারতের মহান ভক্তি কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে একটি শস্য ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পারিবারিক দুর্ঘটনা তাঁকে বৈরাগ্যের ও ভক্তির পথের পথিকে পরিণত করেছিল। তুকারামের স্ত্রী ও পুত্রের দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে মৃত্যু তাঁর পক্ষে হৃদয় বিদারক হয়েছিল এবং এই সময় থেকে তুকারাম ভক্তিকাব্যকে তাঁর জীবনের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করেন। এই সব ভক্তি কাব্যমালা বারকারী তীর্থযাত্রীদের কাছে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল। দুঃখের পথের অন্তহীন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আত্মার আশাহীন যাত্রার একমাত্র ভরসা হল প্রেম।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগতভাবে প্রেমের মধ্য দিয়ে কখনও কখনও অনন্তের স্বরূপদর্শন বা উপলব্ধি আবার সর্বত্র তাঁর পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে কখনও কখনও অন্তর্দৃষ্টির বিষয়ে তুকারামের গীত ও কাব্যে অতীন্দ্র ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। সর্বসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় তুকারাম এইসব কাব্যে লিখেছিলেন। জনগণের জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও নিত্যকার কর্মকান্ড থেকে উপমা দিয়ে তুকারাম তাদের আত্মোপলব্ধির বিষয়ে সচেতন করেছিলেন এবং এই উপলব্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে ভক্তি মার্গের তীর্থযাত্রীতে পরিণত করেছিলেন। ফলে রক্ষণশীল মতবাদের হিন্দুত্বের জাঁকজমক ও কুসংস্কার থেকে দূরে সরে গিয়ে অতীন্দ্রবাদ ও প্রেমভক্তির পথ গ্রহণে সাধারণ মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

রামদাস (১৬০৮-৮৯ খ্রীঃ) বাল্যকালে মাতৃপিতৃহীন ছিলেন এবং গৃহত্যাগী হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। অবশেষে কৃষ্ণা নদীর তীরে আস্তানা গেড়ে স্থায়ী হয়েছিলেন এবং এইস্থানে একটি রামমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। রামদাসের অধিকাংশ উপদেশ ও লেখা তাঁর 'দশবোধ' নামে সংকলনে পাওয়া যায়। এই সংকলনে কেবলমাত্র ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচিত হয়নি, সমকালীন পরিস্থিতি এবং তুর্কী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্মণদের দুর্দশার কথাও আলোচিত হয়েছে। সাধক কবি রামদাস তাঁর শিষ্য শিবাজীর মারফতে মারাঠা নবজাগরণের বীজ বপন করেছিলেন। রামদাসের প্রেমভক্তি ধর্ম সক্রিয় কর্মের সাধনার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং তাঁর পূর্বসূরী গৃহী সাধকদের রামদাসের ন্যায় সমাজ ও রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে কোন চিন্তাভাবনা করতে দেখা যায় না। রামদাস ছিলেন রামভক্ত কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী মহারাষ্ট্রের ভক্তিধর্মের সাধকরা ছিলেন কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর পূজারী। এইসব মারাঠা সাধকরা কৃষ্ণ বা রামদাসের ন্যায় রামভক্ত হিসাবে অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা হিন্দুধর্মের নবজাগরণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন ও মারাঠী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিকে নিজস্ব সত্তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন এবং মহারাষ্ট্রে সামাজিক শক্তিকে সংহত করেছিলেন। তার ফলশ্রুতিতে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভবপর হয়েছিল। পরবর্তীযুগের মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি এই ঐতিহ্য থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল।

হিন্দী বলয়—রামানন্দ*

পঞ্চদশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে 'হিন্দী-বলয়' অর্থে সাধারণভাবে যা বোঝায় সেই অঞ্চলে রামানন্দের (১৩৬০-১৪৭০) প্রভাবে ভক্তি আন্দোলন এক নতুন মোড় নিয়েছিল। রামানন্দ সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতের রামানুজের শ্রীনিবাস সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিলেন। পরবর্তীকালে রামানন্দ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং বেনারস ও আগ্রায় কিছুকাল শিক্ষাদানে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিষ্ণু অবতার রাম ও তৎপত্নী সীতা দেবীর একান্ত সাধনাকে জীবনের লক্ষ্য বলে প্রচার করেছিলেন এবং পবননন্দন রামভক্ত হনুমানের আরাধনা করতেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় আধ্যাত্ম রামায়ণ রচনা করেন।

রামানন্দ জাতিবর্ণবিভক্ত সমাজের বিধি-নিষেধগুলির বিরোধী ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নানা জাতি ও ধর্মের লোক ছিলেন। এই সব শিষ্যদের মধ্যে একজন নারী, একজন অন্ত্যজ ও একজন মুসলমানের নাম পাওয়া যায়। জাতি ও ধর্মের ভেদাভেদ অস্বীকার করে সকলের প্রতি সম-ব্যবহার এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে স্বীয় বাণী প্রচার, রামানন্দের ভক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিল। সর্বসম্প্রদায় ও ধর্মের সমান নীতি ভারতে ইতিপূর্বেও সম্ভবতঃ ছিল। কিন্তু সমকালীন যুগে সুফীদের প্রভাব ইহাতে দেখা যায় বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ভারতের অন্যান্য বহু সম্প্রদায় বিশেষতঃ শিখ ও কবীরপন্থীরা রামানন্দের শিক্ষার থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন।

---

* পূর্ব্বেকার আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

কবীর (১৪৪০-১৫১৮ মতান্তরে ১৪২৫-১৫০৫ খ্রীঃ)* রামানন্দের শিষ্য ছিলেন কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর সকলের প্রতি সমভাব এক নতুন দৃষ্টিকোন থেকে ও ধারণার থেকে প্রচারিত হয়েছিল। সম্ভবত তিনি ছিলেন মুসলমান জোলা। আবার অনেকের মতে তিনি ছিলেন হিন্দু বিধবার সন্তান এবং মুসলমান জোলার ঘরে পালিত হয়েছিলেন। কবীর মনেপ্রাণে একজন সংস্কারক ছিলেন। তিনি কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের পবিত্র গ্রন্থ, তীর্থযাত্রা, আচার-আচরণ কুসংস্কার ও মূর্তিপূজা সমর্থন করেননি। কেবলমাত্র ধর্মীয় বিভেদ নয়, সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচার-আচরণ এবং বিভেদের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ কবীর বলেন যে, সমগ্র মানবজাতি একই সূত্রে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে কবীর ছিলেন উদার। সম্প্রদায় না হলে সাধনা সুরক্ষিত হয় না এ কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন না।** অতএব কবীর বলেছিলেন—

আরে ইন দুহু রাহ না পাই
হিন্দু কী হিন্দ্‌বাই দেখি তুর্কন কী তুর্কাঈ।।

হিন্দুর হিন্দুয়ানী মুসলমানের মুসলমানী দুই দেখিলাম। এদের কারো কাছেই পথের সন্ধান নাই। এই সূত্রে কবীরের প্রসিদ্ধ উক্তি হচ্ছে—

জো খোদায় মসজিদ বসতু হৈ
ঔর মুলুক কোইকেরা
তীরত মুরত রাম নিবাসী
বাহর করে কো হেরা।।

খোদা যদি মসজিদে বাস করেন তবে বাকী জগতটা কাহার?
তীর্থে মূর্তিতেই যদি রাম বাস করেন তবে কে দেখে বাহির?
ব্যক্তিগত জীবনে কবীর গার্হস্থ জীবন-যাপন করতেন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ বা ব্রহ্মচর্য পালন সমর্থন করেননি। কবীর উত্তরভারতের নানা স্থান বিশেষতঃ বেনারস ও তার আশপাশে অনবরত পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন মতের সাধু-সন্ন্যাসী ও ফকির এবং সুফীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এই মেলামেশার ফলে তাঁর আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কবীর ও নানক সাধারণের বোধগম্য ভাষায় ভক্তিধর্ম প্রচার করেছিলেন। কবীরের দোঁহা বা শ্লোক হিন্দিতে জনগণের মধ্যে সহজেই প্রচারিত হয়েছিল। দোঁহার সংকলন গ্রন্থ কবীর পন্থীরা পরবর্তীকালে প্রকাশ করেছিলেন। কবীর কোন সম্প্রদায় স্থাপন করেননি। হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী ও মুসলিম রক্ষণশীলরা তাঁর বিরোধী ছিলেন। কারণ কবীর ও নানক উভয়ই হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সাধনার সংযোগে ধর্মীয় মিলনের প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা নতুন কোন ধর্ম স্থাপনের প্রচেষ্টায় তৎপর এই চিন্তায় ব্রাহ্মণরা তাঁদের উপর খড়্গ হস্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে কিন্তু কবীরপন্থীরা ও নানকের অনুগামীরা পৃথক সম্প্রদায় স্থাপন করেছিলেন। কবীরপন্থীরা কবীরের ঐতিহ্যকে স্থায়ী করেছিলেন। কালক্রমে কবীরপন্থীদের প্রভাব মুষ্টিমেয়র মধ্যে নিবদ্ধ হয়েছিল এবং কবীরপন্থীরা হিন্দুধর্মের গোষ্ঠী হিসাবে গণ্য হয়েছিল। সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ শহরে শ্রমজীবী ও বণিকদের মধ্যে এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর কবীরের ভক্তিধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল। কবীর রাম ও রহিম, হরি ও হজরতের এবং কৃষ্ণ ও করিম এক ও অদ্বিতীয় বলে মনে করতেন। জাতপাতের পার্থক্য বা বেদ ও কোরাণের প্রতি আস্থা তাঁর ছিল না। এইজন্য নিম্নকোটির ও বর্ণের মানুষ কবীরের ভক্তিধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

* The Wonder that was India, Vol-II, পৃঃ ৩৬১-৬২ দ্রষ্টব্য।

** হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সাধনা-ক্ষিতিমোহন সেন (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-বিশ্বভারতী) দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

কবীর হিন্দু ছিলেন না মুসলমান এই প্রশ্নে মতভেদের কারণ কবীর তাঁর ভক্তিধর্ম প্রচারের সময় সকল বর্ণভেদের গোঁড়ামী ও আচার ত্যাগ করতেই কেবল উপদেশ দেননি তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের ঈশ্বরের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কিন্তু উভয় ধর্মের ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর শিক্ষায় উল্লেখ আছে। কবীরে কেবল বিভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের উপরই জোর দেননি তিনি সমাজে সাম্য প্রচার করেছিলেন। অতএব উচ্চবর্ণের মানুষ অপেক্ষা অন্ত্যজ ও নিম্নবর্ণের লোক, শ্রমিক, কারিগর, বণিক ও দরিদ্র ও শ্রমজীবীদের মধ্যে এবং সমাজের অবহেলিত মানুষের কাছে তাঁর শিক্ষা জনপ্রিয় হয়েছিল।* এইজন্য কবীরের দেহাবসান হলে হিন্দুরা তাঁকে নিজেদের ধর্মমত অনুসারে সৎকার করতে চেয়েছিল আর মুসলমানরা তাঁর দেহ কবর দিতে আগ্রহী ছিল। এইজন্য 'মঘর' নামক স্থানে যেখানে কবীরের মৃত্যু হয় সেখানে দুইটি সমাধিস্থল আছে একটি হিন্দুদের অপরটি মুসলমানদের তীর্থস্থান বলে গণ্য হয়।** কবীর স্বয়ং মনে করতেন যে সম্প্রদায় ভেদ মানেন না তাঁর মতই প্রশস্ত সম্প্রদায় বুদ্ধি রহিত হয়ে সাধক নির্ভয় হন বা কবীরের ভাষায় এই ধরনের সাধক—'নির্ভৈনিপশথ হোই'।

দাদু দয়াল : কবীরের ন্যায় দাদু দয়ালের জন্ম বৃত্তান্তও রহস্যাবৃত এবং এ বিষয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে তিনি আহমেদাবাদে জন্মেছিলেন কিন্তু এ সম্পর্কে সকলে একমত নন। দাদুরের পিতা লোদীরাম সম্ভবতঃ একজন ব্যবসায়ী ধুনরী ছিলেন। অনেকের মতে তিনি ছিলেন একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান। দাদুরের জীবনের অধিকাংশই রাজস্থানের সম্বর অঞ্চলে অতিবাহিত হয়। এইখানকার একটি গ্রামে তিনি জন্মলাভ করেছিলেন বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন। রামানন্দ গোষ্ঠীর একজন গুরুর কাছে দাদুরের দীক্ষা হয় এবং তাঁর চিন্তা ও সাধনার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। দাদুর সম্পর্কে প্রচলিত একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে বৃদ্ধ সাধকের বেশে পরমেশ্বর দাদুরকে দর্শন দিয়ে ঐশ্বরিক জ্ঞান ও ভক্তিতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আকবরের দরবারের প্রভাবশালী সভাষদ রাজা ভগবানদাস দাদুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৫৮৪ সালে আকবর ফতেপুর সিক্রী থেকে কাবুলে রওনা হওয়ার আগে রাজা ভগবান দাস দাদুরকে সম্রাট আকবরের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন। জীবনের শেষভাগ দাদু রাজস্থানের নারাইনাতে অতিবাহিত করেছিলেন। দাদুর বলেছিলেন—

আমি হিন্দু হতে চাই না, মুসলমান হতে চাই না, ষড় দর্শনের পথ আমার নয়, আমি চাই দয়াময়কে। দাদুর ভাষায় বলা যায়—

ন তহাঁ হিন্দু দেহরানা তুরুক মসীতি
দাদু আঁপে আপ হৈ নহীঁ তঁহা রহ রীতি॥

ভগবানের রাজ্যে হিন্দু দেবালয় নাই মুসলমানের মসজিদও নাই দাদুর বলেন যেখানে তিনি বিরাজিত সেখানে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। তিনি বলেন, যেদিন থেকে আমি ধর্ম সম্প্রদায়ের বুদ্ধি ছাড়লাম সেদিন থেকে সকলে আমার উপর হলেন রুষ্ট। কিন্তু সদ্‌গুরুর প্রসাদে আমার না আছে তাতে কোনো হর্ষ না আছে কোন শোক।***

* রোমিলা থাপার-ভারতবর্ষের ইতিহাস (ওরিয়েন্ট লংম্যান) পৃঃ ২৩৫ দ্রষ্টব্য।

** এই দুই বিতর্কের অবসান আধুনিক যুগের লেখকদের মধ্যেও চলছে। আধুনিক কালে ঐতিহাসিকদের এই বিষয়ে মতামত সম্পর্কে ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তবের **Medieval Indian Culture** পৃঃ ৫৯-৬০ এবং ইতিপূর্বে উল্লিখিত **Wonder that was India (Vol-II)** পৃঃ ৩৬২-৬৩ দ্রষ্টব্য।

*** পূর্বোল্লিখিত হিন্দু মুসলমান যুক্ত সাধনা (বিশ্বভারতী) দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

দাদুরের কবিতা ও প্রার্থনা বা বানীর সংকলন তাঁর প্রিয় শিষ্যরা তিলা (একজন জাট), মোহন দফতরী, রজ্জব দাস, ছোট সুন্দর দাস প্রভৃতি করেছিলেন। দাদুরের উপর কবীরের প্রভাব পড়েছিল এবং দাদুর তাঁর বাণীতেও বারংবার কবীরের কথা উল্লেখ করেছেন।

তুলসীদাস : তুলসীদাস (১৫৩২-১৬২৩ খ্রীঃ) ছিলেন রামানন্দের সুপ্রসিদ্ধ শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লিখিত রামচরিত মানসকে উত্তরভারতের বাইবেল বলা যেতে পারে। গোঁড়া ব্রাহ্মণদের অনেকের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে তিনি মাতৃভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন যার জন্য জনসাধারণের মধ্যে তিনি বহু জায়গায় বাল্মীকির অবতার বলে পূজিত হন। অগণিত জনগণের কাছে সর্বাধিক প্রিয় গ্রন্থ তুলসীদাসের রামায়ণ ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে ধর্মের ও আধ্যাত্মিক জগতের অনুভূতি এনে দিয়েছে।

তুলসীদাসের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে তাঁর পিতার নাম ছিল অত্মারাম দুবে ও তুলসীদাস মধ্যবয়স পর্যন্ত সংসার ধর্ম পালন করেছিলেন। স্ত্রী রত্নাবলীর বিদ্রূপে মর্মাহত হয়ে ৪২ বৎসর বয়সে তুলসীদাস গৃহত্যাগী হয়ে তপস্বীর জীবন-যাপন শুরু করেন। রামচরিতমানস রচনা কালে (১৫৭৪) তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২ এবং মাত্র দুই বৎসর সাত মাসে এই গ্রন্থ লেখা শেষ হয়। রামচরিতামানস ছাড়া তিনি যেসব কাব্য ও রচনার সৃষ্টি করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হ'ল গীতাবলী, কবিতাবলী, বিনয় পত্রিকা প্রভৃতি। হিন্দি সাহিত্য ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদান ছাড়াও রামচরিতমানস ভক্তি ও প্রেম ধর্মের অনবদ্য নিদর্শন রূপে গণ্য করা যায়। তুলসীদাস রামকে ঈশ্বরের অবতার রূপে দেখতেন এবং তাঁর মতে একমাত্র ভক্তি ও প্রেমের মারফতে সাধক চিত্তের তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব। উত্তরভারতে হিন্দু ধর্মের উপর তুলসীদাসের প্রভাব তিনটি ধারার প্রবাহিত।

প্রতমতঃ, তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রামভক্তির অনুপ্রেরণা জাগ্রত করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ মানুষের অন্তরে নৈতিকতা ও প্রেমভক্তির ধারা রামচরিত মানস আদর্শ প্রবাহিত হয়েছিল। তৃতীয়তঃ, যখন ইসলামের প্রভাবে এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ও আন্দোলনের প্রভাবে মানুষ মূর্তিপূজার বিরোধী হয়ে উঠছিল সেই সময় রামচরিতমানস রচনা করে তুলসীদাস সনাতন হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে দৃঢ় করেছিলেন।

ভক্তিধর্ম যেমন তুলসীদাসের ন্যায় রামভক্তরা সৃষ্টি করেছিল সেইভাবে প্রেমভক্তির আবেগ কৃষ্ণভক্ত সুরদাসের (১৪৮৩-১৫৬৮) সঙ্গীতের ও কাব্যের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। উভয় ছিলেন মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা। কিন্তু সুরদাস কৃষ্ণভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি অজস্র ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে কৃষ্ণ অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভক্তি গাথা কৃষ্ণের জীবনের বিশেষভাবে বাৎসল্যরসে আপ্লুত। সুরদাসের সঙ্গীতের উৎস ছিল প্রধানতঃ ভাগবত পুরাণ। সুরদাসের বহু সংগীতে চিত্রিত হয়েছে সমকালীন রাজস্থানী ক্ষুদ্রাকার চিত্রের বাল গোপালের শৈশব এবং তৎকালীন গ্রাম্য জীবনের ছবি। সুরদাসের কাব্যে কখনও কখনও প্রচণ্ড আবেগের উচ্ছ্বাস দেখা যায় কিন্তু এই আবেগে দৈহিক আকর্ষণের নয় বরং করুণরস সমৃদ্ধ এবং সর্বজীবের প্রতি প্রেম ও ভালবাসার মধুর নিদর্শন। সুরদাসের স্থান প্রেমভক্তির প্রচারক হিসাবে তুলসীদাসের পর ভক্তকবি রূপে নির্ধারিত করা যায়। সুরদাসের কাব্য ও কাব্য সংকলন এবং মর্মস্পর্শী লেখনী মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং ভক্তিধর্মের প্রসারের পথ সুগম করেছিল।

মীরাবাঈ (১৪৯৮-১৫৪৬ খ্রীঃ বা ১৫০৩-৭৩ খ্রীঃ) কৃষ্ণের একান্ত ভক্ত অভিজাত রাজপুত মের্তার রাঠোর সামন্ত রতন সিংহের একমাত্র কন্যা মীরাবাঈ। আজমীরের নিকটবর্তী মের্তার একটি গ্রামে জন্ম হয়েছিল। ১৫১৬ সালে মেওয়ারের রানা সঙ্গের জ্যেষ্ঠপুত্র ও সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী ভোজরাজের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ভোজরাজ ১৫১৮-২৩ সালের মধ্যে স্বীয় পিতার জীবদ্দশায়

www.pathagar.com

দেহত্যাগ করেছিলেন। ফলে মীরার অতি অল্পবয়সে বৈধব্যদশাপ্রাপ্ত হন। সন্তানহীনা মীরাবাঈ সাধু সঙ্গে জীবনযাপন ও কৃষ্ণ আরাধনায় জীবনোৎসর্গ করেন। কারণ পিতৃকুলের ঐতিহ্য অনুসরণ করে তিনি স্বীয় পিতা ও পিতামহের ন্যায় বৈষ্ণবধর্মের ভক্ত ছিলেন এবং কৃষ্ণানুরাগী হিসাবে জীবনোৎসর্গ করেছিলেন। ১৫২৭ সালে খানুয়ার যুদ্ধে তাঁর পিতা ও এই যুদ্ধের পর পরাজিত ও ভগ্নহৃদয় রানা সঙ্গ ১৫২৮ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। রানা সঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র রানা রতন সিংহ সিংহাসন লাভের ৩ বৎসরের মধ্যে দেহত্যাগ করেন। ফলে রানা সঙ্গের তৃতীয় পুত্র বিক্রমজিৎ সিংহাসন লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণগত প্রাণা মীরার সাধুসঙ্গ এবং সাধু সজ্জনের সঙ্গে প্রাসাদ ও প্রাসাদের বাইরে মন্দিরে কৃষ্ণভজন ও নাম কীর্তন শিশোদিয়া রানা বংশের রীতি বর্হিভূত বলে রাজপরিবারের লোকজন বিশেষতঃ রানা বিক্রমজিতের অপছন্দ হয়েছিল। কথিত আছে রানা পরিবারের লোকজন এই ধরনের রীতির জন্য মীরাবাঈর উপর নানা ধরণের উৎপীড়ন চালান বলে অনেকে অনুমান করেন। রানা সর্বসাধারণের সঙ্গে মীরাবাঈ-এর মেলামেশা ও সাধুসঙ্গের বিরোধিতা করেন। কথিত আছে কৃষ্ণভক্ত মীরা যখন রানার আদেশ অগ্রাহ্য করে স্বীয় ভক্তিমার্গ অনুসরণে ব্রতী হলেন তখন রানা তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এইসময় মেওয়ারের রানা পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে মীরা স্বীয় পিতৃব্য ও মের্তার প্রধান বিরাম দেবের আশ্রয়ে কিছুকাল বাস করেন। কিন্তু যোধপুরের মালদেব কিছুকাল বাদে মের্তা দখল করলে মীরাবাঈ দ্বারকায় তীর্থযাত্রা করেছিলেন। দ্বারকায় মীরাবাই কৃষ্ণগতপ্রাণা ভক্ত হিসাবে জীবনের শেষভাগ পর্যন্ত বসবাস করেছিলেন। মীরাবাঈ-এর জীবন সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীকে অনেকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না।*

মীরার পদাবলী ও তাঁর ভজন প্রমাণ করে যে কৃষ্ণপ্রেমে তিনি এতদূর বিভোর ছিলেন যে জাগতিক কোন ঘটনা তাঁর মনকে বিচলিত করতে পারেনি। কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মীরাবাঈ তাঁর প্রিয় গিরিধারী গোপালের সঙ্গে স্বীয় সত্তা বিলীন করতে চেয়েছিলেন। মীরাবাঈ বিষ্ণু অবতার শ্যামের ধরিত্রীতে আর্বিভাবের কথা প্রচার করতেন। শ্রীচৈতন্যের ন্যায় মীরা আবেগে আপ্লুত হয়ে নৃত্য ও গীতের মারফতে গিরিধর গোপালকে স্বীয় পতিরূপে আরাধনা করেছেন। মীরা তাঁর ভজনে এইজন্য বলেছেন—

মেরে গিরিধর গোপাল দুসরা না কোই।
যাকে শিব সৌমুকুট মেরে পতি সোই॥

দক্ষিণভারত

বল্লভাচার্য (১৪৭৯-১৫৩০ খ্রীঃ) দক্ষিণ-ভারতের তেলেগুভাষী অঞ্চলে কৃষ্ণভক্তির ঐতিহ্যে নামোম্মাদনার সঞ্চার করেছিলেন। ভক্তি আন্দোলনে পুনরায় প্রাণসঞ্চারের উদ্দেশ্যে বেদান্ত, ভগবত গীতা ও ভগবত পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বল্লভাচার্য তাঁর লেখনীর মারফতে প্রচার করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সৎচিত্ত আনন্দের প্রকাশ দেখা যায়। যখন ভক্তের আত্মা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় তখনই পরমানন্দ ঈশ্বরের সাথে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই পরমগতি কেবলমাত্র তাদেরই লাভ হয় যারা একান্ত মনে কৃষ্ণভজন কৃষ্ণ কথা শ্রবণ ও কৃষ্ণের সাধনায় মগ্ন থাকেন এবং কৃষ্ণের পূজা করেন ও বৈষ্ণব মন্দিরে তাঁর মূর্তি দর্শনের জন্য তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন। বল্লভাচার্য মথুরায়

---

* 'The members of her royal household could not tolerate her devotion to these ascetics; in order to discipline her they frequently chastised her, looked her up, and even tried to poison her. Such stories are, however, discounted buy many authorities.' The Wonder that was India (Vol II), পৃঃ ৩৬৭।

www.pathagar.com

পশ্চিমে গোবর্দ্ধন পর্বতে শ্রীনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বল্লভাচার্য ভক্তিধর্মে কৃষ্ণ-প্রিয়া রাধাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বল্লভাচার্যের পুত্র ছিলেন বিটলনাথ (১৫১৫-৮৫?)।

উত্তরভারত—নানক ও শিখ ধর্ম

ভক্তি ধর্মের অন্যতম সাধক গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রীঃ) পশ্চিম পাঞ্জাবের শেখুপুরা জিলার তালবন্দী গ্রামে আধুনিক নানকানা সাহেব (লাহোরের ৩৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নানকের পিতা-মাতা জাতিতে ক্ষত্রি ছিলেন এবং নানকের পিতা কালু গ্রামের পাঠোয়ারী ও হিসাবরক্ষক ছিলেন। বাল্যকালে নানক গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেছিলেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকে নানককে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তামগ্ন থাকতে দেখা যেত। জীবনের মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে নানক এই বয়সে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। নানককে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে সংসারী করার জন্য তাঁর পিতা সচেষ্ট হয়েছিলেন। নানকের নিকট আত্মীয় জয়রাম এইসময় সুলতানপুরের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদীর সরবরাহ বিভাগে খাদ্য-শস্য সংগ্রহকারী বণিক ছিলেন এবং নানককে এই সূত্রে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। কারণ নানক কেবলমাত্র হিন্দি নয় ফার্সী ভাষাতেও শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এইসময় নানকের চারণকবি ভাই মার্দানার সঙ্গে পরিচয় হয় এবং এই দুইজনের মধ্যে চিরকালের জন্য প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। নানক ও মার্দানা সাধু ও সূফীদের সঙ্গে যোগাযোগ সূত্র স্থাপন করেন ও তাঁদের উপদেশ ও বাণীর মর্মগ্রহণে আগ্রহ দেখান। নানকের পক্ষে এই সময় তাঁকে দেওয়া দায়িত্ব ও কাজের প্রতি মনোনিবেশ করা সম্ভব ছিল না। অবশেষে নানাক তাঁর কর্মস্থল ত্যাগ করে সাধুসন্তদের ও সূফীদের সঙ্গ করার উদ্দেশ্যে ভাই মার্দানার সহ পানিপথ থেকে আসাম পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে সুলতানপুরে থাকাকালীন সময় নানক একটি উক্তিতে বলেছিলেন যে, 'কোন (সাচ্চা) হিন্দু বা (সাচ্চা) মুসলমান দেখা যায় না।'

নানকের আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে উল্লেখ করে তাঁর জীবনীকাররা বলেছেন যে, অতীতের সাধু-সন্ত ও সূফীদের তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দর্শন লাভ করতেন ও এইসব সাধক ও সূফীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। ১৫২০ সালের মধ্যে নানক তার সঙ্গী পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যাবর্তনের কয়েকবৎসরের মধ্যে বাবর হিন্দুস্তান আক্রমণ করেন ও পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময়কার যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নানকের অন্তকরণে যে ব্যথিত বেদনার সৃষ্টি করেছিল তার প্রকাশ হয় 'বাবর বাণী' গাথা ও কাব্যের মারফতে। ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবেও এই কাব্যগাথা যথেষ্ট মূল্যবান।

অতঃপর গুরু নানক দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে পুনরায় তাঁর তীর্থযাত্রা শুরু করেন এবং দক্ষিণ থেকে ফিরে এসে তিনি কাশ্মীর যাত্রা করেছিলেন। কথিত আছে এরপরে তিনি মক্কা ও বাগদাদ পরিভ্রমণ করেছিলেন। ভ্রাম্যমাণ মুসলমান দরবেশ ও যোগী যাদের মধ্যে কোন বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের গোঁড়ামী ছিল না তাঁদের সঙ্গেই প্রধানতঃ নানকের যোগাযোগ ছিল। শেষজীবনে নানক পাঞ্জাবে অতিবাহিত করেছিলেন। ১৫৩৯ সালে মতান্তরে ১৫৩৮ সালে কর্তারপুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। নানকের মৃত্যুর পর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক স্ব স্ব ধর্মমতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য দাবি করেছিলেন। কথিত আছে কবীরের দেহাবশেষের ন্যায় তাঁর মৃতদেহের আবরণ যখন সরানো হয় তখন সেখানে কেবল কতকগুলি ফুল ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

পরবর্তী চারজন গুরু নানকের প্রার্থনা গীত রচনা ও সমবেত কীর্তনের মারফতে পরম পিতা ঈশ্বরের যিনি নিরাকার অজ্ঞেয়, অপার, সর্বকালের অতীত সেই অলখ নিরাঞ্জনের কাছে প্রার্থনা করাকে সাধনার পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এইসময় সেই পরমপিতাকে প্রিতম ও খসম (পতি)

www.pathagar.com

রূপে আরাধনার রীতি অনুসৃত হয়েছিল। তৃতীয় গুরু অমরদাসের সময় (১৫৫১-১৫৭৪ খ্রীঃ) এইসব প্রার্থনা সংগীত ও তৎসহ অন্যান্য সূফী ও সন্তের যেসব বাণী গুরু নানকের শিক্ষার সঙ্গে সহধর্মী সেগুলি সংকলিত হয়। ১৬০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম গুরু অর্জুনদেব এই সংকলনের সঙ্গে তাঁর নিজের ও তাঁর পিতা গুরু রামদাসের রচনা যোগ দিয়ে আদি গ্রন্থ যা পরবর্তীকালে গুরু গ্রন্থসাহেবের সংকলন করেছিলেন। এই গ্রন্থই হয়েছিল পন্থের ধর্মশাস্ত্র। এই ধর্মশাস্ত্রে বা গ্রন্থসাহেবে গুরু যে পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন তার অনুসরণকারীরা শিখ নামে পরিচিত।

বিদ্রোহী শাহজাদা খসরুরকে সহানুভূতি প্রদর্শনের অভিযোগে সম্রাট জাহাঙ্গীর গুরু অর্জুনদেবকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার পর থেকে শিখরা ক্রমেই সামরিক জাতিতে পরিণত হয়েছিল। কারণ ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ সিং তাঁর অনুচরদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তারা মুঘলবাহিনীর সঙ্গে ১৬২৮ ও ১৬৩১ সালে অন্ততঃ দুইবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। জাট অনুচরদের সংখ্যাধিক্যের প্রভাবে শিখ সম্প্রদায় ইতিপূর্বেও এইরূপ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। শিখ গুরুরা শহরের বণিক শ্রেণীর ক্ষত্রিয়দের বংশজাত ছিলেন কিন্তু তাঁদের অনুচর জাটরাই ছিলেন শিখ সম্প্রদায়ের শক্তির উৎস। দশম গুরু গোবিন্দ সিং (১৬৭৫-১৭০৮ খ্রীঃ) ছিলেন সর্বশেষ গুরু। তাঁর পরবর্তীকালে গুরু গ্রন্থসাহেব ও শিখপন্থ বা গুরু গোবিন্দর প্রতিষ্ঠিত খালসা পন্থের এবং শিখ সংস্থায় যৌথ মতামত শিখদের পরিচালক ও পথ নির্দেশক হিসাবে গণ্য হত। রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশীদার হবার দরুণ এই মতের অনুগামীরা শিখদের সঙ্গে তাঁদের পূর্বসূরী ভক্ত ও সন্তদের পন্থ বা সম্প্রদায়ের মৌলিক পার্থক্য ছিল। যারা খালসা সংগঠনে যোগ দিত তাদের দীক্ষা নিতে হত এবং কতকগুলি নিয়ম-কানুন পালনে প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ত। এইসব নিয়মকানুনের মধ্যে অন্যতম ছিল পঞ্চ 'ক' বা কেশ, কাংগা, কৃপাণ, কবা বা লৌহবলয় পরা ও কচ্চ বা ছোট পাজামা ধারণ ও কুরহিত বা কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা যথা ধূমপান থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি রীতি বাধ্যতামূলক ভাবে পালন করা। গুরুনানক মোক্ষের পথ নির্দেশ করেন নাম জপের মাধ্যমে। সন্তদের অনুসৃত ও নির্দেশিত পন্থার এবং সূফীদের প্রদর্শিত পথে নানক তাঁর অনুচরদের সাধনা ও মুক্তির আলো প্রদর্শন করেছিলেন। নানকের মতে গুরু কা শব্দ (বা অন্তরের অন্তস্থলে যে ঐশ্বরিক অতীন্দ্র বাণীই) কেবলমাত্র সাধকের মনকে আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম। ঈশ্বরকে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের উভয় সম্প্রদায়ের ভাষায় আল্লা, খোদা, রাম, গোবিন্দ, মুরারী নানা নামে আহ্বান করেছেন। নানকের জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য উচ্চমানের নৈতিক মূল্যবোধ ও বাস্তব বুদ্ধি প্রয়োগের শিক্ষাদান করেছিলেন। তিনি ধর্মপালন ও সৎপথে স্বাভাবিক জীবন-যাপনের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি যে সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন তাতে কৃষক বীজবপনের জন্য পরিশ্রম ও দক্ষতার সঙ্গে ভূমিকর্ষণ করে এবং বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যে ন্যায়নীতি অনুসরণ করে। অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জনকে নানক গর্হিত কর্ম বলে মনে করতেন। উচ্চ ও নীচ বর্ণের পার্থক্য করাকে নানক সামাজিক কুসংস্কার হিসাবে নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ নানকের অভিমত ছিল যারা নিজেদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বলে মনে করে ঈশ্বরের কৃপা তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং তারা মুক্তিলাভ করে।

ভক্তিধর্মের প্রচারকদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সমাজ এবং তাঁদের সম্পর্কে রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী

রামানন্দ থেকে শ্রীচৈতন্যের পঞ্চদশ শতকে আবির্ভাব ভারতের ইতিবৃত্তে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, এইযুগ হিন্দুস্তানের ইতিহাসে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের যুগ। এই সংস্কারকরা ধর্মের ক্ষেত্রে জনগণকে বিভিন্ন জটিলতা ও কুসংস্কার মুক্ত সরল বিশ্বাস ও ভক্তির পথে একমেবাদ্বিতীয়ম সগুণ বা নির্গুণ পরমেশ্বর প্রাপ্তির পন্থা নির্দেশ

www.pathagar.com

করেছিলেন। এই পথে সাধনার জন্য কোন প্রকার শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ, পুরোহিত ও পূজার্চ্চনা, কিংবা শাস্ত্রীয় গ্রন্থপাঠ বা তীর্থে এবং মন্দির বা মসজিদে ধর্না দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে তারা স্বীকার করেননি। ভক্তিই মুক্তির পথ এই ছিল তাঁদের বক্তব্য ভক্তি-ধর্মের মতে ঈশ্বরলাভের জন্য সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের কোন প্রয়োজন আছে বলে তারা স্বীকার করতেন না। কিন্তু বৈষয়িক ও জাগতিক ব্যাপারে অতিরিক্ত জড়িত হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব তাঁদের মতে ভক্তির পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

ঐতিহাসিক কিশোরী শরণলালের মতে তৈমুরের আক্রমণের সময় যে ঐক্যের আকাংখায় বৈদেশিক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হিন্দু ও মুসলমানরা ভ্রাতৃত্বের রাখীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল তার চরম পরিণতি লাভ করেছিল এদের (ভক্তিধর্মের প্রচারকদের) শিক্ষায়।* কিন্তু এই ঐক্যের বীজ তৈমুরের আক্রমণের সময় উপ্ত হয়নি, তার বহুপূর্বে এর সূত্রপাত হয়। যখন হিন্দুস্তানের তুর্কী বিজয়ীরা মোংগল আক্রমণের ফলে এদেশকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই সময় থেকে এই ঐক্য ও সমন্বয়ের বীজ বপণ শুরু হয়। কিন্তু এই দেশে তুর্কী আক্রমণের পূর্বে যাঁরা শাসক ছিলেন সেই হিন্দু রায়, রানা, মুকাদ্দাম, চৌধুরী তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও গ্রামাঞ্চলে প্রভুত্ব বজায় রেখে কর আদায়কারী মধ্যসত্ত্ব ভোগী হিসাবে বাস করত। সর্বনিম্ন স্তরে ছিল শহরে কারিগর বণিক গ্রামের কৃষিজীবী আর মজুররা। ভক্তিধর্মের প্রচারকরা এইসব অন্ত্যজদের মধ্যেই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের মসান অধিকারের কথা বলেছেন। গুরু নানক মনে করতেন যারা নিজেদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বলে গণ্য করে তাদের প্রতি ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হয়।

নানকের ভক্তি-ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল প্রধানতঃ পাঞ্জাবের যুদ্ধপ্রিয় জাটদের মধ্যে। ফলে কালক্রমে পরবর্তী গুরুদের সময় বিশেষতঃ দশম গুরু গোবিন্দর (১৬৭৫-১৭০৮) যুগে তাঁর ভক্তিধর্মে অনুরাগীরা শিখপন্থ ও খালসায় রূপান্তরিত হয় এবং মুঘল রাজশক্তির সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়। আহমেদ শাহ আবদালীর আক্রমণ ও তৎপরবর্তী বিশৃঙ্খলার সুযোগে পাঞ্জাবে শিখরা স্বাধীন ১২টি মিসিল বা গোষ্ঠীর প্রাধান্য স্থাপন করে এবং মহারাজা রণজিৎ সিংহের অধীনে স্বাধীন পাঞ্জাব রাজ্য স্থাপন করে।

গুরু নানকের সময় থেকে তাঁর অনুচরদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের জাটদের সংখ্যাধিক্য দেখা দেয়। শিখধর্মের গুরুরা এসেছিলেন শহরাঞ্চলের বণিকদের বা ক্ষত্রিয়দের মধ্য থেকে কিন্তু তাঁদের প্রভাবিত করেছিলেন পাঞ্জাবের সামরিক জাতি গ্রামাঞ্চলের জাটদের মধ্যে। শিখদের মধ্যে জাট প্রভাব, যা অদ্যাবধি দেখা যায়, পরবর্তীকালের পরিবর্তনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জাট প্রভাব ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের। (১৬০৬-১৬৪৪) সময় শিখরা মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল এবং ১৬২৮ ও ১৬৩১ সালে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। ইতিপূর্বে শিখরা মুঘলদের সঙ্গে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল কিনা জোর করে বলা যায় না। হরগোবিন্দের সময় মুঘল-শিখ বিরোধের কারণ পঞ্চম গুরু অর্জুন (১৫৮১-১৬০৬) জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরুকে সাহায্য করার অভিযোগে রাজরোষে প্রাণ দিয়েছিলেন। নবম গুরু তেগবাহাদুর (১৬৬৪-৭৫) মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সম্রাট তেগবাহাদুরকে ইসলাম ধর্ম বা প্রাণদণ্ড দুয়ের মধ্যে একটাকে বেছে নিয়ে গ্রহণ করতে হুকুম দিলে নবম শিখ গুরু শেষোক্তকে শ্রেয়ঃ বলে ঘোষণা করেন (সর দিয়া পর সির না দিয়া) ও আপন ধর্ম বিশ্বাসে অটল থেকে ঘাতকের হাতে জীবন দান করেন। তাঁর পুত্র এবং দশম গুরু (১৬৭৫-১৭০৮) শিখদের

---

* The urge for unity which high begun during Timur's invasion, when Hindus and Muslims stood shoulder to shoulder to fight the foreign invader found its culminations in their teachings"—Twilight of the Sultanate—K.S.Lal (Asia Publishing House) পৃঃ ৩১১ দ্রষ্টব্য (বঙ্গানুবাদ লেখকের)।

www.pathagar.com

নবোৎসাহে উদ্দীপিত করার জন্য 'খালসা' বাহিনীর সৃষ্টি করে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দরিদ্র ও অসহায়ের লড়াইয়ের হাতিয়ার প্রস্তুত করেছিলেন। যদিও নানকের শিক্ষার সঙ্গে গুরু গোবিন্দ সিং প্রবর্তিত খালসা পন্থের নেতৃত্বে শিখদের রাজনৈতিক সংগ্রামের মিল পাওয়া যায় না তৎসত্ত্বেও স্মরণ রাখতে হবে যে গুরু নানকের দৃষ্টিতে সমকালীন যুগের সেকেন্দার লোদীর ন্যায় শাসকের পরধর্মদ্বেষী আচরণ গর্হিত ছিল। নানক এই ধরণের শাসকদের 'কসাই' বলে বর্ণনা করেছেন। বাবর কর্তৃক বারংবার হিন্দুস্তান আক্রমণের ঘটনাও তাঁকে ব্যথিত করে। ১৫২১ সালে বাবরের হিন্দুস্তান আক্রমণের সময় যুদ্ধবন্দীদের জন্য নানক মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে যমের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এবং এইসব নিষ্ঠুর ঘটনার জন্য তিনি সকলের প্রতিপালককে বা ঈশ্বরকে দায়ী করেছিলেন।

গুরু নানক উত্তর পশ্চিম ভারতে বলদৃপ্ত জাট ও যোদ্ধাজাতির মধ্যে ধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন। এই ধর্ম তাদের কেবল দুর্বলকে রক্ষা করতে শিক্ষা দেয়নি, সকল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আত্মরক্ষা করতেও শিখিয়েছিল।* কিন্তু কবীর ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম কখনও হিংসাত্মক হতে শিক্ষা দেয় নাই। কবীর ও চৈতন্যের ভক্তিধর্ম কখনও বাহুবল ও অসিধারণের শিক্ষা দান করেনি। বৈষ্ণব সাধনার এই দুর্বল দিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও ইংগিত দিয়েছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বৈষ্ণব সাধনায় নির্বিচারে অন্যায়কে মেনে নিতে বলা হয়েছে।

চৈতন্য-ধর্ম নদীয়াতে গণমুখী চেতনাকে সম্বল করে অগ্রসর হয়েছিল। চাঁদ কাজী নগর-সংকীর্তন নিষেধ করে আজ্ঞা জারি করেছিলেন। তদুত্তরে মহাপ্রভু শোভাযাত্রা সহকারে কীর্তন করে কাজীর কাছে উপস্থিত হন এবং কাজী বাধ্য হয়ে বৈষ্ণবদের নাম সংকীর্তনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত এই সময়কার নগর সংকীর্তনে সমস্ত নদীয়াবাসীর সহযোগিতা ছিল। 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ঘটনার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন এবং কাজীর নতি স্বীকারের কথা উল্লেখ করেছেন। এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে ভক্তদের মন থেকে স্বধর্ম পালনের জন্য সংকীর্তন করার সময় পূর্বেকার ন্যায় ভয় চকিত মনোভাব দূর হয়েছিল। কাজির বাধা দূর হলে হরিকীর্তন দেখে মৌলবাদী মুসলমান শুধু নয় পূর্বতন দেবদেবী মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরির পূজা প্রবর্তনকারী গোঁড়া ব্রাহ্মণরাও বৈষ্ণব বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন এবং কাজির কাছে গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। কিন্তু কাজী এইসব অভিযোগে কর্ণপাত করেন নাই এবং স্থায়ীভাবে নগরে সংকীর্তনের অনুমোদন দিয়েছিলেন। এইযুগে সুলতান হুসেন শাহ ছিলেন গৌড়েশ্বর। তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে লোকমুখে শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। হুসেন শাহ ভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছামত পরিক্রমা বা যাতায়াত ও ভ্রমণে বাধা দান করতে সকল রাজকর্মচারী, কাজী ও অন্যান্যদের নিষেধ করেছিলেন।

সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব ও তাদের প্রতিক্রিয়া

রামশরণ শর্মা ভারতের সামন্ততন্ত্র গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, তুর্কী আক্রমণের পূর্বের দুইশতকে ভারতের সামন্তবাদী অর্থব্যবস্থায় চরমোৎকর্ষ ও হ্রাস দুই লক্ষ্য করা যায়। তুর্কী শাসকগণ যখন দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিলেন তখন পূর্বতন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শাসকগোষ্ঠী তাদের রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে কাজ করে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও অন্ত্যজ ও নিম্নশ্রেণীর শোষণের ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। বারানী প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা বারংবার এইসব খুট, মুকদ্দম, চৌধুরীদের অর্থাৎ সমাজের উচ্চস্তরের বিত্ত ও প্রভাবশালী হিন্দুদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করতে ও কৃষকের ও নিম্নস্তরের মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন। এমনকি শহরে দরিদ্র মজুরদের দুর্দশা ও বিত্তবানের বিলাসের কথাও সমকালীন ইতিবৃত্তে উল্লিখিত হয়েছে।

* Sikhism—Hew Mcleod (A cultural History of India), পৃঃ ৩১১ দ্রষ্টব্য (বঙ্গানুবাদ লেখকের)।

www.pathagar.com

অতএব ভক্তিধর্মের প্রচারকরা যখন শাস্ত্রের বিধি বিধান থেকে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা সমকালীন সমাজব্যবস্থার চাপে পিষ্ঠ দলিত নিম্নশ্রেণীর আর্তিকে ভাষা দিয়েছিলেন ও সমাজকে সচল করতে চেয়েছিলেন। এই কারণে ভক্তি আন্দোলনে পুরাতন কঠোর সামাজিক নিয়মকানুনকে অস্বীকার করে যখন সামাজিক সচলতার সৃষ্টি করলেন তখন 'পাষণ্ডী হিন্দু' ও যবন কাজীর কাছে নিমাই-এঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে 'হিন্দুধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই'।*

নানকের মতে নিরাকার (নিরংকার), অসীম (আকাল) অলখ নিরঞ্জন, সর্বব্যাপক ঈশ্বরকে যাঁরা সাধনা করেন ও কামনা করেন তাদের কাছে অন্তরে ও বাইরে তিনি দর্শন দেন। কিন্তু লোক ইচ্ছাকৃতভাবে চোখ বন্ধ করে থাকে যার ফলে তাদের চারিদিকে ঈশ্বরের প্রকাশ সম্পর্কে তারা জানতে পারে না। হিন্দুরা মন্দিরে ও মুসলমানরা মসজিদে ঈশ্বরের আরাধনা করে কিন্তু ঈশ্বর লাভের সঠিক পথ নির্দেশের অভাবে বৃথা সময় নষ্ট করে এবং বারংবার জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে ঘুরে আত্মা মুক্তিলাভের পথে ব্যর্থ হয়। নানক বলেছেন যে 'ধর্ম গেরুয়া থাকলে বা যোগীর দণ্ড হাতে নিলে অথবা সারাদেহে ছাই মেখে থাকলে মুক্তি লাভ করা যায় না।' অমৃতলাভের জন্য সত্যকারের গুরুর প্রয়োজন। গুরুবাক্য (শবদ) শুনে নাম স্মরণ বা নামজপ ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য আকুল মানবাত্মার একমাত্র পন্থা। নানকের সঙ্গে কবীরের শিক্ষার অনেক মিল আছে। উভয় সরলমতি হিন্দু ও মুসলমানের পূজা-পার্বণ, আচার-বিচার, নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি ও অন্যের সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বিদ্বেষ, ধর্মীয় গোঁড়ামী, শ্রেণী ও বর্ণের ভিত্তিতে ভেদাভেদের বিরোধিতা করেন। উভয় সন্তই একমেবাদ্বিতম সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সর্বজীবে প্রেমভক্তি বিতরণ করেছিলেন।

ধর্ম সাধনার উদারতার জন্য সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন কবীর। ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদীরা তার সম্বন্ধে আশংকান্বিত ছিলেন। কবীর এক নতুন সমন্বয়ের ধর্ম স্থাপনে উদ্যোগী এই ভয়ে মৌলবাদীরা সন্ত্রস্ত ছিলেন। অতএব মোল্লা ও পণ্ডিতরা কবীরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজ দরবারে অভিযোগ পেশ করেন। কবীর মন্তব্য করেছিলেন, বিধাতার সিংহাসনের তলার স্থান কি পৃথিবীর রাজার সিংহাসনের নিচের স্থান থেকে সংকীর্ণ এবং সেখানে সেইজন্য তোমাদের স্থান সংকুলান হল না? নিরক্ষর কবীরের সহজ ভাষায় ভক্তিধর্মের প্রচারে গভীর সত্যের বাণী থাকায় পণ্ডিতেরা বিস্ময় প্রকাশ করতে তিনি বলেন—'উচে পানী না টিকে নিচে হি ঠাহরায়'। অর্থাৎ জল উচ্চস্থানে স্থির থাকে না, জল নিচে নেমে আসে। কবির কোন ধর্ম বা সম্প্রদায় স্থাপন করেন নাই। কবীরপন্থীরা কোন স্থায়ী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়নি। কবীরের ন্যায় দাদুরও ভেদবুদ্ধিকে উৎসাহ দেননি। দাদুর বলেছেন—

ন হম হিন্দু হোহিঁগে ন হম মুসলমান
ষট দর্শনমে মঁ হম নহী হম রাতে রহমান॥

---

* আদিলীলা শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজ—(শ্রী হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, প্রকাশক দেবসাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ) পৃঃ ১২৬-১২৯।

তা সবার অন্তরের ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি।।
নগরে নগরে আজ করিব কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সভে নগরমন্ডন।।
সন্ধ্যাতে দেওটি সব জ্বাল ঘরে ঘরে।

ঐ পৃঃ ১২৮।

দেখো কোন কাজী আসি মোরে মানা করে।।
কাজী জীবন ইঁহার না করি হিংসেন।
আপন ইচ্ছায় মুলুন যাহা উহার মন।।

www.pathagar.com

আমি হিন্দু হতে চাই না, মুসলমান হতে চাই না, ষড় দর্শনের পথও আমার নয় আমি চাই দয়াময়কে।

সামাজিক সচলতা

ভক্তিধর্মের এই বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণব ধর্মে ও চৈতন্যের প্রেমভক্তির প্রচারের মধ্যে দেখা যায়। কবীর-নানক-চৈতন্য উপলব্ধি করেছিলেন ঈশ্বর এক এবং বহু দেব-দেবীর উপাসনা বৃথা। অতএব তাঁরা ঈশ্বরের নামমহিমা, নামকীর্তন ও নামজপ করতে বলেছেন। নানকের জপজীতে, চৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেমে ও কবীরের নামমন্ত্রে একই ঈশ্বরের মহিমাকীর্তি প্রেমভক্তি ধর্মের পথ বলে নির্দেশিত। ঈশ্বর সাধনা ও মুক্তিলাভের পথ এক বলে সর্বজীবের প্রতি সমভাব ও সমদৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। মানুষে মানুষে বিভেদ বুদ্ধির লোপ হলে জাতি-বর্ণ-ভেদের অবলুপ্তি হবে। সর্বজীবের প্রতি এই সমদৃষ্টিতে স্বাভাবিকভাবেই ভক্তিধর্মের প্রচারকরা সামাজিক ভেদাভেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। সমাজে উচ্চ-নিচ পার্থক্য বজায় রাখা স্মৃতিশাস্ত্র শাসিত সমাজের বৈশিষ্ট্য। শাস্ত্রীয় অনুশাসন সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে একথা নানক-কবীর-চৈতন্য ও অন্যান্য ভক্তিধর্মের প্রচারকরা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা নিম্নবর্গের ও অন্ত্যজশ্রেণীর এবং সকল মানুষকে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা থেকে নামব্রহ্মের প্রচারের মাধ্যমে মুক্তি দিয়ে সমাজকে সচল করতে চেয়েছিলেন। তুর্কী শাসন স্থাপনের পর শাসকগোষ্ঠী ছাড়াও উচ্চকোটির ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বা পূর্বতন শাসকগোষ্ঠী অন্ত্যজদের উপর প্রাধান্য বজায় রেখেছিলেন এবং কঠোর স্মৃতিশাস্ত্রের শাসনে সমাজকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছিলেন। মধ্যযুগের শহরে মজদুর ও বণিক, গ্রামের নিম্নবর্গের মানুষ সকলেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণের শিকার হয়েছিলেন।

সুফীধর্মের প্রচারকরা সাম্যের বাণী প্রচার করে এঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। ভক্তিধর্মের ধারক ও বাহকরা সাম্যের বাণী এনে সমাজকে সচল করেন। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি লাভ নয়। নানক ও কবীর গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেছিলেন। নানক বলেছিলেন 'আওরৎ-আমন, পুত্তর-নিশান, দৌলৎ-গুজরান।' অর্থাৎ স্ত্রী হচ্ছে জীবনের বিশ্রাম, পুত্র হচ্ছে গৃহস্থের সাক্ষী, অর্থ জীবন-ধারণের পাথেয়। শ্রীচৈতন্য জীবনের প্রথমভাগে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করে পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও গৃহী শিষ্যদের তিনি বরাবর সমাদর করতেন। কবীর সংসার ধর্ম পালনে অবহেলা করেননি এবং স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যাসহ সহজ সরল গার্হস্থ্য জীবন-যাপন করেছিলেন। কিন্তু চৈতন্যের সন্ন্যাস জীবনযাপন, বৈরাগ্য গ্রহণ ও সংসারত্যাগী হয়ে কৃষ্ণানুরাগী ও একান্তভাবে কৃষ্ণকে আরাধনা করার জন্য জীবন সমর্পণের আদর্শ গার্হস্থ্যাশ্রম থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছিল। নানক ও কবীর গার্হস্থ্য জীবন যাপনকে সাধনার পথে বিঘ্ন বলে মনে করেননি এবং এদিক থেকে তাঁরা ছিলেন বাস্তবমুখী। চৈতন্য বাস্তববিমুখী ছিলেন না বরং বাস্তবকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন কারণ তিনি ছিলেন মানবপ্রেমিক। চৈতন্যের মানবপ্রেম ও তাঁর ভক্তি আন্দোলন প্রবল সামাজিক আলোড়ন তুলেছিল। 'যবন হরিদাস' প্রমুখ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে তিনি আত্মার আত্মীয়তে পরিণত করেছিলেন। ভক্তি ও প্রেম আন্দোলনের মারফতে ঈশ্বরানুসন্ধান ও আপামর চণ্ডালে মানবপ্রেম বিতরণের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বৈশিষ্ট্য। সুফী প্রচারকদের, নানকের ও কবীরের ভক্তি প্রচারে এই একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বঙ্গদেশে চৈতন্যের প্রচার যে সমাজিক পটভূমির সৃষ্টি করেছিল তাতে ধীরে ধীরে বাউল ও অন্যান্য লোকায়ত ও সমন্বয়মুখী সাধনা বিকশিত হয়েছিল।

নানক ও কবীর শহরে মজুর ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে এবং নিম্নবর্গের কাছে ধর্ম প্রচার করেন। নানকের অনুগত শিষ্যরা শিখপন্থার সূত্রপাত করেন এবং শিখগুরুরা ক্রমান্বয়ে শিখপন্থকে

www.pathagar.com

একটি পৃথক ধর্মে পরিণত করেছিলেন। চৈতন্যের পর ধীরে ধীরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ হিন্দুধর্মের গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। কবীরপন্থীরাও মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে কবীর বা দাদুরের প্রভাব সমাজের অবহেলিত ও পদদলিত নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে সচলতার সৃষ্টি করেছিল। নানকের ভক্তিধর্মের প্রভাবে একটি স্বতন্ত্র জাতি রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সংহত হয়ে পরবর্তীকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সংগ্রামের মারফতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। চৈতন্যধর্মে উচ্চবর্ণের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু উচ্চকোটিতে জন্মগ্রহণ করেও মহাপ্রভু জাতিবর্ণভেদে বিভক্ত সমাজে সচলতার সৃষ্টি করেছিলেন এবং চন্ডালকেও দ্বিজ শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছিলেন। চৈতন্যের ভক্তিধর্ম কর্মমুখী ছিল এবং চৈতন্য প্রচারিত প্রেমভক্তি ধর্ম নিত্যানন্দের মারফতে প্রসারিত ও কার্যকর হয়ে নিম্নস্তরের মানুষকে আত্ম-প্রতিষ্ঠার সুযোগ দান করেছিল।

শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, দাদুর ও অন্যান্য ভক্তিধর্মের প্রচারকগণ অবহেলিত ও নির্যাতিতের জীবনে এক নতুন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন। পূর্বে প্রচলিত হিন্দুসমাজের বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ ও জাঁকজমকের স্থলে কেবল নামজপে জীব উদ্ধার হয় এই আশ্বাস ভক্তিধর্ম অপামর জনসাধারণকে দিয়েছিল। ফলে তাঁদের চেতনার মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল। গৌরাঙ্গের বৈষ্ণবধর্ম নিম্নকোটির মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল কারণ সামাজিক আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সচলতা সৃষ্টির আশ্বাসে তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

বৈষ্ণবধর্ম প্রচারকালে মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে একজন পীর বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে 'রামদাস' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। রামদাসের প্রভু পাঠান বিজুলী খান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'কৃষ্ণ বলি পড়ে সে মহাপ্রভু পায়।' এইভাবে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করে শ্রীচৈতন্য হিন্দুধর্মে পাঠান ও মুসলমানদের গ্রহণ করেছিলেন। নানকের শিখধর্মে, হিন্দু, মুসলমান সকল ধর্ম থেকে লোক যোগদান করেছিল এবং কবীরের অনুচররাও উভয় সম্প্রদায় থেকে গৃহীত হয়।

ভক্তি আন্দোলন প্রচার করে শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশে সামাজিক ক্ষেত্রে অন্ত্যজদের যারা সবার নীচে ছিল তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার সুযোগ দান করেছিলেন। নানকের প্রচারিত ধর্ম জাতপাতের বৈষম্যকে অস্বীকার করেছিল এবং আধ্যাত্মিক জগতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের অগ্রাধিকারের কথা বলেছিল। কবীর জাতি বিচার, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র থেকে সকলকে মুক্ত হয়ে রাম ও রহিমের পার্থক্য বিস্মৃত হতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এইজন্য ভক্তিধর্ম সমাজে সচলতার সৃষ্টি করেছিল। এই সচলতার ফলে ধর্মান্তরিত যবন বিজুলীখানক হইল মহাভাগবত। তার সঙ্গীরা সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে বৈষ্ণবরূপে গৃহীত হয়েছিলেন ও যবন হরিদাস মহাপ্রভু প্রিয় পার্ষদ হয়েছিলেন, হুসেনসাহর দরবারের সাকর মালিক ও দবির খস সনাতন ও রূপ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন ও বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষার পরে বৃন্দাবনে বৈষ্ণব দর্শনের তাত্ত্বিক প্রচারের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। মুরারী গুপ্ত, শিবানন্দ সেনের ন্যায় বৈদ্য ও মকরধ্বজ করের ন্যায় বহু অব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সমাজে উচ্চসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। 'চণ্ডাল দুর্গতি আর সজ্জন দুর্জ্জন।'* সবাকার ঘরে ঘরে মহাপ্রভু তাঁর ভক্তিধর্ম বিতরণ করেন। তিলি, মালী, তামুলী, কামার, কুমোর, নাপিত, গোপ ও অন্যান্য নবশাখদের পক্ষে এইজন্য সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভবপর হয়েছিল।

এইভাবে সামাজিক সচলতা সৃষ্টির ফলে নারীর সম্মান বৃদ্ধি পায়। কৃষ্ণে সমর্পিত প্রাণা মীরাবাঈ, শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, নিত্যানন্দের মাতা জাহ্নবী দেবী, অদ্বৈতাচার্যের স্ত্রী সবিতা

* শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল শ্রীল লোচন দাস বিরচিত (প্রকাশক— শ্রী প্রবোধকুমার হালদার, শ্রী বংক বিহারী মণ্ডল) মধ্যখণ্ড পৃঃ ১৫৫।

www.pathagar.com

দেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীবাসের পত্নী মালিনী দেবী বৈষ্ণব সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির অন্যতম উদাহরণ। প্রাচীন হিন্দুধর্মের বিধি-নিষেধের প্রাচীর ভেদ করে ভক্তিধর্মের স্রোত সমাজকে সচল করে তোলার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উপেক্ষিত, অবহেলিত, অন্ত্যজ ও নির্যাতিতদের স্ব স্ব বৃত্তিতে সসম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত করে শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির আন্দোলন তাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করেছিল। 'যবন হরিদাসের' ন্যায় ধর্মান্তরিতদের মহাপ্রভু প্রিয়পার্ষদে পরিণত করে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থান দিয়েছিলেন। স্থানু, দৈবনির্ভর কর্মফলে বিশ্বাসী সমাজে সবার পিছে সবার নিচে পড়ে থাকা অন্ত্যজ ও নির্যাতিতদের ভক্তিধর্মের প্রচারকরা নতুন আশার আলো দেখিয়েছিলেন। ভক্তিধর্মের প্রভাবে মানুষে মানুষে জাতি, বর্ণ, কুসংস্কার ও ধর্মবিভেদের জাল ছিন্ন হয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল সম্প্রদায়ের ঐক্য তাদের মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল এবং সকল প্রকার নির্যাতনের প্রতিবাদ করার শক্তি ও সাহস দিয়েছিল।

হিন্দী সাহিত্যের বিকাশ ও আঞ্চলিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি

ভক্তিধর্মের প্রচারকরা সর্বসাধারণের কথ্য ভাষায় বক্তব্য জনগণের কাছে বোধগম্য করতে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে জনগণের মধ্যে ভক্তিধর্মের প্রচারকদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। সাহিত্যের বিকাশে ও আঞ্চলিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধিতে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিতে ভক্তিধর্মের প্রচারকদের দান অনন্য। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের মাতৃভাষায় ও কথ্য ভাষায় প্রেমভক্তির বাণী বিতরণে উদ্যোগী হয়ে ভক্তিধর্মের প্রচারকরা আঞ্চলিক সাহিত্য ও ভাষার বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। মাতৃভাষার মারফতে প্রচারের ফলে হিন্দী বিশেষতঃ ব্রজভাষার অগ্রগতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আওধী বা কোশলী ভাষারও এই সূত্রে উন্নতি হয়েছিল। পরিব্রাজক সাধু ও সন্তদের মাধ্যমে এই অঞ্চলের কথ্যভাষা ও তার নানা শাখা-প্রশাখা দূরদূরান্তরে প্রচারিত হয় এবং ধীরে ধীরে সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়। এই অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে দিল্লী এলাকার ও পূর্বপাঞ্জাবের প্রচলিত কথ্যভাষার সংমিশ্রণ হয়েছিল। পাঞ্জাবে শিখগুরুদের লেখনীতে এই সংমিশ্রিত ভাষার প্রভাব দেখা যায়। রাজস্থানী ভাষায় মীরার ভজন ও ডিংগল বা প্রাচীন মাড়য়ারীতে যেসব রাজপুতনার প্রেমকাহিনী আছে এবং অন্যান্য ডিংগল ভাষার কাব্য বর্তমানে হিন্দী সাহিত্যের অঙ্গরূপে গৃহীত হয়েছে।

সুলতানী শাসনের আমল হিন্দীভাষার বিবর্তনের যুগ। এই যুগে হিন্দীভাষা পুরোপুরি সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয়নি। তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজদরবারে স্থানীয় মানুষের ভাষা বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। তৎসত্ত্বেও হিন্দী পরিব্রাজক সাধু ও সন্তদের মুখে মুখে প্রচারিত ভাষা হিসাবে ধীরে ধীরে মধ্যভারতের জনগণের ভাষায় পরিণত হয়েছিল। এই যুগে রাজপুত বীরত্ব কাহিনী পৃথ্বীরাজ রাসো, বিশালদেও রাসো, খুমন রাসো, আলহা উদল রাসো ও অন্যান্য রোমান্টিক কাব্য পশ্চিমী হিন্দীতে রচিত হয়।* এইসব বিভিন্ন ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশের পটভূমিকাতে সৃষ্ট পশ্চিমী হিন্দী রাজস্থানী সাহিত্যের ও হিন্দী সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছিল। এই ভাষা গোরক্ষণাথের ন্যায় শৈবযোগী, রামানন্দ ও কবীরের ধর্ম প্রচারের ভাষায় পরিণত হয়েছিল। ফলে হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পথ ক্রমেই প্রশস্ত হয়। সুফী প্রচারকরা এই ভাষাকে হিন্দু জনগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম বলে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে হিন্দী ভাষার ক্রমোন্নতি হয়েছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে প্রখ্যাত লেখক, কবি ও সাহিত্যিক আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২৫)

* ইন্দো-এশিয়ান প্রাচীন পশ্চিমী হিন্দীকে ডা. সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ব্রজভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হিন্দী খারিবেলীকে কথ্য ভাষা বলে অভিহিত করেছেন এবং এটা অপভ্রংশ নয় বলে মন্তব্য করেছেন। (**Delhi Sultanate, Bharatiya Vidya Bhavan**), পৃঃ ৫০১।

www.pathagar.com

সুফীসাধক শেখ নিজামউদ্দীন আওলিয়া শিষ্য ছিলেন। খসরু হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ পারসিক কবি ছিলেন অপরদিকে পারসিক ও আরবী ভাষার সঙ্গে হিন্দীর গুরুত্বও উপলব্ধি করেছিলেন। হিন্দীভাষার প্রথম যুগের লেখকদের মধ্যে খসরুকে গণ্য করা হয়। আমির খসরুকে তুতী-এ-হিন্দ নাম দেওয়া হয়। তিনি হিন্দুস্তানের প্রকৃতি ও মানুষকে, ভাষা ও সংস্কৃতিকে অন্যদেশের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে সমাদার করেছিলেন। খসরুই প্রথম পারসিক ছন্দে তাঁর প্রিয় হিন্দিতে দুই পংক্তির কবিতা রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন।

খসরুর সমকালীন সঙ্গীতকার গোপাল নায়েক ব্রজভাষার যেসব ধ্রুপদী সংগীত রচনা করেন তা বর্তমানকালেও প্রচলিত আছে। আমির খসরুর পরবর্তীকালে খাজা বন্দাহ নওয়াজ গিসু দরাজ (১৩২১-১৪২২) নামে দাক্ষিণাত্যের একজন সুফী সর্বপ্রথম দক্ষিণী বা দাক্ষিণাত্যের রীতিতে লেখা শুরু করেছিলেন। তাঁর গদ্যে মিরাত-উল-আশিকিন নামক গ্রন্থে দক্ষিণী হিন্দীতে সুফীবাদ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে আরবী ও পারসিক শব্দর বহুল ব্যবহার করা হয়েছে উর্দুর ধাঁচে হিন্দী ভাষায় লেখার প্রাচীনতম নমুনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ শতকে প্রধানতঃ সন্ত কবীরের প্রভাবে ও অনুপ্রেরণায় হিন্দীভাষা ও সাহিত্য প্রসারিত হয়েছিল। ভক্তিধর্ম সর্বজীবে প্রেম ও মানবতার মূলমন্ত্র এবং সূফীবাদের ইসক বা ভালবাসার বন্ধন সকলকে আপন করার প্রচেষ্টাকে অতীন্দ্রবাদী কবীর পরমেশ্বর প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে করতেন। নির্গুণ ব্রহ্মকে তিনি প্রেমভক্তির দ্বারা লাভ করতে চেয়েছিলেন। কবীরের কাছে রাম ও রহিমের কোন পার্থক্য ছিল না কারণ একই পরম পুরুষেরই তাঁরা প্রকাশ এবং বিশ্বজগতে দয়াময় ঈশ্বরের কৃপা সর্বজীবের উপর বর্ষিত হয় ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অস্তিত্বকে প্রকাশিত করে। কবীরের ধ্যানধারণা অতীন্দ্রকাব্যের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। কবীরের অজস্র দোঁহায়, তাঁর বাণী ও বীজকা বা বীজগ্রন্থ কবিতার ভাষায় প্রচারিত হয়েছিল। গুরু নানকের (১৪৬৯-১৫৩৯) ঈশ্বর বিশ্বাস ও ভক্তির বাণী কবীরের বক্তব্যের ন্যায় সহজ, সরল ও মধুর ভক্তিভাবের দ্বারা জনমনকে আকৃষ্ট করেছিল। কবীরের অনেক দোঁহা শিখধর্মের আদিগ্রন্থ সাহেবে (শিখ গুরুদের ভক্তি ও অতীন্দ্রবাদের বাণী সংকলন) পাওয়া যায়।

অনেক কবিতা ও দোঁহা কবীরের নামে প্রচলিত আছে যাদের মূল রচনার সঙ্গে মিল নেই। এইসব কবিতার ভাষা কবীরের মূল কাব্যের থেকে স্বতন্ত্র। কবীরের কাব্যের একাংশের ভাষা ভোজপুরী হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোজপুরী ভাষায় রচিত হবার পরে ব্রজভাষা, (খালিবোলি ও আওধীর মিশ্রিত) একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। ব্রজভাষা ও দিল্লী অঞ্চলের কথ্যভাষার সঙ্গে মিলিত হওয়াতে সমগ্র উত্তর ভারতে কবীরের কবিতা ও দোঁহা জনপ্রিয়তা লাভ করে। এইসব কাব্য পাঞ্জাব এবং বিহারেও জনগণের কাছে প্রিয় ছিল। গুরু নানক ও তাঁর শিষ্যরা কবীরের ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং পাঞ্জাবের সূফীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। সূলতান ও পাকপত্তনের প্রসিদ্ধ সূফী সাধক বাবা ফরিদ উদ্দীন গঞ্জ-ই শকরের (১১৭৫-১২৬৫) রচিত দুটি কবিতাকে আদি হিন্দী ভাষার নমুনা বলে ধরা যায় শিখধর্মের পবিত্র গ্রন্থে এই দুটি স্থানলাভ করেছে। নানক ও তাঁর অনুচররা গুরুমুখী ও পাঞ্জাবী ভাষার প্রসারে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কবির, নানক ও শ্রীচৈতন্যের ন্যায় দাক্ষিণাত্যের তেলেগু ব্রাহ্মণ বল্লভাচার্য (১৪৭৯-১৫৩১) ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা হিসাবে ব্রজভাষায় কৃষ্ণ নামের প্রচারে শিষ্যদের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে যাঁরা ব্রজভাষায় শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা ও ভক্তিমার্গর অনুগামী ছিলেন তাঁদের মধ্যে সুরদাসের (১৪৮৩-১৫৬৩) নাম সর্বাগ্রে গণ্য হয়। মীরাবাঈ-এর (১৪৯২-১৫৪৬) নাম ভক্তি আন্দোলনের কাব্য ও ভজন রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মীরার কাব্য ও ভজন মূলতঃ রাজস্থানী এবং পরে খারিবোলী ও গুজরাটীতে পরিবর্তিত হয়ে ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

www.pathagar.com

আওধী রীতিতে রচিত হিন্দীতে এই ভাষার প্রাচীন নমুনা পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতকে দামোদর পন্ডিত লিখিত উক্তি বিভিন্ন প্রকার আওধী কথ্য ভাষার উদাহরণ হিসাবে ধরা হয়। এই ভাষার পরবর্তী গ্রন্থ মৌল্লা দাউদের (১৩৭০) চন্দ্রায়িনের নায়ক নায়িকার নাম যথাক্রমে লোরিক ও চন্দা। কুতবান নামে আরেকজন লেখক মৃগাবতীর (১৫০১) রচনা করেছিলেন। কুতবান সুফী সাধক শেখ বুরহানের শিষ্য ছিলেন। এই লেখক জৌনপুরের সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। মৃগাবতীকে একটি রাজপুত রোমান্স বলে গণ্য করা হয়। কুতবানের পর মানযাহানের ১৫৩২ সালের রচিত মধুমালতী এই যুগের হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলে গণ্য করা যায়। মানযাহান তাঁর গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন তা সত্ত্বেও উত্তর ভারতে এই গ্রন্থ কল্পনার পরিপূর্ণ বিকাশের নিদর্শন হিসাবে হিন্দী সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে গণ্য করা হয়। পরবর্তীকালে আওধী ভাষায় বহু গুরুত্বপূর্ণ লেখক দেখা যায়।

এই সূত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে হিন্দী ও উর্দুর উৎপত্তির মূলে রয়েছে সাধারণের বোধগম্য একই কথ্য ভাষা এবং সেইজন্য এই দুয়ের প্রকৃতিতে বিশেষ পার্থক্য নাই। হিন্দীর উৎস ও অনুপ্রেরণা ছিল সংস্কৃত এবং উর্দুর উৎপত্তির ও প্রেরণার মূলে রয়েছে পারসিক। দাক্ষিণাত্যের হিন্দী লেখক বন্দা-নওয়াজ গেসু দরাজ (১৩২১-১৪২২) ছিলেন একজন সুফী। তাঁর লিখিত মিরাৎ-উল-অশিকীন সুফীবাদ সম্পর্কে গদ্যে লিখিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম হিন্দীকে উর্দুর আকারে ব্যবহার করা হয়েছিল। কবীর ও মালিক মহম্মদ জয়সী বহু পারসিক শব্দ ব্যবহার করেছেন পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে উর্দু ভাষার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল।

রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার প্রসার

প্রাচীন রাজস্থানী বীরত্বের গাঁথা, সংগীত, দোঁহা ও ডিংগলে বা প্রাচীন মাড়ওয়ারী ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে গুজরাটীর বিশেষ পার্থক্য নাই। কারণ প্রাচীন পশ্চিমী রাজস্থানী ১৫৫০ সাল পর্যন্ত রাজস্থানী ও গুজরাটী ভাষার ভিত্তি ছিল। ১৫৫০ সালের পর থেকে পরবর্তীকালের রাজস্থানী ভাষা স্বীয়রূপ পরিগ্রহণ করে। এই কারণে 'কানাহাড়া-দে প্রবন্ধকে' গুজরাটী ও রাজস্থানী উভয় সাহিত্য স্ব স্ব সম্পদ বলে দাবি করেছে। মীরাবাঈকেও গুজরাটী, রাজস্থানী ও হিন্দি ভাষার ও সাহিত্যের পক্ষ থেকে এই কারণে দাবি করা হয়।

পূর্বাঞ্চলীয় পাঞ্জাবী সাহিত্যের ভাষায় ব্যবহৃত হয় এবং পশ্চিমাঞ্চলের পাঞ্জাবী কেবলমাত্র কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে নিবদ্ধ এবং পশ্চিমী অঞ্চলেও সাহিত্যের ভাষা হিসাবে পূর্বাঞ্চলীয় পাঞ্জাবীর চলন রয়েছে। গুরুনানকের জীবনীকার ও শিষ্য বালা পাঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্য গুরুর জীবনী বা জনমসাখীতে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন। এই জনমসাখী বা জীবনী গুরু নানকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৫৩৮ সালে রচিত হয়েছিল। ১৬০৪ সালে গুরু অর্জুন আদিগ্রন্থের সংকলন করেছিলেন। আদিগ্রন্থে ব্রজভাষার সঙ্গে কোশলীর মিশ্রিত ভাষার ব্যবহার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং স্থানে স্থানে বিশেষত কোন কোন কাব্যে পাঞ্জাবী রীতি অনুসৃত হয়েছে। গুরু নানক গুরুমুখীর (বা গুরুর মুখ নিঃসৃত বাণী) অক্ষর প্রবর্তন করেছিলেন,

জৈন অপভ্রংশ সাহিত্যের ঐতিহ্য গুজরাটের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছিল। প্রাচীন গুজরাটী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমযুগের সাহিত্য ১০০০ সাল থেকে ১৪৫০ অবধি বিস্তৃত। তৎপরবর্তী কাল থেকে মুঘলদের গুজরাট জয় পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ গণ্য করা হয়। গুজরাটের সন্ত, পন্ডিত ও বৈয়াকরণিক জৈনশাস্ত্রজ্ঞ হেমচন্দ্রের (১০৮৮-১১৭৩) সমসাময়িক অপভ্রংশ থেকে প্রায় একশত দুইটি চরণের কবিতার সংকলন করেছিলেন। এই অপভ্রংশের ভাষা মাতৃভাষার ন্যায় তৎকালীন যুগে ব্যবহৃত হত। এই সংকলনের ভাষা হিন্দি (ব্রজভাষা ও খারিবোলি) মাড়ওয়ারী ও গুজরাটীরা তাঁদের মাতৃভাষার পূর্বতন রূপের নমুনা বলে দাবি করেছেন। নেমিচন্দ্র

www.pathagar.com

ভান্ডারী চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে জৈন ধর্মের উপর ১৬০টি গাথা রচনা করেন। ১৫৫০ থেকে ১৫৬০ সালের মধ্যে এইসব গাথার গদ্যে দুইটি টীকা পাওয়া যায়।

এইযুগে প্রাচীন গুজরাটী গদ্যে কেবলমাত্র গুজরাটীই নয় মাড়ওয়ার ও মালবের রূপকথা লেখা হয়েছিল এবং এইসব রূপকথার সংকলন বালবোধ নামে পরিচিত। এইসব বালবোধের মধ্যে গুজরাটীতে জৈন সন্ন্যাসী তরুণপ্রভর সংকলন (১৩৫৫) অন্যতম বলে পরিচিত। জৈন ও ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত লেখকদের রচিত গদ্যের ও ইতিবৃত্তের সন্ধান এই সময়কার গুজরাটী সাহিত্যে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ বা অন্য সম্প্রদায়ের যাঁরা জৈন নন তাঁদের লেখা গ্রন্থেরও সংখ্যাও কম নয়। এইসব অলংকার বহুল কাব্যের উদাহরণ হিসাবে বসন্ত বিহারের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া গুজরাটে আশ্রয়প্রার্থী ও পরে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পার্সী সম্প্রদায়ভুক্তরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্থা ত্রয়োদশ শতকে পহুবী থেকে সংস্কৃততে ও চতুর্দশ শতকে গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। প্রাচীন গুজরাটী কাব্যের মধ্যে রণমল্লচন্দা, উষা-হরণ, সীতা-হরণ এবং গদ্যে আলংকারিক ভাষায় প্রবোদ-চিন্তামণি, পৃথ্বীচন্দ্রচরিত (১৪২২ সালের পূর্বে রচিত) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন গুজরাটী কাব্য ও গদ্যের রেশ ষোড়শ শতকের সূত্রপাত পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। প্রায় দেড় শতক বাদে একটি নতুন ঐতিহ্য মধ্য গুজরাটীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে রচিত কানাহ্যাডা-দে প্রবন্ধ পদ্মনাভ কর্তৃক প্রাচীন গুজরাটীতে সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সঙ্গে গুজরাটের সর্বশেষ হিন্দুরাজা কর্ণের সংঘর্ষ বর্ণনা করেছে। প্রাচীন গুজরাটীতে রচিত হওয়ার জন্য এই গ্রন্থ জনপ্রিয় ছিল না। বর্তমানে কানহ্যাডা-দে প্রবন্ধ আধুনিক গুজরাটীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

নরসিংহ মেহেতা (১৪১৫-১৪৮১) ভক্তি মতবাদের মাধ্যমে গুজরাটী সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করেছিলেন। তিনি অন্যান্য ভক্তিধর্ম প্রচারকদের মতন জাতিবর্ণ-বিভাগের বিরোধী ছিলেন এবং জাতপাতের বেড়াজাল ভাঙার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর ভক্তিসংগীতে কৃষ্ণরূপী পরমেশ্বরের ভজন ও গুণগান প্রচারিত হয়েছিল। নরসিংহ মেহতার কাব্য আজও গুজরাটে সমাধৃত। বেদান্ত ভিত্তিক জ্ঞান, ঈশ্বরে প্রীতিও ভক্তি এবং বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত নরসিংহ মেহতা উত্তরভারতের ভক্ত ও সন্তদের দ্বারা এবং মহারাষ্ট্রের প্রেমভক্তি প্রচারক জ্ঞানদেব, নামদেব ও অন্যান্য ভক্তিধর্ম প্রচারকদের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বল্লভাচার্যের পূর্বে গুজরাটে নরসিংহ মেহেতা ভক্তিধর্মের প্রচার করেছিলেন। পরবর্তীকালে মীরার ভজন গুজরাটের জনগণকে ভক্তিধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। আরেকজন প্রখ্যাত গুজরাটী কবি ভালনা ব্রজভাষায় সুরদাসের সংগীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গুজরাটী ও ব্রজভাষায় ছোট ছোট গীতিধর্মী কাব্য রচনা করেন। ষোড়শ শতকে বল্লভ মেওয়াদো পরমেশ্বরী করুণাময়ীর মাতৃবন্দনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ষোড়শ শতকে প্রধানতঃ বল্লভাচার্যের প্রবর্তিত ভক্তিমার্গ গুজরাটের জীবন ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। এই শতকে ভক্তিমার্গের অনুসরণকারী কবিরা গুজরাটে সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করেছিলেন।

খ্রিস্টীয় এক হাজার সাল থেকে মারাঠী ভাষার সূত্রপাত বলে ধরা হয় কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে কোন লেখকের বা সাহিত্যের সন্ধান মারাঠী ভাষায় পাওয়া দুষ্কর। মারাঠীকে প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং এর সঙ্গে কোংকনী কথ্যভাষার ও উত্তরভারতীয় আর্যভাষার কোন কোন বিষয়ে মিল দেখা যায়। মহারাষ্ট্রে ভক্তিকবি নামদেব ও তাঁর উত্তরসূরীদের সময় থেকে মারাঠীভাষা সমৃদ্ধ হয়েছিল। ভক্তিধর্মের অবদান দাক্ষিণাত্যে যে ধর্মীয় ও সামাজিক পুনরুত্থান এবং সংস্কারের আন্দোলন পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে সূত্রপাত করেছিল রাণাডে তাকে ইউরোপের প্রটেষ্টান্ট ধর্মসংস্কারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচার ও শুষ্ক আচরণ সর্বস্বতার বিরুদ্ধে ও জাতিবর্ণভিত্তিক বিভেদের প্রতিবাদে ভক্তি আন্দোলনের হৃদয়গ্রাহী আকুল আবেদন জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। ফলে কারিগর শ্রেণীর লোক ও ব্যবসায়ীরা এই আন্দোলনের

www.pathagar.com

সমর্থক ও অনুগত হয়েছিল। নামদেবের মৃত্যুর পর (১৩৫০ খ্রীঃ) তুকারাম, রামদাস, বামন পণ্ডিত, একনাথ প্রভৃতির প্রচারকরা মহারাষ্ট্রের জনগণের কাছে মাতৃভাষায় ভক্তিধর্মকে প্রচার করেছিলেন। * তুর্কী আক্রমণের ফলশ্রুতিতে যুদ্ধ ও বিশৃংখলার দরুণ সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠার পরও কিছুকাল ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মহানুভব সম্প্রদায় ও বারকারী সম্প্রদায়ের অনুচরদের প্রচেষ্টায় পুনরায় ভক্তি সংগীত ও কাব্যের প্রভাব জনগণের মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল। নরসিংহ্‌ সরস্বতী ও একনাথের গুরু জনার্দন স্বামী মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের সহায়ক ছিলেন। তাঁরা উভয়েই এ-যুগের লেখক ও শিক্ষক হিসাবে বারকারী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। নরসিংহ সরস্বতীর একজন শিষ্য 'গুরু-চরিত' নামে কাব্য কাহিনী রচনা করেছিলেন। এই কাব্যে দেবতুল্য সন্ত দত্তাত্রেয়র সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

বংলাভাষা

বঙ্গভাষা, উড়িয়া, মৈথিলী ও অন্যান্য পূর্বভারতীয় কয়েকটি ভাষা প্রাচীন মাগধী প্রাকৃতের থেকে উদ্ভূত। বঙ্গদেশে তুর্কী বিজয়ের ফলে মাতৃভাষার প্রসারে বাধা সৃষ্টি হয়নি, বরং সুলতানী শাসনের আমলে মাতৃভাষা সমাদৃত হয়েছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক দীনেশ চন্দ্র সেনের মতানুসারে ** "'ব্রাহ্মণগণ' প্রথমতঃ ভাষা গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও বংশীদাসকে ইহারা সর্বনেশে উপাধিপ্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদগণের জন্য ইঁহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।" এই অবস্থায় সংস্কৃত পুরাণ ধর্মশাস্ত্র, অলংকার ও দর্শন রাজসভায় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং বঙ্গভাষার সেখানে স্থান পাওয়ার সম্ভবনা ছিল না। দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় বলা যায়—"আমাদের বিশ্বাস মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।" কারণ হিন্দু প্রজাদের সঙ্গে বহুকাল বসবাসের ফলে বাংলাভাষাকে মাতৃভাষার মত তাদের কাছে সমাদর লাভ করেছিল।

তুর্কী বিজয়ের দেড়শত বৎসরের শুরুতে সংঘর্ষের পরে শাসনব্যবস্থা সুসংগঠিত হয় এবং শান্তি ও শৃংখলা স্থাপিত হয়েছিল। প্রথমের দিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন বিকাশ হয়নি। কিন্তু শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি প্রবর্তনের পর শাস্ত্র আলোচনার পুনঃ প্রবর্তন ও পুনরুজ্জীবন দেখা যায়। এই যুগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মাতৃভাষায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনা (১৪১৮)। কৃত্তিবাস রামায়ণ কথা বিবৃত করেছেন। কিন্তু তাঁর লেখনীতে যে জনগণের বোধগম্য ভাষার নমুনা পাওয়া তা সহজ ও স্বাভাবিক। গৌড়ের সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারতের অনুবাদ হয়। মহাভারতের অনুবাদের জন্য কবিন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হুসেনশাহ্‌র সেনাপতি পরগল খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন এবং কবিন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর দরবারে সভাকবি ছিলেন। তাঁর রচিত মহাভারত হুসেনশাহ্‌র সিংহাসন লাভের সময় (১৪৯৩) থেকে নসরৎশাহের রাজত্বকাল চলাকালীন সময়ের মধ্যে (১৫৩২) রচিত হয়েছিল। কবিন্দ্রের কাব্যের নাম হল পাণ্ডব বিজয়। পরগলখাঁর পুত্র ও চট্টগ্রামের পরবর্তী শাসক ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকরনন্দী জৈমিনী ভারত অবলম্বনে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেছিলেন।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে গীতিধর্মী কাব্যের লেখক হিসাবে চণ্ডীদাসের নাম সুপরিচিত। বাংলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রায় ১২৫০টি কাব্য প্রচলিত আছে। ভাষা ও গুণমানের বিচারে এই

* Rise of the Maratha Power by Mahdeo Govind Ranade (Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting April 1961, reprint 1966, first published in 1900 by Puncale Kar & and Co, Bombay) পৃঃ ৪-৫।

** বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (অষ্টম সংস্করণ), পৃঃ ৭৩-৭৪।

www.pathagar.com

কাব্যগুলি যে একই লেখকের নয় তা স্বতঃসিদ্ধ। তবে শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) চন্ডীদাসের পদাবলী শুনে আনন্দলাভ করতেন। তিনি যে শ্রীচৈতন্যের পূর্বে তার গীতধর্মী কাব্য রচনা করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বড়ু চন্ডীদাস, চন্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চন্ডীদাস প্রভৃতি অনেকেই এই নামের আড়ালে কাব্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের লেখক বড়ু চন্ডীদাস পুরানাদি ও গীতগোবিন্দ এবং লৌকিক ভাবনার সংমিশ্রণে তাঁর রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক আখ্যান কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যের ভাষা চর্যাপদ ব্যতীত অন্য যে কোন লেখার থেকে প্রাচীন এবং নিঃসন্দেহে প্রাকচৈতন্যযুগের। এছাড়া দীন চণ্ডীদাস নামে আরেকজন লেখক আখ্যান ধর্মী পদাবলী রচনা করেছিলেন। তৃতীয় চন্ডীদাস ছিলেন সহজিয়াসাধক ও রজক-কন্যা রামীকে সাধন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় চন্ডীদাসের ভাব ও ভাষা থেকে তাঁদের চৈতন্যোত্তর যুগের লেখক বলে অনুমান করা হয়। প্রথমজন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লেখক হিসাবে প্রাচীনতর এবং তাঁর উৎকৃষ্ট পদাবলী শ্রীচৈতন্যের প্রিয় ছিল। প্রাক-চৈতন্য যুগের লেখক হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কবি বড়ু চন্ডীদাস যে স্থূলভাবের ও আদিরসাত্মক কাব্যের আভাস দিয়েছেন তার সঙ্গে গীতগোবিন্দের রসাভাসের (অর্থাৎ রসের ত্রুটির) তুলনা চলে। বাংলাসাহিত্যে উপযুক্ত তথ্যাদির অভাব আছে বলে সঠিকভাবে চন্ডীদাস সমস্যার মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি।* চন্ডীদাসের সঙ্গে এক সাথে মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির নাম উচ্চারিত হয়। শেষোক্ত কবি মৈথিলী হলেও বৈষ্ণব পদসাহিত্য থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া যায় না। চতুর্দশ শতকের শেষভাবে মধুবনী মহকুমার বিসফী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে বিদ্যাপতির জন্ম হয় এবং ১৪৬০ সালের পর তার মৃত্যু হয়। বিদ্যাপতি ঠাকুর সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বৈষ্ণব শাক্ত ও শৈব সবমতের সম্বন্ধে সমদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। মৈথিলী ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন। মৈথিলীর সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রনে যে ব্রজবুলির সৃষ্টি হয়েছে তা শ্রুতিমধুর এবং ব্রজবুলির আদর্শে বাংলায় প্রচলিত এই বিদ্যাপতির ভাষা অনেকক্ষেত্রে এই মিশ্রভাষায় পরিণত হয়েছে। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের পথিক ছিলেন। তাঁর শিল্পপ্রতিভা আদিরসকে ভক্তিরসে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। বৈষ্ণবভক্তের চরম আকূতি তাঁর কাব্যে 'অতি মধুর আত্মসমর্পণের' মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যাপতি বলেছেন:

'মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥'

বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন ও আকূতি বৈষ্ণব জনোচিত এবং বৈষ্ণবপদের জন্য এই মৈথিলি কবিকে বাঙালী আপনজন বলে গ্রহণ করেছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকার মালাধর বসু, সুলতান রুকনউদ্দীন বরবক শাহর (১৪৫৯-১৪৭৪) গুণরাজ খাঁ উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ রচনাকাল বাংলার দুইজন সুলতান রুকনউদ্দীন বরবক্ শাহ্ এবং সাম্সুদ্দীন ইউসুফশাহর (১৪৭৪-১৪৮১) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মালাধর বসু বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রাম নিবাসী ছিলেন এবং তাঁর কৃষ্ণবিজয় 'মূলভাগবত পুরাণের অনুসারী এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই।' মালাধর বসু পরবর্তীকালে তাঁর গ্রন্থের জন্য বৈষ্ণব সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন এবং স্বয়ং চৈতন্যদেব কুলীন গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

'তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর
সেও মোর প্রিয় অন্যজন বহু দূর'

মালাধরের কাব্যে চৈতন্যযুগের আগমনীবার্তার ইংগিত আছে। এইজন্য তাঁকে 'যুগসন্ধির সংযোগকারী যুগন্ধর মহাকবি' বলা যায়।

* অধ্যাপক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৯৯-১০৪ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

বাংলাসাহিত্যে চৈতন্যযুগ চেতনার অনুপ্রেরণা সর্বময় মুক্তি ও ব্যাপ্তির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। ফলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন স্বধর্মে উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। "চৈতন্যকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্য মানব-জীবনাভিমুখী হয়েছে।' বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐতিহ্য শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন, সাধনতত্ত্ব ও ভক্তিবাদের প্রভাব পড়েছিল এবং কৃষ্ণপ্রেমের কবিতা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ব্যাখ্যানুযায়ী আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের লীলা ও প্রেম নিয়ে কাব্য লেখার রীতি ছিল। চৈতন্য যুগ থেকে বাৎসল্য ও সখ্যরসের কাব্য লেখা সংযোজিত হয়েছিল। প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব আখ্যান কাব্যের দুইটি ধারা দেখা যায়। প্রথমধারা ভাগবত পুরাণের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময়রূপ বর্ণনা করে যেমন মালাধর বসুর কৃষ্ণবিজয় গ্রন্থে দেখা যায়। দ্বিতীয়টি লোক উৎস জাত এবং কৃষ্ণের লীলাময় মাধুর্যের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

চৈতন্য প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারার জন্ম হয়েছিল যাকে চরিতসাহিত্য বলা যায়। শ্রীচৈতন্য জীবনকাহিনী ও মাহাত্ম্য দিয়ে চরিত সাহিত্যের যাত্রা শুরু। এছাড়া চরিত সাহিত্যে কয়েকজন বৈষ্ণব মহাত্মার জীবনীও রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে লেখা ছোট ছোট বইগুলি কড়চা-নিবন্ধ নামে পরিচিত।

বাংলা ভাষায় চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীকার ছিলেন বৃন্দাবন দাস। তিনি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। ভাগবতের আদর্শে চৈতন্যজীবনী রচনার প্রয়াসে বৃন্দাবন দাস কৃষ্ণজীবনের অনেক অলৌকিক ঘটনা চৈতন্যের উপর আরোপ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় বলা যায় 'চৈতন্য-লীলায় ব্যাস বৃন্দাবন দাস।' ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের পর চৈতন্য ভাগবতের রচনা সম্পূর্ণ হয়। লোচনদাস ছিলেন চৈতন্যদেবের অন্যতম জীবনীকার। তিনি নরহরি দাসের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং মুরারীগুপ্তের কড়চা পড়ে মহাপ্রভুর জীবনীরচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। আনুমানিক ১৫৫০-৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়েছিল। গুরু নরহরি দাসের প্রভাবে লোচনদাস গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণের অবতার রূপে কল্পনা করেছিলেন। লোচনদাস এই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য লোচনদাস তার কাব্য রচনা করেছিলেন এবং ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠতা রক্ষা করা তাঁর লক্ষ্য ছিল না। কাব্যমাধুর্যে লোচনাদাসের পদাবলী মনোমুগ্ধকর। জয়ানন্দমিশ্রের লেখা চৈতন্যজীবনী ও চৈতন্যমঙ্গল নামে পরিচিত এবং লোচনদাসের কাব্যগ্রন্থের সমসাময়িক কালে ১৫৬০ সালের কাছাকাছি এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণব জনের প্রীতার্থে জয়ানন্দের গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কাব্য লক্ষণের অভাব সত্ত্বেও তাঁর গ্রন্থে কতকগুলি নতুন তথ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এইসব তথ্যের অন্যতম হচ্ছে নবদ্বীপ রাজনৈতিক বিপর্যয় যা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে হাবসী শাসনের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে। কিন্তু জয়ানন্দের অন্যান্য তথ্য সবসময় ইতিহাস সম্মত নয়। তাঁর কাব্য মঙ্গলকাব্য ও পৌরাণিক রীতি প্রকরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কে বাস্তবানুগ বিবরণ দেবার প্রচেষ্টা করেছেন।

চৈতন্য চরিতামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চৈতন্যজীবনী কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতরা একমত হতে পারেননি। অনেকের মতে ১৬১২-১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ ১৫৯০-৯২ খ্রীষ্টাব্দের পর কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থর রচনা শুরু করেছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বৃন্দাবনের সংস্কৃতজ্ঞ গোস্বামীরা রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে যে সব তত্ত্বকথা পরিবেশন করেছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তা সরলভাবে ব্যাখ্যা করে সর্বজনবোধ্য করেছিলেন। সহজবোধ্য ভাষায় চৈতন্য জীবনের তাৎপর্য বর্ণনা ও বৈষ্ণবধর্মের দর্শন, ভক্তি ও তত্ত্বকথার পরিবেশন করা তাঁর লক্ষ্য ছিল এবং তিনি সেই উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভ করেছিলেন।

চৈতন্য পরবর্তী যুগে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও শেষভাগে বলরামদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তা 'বৈষ্ণব-পদাবলীর ঐশ্চর্য-যুগের সূচনা করলেন।' দুই বলরাম দাসের মধ্যে

www.pathagar.com

বাৎসল্যরসের কবি বলরাম দাস ষোড়শ শতকের শেষার্ধে কৃষ্ণনগরের কাছে দোগাছিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্ণবসাহিত্যে তাঁর বাৎসল্য লীলার কাব্য অতুলনীয়। আরেকজন বলরাম দাস সপ্তদশ শতকের পদকর্তা। রাধার বিরহবেদনা বর্ণনায় রচিত পদগুলির জন্য বৈষ্ণবসাহিত্যের ইতিবৃত্তে তাঁর আসন স্থায়ী হয়েছে। বৈষ্ণব পদসাহিত্য চৈতন্যোত্তর যুগে জ্ঞানদাসের নাম পদকর্তা হিসাবে স্মরণীয়। তিনি নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবীদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কাটোয়ার নিকট কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ কুলে তাঁর জন্ম হয়। তিনি বাংলা ও ব্রজবুলী উভয় ভাষায় পদরচনা করেছিলেন। যথাক্রমে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে বাংলা ও ব্রজবুলীতে তাঁর রচনার আদর্শ করেছিলেন। বাংলায় তাঁর সরল স্বতঃস্ফূর্ত রচনার মাধুর্য অতুলনীয়, ব্রজবুলীতে তাঁর রচনা খনিকটা কৃত্রিমভাবে অতীতের বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করেছে। গোবিন্দদাসের লেখা পদগুলি ব্রজবুলীতে রচিত। কবি ছিলেন বৃন্দাবনের অন্যতম পণ্ডিত ও ভক্ত শ্রীজীব গোস্বামীর প্রিয় বন্ধু। গোবিন্দ দাস তাঁর পদাবলীতে বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষা আত্মস্থ করেছিলেন। চৈতন্যভাবাদর্শে রচিত তাঁর কাব্য কল্পনা ও ভাবের সমাবেশ এক অপূর্ব গীতধারার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যের অপরূপ বিকাশ এবং তৎসহ মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদসাহিত্যে নবজীবনের সঞ্চার করেছিল। ষোড়শ শতকে চৈতন্য সংস্কৃতির এই জোয়ারের ফলে বাঙালীর সমগ্র জীবন চেতনায় যে অভূতপূর্ব বিকাশ দেখা যায় তার বিভিন্ন ধারা বাংলা সাহিত্যকে সিঞ্চিত করেছিল।*

মধ্যযুগের অন্যান্য ভাষা

আধুনিক যে সব ভারতীয় ভাষা ইন্দো-আর্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাদের আঞ্চলিক শাখার সাহিত্য পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বিকশিত হয়েছে। এই বিকাশের মূলে প্রধানতঃ দুইটি উৎস দেখা যায়। প্রথমতঃ, সংস্কৃতভাষার ঐতিহ্যের প্রতিও সংস্কৃত মহাকাব্যগুলির সম্পর্কে কৌতূহলের পুনর্জন্ম এবং দ্বিতীয়তঃ, বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের নবজাগরণ ও রামায়ণ ও মহাভারতে ভক্তের ভগবান যথাক্রমে রাম বা কৃষ্ণের প্রতি অচলা বিশ্বাস ও প্রেম। ভক্তিধর্মের প্রসারে শিব ও শক্তির প্রতি ভক্তের প্রীতি ও আত্মসমর্পণ কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

পঞ্চদশ শতকে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসামে পীতাম্বর ও মানকর যথাক্রমে উষাহরণ ও বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনী নিয়ে বহু প্রেমসংগীত রচনা করেছিলেন। কিন্তু আসামে বৈষ্ণব প্রেমভক্তি আন্দোলনের পুরধা ছিলেন সন্ত ও কবি শংকরদেব (১৪৪৯-১৫৬৮)। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে আসামের সর্বভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা হিসাবে এই প্রদেশের হিন্দু সমাজকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করেছিলেন। শংকরদেব জনগণের জন্য প্রায় ২৭টি কাব্য প্রার্থনা ও সংগীত রচনা করেছিলেন। এই সব কাব্যে ছিল রামায়ণ ও ভাগবত পুরাণের আংশিক অনুবাদ, কীর্তন, রুক্মিনীহরণ কাব্য ইত্যাদি। পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করে তিনি নাটক রচনা করেছিলেন এবং বর-গীত নামে ভক্তি সংগীত জনপ্রিয় করেন। তাঁর শিষ্য মাধবদাস (১৪৮৯-১৫২৬) গুরুর পদাংক অনুসরণ করে সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। উড়িয়া ভাষায় জগন্নাথদেবের মন্দিরে তালপত্রে লিখিত ইতিবৃত্তি মাদলাপঞ্জী দ্বাদশ শতকে রচিত হয়েছিল। চতুর্দশ শতকে বৎসদাস, নারায়ণানন্দ অবধূত স্বামী, সরল দাস (চণ্ডীপুরাণ, বিলংকা রামায়ণ ও সংক্ষিপ্ত মহাভারতের লেখক) এবং মার্কণ্ড দাস প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকে অর্জুনদাস (রামবিবাহের লেখক), নীলাম্বর দাস (জেমিনী মহাভারত ও পদ্মপুরাণের লেখক) ও অন্যান্য কয়েকজন উড়িয়া সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করা যায়। চৈতন্যদেবের উড়িষ্যায় পদার্পণের সময় চৈতন্যভক্ত প্রতাপরুদ্রদেব ছিলেন উৎকলের রাজা। এই সময় বৈষ্ণবধর্মের ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে উড়িয়া সাহিত্যে যে নবযুগের সূচনা হয়েছিল তাকে জগন্নাথদাসের যুগ বলা হয়। এই যুগে জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, যশোবন্ত,

* বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়) চতুর্থ সংস্করণ (বুকল্যান্ড প্রাঃ লিঃ)—শ্রীভূদেব চৌধুরী পৃঃ ১৫০, ২৬৯ সেকালের চৈতন্য : একালের চৈতন্য (শ্রীচৈতন্য : একালের দৃষ্টিকোণ) ক্ষেত্রগুপ্ত, পৃঃ ৯০-৯১।

www.pathagar.com

অনন্ত ও চুতানন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বলরাম দাস উড়িয়া ভাষায় রামায়নের অনুবাদ করেছিলেন (১৫০০ খ্রী:)। তার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ভগবৎগীতা, বেদান্তসার ইত্যাদির নাম করা যায়। জগন্নাথ দাস শ্রীচৈতন্যের প্রিয় অনুবর ছিলেন। তিনি ভাগবত পুরাণের অনুবাদ করেন। জগন্নাথ দাসের সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য লেখকরা উড়িয়া সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। রায় রামানন্দ দাস চৈতন্যদেবের বিশেষ ভক্ত হিসাবে পরিচিত।

দাক্ষিণাত্যের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য সমূহ এবং উর্দুভাষা

দ্রাবিড় ভাষা ও সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে। ষষ্ঠ শতকের পূর্বে তামিল সাহিত্যে ধর্মীয় প্রভাব অপেক্ষা জাগতিক বিষয়ের অধিক প্রাধান্য ছিল। কিন্তু তৎপরবর্তী যুগে ধর্মীয় চেতনা ক্রমান্বয়ে প্রসরিত হতে থাকে এবং অবশেষে ভক্তিধর্মের প্রেমভক্তির কাব্য, শৈব নায়নার ও বৈষ্ণব আলভা সন্ত সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নবম শতকে এর ফলশ্রুতিতে কামবনের রামায়ণ ধ্রুপদী সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া কানাডা ও তেলেগুর সাহিত্যের ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন ও শেষোক্ত দুইটির মধ্যে কানাড়া ভাষা তেলেগুর তুলনায় পুরাতন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। নবম শতকে এই ভাষায় লিখিত কবিরাজমার্গের মধ্যে অন্যান্য গ্রন্থের উল্লেখ থেকেপ্রমাণিত হয় যে ইতিপূর্বে কানাড়া সাহিত্যে সাবালকত্ব অর্জন করেছিল। তামিল, তেলেগু ও কানাড়া ভাষায় শ্রীবৃদ্ধিতে জৈনধর্মের অনুপ্রেরণা ছিল। কানাড়া সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ছিল। তামিলের অবদান এই ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। আবার একথাও অনস্বীকার্য যে কানাড়া, তেলেগু ও মালায়লম ভাষা সংস্কৃতের ঐতিহ্য ও ভাষায় সমৃদ্ধ হয়েছিল।

সংস্কৃতের ন্যায় কাব্যে ও গদ্যে মিশ্রিত সাহিত্যের রীতি কানাড়া ভাষায় দশম থেকে দ্বাদশ শতকে চম্পা নামে প্রচলিত হয়েছিল এবং পম্পা, পুন্না ও রানা কানাড়া সাহিত্যের ত্রিরত্ন এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন। মহাভারতের তেলেগু ভাষায় প্রসিদ্ধ অনুবাদক ছিলেন নারায়ণান্না (পঞ্চদশ শতক)। কবি টিকান্না ত্রয়োদশ শতকে চম্পা রীতির অনুসরণ করেন। বীর শৈব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আন্দোলনের প্রবর্তক বাসব ও তাঁর অনুচররা কর্নাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে সহজ সরল গদ্য রীতির বা 'বচনের' প্রবর্তন করেছিলেন। কানড়া ও তেলেগু সাহিত্যের বিস্তারে অন্য দুইটি প্রভাব সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সূচনা করেছিল। এই দুইটি প্রভাবের মধ্যে একটি হচ্ছে চতুর্দশ শতকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে সারা ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার। উভয় ঘটনাই হিন্দুধর্মের সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকারের পুর্নজাগরণে সহায়তা করেছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্য ষোড়শ শতকে কৃষ্ণদেবরায়ের রাজত্বকালে গৌরবের চরমশিখরে উঠেছিল। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভায় তেলেগু সাহিত্যের 'অষ্টদিগগজ' বা কবি অলংকৃত করেন। প্রসিদ্ধ তেলেগু লেখক পেড্ডন কৃষ্ণদেব রায়ের সভাকবি ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং তেলেগু ভাষায় 'আমুক্ত মালধ্যা' নামক গ্রন্থের ও বহু সংস্কৃত পুস্তকের রচনাকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সংস্কৃতের প্রভাবে বহু আখ্যানমূলক কাব্য বা প্রবন্ধ এই সময় লিখিত হয়েছিল। এছাড়া বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে কানাড়া ভাষায় ভক্তিমূলক কাব্য রচিত হয়।

উর্দুকে একটি ইন্দো-এরিয়ান ভাষা বলা যায়। উর্দু একটি তুর্কী শব্দ যার অর্থ সৈন্যশিবির। মধ্যযুগে তুর্কী, আফগান, মুঘল প্রভৃতি যে সব বৈদেশিক এদেশে এসেছিলেন তাঁরা সাধারণত পারসিক ভাষা ব্যবহার করতেন। কিন্তু স্থানীয় লোকের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা বিশেষত সৈন্য বাহিনীর লোকেরা এদেশের ভাষা কিছুটা রপ্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে হিন্দুস্থানী ও পারসিক ভাষার সংমিশ্রণে উর্দুর সৃষ্টি হয়। এই ভাষার লেখকরা অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান এবং সেইজন্য পারসিক ও আরবী অটরে উর্দু লেখার রীতি চালু হয়। পঞ্চদশ শতকে দক্ষিণী সুফী সাধক মহম্মদ বান্দা-নওয়াজ গেসু দরাজকে প্রথম উর্দু লেখক হিসাবে গণ্য করা যায়।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

মধ্যযুগের রাষ্ট্রের ধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী

সিন্ধুতে আরব প্রাধান্য একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে গণ্য করা যায়। হিন্দুস্তানের ইতিহাসে তারা কোন স্থায়ী পদচিহ্ন রেখে যেতে পারেনি। ৭১২ সালে বাগদাদের খলিফার আদেশে মহম্মদ বিন কাশেম রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধুতে ইসলামের জয়পতাকা প্রথিত করেছিলেন। হিন্দুস্তানে আরবদের রাজ্যবিস্তারের পথে দাক্ষিণাত্যের চালুক্য নৃপতিরা ও উত্তর ভারতের গুর্জরপ্রতিহার বংশীয় নৃপতিরা অলঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। সিন্ধুবিজয় করে আরবরা হিন্দুদের ধর্মদ্বেষের বশে অত্যাধিক নিপীড়ন করেছিলেন, মধ্যযুগের লেখকরা সে বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই। বরং ইসলাম ব্যতীত অন্যধর্মের মানুষদের ধর্মস্থান সম্পর্কে আরবদের নীতি সম্পর্কে মহম্মদ বিন কাসেম যে উক্তি করেছিলেন আল বিলদারী তা উল্লেখ করেছেন। এই উক্তিতে মহম্মদ বিন কাসেম বলেন যে হিন্দুদের দেবালয়গুলি আমাদের কাছে খ্রীস্টানদের চার্চ, ইহুদীদের সিয়িনাগোগ ও ম্যাগিয়ানদের সূর্য মন্দিরের ন্যায়।* আরবদের সিন্ধু ও মূলতান বিজয়ের পর বিজিত অঞ্চলে জিজিয়া আদায় করা ও মসজিদ নির্মাণ ছাড়া হিন্দুদের প্রতি আরবদের আচরণের পার্থক্য দেখা যায়নি এবং ইতিপূর্বে আরব বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে হিন্দুদের যে সুসম্পর্ক ছিল তার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। ফলে বহুকাল ধরেই সিন্ধু অঞ্চলে বিজয়ী আরবদের বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে ধর্মীয় কারণে সম্পর্কের বিশেষ হানি হয়নি।

হিন্দুস্তানে তুর্কী শাসনের প্রতিষ্ঠা ও শাসকগোষ্ঠীর ধর্মসংক্রান্ত নীতি

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পর প্রায় তিনশতকের ব্যবধানে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে তুর্কী আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতে তুর্কী শাসন স্থাপিত হয়।** তুর্কীরা এদেশে এসেছিলেন তাঁদের পূর্বসূরী শক, হুণ ও অন্যান্য আক্রমণকারীদের পথ অনুসরণ করে। ইতিপূর্বে আর্য অভিযাত্রী ও হিন্দুস্তানে বসবাসকারী অনার্যদের মধ্যে সংঘর্ষ ও পরে সহাবস্থান এবং সমন্বয়ের ফলে তারা একাত্ম হয়ে যায়। পরবর্তীকালে শক-হুণ-গ্রীক ও অন্যান্যরাও একইভাবে মিশে গিয়েছিল ভারতের জনসমুদ্রে। তুর্কী এবং মুঘলরাও একই পথ ও ধারা অনুসরণ করে ভারতে এসেছিল। প্রাথমিক সংঘর্ষের পরে তারা হিন্দুস্তানকে স্বদেশ বলে মেনে নিয়েছিল। কারণ হিন্দুস্তানে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই বর্বর মোঙ্গল আক্রমণের ফলে সমরকন্দ, বোখারা, খিবা প্রভৃতি ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্র ধ্বংস হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে মোঙ্গলদের আক্রমণে খলিফা আল-মুস্তাসিম-বিল্লাহ চেঙ্গিজের বংশধর হুলাগু খানের হাতে নিহত হয়েছিলেন ও ১২৫৮ সালে বাগদাদ মোঙ্গলদের পদানত হয়েছিল। মোঙ্গল আক্রমণে

---

* Elliot and Dowson. (Susil gupta reprint) — History of India, vol-I, পৃঃ-২৩।

** হিন্দুস্তানে তুর্কী বিজয়ের মূলে যে সব কারণ ছিল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বর্ণবৈষম্য ও জাতপাতের বিচার। আলবেরুনী মন্তব্য করেছেন যে হিন্দু শাসকরা প্রজাদের নিপীড়ন করতেন ও অস্পৃশ্যদের নগরের বাইরে বাস করতে বাধ্য করতেন। All Biruni's India-Sachu Tr., Vol-1. পৃঃ- ২২-২৩ ও ১০১-১০২।

www.pathagar.com

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষায় ভারতের তুর্কী সুলতানরা যে যোগ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। বহিরাগত হলেও তুর্কী শাসকগোষ্ঠীর কাছে মোঙ্গল আক্রমণের প্রেক্ষাপটে এইদেশ একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়েছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোঙ্গলদ্বারা তাড়িত মধ্যএশিয়া থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীরা হিন্দুস্থানে নিরাপদ আশ্রয় লাভের আশ্বাস পেয়েছিল। অতএব সর্বস্তরের তুর্কীরা হিন্দুস্তানকে বেহেস্ত বলে মনে করছিল যার জন্য আমির খসরু লিখেছেন,—'ওতনে হিন্দ ফিরদৌস অস্ত'।

সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠার পর কোন সুলতানের পক্ষে ধর্মবিশ্বাস মেনে (দিন দারি) কাজ করা সম্ভব নয় বলে ইলতুৎমিস মন্তব্য করেন এবং তাঁর পক্ষে এটাই যথেষ্ট যদি তিনি ধর্ম বিশ্বাস রক্ষা (দিন পানাহি) করতে পারেন।* তুর্কী সুলতানরা যখন স্থায়ীভাবে হিন্দুস্তান শাসনে উদ্যোগী হলেন তখন শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন অভিজাতরা যাঁরা যোদ্ধা শ্রেণীভুক্ত আর উলেমা বা ধর্মীয় বিশেষজ্ঞরা। এদের যথাক্রমে আহেলী তিগ বা তরবারীর লোক এবং আহেলী কলম বা উলেমা এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। শেষোক্ত শ্রেণীর অধিকাংশ ধর্মীয় ব্যাপারে গোঁড়া ছিলেন এবং সেইজন্য তাঁদের লক্ষ্য ছিল হিন্দুস্তানের মতো অমুসলমান অধ্যুষিত দেশ বা দার উল হারবকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসীর দেশে বা দার উল ইসলামে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা সুলতানকে কেবল পরামর্শ দিয়ে ক্ষান্ত ছিলেন না লেখনীর মারফতে হিন্দুদের সম্পর্কে তাঁদের বিদ্বেষ প্রকাশ করতে বা ইসলামের জয়গান করে অতিরঞ্জিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। জিয়াউদ্দিন বারানী, শামসী সিরাজ আফিফ, ফিরিস্তা এমনকি ইবন বতুতার ন্যায় বিদেশী পর্যটকরাও হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। উলেমাদের একটি দল সুলতান ইলতুৎমিসকে(১২১০-৩৬) আবেদন করে হিন্দুধর্মের মাথা ব্রাহ্মণদের হয় ধর্মান্তকরণ নয় মৃত্যু এই চরমপত্র দিতে বলেছিলেন। কিন্তু সুলতান স্বভাবতই তাঁদের কথায় রাজি হননি।** কারণ তুর্কী সুলতানরা হিন্দুস্তানে জাহান্দারী প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রণী হয়েছিলেন। অবশ্য স্বীয় ধর্মবিশ্বাসরক্ষা করাও ছিল তাঁদের অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু সেজন্য সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করার দায়িত্ব থেকে তাঁরা বিচ্যুত হতে রাজি ছিলেন না। অর্থাৎ সমাজের কোন অংশ যাতে অপর যে কোন অংশের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা সুলতানদের দায়িত্বের অর্ন্তভুক্ত ছিল। রাজ্যরক্ষা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে অনেক সময় সুলতানরা শক্তিপ্রয়োগ করেছেন। রাজনৈতিক স্বার্থে তাঁদের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার। এইজন্য কোন কোন লেখক মধ্যযুগের রাষ্ট্রকে 'মুলুক' অ্যাখ্যা দিয়েছেন।***

উলেমাদের হিন্দুবিরোধী মনোভাব বরাবরই ছিল। সুলতান আলাউদ্দীন খলজীকে বিয়ানার কাজী মুঘিসউদ্দিন বলেছিলেন যে, রাজস্ব সংগ্রহকারীরা রাজস্ব আদায়ের সময় হিন্দুদের হেনস্থা করবেন। কাজি মুঘিসের মতে হিন্দুদের উপর লাঞ্ছনা ও অত্যাচার কেবলমাত্র আইনসংগতই নয়; ইসলামের বিধিতে ধর্মে অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোরতর ব্যবহারের নির্দেশ আছে। অতএব কাজি মুঘিসউদ্দিন সুলতান আলাউদ্দীনকে হিন্দুদের অপমান করে রাজস্ব ও জিজিয়ার প্রভৃতি কর আদায় করতে প্ররোচিত করতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও কাজি মুঘিস শ্রেণীর মত উলেমারা হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষবশত এই ধরণের নীতির পক্ষে ছিলেন। কিন্তু

---

* মধ্যযুগের ভারতে রাষ্ট্র ও ধর্মসংক্রান্ত কিছু সমস্যা-সৈয়দ নুরুল হাসান—মধ্যযুগের ভারত (কে. পি. বাগচি) পৃঃ ৪-৫ দ্রষ্টব্য।

** ঐ

*** History of India as told by its own Historians (E and D), Introduction by Prof. Habib (Aligarh reprint).

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে সুলতানরা উলেমাদের প্রভাব মুক্ত হবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন এবিষয়ে সক্রিয় হয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, সুলতান হচ্ছেন ঈশ্বরের ছায়ামাত্র। কাজি মুঘিসউদ্দীনের কাছে সুলতান আলাউদ্দীন আরো সুস্পষ্টভাবে জাগতিক ব্যাপারে সুলতানের সর্বোচ্চ ক্ষমতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন বলেন যে 'যা কিছু প্রজাদের পক্ষে মঙ্গলজনক তাই আমি করি। তদানুসারে আমি লোকের উপর হুকুমজারি করি। আমি জানি না এটা শরিয়তের বিধি অনুযায়ী কিনা। যা কিছু রাষ্ট্রের পক্ষে হিতকর বলে আমি মনে করি তাই আমি করি এবং আমি বলতে পারব না শেষবিচারের দিনে ঈশ্বর এজন্য আমার সম্পর্কে কি রায় দেবেন।'* আলাউদ্দীন বলবনের পথ অনুসরণ করে রাষ্ট্রকে উলেমাদের প্রভাব মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং বলবনের থেকেও এ-বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হয়েছিলেন।

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে মরক্কোর পর্যটক ইবনবতুতা সুলতানের রাষ্ট্রপরিচালনার বিষয়ে ও উলেমাদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর উপর আলোকপাত করেছেন। ইবনবতুতা বলেছেন যে, জলসেচের জন্য ও দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদের সাহায্যের জন্য সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী দিল্লীর বহির্ভাগে কতকগুলি কূপ খনন করেছিলেন। আফিফউদ্দীন নামে একজন উলেমা এধরণের কার্যকলাপের কোন সার্থকতা নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেন। মহম্মদ বিন তুঘলক অফিফউদ্দীনের মন্তব্য শুনে তাঁকে ডেকে পাঠান ও জিজ্ঞাসা করেন 'আপনি কেন রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন?'' রাষ্ট্রের কার্যকলাপে সুলতান উলেমাদের হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন এবং সেই কারণে আফিফ-উদ্দীনকে অবশেষে কারাগারে প্রেরণ করেছিলেন।** সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলক দার্শনিক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিতর্কে উলেমারাও পেরে উঠতেন না। তাঁর উদার মনোভাবের জন্য গোঁড়া ও রক্ষণশীল উলেমা শ্রেণী সুলতানের প্রতি বিরূপ ছিলেন। রাষ্ট্রের ব্যাপারে তিনি কোন উলেমার মতামত গ্রহণ করতেন না। ফলে যখন সুলতান তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়নে ব্যর্থ হন তখন এই উলেমা শ্রেণীর লেখকরা তাঁর ব্যর্থতা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বিবরণ দিয়ে সুলতানকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মহম্মদ-বিন-তুঘলকের খুল্লতাত ভ্রাতা ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে উলেমারা দরবারে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। এইজন্য জিয়াউদ্দীন বারাণী, শামসী সিরাজ আফিফ, ইসেমী প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা ফিরোজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ফিরোজ তুঘলকের আমলে শরিয়তের বিধি অনুসরণ করে কঠোরভাবে ধর্মীয় নির্দেশ অনুসারে কর আদায় করা হয়েছিল। ফলে বেআইনী কর যা ইতিপূর্বে আদায় করা হ'ত এবং যা শরিয়তের নির্দেশ বিরোধী তা তুলে দেওয়া হয়। আবার হক-ই-শিরাব জাতীয় শরিয়ত গ্রাহ্য কর নতুন করে বসানো হয়। ইসলাম অনুমোদিত প্রধান প্রধান কর ছিল জিজিয়া বা অমুসলমানদের দেয় কর, খরজ বা ভূমি কর, জাকৎ বা বিত্তবান মুসলমানদের দেয় আয়কর যার থেকে প্রাপ্ত অর্থ মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের জন্য বিশেষ কতকগুলি কাজে, সমাধি, কবর ও মসজিদ সারাই, ধর্মীয় বৃত্তিদান এবং দীনদরিদ্র ফকিরদের আর্থিক সাহায্য দান করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। নির্দিষ্ট সীমা বহির্ভূত সম্পত্তির উপর শতকরা ২ ১/২ ভাগ এই উদ্দেশ্যে কর হিসাবে গৃহীত হত। মুসলমানদের জমির উপর শতকরা এক দশমাংশ কৃষিকর বা উশর (Ushr) আদায় করার রীতি ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে ভূমিকর বা খরজের হার ছিল উৎপাদনের ১/১০ অংশ থেকে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত। খামসের অর্থ

* জিয়াউদ্দীন বারানসী—তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৯৫-৯৬।

** ইবনবতুতার ভ্রমণকাহিনী বা 'রেহেলা' (ইং অনুবাদ, আগা মাহেদী হুসেন) পৃঃ ৮৮-৮৯।

www.pathagar.com

ছিল যুদ্ধেলুণ্ঠিত ধনদৌলত। এই লুণ্ঠিত অর্থের ১/৫ অংশ খাজাঞ্চিখানায় জমা পড়ত ও ৪/৫ অংশ সৈন্যবাহিনী লাভ করত। এছাড়া খনি ও সঞ্চিত ধনদৌলত, শুল্ক, উত্তরাধিকারীবিহীন সম্পত্তি প্রভৃতি সরকারী আয়ের সূত্র হিসাবে গণ্য করা হত।

সুলতানী শাসনে হিন্দুদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা কতদূর বিঘ্নিত হয়?

হিন্দুদের স্ব-ধর্ম পালনে বাধা সৃষ্টির জন্য মধ্যযুগের শাসক সুলতান, উলেমা ও শাসকগোষ্ঠীর কার্যকলাপকে হিন্দুবিরোধী বলে বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকরা অনেকে নিন্দা করেছেন। এইসব লেখক গোঁড়া উলেমাদের লেখা মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত থেকে তাঁদের মতের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টায় লিপ্ত। কিন্তু বাস্তব সত্য অনুধাবন করতে হ'লে স্মরণ রাখতে হবে যে, তুর্কী বিজয়ের পরে হিন্দুস্তানে শাসক তুর্কীগোষ্ঠী সহ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অগণিত অমুসলমান বিশেষতঃ হিন্দুদের তুলনায় ছিল নগণ্য। অতএব শরিয়তের বিধান অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা মুসলমান সুলতানদের পক্ষে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। কারণ উলেমাশ্রেণীর বক্তব্য ছিল হিন্দুরা ও অন্যান্য যারা অমুসলমান তাদের কাছ থেকে একটি বিশেষ কর বা জিজিয়া আদায় করতে হবে এবং তারা জিম্মি (বা যেসব লোকের জিজিয়ার বিনিময়ে ধনদৌলত, ধর্ম, সম্মান ও জীবন রাষ্ট্র কর্তৃক রক্ষিত হয়) বলে উল্লেখিত হবে। উলেমারা চেয়েছিলেন এইসব জিম্মিদের রাষ্ট্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করতে হবে। কারণ তারা সৈন্যবাহিনীতে কাজ করে না এবং ইসলামের রক্ষা ও প্রসারে সহায়ক নয়। বাস্তবক্ষেত্রে সুলতানরা ধমতত্ত্ববিদদের মতবাদকে প্রাধান্য দিতে পারেননি। সুলতান আলাউদ্দীন এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেছিলেন যা রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োজন তাই তিনি করেন। উলেমাদের রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া সুলতানদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ সুলতানরা জাহানদারির ভিত্তিতে অর্থাৎ রাষ্ট্রবিদদের বৈষয়িক জ্ঞানের ভিত্তিতে রাজ্য শাসন করতেন।*

সুলতানী শাসনের আমলে যে জিজিয়া কর আদায় করা হত তার ভিত্তি খুঁজতে গেলে দেখা যায় যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নয় তাদের রক্ষা করবে ইসলামী রাষ্ট্র এই নীতি দ্বিতীয় খলিফা ওমরের আমল থেকে শুরু হয়।** আরবরা এই নীতি গ্রহণ করেছিল এবং জিজিয়ার বিনিময়ে জিম্মিদের সুরক্ষা দেওয়া হ'ত। জিজিয়া আদায়ের স্বপক্ষে প্রধানতঃ যে সব যুক্তি দেখানো হ'ত তাহ'ল, (১) অমুসলমানদের জাকৎ দিতে হত না; (২) সৈন্যবাহিনীতে অমুসলমানদের যোগদান করা বাধ্যতামূলক ছিল না; (৩) অমুসলমানরা স্বধর্মীয়দের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধে নিজস্ব আইনে বিচারনিষ্পত্তি করতে পারত; (৪) জীবন, ধর্ম, ধনদৌলত সম্মানরক্ষার বিনিময়ে জিম্মিরা এই রাজকর দিত। জিজিয়া আদায় করার জন্য অনেক সময় চুক্তি সম্পাদনের মারফতে এই রাজকরের হার নির্ধারিত হত। জিজিয়ার হার ছিল ধনীদের ক্ষেত্রে বাৎসরিক ৪০ দিরহাম, স্বল্পবিত্তের ক্ষেত্রে ২৪ দিরহাম ও দরিদ্রের ক্ষেত্রে ১২ দিরহাম। জিজিয়া কর থেকে বাদ পড়ত শিশু, নারী, উন্মাদ, অক্ষম, বৃদ্ধ, অন্ধ ও দরিদ্র কর্মহীনরা।***

উলেমাশ্রেণীর কাছে ব্রাহ্মণরা হিন্দুধর্মের প্রধান প্রবক্তা হিসাবে ইসলামের প্রধান শত্রু ছিলেন। কিন্তু সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের রাজত্বের পূর্বে তাদের জিজিয়া দিতে বাধ্য করা হয়নি। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকই সর্বপ্রথম জিজিয়া কর ব্রাহ্মণদের থেকে আদায় করার

---

* মধ্যযুগের ইতিহাস (কে. পি. বাগচি) পৃঃ-৫।

** ঐ মধ্যযুগের রাষ্ট্র ও ধর্ম সংক্রান্ত কিছু সমস্যা (মধ্যযুগের ভারত) পৃঃ ২।

*** Muhammedan theories of Finance-Aghnides - পৃঃ-৩৯৮-৯৯, ৪০৪-০৫; Hidayah (E. Trans) Charles Hamilton, vol. II পৃ-২১১, ২১৪।

www.pathagar.com

জন্য অগ্রণী হয়েছিলেন। এর ফলে ব্রাহ্মণরা সমবেতভাবে প্রতিবাদ করার জন্য প্রথমে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেবে বলে ঘোষণা করেছিল এবং পরে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করবে বলে অনশন শুরু করে। এই সময় দিল্লীর অন্যান্য হিন্দুরা ব্রাহ্মণদের হয়ে জিজিয়া দিতে সম্মত হয়েছিলেন। অবশেষে সুলতান ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে মাত্র দশ তঙ্কা পঞ্চাশ জিতল হারে জিজিয়া আদায়ে সম্মত হয়েছিলেন। দিল্লীতে প্রচলিত জিজিয়ার বাৎসরিক হার ছিল ধনী,স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্রদের জন্য যথাক্রমে ৪০, ২০ ও ১০ তঙ্কা। সুলতান ব্রাহ্মণদের জন্য এই বিশেষ হার দেওয়ার কারণ তাঁর রাজ্য পরিচালনার বাস্তবজ্ঞান বা জাহান্দারি।* হিন্দু প্রজা-সাধারণদের ব্রাহ্মণদের প্রতি সহানুভূতিই সম্ভবত সুলতানকে ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে বিত্তর ভিত্তিতে জিজিয়া আদায়ে বিরত করেছিল। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কোন জিজিয়া কর আদায় করা হ'ত না। ফিরোজের সময় এই নীতির পরিবর্তন করা হয় এবং নমুনা হিসাবে প্রায় সর্বনিম্নহারে ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করা হয়।

শরিয়ত অনুসারে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় অনুমোদিত ছিল। সুলতানরা এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। অনবরত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত মুসলিম রাষ্ট্রনেতারা সকল সবল সক্ষম' নাগরিকদের সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করতেন। ইসলামের সম্প্রসারণ ও আত্মরক্ষার জন্য এর প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু অবিশ্বাসীদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে বাধ্য করা সম্ভবপর ছিল না। ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন এরূপ কোন ব্যাক্তি সৈনিক হিসাবে গৃহীত হলে তাকে জিজিয়া দিতে হ'ত না। সুলতান মামুদ গজনীর আমল থেকে শুরু করে প্রায় সব বাদশাহ ও সুলতানদের অধীনে হিন্দুসৈনিক ও সেনাপতিরা অনেকক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এইসব হিন্দুসৈন্য ও সেনাপতিদের মধ্যে তিলক, ব্রহ্মজিৎ গৌড়, কেশবছত্রী ও হিমুর নাম সুপরিচিত।** হিমুকে সেনাপতি করে আফগানরা মুঘলদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং আকস্মিক দুর্ঘটনায় হিমু আহত ও বন্দী না হলে হিন্দুস্তানে পুনরায় সাম্রাজ্য স্থাপন করা মুঘলদের পক্ষে সম্ভব হত না বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন।*** ইতিপূর্বে বাবর প্রথম পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করা সত্ত্বেও হিন্দুস্তানে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য রানা সংগ্রামের বিরুদ্ধে খানুয়ার যুদ্ধে (১৫২৭) জয়লাভ করতে হয়েছিল। অতএব সুলতানী আমলে অমুসলমানদের বিশেষতঃ হিন্দুদের মধ্যযুগে গুরুত্ব ছিল সমধিক এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমির তৈমুর ১৩৯৮ সালে হিন্দুস্তান আক্রমণ করেন এবং তার ফলে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জীবনে বিপর্যয় নেমেছিল। তৈমুরের আত্মজীবনী মালফুজত-ই-তৈমুরী পড়লে জানা যায় এই দুর্ধর্ষ আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন দুর্বল তুঘলক শাসকদের ব্যর্থতার জন্য প্রজাসাধারণের জীবন, ধনদৌলত ও মানসম্মান বিপন্ন হয়েছিল। তৈমুর হিন্দুস্তানে লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তাঁর বিঘোষিত নীতি ছিল অবিশ্বাসী ও মূর্তিপূজকদের ধ্বংস করা। হিন্দুস্তানের ধনদৌলত তাঁকে প্রলোভিত করেছিল। বাস্তবক্ষেত্রে দিল্লী ও অন্যান্য যেসব স্থান তৈমুর তাঁর স্বল্পস্থায়ী আক্রমণকালে লুণ্ঠন করেন সেখানেই কেবলমাত্র হিন্দু নয় মুসলমানদের কাছেও বাধাপ্রাপ্ত হন। দিল্লীতে যারা তৈমুরের সৈন্যদের বাধা দেন সেই হিন্দুরা পুরাতন দিল্লীর মসজিদ-ই-জামাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং অন্যান্য অবিশ্বাসীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইতে প্রাণ দিয়েছিলেন। মসজিদে স্বাভাবিকভাবে মুসলমানরা বিপদের সময় আশ্রয় গ্রহণ

* শামসী সিরাজ আফিফ—তারিখ-ই-ফিরাজ শাহী (বি. আই) পৃঃ ৩৮২-৮৪।

** হিমু সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা Himu - A Forgotten Hero (The Mughal Empire পৃ-৯৭-১০১) দ্রষ্টব্য।

*** ঐ

www.pathagar.com

করেন। এক্ষেত্রে মসজিদ তৈমুরের লুঠেরাদের বিরুদ্ধে বিপন্ন সর্ব সম্প্রদায়ের নাগরিকদের আশ্রয়স্থল হয়েছিল।*

তুর্কী আক্রমণের যুগে বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস হয়েছিল এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব ঘটনার মূলে ছিল বিজয়ীর লুণ্ঠন করার মনোবৃত্তি। যেহেতু মন্দির ও দেবালয়গুলিতে বহু বিত্ত ও ধনদৌলত সঞ্চিত হয়েছিল এগুলি স্বভাবতই আক্রমণকারী তুর্কীদের লুঠপাটের লক্ষ হয়। এই লুঠপাটের জন্য ধর্ম নয় তুর্কী ও মধ্যএশিয়ার সৈন্যদের ধনদৌলতের আকাংখাই ছিল প্রধান। পরবর্তীকালে সুলতানী শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর ফিরোজ শাহ তুঘলক ও সিকন্দর লোদীর ন্যায় গোঁড়া সুলতানরা হিন্দু দেবালয়ের ধ্বংসের জন্য দায়ী। কিন্তু ফিরোজ শাহ তুঘলকের শরিয়তী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কেবল দেবালয়ের উপর আক্রমণ (যথা উড়িষ্যায় জগন্নাথদেবের মন্দির লুণ্ঠন) ছাড়া অন্যান্য কার্যকলাপের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছিল। ফিরোজ খাজাঞ্চিখানার ক্ষতিসত্ত্বেও বহু শরিয়ত বিরোধী কর অবলুপ্ত করেছিলেন। দুইটি অশোক স্তম্ভের সংরক্ষণে তৎপর হয়েছিলেন ও কৃষকের উন্নতির জন্য তৎপর ছিলেন এবং বহু সংস্কৃত পুঁথির অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর এই সকল ও অন্যান্য এই ধরণের কার্যকলাপ প্রমাণ করে গোঁড়াপন্থী মুসলমানদের সন্তোষ বিধানের জন্য যেমন তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তেমনি প্রজামঙ্গলের জন্যও তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের স্বার্থে উন্নয়নের কাজে লিপ্ত ছিলেন।** অনেকক্ষেত্রে সুলতানরা নিজেদের শক্তির দম্ভ ও পরাজিত শত্রুর রাজ্য জয় করার পর স্বীয় প্রতাপ দেখানোর জন্য মন্দির এমনকি মসজিদও ধ্বংস করেছেন। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার সিকন্দর লোদী কর্তৃক জৌনপুর জয়ের পর মসজিদ ভঙ্গের ঘটনা উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে, 'সিকন্দর লোদী জৌনপুরের সুলতানের মসজিদ ভেঙ্গে দিয়ে নিজের শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।' সুতরাং দুইটি পরস্পর বিরোধী ধর্মের কথা এখানে ওঠে না।'*** হিন্দুদের ধর্মস্থান সম্পর্কে অন্যান্য বহু কারণে মুসলমান সুলতানরা সন্দেহ পোষণ করতেন। এখানে হিন্দুদের জমায়েত শুধু ধর্মীয় কারণে ও সামাজিক মেলামেশার জন্য হ'ত না তাদের অর্থনৈতিক কিছু কিছু কার্যকলাপও চলত এবং মন্দিরে জমায়েত তাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের দিকনির্ণয় করত।**** এই কারণে শাসকগোষ্ঠী মন্দিরকে হিন্দুদের শক্তি সমাবেশের কেন্দ্ররূপে দেখতেন। এদিক থেকে তারা সুফীদের খানকাহ সম্পর্কেও সন্দিগ্ধ ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ সুলতান জালালউদ্দীন খলজীর সময় সিধি মোল্লার খানকাহর কথা উল্লেখ করা যায়। জালালউদ্দীন এই স্থানকে বলবনের সমর্থকদের সমাবেশের স্থান বলে সন্দেহ করেছিলেন এবং সিধি মোল্লাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন।*****

হিন্দু দেবালয় ধ্বংসের প্রশ্নে কোন কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের সম্পর্ক স্থায়ীভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল। বঙ্গদেশের প্রাক-তুর্কী রাজত্বের যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিষয়ে আলোচনা করার সময় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন 'এ সবের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নাই। এদের মধ্যে কিছু, বিশেষ করে সহজেই বিনষ্ট হয় এরূপ মালমশলা দিয়ে যেগুলি তৈরী

---

* ইলিয়ট ও ডাউসন, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৪৪৬-৪৪৭।

** সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনকল্যান মূলক কাজের মধ্যে ইয়াহিয়া বিন আহমেদ বিন আবদুল্লা সিরহিন্দীর লেখা তারিখ-ই-মুবারক শাহী (ইং অনুবাদ) দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের পৃঃ ১৩০-৩১ ও ১৩৭-এ সুলতান সেচের উন্নয়নের জন্য যেসব খাল খনন করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

*** ভারতবর্ষের ইতিহাস—রোমিলা থাপার (ওরিয়েন্টালংম্যান) পৃঃ ২০৯ পাদটিকা।

**** ঐ

***** বারানী, পৃঃ ২১০-২১২, কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৪।

www.pathagar.com

সেগুলির ধ্বংসের জন্য আংশিকভাবে মাটির বৈশিষ্ট্য ও বঙ্গদেশের জলহাওয়া অংশত দায়ী। কিন্তু সুবিশাল নির্মাণ কার্যগুলি বিশেষত মন্দিরগুলি মুসলমানরা ধ্বংস করেছিল।"* লেখকের এই বক্তব্য তাঁর অন্যান্য লেখায়ও সমর্থিত হয়েছে। আধুনিককালে ডেভিড ম্যাকাচিন (David J. McCutchion) তাঁর গবেষণায় প্রমাণ করেছেন (এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ১৯৭০ দ্বাদশখণ্ড) যে সুলতানী আমলে মন্দির নির্মাণ বন্ধ হয়নি এবং এই সব মন্দির কালক্রমে যতই জীর্ণ হোক তাদের দেউলে পূজিত মূর্তি এখনও দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা এই কাজে অগ্রণী ছিলেন এবং মালভূম জিলার পশ্চিমাংশে জৈনরাও এবিষয়ে ত্রয়োদশ শতকে তৎপর ছিলেন। ম্যাকাচিনের এই সচিত্র গবেষণাপত্রে সুলতানী যুগের ও পরবর্তীকালের যেসব মন্দিরের উল্লেখ আছে তার থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে কালের গ্রাসে বহু মন্দির ধ্বংস হয়েছে কিন্তু জরাজীর্ণ হলেও সুলতানী যুগে হিন্দুমন্দির বহুক্ষেত্রেই অক্ষত অবস্থায় তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

সাধারণতঃ অমুসলমানরা ধর্ম পালনে যথেষ্ট স্বাধীনতা উপভোগ করত এবং তাদের দেবস্থান ও পূজার্চনায় বিশেষ কোন হস্তক্ষেপ করা হত না। বেরিলী ও মথুরার যাতায়াতের পথে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রধান ক্যানিংহাম কমপক্ষে এক হাজার খ্রীষ্টাব্দের একটি পুরাতন মন্দির দেখেছিলেন এবং এই মন্দিরের চত্বরে তীর্থযাত্রীদের খোদাই করা বহু লিপি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। ১২৪৬-১২৯০ সালের মধ্যে এইসব লিপির অন্ততঃ ১৫টিতে তীর্থযাত্রীদের কথা উল্লিখিত হয়েছে।** মুলতানের প্রসিদ্ধ আদিত্য মন্দির কারামিতা সম্প্রদায়ের শাসক কর্তৃক ধ্বংস হয়। পরে এই মন্দির পুনর্নির্মিত হয়েছিল ও সপ্তদশ শতক পর্যন্ত স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।*** দিল্লীর পুরাণে কিল্লাতে ফার্সী ও সংস্কৃতে খোদিত একটি লিপি থেকে শ্রীকৃষ্ণের নামে সমর্পিত একটি মন্দিরে ১২ বিঘা জমি উৎসর্গিত হয়েছিল।**** এমনকি সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলেও মন্দির নির্মাণ কার্য বন্ধ হয়নি এবং সুলতানের আফশোষ ছিল যে, সুলতানের প্রাসাদের নিচে দিয়ে শঙ্খ ঘন্টা সহযোগে হিন্দুরা যমুনায় মূর্তিপূজার জন্য যাতায়াত করত। এইসব ঘটনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে মামলুক সুলতানরা ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু 'মুলুক' বা শক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁরা বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন এবং হিন্দুদের উপর জোরজবরদস্তি করে তাদের ধর্ম পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হননি। এই বাস্তববুদ্ধির জন্য তুর্কী শাসকগোষ্ঠী ধর্মান্তকরণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেননি। ফিরোজ ও সিকন্দর লোদীর মত কয়েকজন গোঁড়াপন্থী তুর্কী ও আফগান শাসক ব্যতীত ধর্মের ব্যাপারে কোন সুলতানই বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেননি। কিন্তু যখন রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা সুলতানের স্বার্থের জন্য প্রয়োজন হত তখন শাসকগোষ্ঠী ধর্মকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার করতেন। তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ও সমকালীন গোঁড়াপন্থী ঐতিহাসিক বারাণীর ন্যায় উলেমারা সুলতান নাসিরউদ্দীন খসরু শাহকে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত অবিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এই অভিযোগ ভিত্তিহীন যে, তার অন্যতম প্রমাণ বহু মুসলমান সৈনিক সুলতান নাসিরউদ্দীনের হয়ে লড়াই করেন। রাষ্ট্রবিরোধী সকল কাজের জন্য সমকালীন ঐতিহাসিকরা হিন্দুদের দায়ী করেছিলেন। কারণ প্রাক্তন শাসকশ্রেণী বা বিত্তবান হিন্দু রায়, রানা, মুকদ্দম, চৌধুরীদের দমন করে রাখা তুর্কী শাসকগোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল।

* History of Ancient Bengal পৃ: ৬০৩-০৪ দ্রষ্টব্য (বঙ্গানুবাদ)।
** Habibullah, A B-M, The Foundation of Muslim Rule in India, পৃ: ২৬৭।
*** ঐ।
**** ঐ, এইসূত্রে ১৯০৯-১০ সালের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ধর্মান্তকরণ

ইসলামে ধর্মান্তকরণে শাসকগোষ্ঠী অপেক্ষা ফকির, সুফী ও ইসলাম ধর্মের অত্যুৎসাহী প্রচারকরা বেশী তৎপর ছিলেন। ধর্মান্তকরণে তুর্কী সুলতানদের উৎসাহের অভাবের কারণ বিস্তির্ণ এলাকা অজস্র মানুষ ইসলামের অনুগামীতে পরিণত হলে খাজাঞ্চিখানায় স্বভাবত জিজিয়া থেকে সংগৃহীত রাজস্ব হ্রাস পেতেপারে এই আশংকা ছিল। অনেক সময় সমকালীন মধ্যযুগের উলেমা ও গোঁড়াপন্থী ঐতিহাসিকরা জিয়াউদ্দীন বারানী, শামসী সিরাজ আফিফ, ইসেমী ও অন্যান্যরা সুলতানদের স্বাধীন হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসলামের বিজয় কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এইসব বর্ণনায় বিজিতের রাজ্য থেকে লুণ্ঠিত ধনদৌলতের লাভের কথা প্রাধান্য পেয়েছে এবং অবিশ্বাসীদের দোজখে (নরকে) প্রেরণ অথবা পৌত্তলিকতার বিনাশের বিষয়ে সগৌরবে ঘোষণা করার রীতি দেখা যায়। কিন্তু ধর্মান্তকরণের কথা মুসলিম উলেমাদের লেখা ইতিহাসেও প্রাধান্য পায়নি। তাছাড়া তুর্কী আক্রমণের প্রাথমিক স্তরে লুণ্ঠনই যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তা সুলতান মামুদ ও মুইজউদ্দীন মহম্মদ বিন সামের হিন্দু রাজাদের সঙ্গে সংঘর্ষের কাহিনী পাঠে উপলব্ধি করা যায়। এমনকি পৃথ্বীরাজ চৌহানের মৃত্যুর পর মহম্মদ ঘুরী তাঁর পুত্রকে আজমীরের সিংহাসনে স্থাপন করেছিলেন এবং বিনিময়ে বশ্যতা স্বীকারের নিদর্শন হিসাবে কর আদায় করেছিলেন। আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্যের রাজাদের কাছে বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রচুর ধনদৌলত গ্রহণ করেন। বরঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের মূল উদ্দেশ্যই ছিল দক্ষিণের থেকে অর্থ লুণ্ঠন। সুলতান অন্যান্য দক্ষিণের রাজ্যগুলিও এই কারণে বারংবার আক্রমণ করেছিলেন। সুলতান ফিরোজের সময় রাষ্ট্রের সমর্থনে গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতা চালু হয়েছিল বলে অভিযোগ শোনা যায়। তিনি সকলের থেকে এবং এমনকি ব্রাহ্মণদের থেকেও জিজিয়া কর আদায় করেছিলেন। এইজন্য হিন্দু দেবস্থান ভঙ্গ করা ও ধর্মান্তকরণে উৎসাহ দান করার দরুণ ফিরোজ এবং তাঁর ন্যায় আরোও দুই একজন সুলতানকে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের জন্য দায়ী করা হয়। কিন্তু আবার এই ফিরোজ ও সিকন্দর লোদীর ন্যায় হিন্দু ধর্মদ্বেষীদের সময়েই পণ্যমূল্য হ্রাসের ফলে সাধারণের জীবনযাত্রা সহজ হয়েছিল। প্রজামঙ্গলের উদ্দেশ্যে ফিরোজ কৃষির উন্নয়ন করেন, সেচখাল খনন করেন ও চিকিৎসালয় নির্মাণ ও শিক্ষাবিস্তারের জন্য সাহায্যদান প্রভৃতি জনহিতকর কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ফিরোজ ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর রাজত্বে প্রতিটি কৃষকের হালের গরু আছে ও প্রত্যেক কৃষক রমণীর গহনা আছে। এই হিন্দুবিদ্বেষী সুলতানকে সাধারণ প্রজারমঙ্গল বিধানে পিছপা হতে দেখা যায়নি।

মূলতঃ এদেশে ইসলামে ধর্মান্তকরণের জন্য সুফীদের জনগণের মধ্যে ইসলামের উদার মনোভাব সম্পর্কে প্রচারকে দায়ী করা যায়। কিছুসংখ্যক লোক আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ইসলামের আওতায় এলেই যে শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় না তা উপলব্ধি করতে তাদের দেরী হয়নি। বলবনের প্রতিদ্বন্দ্বী ইমাদউদ্দীন রিহান থেকে মুবারক খলজীর হত্যাকারী দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারী একমাত্র ভারতীয় মুসলমান নাসিরউদ্দীন খসরুশাহ পর্যন্ত অনেক হিন্দুস্তানী মুসলমান বাস্তবে এইসত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভারতীয় মুসলমান নাসিরউদ্দীনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

সাধারণ মানুষের ধর্মান্তকরণের পশ্চাদপট রচিত হয়েছিল স্মৃতিশাস্ত্র শাসিত ব্রাহ্মণ্য সমাজের রক্ষণশীলতায় ও নিপীড়িত বৌদ্ধ ও নিম্নবর্গের মানুষ জাতপাতের নিয়মশৃঙ্খলা থেকে মুক্তির কামনায়। তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে হিন্দুস্তানের প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের প্রথমসারির থেকে দ্বিতীয়সারির নাগরিকে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয়সারির

www.pathagar.com

সহযোগিতা ছাড়া রাজ্য চালানো অসম্ভব ছিল। কারণ যোদ্ধা ও সৈনিকবৃত্তি ছিল বিজয়ী তুর্কী শাসকগোষ্ঠীর কাজ। রাজস্ব আদায় ও জমিজেরাত দেখার জন্য তাদের এই দেশের প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। হিন্দুরা অর্থাৎ রায়, রানা, খুট, মুকদ্দম ও চৌধুরীরা তুর্কী রাজ্যের রাজস্বসংগ্রহকারী হিসাবে এবং শহুরে বণিকরা আর্থিক লেনদেনের প্রয়োজনে রাজসভায় যাতায়াত বজায় রাখলেন। সামাজিক ক্ষেত্রে এঁরাই অন্ত্যজ শ্রেণীর উপর প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য জাতপাতের ভেদরেখা আরো কঠোরভাবে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্যে সনাতন হিন্দুধর্ম বিধি বজায় রাখার প্রচেষ্টায় তাঁরা সক্রিয় হয়েছিলেন। ফলে অন্ত্যজ শ্রেণী বা বৌদ্ধ সহজিয়ারা হিন্দুধর্মের চাপে পড়েছিল। ভক্তিধর্মের আগমনের পূর্বে এইসব নিপীড়িত সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ সহজেই গণমুখী প্রচারের জন্য নবাগত ইসলাম ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল। সুফী সাধকদের পবিত্রজীবন ধারা ও খানকাহর সংঘ জীবন এবং ইসলামের গণতান্ত্রিক ধারা তাদের আকর্ষিত করেছিল। তুর্কী শাসনের যুগে এইজন্য অনেক নির্যাতিত অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য স্বেচ্ছায় ধর্মান্তকরণে সম্মত হয়। এর ফলে বহুক্ষেত্রে তারা স্মৃতিশাস্ত্র বিজড়িত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর নিয়মকানুন থেকে মুক্তিলাভ করত।

ভক্তিধর্মের প্রবর্তকরা এই জাতপাতের বিভেদ মানতেন না। শ্রীচৈতন্যর জীবনের সাধনা অভিজ্ঞতা তাঁকে অন্ত্যজদের এবং আপামর চন্ডাল সকলকে উদ্ধারে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সংস্পর্শের প্রভাবে যবন হরিদাস বা রামদাস এবং জাতিচ্যুত সুবুদ্ধি রায় মুক্তির পথ পেয়েছিল এবং নামধর্মের প্রভাবে সমাজে সচলতার সৃষ্টি হয়েছিল। কবীর ছিলেন জোলার সন্তান, তিনি বলেছিলেন 'এক নিরঞ্জন অলহা সেরা হিন্দু তুরক দহূঁ নহী মেরা'। (আমার নিরঞ্জন ও আল্লা এক। আমার কাছে হিন্দু তুরক দুই নয়)। নানকের কাছে 'হিন্দু নয় মুসলমান নয় মানুষ মানুষই' বলে গণ্য হত। ভক্তিধর্মের অন্যান্য প্রচারকরা প্রায় এই একই সুরে কথা বলতেন। সুফী ধর্মের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল। ভক্তি আন্দোলনের জোয়ারে অনেকক্ষেত্রে ইসলামের বিস্তারের গতি শ্লথ হয়ে যায়।

শাসকগোষ্ঠী ও প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্ক

তুর্কী বিজয়ের ও শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর অবস্থায় যে পরিবর্তন হয় তার ফলশ্রুতিতে তাদের প্রাধান্য বিশেষ হেরফের হয়নি। ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠী করদানের বিনিময়ে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে তুর্কী শাসনের ছত্রছায়াতে তাদের প্রভাব বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। ইসলামের আগমনের পর হিন্দু ব্যবসায়ী ও মহাজন শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে রাজস্ব আদায়কারী হিন্দু খুট, মুকদ্দম, চৌধুরী ও বিত্তবান কৃষকরা আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের গুরুত্ব হারায়নি। হিন্দু রায়, রানা, প্রভৃতিও নিয়মিত রাজসরকারে কর দিয়ে স্ব স্ব অঞ্চল শাসন করতেন। পুরাতন হিন্দু রাজস্বআদায়কারীরা বিদ্রোহী না হলে নতুন শাসকশ্রেণীর দ্বারা পদচ্যুত বা ক্ষমতাচ্যুত হননি। রাজস্বআদায়কারীরা সুযোগ সুবিধা মত কৃষকের উপর কর বৃদ্ধি করতেন এবং সময় বিশেষে রাজ্য সরকারের কর বন্ধ করতেন। তুর্কীদের ভারত বিজয়ের ফলে শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কারণ তুর্কীরা নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত ছিল। শহরের জীবনযাত্রায় ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। ধনী আমির ওমরাহ, গুজরাটি বানিয়া, মুলতানী বণিক ও রাজস্থানী, মাড়ওয়ারী বা বিদেশী আরব রপ্তানীকারী ও ব্যবসায়ীর জীবনযাত্রা ছিল স্বচ্ছল ও বিলাসবহুল। কিন্তু নিম্নবর্গের কারিগর, মজদুর ও বেকার চরম কৃচ্ছতার মধ্যে দৈনন্দিন আয়ব্যয়ের সমতা বজায় রাখতে ব্যাপৃত ছিল। শেষোক্তদের সঠিক দৈনন্দিন আয়ের কোন হিসাব পাওয়া দুষ্কর। এ বিষয়ে আমরা

www.pathagar.com

সমকালীন ঐতিহাসিকদের বিবরণী থেকে কতকগুলি অনুমান করতে পারি। শামসী সিরাজ আফিফের দেওয়া একটি বক্তব্য থেকে মজদুরদের ও পরিবহনে নিযুক্ত নিম্নবর্গের লোকের আয়ের একটি ইংগিত পাওয়া যায়। আফিফ লিখিত তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীতে বলা হয়েছে দিল্লি থেকে ফিরোজাবাদ ৫ ক্রোশ পথে যাত্রীবহনের জন্য পাল্কীবাহকরা ভাড়া নিত অর্ধ তংকা ও ঘোড়ার জন্য ভাড়া লাগত ১২ জিতল।* এছাড়াও এই পথে যাতায়াতের জন্য অন্যান্য যানবাহন ছিল। ৫ ক্রোশ পথ পাল্কী বহন করার পর নিশ্চয় সেদিনেই অন্য কাজ করা একজন পাল্কীবাহকের পক্ষে সম্ভব ছিল না, আর অন্য কাজ চাইলেই পাওয়া যেত না কারণ পরিবহনের ক্ষেত্রে আরো অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।** একটি পাল্কী বহন করতে অন্ততঃ ৪ জন লোকের প্রয়োজন এবং তাদের মাথাপিছু আয় ৫ ক্রোশ পাল্কীবহনের জন্য ছিল ৬ জিতল বা অর্ধ তংকার (অর্থাৎ২৪ জিতলের) ১/৪ অংশ। এক্ষেত্রে পিতা মাতা ও দুইটি সন্তানসহ একটি মজদুর পরিবারের আয় মাথা পিছু হ'ত দৈনিক ৬ জিতল যা একজন শ্রমিক বা পাল্কীবাহক দৈনিক মজদুরী হিসাবে অর্জন করত। ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই ধরণের একটি পরিবারকে খাদ্যের জন্য এক জিতল মাথাপিছু খরচ করতে হত। ঐতিহাসিক কে. এম. আশরফ, মাসালিক উল অবসারের বক্তব্য থেকে হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, সেইযুগে চারজনের সেদ্ধগোমাংস, মাখন সহ রুটির জন্য ব্যয় হ'ত ১ জিতল।*** অর্থাৎ একজনের দুইবেলা খাদ্যের জন্য দৈনিক অর্ধ জিতল বা মাসে ১৫ জিতল খরচা হতে পারে। এছাড়া অন্যান্য খরচ বাসস্থান, আশ্রয়, চিকিৎসার ক্ষেত্রে বা উৎসব অনুষ্ঠানে যা ব্যয় হ'ত তাতে দরিদ্র মজদুর ও কারিগরদের জীবনযাত্রার সমতা কোনক্রমে আনা সম্ভব হলেও মূল্যবৃদ্ধি বা দুর্ভিক্ষের সময় তাদের দুর্দশা বৃদ্ধি পেত। মুসলমান বা হিন্দু নিম্নবর্গের মানুষের দরিদ্র জনগণের সমানে আর্থিক অনটনের জন্য ভুগতে হ'ত। ধনী হিন্দুবণিক বা আমির ওমরাহরা যখন বিলাসলালসাময় জীবনযাপন করত তখন হিন্দু ও মুসলমান দরিদ্র শ্রমজীবী সাধারণ প্রাণরক্ষার দায়ে তাদের দুয়ারে ভিক্ষা করত। জিয়াউদ্দীন বারাণী বলেছেন ধনী হিন্দুরা কিংখাপের পোষাক পরত ও অলংকার ভূষিত হয়ে বাদ্যবাজনাসহ উৎসব এবং ব্যসনে লিপ্ত থাকত। আর দরিদ্র মুসলমানরা তাদের দরজায় ভিক্ষা করত। জিয়াউদ্দীন বারানীর অভিযোগ ছিল প্রধানতঃ হিন্দু'দের বিরুদ্ধে। কিন্তু তৎকালীন অর্থিক কাঠামোতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শহরে ও গ্রামে দরিদ্র জনসাধারণ বিত্তবান হিন্দু ও আমির, মালিক ও রাজকর্মচারীদের দ্বারা শোষিত হত।

এইজন্য জিয়াউদ্দীন বারানী ও সমকালীন রক্ষণশীল উলেমা ও লেখকরা 'হিন্দু' বলে যাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন তারা হল শহরের ধনী বণিক, গুজরাটি ও মুলতানী বানিয়া, রাজস্থানী ও মাড়ওয়ারী এবং গ্রামাঞ্চলের রায়, রানা খুট, মুকদ্দম ও চৌধুরী। এইসব হিন্দু রাজস্বআদায়কারী এবং রায়, রানা প্রভৃতির ক্ষমতা ও বিত্ত সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠী আশংকান্বিত ছিলেন। সেইজন্য বারাণী 'হিন্দু'দের শক্তি ও ধনবৃদ্ধির বিষয়ে শাসকগোষ্ঠীকে সতর্ক করতে সদাসর্বদা উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু তুর্কীশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এইসব প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর রায়, রানা, খুট, মুকদ্দম, চৌধুরী প্রভৃতির সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। বিদ্রোহী মালিক, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও আমির ওমরাহদের সুলতানী শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান দমনেও রায়, রানা ও অন্যান্য হিন্দু রাজস্ব আদায়কারীদের সহযোগিতাও একান্ত

---

* H. N. Wright-Coinage and Metrology of Sultans of Delhi অনুসারে ৪৮ জিতলে ১ তংকার সমান (পৃঃ ৭৩)।

** শামসী সিরাজ আফিফ, তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (বি. আই) পৃঃ ১৩১।

*** কে. এস. আশরাফ, হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনর্যা পৃঃ ২১৪-২১৫।

www.pathagar.com

কাম্য ছিল।* এই কারণে সুলতান বলবন লখনৌতির শাসনকর্তা তুঘরিলের বিরুদ্ধে রায়দনুজের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন, এবং সিন্ধুতে তাঘীর বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক মন্ডল ও টেরীর রায়ের সুহায়তা নিয়েছিলেন। আলাউদ্দীনের দক্ষিণ ভারতে বরঙ্গলের বিরুদ্ধে অভিযানে দেবগিরীর রাজা রামচন্দ্রদেবের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন। এইসব অধীনস্ত রায়, রানা, খুট, মুকদ্দম ও চৌধুরীদের সম্পর্কে সুলতান আলাউদ্দীন খলজী ও কাজি মুঘিসউদ্দীনের আলোচনায় যথেষ্ট আলোকসম্পাত করে। সুলতান আলাউদ্দীন বলেছেন খুট ও মুকদ্দমরা উত্তম অশ্ব ব্যবহার করে, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে ও পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত থাকে যদিও তারা খাজাঞ্চিখানায় এক জিতলও রাজস্ব হিসাবে জমা দেয় না। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য আলাদাভাবে রাজস্ব আদায় করে উৎসবে ও মদ্যপানে অকাতরে খরচ করে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই বিনা দাবিতে রাজস্ব সরকারকে জমা দেয় না। এইসব মধ্যসত্ত্বভোগীদের সুলতান আলাউদ্দীন দমন করতে চেয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

এইসব রাজস্বআদায়কারী রায়, রানা এবং বিত্তবান হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী বিষোদগার করেছেন। সাধারণ কৃষকদের রাজস্বের উপর উপরতলার মানুষদের বিলাসীজীবন ও শাসনকার্য এবং সামরিক ব্যয়ের জন্য নির্ভর করতে হ'ত। সেইজন্য কৃষককে ও চাষাবাদ রক্ষা করার জন্য সুলতান এবং শাসকগোষ্ঠী ব্যগ্র ছিলেন। যে হাঁসটা সোনার ডিম দেয় তাকে হত্যা করে রাষ্ট্রের ও শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের ক্ষতিকরার নীতি তাঁরা গ্রহণ করেননি। এইজন্য বলবন তাঁর পুত্র বুঘরা খাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সৈনিক, কৃষক ও বণিককে সুখে রাখতে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দাবি বা রাজস্বের দাবি অতিরিক্ত হ্রাস করা, উভয় পন্থা বলবন তাঁর পুত্রকে পরিহার করে চলতে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলেছিলেন। তুর্কী শাসকরা কৃষিক্ষেত্রে শোষণ, শাসন ও সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজস্ব আদায়কারী ও বিত্তশালী হিন্দুদের তুর্কী শাসকগোষ্ঠী সন্দেহের চক্ষে দেখতেন কারণ তারা রাজস্ব আদায়ের সময় কৃষকের উপর অতিরিক্ত কর চাপিয়ে নিজেদের বিত্তবান করার সহজপথ নিয়েছিলেন ও সরকারকেও তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতেন। এইজন্য সুলতান আলাউদ্দীন নিয়ম করেছিলেন যে খুট থেকে বালাহার অর্থাৎ রাজস্ব আদায়কারী গ্রামপ্রধান থেকে সাধারণ চাষী একইহারে রাজস্ব দান করবে এবং শক্তিশালীর ভার দরিদ্রের উপর চাপানো চলবেনা।**

---

* দিল্লীর সুলতানী শাসনের সরাসরি অধিকারভুক্ত এলাকার বাইরে যেসব হিন্দুশাসক তাদের প্রাধান্য মেনে কর দিতেন এবং সুযোগ বুঝে করদানে বিরত থাকতেন সেইসব রায়, রানা প্রভৃতির সহযোগিতা বিদ্রোহ দমনে কতকখানি প্রয়োজন ছিল তার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন লখনৌতির শাসনকর্তার বিদ্রোহ দমনে রায়দনুজের সহযোগিতা কামনা করেন। রায়দনুজ সুলতানকে অনুরোধ করেছিলেন যে দরবারে উপস্থিত হলে সুলতান যেন দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এই অনুরোধে সুলতান চিন্তিত হয়েছিলেন। অবশেষে নেকতার নামক একজন অভিজাতের পরামর্শে একটি বাজপাখী হাতে বলবন সিংহাসনে বসে রায় দনুজের জন্য দরবারে অপেক্ষা করতে থাকেন এবং রায়ের দরবারে পদার্পনের সঙ্গে সঙ্গে বাজপাখীটি উড়িয়ে দেবার অজুহাতে দণ্ডায়ন হয়েছিলেন। এইভাবে সুলতান স্বীয় সম্মান ও রায়ের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। তারিখ-ই-মুবারক শাহী (ইং অনুবাদ পৃঃ ৪০)। রায় ও রাণা অর্থে সাধারণত হিন্দু শক্তিশালী রাজাদের কথা বলা হয়েছে যাঁরা অনেক সময় বশ্যতা স্বীকার করে করদানে সম্মত হতেন। মুকদ্দমকে রাজস্ব আদায়কারী ও খুটকেও রাজস্ব আদায়ে ব্যাপৃত গ্রামপ্রধান বলে গণ্য করা হ'ত। চৌধুরী ছিলেন অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি।

** জিয়াউদ্দীন বারানী সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন 'রাজস্ব ছাড়া রাজ্য শাসন চালানো সম্ভব নয়। এই জন্য বলবন তাঁর পুত্রকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে রাজস্বনীতির ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।তারিখ-ই-ফিরোজশাহী পৃঃ ৭১,১০০,২৮৭।

www.pathagar.com

তুর্কী শাসকগোষ্ঠী বিত্তবান হিন্দুদের বা প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীদের ক্ষমতাবৃদ্ধি সুচক্ষে দেখেন নাই। মোরল্যান্ড মন্তব্য করেছেন যে বারানী 'হিন্দু' অর্থে উচ্চবর্গের হিন্দুদের কথা বলেছেন এবং মধ্যযুগের রাষ্ট্রে তিনটি শ্রেণী ছিল—মুসলিম, হিন্দু ও সাধারণ লোক।* মোরল্যান্ডের এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যে শহরাঞ্চলের বিত্তবান ব্যবসায়ী ও মজদুররা এবং শহরে হিন্দু ও মুসলমান দীনদরিদ্রকেও যোগ দেওয়া যায়। বারানী অভিযোগ করেছেন যে, অবিশ্বাসী ও কফেররা 'জিম্মি' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তারা ব্রোকেডের উপরে রত্নখচিত পোষাক পরে সুসজ্জিত অশ্বারোহণে বাদ্যবাজনাসহ পতাকা উড়িয়ে পথে বের হওয়ার অধিকার পেয়েছিল এবং উচ্চপদে নিযুক্ত হত।** রাজস্ব আদায়কারী হিন্দু উচ্চবর্গের মানুষ, বিত্তবান ব্যবসায়ী প্রভৃতির প্রতি সমকালীন মৌলবাদী লেখকদের বিদ্বেষ দেখে মোরল্যান্ডের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু তুর্কী শাসকগোষ্ঠী একদিকে কৃষকের শোষণের ব্যাপারে তৎপর ছিল অপরদিকেচাষাবাদ সুরক্ষিত রাখার স্বার্থে তারা কৃসকের ও কৃষির উন্নয়নকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেনি। এইজন্য মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত পাঠে উপলব্ধি করা যায়, রাষ্ট্রকে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না। কারণ শাসকশ্রেণী ও তাঁদের উত্তরসুরী, শাসকগোষ্ঠী ও হিন্দু বিত্তবান এই দুইশ্রেণীর নিচে ছিল কৃষক ও তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল শহরের দীনহীন মজুর ও দরিদ্রশ্রেণী। যাঁরা মোরল্যান্ডের বক্তব্য মেনে নিতে রাজি নন তাঁরা কিন্তু এই বিশ্লেষণের যৌক্তিকতাকে নাকচ করতে পারেননি।***

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক

হিন্দুস্তানে তুর্কী আক্রমণের প্রাথমিকস্তর বৈদেশিক আক্রমণ, লুন্ঠন, ধ্বংস, বিরোধ ও সংঘর্ষের ইতিবৃত্ত। কিন্তু বিজয়ী তুর্কীরা শাসকে পরিণত হবার পর তাদের সঙ্গে উচ্চকোটি হিন্দুদের সম্পর্ক বাস্তব প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কারণ শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে করদাতা রায়, রানারা ও রাজস্বআদায়কারী গ্রামাঞ্চলের খুট, মুকদ্দম, চৌধুরী, তুর্কী শাসকদের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করলেও সুযোগ সুবিধা বুঝে স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠত। এইজন্য মধ্যযুগের শাসকদের সদাসতর্ক থাকতে হ'ত এবং রক্ষণশীল উলেমারা ও বারানীর ন্যায় মধ্যযুগের ঐতিহাসিকরা সর্বদা 'হিন্দু' অর্থাৎ প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর অর্থাৎ রায়, রানা, গ্রামপ্রধান ও রাজস্ব সংগ্রহকারীদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। জনসাধারণের জীবনযাত্রায় তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বিশেষ তারতম্য হয়নি। কারণ প্রাক-তুর্কী বিজয়ের যুগে হিন্দু শাসকরা নিচুতলার মানুষদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শাসন ও শোষণ করে দাবিয়ে রেখেছিলেন। ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য এত দৃষ্টিকটু ছিল যে, বিদেশী ভ্রমণকারী আলবেরুণী বলেছেন যে, এই দেশে বহু লোক এক আঙ্গুল চওড়া এক টুকরো কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করে, আর অনেকের পোষাকের বাহুল্য এত বেশী ছিল যে তারা যেপরিমাণ কাপড়ে নিজেদের আবৃত করত তাতে পুরোপুরি একটা ঘোড়ার জিন তৈরী করা যেত। তার উপরে ছিল জাতপাতের বিচার। চন্ডাল, ডোম, মুচি প্রভৃতি ৮টি সমাজের সর্ব নিম্নবর্গের লোককে শহরের অভ্যন্তরে বাস করতে দেওয়া হত না, তাদের স্থান নির্দিষ্ট ছিল শহরের বহির্ভাগে।**** আবার ইসলামের ধ্বজাধারী সুলতান মামুদ স্বধর্মাবলম্বী জনসাধারণের প্রতি কিরূপ দুর্ব্যবহার করতেন তার বিবরণ পাওয়া যায় মামুদের একান্ত সচিব আল উতবীর কিতাব-উল-ইয়েমিনীতে। উতবী বলেছেন নিশাপুরে মামুদের

---

* ডব্লু, এইচ, মোরল্যাণ্ড, এগরেরিয়ান সিসটেম অব মোসলেম ইন্ডিয়া, পৃঃ ৩২ পাদটীকা।

** বারানীর ফতোয়া ই জাহান্দারী (ইং অনুবাদ) ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বিবরণী, ১৯৪৮।

*** Delhi Sultanate (Bharatiya Vidya Bhavan) পৃঃ ২৮।

**** Al-Biruni's India (ইং অনুবাদ Sachau) ১ম খণ্ড পৃঃ ২২-২৩, ১০১-১০২।

www.pathagar.com

রাজত্বকালে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাবের ফলে মানুষ অনেক সময় মৃত ব্যক্তির হাড়-মজ্জায় ক্ষুন্ন নিবৃত্তি করতেও দ্বিধা করেনি। অথচ এই ভয়াবহ অন্নাভাবের সময় একজন রুটিওয়ালা তার অবিক্রিত রুটির জন্য বাজারে ক্রেতার অভাব বলে অভিযোগ করেছিল।* অর্থাৎ রুটির দাম জোগানোর ক্ষমতা মানুষের ছিল না এবং রাষ্ট্র কালোবাজারী বন্ধ করা বা দাম কমানো অথবা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সহায়তা করায় সক্রিয় ছিল না। এই ধরণের ঘটনা প্রবাহ হিন্দু বা মুসলমান ধর্মের শাসকগোষ্ঠীর শাসনে ও শোষণে সাধারণ শ্রমিক, কারিগর, চাষী ও খেটে খাওয়া মানুষের দুর্দশার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দুর্ভিক্ষের সময় হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের নিম্নবর্গের মানুষের স্বার্থ অবহেলিত হ'ত। আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির চাপ তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার সহায়ক হয়েছিল। কারণ তুর্কী ও তৎপূর্বেকার হিন্দু শাসকগোষ্ঠীর বিলাসব্যসন নিম্নবর্গের মানুষদের নির্মম শোষণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।

তুর্কী শাসকগোষ্ঠী ও সুযোগ সন্ধানী প্রাক্তন হিন্দু শাসকদের মধ্যে একদিকে যেমন স্বার্থের সংঘাত ছিল আবার সহযোগিতাও দেখা যায়। রাজস্ব সংগ্রহকারীরা রাষ্ট্র নির্দিষ্ট রাজস্বসংগ্রহের সময় নিজের স্বার্থে কৃষককে শোষণ করত। এইজন্য কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কলহণ মন্তব্য করেছেন যে রাজস্ব সংগ্রহকারী ও অন্যান্য রাজকর্মচারী যারা রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা ছিলেন কৃষকের কাছে শূলবেদনা ও সাপের ন্যায়।** মধ্যযুগে রাষ্ট্র ও রাজস্বসংগ্রহকারী উভয়েই কৃষককে শোষণ করে চলেছিল। কিন্তু তুর্কী শাসকগোষ্ঠী জানতেন যে হাঁসটি সোনার ডিম দেয় তাকে হত্যা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অতএব রাজস্বের ব্যাপারে তাঁরা চরম ও নরম দুই নীতির মধ্যবর্তী পন্থা অনুসরণ করতেন। আলাউদ্দীন খলজীর ন্যায় দূরদর্শী শাসকরা শক্তিশালী রাজস্বসংগ্রহকারীর হাত থেকে চাষীর স্বার্থরক্ষার জন্য সচেতন ছিলেন।

নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে শহরে ও গ্রামে সম্প্রীতির বিশেষ অভাব দেখা যায়নি। শাসকগোষ্ঠী হিন্দু ও মুসলমান রাজনৈতিক ও আর্থিক উদ্দেশ্যে ধর্মের কুসংস্কারের সুযোগ গ্রহণ করে সাম্প্রদায়িক বিরোধের পথ প্রশস্ত করতেন। কিন্তু ইউরোপে ১৫৭২ সালে সেন্ট বার্থোলোমিউ দিবসে (St. Bartholomew's day) যেরূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিয়েছিল ভারতের ইতিবৃত্তে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে এরূপ উদাহরণ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। ইবনবতুতার ভ্রমণকাহিনী রেহলাতে যেসব ঘটনার উল্লেখ আছে তা থেকে বোঝা যায় নিরস্ত্র লোকেদের জীবন ধর্মবিরোধ সত্ত্বেও বিপন্ন হবার সম্ভবনা ছিল না।*** রাজ্য জয়ের ও শাসনবিস্তারের জন্য সংঘর্ষ ও তৎজনিত বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রমাণ করে না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যুদ্ধোত্তরকালে সম্প্রীতি ও শান্তিতে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ ও খেটে খাওয়া মানুষের পাশাপাশি জীবনযাত্রা শন্তিপুর্ণভাবে নির্বাহের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস বতুতার ন্যায় কাজির কাহিনীকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা দূষিত বলে প্রমাণিত করে।

---

* সুলতান মামুদ যিনি ধর্মের নামে কাফেরদেব ধনেপ্রানে মারতে দ্বিধা করেননি তাঁর রাজ্যে মুসলমান প্রজাদের মামুদ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসের থেকে রক্ষা করার জন্য অঙ্গুলী হেলন পর্যন্ত করেননি। কিতাব-ই-ইয়েমিনী (ইং অনুবাদ Reynolds) পৃঃ ৩৬৫-৬৭।

** রাজতরঙ্গিনী বা River of Kings, R. S. Pandit (ইং অনুবাদ) পৃঃ ৩৪৬।

*** Delhi Sultanate p 629-30; ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার ইবনবতুতার ভ্রমণকাহিনী থেকে উদাহরণ দেখিয়ে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তৎকালীন যুগের স্থায়ী-বৈশিষ্ট্য বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বতুতা বলেছিলেন মালাবারের হিন্দুরাষ্ট্রে মুসলমানের সংখ্যা ছিল 'স্বল্প'। প্রশ্ন হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চরম সাম্প্রদায়িক বিরোধের যুগে এটা সম্ভব হয়েছিল কি করে?

www.pathagar.com

হিন্দুস্তানে হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা, সংঘর্ষ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনার দ্বারা দূষিত হবার উদাহরণ বিরল। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিবরণ সমকালীন উলেমা ও রক্ষণশীলদের লেখনী থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে না এমন নয়, কিন্তু এইসব ঘটনার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সমন্বয়ের পথিকৃত হিসাবে কাজ করেছিল ও মেলবন্ধন রচনা করেছিল। সুফী সাধক ভক্তিধর্মের সন্তরা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের সেতু বন্ধন রচনা করেছিলেন। এইসব মেলবন্ধন হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সাধনাকে শক্তিশালী করেছিল। তুর্কী আক্রমণের শুরুতে সংঘর্ষ ও প্রতিরোধের পর সংযোগের এবং সমন্বয়ের যুগ শুরু হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এর ফলশ্রুতিতে এসেছিল তাতে উভয় সম্প্রদায়ের নিকটতর হয়েছিল। কিন্তু স্মার্তব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ এইসময় বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথাকে নিয়মকানুনের জালে বাঁধতে চেয়েছিল। ভক্তি আন্দোলন এই যুগে বর্ণশাসিত ভেদাভেদ এমনকি হিন্দু-মুসলমান বিভেদকে অস্বীকার করে এবং রাম ও রহিমের সাধনা একই ঈশ্বরের সাধনা বলে প্রচার করে। দুই সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গের মানুষরা রাষ্ট্র ও সমাজের দ্বারা সমানে নিপীড়িত হ'ত, যার ফলে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের প্রাচীর জীর্ণ হয়ে পড়ে এবং এইজন্য সমাজের উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে নানা দিক থেকে সহজে যোগাযোগ হয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে বিভেদ মেটেনি কিন্তু বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ স্থায়ী হয়নি। হিন্দু মুসলমান নিম্নবর্গের সংযোগ উচ্চবর্গের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের পথ প্রশস্ত করেছিল এবং হিন্দুস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবার পর বিদেশাগত আক্রমণকারীরা এইদেশকে স্বদেশ বলে মানতে বাধ্য হয়েছিল।

বাংলাদেশে চৈতন্য আন্দোলনে সুফী প্রভাব বিশেষ দেখা যায় না। সম্ভবত সুফী সাধনার সংযোগে পরবর্তীকালের সহজিয়া, ফকির ও বাউলদের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে চৈতন্য স্বয়ং পরমতত্ত্ব রূপে গৃহীত হয়েছিলেন এবং সহজিয়াদের সঙ্গে চৈতন্যতত্ত্বের নৈকট্যও সহজে স্থাপিত হয়। চৈতন্য ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু ও উদার মানবিকতার প্রতীক। সমাজের উচ্চকোটিতে জন্মেও তিনি হরিভক্ত চন্ডালকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সামাজিক সচলতার সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের মত তাঁর আন্দোলন নিম্নস্তরের মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়েছিল। চৈতন্যের উত্তরাধিকারীরা পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজপতিদের গোত্রভুক্ত হয়েছিলেন। চৈতন্যধর্মের বর্ণজাতিভেদ বর্জিত ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার দায়ভাগটা এইসময় আউল-বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতি অপ্রতিষ্ঠানিক শাখাগুলির উপর বর্তায়। এইসব শাখাধর্মের মধ্যে কর্তাভজাদের ও সাহেবধর্মীদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন মুসলমান। আসলে এইসব লোকায়ত ধর্মের মধ্যে দেখা যায় হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ বর্জন করার রীতি। লোকধর্ম প্রচারকদের মধ্যে দরবেশরা প্রচার করলেন—

'কেয়া হিন্দু কেয়া গোসলমান
মিলজুলকে করো সাঁইজীকী নাম।'

চৈতন্যধর্মের মূলধারার বাইরে এই শাখাধর্মগুলি নীতিবোধের মান ক্ষুন্ন করলেও এরা গণমানসের আশ্রয় স্থল হয়েছিল এবং হিন্দু-মুসলমানদের বিভেদ বর্জনের প্রয়াসে সচল ছিল।

কবীর ও নানক শহরের মানুষ ও গ্রামের কারিগর এবং শহরের সঙ্গে সংযোগ ছিল এমন লোকেদের কাছে ধর্ম প্রচার করেছিলেন।* তাঁরা উভয়েই সুফী সাধনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নানক ও কবীর, হিন্দু ও মুসলমানদের পার্থক্য দূর করতে সর্বধর্মের সার বিশেষতঃ হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সারবস্তু গ্রহণ করেছিলেন এমন ধারণা ঠিক নয়। অথবা নানক প্রতিষ্ঠিত শিখধর্ম, হিন্দুধর্ম বা ইসলামের শাখামাত্র নয়। নানক বহু বিষয়ে পূর্ববর্তী সন্তদের বিশেষতঃ

---

* ভারতবর্ষের ইতিহাস—পৃঃ ২৩২।

www.pathagar.com

কবীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।* তারা উভয়ই প্রধানতঃ কারিগর ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রচার করেছিলেন। হিন্দু বা মুসলমান ধর্মের রক্ষণশীলরা নানক, কবীর এবং ভক্তিধর্মের অন্যান্য প্রচারকদের বিরোধী ছিলেন কারণ সামাজিক সাম্যের সপক্ষে ও বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে অবহেলিত জনগণকে সচেতন করেছিলেন। নানকের পর শিখধর্ম স্থায়ী হয়েছিল কিন্তু কবীর-পন্থীরা তাদের স্বাতন্ত্র হারায়।

হিন্দু ও মুসলমানদের সুদীর্ঘকাল সহাবস্থানের ফলে ধর্মীয় পার্থক্য সত্ত্বেও সামাজিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কাজি ও চৈতন্যদেবের যে বাক্যালাপ দেওয়া আছে তাতে কাজি বলেছিলেন যে, গ্রাম সম্বন্ধে তিনি গৌরাঙ্গদেবের নিকট আত্মীয়।**

সাহিত্য তৎকালীন যুগের সমাজ জীবনের দর্পণ। বিশেষতঃ মাতৃভাষায় লেখা কাব্য ও কাহিনীতে রাজা ও রাজপুরুষদের কথা বড় করে বলা হলেও প্রায় দেখা গেছে খেটেখাওয়া মানুষের জীবনের চালচিত্র ও সাধারণের সুখদুঃখের কথা এদের মাধ্যমে বলা হয়েছে। শেরশাহর আমলে অযোধ্যার খ্যাত নামা কবি মালিক মহম্মদ জয়সীর 'পদ্মাবত' এইরূপ একটি কাহিনী যাতে সমাজ জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে যে সমাজচিত্র পাওয়া যায় তাতে কৃষি, কারিগরি বিদ্যা, সমুদ্রপথে যাত্রা ও বাণিজ্য এবং শিল্প ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে নানা বিষয় জানা যায়। এই যুগের কথা উল্লেখ করে একজন লেখক মন্তব্য করেছেন যে, 'হিন্দু ও মুসলমানগণ মধ্যযুগে পরম সম্প্রীতির সহিত পাশাপাশি বাস করিত। মধ্যে মধ্যে মনোমালিন্য না হইত এমন নহে, তবে তাহা খুব কম হইত।"*** এইযুগের সাহিত্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত কবিকঙ্কন চণ্ডীতে গুজরাট নগরের যে বর্ণনা দেওয়া আছে তাতে বলা হয়েছে যে, কালকেতু প্রতিষ্ঠিত এই নগরে মুসলমানরা পশ্চিমদিকে বাস করত। হিন্দুদের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের লোক যারা এই নগরে বসবাস করতে এসেছিল মুকুন্দরাম তাদের কথাও সবিস্তারে বলেছেন। এরা ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও কায়স্থ। এছাড়া ছিল বণিক ও নবশাখরা। সর্বশেষে ইতর অর্থাৎ নিম্নবর্গের মানুষ ধীবর, দরজী, ছুতার, চণ্ডাল প্রভৃতি। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে হিন্দুদের বিভিন্ন জাতির কথা বলা আছে এবং তৎসহ মুসলমানদের মধ্যেও জাতিভেদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সৈয়দ, মুঘল, কাজি, পীর প্রভৃতি উচ্চকোটির মানুষ ছাড়া জোলা, তাঁতী ধর্মান্তরিত মুসলমান বা 'গয়সাল', কসাই প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মানুষ এখানে ছিলেন। সমাজের সর্বোচ্চস্তরের মুসলমানরা নিম্নবর্গের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতেন।****

মধ্যযুগের মঙ্গল সাহিত্যে অভিজাতদের সম্পর্কে উল্লেখ আছে। কিন্তু নিম্নবর্গের মানুষের জীবনের চালচিত্রই এই সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত। এইজন্য এইখানে দেখা যায় 'শিব চাষ করেন, দুর্গা বাগদিনী সেজে মাছ ধরেন, মনসা দেবীর প্রিয়সখী নেতা ধোপানী, আর কীর্তিবাস যে রাজসভায় গিয়েছিলেন সেখানে 'আঙিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা সে মাজুরী', এবং পাটের চাঁদোয়া মাথার উপর দিয়ে 'মাঘমাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর'।***** সমাজ জীবনের

---

* Sikhism— Hew McLeod (A Cultural History of India, Ed. Basham) পৃঃ ২৯৫-৯৬)।

** গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা।।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।।
শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা (শ্রী হরেকৃষ্ণ মজুমদার সাহিত্যরত্ন ও শ্রী সুবোধ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত; প্রকাশক দেবসাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ) পৃঃ ১২৬।

*** প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা ডঃ তমোনাশ দাশগুপ্ত, ভূমিকা।

**** কবিকঙ্কন চণ্ডী (প্রকাশক নটবর চক্রবর্তী, কলকাতা, ২য় সংস্করণ) পৃঃ ৮৫-৯০।

***** কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটীর) পৃঃ ১৮।

www.pathagar.com

চিত্র বিদ্যাপতি ঠাকুর, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম ও অন্যান্য মধ্যযুগের লেখকদের লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া ভক্তিগীতির মধ্যেও আপামর জনসাধারণের কথা বলা হয়েছে। নানক, কবীর, চৈতন্য ও অন্যান্য ভক্ত ও সাধকরা তাঁদের ভক্তিগীতি, গান ও উপদেশে সাধারণের জীবন সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছেন। ভক্তি আন্দোলনের স্রোত হিন্দু ও মুসলমানের চিন্তাধারার আদানপ্রদানের পটভূমি তৈরী করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের পথ প্রশস্ত করেছে। এই ঘনিষ্ঠতা হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।

লোক-সংস্কৃতি

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ধরণের পালা-পার্বণ ও উৎসব ছিল। সরকারী অনুষ্ঠানগুলিও সাধারণের আনন্দবর্দ্ধন করত। এইসব উৎসব অনুষ্ঠানগুলি জনগণের কাছে দৈনন্দিন একটানা জীবনধারণের গ্লানি থেকে সাময়িক মুক্তির পথ বলে গণ্য হত। এইসব লোক-উৎসব নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে নব অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করত। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এইসব অনুষ্ঠান নিয়মিত ফিরে আসত। এইসব উৎসবের মধ্যে হোলী, বসন্ত পঞ্চমী, শিবরাত্রি, দেওয়ালীর দিনে সাধারণ মানুষ উৎসবে মেতে উঠত। গান ও বাজনা সহযোগে নৃত্য ও উৎসব সার্বজনীন আনন্দের মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপিত হ'ত। হোলীর দিনে আবির গুলাল নিম্নবর্গের মানুষের বিবর্ণ জীবন সাময়িকভাবে নানারঙে রাঙিয়ে দিত। বসন্ত পঞ্চমীর উৎসব উদ্‌যাপনের কথা মালিক মহম্মদ জয়সীর লেখা 'পদ্মাবতে' বর্ণিত হয়েছে। দেওয়ালী হচ্ছে আলোর উৎসব এবং এইদিনে পূর্বপুরুষদের আলোর মারফতে সংবর্ধনা জানানো হ'ত। দশেরা ছিল কৃষির উৎসব। ক্ষত্রিয়রা ও বিভিন্নশ্রেণীর লোকেরা যন্ত্রপাতি পূজার উৎসব করত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনের উৎসব, রথযাত্রা, পূর্ণমাসীতে রাখীবন্ধন ও অন্যান্য উৎসবের সমাজের উচ্চ-নীচ সকলের কাছে বিশেষ মূল্য ছিল।

মুসলিম পরবগুলি ছিল ধর্মীয়। হজ্ব ও নমাজের ন্যায় অনুষ্ঠানের গুরুগম্ভীর পরিবেশ ও ধর্মীয় জমায়েত কখনও সামাজিক উৎসবের রূপ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু হিন্দুস্তানে আসার পর এইখানের পরিস্থিতি ও আচার আচরণের প্রভাব ধীরে ধীরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের নিয়মানুবর্তিতার উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল ও পরিবর্তন এনেছিল। ফলে নতুন নতুন সামাজিক উৎসব মুসলিম পরবগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়। এই সব পরবগুলির মধ্যে রাষ্ট্র অনুমোদিত 'নওরোজ' বা বসন্ত উৎসব সাধারণের অপেক্ষা ধনীদের মধ্যে বেশী প্রচলিত ছিল। শববরাত উৎসব পাপপুণ্য লিপিবদ্ধ করার রাত হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল। হিন্দুদের শিবরাত্রির উৎসবের সঙ্গে 'শববরাত' তুলনীয় এবং তার অনুকরণে প্রবর্তিত বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু মুসলিম ধর্মাবলম্বী একাংশের মতে এই অনুষ্ঠান মুসলিমদের একান্ত নিজস্ব অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে পরপর কয়েক রাত্রি বাজির সমারোহ ও আলোকমালার ছটায় আকাশ উজ্জ্বল হয়ে থাকত। মহরম, পীরের দরগা দর্শন ও উরসের ন্যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান জনপ্রিয় ছিল।*

এইসব উৎসব উদ্‌যাপনের মারফতে জনগণের মধ্যে সংযোগ ও সহমর্মিতার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমান জনগণ পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে প্রাত্যহিক একঘেঁয়েমির মধ্যে এই ধরণের অনুষ্ঠান ও উৎসব ছিল ব্যতিক্রমী ঘটনা। এইসব উৎসবের অঙ্গ হিসাবে লোকনৃত্য ও তৎসহ গীত ও বাদ্যানুষ্ঠানে সকলেই অংশগ্রহণ করতেন। লোকসাহিত্যে যেসব কাব্য রচিত হয়েছিল সেগুলি

* হিন্দু ও মুসলমানদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সম্পর্কে ও সাধারণ ও ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে কে. এম. আশরফের হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবন-চর্যা পৃঃ ২০৭, ২৮৩, ৩১৮-৩২১ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

মহাকাব্য অবলম্বনে রচিত। এই সব সাহিত্যের মধ্যে আওধী হিন্দীতে রচিত তুলসীদাসের রামায়ণ (১৬শ শতক), কম্বনের তামিল রামায়ণ (নবম শতক), কৃত্তিবাসী রামায়ণ (পঞ্চদশ শতক) ও কাশীরামদাসের মহাভারত (১৭শ শতক) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইসব লোককাব্যে প্রাচীন মহাকাব্যের ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্য না থাকলেও তাদের গীতধর্মী মাধুর্য্য সর্বসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া সাধু-সন্ত ও বাউলের সংগীত তৎসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত জনপ্রিয় কাব্য ভক্তিরসে সিঞ্চিত হয়ে জনমানসকে অপ্লুত করত। মহাকাব্যর কাহিনী অবলম্বনে ঐতিহ্যবাহী কাব্যকাহিনী ও গীত ছাড়াও বহু সাধক কবির গান ও রচনা লোকসাহিত্যের অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। এইসব লোকসাহিত্যের কবির মধ্যে বাংলার বড়ু চণ্ডীদাস, মৈথিলীর বিদ্যাপতি, আসামের শংকরদেব, গুজরাটের নরসী মেহতা, রাজস্থানী ভাষায় মীরার ভজন, ভোজপুরী ও উর্দু মিশ্রিত কবীরের ভজন, ব্রজভাষায় সুরদাসের ভক্তিগীতি, মারাঠী ভাষায় নামদেব ও একনাথের প্রাণস্পর্শী গীত, উড়িয়াতে সরলদাসের কাব্য ও পাঞ্জাবীতে গুরুনানকের বাণী এবং অগণিত সন্ত কবিদের ও সূফী সাধকদের বিভিন্ন ভাষায় বাণী, দোঁহা ভজন, গীত ও কাব্য হিন্দুস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলের জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। চতুর্দশ শতকের কাশ্মীরের অতীন্দ্রবাদী শিবভক্ত মহিলা কবি লালদাস ভক্তিগীত ও স্তবরচনায় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। এছাড়া ছিল বীরত্বগাথা, সন্ত ও সূফীদের জীবনী ও কথা রোমান্টিক কাহিনী যার জনপ্রিয়তা চারণ কবিদের গানে সম্প্রচারিত হয়েছিল।

হিন্দু-মুসলমান সংযোগের ফলশ্রুতি উর্দু ভাষায় ও সাহিত্যের অবদান ছাড়াও মুসলমান লেখকরা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের সাহিত্য প্রতিভার প্রমাণ রেখেছেন। চিতোরের রাণী পদ্মিনীর কাহিনী নিয়ে রচিত মালিক মহম্মদ জয়সীর 'পদ্মাবত' ষোড়শ শতকে আওধীতে লিখিত হয়েছিল। পরবর্তী যুগে আলওয়াল বাংলায় একই বিষয়ে কাব্যরচনা করেছিলেন।* সপ্তদশ শতকের শেষপাদে বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক সংযোগের সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এই সময়কার কবি দৌলত কাজির 'লোচ-চন্দ্রালী' বা 'সতী-ময়না' এর অন্যতম প্রমাণ। শেষোক্ত কাব্য দৌলত কাজী শেষ করে যেতে পারেননি এবং পরবর্তীকালে কবি আলওয়াল এই কাব্য সম্পূর্ণ করেন।

ইসলামিক চিন্তাধারার প্রভাব বিশেষত সূফী মতবাদ ও ঐতিহ্য এবং ফার্সী ও আরবী ভাষার কথা ও কাহিনী হিন্দুস্তানের বিভিন্ন ভাষাকে বিশেষত কাশ্মিরী, পাঞ্জাবী ও সিন্ধী ভাষাকে প্রভাবিত করেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ছিল এই যুগের সাহিত্য সৃষ্টির মূলে। ধ্রুপদী সংস্কৃত ও প্রাচীন তামিল সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রে ধর্মসংস্কার মুক্ত। মধ্যযুগে ভক্তিধর্ম ও সূফী প্রভাব সাহিত্যে ও কাব্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু মধ্যযুগে ধর্মসংস্কার মুক্ত মানবীয় প্রণয় কাহিনী দৌলত কাজি ও আলওয়ালের ন্যায় কবির লেখনীতে প্রাধান্য লাভ করেছে।

যুক্তসাধনা ও সহমর্মিতা

হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের পাশাপাশি অস্তিত্ব ও সংযোগ এই দুই ধর্মের দর্শন ও চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষতঃ সূফী ও যোগীদের সাধনায় সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করেছিল। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে নাথযোগীরা নিম্নবর্গের হিন্দুদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। যোগের লক্ষ্য ছিল পরম-সত্য উপলব্ধি। তার সঙ্গে সূফীদের চিন্তাধারার অনেক মিল ছিল এবং সূফীদের ও হিন্দুযোগী ও অতীন্দ্রবাদীদের ঈশ্বর ও আত্মা এবং বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কর বিষয় অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ছিল। সূফী মানবতাবোধ অবিশ্বাসীদের প্রতি সহিষ্ণু মনোবৃত্তির

* বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম ও মধ্যযুগ) গোপাল হালদার—পৃঃ ১৫৫।

www.pathagar.com

সৃষ্টি করেছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু যোগীদের প্রভাবের ফলে সুফীদের নানা আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান ও সাধন পদ্ধতিতে পূর্বোক্তদের অনুসৃত রীতিনীতি ছাপ ফেলেছিল। বৌদ্ধদর্শন বা বৈদান্তিক চিন্তাধারা সুফী মতবাদকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পেরেছিল কিনা এসম্পর্কে মতবিরোধ আছে। কিন্তু হঠ যোগীদের গ্রন্থ অমৃতকুণ্ড সংস্কৃত থেকে পারসিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং এর থেকেই সুফীরা তাদের 'ধ্যানের' মারফত সাধনপদ্ধতি এবং রসায়নের ও গাছগাছড়া সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছিল। সুফীদের সংঘ জীবন ও নৈতিক মূলবোধ সম্পর্কে ধারণার কোন কোন দিক যোগীদের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছিল।

সংগীতের মাধ্যমে ভাববিনিময়

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে সুফীদের হিন্দীকাব্য গ্রাম ও নগরে প্রচলিত ছিল। এর সূত্রপাত করেছিলেন মোল্লা দাউদ (শেখ নাসিরুদ্দীন চিরাগের ভ্রাতুষ্পুত্র)। তাঁর গ্রন্থ 'চন্দায়িন' ১৩৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে কবীর ও নানকের ন্যায় ভক্তি আন্দোলনের সন্তদের আবির্ভাবের মূলে ছিল দুইশতকের সুফী ও সন্তদের পারস্পরিক প্রভাবের ফলশ্রুতি।

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের পারস্পরিক যোগাযোগের প্রভাব লৌকিক ধর্ম,* সংগীত, চিত্রকলা ও স্থাপত্যের মধ্যে বিভিন্নক্ষেত্রে, বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। ভারতের মধ্যযুগে উলেমা ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের মাথারা যখন বিবাদে লিপ্ত তখন সঙ্গীত, কলা, স্থাপত্য ও সাহিত্যে সর্বত্র হিন্দু-মুসলমান সহমর্মিতা ও যুক্ত সাধনার ফলশ্রুতির উদাহরণ সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ধারাকে গতিশীল করেছে।

পারসিক ও আরবী সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের যোগসূত্র হিন্দুস্তানে তুর্কী বিজয়ের পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু এই যোগাযোগ সুদৃঢ় হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকের পর যখন ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত দরবারে ও 'খানকাহতে' ক্রমেই পারসিক সংগীত অপেক্ষা অধিক সমাদৃত হতে শুরু করে। কিন্তু শেষোক্ত সংগীতের ধারাকেও অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখা হয়নি। ভারতীয় ও পারসিক সংগীতের সংযোগ এক নতুন সংগীতের রীতির উদ্ভবের সুযোগ করে দিয়েছিল যার পথপ্রদর্শক ছিলেন আমির খসরু। তাঁর প্রদর্শিত পথকে হিন্দুস্তানী-পারসিক ধারা নামে অভিহিত করা যায়। খসরু একদিকে যেমন আলাউদ্দীন খলজীর দরবারের প্রিয়পাত্র ছিলেন অপরদিকে শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার খানকাহর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আবার সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পর সেই অঞ্চলের অনেক বিখ্যাত দক্ষিণী সংগীতকাররা দিল্লীতে এসেছিলেন। কর্ণাটক সংগীত সম্পর্কে খসরু এই সুযোগে পরিচিত হয়েছিলেন। এইসময় বিখ্যাত দক্ষিণী ভারতীয় সংগীতকার নায়েক গোপাল ও খসরু পরিচিত হয়েছিলেন। খসরু দক্ষিণী সংগীতের ধ্রুপদী ধারাকে নিজস্ব রীতি ও কলাকৌশলে আত্মস্থ করেছিলেন। ১২৯৪ সালে 'ঘুরত-আল কমাল' (Ghurrat-al-Kamal) নামক তিন খণ্ডের কাব্যগ্রন্থ রচনার পরও তিন খণ্ডের সংগীতের গ্রন্থ রচনা করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য কাজ বলে খসরু দাবি করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় শেষোক্ত সংগীতের

---

* মুসলমান আগমনের পূর্বে লোক মনে নাথগুরু ও সিদ্ধাদের আসন যেখানে ছিল, মুসলমান পীর ও ফকিররা তাদের কেরামতির খ্যাতিতে সেইখানে অতি সহজে আসন গ্রহণ করেছিলেন। তারপরে জনজীবনে দুই ধর্মের পীর ও গুরুদের সমান প্রভাব বিস্তৃত হয়। সমভাবে তাঁদের মাহাত্ম্য গান একত্রে রচিত হতে থাকে। এই জনজীবনের সহজ সংমিশ্রণেই উদিত হন সত্য পীরবা 'সত্যনারায়ণ'- বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, গোপাল হালদার, পৃঃ ১২৫। ঐতিহাসিক তরফদারের মন্তব্য অনুসারে "Numerous poems were written on this cult in the eighteenth century although the cult itself may be of an earlier origin. The earlist poems on Satyapir is the one composed by Shaikh Faidullah who seems to have lived in the sixteenth century" (Hussin Shahi Bengal পৃঃ ১৬৫)।

www.pathagar.com

সম্পর্কে রচনাগুলি খসরু আগ্রহী পাঠকদের কাছে উপহার দিতে সক্ষম হননি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি বহু সুর ও সংগীত যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে লিখিত গ্রন্থে প্রায় ১৯টি সুর ছিল, যার মধ্যে খেয়াল, তরাণা, কাওয়ালী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এইগুলি খসরুর রচিত বলে দাবি করা হয়েছে। ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় গুজরাটের শাসনকর্তা আবুরেজার পৃষ্ঠপোষকতায় (১৩৭৪-৭৫) দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই দুইটি সংগীত বিষয়ক গ্রন্থের অজ্ঞাত লেখক ইতিপূর্বে আরো একটি সংগীত বিষয়ক আরবী বই পারসিক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। শেষোক্ত বইটির নাম 'ফরিঘউজ-জমান-ফি-মায়রিয়াফত-আল ইলহান' (Farigh-uz-zaman fi marifat al-ilhan)। এই বইর একটিমাত্র পুঁথি 'ঘুনিয়াত-উল-মুনিয়া, (Ghunyatul-munya) নামে পরিচিত। সাতটি সংস্কৃত গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে এটি রচিত হয়েছিল। এই সাতটির মধ্যে অন্যতম সার্ঙ্গদেবের (১২১০-৪৭) সংগীত রত্নাকর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। দেবগিরির যাদব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সার্ঙ্গদেব সংগীত বিষয়ক এই মূলবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'ঘুনিয়াত-উল-মুনিয়া'তে সংগীত যন্ত্রের মধ্যে বীণার সুবৃহৎ আকারের কথা উল্লিখিত আছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে আঞ্চলিক রাজগুলির দরবারে সংগীত সমাদৃত ছিল। ১৪২০ সালে সংগীত-সম্পর্কিত গ্রন্থ সংগীত-শিরোমণি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শার্কীর নামে উৎসর্গিত হয়েছিল। জৌনপুরের আরেকজন সুলতান হুসেন শাহ শার্কী সংগীতজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি যেসব সুরের ও গানের স্রষ্টা ছিলেন তার মধ্যে হুসেনী বা জৌনপুরী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। 'খেয়ালের' ক্ষেত্রে বৈচিত্র সৃষ্টির জন্য তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কাশ্মীরের সুলতান জয়নাল আবেদিন সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সংগীত রত্নাকরের জন্য তিনি একটি টীকা রচনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমর (১৪৫০-১৫০৮) সংগীতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ও সংগীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধ্রুপদ সংগীতের ধারাকে হিন্দী ভাষায় এই সময় প্রকাশিত করা হয়। মানসিংহের দরবারের সংগীতকাররা রাগ-রাগিনী প্রকাশের নিয়মাবলীকে সংকলিত করে 'মানকৌত-হাল' নামে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। গুজরাটে বাহাদুর শাহর দরবারে অন্যতম প্রসিদ্ধ সংগীতকার বৈজু বাওয়ারা তাঁর পৃষ্ঠপোষকের নামে বাহাদুরী নামক সুরের সৃষ্টি করেছিলেন। লোদী সুলতান সিকন্দর লোদী সংগীতের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময় ধ্রুপদী সংগীতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লহজাৎ-ই-সিকন্দারী নামে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল।

পরিব্রাজক হিন্দু সাধকদের ভক্তিগীতি মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের বাণী প্রচারে সহায়ক হয়েছিল। তামিলনাড়ু থেকে শুরু করে ভক্তিধর্ম উত্তর ভারতে মহারাষ্ট্রে ও অন্যত্র প্রসারিত হয়েছিল। এইসব ভক্তিধর্মের প্রচারক সন্ত কবিরা বা সন্ত গায়করা সাধারণতঃ মাতৃভাষার মাধ্যমে তাঁদের সংগীত জনপ্রিয় করেছিলেন। এর ফলে ভজন, কীর্তন ও অভংগ প্রভৃতি নতুন রীতির সংগীতের সৃষ্টি হয়। আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রবাদের উপর নির্ভরশীল এইসব সংগীত রীতি সন্ত কবিদের কাব্যের ভাষার মাধুর্য্যে মন্দিরে ও ভজনমণ্ডলে সর্বসাধারণের মধ্যে গানে গানে প্রচারিত হয়। প্রায় একইরকম ভাবে মুসলমানদের মধ্যে সুফী অতীন্দ্রবাদী আন্দোলন আল্লার বন্দনার জন্য সংগীতের আশ্রয় নিয়েছিল। সুফী ভ্রাম্যমান ফকির ও দরবেশরা নগরে ও গ্রামে সংগীতের মারফতে সুফী অতীন্দ্রবাদী ধ্যানধারণা প্রচার করেন। হিন্দু ও মুসলমান সাধু ও সন্ত ফকির এবং দরবেশদের ধ্যানধারণার মধ্যে সংযোগের ফলে তাঁরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখতেন ও পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সূত্র থেকে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংস্কৃত ও পারসিক ভাষার সংযোগের ফলশ্রুতি কবীরের (১৪৪০-১৫১৪) দোঁহায় প্রকাশিত হয়েছে। কারণ কবীর তাঁর ধ্যান ধারণার মধ্য দিয়ে উভয়ধর্মের চিন্তাধারাকে তাঁর

www.pathagar.com

নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রতিফলিত করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সংগীতের পারস্পরিক প্রভাবের ফলশ্রুতি খসরুর কাওয়ালী সংগীতের মধ্যেও পাওয়া যায়। ভজনের পদাংক অনুসরণ করে কাওয়ালী সম্মিলিত ভাবে সংগীত বিতরণের জন্য ব্যবহৃত হ'ত। অনেকের মতে কাওয়ালী সংগীতের উচ্চমানের সংগে উত্তরভারতের ধ্রুপদী সংগীতের রীতি তুলনীয় এবং কাওয়ালী সংগীতের পরিবেশন দক্ষতার জন্য প্রাথমিক স্তরের ধর্মীয় পরিবেশের বাইরেও জনপ্রিয় হয়েছে। এইজন্য অনেক সময় ভজনও কাওয়ালী রীতিতে পরিবেশনা করা হয় এবং হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কাওয়ালরা সংগীত পরিবেশনার জন্য আমন্ত্রণ লাভ করেন। কাওয়ালী গানের আরেকটি রূপকে 'গজল' নামে অভিহিত করা হয়। উর্দু কাব্যের 'গজল' থেকে এই সংগীতের ভাষা গৃহীত হয়েছে এবং এই ধরণের উর্দু কাব্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ও দুইটিচরণ বিশিষ্ট্য। এই সব কাব্যে সুফী অতীন্দ্রবাদীদের ঈশ্বরপ্রেমের প্রকাশ দেখা যায়। আবার 'গজল' সম্পর্কে অন্যান্য অনেক ব্যাখ্যা আছে। এইসব ব্যাখ্যাতে 'গজল'কে ধর্মনিরপেক্ষ, দার্শনিক বা অলৌকিক সংগীত বলা হয়েছে। গজল অতীব জনপ্রিয় এবং গজলের গান ও আবৃত্তি করার জন্য বিশেষ কবি সম্মেলন বা মুসেহরার অনুষ্ঠান আহ্বান করার রীতি হিন্দুস্থানের সর্বত্র চালু আছে।*

চিত্রকলায় নবরূপায়ন

ইসলামের হিন্দুস্তানে প্রাধান্য বিস্তারের পর যে চিত্রকলার নমুনা পাওয়া যায় তা সাধারণভাবে দ্বিধারায় বিভক্ত। একটি ধারা প্রাচীন রীতি ও পদ্ধতীকে রক্ষার প্রচেষ্টায় সাময়িকভাবে গুরুত্ব হারিয়ে কেবলমাত্র পুরাতন কাঠামোকে ধরে রেখেছিল পরবর্তীকালে অনুকূল পরিস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। আর দ্বিতীয়টি ছিল নতুন শৈল্পিক রূপ ও চেতনার রসে সিঞ্চিত। মুসলমান আক্রমণের পর ইরান থেকে এই রীতি ভারতে এসে পৌঁছেছিল এবং নতুন রূপরেখার সৃষ্টি করেছিল। এইভাবে পুরাতন ও নতুন, বৈদিশিক ও স্থানীয় রীতি ধীরে ধীরে পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। ফলে উভয়ের বৈশিষ্ট পরস্পরের বিকাশের সহায়ক হয়েছিল এবং তাঁদের মিলিত শৈল্পিক উপলব্ধি চিত্রকলার ক্ষেত্রে কয়েকটি অপূর্ব কীর্তির রূপায়নের জন্য দায়ী। এ ধরণের সমন্বয় ছিল হিন্দুস্তানে বিভিন্ন যুগে নব নব সৃষ্টির ধাত্রী। এ সম্পর্কে মধ্যযুগের চিত্রকলাও ব্যতিক্রমী উদাহরণ নয়। দমননীতি ও মূর্তিভাঙ্গার উৎসাহে যেসব বিজয়ী-মুসলমানরা হিন্দুস্তানে আগমনের প্রথমযুগে স্থানীয় সবকিছু ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের শত বাধা সত্ত্বেও আক্রমণকারী ও আক্রান্তের সংযোগ হয়। ফলে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সমন্বয়ের পথ রুদ্ধ হয়নি।

হিন্দুস্তানে প্রাক-মুঘল মুসলমান শাসকরা ধর্মীয় গোঁড়ামীর জন্য চিত্রকলাকেপৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন বলে অনেকে দাবি করেন। কিন্তু ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতকের পুঁথিতে যে সব চিত্রাংকনের নমুনা পাওয়া গিয়েছে তার থেকে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে এই বক্তব্য সঠিক নয়। এইসব চিত্রকে অনেক ক্ষেত্রেই সমকালীন ইরানের বিভিন্ন চিত্রাংকন রীতির দুর্বল অনুকরণ বলা যায়। মান্ডুর সুলতান নাসিরশাহ খলজীর (১৫০০-১০) দরবারে অংকিত বুস্তানের পুঁথির একটি চিত্রকে অন্যান্য চিত্র থেকে পৃথকভাবে চিহ্নত করা হয়। এই চিত্রটিতে হিরাটের চিত্রকলায় যেভাবে রঙ ব্যবহার করা হত, সেই রীতি অনুসৃত হয়। প্রায় সমকালীন যুগে নিয়ামতনামার একটি সচিত্র পুঁথিতে শিরাজের চিত্রকলার অংকন-রীতির

* মধ্যপ্রাচ্যের সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র হিন্দুস্তানে এসে সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল রবাব, তানবুর ও অন্যান্য যন্ত্র এবং কিন্নরী বীণা যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে নতুন ধারার প্রচলন করেছিল।

www.pathagar.com

ছাপ পড়া সত্ত্বেও রেখার টানে ও নারীচিত্রে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এই চিত্রাংকন এমন একটি স্তরের পরিচয় দিয়েছে যেখানে পারসিক প্রভাবকেভারতীয় চিত্রকররা নিজস্ব প্রতিভার সঙ্গে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সমন্বয় পরবর্তীকালে মুঘল এবং কিছুটা রাজস্থানী চিত্রকলার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই।

মধ্যযুগের চিত্রাংকনের রীতি পশ্চিম ভারতের প্রচলিত অংকন পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতের সর্বত্র প্রচলিত হয়েছিল। অধুনা প্রাপ্ত পুঁথিচিত্র থেকে অনুমান করা যায় যে এ যুগের চিত্রাংকন পদ্ধতি গুজরাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এবং জৈনরা ছিলেন চিত্রাংকনের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। কেবলমাত্র জৈন ধর্ম নয় হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত পুঁথি পত্রেরও অভাব নেই এবং রাজস্থান, দিল্লী ও পূর্ব ভারতের জৌনপুরে পুঁথিতে অঙ্কন করার রীতি প্রচলিত ছিল। জৈনদের প্রিয় গ্রন্থ 'কল্পসূত্র' ও 'কালকার্য কথায়' অলংকরণ ও চিত্রাংকনের বৈশিষ্ট্য লক্ষণী । এই সব জৈন পুঁথি দৃঢ়ভাবে রেখাঙ্কিত এবং ছবিগুলির আকৃতি সুস্পষ্ট। জৈন চিত্রগুলিতে মানুষের মুখ ও অবয়ব প্রাধান্য লাভ করেছে এবং চিত্রে দুই চোখের মধ্যে একটি এগিয়ে থাকত। এইসব চিত্রে রঙের বৈচিত্র খুব বেশী ছিল না। সাধারণত একরঙা লালের পটভূমিকায় লাল, সবুজ, নীল ও কালো রঙের ব্যবহার এইসব চিত্রে দেখা যায়। পশ্চিম ভারতের রীতিতে প্রাচীন ভারতের ধ্রুপদী রীতি ছিল। এই চিত্রকলা খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতকে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। এই ঐতিহ্য অজন্তা চিত্রাবলীর অপূর্ব রঙ ও চিত্রের মধ্যে বিকশিত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে সরলীকরণ, বিমূর্তন ও রেখাঙ্করণের বিভিন্ন স্তর উত্তীর্ণ এই রীতির পরিণতি সহজে সনাক্তকরণ করা সম্ভব। পশ্চিম ভারতীয় রীতি অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল এবং ষোড়শ শতক পর্যন্ত বাঁধাধরা নিয়ম অনুসরণ করে চলেছিল।

পঞ্চদশ শতক থেকে পশ্চিম ভারতীয় রীতিতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল। এই পরিবর্তনের জন্য পারসিক চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিতিকে দায়ী করা যায় না। অভ্যন্তরীণ চাপে পশ্চিম ভারতীয় চিত্রকলার পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছিল তাও সঠিকভাবে বলা যায় না। শেষোক্ত চিত্রকলার রীতিতে পঞ্চদশ শতকের যে নবরূপায়ণ শুরু হয় তার নমুনা কেবল দুটি বা একটি ক্ষেত্রে পেওয়া যায়। তিনটি পুঁথির চিত্র ও অঙ্কনরীতিতে এই পরিবর্তন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৪৩৯ সালে মান্ডুতে চিত্রিত কল্পসূত্রের পুঁথি এবং সমসাময়িক কালে ও উৎস থেকে 'প্রাপ্ত কালকার্য কথায়' ও ১৪৬৫ সালে জৌনপুরে অঙ্কিত কল্পসূত্রর পুঁথিতেএই রীতির অন্যতম উদাহরণ। এই সব চিত্রে রেখা স্বচ্ছন্দ ও মসৃণ, আকৃতি অনেক পরিপূর্ণ এবং অঙ্কন শৈলীতে যে প্রতিমূর্তি পাওয়া যায় তা একটি নতুন রীতির আগমনের বার্তাবহ। এই নয়ারীতির সূত্রপাত হয় ষোড়শ শতকে। মহাভারতের আরণ্যক পর্বের পুঁথি (১৫১০) ও মহাপুরাণের পুঁথির (১৫৪০) অঙ্কন শৈলীতেএই নতুন রীতির প্রচলন হয়েছিল। ভাগবত পুরাণের পুঁথির অঙ্কনরীতিতে ও বিহলনের চৌরপঞ্চাশিকার পুঁথিতে (আহমেদাবাদ যাদুঘরে রক্ষিত) এই অঙ্কন শৈলীর বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। পারসিক অঙ্কনশৈলী ও অলংকরণ ভারতীয় চিত্রকে প্রভাবিত করেছিল। তুর্কীদের আগমনের পর চিত্রাংকনের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময় পারস্য থেকে অলংকরণ করা অনেক গ্রন্থ এদেশে এসেছিল এবং পারসিক শৈলীর রঙের বৈচিত্র্যের প্রভাব এদেশে অঙ্কন শৈলীকেপ্রভাবিতকরেছিল। পারসিক রীতিতে অনুপ্রাণিত মোল্লা দাউদের চন্দায়নে (বোম্বাই, প্রিন্স অব ওয়েলস যাদুঘরে রক্ষিত) অঙ্কিত চিত্রে দেখা যায় আবছা শীতল ছায়াঘন রঙের রেখা বিশেষ অগ্রাধিকার লাভ করেছে।

www.pathagar.com

এই অঙ্কন শৈলী ভাগতব পুরান ও চৌরপঞ্চাশিকার পুঁথিচিত্রের তুলনায় অনেক বেশী পরিমার্জিত ও পরিশীলিত।*

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। এইযুগে মুসলমান শাসকদের দরবারে পারসিক প্রভাবিত বা সংযোগে এইসব ইন্দো-ইরানীয় অঙ্কনশৈলী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। এছাড়া ছিল পূর্বভারতীয় অঙ্কনশৈলী। ঐতিহাসিক রমিলা থাপর বলেছেন যে, 'আরব ব্যবসায়ীরা পশ্চিমভারতে কাগজের ব্যবহার প্রচলন করায় জৈন পুঁথিগুলি তখন থেকে কাগজে লেখা শুরু হয়। সরু ও লম্বা কাগজের আকৃতি হ'ল চওড়া আয়ত ক্ষেত্রাকার। আঁকার জায়গা পাওয়া গেল অনেক বেশী।'** এখন থেকে অলংকরণের ভার পড়ল দক্ষ শিল্পীদের উপর। এছাড়া তৎকালীন অঙ্কনশৈলীতে কতকগুলি নবরূপায়নের প্রয়াস পরিবর্তনের সূচনা করেছিল যার নমুনা পূর্বোক্ত মহাভারত ও চৌরপঞ্চাশিকার ন্যায় চিত্রের অলংকরণে সর্বপ্রথম দৃষ্টিআকর্ষণ করে। এই নয়া শিল্পরীতিতে মধ্যএশিয়া, ইরান ও কিছুটা পরোক্ষভাবে চীন ও মঙ্গোলিয়ার শৈলী স্থানীয় শিল্প চেতনার সঙ্গে সবে মিশতে শুরু করেছিল। এই মিশ্রণে মুঘলযুগে গতির সঞ্চার হয়।

স্থাপত্য***

মুসলিম স্থাপত্যরীতি, হিন্দুস্তানে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রচলিত হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন স্থাপত্যরীতিতে যে পদ্ধতি অনুসৃত হ'ত তার থেকে অনেক বিষয়ে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। সুপ্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যরীতি মুসলিম শাসনের শুরুতে নবাগতদের চিন্তাভাবনা ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ও ব্যবহারিক বিদ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছিল।

প্রাক্-মুসলিম যুগে প্রাসাদ, নগর, বাসগৃহ ছাড়াও দেখা যেত মন্দির, স্তুপ, তোরণ, বিহার ও দূর্গ। কিন্তু এইযুগে স্মৃতিসৌধ বা সমাধিস্থল গঠিত হয়নি। নবাগতরা মসজিদ, মক্‌বারা ও মোকামের নির্মাণ করে তাঁদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন এবং প্রাক্-মুসলিম যুগের উদাসীন ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করেছিলেন।

যৌথ উপাসনা কেন্দ্র হলেও বৌদ্ধ চৈত্যে, জৈন উপাসনা স্থলে বা হিন্দু মন্দিরে সর্বত্র ভক্তজনের মুমুক্ষার প্রয়োজনে উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু বা গর্ভগৃহ ছিল অপরিসর এবং এর পরিধি ছিল আত্মশোধনে মগ্ন ব্যক্তির উপাসনার উপযুক্ত স্থান। মসজিদ ছিল সমবেত উপাসনা কেন্দ্র এবং সেইজন্য তার ধর্মাচরণের স্থান ছিল যৌথ এবং জনগণের ধর্মচেতনাকে সংহতভাবে প্রকাশের কেন্দ্র। মসজিদ নির্মাণের নিয়মকানুন এইজন্য বাস্তুকারকে সঠিকভাবে মেনে চলতে হয়। মসজিদের পশ্চিম দিকে 'মিহরাব', তাতে থাকবে মক্কার দিক নির্দেশক কিবলার চিহ্ন। আর মিহরাবের পাশেই থাকবে ইমামের বেদী যাকে মিমবার নামে অভিহিত করা হয়। মসজিদের মূল প্রার্থনা স্থলের সামনে থাকবে 'শেহান' বা মুক্ত প্রাঙ্গণ এবং প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে থাকবে অজুর জন্য জলাধার। অন্য তিন দিকে যে টানা বারান্দা নির্মিত হ'ত, তা যাত্রী সাধারণের বিশ্রামের জন্য। আজানের প্রয়োজনে সুউচ্চ ইমারত সংলগ্ন 'মিনার' নির্মাণ করা হয়। ইমারত থেকে বিচ্ছিন্ন বলে একে 'মিনার' বলা হয়। মক্‌বারা বা সমাধিসৌধ যার পরিকল্পনা কোন বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত না। কিন্তু সমাহিত মৃতদেহ মক্কামুখী করে শয়ান দেবার নির্দেশ দেওয়া আছে।

---

* A Cultural History of India (Ed. Basham)—Medieval Indian Minature Paisting by Promod Chandra পৃ ৩২৬-৩২৭।

** ভারতবর্ষের ইতিহাস—(ওরিয়েন্ট লংম্যান) পৃঃ ২৩৮-২৩৯।

*** ইতিপূর্বে স্থাপত্য সম্পর্কে একাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামের আগমনের সঙ্গে হিন্দুস্তানে আরবী ও ইরানীয় সভ্যতা এবং তাদের শিল্পরীতি এসেছিল। মধ্যযুগে তুর্কী বিজয়ের পর নগরায়ণ শুরু হয়, প্রয়োজন হয় দুর্গ ও তাকে ঘিরে গড়ে ওঠে বসতি ও সাধারণের বাসস্থল এবং তৎসহ নবাবের ও আমির ওমরাহদের প্রাসাদ, দরবার ও দরওয়াজা, সুলতানের খাসমহল, পিলখানা, আস্তাবল এবং দেওয়ান-ই-খাস ও দেওয়ান-ই-আম, বাজার ও সরাইখানা ইত্যাদি। এই নির্মাণ কার্য প্রথমে শুরু হয়েছিল পূর্বতন স্থাপত্য কীর্তি ধ্বংস করে। কুওয়েত উল-ইসলাম ও কুতবমিনারে স্থাপত্যের যে মিলন রয়েছে তা স্বাভাবিক শিল্প চিন্তার সংমিশ্রণের ফলশ্রুতি নয়। ইরানীয় রীতির অনুসরণে খিলান ও গম্বুজের নির্মাণ কৌশল ভারতীয় স্থাপত্যে ছিল না। তির্যক খিলান ও গম্বুজের তলায় আটকান যুক্ত গৃহ ভারতীয় কারিগর জানত না। অতএব কুওয়েত-উল-ইসলাম নির্মাণের জন্য যেসব ভারতীয় কারিগর নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা নিজস্ব উদ্ভাবনী দক্ষতায় ও রীতিতে দুই স্থাপত্যে মিলন সম্ভব করেছিলেন। যার ফলে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন হয়েছিল। ভারতীয় রীতিতে খিলানকে গোলাকার করে বানানো হ'ত অথবা দরজার চৌকাটের ন্যায় একটি জিনিস খিলানের উপর স্থাপনের রীতি ছিল।* মুসলিম স্থাপত্যে খিলান নির্মাণের সময় প্রস্তরখণ্ডকে কেন্দবিন্দুমুখী করে পাশাপাশি সাজানো হ'ত। গম্বুজ ও খিলান বানানোর পারসিক রীতি হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যে অজানা ছিল। কিন্তু ভারতীয় কারিগররা তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইসলামী স্থাপত্য শৈলীতে কিছু রদবদল করে ভারতীয় ও বিদেশাগত রীতির মিলনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। ভারতীয় কারিগররা পদ্মফুলের ন্যায় দেশীয় প্রচলিত প্রতীকের সঙ্গে ইসলামী রীতির জ্যামিতিক নকশা, সূক্ষ্ম অক্ষরের লেখা ও নানা লতাপাতার নকশাও ব্যবহার করেছিলেন। স্থাপত্য সংস্কৃতি ও কলার ক্ষেত্রে এইযে সমন্বয় তা যুগ যুগ ধরে স্থায়ী হয়েছে। এইজন্য একজন লেখক মন্তব্য করেছেন যে, 'ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সৃষ্টি কার্যে হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে যে অদ্ভুত সাফল্য দেখিয়েছিল, সে মিলন পরবর্তী যুগে কখনও ভঙ্গ হয়নি। কোথাও মুসলমানের প্রাধান্য বেশী, আবার কোনও ইমারতে হিন্দুর প্রাধান্য বেশী।'** গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের সমাধিসৌধে ভারতীয় ও ইসলামী শৈলীর মিলন কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'এর খিলানগুলি তীক্ষ্ণ প্রকৃত খিলান (অর্থাৎ Corbelled নয়), অথচ খিলানের পাদদেশে আড়াআড়িভাবে একটি চৌকাঠও আছে, যদিও সে চৌকাঠের কোন ব্যবহারিক যৌক্তিকতা নেই।'

উপসংহার

তুর্কী আক্রমণের সময় ও হিন্দুস্তান বিজয়ের পরে, মধ্যএশিয়া ও ইরাণের সঙ্গে এবং বহির্বিশ্বের মুসলিম সভ্যতার সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সংযোগ বৃদ্ধি পায়। তুর্কী শাসকরা ছিলেন নাগরিক সভ্যতার পক্ষপাতী এবং এইযুগে নগরায়ণের পৃষ্ঠপোষকতা ও বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের ফলে নগদ লেনদেনের পরিমাণ বাড়ে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। গ্রামাঞ্চলে কৃষকের শোষণ ও সামরিক শাসকগোষ্ঠীদের স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব মধ্যযুগের ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল।*** মধ্যএশিয়া ও ইরাণে যে সব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন হয়েছিল সেগুলি এদেশে তুর্কী শাসকগোষ্ঠী প্রবর্তিত করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুস্তানের শহরাঞ্চলে স্থানীয় হিন্দু বণিক ও কুষীদজীবীরা ও গ্রামাঞ্চলের রায়, রানা, মুকদ্দম ও চৌধুরীদের প্রাধান্য তাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়নি।****

---

* ভারতবর্ষের ইতিহাস - রমিলা থাপর, পৃঃ ২৩৯-৪০।

** চতুরঙ্গ, মুজতবা আলি (৪র্থ মুদ্রন)।

*** Economic History of Delhi Sultanate-an Essay in interpretation-Irfan Habib (Historical Review-vil-iv.

**** Wonder that was India Vol-II. pp.XIX.

www.pathagar.com

উত্তর ভারতে তুর্কীরা কালক্রমে এদেশকে স্বদেশে পরিণত করতে বাধ্য হয়েছিল। হিন্দুস্তানে তুর্কী শাসনের শুরুতে নয়া শাসকগোষ্ঠী বিজেতা হিসাবে ভারতীয়দের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত ও জাতি হিসাবে তুর্কীরা যে সর্বশ্রেষ্ঠ এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিল। এইজন্য তুর্কী শাসনের আমলে যে সব ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতীয় আমির ওমরাহ্ দরবারের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁদের প্রতি তুর্কী শাসকগোষ্ঠী বিরূপ ছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন তাঁর তবকত্-ই-নাসিরী গ্রন্থে এই মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন এবং বলবনের প্রতিদ্বন্দ্বী ইমাদউদ্দীনের ক্ষমতাচ্যুতিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বস্তি প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তী কালে তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ১৩২০ সালে দিল্লী সুলতানী আমলের একমাত্র ভারতীয় বংশোদ্ভব সুলতান নাসিরউদ্দীন খসরু শাহকে সিংহাসনচ্যুত করেন। কারণ তুর্কী বা অন্যান্য বিদেশাগত জাতিগোষ্ঠী ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষমতা প্রাপ্তি সুচক্ষে দেখেন নাই।* বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক চাজ্জুর সমর্থক বিদ্রোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে সুলতান জালালউদ্দীন খলজীর জয়লাভ বর্ণনা করে বারাণী মন্তব্য করেছিলেন যে, সুলতানের আমির ও সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে চাজ্জুর সমর্থক 'উদ্যোগহীন ভাত খাওয়া হিন্দুস্তানীরা' পলায়ন করে ও ছত্রভঙ্গ হয়।**

কিন্তু ত্রয়োদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতক এই সুদীর্ঘ কাল হিন্দুস্তানে বসবাসের ফলে ভারতীয় ও তুর্কী এবং অন্যান্য বহিরাগত ইরানীয়, আফগান ও মধ্যএশিয়ার জাতিগোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া করার সুযোগ হয়েছিল। তার ফলশ্রুতিতে এই উন্নাসিক মনোভাবের পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই এসেছিল। তা যদি না হ'ত তাহলে রাজপুতানার মেবারের রানা সংগ্রামসিংহ ও রাজা কৃষ্ণদেব রায় প্রবলপ্রতাপান্বিত হিন্দু রাজা বলে স্বীকৃতি লাভ করেন কিভাবে? প্রথম পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর (১৫২৬) বাবরকে হিন্দুস্তান জয় করার জন্য খানুয়াতে রাজপুতদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জেহাদের গুরুত্ব দিতে হয়েছিল কেন? বাবরের মৃত্যুর পর (১৫৩০) হুমায়ুন প্রথম দফায় মাত্র দশবৎসর রাজত্ব করে শেরশাহ কর্তৃক হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। হুমায়ুন পুনরায় হিন্দুস্তানের সিংহাসন লাভ (১৫৫৫-৫৬) করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আকবর ও আকবরের অভিভাবক বৈরাম খানকে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে (১৫৫৬) হিমুর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত আফগানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। কারণ বিদেশী মুঘলদের বিরুদ্ধে মুসলমান শাসকগোষ্ঠী দক্ষ হিন্দু সেনাপতি হিমুকে (রাজা বিক্রমজিৎ) নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

তৈমুরের আক্রমণের সময় হিন্দুস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে লুণ্ঠেরাদের বাধা দান করেছিলেন। রাজনীতির খাতিরে মুসলমান সুলতানরা হিন্দুরাজাদের সহায়তা ও সহযোগিতা

---

* গিয়াসউদ্দীন তুঘলক সিংহাসনে আরোহনের পূর্বে স্বীয় সমর্থনে যা বলেন তার মর্মার্থ ছিল এই যে ইসলামের পুর্নবাসনের জন্য ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক খলজী সুলতানের প্রতি খসরু শাহর অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তিনি অস্ত্রধারণ করেছিলেন (তুঘলক-নামাহ্ আমির খসরু পৃঃ ১৩৬)। কিন্তু তুঘলক সুলতানের এই বক্তব্যের কোন ভিত্তি নাই। কারণ নাসিরউদ্দীন শাহ্ বা খসরু শাহর সমর্থনে অনেক মুসলমান সৈনিক অস্ত্রধারণ করেছিলেন এবং তাঁরা তুঘলক সুলতানের ঘোষিত জেহাদকে গ্রাহ্য করেননি। নাসিরউদ্দীন খসরু শাহব বিষয়ে আলোচনার জন্য শ্রীবাস্তবের The Sultanate of Delhi Appendix দ্রষ্টব্য।

** তারিখ-ই-ফিরোজশাহী পৃঃ ২৯।

www.pathagar.com

গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। ত্রয়োদশ শতকেও সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন বাংলাদেশের শক্তিশালী বিদ্রোহী শাসনকর্তা তুঘরিলের বিদ্রোহ দমন করার জন্য রায় দনুজের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। রায়ের অনুরোধ ছিল দরবারে সুলতান তাঁকে দণ্ডায়মান হয়ে অভ্যর্থনা জানাবেন। এই অনুরোধ রক্ষা করার জন্য ও সুলতানের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে মালিক নেক্‌তারসের পরামর্শে বলবন একটি বাজপাখী হাতে সিংহাসনে বসেছিলেন। রায় দনুজের সভায় প্রবেশের সময় সুলতান বাজপাখীটিকে মুক্ত করার নামে উঠে দাঁড়ান। এতে দুইদিকই অর্থাৎ সুলতানের সম্মান ও রায়ের অনুরোধ রক্ষা পায়। তুঘরিলের বিদ্রোহ দমনের জন্য বলবন, রায় দনুজের সহযোগিতা লাভে কতদূর অগ্রসর হতে রাজি ছিলেন তা এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয়।*

পরবর্তীযুগে জৌনপুরের সুলতান, প্রয়োজনে গোয়ালিয়রের হিন্দু শাসক ও পূর্বাঞ্চলের জমিদার ও শাসকদের সাহায্য গ্রহণের জন্য তৎপর ছিলেন। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই জৌনপুরের সুলতানরা বাঘেলা ও তোমর রাজপুতদের সাহায্যে দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন।**

মধ্যযুগের সুলতানী শাসনে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে ঋজু ও সোজাসুজি দুইভাগে বিভক্ত করা যায় না। মোরল্যান্ডের মতে বারানী যখন তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে 'হিন্দুদের' কথা উল্লেখ করেছেন তখন তিনি সমাজের উচ্চ কোটি হিন্দুদেরই দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন, সাধারণ লোক বিশেষ করে কৃষকদের কথা বলেননি। ঐতিহাসিক বারানী মধ্যযুগের রাষ্ট্রের শাসক ও শাসিতের ত্রিস্তরীয় বিভাগ অর্থাৎ মুসলমান, হিন্দু ও কৃষকের কথা ভেবেছিলেন।*** এছাড়া সুলতানী আমলের শহরাঞ্চলের মজদুর ও হিন্দু বানিয়াদের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।****

হিন্দু ও মুসলমান জনগণ বিভিন্ন উৎসবে ও অনুষ্ঠানে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'ত। হিন্দু ধর্মীয় উৎসব হোলী, দশেরা ও দেওয়ালীতে সব সম্প্রদায়ই অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল। আবার অনেক মুসলিম ধর্মীয় উৎসব অন্য সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের জীবনে আনন্দোৎসব হিসাবে গৃহীত হ'ত। উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের মধ্যে উৎসবে ও ব্যাসনে প্রীতির বন্ধনে জড়িত হয়েছিলেন এবং বৈদেশিক আক্রমণের মোকাবিলা করতে হাতে হাত মিলিয়েছিলেন।

মধ্যযুগের উলেমা ও রক্ষণশীল ঐতিহাসিকরা দুই সম্প্রদায়ের বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার স্মার্ত ব্রাহ্মণ রক্ষণশীলরা কঠোর নিয়মে বর্ণভিত্তিক সমাজের শুদ্ধতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধ এর ফলে ব্যাহত হয়নি। ইসলাম বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং হিন্দুসমাজে বহু উপবর্ণ ও গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বর্ণবিভেদের প্রভাবে বহু ক্ষেত্রে ইসলামে সামাজিক বিভেদের

---

* তারিখ-ই-মুবারকশাহী (ইং অনুবাদ কে. কে. বসু) পৃঃ ৩৯-৪০

** Twilight of the Sultanate—K. S. Lal পৃঃ ২৮৯।

*** W. H. Moreland—The Agrarian System of Moslem India পৃঃ ৩২, টীকা।

**** রিজভীর মতে সুলতানী আমলে অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে আমদানী করা হয়েছিল, তৎসত্ত্বেও নগরাঞ্চলে হিন্দু কুসীদজীবি ও গ্রামাঞ্চলে রাজপুত প্রধানদের প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল। Wonder that was India Vol-II XIX দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়েছিল এবং শেখ, সৈয়দ প্রভৃতি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল।* বর্ণবিভেদ বিভিন্ন সামাজিক স্তরে চিন্তার বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধর্মীয় ও সামাজিক পার্থক্য ছিল, কয়েক শতাব্দীর সহাবস্থানের ফলে তার উগ্রতা হ্রাস পেয়েছিল। দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোক সুখ, দুঃখের সমান অংশীদার হিসাবে একে অপরের আচারআচরণ প্রচলিত প্রথা, ধর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কে সহনশীল হয়ে উঠেছিলেন এবং বহু ক্ষেত্রে একে অপরের আনন্দ উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন। গ্রাম ও শহরের নিপীড়িত মানুষ স্বার্থরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে শিখেছিল। দরিদ্র হিন্দু বা মুসলমান শহরে বা গ্রামে আমিরওমরাহ বা রায়, রানা, মুকদ্দম, চৌধুরীদের শোষণের ফলে নিষ্পেষিত হ'ত। তৎকালীন যুগে আমিরওমরাহরা এতদূর বিলাসী ছিলেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি পোষাক একবারের বেশী পরিধান করতেন না। জিয়াউদ্দীন বারানী অভিযোগ করেছেন যে ধনী হিন্দুরা কিংখাপের পোষাক, অলংকার পরিধান করে ও বাদ্যবাজনা সহ যাতায়াত করতেন। বারানী কেবলমাত্র হিন্দুধনীদের বিলাসিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।কিন্তু তখনকার আর্থিক কাঠামোতে দরিদ্ররা সাধারণত ধর্মমতনির্বিশেষে শোষিত হতেন এবং হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিত্তবানরা বিলাসী জীবন যাপন করতেন।

হিন্দুস্তানে তুর্কী আগমনের প্রাক্কালে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও বর্ণবিভক্ত সমাজে রক্ষণশীলতার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতে ইসলামের আগমনের পরে স্মার্তব্রাহ্মণ সমাজ কঠোর নিয়মকানুনের বন্ধনে গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু সংঘর্ষ যুগের পরে সংযোগ ও সহাবস্থান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনের মারফতে এক নতুন মানসিকতার সৃষ্টি করেছিল। এদেশের হিন্দু ও মুসলমানরা সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে একে অপরকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ধর্মান্তরিত হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাদের পুরাতন ধ্যানধারণা ত্যাগ করতে পারে নি। ফলে বর্ণভিত্তিক হিন্দুধর্মের চিন্তা মুসলমানদের মধ্যেও বহুক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করেছিল। রাষ্ট্রে আর্থিক কাঠামোতে ধনী হিন্দু বা মুসলমানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পার্থক্য নিম্নকোটির মানুষের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি রচনা করেছিল। পারস্পরিক লেনদেনের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মানসজগতে ঐক্যের সেতুবন্ধের সৃষ্টি হয়। এইযুগের সুফীবাদ ও ভক্তি আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান সহমর্মিতার অন্যতম উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সমন্বয় নতুন সৃজনী প্রতিভার বিকাশে সহায়ক হয়েছিল এবং লোকসংস্কৃতির পথ নির্দেশক হিসাবে কাজ করেছিল। এই সমন্বয়ের ধারা ধর্ম ও জাতি বিচারের ভেদাভেদকে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু বর্ণভিত্তিক সমাজে ভক্তিআন্দোলন আংশিক সাফল্য লাভ করেছিল। ফলে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে চিন্তাধারার বিনিময়ের অভাব দেখা দিয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এইজন্য ভক্তিআন্দোলনের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল।

একমাত্র নানকের অনুগামী শিখরা পরবর্তী কালে রাজনৈতিক শক্তি হিসাব গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন। ভক্তি আন্দোলন হিন্দু সামাজিক কাঠামোকে ধ্বংস না করে এক প্রেমময় পরমেশ্বরের সামনে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ধারণার সৃষ্টি করেছিল। সমাজের সর্বস্তর থেকে গৃহীত ভক্তি আন্দোলনের সন্তরা ঘোষণা করেছিলেন ভক্তিধর্মে জাতপাতের বিচার

* ভারতবর্ষের ইতিহাস—(ওরিয়েন্ট লংম্যান) পৃঃ ২৪২।

www.pathagar.com

অর্থহীন।* ভক্তি আন্দোলনের মারফতে যে বীজ উপ্ত হয়েছিল তা কেবলমাত্র সাময়িকভাবে বর্ণভিত্তিক মধ্যযুগের সমাজকে আলোড়িত করে ক্ষান্ত হয়নি পরবর্তী যুগে সুফীবাদ ভক্তিধর্ম প্রসূত চিন্তাধারার প্রগতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

•

* J.T.F. Jordens মন্তব্য করেছেন যে, "The new devotioned religion, without destroying the Hindu social framework, fostered ideas of brotherhood and equality before the loving Lord, and its saints drawn from all levels of society proclaimed thet in bhakti caste had no meaning," A Cultural History of India (Ed. Basham)– Medieval Hindu Devotsionalism পৃঃ ২৮৬।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট - ক

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত

'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এল কোথা থেকে সমুদ্রে হল হারা।' যুগে যুগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বয়ে উত্তর ভারতে আর্য-অনার্য, শক-হূণ-পাঠান-মুঘল ও অন্যান্য বহু জাতি এদেশে এসেছে এবং ভারতীয় জনসমুদ্রে মিশে গেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়েও বহু বিদেশাগত আক্রমণকারী ভারতে এসে এই জনস্রোতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কেবল সমুদ্রপথে যে ইউরোপীয় বণিকরা হিন্দুস্তানে এসেছিল তারা কোনদিন এই দেশের সঙ্গে একাত্ম হতে চায়নি। ইংরাজ রাজশক্তির পতনের পর তারা বিদেশী হিসাবে যোগাযোগ এখনও রেখেছে। কিন্তু ভারতের ইতিবৃত্তে ইংরাজ দূরাগত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবেই গণ্য। অন্যান্যদের মধ্যে বেশীরভাগ জাতিগোষ্ঠী উত্তর পশ্চিম দিকের গিরিপথ বেয়ে হিন্দুস্তানে এসেছিল। উত্তর-পূর্ব থেকে সে তুলনায় আগমনকারীর সংখ্যা কম। মধ্যযুগে ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্ত অপেক্ষা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার সমস্যা দিল্লীর শাসকদের বেশী চিন্তিত করেছিল। কাবুল, গজনী ও কান্দাহার অঞ্চল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে আসার গিরিপথের দ্বার নিয়ন্ত্রণ করে। সেই সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলের দুর্ধর্ষ ও রণ দুর্দম গোষ্ঠীদের বশে রাখা দিল্লীর সুলতানদের ও তাঁদের উত্তরসূরীদের কাছে সমস্যা সঙ্কুল ছিল। সীমান্তের এই পার্বত্য অঞ্চলে খোক্কর ও অন্যান্য পার্বত্য গোষ্ঠীরা স্ব-স্ব প্রধান হয়ে বাস করত। তাদের সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত না রাখতে পারলে সীমান্ত সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

মোঙ্গল আক্রমণ ও দিল্লীর সুলতানদের সমস্যা

কুতুবউদ্দীন আইবক সিংহাসন লাভের পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে সুরাহা করার জন্য গজনীকে দিল্লীর সুলতানের সাম্রাজ্যভুক্ত করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে মহম্মদ ঘূরীর মৃত্যুর পর তাজউদ্দীন ইলদিজ যখন গজনীতে ক্ষমতা লাভ করেন তখন কুতুবউদ্দীন গজনী আক্রমণ করে স্বদখলে এনেছিলেন (১২০৮)। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি এবং ইলদিজ সহজেই কুতুবউদ্দীন আইবককে গজনী থেকে বিতাড়িত করেন। কুতুবউদ্দীনের পর তার পুত্র আরাম শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে ইলতুৎমিস যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সমস্যার সংকট তাঁকে চিন্তিত করেছিল। প্রথমতঃ, গজনী থেকে ইলদিজ মধ্যএশিয়ার খোয়ারজিম বা খিবার শাহর বাহিনীর আক্রমণে স্থানচ্যুত হয়েছিলেন এবং তিনি লাহোরে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন (১২১৫)। তাজউদ্দীন ইলদিজ ইতিপূর্বেই ইলতুৎমিসের আনুগত্য দাবি করেন এবং সার্বভৌম হিসাবে দিল্লীর সুলতানের কাছে সাহায্য দাবি করেছিলেন। ফলে ইলতুৎমিস এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত উত্তর দানের জন্য ইলদিজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তরাইয়ের যুদ্ধে তাজউদ্দীনকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয়তঃ, খোয়ারজিমের শাহজাদা জালালউদ্দীন মাংগবারানী ইতিমধ্যে মোঙ্গল বাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে হিন্দুস্তানে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন এবং তাঁর পশ্চাদধাবন করে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রান্তে হানা দিয়েছিলেন।

মোঙ্গল আক্রমণের বৈশিষ্ট্য

খোয়ারজিমের শাহজাদা হিন্দুস্তানে আশ্রয়প্রার্থী হওয়াতে ভারতে মোঙ্গল আক্রমণের আশংকা

www.pathagar.com

বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে নবগঠিত দিল্লীর সাম্রাজ্য ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিল। মোঙ্গল নেতা চেংগিজখান মধ্যএশিয়ার বিচ্ছিন্ন ও যাযাবর মোঙ্গল গোষ্ঠীদের ঐক্যবদ্ধ করে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগে এক দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। মোঙ্গল বাহিনী ১২১৫ সালে পেচিং দখল করে ও পাঁচ বৎসর পরে সমগ্র ট্রান্সঅক্সিয়ানা পদানত করেছিল। মোঙ্গলরা পঙ্গপালের মতন মধ্যএশিয়ার সভ্যতার কেন্দ্রগুলি, নগর ও জনপদ মরুভূমিতে পরিণত করেছিল। ফলে সমরকন্দ, বোখারা খিভা প্রভৃতি ইসলামিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল। মধ্যএশিয়ার শক্তিশালী খোয়ারজিমের শাহ মোঙ্গল আক্রমণের ফলে তাঁর সাম্রাজ্য হারান ও আত্মরক্ষার জন্য ক্যাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে পলায়ন করেন। খোয়ারজিমের শাহজাদা জালালউদ্দীন মাঙ্গবারানী মোঙ্গলদের সংগে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন। মাংগবারানী-মোঙ্গলনেতা চেঙ্গিজখান কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ভারতে নিরাপত্তা লাভের আশায় আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন। এইসময় মোঙ্গল ভয়ে ভীত সংখ্যাতীত আশ্রয়প্রার্থী এদেশে এসেছিলেন। এইসব পলাতকদের মধ্যে শাহজাদা থেকে সাধারণ নাগরিক, ফকির থেকে বাদশাহ, উলেমা থেকে অক্ষরজ্ঞানহীন অজস্র শরণার্থী ছিলেন। কারণ মোঙ্গলরা তাঁদের নিষ্ঠুরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তারা কোনস্থান দখল করলে নির্বিচারে হত্যা ও লুণ্ঠনের তান্ডব চালিয়ে সেইস্থানকে বিধ্বস্ত করত। আমির খসরু মোঙ্গলদের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে মোঙ্গলরা দেখতে শ্বেতদানবের ন্যায় ছিলেন এবং লোকে তাদের ভয়ে স্থান ত্যাগ ক'র পলায়নে তৎপর ছিল। ১২৫৮ সালে বাগদাদ দখল করে তারা খলিফা আল মুসতাসিম বিল্লাহকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল এবং বাগদাদের প্রায় ৮০০,০০০ লোকের প্রাণনাশ করে। মোঙ্গলদের আক্রমণে মধ্যযুগে শতসহস্র মানুষ ধনেপ্রাণে মারা যায়। অগণিত সমৃদ্ধ জনপদ, গ্রাম ও নগর শ্মশানে পরিণত হয় এবং বহু সভ্যতার নিদর্শন চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে যায়। বোখারা থেকে আগত মোঙ্গল আক্রমণে গৃহচ্যুত একজন শরণার্থী সংক্ষেপে মোঙ্গল আক্রমণের ও তার ফলাফলের কথা বর্ণনা করে মন্তব্য করেছিলেন 'মোঙ্গলরা এল, খনন করল, খুন-খারাপী করল, লুটপাঠ করল ও চলে গেল।' *

মামলুক সুলতানদের আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে খিবার শাহজাদা জালালউদ্দীন মাংগবারানী মোঙ্গলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে হিন্দুস্তানে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন এবং তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে মোঙ্গল নেতা চেংগিজ খান ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সসৈন্যে হানা দিয়েছিলেন। ফলে ইলতুৎমিস নবগঠিত তুর্কীরাজ্য রক্ষার জন্য একচরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারণ জালালউদ্দীন মাংগবারানী কাফের মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং বিধর্মীদের বিরুদ্ধে একজন মুসলমান সুলতানের সাহায্যের জন্য প্রার্থণাকে না মঞ্জুর করা ইলতুৎমিসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অপরদিকে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার অর্থ ছিল অনিবার্যভাবে নবগঠিত তুর্কী সাম্রাজ্যের ধ্বংস ডেকে আনা। এইসময় ইলতুৎমিস সৌজন্য বজায় রেখে কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং জালালউদ্দীনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ইলতুৎমিসের খিবার শাহজাদাকে বলে পাঠালেন যে, দিল্লীর আবহাওয়া তাঁর বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত নয়। মোঙ্গলরা যখন জালালউদ্দীন খোয়ারজিমের শাহর সন্ধানের জন্য ইলতুৎমিসের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছিলেন তখনও দিল্লীর সুলতানী বাহিনী তাদের বাধা দান করেনি। এইসময়

* How worth-History of the Mongals, Vol-I, পৃঃ ৭৮-৯১, Vol-III, পৃঃ ১২৭-৩০, E and D Hist of India etc. Vol. II, পৃঃ ৩৮৮, Vol. III পৃঃ ৫২৯ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

জালালউদ্দীন মাংগবারানী লাহোরের দিকে অগ্রসর হয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এবার তিনি সল্টরেঞ্জের একজন খোখর প্রধানের কন্যাকে বিবাহ করে নাসিরউদ্দীন কুবাচার শত্রুদের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। জালালউদ্দীন মাংগবারানী পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রায় ৩ বৎসর কাল অবস্থানের ফলে ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ইলতুৎমিসের প্রাধান্য ক্ষুন্ন হয়েছিল।

ইতিমধ্যে জালালউদ্দীন মাংগবারানীর বাহিনী কর্তৃক আকস্মিকভাবে আক্রান্ত না হয়ে নাসিরউদ্দীন কুবাচার বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছিল। ১২২৪ সালে চেংগিজ ও তাঁর মোঙ্গলবাহিনী হিন্দুস্থানের উত্তপ্ত আবহাওয়া অসহ্য মনে হওয়াতে এদেশ ত্যাগ করে। অতঃপর জালালউদ্দীন মাংগবারানীও পারস্যের কিরমানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। এইসকল ঘটনায় একদিকে যেমন নাসিরউদ্দীন কুবাচার শক্তি হ্রাস করেছিল, অপরদিকে এর ফলশ্রুতিতে ইলতুৎমিস কেবল বৈদেশিক আক্রমণ ও কালান্তর মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজের দুর্ধর্ষ বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পাননি বরং এর ফলশ্রুতিতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর রাজ্য দখলের সুযোগ লাভ করেছিলেন। কুবাচা যখন নিম্ন সিন্ধু অঞ্চলে নানাধরণের আগ্রাসনের মুখোমুখি তখন ইলতুৎমিস লাহোর দখল করেন এবং ১২২৮ সালে লাহোরের শাসনকর্তাকে মুলতান দখলের নির্দেশ দান করেছিলেন এবং স্বয়ং উচ্ দখলের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। উচের পতনের পর নিরাপত্তার সন্ধানে নাসিরউদ্দীন কুবাচা নৌকা যোগে পলায়নের সময় সপরিবারে সিন্ধুনদে সলিল সমাধি লাভ করেন।

সিন্ধুনদের দক্ষিণ তটে দিল্লীর প্রাধান্য স্থাপিত হলেও এই নদের উত্তর তীরভূমিতে মোঙ্গলরা সক্রিয় ছিল। এই জন্য ইলতুৎমিস তাঁর সৈন্যবাহিনীকে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর উপত্যকায় প্রাধান্য বিস্তারের জন্য নির্দেশ দান করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীকে যতদূর সম্ভব সংঘর্ষ পরিহার করে চলতে বলা হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে ইলতুৎমিস উত্তরে শিয়ালকোটে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সল্টরেঞ্জের নন্দনা পর্যন্ত সাময়িকভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন। শামসউদ্দীন ইলতুৎমিসের সর্বাধিক কৃতিত্ব হল যে, তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মোঙ্গল আক্রমণ ও খিবার শাহজাদার হিন্দুস্তানে আশ্রয় গ্রহণের ফলে যে বিপদ্জনক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল তা স্বীয় কূটনৈতিক চাল ও দক্ষতায় সমাধান করেছিলেন।

ইলতুৎমিসের দুর্বল বংশধরদের সময় মোঙ্গল আগ্রাসন

ইলতুৎমিসের দুর্বল বংশধরদের রাজত্বকালে দিল্লী সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১২২৯ সালের পর মোঙ্গলরা খোরাসান ও আফগানিস্তানে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় হয়েছিল এবং সিন্ধুতে অভিযান জোরদার করেছিল। এই পরিস্থিতিতে মাংগবারানীর একজন অনুগামী হুসেন কারলুগ সিন্ধুতে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে দিল্লীর সঙ্গে মোঙ্গল বিরোধী মৈত্রী স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই সময় ইলতুৎমিসের সুযোগ্য কন্যা রাজিয়া ছিলেন দিল্লীর শাসক এবং তিনি মোঙ্গলদের বিরোধিতায় সক্রিয় অংশ গ্রহণে রাজি ছিলেন না। তাঁর এই দূরদর্শিতার ফলে মোঙ্গলরা সুলতানী সাম্রাজ্যের সীমানায় আগ্রাসনে লিপ্ত হয়নি। কিন্তু ১২৪০ সালে রাজিয়ার পতনের পর ১২৪১ সালে বাহাদুর তায়েরের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা দখল করেছিলেন। এইসময় ইরাবতী নদী মোঙ্গল অধিকৃত অঞ্চল ও দিল্লী সাম্রাজ্যের সীমানায় পরিণত হয়েছিল।

মূলতান ও উচ্এই দুইটি স্থানের ভাগ্যেও নানা রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল। প্রথমে বিদ্রোহী শাসক কবির খান সুলতান আলাউদ্দীন মামুদ শাহর রাজত্বকালে (১২৪২-৪৬ খ্রীঃ)

www.pathagar.com

এই দুই শহর স্বদখলে রেখেছিলেন। পরে হাসান কারলুগ এইসব অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপনের প্রচেষ্টা করলে বলবন তাঁকে বিতাড়িত করে কিসলু খানকে এইস্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আরো দুই-এক বার ভাগ্য পরিবর্তনের পর অবশেষে ১২৫৫ সালে কিসলুখান ইরানের মোঙ্গল শাসক হুলাগু খানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শণ করে এই অঞ্চল তাঁর হস্তে সমর্পণ করেন।

এই সময় দিল্লীর তুর্কী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার জন্য মোঙ্গলদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি সুলতান ইলতুৎমিসের একটি পুত্র জালালউদ্দীন মামুদশাহ মোঙ্গলিয়া ও চীনের মোঙ্গল শাসক মাংগু খানের বশ্যতা স্বীকার করে সল্টরেঞ্জ অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারে সক্রিয় হয়েছিলেন। ভাতিণ্ডার শাসনকর্তা থাকাকালীন শেরখানও মোঙ্গলদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে উজীর গিয়াসউদ্দীন বলবনের প্রচেষ্টায় সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে একটি রফা করেছিলেন এবং ১২৬০ সালে হুলাগু খানের দূত দিল্লীতে উপস্থিত হলে তাঁকে জাঁকজমকের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ ও হুলাগু খানের মধ্যে যে সমঝোতা হয় তাতে বিতস্তা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত মোঙ্গলরা নিজেদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখতে সম্মত হয়।

গিয়াসউদ্দীন বলবনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য তৎপর হয়েছিলেন এবং তাঁর সিংহাসন লাভের কয়েকবৎসরের মধ্যে লাহোরে দিল্লীর প্রাধান্য স্থপিত হয়েছিল। ভবিষ্যতের মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বলবন উত্তর পশ্চিম সীমান্তে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন এবং রাস্তাঘাটের সংস্কার সাধন করেছিলেন। সৈন্যবাহিনী বিশেষতঃ অশ্বারোহী বাহিনীকে সুলতান বলবনের আমলে ঢেলে সাজানো হয়। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিগুলিকে তাদের শক্তিশালী করা হয়েছিল। গিয়াসউদ্দীন বলবনের সিংহাসন আরোহণের পর কিছুকাল পর্যন্ত সুলতানের সম্পর্কিত ভ্রাতা শেরখান মুলতান ও দিপালপুরের শাসনকর্তা ছিলেন এবং তাঁর প্রতাপে মোঙ্গলরা সীমান্ত অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু শেরখানের শক্তিবৃদ্ধি সুলতানের চক্ষুশূল হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ বলবনের নির্দেশেই গোপনে বিষপ্রয়োগ করে তাঁকে হত্যা করা হয়।

শেরখানের মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দীন বলবন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য মুলতান ও দিপালপুরে তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্র শাহজাদা মহম্মদকে শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেন। পূর্বাঞ্চলের ভাতিন্ডা জিলা এবং সুনাম ও সামানা তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুঘরাখাঁর অধীনস্থ করা হয়েছিল। সমগ্র অঞ্চলের প্রধান সেনাপতি হিসাবে শাহজাদা মহম্মদকে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রতি ক্ষেত্রে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উভয় শাহজাদার অধীনে ১৮ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সর্বদা মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তৎপর ছিল। রাজধানী দিল্লীতেও সমসংখ্যক একদল ঘোড়সওয়ার সংরক্ষিত বাহিনী হিসাবে প্রস্তুত ছিল।

এইভাবে মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ফলে যখনই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে কোন হানাদার বাহিনী সুলতানী সাম্রাজ্যের সীমানা লংঘন করে আক্রমণ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হত তখনই মুলতান ও দিপালপুর থেকে শাহজাদা মহম্মদের ও ভাতিণ্ডা থেকে শাহজাদা বুঘরাখাঁ প্রেরিত সৈন্য দিল্লী থেকে প্রেরিত বাহিনী ত্রিভুজ আক্রমণে তাদের বিধ্বস্থ করত। এইভাবে বলবন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে সুরক্ষিত করেছিলেন ও মোঙ্গল

www.pathagar.com

আক্রমণের আশংকা থেকে সাম্রাজ্যকে মুক্ত করেছিলেন। যদিও লাহোর এইসময় সীমান্তবর্তী শহর বলে গণ্য হওয়া সত্ত্বেও বলা যায় যে, মোঙ্গলরা এইযুগে বিতস্তার অপরপারে পদার্পণ করতে সক্ষম হয়নি। কারণ বলবনের প্রবর্তিত মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত ত্রিভুজ আক্রমণের সামরিক পরিকল্পনার সাফল্যের ফলে মোঙ্গলরা বারংবার পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা এমনকি বিতস্তার তীরবর্তী অঞ্চল অবধি অগ্রসর হবার হিম্মৎও হারিয়েছিল। বুঘরাখাঁকে লখনৌতিতে শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠানোয় সুনাম-সামানা অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে সমগ্র এলাকা সুরক্ষিত করা হয়েছিল ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে শাহজাদা মহম্মদের অধীনস্থ করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা এতদূর সাফল্য অর্জন করেছিল যে মোঙ্গলরা অবশেষে সিন্ধুর অপর পারে বিতাড়িত হয়। শাহজাদা মহম্মদ প্রতিবছর মোঙ্গল হামলাকারীদের বন্দী করে দিল্লীতে প্রেরণ করতেন।

সীমান্তের এই সাফল্য ও লখনৌতিতে বিদ্রোহ দমন এবং সমগ্র সুলতানী সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়াতে বলবনের রাজত্বে সর্বাঙ্গীন উন্নতি সূচিত করেছিল। কিন্তু ১২৮৬ সালের প্রথমদিকে অকস্মাৎ একটি মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব করার সময় শাহজাদা মহম্মদ মোঙ্গলদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এইজন্য শাহাজাদা মহম্মদ সমকালীন ইতিহাসে খান-ই-শহীদ নামে পরিচিত। মহম্মদের মৃত্যুতে বলবনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়নি ও মোঙ্গলরা সীমান্ত অতিক্রম করে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টায় সফল হয়নি। কিন্তু এই দুর্ঘটনা সুলতান বলবনের জীবনে এক মর্মান্তিক আঘাত হেনেছিল। মহম্মদের মৃত্যুর পর সুলতান বলবনকে কখনও হাস্যপরিহাস করতে দেখা যায়নি এবং এই ঘটনার এক বৎসর পর ১২৮৭ সালে তার জীবনাবসান হয়েছিল। দিল্লীর সিংহাসনে বলবনের উত্তরসূরী কাইকোবাদ যখন রাজত্ব করেন সেই সময় মোঙ্গলরা মুলতানে ও পাঞ্জাবে দুইবার হামলা করেছিল, কিন্তু বলবন প্রবর্তিত প্রতিরক্ষার ও সামরিক ব্যবস্থা তাতে ক্ষুন্ন হয়নি। ইলবারী তুর্কীদের শাসনকালে বলবনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি মোঙ্গলদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল তার সাফল্য অনস্বীকার্য।

খলজী সুলতানদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

খলজীদের ক্ষমতালাভের পর মোঙ্গলরা পুণরায় উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাদের অভিযান জোরদার করেছিল। এইসময় তারা কেবলমাত্র মুলতান, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের উপর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে ক্ষান্ত থাকতে চায়নি। কারণ খলজীদের রাজত্বকালে মোঙ্গলরা দিল্লী পর্যন্ত অভিযান প্রেরণ করেছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল সম্ভব হলে রাজধানী দিল্লীকে মোঙ্গল খানদের পদানত করা। ১২৯২ সালে সুলতান জালালউদ্দীনের রাজত্ব কালে হলাগুখানের এক পৌত্রের নেতৃত্বে একটি বিশাল মোঙ্গল বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে সুনাম পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। সুলতান জালালউদ্দীন এই মোঙ্গল বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি চেঙ্গিজের বংশধর উলুঘ খান ও তাঁর অনুচরকে দিল্লীতে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই মোঙ্গলরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নয়ামুসলমান নামে পরিচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তারা সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে বারংবার বিদ্রোহ করেছিল। সুলতান আলাউদ্দীন নিষ্ঠুরভাবে নয়া মুসলমানদের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বের প্রথমদিকে কাদারের নেতৃত্বে প্রায় ১০০,০০০ মোঙ্গল পাঞ্জাবে হামলা করেছিল। এই মোঙ্গল আক্রমণকারীরা লাহোরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত অগ্রসর

www.pathagar.com

হয়েছিল। আলাউদ্দীনের সেনাপতি উলুঘখান ও জাফরখান তাদের জলন্ধরের কাছে যুদ্ধে পরাজিত করে হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। এই যুদ্ধে বহু মোঙ্গল হামলাকারী নিহত হয় (১২৯৭)। এই পরাজয়ে নিরুৎসাহিত না হয়ে ১২৯৮ সালে পুনরায় সালদীর নেতৃত্বে মোঙ্গলরা আলাউদ্দীনের রাজ্যসীমা লংঘন করে লুণ্ঠন ও নরহত্যার সূত্রপাত করেছিল। এইসময় সিন্ধু সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ শুরু হয় এবং জাফর খান সিওয়ান বা সিবিস্তানে তাদের পরাজিত করে সালদী ও তাঁর ভ্রাতাকে রাজধানীতে বন্দী করে নিয়ে আসেন।

১২৯৯ সালে কুতলুঘ খোজার নেতৃত্বে প্রায় ২ ০০,০০০ মোঙ্গল বাহিনী দিল্লীর উপকণ্ঠে হাজির হয়েছিল। এই সময় রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকজন নিরাপদ আশ্রয় লাভের জন্য রাজধানীতে শরণার্থী হয়ে এসেছিল। ফলে শহরে মানুষের ভীড় বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুলতান স্বয়ং রাজধানীর উত্তরে কিলিতে মোঙ্গলদের প্রতিরোধ করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণকারীরা এইবার জাফর খানের প্রবল আক্রমণে ও বীরত্বে বিধ্বস্ত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু মোঙ্গলদের সঙ্গে সংঘর্ষে জাফর খান নিহত হয়েছিলেন।

এই ঘটনার পরও ১৩০৩ সালে মোঙ্গলরা পুনরায় দিল্লী আক্রমণ করে অবরোধ করেছিল। কারণ তেলেঙ্গানা ও রাজস্থানে আলাউদ্দীনের অভিযানে দিল্লীর অনেক সৈন্য ব্যাপৃত ছিল। মোঙ্গলরা এই সুযোগে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তৎপর হয়। মোঙ্গল নেতা তাগীর নেতৃত্বে প্রায় ১,২০,০০০ মোঙ্গল সৈন্য দিল্লী আক্রমণ করেছিল। এইসময় সিরি দুর্গের সুরক্ষিত এলাকায় সুলতান তার সৈন্যবাহিনী সহ অবরুদ্ধ ছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ, মোঙ্গলরা দুর্গ দখল ও প্রতিরাধ চূর্ণ করার রণনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না। অতএব লুটপাটের পর মোঙ্গলরা স্বেচ্ছায় এই অবরোধ তুলে নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করেছিল। ১৩০৫ সালে আলি বেগ, তারতাক ও তাগীর নেতৃত্বে একদল সৈন্যবাহিনী শিবালিক পর্বতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দিয়ে আমরোহো পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। মালিক নায়েকের* অধীনে প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর হস্তে পরাজিত হয়েছিল। সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ মোঙ্গল আক্রমণ হয় ১৩০৬ সালে কুবাক ও ইকবালমান্দার নেতৃত্বে। মালিক কাফুরের নেতৃত্বে প্রেরিত সুলতান বাহিনী মোঙ্গলদের যুদ্ধে পরাজিত করে। এই যুদ্ধে বন্দী মোঙ্গল বাহিনীর পদস্থ সামরিক লোকদের দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সুলতানের আদেশে তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ভবিষ্যতে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সুলতান আলাউদ্দীন খলজী তাঁর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করেন এবং গাজি মালিককে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ফলে পরবর্তীকালের মোঙ্গল আক্রমণকারীদের সীমানা অতিক্রম করার প্রচেষ্টা সুলতানী বাহিনী সহজেই ব্যর্থ করে দিয়েছিল। এই সময় সুনাম ও দিপালপুর সীমান্তে মোঙ্গলদের আগমনের পরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়। পুরাতন দুর্গগুলি সংস্কার করা হয় এবং অভিজ্ঞ সেনাপতিদের এইসব দুর্গের দায়িত্বভার দেওয়া হয়। রাজকীয় সৈন্যবাহিনী সুসংগঠিত করার জন্য দাগ প্রথার প্রচলন করা হয় এবং প্রতিটি সৈন্যের পরিচিতির জন্য বর্ননামূলক ভাবে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। রাজকীয় কারখানায় সর্বপ্রকার অস্ত্র নির্মাণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ট্রান্সঅক্সোনিয়ার মোঙ্গল প্রধান দুওয়া খানের (Duwa khan) মৃত্যুর (১৩০৬ খ্রীঃ) পর তিনজন খান তিনবৎসরের মধ্যে একের পর এক ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন এবং হিন্দুস্তানে মোঙ্গল আক্রমণের তীব্রতা এইসময় হ্রাস পেয়েছিল।

---

* কোন কোন পণ্ডিতের মতে আকাট খানের হাত থেকে সুলতানের জীবন রক্ষাকারী মানকপাকের সঙ্গে মালিক নায়েককে সনাক্ত করা যায়। (Delhi Sultanate, Vidya Bhavan, পৃ : ২৯ ও পাদটিকা ২৩)।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে মোঙ্গল আক্রমণ ও তুঘলক আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

গাজি মালিক, যিনি সুলতান আলাউদ্দীন খলজী কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় মোঙ্গলদের সামরিক অভিযান বন্ধ করার জন্য শেষোক্তদের কাবুল ও গজনীর ঘাঁটি পর্যন্ত অভিযান করেছিলেন। এই গাজী মালিকই ১৩২০ সালে আলাউদ্দীনের পুত্র সুলতান মুবারক খলজীর (১৩১৬-১৩২০) হত্যাকারী সুলতান নাসিরউদ্দীন খসরু খানকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক নামে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মোঙ্গলরা একবার সুলতানী সাম্রাজ্যের সীমানা লংঘন করেছিল। কিন্তু দিল্লীর সৈন্যবাহিনী মোঙ্গলদের সহজে পরাজিত করে মোঙ্গল নেতাদের বন্দী করেছিল। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে চাঘতাই মোঙ্গল প্রধান তরমাশিরিণের মোঙ্গল বাহিনী সুলতানী সাম্রাজ্য আক্রমণ করে বাদায়ুন পর্যন্ত লুটপাট করেন। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কালানোর পর্যন্ত পশ্চাদধাবন করেছিলেন এবং ভবিষ্যতে মোঙ্গল প্রতিরোধের জন্য কালানোর ও পেশোয়ার সুরক্ষিত করেছিলেন। সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের রাজত্ব কালে কোন মোঙ্গল আক্রমণ সাম্রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত করেনি। মধ্যএশিয়াতেও এইসময় মোঙ্গল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। চতুর্দশ শতকে মোঙ্গলরা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিল।

তৈমুরের আক্রমণ

এইসময় সমরকন্দে রাজধানী স্থাপন করে আমির তৈমুর একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। বারলাস তুর্কী গোষ্ঠীর গোরগান শাখায় আমির তৈমুর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন (১৩৩৬)। এই গোষ্ঠী তুর্কি-মোঙ্গল জাতিগোষ্ঠীর একটি শাখা। সমরকন্দকে কেন্দ্র করে তিনি বালখ, কাস্পিয়ান প্রদেশসমূহ, ফার্স, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, মেসোপটেমিয়া ও দক্ষিণ রাশিয়াতে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। ১৩৯৬-৯৭ সালে পৌত্র পীরমহম্মদের নেতৃত্বে তাঁর বাহিনী হিন্দুস্তান আক্রমণ করেছিল। ১৩৯৮ সালে তৈমুর সসৈন্যে হিন্দুস্তানে অনুপ্রবেশ করে দিল্লী পর্যন্ত লুণ্ঠন করেছিলেন। তৈমুরের আক্রমণের ফলে সংখ্যাতীত মানুষের প্রাণনাশ হয়। অজস্র গ্রাম ও নগর ধ্বংস হয় এবং যেপথ দিয়ে তিনি এসেছিলেন তার দুপাশের জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। * ১৩৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তৈমুরের দিল্লী আক্রমণের ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর সৈন্যদের তরবারীতে প্রাণ-হারিয়েছিল। ১৩৯৯ সালে অজস্র দক্ষ কারিগর ও ক্রীতদাস, স্থপতি ও সুদক্ষ নির্মাণ কার্যে অভিজ্ঞ শ্রমিকসহ তৈমুর স্বদেশে যাত্রা করেছিলেন। পরবর্তী কালে তৈমুরের বংশধর বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (২১শে এপ্রিল, ১৫২৬ খ্রীঃ) দিল্লীর লোদী সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন। ১৫২৭ সালের ১৭ই মার্চ বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে রানা সঙ্গ ও তার রাজপুত বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছিলেন।

ফলাফল

দিল্লীর সুলতানদের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতিতে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়েছিল। মোঙ্গলদের প্রতিরোধের জন্য সামরিক, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুলতানরা সুদৃঢ় করবার প্রয়াসে সর্বদা তৎপর ছিলেন। ইলবারী তুর্কী সুলতানদের থেকে তুঘলক ও লোদী

---

* পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সুলতানদের আমল পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতির সমস্যা দিল্লীর তক্তের অধিকারীদের বিব্রত করেছিল ও তাঁদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এই কারণে দিল্লীর সুলতানরা তাঁদের রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও অনৈক্য যাতে মোঙ্গল আক্রমণকারীরা কাজে লাগাতে না পারে সেদিকে কঠোর নজর রাখতেন। ফলে সুলতানী শাসনে স্বৈরাচারের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য দিল্লীর সুলতানরা, যথা ইলতুৎমিস, বলবন, আলাউদ্দীন খলজী, মহম্মদ বিন তুঘলক রাজস্বের সিংহভাগ ব্যয় করতেন এবং এবিষয়ে তাদের তৎপরতা কোনদিনই হ্রাস পায়নি। মোঙ্গল আক্রমণে মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন শক্তিশালী রাজ্য ধ্বংস হওয়াতে সেখান থেকে আশ্রয়প্রার্থীরা, বাদশাহ ও আমির থেকে সাধারণ লোক পর্যন্ত, দিল্লীতে এসেছিলেন। এইসব শরণার্থীদের মধ্যে কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, দক্ষশাসক ও সৈনিক, শিল্পী, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিরা ছিলেন। তাঁদের আগমনে দিল্লী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং হজরত-ই দিল্লী নামে পরিচিত হয়েছিল।

এছাড়া মোঙ্গল আক্রমণের আশংকায় দিল্লীর সুলতানরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতেন বলে তাঁরা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানে রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করতে পারেননি। অবশ্য আলাউদ্দীন খলজীর ন্যায় সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন সুলতানরা একাধারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে আগত মোঙ্গলদের প্রতিরোধে সাফল্য অর্জন করেছিলেন অপরদিকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন রাজ্য পদানত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এইরূপ প্রয়াস সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপদের আশংকা ডেকে আনার সম্ভবনা বৃদ্ধি করেছিল। এইজন্য অন্যান্য কারণে সুলতান বলবনের সময় সাম্রাজ্য-বিস্তার-নীতি অনুসৃত হয়নি। পরবর্তী কালে মহম্মদ বিন তুঘলকের নীতি সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তব মন্তব্য করেছেন যে, মোঙ্গলরা সাফল্য অর্জন করলে সুলতানী শাসনের অবসান হত। "যেহেতু মোঙ্গলরা বস্তুতঃ বৌদ্ধ ছিল, তারা ধীরে ধীরে গ্রীক, শক ও হুণদের ন্যায় হিন্দু সমাজে মিশে যেত ও ভারত তার ইতিহাসের সবথেকে বিভ্রান্তিকর সামাজিক এবং ধর্ম সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করত।"* এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শ্রীবাস্তব ও অন্যান্য যেসব ঐতিহাসিক মধ্যযুগের ইতিবৃত্তে মোঙ্গল আক্রমণ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেছেন, সংকীর্ণ দৃষ্টি-কোণের জন্য সঠিকভাবে মোঙ্গল আক্রমণের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যর সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হননি। কারণ মোঙ্গলরা যখন কোন দেশ আক্রমণ করত তাদের উদ্দেশ্য ছিল পঙ্গপালের মত সেই দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা। মোঙ্গল নেতা চেংগিজ খান তাঁর অনুচরদের জীবনের সর্বাধিক আনন্দ কি তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাদের দেওয়া উত্তর মোঙ্গল নেতার পছন্দ না হওয়াতে চেঙ্গিজ নিজেই মোঙ্গল আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, 'সর্বাধিক আনন্দ যা একজন মানুষ লাভ করতে পারে তাহ'ল তার শত্রুদের জয় করা ও তাড়া করে নিয়ে যাওয়া। তাদের ঘোড়ায় চড়া ও সম্পদ কেড়ে নেওয়া। তাদের প্রিয়জনের চোখের জলে ভরা মুখমণ্ডল দেখা এবং তাদের স্ত্রী ও মেয়েদের স্বীয় বাহুবন্ধনে জড়ানো।' মোঙ্গলরা যেসব দেশ ও অঞ্চল জয় করেছে সেখানেই তাদের অমানুষিক

---

* 'Had the Mongols succeeded, the history of our country would have taken a different course. The sultanate, of course, would have come to an end; and the Mongols, being virtual Buddhists would have gradually merged in the Hindu society like the Greeks, the Sakas and the Huns, and India would have been saved from the most baffling social and religious-cum-political problem of her history.' The Sultanate of Delhi by A. L. Srivastav, পৃঃ ৩১৪।

www.pathagar.com

কার্যকলাপের প্রমাণ পাওয়া যায়।* দুর্ধষ মোঙ্গল লুণ্ঠনকারীরা যেখানেই অভিযান করেছে সেখানেই গণহত্যা ও লুঠতরাজের দ্বারা সেই স্থান শ্মশানে পরিণত করেছে। চেঙ্গিজের অনুচররা বারংবার ভারতে হানা দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ইলতুৎমিস ও তাঁর পরবর্তী দিল্লীর মুসলমান সুলতানরা তাঁদের সাম্রাজ্য মোঙ্গল বিভীষিকা থেকে রক্ষা করেছিলেন। মোঙ্গলরা হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করেছিল। শ্রীবাস্তবের ন্যায় যে সব ঐতিহাসিক তাঁদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মোঙ্গল আক্রমণকে দেখেছেন তাঁদের বিশ্লেষণ বিভ্রান্তিকর। কারণ যে তথাকথিত বৌদ্ধধর্মের মোঙ্গলরা অনুগামী ছিল তাতে শাক্যমুণির অহিংসা ও মৈত্রীর কোন স্থান ছিল না। এদেশ থেকে মোঙ্গল হানাদারদের দিল্লীর সুলতানরা যদি বিতাড়িত করতে সক্ষম না হতেন তাহলে তারা হিন্দুস্তানের গ্রাম, জনপদ ও নগরগুলি ধূলিস্যাৎ করে শ্মশানে পরিণত করত। ফলে সমরকন্দ, বোখারা, খিবা, বাগদাদ ও অন্যান্য বহু মোঙ্গল আক্রমণে বিধ্বস্ত নগরের মত দিল্লী, লাহোর, মূলতান প্রভৃতি ধ্বংস হয়ে যেত। ভারতের তুর্কী শাসক ও তাঁদের উত্তরসূরীরা সাফল্যের সঙ্গে মোঙ্গল হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে কেবলমাত্র দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী করেননি তাঁরা হিন্দুস্তানের মানুষকে ও অগণিত শরণার্থীদের মোঙ্গল আতঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

---

* "The greatest joy a man can know is to conquer his enemies and drive them before him. To ride their horses and take away their possessions. To see the faces of those who were dear to them bedewed with tears and to clasp their wives and daughters in his arms".

— The Mongol Empire : its Rise and Fall,—Michael Prawdin, পৃঃ ৬০।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট - খ

ইংরাজী গ্রন্থপঞ্জী

আলি, আমির—*এ শর্ট হিষ্ট্রি অফ্ দি সারাসেনস্।*

আর্নল্ড, স্যার টি. ডব্লিউ.—*দি খালিফেত,* লণ্ডন, ১৯৬৫।

— *দি প্রিচিং অফ্ ইসলাম।*

আমির খসরু—*খাজাইন-উল্-ফুতুহ* (ইংরাজী অনুবাদ, হাবিব)।

— *নুহ সিপির* (মহম্মদ ওয়াহিদ মির্জা সম্পাদিত; আংশিক অনুবাদ *হিষ্ট্রি অফ্ ইন্ডিয়া এজ টোল্ড বাই ইট্স ওন হিষ্টোরিয়ানস্*—ইলিয়ট ও ডাউসন, ৩য় খণ্ড)।

— *মিফতাহ-উল-ফুতুহ* (নিয়াজী, ওয়াই. কে. সম্পাদিত, আংশিক অনুবাদ-ইলিয়ট ও ডাউসন, ৩য় খণ্ড)।

— *তুঘলক নামা* (হায়দ্রাবাদ সংস্করণ)।

আবুল ফজল—*আইন-ই-আকবর-ই* (অনুবাদ-ব্লকম্যান ও জ্যারেট)।

আগনাইডস, এন. পি—*মহামেডান থিওরিজ অফ্ ফিনান্স।*

আয়েঙ্গার, এস. কুমারস্বামী—*সাউথ ইন্ডিয়া অ্যান্ড হার মহামেডান ইনভেডারস।*

অন্টোনোভা, কে., বোনগার্ড লেভিন, জি. এবং কোটভস্কি, জি.—*এ হিষ্ট্রি অফ্ ইন্ডিয়া* (২য় খণ্ড, মস্কো)।

আহমদ শাহ—*বিজক অফ্ কবীর* (হামিরপুর)।

ইলিয়ট, এইচ. এম ও ডাউসন, জি.—*হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়া এজ টোল্ড বাই ইট্স্ ওন হিস্টোরিয়ানস্।*

ইয়ুল, কর্ণেল হেনরী—*দি বুক অফ্ সের্ মার্কোপোলো।*

ঈশ্বরীপ্রসাদ—*হিষ্ট্রি অফ্ মিডিয়াভ্যাল ইন্ডিয়া*

— *এ শর্ট হিষ্ট্রি অফ্ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া।*

ওয়েস্টকোট, জি. এইচ.—*কবীর অ্যান্ড কবীরপন্থ।*

ওয়াহেদ, মির্জা মহম্মদ—*লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কস্ অফ্ আমির খসরু।*

কার স্টিফেন্স—*দি আর্কেয়োলজি অ্যান্ড মনুমেন্টস্ অফ্ দিল্লী।*

কমিসেরিয়েট, এস. এস.—*এ হিষ্ট্রি অফ্ গুজরাট।*

কাইজার, এ. জে.—*দি ইন্ডিয়ান রেসপন্স টু ইউরোপিয়ান টেক্‌নোলজি অ্যান্ড কালচার (১৪৯৮-১৭০৭ খ্রীঃ),* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮২।

কোশাম্বী, ডি. ডি.—*অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি স্টাডী অফ্ ইন্ডিয়ান হিষ্ট্রি।*

খানসাহেব এম. আবেদ আলী খান—*মেমোয়ার্স অফ্ গৌড় অ্যান্ড পাণ্ডুয়া* (স্টেপলটন সম্পাঃ)।

খুদাবক্স, এস. এম.— *পলিটিক্স ইন ইসলাম।*

— *এসেইজ ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইসলামিক।*

খুদাবক্স, এস. অ্যান্ড মার্গোলিয়াত— *কনট্রিবিউসন টু দি হিষ্ট্রি অফ্ ইসলামিক সিভিলাইজেশন,* দুই খণ্ড, কলকাতা ১৯২৯।

খুশবন্ত সিং— *এ হিষ্ট্রি অফ্ দি শিখস্।*

গেইট, স্যার এডওয়ার্ড— *এ হিষ্ট্রি অফ আসাম।*

গিবস, এইচ. এ. আর.— *ইবনবতুতা* (ব্রডওয়ে ট্রাভেল সিরিজ)।

গ্রীয়ারসন, স্যার জি. এ.— *বিহার পেজেন্ট লাইফ।*

ঘোষাল, ইউ. এন.— *অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া।*

টড, কর্ণেল জেমস— *অ্যানালস্ অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিস্ অফ্ রাজস্থান* (ডব্লিউ ক্রক সম্পাঃ)।

টমাস, এডওয়ার্ড— *দি ক্রনিক্যাল অফ্ পাঠান কিংস অফ্ দিল্লী।*

টোপা ঈশ্বর— *পলিটিক্স ইন প্রি-মুঘল টাইমস্।*

ডর্ন, বি— *হিষ্ট্রি অফ্ দি আফগানস্* (খারি নিয়মতুল্লাহ, *তারীখ-ই খানজাহানী ওয়া মাখজান-ই-আফগানী,* ইং অনুবাদ)।

ডমিনিগো পায়েজ, ফার্নান্ডো নুনিজ— *দি বিজয়নগর এম্পায়ার।*

ত্রিপাঠি, আর. পি— *সাম্ অ্যাসপেক্টস্ অফ্ মুসলিম অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন্।*

থাপার, রোমিলা— *এ হিষ্ট্রি অফ্ ইণ্ডিয়া,* প্রথম খণ্ড (পেঙ্গুইন)।

দত্ত, চিন্ময়— *ক্যাটালগ অফ্ অ্যারাবিক অ্যান্ড পার্শিয়ান ইনস্ক্রিপশনস্ ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম,* কলকাতা।

দেশাই, জিয়াউদ্দিন— *পার্সিয়ান অ্যান্ড অ্যারাবিক এপিগ্রাফি অফ্ গুজরাট* (দি মহারাজা সিয়াজিরাও ইউনিভার্সিটি, বরোদা, ১৯৮২)।

দাশগুপ্ত, এস.— *অবস্কিয়োর রিলিজিয়াস্ কাল্টস্।*

দে, বি.— *তবকত্-ই-আকবরী* (নিজাম-উদ্দীন আহমেদের গ্রন্থের ইং অনুবাদ)।

নাইনার, এস, এস, এইচ— *আরব জিওগ্রাফারস্ নলেজ অফ্ সাউর্দান ইন্ডিয়া।*

নিজামী, কে. এ.— *সাম অ্যাস্পেকট্স অফ্ রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া ডিউরিং দি থার্টিনথ্ সেঞ্চুরী।*

— *দি লাইফ অ্যান্ড টাইমস্ অফ্ শেখ ফরিদউদ্দীন গঞ্জ-ই শকর।*

পন্ডিত, আর. এস.— *দি রিভার অফ্ কিংস* (কলহনের রাজতরঙ্গিনীর ইং অনুবাদ)।

প্রধিন, মাইকেল— *মোঙ্গল এম্পায়ার : ইটস্ রাইজ অ্যান্ড ফল।*

ফার্গুসন, জেমস— *হিষ্ট্রি অফ্ ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার।*

বড়ুয়া, কে. এল— *আর্লি হিষ্ট্রি অফ্ আসাম।*

বসু. কে. কে.— *তারিখ-ই-মুবারক শাহী* (ইয়াহিয়া বিন্ আহমেদ সিরহিন্দ-এর গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ)।

www.pathagar.com

ব্রিগস, জন—*এ হিষ্ট্রি অফ্ দি রাইজ অফ্ মহমেডান পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া* (মহম্মদ কাশীম ফিরিস্তার গ্রন্থ *তারিখ-ই-ফিরিস্তা*-র ইংরাজী অনুবাদ)।

বেভারিজ, এ. এস.—*বাবর নামা* (জাহিরউদ্দীন মহম্মদ বাবরের *বাবরনামা* গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ)।

বেইলী, ই, সি —*লোকাল মহমেডান ডাইনাস্টিজ্* (মিরাট-ই-সিকন্দরী—ইং অনুবাদ)।

বৈদ্য, সি. ডি.— *হিষ্ট্রি অফ্ মিডিয়াভ্যাল ইন্ডিয়া* (৬০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস)।

ব্যাডেন পাওয়েল, বি.এইচ.—*ল্যান্ড সিস্টেম অফ্ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া,* ৩ খন্ড (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৮৯২)।

ব্যানার্জি, অনিল চন্দ্র—*লেকচারস্ অন রাজপুত হিষ্ট্রি।*

ব্যানার্জি, ইন্দুভূষণ—*ইভোলিউশন অফ্ দি খালসা* (২ খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ)

ব্যানার্জি, যামিনীমোহন—*হিষ্ট্রি অফ্ ফিরোজ শাহ তুঘলক।*

ব্রাউন, পি—*ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), ২য় সংস্করণ, ১৯৭৫।

ব্যাসাম, এ. এল. (সম্পাদিত)—*এ কালচারাল হিষ্ট্রি অফ্ ইন্ডিয়া।*

বারবোসা, দুয়ার্তে— *দি বুক অফ্ দুয়ার্তে বারবোসা* (ইংরাজী অনুবাদ এম. এল. ডোমস, হাকল্যুট সোসাইটি)।

ভার্থেমা, লুডভিক— *দি ট্রাভেলস ইন ইজিপ্ট, সিরিয়া, পার্শিয়া, ইথিয়োপিয়া* (ইংরাজী অনুবাদ জে. ডবলু, জেমস্. হ্যাকল্যু সোসাইটি)।

মহালিঙ্গম, টি.টি— *ইকনমিক লাইফ ইন দি বিজয়নগর কিংডম।*

— *অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অ্যান্ড সোশাল লাইফ আন্ডার বিজয়নগর।*

মজুমদার, আর. সি; রায়চৌধুরী, এইচ. সি.; দত্ত, কে. কে— *অ্যান অ্যাডভানস্ড় হিষ্ট্রি অফ্ ইন্ডিয়া*, ম্যাকমিলিয়ন।

মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদিত)—*দি ষ্ট্রাগল ফর এম্পায়ার* (ভারতীয় বিদ্যাভবন, হিষ্ট্রি অ্যান্ড কালচার অফ দি ইন্ডিয়ান পিপল, ৫ম খন্ড)।

— *দি দিল্লী সুলতানত* (ভারতীয় বিদ্যাভবন, হিষ্ট্রি অ্যান্ড কালচার অফ দি ইন্ডিয়ান পিপল, ষষ্ঠ খণ্ড)।

মোরল্যান্ড. ডবলু. এইচ,— *অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম অফ্ মোসলেম ইন্ডিয়া।*

র‍্যাভেনশ, জন হেনরী—*গৌড়, ইটস্ রুইনস্ অ্যান্ড ইনসিক্রপসনস্।*

রায়, এইচ. সি.— *ডাইনাষ্টিক হিষ্ট্রি অফ্ নর্দান ইন্ডিয়া।*

রাইট, এইচ. এন.—*দি কয়েনেজ অ্যান্ড মেটেরিওলজি অফ্ দি সুলতানস্ অফ্ দিল্লী।*

রিজভী, এস. এ. এ.—*দি ওয়ান্ডার দ্যট ওয়াজ ইন্ডিয়া* (২য় খণ্ড)।

রিজলী, স্যার হার্বার্ট — দি পিপ্‌ল অফ্ ইন্ডিয়া।

রেনল্ডস, জেমস— *তারিখ-ই-ইয়েমিনী* (আলু উতবীর গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ)।

www.pathagar.com

রায়চৌধুরী, তপন ও হাবিব, ইরফান—*কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিষ্ট্রি অফ্ ইন্ডিয়া,* ১ম খন্ড।
রোজেনথাল, ই. আই. জে.— *পলিটিক্যাল থট ইন মিডিয়াভ্যাল ইসলাম।*
রোজেনথাল, ফ্রানজ— *দি মুকাদ্দিমা অফ্ ইবন-ই-খালদুন,* (ইংরাজী অনুবাদ)।
লাল কে. এস.—*টোয়াইলাইট অফ্ দি সুলতানত।*
— *হিষ্ট্রি অফ্ দি খলজীস্।*
লেনপুল, স্ট্যানলি—*মিডিয়াভ্যাল ইন্ডিয়া আন্ডার মহামেডান রুল।*
হাবিব, মহম্মদ—*ক্যাম্পেনস্ অফ্ সুলতান আলাউদ্দীন খলজী।* (ইংরাজী অনুবাদ, *খাজাইন-উল ফুতুহ,* আমির খসরু)।
— *সুলতান মামুদ অফ্ গজনি।*
— *হজরৎ আমির খসরু অফ্ দিল্লী।*
হাবিব, এম; নিজামী, কে. এ.(সম্পাদিত)— *এ কম্প্রিহেনসিভ হিষ্ট্রি অফ্ ইন্ডয়া,* ৫ম খণ্ড।
হাবিবউল্লা, এ. বি. এম—*দি ফাউনডেশন অফ্ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া* (২য় সংস্করণ)
হ্যামিল্টন, চার্লস—*দি হিদাইয়া* (ইংরাজী অনুবাদ)।
হাওয়ার্থ, এইচ. এইচ.—*হিষ্ট্রি অফ্ দি মোঙ্গলস।*
হিটি, ফিলিপ—*হিষ্ট্রি অফ্ দি আরবস্।*
হুসেন, আগা মাহেদী—*রাইজ অ্যান্ড ফল অফ্ মহম্মদ বিন তুঘলক।*
— *তুঘলক ডাইনেস্টি।*
— *দি রেহেলা অফ্ ইবন বতুতা* (ইংরাজী অনুবাদ)।
— *ফুতুহ-উস সালাতিন* (অনুবাদ)।
হুসেন, ওয়াহিদ— *অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অফ্ জাস্টিস ডিউরিং দি মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া উইথ এ হিষ্ট্রি অফ্ দি অরিজিন অফ্ ইসলামিক লিগ্যাল ইনষ্টিটিউশন।*
শাস্ত্রী, নীলকণ্ঠ ও শ্রীনিবাসাচারী—*অ্যাডভান্সড হিষ্ট্রি অফ্ ইন্ডিয়া।*
শ্রীবাস্তব, এ. এল—*দি সুলতানত অফ্ দিল্লী।*
— *মিডিয়াভ্যাল ইন্ডিয়ান কালচার।*
শেরওয়ানী, এইচ. কে— *দি বাহমনিস্ অফ্ দি ডেকান।*
— *মামুদ গাওয়ান।*
সরকার, স্যার জে. এন—*হিষ্ট্রি অফ্ বেঙ্গল* (২য় খন্ড, ঢাকা)।
সরণ, পি.—*ষ্টাডিজ ইন মিডিয়াভ্যাল ইন্ডিয়া।*
সাইকস, স্যার পার্সি—*এ হিষ্ট্রি অফ্ পার্শিয়া,* (২ খণ্ড)।
সাচউ, এডওয়ার্ড. সি.—*আলবেরুনীজ্ ইন্ডিয়া* (ইংরাজী অনুবাদ আলবেরুনীর ভ্রমন বৃত্তান্ত— *তহকিক-ই-হিন্দ*)
সালাটোর, বি. এ—*সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল লাইফ ইন দি বিজয়নগর কিংডম।*
সিওয়েল, রবার্ট— *এ ফরগটন এম্পায়ার।*

www.pathagar.com

সিওয়েল, রবার্ট ও আয়েঙ্গার, এস—*হিস্টোরিক্যাল ইনস্‌ক্রিপশনস্‌ অফ্‌ সাউথ ইন্ডিয়া* (১৯২০সাল পর্যন্ত সংগৃহীত)।
সেন, এ, কে,—পিপল অ্যাণ্ড পলিটিক্স্‌ ইন আর্লি মিডিয়াভাল ইণ্ডিয়া।
স্টুয়ার্ট, চার্লস—*হিস্ট্রি অফ্‌ বেঙ্গল।*
স্মিথ, ভি এ.—*দি অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ্‌ ইন্ডিয়া। কেম্বি জ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া—৩য় খণ্ড।*

বাংলা গ্রন্থপঞ্জী

আশরাফ, কে. এম.—*হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবন-চর্যা।*
কৃষ্ণদাস কবিরাজ— *চৈতন্য চরিতামৃত* (দেবসাহিত্য কুটির)।
কৃত্তিবাস—*রামায়ন* (দেবসাহিত্য কুটির)।
কোরয়শী, গোলাম সামদানী—*তারিখ-ই-ফিরোজশাহী* (জিয়া-উদ্দীন বারানীর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা)
গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পাদিত)—*শ্রী চৈতন্য একালের দৃষ্টিকোন।*
চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম—*কবিকঙ্কন চন্ডী!*
চক্রবর্তী, রজনীকান্ত—*গৌড়ের ইতিহাস* (এস.পি. পাবলিশার্স)।
চৌধুরী, মহম্মদ আলী—*তারিখ-ই-শেরশাহী* (আব্বাস খান শেরওয়ানীর রচিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা)।
চৌধুরী, ননীগোপাল—*বিদেশী পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত* (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ)।
চৌধুরী, প্রমথ—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ)।
থাপার, রোমিলা—ভারতবর্ষের ইতিহাস (ওরিয়েন্ট লংম্যান)।
দাশগুপ্ত, প্রেমময় (সংকলন ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)—*বিদেশীর চোখে ভারতবর্ষ: (১) মার্কোপোলোর চোখে ভারত, (২) অলবেরুণীর দেখা ভারত, (৩) ইবন বতুতার দেখা ভারত।*
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস—*বাঙ্গালীর ইতিহাস।*
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার—*বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।*
মুখোপাধ্যায়, সুকুমার—*বাংলা ইতিহাসের দু'শ বছর* (স্বাধীন সুলতানদের আমল—১৩৩৮-১৫৩৮)।
যাকারিয়া, আবুল কামাল মোহম্মদ—*তবকত-ই-নাসিরী* (মিনহাজউদ্দীন সিরাজের রচিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা)।
রায়, অনিরুদ্ধ; সৈয়দ নুরুল হাসান; গৌতম ভদ্র; অশীন দাশগুপ্ত—*মধ্যযুগের ভারত।*
রহিম, এম.এ.—*বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা)।

www.pathagar.com

শর্মা, রামশরণ—*ভারতের সামন্ততন্ত্র* (চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত)।

সরকার, জগদীশ নারায়ণ—*বাংলার হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক।*

সেন, দীনেশচন্দ্র—*বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (ইংরাজ প্রভাবের পূর্ব পর্যন্ত, অষ্টম সংস্করণ, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং)।

সেন, সুকুমার—*মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী* (বিশ্বভারতী)।

সেনগুপ্ত, কান্তিপ্রসন্ন—*দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস: মধ্যযুগ* (কে পি বাগচী অ্যান্ড কোং)।

www.pathagar.com

দিল্লীর সুলতানদের কালনির্ঘন্ট

হিজরি সন	দিল্লীর মামলুক সুলতানরা	খ্রীষ্টাব্দ
	কুতবী বংশ	
৬০২	কুতুবউদ্দীন আইবাক	১২০৬
৬০৭	আরাম শাহ	১২১০-১১
	ইলতুৎমিসের বংশ	
৬০৭	শামসউদ্দীন ইলতুৎমিস	১২১১
৬৩৩	রুকনউদ্দীন ফিরোজ	১২৩৬
৬৩৪	রাজিয়া	১২৩৬
৬৩৭	মুইজউদ্দীন বহরাম	১২৪০
৬৩৯	আলাউদ্দীন মাসুদ	১২৪২
৬৪৪	নাসিরউদ্দীন মামুদ	১২৪৬
	বলবনের বংশ	
৬৬৪	গিয়াসউদ্দীন বলবন	১২৬৫
৬৮৬	মুইজউদ্দীন কাইকোবাদ	১২৮৭
৬৮৯	শামসউদ্দীন কাইমুরস্	১২৯০
	খলজী বংশ	
৬৮৯	জালালউদ্দীন ফিরোজ	১২৯০
৬৯৫	রুকনউদ্দীন ইব্রাহিম	১২৯৬
৬৯৫	আলাউদ্দীন মহম্মদ	১২৯৬
৭১৫	শিহাবউদ্দীন উমর	১৩১৬
৭১৬	কুতুবউদ্দীন মুবারক	১৩১৬
৭২০	নাসিরউদ্দীন মূবারক (খলজীদের উচ্ছেদ করে সিংহাসন দখল করেন)	১৩২০

www.pathagar.com

তুঘলক বংশ

৭২০	প্রথম গিয়াসউদ্দীন তুঘলক	১৩২০
৭২৫	মহম্মদ বিন তুঘলক	১৩২৫
৭৫২	ফিরোজ তুঘলক	১৩৫১
৭৯০	দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন তুঘলক	১৩৮৮
৭৯১	আবু বকর	১৩৮৯
৭৯২	মহম্মদ বিন ফিরোজ	১৩৯০
৭৯৫	সিকন্দর তুঘলক	১৩৯৪
৭৯৫	মামুদ তুঘলক	১৩৯৫
৭৯৭	নসরৎ শাহ (বৈধ উত্তরাধিকারী নয়)	১৩৯৬
৮০১	মামুদ তুঘলক (পুনরাধিষ্ঠিত)	১৩৯৯
৮১৫	দৌলতখান লোদী (নির্বাচিত)	১৪১৩

সৈয়দ বংশ

৮১৭	খিজির খান সৈয়দ	১৪১৪
৮২৪	মুইজউদ্দীন মুবারক শাহ	১৪২১
৮৩৭	মহম্মদ শাহ	১৪৩৪
৮৪৭	আলাউদ্দীন আলম শাহ	১৪৪৫

লোদী বংশ

৮৫৫	বহলুল লোদী	১৪৫১
৮৯৪	সিকন্দর লোদী	১৪৮৯
৯২৩-৯৩২	ইব্রাহিম লোদী	১৫১৭-১৫২৬

www.pathagar.com

ইতিহাস চলমান জীবনের চালচিত্র। কাল্পনিক সীমারেখা টেনে বহমান ইতিহাসকে আদি, মধ্য ও আধুনিক এই তিন অংশে ভাগ করা হয়। আমাদের পাঠের সুবিধার জন্য বিশেষ কতকগুলি ঘটনার সমাবেশকে যুগের পরিবর্তনের নিশানা বলে চিহ্নিত করে আদি, মধ্য ও বর্তমানকালের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

তুর্কী আক্রমণ ও তাদের আগমনের সময় থেকে ভারতের মধ্যযুগের ইতিবৃত্তের সূত্রপাত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সাধারণত ১২০৬ সালে কুতবউদ্দীন আইবাকের সিংহাসনে আরোহন থেকে ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। এই গ্রন্থের প্রথম অংশে মুঘলদের আগমনের পূর্বে তুর্কী-আফগান শাসনের আমল আলোচিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়ার্ধে আলাদাভাবে মুঘল আমল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

স্নাতক ও স্নাতোকত্তর, সাম্মানিক ও অন্যান্য অগ্রসর শ্রেণীর ছাত্ররা এই বই পড়ে ভারতের মধ্যযুগ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক, ঐতিহাসিক ও লেখকদের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে পরিচিত হতে পারবেন। লেখক আধুনিক গবেষণালব্ধ তথ্যের সাহায্যে কারিগরী বিদ্যা, শিল্প ও বাণিজ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি জনজীবনের নানাদিক নিয়ে এই বইতে আলোচনা করেছেন। লেখকের বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মূল বক্তব্য সহজ সরল ভাষায় ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য করার প্রয়াস কতদূর সাফল্য অর্জন করেছে সে সম্পর্কে মধ্যযুগের ইতিহাসের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরাই রায় দেবেন।

তুর্কী আগমনের প্রাথমিক স্তরে সংঘর্ষ ও সংহাতের সূত্রপাত হয়েছিল। কালক্রমে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তুর্কী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রাক্তন শাসকদের ও স্থানীয় জনগণের সহযোগিতার সূত্রপাত হয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। ইতিমধ্যে মধ্যএশিয়ার যাযাবর মোংগলরা চেঙ্গিসখানের নেতৃত্বে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দুস্থানের দ্বারদেশে হানা দেয়। পঙ্গপালের মতন মোংগল বাহিনীর হানায় মধ্যএশিয়ার ইসলামিক সভ্যতার কেন্দ্রগুলি শশ্মানে পরিণত হয় এবং মধ্যএশিয়া ও ইসলামিক সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে উজবেক, তাতার তুর্কী দলে দলে ভারতে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। ফলে হিন্দুস্থান হয়ে উঠে বিদেশাগত আশ্রয়প্রার্থীদের নববাসভূমি। তারা আর তুর্কী বা তাজিক বা বিদেশী নয় হিন্দুস্থানকে তারা স্বদেশভূমি বলে গ্রহণ করেছিল।

মধ্যযুগের শহরে ও গ্রামে যে জনজীবনের ধারা ছিল তার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় সামাজিক আচার ব্যবহার, সমকালীন সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে, ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তাদের বক্তব্যে ও সুফী সন্তদের প্রচার থেকে। হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সাধনার ফলে এই যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে, স্থাপত্য ও কৃষ্টিতে, সংগীত ও শিল্পে একটি সমন্বয়ের ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের কথা ভেবে এই বইতে মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। কলকাতা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর দিকে দৃষ্টি রেখে এই বইতে বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে।

স্কটিশচার্চ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অসিত কুমার সেনের মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ *Peoples and Politics* বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থের নাম *International Relations since World War I* ও *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস*।

ISBN-81-7074-199-8

Rs. 100.00

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী

২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২